২য় খণ্ড

শঙ্করনাথ রায়
(প্র-না-ভ)

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা-৯

নিবেদন

কোনো লেখকের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজন সাধারণতঃ তখনি হয় যখন সেগুলি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থেকে দুষ্প্রাপ্যের কোঠায় পড়ে; আবার দীর্ঘদিনের বিস্মৃতির ধুলো ঝেড়ে পাঠকের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ের চেষ্টাও থাকে কখনো। শঙ্করনাথ রায়ের রচনাবলী প্রকাশের কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। দশবছরের ওপরে প্রয়াত এই লেখকের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সব রচনারই নতুন সংস্করণ হচ্ছে নিয়মিত। সাপ্তাহিক বেস্টসেলারের তালিকাতেও তাঁর নাম প্রায়ই চোখে পড়ে। তবু আবার নতুন রূপে এই আয়োজন কেন—সংগতভাবেই এ প্রশ্ন জাগে। আর তার উত্তর পেতে গেলে অবহিত হতে হবে এ-রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। শঙ্করনাথের রচনা তো শুধু একই সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়, আজকের জীবনযন্ত্রণায় বিভ্রান্ত মানুষের সামনে তা এক ধ্রুব মূল্যবোধের আদর্শ। সেই আদর্শের আলোয় মুমুক্ষু হৃদয় চিনে নিতে পারে নিজের অস্তিত্বের স্বরূপটিকে, সংশয়ী পায় শান্তি, আর্ত লাভ করে সান্ত্বনা। মহৎ সাহিত্যের সেই তো ফলশ্রুতি। সেই মহাফল কামনা করেই শঙ্করনাথের সাধক সমগ্রকে আমরা এই সংস্করণের মাধ্যমে এনে দিতে চাই সকলের আয়ত্তের মধ্যে। সর্বপ্রকার দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে পরাবিদ্যা দান করে গেছেন শঙ্করনাথ তাঁর গ্রন্থরাজিতে—তার সুফল যেন সর্বাধিক লোকে গ্রহণ করতে পারেন সেই প্রত্যাশাতেই এই সুলভ সংস্করণের পরিকল্পনা।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে এক অভিনব রসধারার উৎস মুক্ত করে দিয়েছেন শঙ্করনাথ। সে ধারার নাম আধ্যাত্মিক সাহিত্য। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে সে সাহিত্যধারার কথা-শরীর। কিন্তু সে রচনা তো শুধুই সাধুপুরুষদের 'জীবনী' নয়। কোনো অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জীবৎকালের ঘটনাবলীর বিবরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই চরিত্রের পরিচয় প্রদানই সাধারণ জীবনীর লক্ষ্য। শঙ্করনাথের রচিত জীবনীসমূহ কিন্তু নির্দিষ্ট জীবনবৃত্তান্তের বর্ণনাকে অবলম্বন করে এগিয়ে গেছে গভীরতর লক্ষ্যভেদে। ভারতবর্ষের সাধকসমাজের জীবনকাহিনীতে তিনি অন্বেষণ করেছেন তাঁদের শাশ্বত সাধনার মর্মকথা। সেই উদ্দেশ্যে নানা মত, নানা মুনির বিচিত্র শোভাযাত্রার পথে সন্ধানী পথিক শঙ্করনাথ। যোগী, বেদান্তী, তান্ত্রিক, মরমিয়া —সকলেরই উদার আমন্ত্রণ সেখানে।

সাধারণতঃ সাধুপুরুষদের জীবনী তাঁদের শিষ্যবর্গের দ্বারাই রচিত হয়ে থাকে। ফলে ব্যক্তিগত আবেগের কুয়াশায় যথার্থ সত্যের স্বরূপটি যায় ম্লান হয়ে। শঙ্করনাথের নির্মোহ সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে সেই মোহ-আবরণ কখনো বাধা হয়নি। বৈজ্ঞানিকের সামবসের শক্তিতে তিনি আমাদের জন্য অপাবৃত করে দিয়েছেন সেই দুর্লভের দর্শন দ্বার। এই শক্তি শঙ্করনাথ লাভ করেছিলেন এক যোগীশ্বর মহাত্মার কৃপায়। শঙ্করনাথের রচনার যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে হলে সেই কৃপাসিদ্ধ জীবনের কিছু ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন আছে।

শঙ্করনাথ রায় লেখকের ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। ১৯১১ সনে

অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার বায়রা গ্রামে মাতুলালয়ে প্রমথনাথের জন্ম। মাতামহী মধুমালাদেবী ছিলেন সেকালের ছাত্রবৃত্তি উত্তীর্ণা বিদুষী। তাঁর স্নেহমধুর ব্যক্তিত্ব শিশু প্রমথনাথের চরিত্রগঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরিণত বয়সেও দিদিমার স্নেহস্মৃতি স্মরণ করে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। শৈশবজীবনের এই স্নেহাতুরার আতিশয্য প্রমথনাথের চরিত্রে কোনোরকম দুর্বিনয় বা দুঃশীলতার পরিবর্তে এনেছিলো এক সর্বাঙ্গীণ পরিতৃপ্তিবোধসঞ্জাত সহৃদয়তা। স্বভাবের এই মধুর উপাদান আজীবন তাঁর চারপাশের পরিমণ্ডলকে স্নেহসুকুমার সামাজিকতায় ভরিয়ে রেখেছে।

প্রমথনাথের পিতা যোগেন্দ্রনাথ ঢাকা শহরে ওকালতী করতেন। তাঁর অনুচ্চারিত প্রশ্রয়ে জ্যাঠতুতো ও অনুজ ভাইয়েরা সকলেই ছাত্রবয়সে সক্রিয় বিপ্লবী রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই পরিবেশের প্রলোভন অনায়াসে এড়িয়ে গেছেন কিশোর প্রমথনাথ। সকলের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েও তিনি একা ছিলেন এ দলের বাইরে। সেই অবিবেচক আবেগের বয়সেও তিনি চিন্তা করেছেন অন্য ধারায়। ভাঙার পথ নয়, গড়ে তোলার লক্ষ্যই বরাবর তাকে টেনেছে। পোগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রমথনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে যোগদান করলেন। এ সময় হলের নানা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। হলের মুখ-পত্র 'বাসন্তিকা' সম্পাদনা করেছেন, লাভ করেছেন 'বিবেকানন্দ পদক'। হলের প্রোভোস্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে এইসময় তাঁর যে ঘনিষ্ঠ স্নেহসম্বন্ধ স্থাপিত হয় তা অম্লান ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করে কলকাতায় এলেন প্রমথনাথ। আইনজ্ঞ পিতার ইচ্ছা ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিজের জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু প্রমথনাথের রক্তে ছিল অন্যতর আকর্ষণের অস্থিরতা। ছাত্রবয়স থেকেই আর সকলের অনুসরণে গতানুগতিক জীবনে গা ভাসিয়ে শান্তি পাননি তিনি। পেশাগত ক্ষেত্রেও নতুনের সন্ধানে উন্মুখ হলেন। এমনি অস্থির সময়ে তাঁর পরিচয় হ'ল এক মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। তরুণ প্রমথনাথের পক্ষে কঠিন হয়নি এই মানুষটির মহত্ত্ব বোঝা—এখানেই তাঁর নিজের মহনীয়তা। জহুরী ছাড়া জহরতের আসল মূল্যায়ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব। অনায়াস আত্মসমর্পণের গুণে তিনি আকর্ষণ করে নিলেন এই মহাপুরুষের অপরিসীম কৃপা। জীবনপথের নিশ্চিত নির্দেশটি দিলেন তিনি—আর প্রমথনাথ সে নির্দেশ গ্রহণ করলেন সর্বান্তঃকরণে, সানিষ্ঠায়। যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায় হলেন প্রমথনাথের friend, philosopher and guide—তাঁর সর্বকর্মের নিয়ন্তা, আলোকদিশারী অগ্রজ—দাদা, কালীদা।

শ্রীযুক্ত গুহরায় প্রথম জীবনে ছিলেন সক্রিয় বিপ্লবী কর্মী। কারাবাসকালে কবি নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নানা দুর্বিপাকে উদ্‌ভ্রান্ত কবি এই মানুষটির মধ্যে খুঁজে পান শান্তির পরমাশ্রয়। ১৩৪২ সনে ১৯ই জ্যৈষ্ঠের নবযুগে 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে সেকথা তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন—"এমন সময় এলেন আমার এক না দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফত আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন। ..... আমার সকল জ্বালা যন্ত্রণা ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল। আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল।" দ্বিতীয়বার 'নবযুগ' সম্পাদনার ভার নিয়ে এই 'বিদ্রোহী' বন্ধুকেও নজরুল সেখানে টেনে নিলেন তাঁর সহযোগী করে। এইসময় প্রমথনাথ প্রায় নিত্য যেতেন 'নবযুগ' অফিসে। কালীদা ও কাজীদার সঙ্গে এই বৈঠকে যোগ দিতেন কারাজীবনের

আরেক বন্ধু, সাংবাদিক অমলেন্দু দাশগুপ্ত। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা—চিন্তাজগতের সবগুলি জানলাই খোলা ছিল এ আসরে। শ্রীগুহরায়ের জীবনে রূপান্তরের পর্বটি তখনো চলেছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সামনে একে একে উন্মীলিত হচ্ছে সেই অলৌকিক কাহিনীর পৃষ্ঠাগুলি। প্রমথনাথও তার সাক্ষী। এই অভিজ্ঞতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁরও ছায়াসংশায়িত চেতনালোক। মৃত্যুর অব্যবহিত আগে 'হিমাদ্রি' পূজাসংখ্যায় পরপর তিনবছর ধরে এ বিষয়ে অনেক কথাই লিখেছেন তিনি। এ রচনাগুলি তিনি লিখেছেন স্বনামে। 'শঙ্করনাথ' নামের ছদ্ম আবরণ মোচন করে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সত্য-অভিজ্ঞতাকে পাঠকের মুখোমুখি বসে মেলে ধরেছেন এখানে। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত সেই রচনাগুলিও শেষখণ্ডে সংগ্রথিত হবে।

শঙ্করনাথের রচনার বিষয়বস্তু যে অধ্যাত্মলোক সেখানে লৌকিক অলৌকিকের সংমিশ্রণ অবাধ। সাধারণ পাঠকের কাছে এ ধরনের রচনায় যে অনেকখানি সংশয়ের অবকাশ থেকে যায় এ কথা প্রমথনাথ জানতেন।

১৯৫২ সালে 'হিমাদ্রি' পত্রিকা প্রকাশের পর সম্পাদকরূপে অনেকটা বাধ্য হয়েই যখন তিনি এই জীবনীগুলি লিখিতে শুরু করেন, তখন এইসব অলৌকিক উপাদানের প্রকাশ্য উপস্থাপনে তাঁর অনেকটাই কুণ্ঠা ছিল। শ্রীগুহরায় সেসময়ে তাঁকে দিয়েছেন আশ্বাস আর অনুপ্রেরণা, সাধকজীবন ও সাধনার নানা কূটরহস্য উন্মোচন করে বহু জিজ্ঞাসার সমাধান করেছেন। 'সাধুসন্তের মহাসংগমে' গ্রন্থে প্রমথনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন সাধনা ও সিদ্ধির তত্ত্ব এবং ভারতীয় সাধু মহাত্মাদের কাহিনী ও মাহাত্ম্যের যা কিছু আমি জেনেছি, তা ঐ যোগীশ্বরজীর কৃপায়।' বস্তুত এই পর্ব থেকে শঙ্করনাথের জীবন নিবেদিত এক আত্মার ইতিহাস। কথায় বলে, 'গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য না মিলে এক।' এমনি একতম শিষ্য ছিলেন শঙ্করনাথ। গুরুর মাহাত্ম্য ও মহত্ত্বকে সনিষ্ঠায় অনুধাবন করাই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কৃত্য। সাধুসন্তদের পুণ্যজীবনী আলোচনার মাধ্যমে ভারত-সাধনার প্রকৃত পরিচয় ফুটিয়ে সেই কৃত্যকেই সম্পন্ন করতে চেয়েছেন তিনি। তাই শুধু মহাপুরুষদের জীবনের কাহিনী নয়, তাঁদের সাধনার কাহিনীও সমান তথ্যবহরূপে সন্ধান করেছেন প্রমথনাথ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সে অনুসন্ধানকে 'বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা'র অভিধা প্রদান করেছেন। বলেছেন, 'এই বই পড়া মানে, ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব-গঙ্গায় অবগাহন স্নান করা। সাপ্তাহিক 'হিমাদ্রি' পত্রিকায় যখন এই জীবনীগুলি প্রকাশিত হতে থাকে, জীবনী লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সেসময় এগুলি পড়ে অভিভূত হন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর মুখে রচনাগুলির কথা শুনে শ্রীমুখোপাধ্যায় এগিয়ে এলেন গ্রন্থাকারে এই রচনাবলীর প্রকাশে।

১৯৫৮ সালে 'ভারতের সাধকে'র প্রথম প্রকাশ। আর প্রথম প্রকাশ থেকেই জনচিত্তজয়ের এক আশ্চর্য ইতিহাস।

ভক্ত, জ্ঞানী ও ঔপন্যাসিক—এই তিন সত্তার সম্মিলনই প্রমথনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এর ফলে ভারতবর্ষের যে শাশ্বত-ঐতিহ্য সম্বন্ধে তিনি বাঙালী পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন, সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে বড় সুচারুভাবে। উপস্থাপনার নাটকীয় ভঙ্গি, বর্ণনার কবিত্বপূর্ণ রীতি এবং সর্বোপরি বিষয়বস্তুর সনিষ্ঠ জ্ঞান বাংলা জীবনী-সাহিত্যে শঙ্করনাথকে শ্রেষ্ঠতম আসনের অধিকারী করেছে। গুণীজনের জীবনী রচনায়

মুখ্য উদ্দেশ্য হল তাঁর বিশেষ গুণটির পরিচয় প্রদান। এদিক থেকে দেখলে যত দুরূহ ছিল প্রমথনাথের কর্তব্য। অবাঙ্‌মানসগোচর যে রহস্য তাকেই রূপ দিতে বসেছেন তিনি। মহাপুরুষদের জীবনী সেই অরূপে পৌঁছবার রূপময় সোপান। ত্রয়োদশখণ্ড 'ভারতের সাধক', দুইখণ্ড 'ভারতের সাধিকা'র শেষে সেই আরোহণের শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন লেখক। তারপরের গ্রন্থে 'সাধুসন্তের মহাসংগমে।' সে গ্রন্থের 'প্রাক্ ভাষণের' সূচনায় তিনি লিখেছেন, আধ্যাত্মিক মহাসংগম বলতে তাত্ত্বিক সুধী-জনেরা বোঝেন এমন একটি পবিত্র এবং বৃহৎ সংগমস্থলকে যেখানে নানা দিগ্‌দেশ থেকে এসে মিলিত হয়েছে বহু বিচিত্র সাধনার ধারা, আর তা বিলীন হয়েছে মুক্তি মোক্ষ বা ব্রহ্মনির্বাণের মহাপারাবারে।' সেই মহাপারাবারের মহাতীর্থে পৌঁছেছেন লেখক ঘটনাময় জীবনের তথা জীবনীর রূপলোকে তিনি আর আবদ্ধ থাকতে চান না। তাঁর চেতনায় এবার পরামুক্তির আহ্বানটি স্পষ্ট হয়ে এসেছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলির অন্তস্তলে উদ্বেলিত সেই আহ্বানের আকর্ষণ। ১৩৭৯ ও '৮০ সনের 'হিমাদ্রি' শারদীয়া সংখ্যায় তাই নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করলেন নিজের অধ্যাত্মজীবনের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। বলা বাহুল্য সেখানেও প্রমথনাথ নিজেকে স্থাপন করেছেন ইতিহাসের আধারমাত্ররূপে। এক আশ্চর্য সংঘটনের তিনি দ্রষ্টা—ব্যক্তিহিসেবে এটুকুই তাঁর নিরভিমান ভূমিকা।

পরাজ্ঞান যিনি উপদেশ করতে পারেন এমন লব্ধজ্ঞান বক্তা যেমন দুর্লভ তেমনি সুদুর্লভ যিনি নিপুণরূপে অনুশিষ্ট হতে পারেন এমন তন্নিষ্ঠ শিষ্য—

'আশ্চর্যোবক্তা কুশলোহস্য লব্ধা
আশ্চর্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।

এই উভয় ভূমিকাই প্রমথনাথ অনায়াসে পালন করতে পেরেছেন, আর তারই ফলে সম্ভব হয়েছে এই গ্রন্থরাজী রচনা। আর এই দুই ভূমিকাতেই তাঁর সার্থকতার মূলে রয়েছে গুরুর প্রতি অনিঃশেষ আনুগত্য। এ আনুগত্য সম্মুঢ় চিত্তের অবিবেকী আত্ম-সমর্পণ নয়। জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকে, শাস্ত্রানুশাসন ও ঐতিহ্যপরম্পরার বিশ্লেষণে একে তিনি অর্জন করেছেন। আর একবার অর্জনের পর আর কোনো দ্বিধা জাগেনি, পিছু ফিরে দেখার প্রশ্ন ওঠেনি কোনোদিন। এজন্যই এই দুর্গম পথে তাঁর যাত্রা এত অনায়াস, গতি এত সাবলীল।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রমথনাথ ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয় সামাজিক মানুষ, কর্তব্যপরায়ণ গৃহস্বামী, স্নেহশীল স্বামী ও পিতা। তাঁর সুরসিক হাস্যালাপ, সহজ কথার ছলে গভীর তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রতিভা এবং সর্বোপরি সকলের সঙ্গে সহমর্মিতাবোধের অ-সহজ ক্ষমতায় অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। অসামান্য ধীশক্তি ও সহজাত বুদ্ধির প্রাখর্যে লৌকিক অথবা চিন্তাজগতের যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারতেন অনায়াসে। যে কোনোভাবে অপরের আর্তি অপনোদনে তিনি ছিলেন সদা উৎসুক। সর্বদা বলতেন, 'নিজের স্ত্রীপুত্রের আরামের আয়োজন ত কুকুর বিড়ালও করে থাকে। সকলের সুখের কথা যদি ভাবতে না পারি তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন।' বলা বাহুল্য, সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন চিন্তাধারাকে সাধুবাদ দেওয়া যত সহজ, গ্রহণ করা তেমনি কঠিন। প্রমথনাথের পক্ষে এ মনোভাব তো শুধু তাত্ত্বিক চিন্তার ফল নয়, এ তাঁর স্বভাবের প্রবণতা। এজন্য বাহ্যিক লাভ-ক্ষতি নিন্দা-প্রশংসাকে সমভাবে গ্রহণ করে নিজে যা কর্তব্য বুঝেছেন তা থেকে বিরত হননি কোনোদিন। সুকুমার সংবেদন-

শীল স্বভাবের মধ্যে আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার যে বজ্রাদপি কঠোরতা নিহিত ছিল, বাইরে থেকে অনেকসময়ই তার হদিস পাওয়া যেত না। দারুণতম বিপর্যয়ের দিনেও সদা-প্রসন্ন আননে একটি দুশ্চিন্তার রেখা কখনো প্রকট হয়নি। চিত্তের স্থৈর্য হয়নি বিপর্যস্ত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে আসছে তারই সঙ্গে মেতে উঠেছেন হাস্যালাপে। আবার বিদায়ের পরমুহূর্তেই কলমটি খুলে ঠিক ছেড়ে দেওয়া পঙ্‌ক্তির অনুবৃত্তি করেছেন অতি অনায়াসে। চিত্তের এই সমতা সাধারণ দৃষ্টিতে আশ্চর্য মনে হলেও প্রমথনাথের পক্ষে ছিল স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর সহজাত চিন্তাশীল ধীরস্বভাব আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমি লাভ করে পরিণত হয়েছিল সুখে-দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন স্থিতধী চেতনায়। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের যে গুণাবলীর কথা শোনা যায়, ভক্তিতে ভদ্রতায়, স্নেহে, সখ্যে কর্তব্যে—সাংসারিক সমস্ত সম্বন্ধে তার আদর্শ ছিলেন প্রমথনাথ। তাঁর তিরোধানের পরে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৩৮১ সনের শারদীয়া 'হিমাদ্রি'তে 'আধুনিক চিন্তাধারা' নিবন্ধে লিখেছেন—"আমার দুঃখ হয়—ভারতীয় ধারায় চিন্তা করিবার মানুষ ভারতবর্ষে নাই।.........পূজ্যপাদ প্রত্যাগাত্মা স্বামী লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শিববাটির ললিতা শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ কেমন আছেন জানি না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় পাই। সদ্‌গৃহস্থ সাধু আমাদের চির আদরের প্রমথনাথে আমাদিগকে কাঁদাইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। চোখের সম্মুখে তো গৃহীর একটা আদর্শ ছিল, একান্ত ভরসাস্থল সুহৃদ ছিল আমার প্রমথনাথ। কাহার মুখ চাহিয়া আমরা বুক বাঁধিব।"

বলা বাহুল্য, বর্ষীয়ান বৈষ্ণবের এই বেদনা, এই মূল্যবোধ আজকের সমাজে অতি বিরল। সেজন্য ব্যক্তি প্রমথনাথের চারিত্রশক্তির যথার্থ মূল্যায়নও সাধারণ্যে হওয়া কঠিন। প্রমথনাথ তাঁর আলোচিত মধুসন্তদের আদর্শেই জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন। এই লৌকিক সংসারে থেকেও দৃষ্টিভঙ্গির মহনীয়তায় অলৌকিক তাঁর জীবন। তাই হয়তো লোকোত্তর জীবনের ডাক তাঁর কাছে এত শীঘ্র এসেছিল। ১৯৭৩ সালের ৮ই নভেম্বর মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে প্রমথনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন। তবে মহৎ জীবনের সার্থকতা এই, তিনি নবদেহ ত্যাগ করলেও নিত্যকালের জন্য গচ্ছিত রেখে গেছেন তাঁর চিন্ময়-চিন্তা। তাঁর অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের যে ফলশ্রুতি তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন, মহা-কালের ভাণ্ডারে তা চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে।

—জয়ন্তী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

আচার্য রামানুজ

ভোর হইতে না হইতেই দাক্ষিণাত্যের পার্থসারথির মন্দিরে সেদিন ভিড় জমিয়াছে। নিকটেই কৈরবিণী সাগরসঙ্গমের তীর্থ। প্রতি বৎসর চন্দ্রগ্রহণের সময় অসংখ্য যাত্রী এ অঞ্চলে আসিয়া জুটে। স্নান তর্পণ সারিয়া এ মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করে, ভক্তিভরে সমাপন করে পূজা অর্চনা। এবারও দলে দলে সবাই আসিয়াছে।

পেরেমবুদুরের সর্বজনপ্রিয় পণ্ডিত, আসুরি কেশবাচার্যও আজ সস্ত্রীক এখানে উপস্থিত। বেদবিদ্ ও যজ্ঞনিষ্ঠ এই ব্রাহ্মণের খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা নাই। পাণ্ডরাজ্যের ব্রাহ্মণেরা সবাই মিলিয়া তাঁহাকে উপাধি দিয়াছেন—'সর্বক্রতু'।

বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশব ও তাঁহার স্ত্রী অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। ব্যক্ত করিলেন প্রাণের গোপন আকাঙ্ক্ষা।

দীর্ঘ বিবাহিত জীবন যাপনের পরও গৃহে তাঁহাদের সুখ নাই। কারণ, পুত্রমুখ দর্শনে এযাবৎ বঞ্চিত রহিয়াছেন। পূজা সমাপনের পর পণ্ডিত সেদিন তাই মন্দির সন্নিহিত তিরুইল্লি-কেণিতে, কুমুদ সরোবরে অনুষ্ঠান করিলেন এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ।

কাজকর্ম শেষ হইয়া গেল। সারাদিনের পর ক্লান্ত দেহে কেশবাচার্য নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন। গভীর নিশীথে দেখিলেন এক বিচিত্র স্বপ্ন—

ভগবান্ পার্থসারথি জ্যোতির্ময় মূর্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রসন্ন-মধুর কণ্ঠে ঠাকুর বলিতেছেন, "বৎস সর্বক্রতু তোমার ভক্তি, নিষ্ঠা ও শরণাগতিতে আমি তুষ্ট হয়েছি। কোনো চিন্তা নেই। বর দিচ্ছি অচিরে তুমি এক পরম ভাগবত পুত্র লাভ করবে। আত্মাভিমানী পণ্ডিতদের দমনের জন্য শক্তিধর আচার্যরূপে হবে তার আবির্ভাব। তোমার এই তনয় আসবে এক প্রেরিত পুরুষরূপে, আর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ধারাকে এযুগে সে নামিয়ে আনবে।"

দেবতা অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উচ্ছ্বাসে পণ্ডিতের নিদ্রা টুটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি পত্নীকে জাগাইয়া তুলিয়া শুনাইলেন এই দৈবী বার্তা।

বৎসর না ঘুরিতেই প্রভু পার্থসারথির এ স্বপ্নাদেশ বাস্তবে রূপ নেয়। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবাচার্যের গৃহ আলোকিত করিয়া শুভলগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় এক দিব্যকান্তি শিশু। এই শিশুই উত্তরকালের বহুকীর্তিত মহাপুরুষ—আচার্য রামানুজ। এই বিরাট সাধকের আবির্ভাব শুধু দক্ষিণ ভারতকেই উজ্জীবিত করিয়া তুলে নাই, সমগ্র ভারতের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনেও আনয়ন করে এক নূতন তরঙ্গোচ্ছ্বাস। এ তরঙ্গের শীর্ষে দেখা দেয় বহুখ্যাত দার্শনিক তত্ত্ব—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

বৌদ্ধ ও শঙ্কর-যুগের পরে, শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী আচার্যরূপে রামানুজ আবির্ভূত হন। তিনি প্রচার করেন—ব্রহ্ম আমাদের উপাসনা ও সেবার যোগ্য। ভগবৎ-প্রেম আর শরণাগতির পরমতত্ত্ব নূতন করিয়া মানুষের কাছে তিনি ঘোষণা করেন। অসামান্য মনীষা ও সাধন-শক্তি বলে স্থাপন করেন নিজস্ব ভক্তিতত্ত্ব। তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শুধু শাঙ্কর-মতের প্রতিদ্বন্দ্বীই হয় নাই, সমকক্ষ বলিয়াও সারা দেশে খ্যাত হইয়া উঠে।

ভারতের ধর্মজীবন ও সাধনক্ষেত্রে রামানুজের প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। তাঁহার আবির্ভাব বৈষ্ণবমতে প্রতিষ্ঠাকে এদেশে ত্বরান্বিত করিয়া তোলে। তাঁহার প্রচারিত বিষ্ণু-উপাসনা ও ভক্তিআন্দোলন প্রভাবিত করে মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্যদের। ভক্তিধৃত এই মহান্ জীবনের সাধনা আত্মপ্রকাশ করে এ যুগের ভক্তিধর্মের যমুনোত্রীরূপে।

বাল্যকাল হইতেই রামানুজের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দুরূহ পাঠ্য-সমূহ অতি সহজে সে আয়ত্ত করিতে থাকে, এই মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া অধ্যাপকেরা অবাক হইয়া যান। যে ধর্মজীবন উত্তরকালে অনন্যসাধারণ হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, তাহার সূত্রপাত দেখা যায় এই অল্প বয়সেই। তাছাড়া ধর্মকথা ও সাধুসজ্জনের সঙ্গ পাইলে তো কথাই নাই, তখন আর বালকের কোনো দিকে হুঁশ থাকে না।

রামানুজের অধ্যাত্মজীবনে দুইটি বিশেষ ধারাকে মিলিত হইতে দেখা যায়। পিতা কেশবাচার্য শাস্ত্র-পারঙ্গম, সাধননিষ্ঠ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার জীবন হইতে রামানুজের মধ্যে সঞ্চারিত হয় জ্ঞান ও কর্মের প্রবাহ, আর মাতৃকুল হইতে সে প্রাপ্ত হয় ভক্তি ও প্রপত্তি। মাতা কান্তিমতীর বংশে ভক্তি-সম্পদের অভাব ছিল না তাঁহার ভ্রাতা প্রবীণ ভক্ত ও সাধক শৈলপূর্ণ ছিলেন বৈষ্ণবনেতা যামুনাচার্যের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। বালক বয়স হইতেই মাতা ও মাতুলবংশের অতুলনীয় ভক্তি রামানুজ প্রাপ্ত হন।

সন্ধ্যার অন্ধকার সেদিন পেরেমবুদুরের পথে-প্রান্তরে ঘনাইয়া আসিতেছে। বালক রামানুজ চতুষ্পাঠী হইতে সবেমাত্র ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। অদূরে রাজপথে এক প্রিয়-দর্শন সাধুকে দেখিয়া অমনি সে তাড়াতাড়ি সেদিকে আগাইয়া যায়। অপূর্ব দিব্যকান্তি তাঁহার, আনন্দোজ্জ্বল নয়ন দুইটি কোন্ এক অজানিত আকর্ষণে মানুষকে চঞ্চল করিয়া তোলে। সাধুটি অচেনা নন, এ পথে প্রায়ই তাঁহাকে আনাগোনা করিতে দেখা যায়—দেবপূজার জন্য তিনি কাঞ্চী শহর হইতে পুনামেলি অবধি পরিব্রাজন করেন।

রামানুজদের গৃহের সম্মুখ দিয়াই এই মহাত্মার গমন পথ। এক পরম ভাগবত মহা-পুরুষরূপে এ অঞ্চলে তাঁহার খ্যাতি আছে—নাম কাঞ্চীপূর্ণ। বিষ্ণুকাঞ্চীর জাগ্রত বিগ্রহ বরদরাজের তিনি পরমভক্ত, আপনজন। লোকের ধারণা, শ্রীবিগ্রহ তাঁহার এই চিহ্নিত ভক্তের মুখ দিয়া নিজের লীলাকাহিনী প্রকাশ করেন, ভক্তদের নির্দেশাদি দেন।

বালক রামানুজ এতসব কথা জানে না। কিন্তু এই মহাসাধকের ভাবময় দৃষ্টি, আনন্দঘন রূপ সদাই তাহার প্রাণ-মন কাড়িয়া নেয়। সুযোগ পাইয়া আজ সে কাঞ্চী-পূর্ণের সম্মুখীন হয়।

ব্যাকুল কণ্ঠে বালক অনুরোধ জানায়, আজ রাত্রে মহাত্মাকে কৃপা করিয়া তাহাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি গন্তব্যস্থলে পুনা-মেলিতে যাইতে পারিবেন।

কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে কেশবাচার্যের পুত্র এই ক্ষুদ্র বালকের মধ্যে। চোখে মুখে এক মহাসাধকের লক্ষণ পরিস্ফুট,—সর্ব অঙ্গে মাখানো রহিয়াছে দিব্য লাবণ্য-শ্রী। সাধু কাঞ্চীপূর্ণ বালকের সাগ্রহ আহ্বান সেদিন কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। আতিথ্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইল।

বালক পুত্রের এ আবার কি খেয়াল? পিতা কেশবাচার্য কিন্তু মনে মনে খুশীই হইলেন। সাধুকে উত্তমরূপে ভোজন করানো হইল। রাত্রে তিনি পালঙ্কে বিশ্রাম

করিতেছেন, এ সময়ে রামানুজ পদপ্রান্তে আসিয়া বসিল, সে তাঁহার পদ সম্বাহন করিতে চায়।

ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "সেকি কথা, বৎস! তুমি আমার পদসেবা কি ক'রে করবে বলতো? তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান—আর আমি নীচ জাতীয় শূদ্র। ছি—ছি, এমন প্রস্তাব কখনো ক'রো না।"

রামানুজ হটিবার পাত্র নয়। উত্তর দেয়, "প্রভু, উপবীত ধারণ করলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি-ই তো প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দেশবিখ্যাত ভক্ত তিরুপ্পান আড়-বার কি চণ্ডাল হয়েও শত শত ব্রাহ্মণের পূজা পান নি? বুঝেছি, আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই আপনার মতো মহাপুরুষের সেবার অধিকার আমি পাবো না।"

এ কি অদ্ভুত কথা এই ক্ষুদ্র বালকের মুখে। কাঞ্চীপূর্ণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বুঝিলেন, এ বালক ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, অসামান্য সম্ভাবনা ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

শুধু একটি রাত্রির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও অন্তরের স্পর্শ—কিন্তু বালক রামানুজের জীবনে ইহার প্রভাব অনতিবিলম্বে দূরপ্রসারী হইয়া উঠে। শ্রীবরদরাজের প্রিয়ভক্ত, কাঞ্চীপূর্ণ সেদিন তাহার জীবনের মূলে এক প্রকাণ্ড নাড়া দিয়া যান।

পুত্র ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করার পর সৎ বংশের এক সুন্দরী কন্যার সহিত কেশবা-চার্য তাহার বিবাহ দেন। পণ্ডিতের গৃহ এ উৎসবের আনন্দে মুখর হইয়া উঠে। কিন্তু এ আনন্দ মাসখানেকের বেশী বিরাজিত থাকে নাই। পরিবারের সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া কেশবাচার্য হঠাৎ একদিন পরলোকে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে শোকসন্তাপ কিছুটা কমিয়া আসিল। রামানুজ এবার নিজের জীবন গঠনে ব্রতী হইলেন। স্থির করিলেন, উচ্চতর শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া হইবেন এক লোকমান্য মহাপণ্ডিত।

কাঞ্চীতে তখন অদ্বৈতবাদী আচার্য যাদবপ্রকাশের প্রচণ্ড প্রতাপ। বহু শিষ্য পরিবৃত হইয়া তিনি এ নগরে বাস করেন—পাণ্ডিত্য গৌরবের তাঁহার সীমা নাই। রামানুজ পরম উৎসাহে ইঁহারই নিকট অধ্যয়ন শুরু করিয়া দিলেন।

নবাগত ছাত্রের মেধা ও প্রতিভা দর্শনে আচার্য তো মহা উল্লসিত। অল্পদিনের মধ্যে রামানুজ তাঁহার প্রিয়তম ছাত্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

সেদিন ছাত্রদের ভোরবেলার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ স্নানের জন্য তৈলমর্দনে রত। এ সময়েও পণ্ডিতের অবসর নাই। উচ্চতর শ্রেণীর এক পড়ুয়া আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদের এক শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বসিল।

'তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী'—এ মন্ত্রাংশের 'কপ্যাসং' কথাটি নিয়াই যত গোল বাধিয়াছে। সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ—কিন্তু তাহা ঠিক কিরূপ? না, কপির গুহ্যদ্বারদেশের মতো। অর্থাৎ সেই হেমকান্তি পুরুষের নয়ন দুইটি বানরের গুহ্যদ্বারের ন্যায় লোহিতবর্ণের যে পদ্ম, তাহারই সদৃশ। মন্ত্রটির বহু প্রচলিত ব্যাখ্যাই অধ্যাপক প্রকাশ করিলেন।

পরমপুরুষ শ্রীভগবানের নয়নকমল সম্বন্ধে একি অবাঞ্ছিত, হীন উপমার প্রয়োগ! —ভক্ত রামানুজের ব্যথিত হৃদয়ে তখন বার বার এই প্রশ্নই আন্দোলিত হইতেছে। যিনি নিখিল সৌন্দর্যের আকর সর্ব কল্যাণ ও গুণের উৎস, তাঁহার আঁখিপদ্ম দুইটিকে বানরের গুহ্যদ্বারদেশের সহিত তুলনা করা! এ যে অসহ্য!

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে স্বভাব-ভক্ত রামানুজ কাঁদিয়া ফেলিলেন। নয়ন বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বার বার ভাবিতে লাগিলেন—'এ কখনও হতে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের উদ্‌গীত এ মন্ত্রে নিশ্চয় অন্য কোনো অর্থ প্রচ্ছন্ন রয়েছে।'

অধ্যাপকের অনাবৃত জানুদেশে হঠাৎ দুই ফোঁটা ঈষদুষ্ণ জল গড়াইয়া পড়ে। তিনি চমকিয়া উঠেন। তৈলমর্দনকারী রামানুজের দিকে তাকাইয়া দেখেন, তরুণ শিষ্যের দুই চোখে অশ্রুরাশি টলমল করিতেছে। সে কি। কোন্ মনোবেদনায় সে এমন মুহ্যমান। ব্যাকুল হইয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তর শুনিয়া অধ্যাপকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

বেদনাহত কণ্ঠে রামানুজ নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আপনার মতো আচার্যের মুখে একি কথা। উপনিষদের এ ব্যাখ্যায় আমি মর্মাহত হয়েছি। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের নয়নকমলের সঙ্গে বানরের অপান দেশের তুলনা। এ শুধু অশোভনই নয়, পাপ-জনকও বটে। আপনার মতো প্রাজ্ঞ মহাত্মার মুখ থেকে এ কদর্থ আশা করি নি।"

অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বৎস, তোমার দাম্ভিকতা আমাকে আজ মর্মাহত করেছে। বেশ। এ থেকে উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা কি তুমি করতে পার ?"

"প্রভু, আপনার আশীর্বাদে অনেক কিছুই সম্ভব হতে পারে।"

"ভাল, ভাল। তোমার নূতনতর ব্যাখ্যাটি আমায় শোনাও দেখি। তুমি দেখছি আচার্য শঙ্করকেও ছাড়িয়ে উঠবে।"

রামানুজ করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদে তাই বা অসম্ভব হবে কেন ? প্রভু, আমি কিন্তু এ মন্ত্রের অন্য প্রকার অর্থ ক'রে ঐ হীন উপমার দোষটি দূর করতে চাচ্ছি। কপ্যাস শব্দের কং পদের অর্থ জল। আর পিবতি অর্থ—যে পান বা আকর্ষণ করে, অর্থাৎ সূর্য। আর মন্ত্রের 'আস্' শব্দটি আস্ ধাতুর রূপ এর নিহিতার্থ —'বিকশিত'। সুতরাং সমগ্র বাক্যটির অর্থ হচ্ছে সূর্যের দ্বারা যা বিকশিত হয় অর্থাৎ —পদ্ম। এদিক থেকে মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়ায়—সেই স্বর্ণবর্ণ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষের নয়নদ্বয় সূর্যবিকশিত কমলের ন্যায়।"

ব্যাখ্যা শুনিয়া অধ্যাপক রুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "হু"। কিন্তু তুমি যা বললে তা মুখ্যার্থ নয়, গৌণার্থ মাত্র—এ তোমার মনোভিলাষ অনুযায়ী তুমি তৈরী করেছ। যাক্, তোমার ব্যাখ্যানকৌশল অবশ্যই প্রশংসনীয়।"

সুচতুর যাদবপ্রকাশ সেদিন হইতেই বুঝিয়া নিলেন, শিক্ষার্থী রামানুজ শুধু ভগবদ্-ভক্ত ও সুপণ্ডিতই হন নাই, এক তীক্ষ্ণধী দ্বৈতবাদী শাস্ত্রবিদের সম্ভাবনা তাঁহার জীবনে ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রতিভাধর শিষ্য রামানুজ যাদব-প্রকাশের মতবাদের ধারক ও বাহক হইবে, ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা। এজন্য এই তরুণ শিষ্যের প্রতি এতকাল কম স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আজিকার এই ঘটনার পর তাহা অনেকটা হ্রাস পাইয়া গেল। ভিতরে ভিতরে ক্রোধ খুবই হইয়াছে কিন্তু নিজের মনোভাব কিছুই তিনি প্রকাশ করিলেন না।

আচার্য যাদবপ্রকাশ শুধু শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবেই খ্যাত ছিলেন না, মন্ত্রবিদ্যায়ও তাঁহার অধিকার ছিল যথেষ্ট। সে-বার কাঞ্চীর রাজকন্যা এক দুষ্ট প্রেতাত্মার প্রভাবে পতিত হন। বহু চিকিৎসায়ও তাঁহাকে সারানো যাইতেছে না। অবশেষে রাজা নিরুপায় হইয়া মন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী যাদবপ্রকাশের কাছে দূত পাঠাইলেন।

শিষ্যগণসহ আচার্য প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হন। সাড়ম্বরে রোগিনীর সম্মুখে শুরু হয় মন্ত্রপাঠ।

প্রেত কিন্তু রাজকুমারীর মুখ দিয়া এক অদ্ভুত কথা বলিয়া বসে "পণ্ডিত আমি রাজকুমারীকে ত্যাগ ক'রে যাবো, কিন্তু তার পূর্বে সম্মুখে দণ্ডায়মান তোমার শিষ্য রামানুজকে আমার শিরে পদস্পর্শ করতে দাও। তোমার এ শিষ্যের দেহ পরম পবিত্র, সে এক শক্তিমান্ বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণ।"

কথাটি শুনিয়া যাদবপ্রকাশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রেতের অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইল, নহিলে রোগ সারিবে না। আচার্যের ইঙ্গিতে রামানুজ তখনি সর্বসমক্ষে রোগিনীর মস্তকে চরণ স্থাপন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, প্রেতাবিষ্টা রাজকুমারী সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন।

ঘটনাটি সামান্য কিন্তু ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কাঞ্চীর রাজসভা ও জনজীবনে রামানুজের প্রসিদ্ধি সেদিন ছড়াইয়া পড়ে। পুণ্যাত্মা সাধক ও বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে ধীরে ধীরে তিনি সর্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন।

অধ্যাপকের সঙ্গে রামানুজের দৃষ্টিভঙ্গির রহিয়াছে এক মৌলিক পার্থক্য। আর এ প্রার্থক্য ক্রমেই বড় হইয়া দেখা দেয়। রামানুজ নিজে কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতী, খ্যাতনামা বিষ্ণু-উপাসক বংশে তাঁহার জন্ম। তাহা ছাড়া, বালক বয়স হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ছোঁয়া লাগিয়াছে পরম ভাগবত কাঞ্চীপূর্ণের, প্রপত্তি ও শ্রদ্ধাভক্তির উপর জাগিয়াছে অটুট আস্থা। অপর দিকে, অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ হইতেছেন এক শুষ্ক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত। শাঙ্কর মত হইতে এক ভিন্নতর অদ্বৈত-মতের ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি সুপরিচিত, তাই আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করেন।

এতদিন অধ্যাপক ও ছাত্রদের মতবিরোধ ছিল প্রচ্ছন্ন—এবার মাঝে মাঝে ঘটিতে থাকে প্রকাশ্য সংঘাত। অসামান্য ধীশক্তি ও প্রতিভা নিয়া রামানুজ জন্মিয়াছেন, এই শক্তিবলে প্রায়ই যাদবপ্রকাশের মত তিনি খণ্ডন করিতেন। যুক্তিতে আঁটিতে না পারিয়া আচার্যের অন্তর্দাহ আরও বাড়িয়া উঠিত।

একদিনকার বিতর্ক চরমে উঠিল। আচার্য ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। সর্বসমক্ষে রামানুজকে অপমানিত তো করিলেনই, তারপর তাঁহাকে আশ্রম হইতে করিলেন বহিষ্কৃত।

অধ্যাপকের পদবন্দনা করিয়া রামানুজ নতমস্তকে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। মেধা ও উন্মেষশালিনী বুদ্ধি তাঁহার যথেষ্টই রহিয়াছে এবার স্বগৃহে বসিয়াই শুরু করিলেন শাস্ত্রচর্চা।

রামানুজকে তাড়াইয়া দিবার পর যাদবপ্রকাশ আরো বেশী দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। যে বিপুল শক্তি তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহা অধ্যাপকের অজানা নয়। অল্প কিছুদিন আগেই তো রাজকুমারীর রোগমুক্তির দিন হঠাৎ তাহার কিছুটা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। তখনকার ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রাজসভাতেও পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের কম মর্যাদাহানি হয় নাই।

তাহা ছাড়া, আশ্রমে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিতর্কে রামানুজ অনেকবারই তাঁহাকে কোণঠাসা করিয়াছেন। শিষ্যদের সম্মুখে আচার্য পরাজয় স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু রামানুজের যুক্তিতর্ক যে অকাট্য অনেকেরই তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় নাই।

রামানুজ শুধু চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়া গেলেই সমস্যার সমাধান হব কই ? অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁহার। এই পাণ্ডিত্যের আঘাতে দ্বৈতবাদের যুক্তিতর্কে, শীঘ্রই হয়তো সে যাদব-প্রকাশের সমস্ত কিছু মান মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করিবা দিবে। তখন কি আর কাঞ্চীনগরে তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন ?

আহত আত্মাভিমান ক্রমে অধ্যাপক যাদবপ্রকাশকে হিংস্র করিয়া তুলে। যাহা কিছু সৎপ্রবৃত্তি ছিল, উত্তেজনার মুখে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। এই বিকৃত মানসিকতা নিয়া জনকয়েক শিষ্যসহ তিনি এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

রামানুজ বাঁচিয়া থাকিতে অধ্যাপকের মর্যাদা কোনোদিনই আর রক্ষা করা যাইবে না—তাহা ছাড়া, এ অঞ্চলে অদ্বৈত মতের প্রচারও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে না। শিষ্যদের কাছে এ পরিস্থিতি অসহনীয়। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, কোনো দূর তীর্থে রামানুজকে নিয়া যাওয়া হইবে। সেখানে গোপনে করা হইবে তাঁহার প্রাণসংহার।

ষড়যন্ত্র ঠিক করিবার পর যাদবপ্রকাশ একদিন রামানুজকে ডাকাইয়া আনিলেন। স্নেহাভিনয় করিয়া কহিলেন, শিক্ষাগুরু ও ছাত্রের সম্পর্ক চির-অচ্ছেদ্য। তাহা ছাড়া, মেধা, প্রতিভা ও শাস্ত্রজ্ঞানের দিক দিয়া রামানুজ অদ্বিতীয়, অধ্যাপকের তিনি প্রিয়তম শিষ্য। আবার তাঁহাকে আশ্রমে গ্রহণ করা হইল।

অল্প কিছুদিন পরেই আচার্য ঘোষণা করিলেন . তিনি শিষ্যগণসহ তীর্থদর্শন ও গঙ্গাস্নানে যাইবেন। মনে রহিল দুরভিসন্ধি, পথে কোনো গহন অরণ্যে রামানুজের প্রাণনাশ করা হইবে।

আচার্য ও সতীর্থদের সহিত তীর্থ ভ্রমণ, এ যে তাঁহার এক পরম সুযোগ। রামানুজ সোৎসাহে সকলের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অন্যতম সতীর্থ, তাঁহার মাসতুতো ভাই, গোবিন্দও হইলেন তাঁহার সহযাত্রী।

তীর্থযাত্রীর দল সেদিন বিন্ধ্যপ্রদেশের গোণ্ডা অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকে দূরবিস্তারী গহন বন। জনমানবের বসতি এখানে কোথাও নাই। হিংস্র জন্তু ও শ্বাপদে সর্বস্থান পূর্ণ। কুচক্রীরা ঠিক করিল, এখানেই রামানুজকে বধ করিবে। তারপর তাহাদের কার্য শেষে রটাইয়া দিলেই চলিবে, নরখাদক বাঘের আক্রমণে তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে।

নিভৃতে বসিয়া সকলে পরামর্শ আঁটিতেছে, এ সময়ে তাহাদের কথাবার্তা গোবিন্দের কানে যায়। সে মহাদুশ্চিন্তায় পড়ে, কি করিয়া রামানুজকে বাঁচানো যায় ? দিন শেষে রামানুজ একটি সরোবরে হাত পা ধুইতে গিয়াছেন, এই সুযোগে গোবিন্দ তাঁহাকে ষড়-যন্ত্রের কথা খুলিয়া বলেন। অবিলম্বে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইবে, নইলে নিস্তার নাই। দুর্বৃত্তেরা আজ রাত্রেই তাঁহাকে হত্যা করিবে।

গোবিন্দের নির্বন্ধাতিশয্যে রামানুজকে সেই মুহূর্তে গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইল। আর কোনোদিকে না চাহিয়া তিনি বনজঙ্গল ভেদ করিয়া ধাবিত হইলেন।

কাঞ্চীনগরী দক্ষিণ দিকে—সেই দিকে লক্ষ্য করিয়াই শুরু হইল তাঁহার পদযাত্রা।

রাত্রিতে দলের মধ্যে রামানুজের খোঁজ পড়িল। তাই তো। কোথায় তিনি অন্তর্হিত হইলেন ?

গহন অরণ্যাঞ্চলে তখন ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। সারা পথ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল। এ অঞ্চলে এ সময়ে একাকী কোথাও যাওয়া মানেই মৃত্যু বরণ করা।

যাদবপ্রকাশ ও তাঁহার শিষ্যেরা ধরিয়া নিলেন, রামানুজ নিশ্চয়ই বাঘের কবলে পড়িয়াছে। পরদিন ভোরবেলায় সবাই নিশ্চিন্ত মনে গঙ্গাতীরের তীর্থ অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন।

এদিকে রামানুজ ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। হিংস্র বাঘ, ভালুক ও শ্বাপদকুলে ভরা এই বনপথ। এ ঘোর বিপদে একমাত্র আশ্রয় শ্রীভগবান্। তাঁহারই নামজপ করিতে করিতে দুর্গম পথ তিনি অতিক্রম করিতেছেন।

একদমে বেশ খানিকটা দূরে চলিয়া আসা গিয়াছে, এবার এক বৃক্ষের উপর রাত্রি যাপন করিলেন। পরের দিন গহন জঙ্গলের মধ্য দিয়া আবার শুরু হয় তাঁহার পথ চলা। মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অবিরত তিনি হাঁটিয়া আসিয়াছেন। দেহ তাঁহার বড় অবসন্ন। তীব্র পিপাসায় ছাতি ফাটিবার উপক্রম। একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসার পর কিছুকালের মধ্যেই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে রামানুজ দেখিলেন, বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁহার দেহের শ্রান্তি ক্লান্তি কোথায়? সব যেন কাহার মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়াছে।

আরও এক বিচিত্র দৃশ্য। এক ব্যাধদম্পতি শিয়রে বসিয়া সস্নেহে তাঁহার পরিচর্যায় রত। এই গভীর অরণ্যে মনুষ্যমূর্তি দেখিয়া খানিকটা আশ্বস্তও হইলেন।

রামানুজ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলে ব্যাধ-পত্নী স্নেহমাখা সুরে প্রশ্ন করিল, "বাবা, তুমি কে বলতো? এ জঙ্গলে ঢুকতে যে ডাকাতরাও ভয় পায়। তুমি কি ক'রে কোথা থেকে এখানে এলে? কোথায়ই বা যেতে চাও?"

"মা, আমি এক বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ সন্তান। তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলাম। তারপর সঙ্গীদের শত্রুতার জন্য এদিকে পালিয়ে এসেছি। আমি, দক্ষিণে কাঞ্চীনগরে যাবো। ভগবান্ই আজ তোমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন। দয়া ক'রে আমার পথ দেখিয়ে দাও।"

ব্যাধ আশ্বাস দেয়, "বেশ তো বাবা, আমরাও যে কাঞ্চীরই যাত্রী। চল সবাই এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

ব্যাধপত্নীর দেওয়া সামান্য কিছু ফলমূল আহার করিয়া রামানুজ তাহাদের সঙ্গে অগ্রসর হইলেন।

সূর্য বহুক্ষণ যাবৎ অস্তমিত। রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। সেদিনকার মতো পথচলা শেষ হইল।

রামানুজ নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় অদূরে শায়িত দম্পতির অস্ফুট কথা-বার্তা তাঁহার কানে গেল। সারাদিন পথশ্রমের পর ব্যাধরমণীর বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে। স্বামীকে সে বলিতেছে, "ওগো, খুব কাছেই তো সেই নামকরা কূয়া। তা থেকে কিছুটা জল নিয়ে এসো না, তেষ্টা মেটাই।"

স্বামী বুঝাইতেছে, "এ জঙ্গলে গভীর অন্ধকারে কেন আর ছুটাছুটি করা? রাতটা কাটিয়ে দাও, ভোর হলেই জল এনে দেবো।"

রামানুজ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সে কি! যে স্নেহময়ী নারী এই দুর্গম পথে তাঁহার এত সেবাযত্ন করিয়াছে, আশ্রয় দিয়া ও পথ দেখাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে,

তাহার তৃষ্ণার জল মিলিবে না ? তিনি নিজেই উহা আনিতে যাইবেন। হোক না অন্ধকারময় রাত্রি, তাহাতে কি আসে যায় ?

ব্যাধ দম্পতির নিকটে গিয়া রামানুজ কূপের পথ-সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই এই রাত্রিতে বনপথ দিয়া তাঁহাকে যাইতে দিতে রাজী নয়। উভয়েই বলিয়া উঠিল, "না বাবা, এতে তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। রাত তো শেষ হবে এলো বলে। কাল সকালে জল আনলেই চলবে।"

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া ব্যাধপত্নী রামানুজকে বলিল, "বাবা, কাল রাতে তুমি জল আনতে চেয়েছিলে। খুব কাছেই সে কূয়ো। চল, সেদিকেই আমরা সবাই মিলে যাই।"

অরণ্যের শেষ সীমায় আসিয়া দেখা গেল, অদূরে শালকুঞ্জের নিচে এক বৃহৎ কূপ। প্রস্তর-সোপান বাহিয়া বহু নর-নারী উপরে উঠিতেছে এবং জল সংগ্রহ করিতেছে। রামানুজ সানন্দে সেখানে গিয়া হাত মুখ ধুইলেন, অঞ্জলি পূরিয়া স্নিগ্ধ শীতল জল আনিয়া ব্যাধপত্নীকে পান করাইলেন। তিন তিনবার জল আনিয়া দিয়াছেন, কিন্তু রমণীর পিপাসা যেন মিটিতেই চাহে না। রামানুজ আরও একবার কূপের দিকে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, স্বামী-স্ত্রী ইতিমধ্যেই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে কত খুঁজিলেন, কোনো সন্ধানই মিলিল না।

এবার কূপের কাছে ফিরিয়া গিয়া রামানুজ একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, এই অঞ্চলের নাম কি ? কাঞ্চী এখান থেকে কতদূর বলতে পারো ?"

এমন অদ্ভুত কথা যেন কেহ কখনো শোনে নাই। রামানুজের চারিদিকে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমিতে আরম্ভ করিল।

কয়েকজন তাঁহাকে চিনিয়াও ফেলিয়াছে। সহাস্যে তাহারা কহিল, "সে কি গো, তোমায় কি ভূতে পেয়েছে। তোমার সারা জীবনের চেনা কাঞ্চীনগরকে তুমি এ ক'দিনের ভেতর ভুলে গেলে ? তুমি আচার্য যাদবপ্রকাশের ছাত্র, অথচ এ-জায়গার স্মৃতি তোমার মনে নেই। দেখতে পাচ্ছ না, অদূরে ঐ বরদরাজের মন্দিরচূড়ো ? আর এ কূপ যে মহা পবিত্র শালকূপ—তাও দেখছি চিনছো না। শেষটায় মাথা খারাপ হলো নাকি গো ?"

এ কি বিচিত্র ইন্দ্রজাল। রামানুজের তখন বাক্‌স্ফূর্তি হইতেছে না। তাঁহার সর্ব-শরীরে পুলক-রোমাঞ্চ, নয়নে বহিতেছে আনন্দাশ্রু। ভাবিতেছেন, মধ্যপ্রদেশের অরণ্য অঞ্চল হইতে সুদূর কাঞ্চীতে এক অপরাহ্ণ মাত্র হাঁটিয়া কি করিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন ? সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল দিব্য অনুভূতির ঝলক। উপলব্ধি করিলেন, ব্যাধদম্পতির বেশে স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি ও লক্ষ্মীদেবীই যে তাঁহাকে এখানে আনিয়া দিয়া হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছেন।

তীব্র ভাবাবেগে রামানুজের সারা দেহ কম্পিত হইতেছে। শালকূপের সম্মুখে তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দেখিলেন, চারিপাশে জানা-অজানা বহু লোকের ভিড়। কাহারও প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইল না। দুই নয়নে কেবলই অঝোর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে. মর্মমূলে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে শরণাগতি ও ভগবৎ-ভক্তির পরমবোধ।

রামানুজের জীবনপ্রভু সেদিন কৃপা করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। অলৌকিক দিব্যলীলার মধ্য দিয়া জানাইয়াছে তাঁহার হাতছানি। জীবনের এক নূতনতর অধ্যায় আজ উন্মোচিত হইয়াছে।

ঘরে ফিরিয়া রামানুজ নিজের, ধ্যানধারণা ও শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যাপৃত হইলেন। কয়েকদিন পরে ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ হঠাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীবিষ্ণুর দাস্যভাবে এই মহাসাধক সদা ভাবিত, তাই তাঁহার দর্শনে রামানুজের আনন্দ উথলিয়া উঠিল।

বিন্ধ্যারণ্যে যাহা কিছু ঘটিয়াছে সমস্তই তিনি মহাত্মার কাছে বিবৃত করিলেন। এত কিছু নিগ্রহের মধ্যে ব্যাধদম্পতির ছদ্মবেশে লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁহাকে যে অহেতুক অনুগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন, পুলকাঞ্চিত দেহে বর্ণনা করিলেন সেই কাহিনী।

সিদ্ধভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজ-বিগ্রহের নিত্যদাস। প্রভুর অনুধ্যানে সদাই তিনি বিভোর। ভাবাবেশে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন—কখনও বা প্রভুর সহিত থাকেন কথোপকথনে রত। আনন্দময় শ্রীহরির এই পরমভক্তের দেহে মনে আনন্দ-হিল্লোল বহে অবিরাম। মধু ঋতুর মতোই তাঁহার আবির্ভাব ও প্রভাব—কাঞ্চীর যে পল্লীতে যে গৃহেই তিনি যান, সেখানেই খেলিয়া যায় অপার্থিব আনন্দের ঢেউ।

সমস্ত কাহিনী শুনিয়া ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ ভাবাবিষ্ট হইলেন। তারপর কহিলেন. বৎস, ভগবান্ শ্রীবরদরাজ তোমার প্রতি বড় প্রসন্ন, তাই তোমার প্রাণরক্ষা পেয়েছে। আর তুমি যে তাঁর একান্ত প্রিয়, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ছদ্মবেশে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তোমার করপুটের জল পান করেছেন। তোমার জীবনের সকল পিপাসা মিটিয়ে দেবেন বলেই তো তোমার দেওয়া জলে নিজেদের পিপাসা মেটাবার ভান তাঁরা ক'রে গেলেন। বৎস, তুমি এখন থেকে প্রভুর নিত্য সেবায় ব্রতী হও। শালকূপের জল রোজ শ্রীবরদ-রাজের জন্য বহন ক'রে আন, বিগ্রহকে স্নান অভিষেক করাও। আমি বলছি, অচিরে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে, ঘটবে পরম প্রাপ্তি।"

কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি বাল্যাবধি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির আকর্ষণ রামানুজ অনুভব করিতেন। এবার তাহা যেন আরও তীব্র হইয়া উঠিল। এই সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা নিতে তিনি চির-উৎসুক. আজও সেই কাতর প্রার্থনাই বার বার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ দাস্যভাবের মূর্ত বিগ্রহ। দীক্ষাদানে তাঁহাকে রাজী করানো বড় কঠিন। কাঞ্চীর লোকে তাঁহাকে যত মর্যাদাই দিক, দৈন্যময় বৈষ্ণবীয়তা নিয়া তিনি বাস করেন, নিজেকে শূদ্রাধম বলিয়া একান্তে সরিয়া থাকেন। রামানুজকে তাই এড়াইয়া গেলেন।

রামানুজ কিন্তু এ মহাভক্তের চরণে চিরকালের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছেন। এখন হইতে প্রকৃত দাস্যভক্তির বীজ তাঁহার জীবনে কাঞ্চীপূর্ণের প্রসাদেই অঙ্কুরিত হইতে থাকে।

তীর্থপর্যটন সারিয়া যাদবপ্রকাশ কাঞ্চীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। লোকমুখে সেদিন তিনি সংবাদ পাইলেন, রামানুজের প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই—বিন্ধ্যারণ্য হইতে নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

দেখা হইবামাত্র আচার্য কপট সমবেদনা দেখাইলেন। কহিলেন, "বাবা রামানুজ, সেদিন বনাঞ্চল হ'তে তুমি অন্তর্হিত হবার পর আমার যে কি দুশ্চিন্তায় কাল কেটেছে, তা আর কি বলবো। পথ হারিয়ে তুমি হিংস্র পশুর মুখেই হয়তো পড়েছো, এ আশঙ্কা হয়েছিল। যাক্, এবার তোমার নিরাপদ দেখে প্রাণে শান্তি এসেছে। আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, বাবা।"

আচার্যের পদবন্দনা করিয়া রামানুজ সবিনয়ে কহিলেন, "প্রভু, সেই হিংস্রজন্তুসঙ্কুল গহন বনে প্রাণরক্ষা পাওয়া সত্যিই সম্ভব নয়। এ যে শুধু আপনার আশীর্বাদ ও অনুগ্রহেই ঘটেছে, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

পূর্ববৎ শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের প্রকাশ দেখিয়া আচার্য কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন—'তবে রামানুজ তাঁহার কপট অভিসন্ধি ও হত্যার ষড়যন্ত্র টের পায় নি।'

আচার্য ভিতরে ভিতরে নিজের আচরণের জন্য কিছুটা লজ্জিত যে না হইলেন, তাহাও নয়। পরদিন হইতে রামানুজকে চতুষ্পাঠীতে যোগ দিতে বলিলেন। রামানুজের যাতায়াত আবার আরম্ভ হইল।

কিছুকাল পরের কথা। প্রসিদ্ধ ভক্তসাধক শ্রীরঙ্গনাথের একান্ত সেবক, যামুনাচার্য সেদিন কাঞ্চী নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। জাগ্রত বিগ্রহ বরদরাজের দর্শন ও আরাধনার জন্যই তাঁহার এই আগমন। মন্দির হইতে ফিরিবার সময় তিনি বেদান্তবিদ্ আচার্য যাদব-প্রকাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

শতবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই বৈষ্ণব মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য সেদিন রাস্তায় ভিড় জমিয়া গেল। আশ্রমের তরুণ শিক্ষার্থীরা সবাই যামুনাচার্যকে সংবর্ধনা করিতে আগাইয়া গেলেন। রামানুজেরই স্কন্ধে ভর দিয়া প্রবীণ বৈষ্ণব ধীরে ধীরে যাদবপ্রকাশের চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিলেন।

মহাপুরুষের প্রসন্ন দৃষ্টি এ সময়ে রামানুজের উপর পতিত হইল। দিব্যকান্তি, তেজঃপুঞ্জকলেবর কে এই তরুণ? দৃষ্টিপাত মাত্রেই লোকের মন-প্রাণ কাড়িয়া নেয়। এ ছাত্রটির পরিচয় লাভের জন্য যামুনাচার্য ব্যগ্র হইলেন।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে কাঞ্চীর এক ভক্ত কহিলেন, "আলওয়ান্দার কাঞ্চীর এ যুবক এক রত্নবিশেষ। প্রভু বরদরাজের ইনি পরমভক্ত, মহাপুরুষ কাঞ্চীপূর্ণেরও ইনি অনুগৃহীত। তাছাড়া ইনি প্রতিভাবান্ শাস্ত্রবিদ্। সম্প্রতি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্রের এক ভক্তিপ্রধান, বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রণয়ন ক'রে পণ্ডিত ও ভক্তসমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন।

যামুনাচার্য দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধর্মের অন্যতম ধারক ও বাহক। এ সংবাদে তিনি মহা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, এ দিব্যকান্তি যুবক যেন শ্রীহরির এক চিহ্নিত সেবক—বিরাট সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে ইহার মধ্যে। কিন্তু শুষ্ক তার্কিক ও অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের অভিভাবকত্বে এতদিন সে বড় হইয়াছে, ইহাই সব চাইতে উৎকণ্ঠার কথা। ইচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন লোকের ভিড়ে যামুনাচার্য রামানুজের সহিত কথাবার্তার তেমন সুযোগ পাইলেন না। লোকজন পরিবৃত হইয়া তিনি চতুষ্পাঠীতে ঢুকিয়া পড়িলেন। তারপর আচার্য যাদবপ্রকাশের সহিত কিছুটা শিষ্টাচার ও বাক্যালাপের পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

হঠাৎ-দেখা তরুণ ভক্তের স্মৃতি কিন্তু দীর্ঘদিন যামুনাচার্যের অন্তরপট হইতে মুছিয়া যায় নাই। তাছাড়া, নিজের দেহত্যাগের পূর্বে বৈষ্ণব জগতের এক ভবিষ্যৎ দিক্‌পালরূপে

রামানুজকে তিনি ভক্তজন সমক্ষে চিহ্নিত করিয়া দিয়া যান। ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারীর কণ্ঠে অনাগত বৈষ্ণব নেতার মাঙ্গলিকী উদ্‌গীত হয়। যামুনাচার্যের রচিত সেই শ্লোকের শেষাংশ—।

লক্ষ্মীশ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃপাং রামানুজে তব।
নিধায় স্বমতে নাথ প্রবিষ্টংকর্ত্তুমর্হসি ॥

অর্থাৎ হে কমলনয়ন শ্রীপতে!—রামানুজের উপর তোমার কৃপা স্থাপন ক'রে তাঁরে স্বীয় মতে আনয়ন করো, নাথ।

রামানুজ কিন্তু আগের মতোই অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের কাছে অধ্যয়ন করিতেছেন। অসামান্য মেধা ও প্রতিভা নিয়া শাস্ত্রসাগরের মন্থন চলিয়াছে, আর এসঙ্গে মিলিত হইয়াছে তাঁহার আজন্মলব্ধ ভক্তি ও ভাবুকতা। শ্রীহরির দাস্যভাবে সদা বিভোর কাঞ্চীপূর্ণের সান্নিধ্যও এসময়ে তাঁহার জীবনকে রসস্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

যাদবপ্রকাশ সেদিন তাঁহার ছাত্রদের কাছে উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা অপূর্ব, কিন্তু এ সবই চরম অদ্বৈতমতের ব্যাখ্যা। জীব ও ঈশ্বরের সেব্য-সেবক ভাবের চিহ্নমাত্র নাই। ভক্ত রামানুজের পক্ষে এ বড় অসহ্য হইয়া উঠিল। সবিনয়ে তিনি আপত্তি প্রকাশ করিলেন।

আচার্য যাদবপ্রকাশও ছাড়িবার পাত্র নহেন। উভয়ের মধ্যে শুরু হইয়া গেল তুমুল বিচারদ্বন্দ্ব। অপূর্ব প্রতিভা বলে রামানুজ তাঁহার আচার্যের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া চলিলেন। সিদ্ধান্তের সমর্থনে শ্রুতি হইতে নানা যুক্তি প্রমাণ তিনি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন। আচার্য কোনো দিক দিয়াই শিষ্যের এই তর্কজাল ছিন্ন করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "রামানুজ, তোমার ধৃষ্টতা আজ কিন্তু সীমা অতিক্রম করেছে। তুমি যদি এমন শাস্ত্রপারঙ্গমই হয়ে থাক তবে আমার টোলে অধ্যয়ন করার তোমার আর কি প্রয়োজন? আগেও তোমায় দু'বার মার্জনা করেছি, কিন্তু আর নয়। তোমার মতো উদ্ধত শিষ্যের মুখ দর্শন আর আমি করতে চাইনে। এখনি তুমি দূর হও।"

রামানুজ টোল ত্যাগ করিলেন। ভাবিলেন যাঁহার কাছে পড়িলে ভগবৎ ভক্তি লোপ পায় এমন আচার্যের সান্নিধ্য ত্যাগ করাইয়া প্রভু আজ তাঁহার কল্যাণ সাধনই করিলেন। ঘরে ফিরিয়া একান্তভাবে দ্বৈতবাদী শাস্ত্রের চর্চায়ই তিনি ব্রতী হইলেন। তাছাড়া, আরো এক বড় সেবাকার্যের ভার তিনি নিয়াছেন। প্রতিদিন নিষ্ঠা সহকারে পবিত্র শালকূপ হইতে জল বহন করিয়া আনেন এবং শ্রীবরদরাজকে স্নান করান। সর্বোপরি লাভ করিয়াছেন পরম ভাগবত কাঞ্চীপূর্ণের ঘনিষ্ঠ পুণ্যময় সঙ্গ। এই পরিবেশে তাঁহার অধ্যাত্মজীবন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

বৃদ্ধ যামুনাচার্য কিছুদিনের মধ্যে খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সবাই বুঝিল শেষের দিনটি তাঁহার আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় শ্রীরঙ্গমে বসিয়া এই মহাপুরুষ তাঁহার অন্তিম সময়েও তরুণ ভক্ত রামানুজকে স্মরণ রাখিতে ভুলেন নাই। কাঞ্চীর এক ব্রাহ্মণের নিকট জানিলেন রামানুজ অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। সাধু কাঞ্চীপূর্ণের নির্দেশে এবার হইতে তিনি ভক্তিসাধনার পথে অগ্রসর হইতে কৃতসঙ্কল্প। এ সংবাদে যামুনাচার্যের আনন্দের সীমা রহিল না। তখনই

অন্তরঙ্গ শিষ্য মহাপূর্ণকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন অবিলম্বে কাঞ্চীতে যান এবং রামানুজকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন।

কাঞ্চীর বরদরাজ মন্দিরে পৌঁছিয়া মহাপূর্ণ শুনিলেন, রামানুজ প্রতিদিন এই পথেই শালকূপের পবিত্র বারি নিয়া শ্রীমন্দিরে আসেন। প্রভুর স্নান সমাপনান্তে আবার ফিরিয়া যান নিজ গৃহে। তাই মন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া মহাপূর্ণ নিবিষ্ট মনে যামুনাচার্যের রচিত অপূর্ব শ্লোকগাথা গাহিতে লাগিলেন।

রামানুজ রাজপথ দিয়া আসিতেছেন, মাথায় তাঁহার শ্রীবিগ্রহের স্নান-জলের ভাণ্ড। হঠাৎ বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। একি তিনি শুনিতেছেন ? এমন অপরূপ স্তোত্রমালা তো কখনো শোনেন নাই। সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া তিনি কাবায় পরিহিত বৈষ্ণব সাধক মহাপূর্ণকে প্রশ্ন করিলেন, “প্রভু, দয়া ক'রে একবার বলুন, এ রসমধুর স্তব কে রচনা করেছেন ?”

“ভাই, এর রচয়িতা আমার প্রভু মহামুনি যামুনাচার্য—রঙ্গনাথজীর যিনি নিত্যসেবক, সারা দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণুভক্তদের যিনি মধ্যমণি। দাস্যভাবের মহাতত্ত্বের মধ্য দিয়েই যে তিনি এতকাল শ্রদ্ধা ভক্তি ছড়িয়ে আসছেন। তুমি কি তাঁর অপূর্ব স্তবগাথা শোন নি ?”

আগ্রহভরে রামানুজ মহাপূর্ণকে নিবেদন করিলেন, “মহাত্মন্, আপনি এখানে কোথায় অবস্থান করবেন ? চলুন, অনুগ্রহ ক'রে আজ এই দীনের গৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করুন।”

স্মিতহাস্যে মহাপূর্ণ কহিলেন, “আমি যে ভাই তোমার কাছেই এসেছি। আমার প্রভু মহামুনি যামুনাচার্যের দেহরক্ষার সময় এবার আসন্ন। তাই অবিলম্বে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তোমায় নিয়ে যাবার জন্যই যে আজ আমার কাঞ্চীতে আসা।”

এ কি অভাবনীয় প্রস্তাব। দাক্ষিণী বৈষ্ণবজগতের একপত্রী পণ্ডিত মহাপুরুষ যামুনাচার্য তাঁহার মতো এই নগণ্য ব্যক্তিকে আজ স্মরণ করিয়াছেন ? স্নানাভিষেকের জল তাড়াতাড়ি মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়া রামানুজ ফিরিয়া আসিলেন। মহাপূর্ণের সঙ্গে তখনি শ্রীরঙ্গমের পথে তিনি পা বাড়াইলেন। ঘরে ফিরিয়া জননী ও স্ত্রীকে সংবাদ দিবারও তর সহিল না।

চারদিন পদব্রজে চলিবার পর ।। বেরীর অপর তীরে রঙ্গনাথজীর মন্দির দেখা দিল। অদূরে এক বিরাট জনতা দেখিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। নিকটে অগ্রসর হইয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহা মর্মান্তিক। বৈষ্ণবগুরু যামুনাচার্য আজ সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন।

মহাপুরুষকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে অগণিত মানুষ। নিষ্প্রাণ দেহের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রামানুজ হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার ডান হাতের তিনটি অঙ্গুলি রহিয়াছে মুষ্টিবদ্ধ। নিবিষ্ট মনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি দেহত্যাগের সময় মহাপুরুষের মনে কোনো বিশেষ সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল ? এই বদ্ধমুষ্টি কি তাহারই কোনো সঙ্কেত বহন করিতেছে ?

সঙ্গে সঙ্গেই এক দিব্যভাবে রামানুজ আবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। বিগতপ্রাণ যামুনাচার্যের শায়িত দেহকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে সদ্যরচিত এক শ্লোকে নিজের সঙ্কল্পবাণী উচ্চারণ করিলেন। এ বাণীর মর্ম এই—“বিষ্ণুমতে দৃঢ়নিষ্ঠ থেকে, অজ্ঞানমোহিত জন-

গণকে আমি কববো পঞ্চসংস্কাবযুক্ত দ্রাবিডবেদে শিক্ষিত আব শ্রীনাবায়ণে যাবা শবণাগত তাদেব সদাই কববো বক্ষণ।'

সঙ্গে সঙ্গে একি অলৌকিক কাণ্ড। মৃত আচার্যেব হস্তেব বদ্ধমুষ্টি হইতে একটি অঙ্গুলি সোজা হইয়া খুলিয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া জনতা তো বিস্ময়ে হতবাক্।

ভাবতন্ময় বামানুজ আবাব আব এক শ্লোক গাহিয়া উঠিলেন—'লোক-বক্ষাব উদ্দেশ্যে আমি বচনা কববো শ্রীভাষ্য যা হবে সর্বার্থসংগ্রহ, কল্যাণকব ও তত্ত্বজ্ঞানময়।'

দেখা গেল, মৃত যামুনাচার্যেব আব একটি অঙ্গুলিও সোজা হইয়াগিযাছে। ইহাব পর উচ্চাবিত হইল বামানুজেব কণ্ঠে শ্লোকবদ্ধ তৃতীয় সঙ্কল্প-বাক্য—'যে কৃপাময় পবাশব মুনি বদ্ধ জীবেব উদ্ধাব সাধনেব জন্য ঈশ্ববতত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি প্রচাব কবেছেন, পুবাণরত্ন বিষ্ণুপুবাণ বচনা কবেছেন, আমি কোনো সুপণ্ডিত বৈষ্ণব সাধককেই তাঁবই নামে কববো চিহ্নিত।'

পবম আশ্চর্যেব বিষয়, এ শ্লোক উদ্‌গীত হইবাব পব দেখা গেল—যামুনাচার্যেব তৃতীয় অঙ্গুলিও সবল হইয়া গিযাছে।

সঙ্কল্পবাণী তিনটি উচ্চাবিত হইবাব সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন নিষ্প্রাণ যামুনাচার্যেব বদ্ধমুষ্টিটি খুলিযা গেল। এই অদ্ভুত অলৌকিক দৃশ্য দেখিযা সমাগত ভক্ত ও দর্শনার্থীদেব বিস্ময়েব অবধি বহিল না। চাবিদিকে কেবলই শোনা যাইতেছে কৌতূহলেব গুঞ্জনধ্বনি—কে এই শক্তিধব তবুণ ব্রাহ্মণ? বঙ্গনাথজীব এ কোন্ চিহ্নিত সেবক? দাক্ষিণেব সমগ্র বৈষ্ণবসমাজেব নেতা যামুনাচার্য আজ চিবনিদ্রাব নিদ্রিত। কিন্তু তাঁহাব সহিত এ তবুণ সাধকেব একি বিস্ময়কব যোগাযোগ।

অল্প সমযেব মধ্যে বামানুজ সে অঞ্চলে প্রসিদ্ধি অর্জন কবিলেন। যামুনাচার্যেব ভক্ত ও শিষ্যদেব সংখ্যা যথেষ্ট, তদুপবি শ্রীবঙ্গনাথেব মন্দিবে তীর্থযাত্রীবা দলে দলে আসিতেছে। সেদিন ইহাদেব দ্বাবা তাঁহাব নামটি এই অলৌকিক ঘটনাব মাধ্যমে ছডাইয়া পডে।

বামানুজ কিন্তু শ্রীবঙ্গমে আব একটুও অপেক্ষা কবেন নাই। এমন ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিযাও জীবিতাবস্থায তিনি যামুনাচার্যকে দর্শনে বঞ্চিত হইলেন, এজন্য তাঁহাব মনস্তাপেব অবধি নাই। ব্যথিত হৃদযে সোজাসুজি তাই স্বগৃহেই প্রত্যাবর্তন কবিলেন।

কাঞ্চীপুবে ফিবিযা আসাব পব, তাঁহাব জীবনে এবাব ঘটিল নব বূপান্তব। এখন হইতে হইলেন স্বল্পভাষী ও ভাবগম্ভীব—আব অন্তবে জাগিল পবমতত্ত্ব লাভেব তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অবিলম্বে দীক্ষা নিবাব জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পডিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণেব পুণ্যময় সান্নিধ্য ও ভক্তিব প্রভাবে কিছুকাল যাবৎ তাঁহাব সাধন জীবন গডিযা উঠিতেছিল। শ্রীহবিব এই প্রিযসেবক ও সিদ্ধ ভক্তেব জন্য তাঁহাব শ্রদ্ধাও বহিযাছে অপবিসীম। এবাবও এই ভক্তশ্রেষ্ঠেব কাছে তিনি দীক্ষা নিতে চাহেন। কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণকে সম্মত কবানো বড কঠিন। দাস্যভাবে ভাবিত মহাপুবুষ বামানুজকে এডানোব জন্য বলিলেন, "বৎস, আমাব মতো শূদ্রাধমকে আব পাপে লিপ্ত ক'বো না। তোমাব মতো পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ সন্তানেব গুবু হওযা দূবেব কথা—কাবুব গুবু হবাব যোগ্যতাই আমাব নেই।'

বামানুজ একদিন তাঁহাকে বড বেশী চাপিযা ধবিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ স্নেহভবে কহিলেন, "বৎস, তুমি এত ব্যস্ত হ'যো না। তুমি ব্রাহ্মণ, আব আমি শূদ্র—ব্যবহাবিক দিকটাও তো মানতে হয? জান তো, শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদানেব অধিকাব শূদ্রেব নেই। শ্রীবিষ্ণুই তোমার চিহ্নিত গুবুকে ঠিক সময পাঠিয়ে দেবেন তুমি নিশ্চিন্ত হযে সাধনভজন কবো।'

রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে আর একদিন ধরিয়া বসিলেন, গুরুকরণ ও সাধনভজন সম্পর্কে শ্রীবরদরাজের নির্দেশ তাঁহাকে আনিয়া দিতে হইবে। কাঞ্চীপূর্ণকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। কহিলেন, "বেশ ভাই, আমি প্রভুকে তোমার কথা নিবেদন করবো।"

সেদিন গভীর রাত্রিতে কাঞ্চীপূর্ণ ধ্যানতন্ময় রহিয়াছেন, এমন সময় শ্রীবরদরাজ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। প্রভুর শ্রীমুখে যে শ্লোক কয়টি সেদিন উচ্চারিত হয়, আচার্যের অধ্যাত্মজীবন ও দর্শনতত্ত্বের উপর তাহার প্রভাব অসামান্য। বরদরাজের বাণীর মর্ম, তুমি শীঘ্র রামানুজাচার্যকে আমার এই বিশেষ তত্ত্ব কয়টি বল—আমিই জগৎ কারণ, প্রকৃতির কারণ পরব্রহ্ম, জীব ও ঈশ্বর ভেদ স্বতঃসিদ্ধ; মুমুক্ষুদের মুক্তির একমাত্র কারণ আমার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ—অন্তিম সময়ে আমার স্মরণ করতে সক্ষম না হলেও তাদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী, দেহত্যাগ হলেই আমার ভক্তগণ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। হে রামানুজ, এবার হতে তুমি মহাত্মা মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করো।

প্রত্যাদেশগুলি শুনিয়া ভক্ত রামানুজের আনন্দ আর ধরে না। যে কয়েকটি প্রশ্ন এযাবৎ তাঁহার চিত্তকে বেশী করিয়া আলোড়িত করিতেছে, প্রভুর বাণীতে সেগুলির উত্তর আজ মিলিয়া গেল। দীক্ষা গ্রহণের জন্য এযাবৎ তিনি ব্যাকুল ছিলেন। দীক্ষাগুরুর নামটিও আজ প্রভুর কৃপায় জানিতে পারিলেন। আনন্দে অধীর হইয়া সেদিন বার বার নিষেধ সত্ত্বেও কাঞ্চীপূর্ণের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া বসিলেন। তারপর উন্মাদের মতো ছুটিয়া বাহির হইলেন যামুনাচার্যশিষ্য মহাত্মা মহাপূর্ণের উদ্দেশে, শ্রীরঙ্গমের পথে।

যামুনাচার্যের তিরোধানের পর শ্রীরঙ্গম মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছেন শ্রীতিরুবরঙ্গ। পরম দাস্যভাবে এই সাধক সদা ভাবিত। শাস্ত্র ব্যাখ্যা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনায়ই বেশীর ভাগ সময় তাঁর অতিবাহিত হয়। ফলে মঠের নেতৃত্বের ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠে। যামুনাচার্য জীবিত থাকা কালে শাস্ত্র ব্যাখ্যার দিক দিয়া এই মঠের যে গৌরব ও প্রসিদ্ধি ছিল, ক্রমে তাহাও যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে।

তিরুবরঙ্গ একদিন মঠের ভক্ত সাধকদের আহ্বান করিয়া নিজের মনোভাব সরলভাবে ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "তোমাদের বোধ-হয় মনে আছে, প্রভু যামুনাচার্য তাঁহার দেহরক্ষার আগে কাঞ্চীনগরের তরুণ সাধক, শাস্ত্রবিদ্ রামানুজকে আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। এই তরুণ আচার্য অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এবং শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণব। সাধন-ঐশ্বর্যও রয়েছে প্রচুর। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা এঁর রয়েছে।

'মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের আশীর্বাদ ও শিক্ষার এই বৈষ্ণব আচার্যের অধ্যাত্ম-জীবন গঠিত। প্রভু যামুনাচার্যও একে নেতারূপে একরকম চিহ্নিত ক'রে দিয়ে গেছেন। তাছাড়া মহামুনির শেষকৃত্যের সময় যে অলৌকিক কাণ্ড এই নবীন আচার্যকে কেন্দ্র ক'রে ঘটেছে তাও তোমাদের অজানা নেই। যামুন মুনির নিজস্ব মতবাদ প্রচারের সংকল্পই রামানুজ সেদিন ঘোষণা করেন, আর বিগতপ্রাণ মহামুনি বদ্ধমুষ্টি খুলে দিয়ে তার সমর্থনও জানিয়ে দেন। আমার মতে, রামানুজই বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচারের উপযুক্ত শক্তি ধারণ করেন। তাঁকেই ডেকে এনে এই মঠের অধ্যক্ষ করা হোক।"

সকলেই এ প্রস্তাব একবাক্যে অনুমোদন করিলেন। স্থির হইল মহাত্মা মহাপূর্ণ স্বয়ং অবিলম্বে কাঞ্চীতে গিয়া রামানুজকে দীক্ষাদান করিবেন।

শ্রীতিরুররাঙ্গ মহাপূর্ণকে আবও বলিযা দিলেন, "মনে হচ্ছে যে, দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গেই রামানুজ শ্রীরঙ্গমে আসতে সক্ষম হবেন না। প্রযোজন হ'লে তুমি সেখানে বৎসর-খানেক থাকবে এবং ইতিমধ্যে তাঁকে সযত্নে দ্রাবিড আম্নায শিক্ষা দেবে। হযতো তোমাকে সেখানে কিছুদিন স্থাযিভাবেই বসবাস করতে হতে পারে। তাই ববং তোমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিযে যাও।"

মঠাধীশের নির্দেশ অনুসারে মহাপূর্ণ সস্ত্রীক কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে রামানুজ দ্রুতপদে শ্রীরঙ্গম অভিমুখে ধাবিত হইযাছেন। পথেই পড়ে মাদুরান্ত-কের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির। ঠিক করিলেন, নিকটস্থ সরোবরে স্নান সমাপন করিযা বিগ্রহ দর্শনে যাইবেন। কিন্তু উহার তীরে পৌঁছিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। একি অদ্ভুত কাণ্ড! যে মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ বরদরাজ তাঁহাকে দিযাছেন, স্বযং তিনিই যে সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত। উভযের মিলনে আনন্দের বান ডাকিযা উঠিল।

স্নান সমাপনের পর মহাপূর্ণের নিকট তিনি বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যন্ত্র, অঙ্কন, ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, মন্ত্র ও দাস্যনাম দ্বারা তাঁহাকে সংস্কৃত করা হয। অতঃপর নবলব্ধ গুরু ও গুরুপত্নীকে তিনি সাদরে কাঞ্চীতে নিজের গৃহে নিযা আসেন।

রামানুজের একান্ত অনুরোধে মহাপূর্ণ তাঁহার স্ত্রী জমাম্বাকেও দীক্ষা প্রদান করেন। নিজ গৃহের একাংশে গুরু ও গুরুপত্নীকে রাখিযা নবদীক্ষিত শিষ্য সযত্নে তাঁহাদের সেবায় ব্রতী হন। মহাপূর্ণের কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যযনের ফলে বৈষ্ণবশাস্ত্রে রামানুজের অধিকার এবার পূর্ণতর হইতে থাকে।

দ্রাবিড আম্নায বা তামিল-বেদে চারি হাজার ভক্তিরসাত্মক শ্লোক রহিযাছে—তিরুবাই-মুডি নামে এগুলি খ্যাত। ছযমাসের মধ্যে তিনি এসব আযত্ত করিযা ফেলিলেন।

শ্লোক পাঠ সেদিন সমাপ্ত হইযাছে। রামানুজ তাঁহার গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য মহা উৎসুক হইযা উঠিলেন। প্রভাতে ফল-ফুল পূজার নানা উপচার ও নববস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য তিনি বাজারে চলিযা গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা তাঁহার গৃহে ঘটিযা গেল।

ভক্তিসাধনা ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যযনে রামানুজ সম্প্রতি একেবারে ডুবিযা গিযাছেন। তদুপরি গুরু ও গুরুপত্নীর সেবার অধিকার পাইযা তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। ঘর-সংসারের আনন্দ ও আকর্ষণ আজকাল ক্রমেই কমিযা যাইতেছে। পত্নী জমাম্বা কিন্তু তাহার এই পরিবর্তনকে মোটেই সুচক্ষে দেখেন নাই। ধীরে ধীরে স্বামী যেন তাঁহার নিকট হইতে কেবলি দূরে চলিযা যাইতেছেন। ধর্মচর্চা ও গুরুসেবা নিযাই দিন-রাত উন্মত্ত। পত্নীর খোঁজ-খবর কতটুকু রাখেন? জমাম্বার রুদ্ধ আক্রোশ ক্রমে পুঞ্জীভূত হইযা উঠিতে থাকে। সুযোগ পাইযা অবশেষে একদিন ঘটে বিস্ফোরণ।

সেদিন ভোরে জমাম্বা কূযার ধারে জল আনিতে গিযাছেন। গুরুপত্নীও কলসীকক্ষে সেখানে উপস্থিত। প্রায একই সমযে উভযে জল উঠাইতেছেন—হঠাৎ গুরুপত্নীর কলসীর জল তাঁহার কলসীর উপর গড়াইযা পড়িল।

জমাম্বা ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায হইযা গেলেন। চীৎকার করিযা বলিতে লাগিলেন "হ্যাগা, তুমি কি চোখের মাথা একেবারে খেযেই বসেছো? দিলে তো আমার কলসীর সমস্তটা জল নষ্ট ক'রে। তোমার পিতৃকুল আমার পিতৃকুল থেকে কত ছোট তা কি

তোমার জানা নেই ? তোমার ছোঁয়া জল কি ক'রে আমি ব্যবহার করবো ? গুরুপত্নী বলে কি মাথায় চড়ে বসবে ?"

গালাগালির পালা শেষ হইল। রামানুজের স্ত্রী এবার আঙিনায় পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন। বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে লাগিলেন, "সবই আমার কর্মফল, নইলে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীর হাতে পড়ে আমায় এত কষ্ট পেতে হবে কেন ?"

মহাপূর্ণের পত্নী স্বভাবত শান্ত ও ধর্মনিষ্ঠ কিন্তু এবারকার আঘাত তাঁহার বড় বাজিল। ঘরে ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীরে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভক্ত মহাপূর্ণ কহিলেন 'ওগো তুমি এজন্য দুঃখ করো না। এতে যে শ্রীনারায়ণেরই ইঙ্গিত আমি দেখতে পাচ্ছি। বোধহয় তাঁর ইচ্ছে নয় যে, এখানে আমরা দু'জন আর অবস্থান করি। প্রভু যা করেন তা মঙ্গলেরই জন্য। অনেকদিন তো রঙ্গনাথজীর পাদপদ্ম পূজা করি নি চল আমরা আজই শ্রীরঙ্গমের দিকে রওনা হই।"

উভয়ে তখনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। রামানুজ সে সময়ে কার্যান্তরে কোথায় গিয়াছেন, পাছে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বাধা দেন এ ভয়ে মহাপূর্ণ আর এক মুহূর্তও দেরি করেন নাই।

কিছুকাল পরেই রামানুজ ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু একি ? তাঁহার পূজ্যপাদ গুরু ও গুরুপত্নী কোথায় ? তবে কি তাঁহারা কাঞ্চী ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া গেলেন ?

প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া জমাম্বা কহিতে লাগিলেন, "শুনছো, আজ ভোরে তো জল আনতে গিয়ে গুরুপত্নীর সাথে আমার ঝগড়া হয়ে গেল। তবে আমি কিন্তু তাঁকে কটু কথা কিছু বলি নি। অথচ এই সামান্য ঘটনার কথা শুনেই তোমার গুরুর এমন ক্রোধ হল যে, সস্ত্রীক ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। শুনেছি, সাধু মহাত্মারা অক্রোধী হন। কিন্তু এ কি ধরনের সাধুপুরুষ, তা তো বুঝিনে। তোমার এমন সাধুর পায়ে দূর থেকে আমি গড় করি।"

প্রকৃত ঘটনা বুঝিয়া নিতে রামানুজের দেরি হয় নাই। ধর্মজীবনের প্রতি স্বামীর তীব্র আকর্ষণ কোনোদিনই জমাম্বার মনঃপূত ছিল না। এই কারণেই এ-গৃহে গুরুপত্নীর থাকাটা তিনি সুচক্ষে দেখিতেন না। তাই সামান্য অজুহাতের ছলে আজ ঝগড়া করিয়া তিনি তাঁহাদের তাড়াইয়াছেন। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ রামানুজ স্ত্রীকে তিরস্কার করিতে করিতে ঘরের বাহির হইলেন। অতঃপর বরদরাজ মন্দিরে গিয়া হৃদয়ের সন্তাপ জুড়াইতে বসিলেন।

ভিন্ন রুচি, ভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্না তাঁহার স্ত্রী। ইহাকে নিয়া রামানুজকে এমন দুর্ভোগ ও মনস্তাপ প্রায়ই ভুগিতে হয়। এক এক দিন দুরবস্থা তাঁহার চরমে পৌঁছে।

সে-বার রামানুজের গৃহে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। জমাম্বার নিকট কাতর স্বরে বার বার কিছু আহার্য চাহিতে থাকেন, কিন্তু প্রত্যুত্তরে মিলে শুধু কঠোর ভর্ৎসনা। হতাশ হইয়া ব্রাহ্মণটি ফিরিয়া চলিয়াছেন, পথেই রামানুজের সঙ্গে হয় সাক্ষাৎ।

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া রামানুজের বড় দয়া হইল, তিনি তাঁহাকে তাঁহার গৃহেই ভোজন করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুনিলেন, এইমাত্র তাঁহার গৃহ হইতেই তাড়া খাইয়া আসিয়াছেন তিনি, জমাম্বার কটুবাক্য শুনিবার পর আর সেখানে ফিরিতে রাজী নন।

রামানুজের ক্রোধ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাঁহার গৃহ হইতে অভুক্ত ব্রাহ্মণ বিতাড়িত ! এ যে মহাপাপ। প্রশ্রয় পাইয়া জমাম্বা অনেকবারই এমন হীন কাজ

করিয়াছে, মুখ বুঝিয়া তিনি দিনের পর দিন তাহা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আর এরূপভাবে চলিতে দেওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গেই মন স্থির করিয়া ফেলিলেন, বিবুদ্ধধর্মী স্ত্রীর সাহচর্যে আর থাকা নয়। চিরতরে সংসার ত্যাগের জন্য এবার তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

একাজ করিতে হইলে পত্নীকে এখুনি দূরে পাঠানো প্রয়োজন। রামানুজকে তাই এক কৌশল অবলম্বন করিতে হইল।

ব্রাহ্মণটিকে নিয়া তখনি তিনি এক দোকানে ঢুকিলেন। সেখানে বস্ত্র, তাম্বুল, ফলমূল প্রভৃতি কিনিয়া নিয়া সেই সঙ্গে তাঁহার হাতে একটি পত্র দিয়া দিলেন। সে পত্র রামানুজেরই উদ্দেশে, আর লিখিতেছেন যেন তাঁহারই শ্বশুর মহাশয়।

নূতন রকমের সাজগোজ করিয়া ব্রাহ্মণ আবার রামানুজ-পত্নীর নিকট গিয়া উপস্থিত। লিপিটি দিয়া কহিলেন, "ওগো, আমি তোমার পিত্রালয় থেকে আসছি। তোমার ছোট বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। তাই তোমার বাবা তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য আমায় পাঠিয়েছেন, এই দ্যাখো, রামানুজের নামে তাঁর পত্র।"

জমাম্বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এবার ব্রাহ্মণের স্নান ভোজনের ব্যবস্থা করিতে আর বিলম্ব হইল না।

কিছুক্ষণ পরেই রামানুজ গৃহে ফিরিলেন। শ্বশুরের পত্র পড়িয়া তাঁহার যেন আনন্দ ও উৎসাহের অন্ত নাই। পত্নীকে বলিতে লাগিলেন, "ওগো, শুভকার্যে দেরি করা উচিত নয়, তুমি এখনি এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে যাত্রা করো। আমার হাতে দু'একটি জরুরী কাজ রয়েছে, এগুলি শেষ ক'রেই আমি পরে আসছি।"

জমাম্বা মনের আনন্দে জিনিসপত্র গুছাইয়া রওনা হইলেন।

এবার রামানুজ নিষ্কণ্টক। তৎক্ষণাৎ তিনি বরদরাজ মন্দিরে চলিয়া গেলেন। সদ্‌গুরু শ্রীবরদরাজ বিগ্রহের সম্মুখে সেদিন তাঁহার সন্ন্যাসী-দীক্ষা সমাপ্ত হইল। কাঞ্চীপূর্ণ সারাক্ষণ সেখানে ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে রামানুজকে সংবর্ধনা জানাইয়া কহিলেন, "বৎস, আজ থেকে তুমি হলে যতিরাজ।"

দিব্যকান্তি, তেজঃপুঞ্জদেহ এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে সেদিন বরদরাজ মন্দির চত্বরে ভিড় জমিয়া যায়।

রামানুজের প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা ও পবিত্রতার কথা, তাঁহার প্রতি যামুনাচার্য ও কাঞ্চীপূর্ণের গভীর স্নেহের কথা বৈষ্ণবদের অবিদিত ছিল না। এবার তিনি সুন্দরী তরুণী ভার্যা ও সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের চারিদিকেই তাই তাঁহার জনপ্রিয়তার সীমা নাই। অবিলম্বে তিনি কাঞ্চীর বরদরাজ-মঠের নেতা নির্বাচিত হইলেন।

রামানুজের এক ভাগিনের—দাশরথি (আণ্ডান) তাঁহার নিকট সর্বাগ্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হরিভক্তির সহিত বেদান্তের প্রগাঢ় জ্ঞান এই নবীন শিষ্যের মধ্যে সম্মিলিত হইয়াছিল। রামানুজের দ্বিতীয় শিষ্য হইলেন কুরেশ (আলওয়ান)। অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য পূর্ব হইতেই তিনি প্রসিদ্ধ। সংসারাশ্রমে এক বড় ভূস্বাধিকারী ও দানবীররূপেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

মঠ-প্রাঙ্গণে বসিয়া এই দুই প্রতিভাধর শিষ্যসহ, উর্ধ্বপুণ্ড্র অঙ্কনশোভিত তেজোদৃপ্ত রামানুজ শাস্ত্রালোচনায় রত হইতেন। ভক্ত ও মুমুক্ষু নরনারী দলে দলে তাঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইত। এইভাবে রামানুজের আচার্যজীবন শুরু হইয়া গেল।

রামানুজের প্রাক্তন শিক্ষক যাদবপ্রকাশের মাতা সেদিন বরদরাজ মন্দিরে আসিয়াছেন। দেবোপম এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিবাই তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। রামানুজের মধুর বাক্য ও শাস্ত্রালোচনা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে উঠিল এক বিচিত্র ভাবের আলোড়ন। ঘরে ফিরিয়া পুত্র যাদবপ্রকাশের কাছে রামানুজের কথাই বৃদ্ধা বার বার কহিতে লাগিলেন।

জননী জানিতেন, যাদবপ্রকাশ রামানুজের সহিত নানা অসৎ ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্বকৃত আচরণের কথা স্মরণ করিয়া যাদবপ্রকাশের অন্তরেও স্বস্তি নাই। বৃদ্ধা জননী পুত্রকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া কহিলেন, "ওরে, তুই তোর সব অহমিকা ভুলে, এখনি এই দেবতুল্য সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কর।"

সেকি। নিজ ছাত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ? যাদবপ্রকাশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, একাজ কখনও তিনি পারিবেন না। কিন্তু পুরাতন পাপকাহিনী—নিজের অত্যুগ্র অভিমান, নিরপরাধ শিষ্যের প্রাণনাশের চেষ্টার কথা, সব কিছু একের পর এক তাঁহার মনে পড়ে, আর হৃদয়ে অনুশোচনার তীব্র দহন আরম্ভ হয়। মায়ের কাছে পণ্ডিত অবশেষে একদিন বলিলেন, সন্ন্যাসী রামানুজকে একবার তিনি অবশ্যই দেখিতে যাইবেন।

রাত্রিতে আচার্য যাদবপ্রকাশ সেদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। এক দিব্যপুরুষ নয়ন-সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "যাদব, অবিলম্বে তুমি নবীন সন্ন্যাসী রামানুজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা নাও। যে মহাপাপ তুমি করেছো, এ ছাড়া তার কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

প্রভাতে উঠিয়া আচার্য বার বার এই কথাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ কাঞ্চী-পূর্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। আচার্য কহিলেন, "আমার অন্তরে সদাই অশান্তির আগুন জ্বলছে। শুনতে পাই আপনি বরদরাজের শ্রীমুখস্বরূপ—সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ। দয়া ক'রে বলে দিন, এ অশান্তি কি দূর হবে?"

কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সহিত কহিলেন, "মহাত্মন্, আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি। তবে আপনি যখন আদেশ করেছেন, প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে কাল আপনাকে বলবো।"

পরদিনই তিনি জানাইলেন, বরদরাজ নির্দেশ দিয়াছেন—সন্ন্যাসী রামানুজের কাছেই যাদবপ্রকাশ শিষ্যত্ব গ্রহণ করুক, এতেই নিহিত রয়েছে তাঁর কল্যাণ।

যাদবপ্রকাশ সেদিন ধীর পদবিক্ষেপে রামানুজের মঠে আসিয়া উপস্থিত। স্বপ্নের নির্দেশ বা কাঞ্চীপূর্ণের প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ, কোনো কিছুই চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিবার পাত্র তিনি নহেন। রামানুজের নব রূপান্তর তিনি নিজে আজ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

প্রাক্তন শিক্ষা গুরুকে দেখিয়া রামানুজ সসম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, আসন বিছাইয়া দিলেন।

যাদবপ্রকাশ কহিলেন "বৎস, তুমি দেখছি সন্ন্যাস গ্রহণ করেও ঊর্ধ্বপুণ্ড্র সহ দুই বাহুতে পদ্ম ও চক্র চিহ্ন ধারণ করেছ। বুঝতে পারছি, সগুণ ব্রহ্মের আরাধনার প্রতি এখনো তুমি অনুরক্ত। এবার তোমার মতবাদের নির্যাসটুকু আমায় শোনাও দেখি।"

রামানুজ শান্ত, বিনয়পূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, ব্রহ্মকে সবিশেষ বা সগুণ বলে অভিহিত করছি—কারণ, যাতে কোনো বিশেষ নেই, যা অদ্বিতীয়, এক রস—বহুর উৎপত্তি তা থেকে কি ক'রে হয়? নামরূপময় বৈচিত্র্য কি ক'রে ঘটে? মূলতঃ দ্বৈতহীন যে সত্তা তা কি ক'রে দ্বৈতের জনক হয়? দ্বৈতহীন সত্তা থেকে দ্বৈত উৎপন্ন হলে বলতে হবে যে, কারণ ব্যতীতই কার্য সংঘটিত হচ্ছে। এতে যুক্তির দিক দিয়ে

দোষ ঘটে না কি ? কাজেই বলতে হয় এই জগৎপ্রপঞ্চের মূলে রয়েছে অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চময় এক ব্রহ্মরূপ বা কারণ বস্তু। সৃষ্টির মূল কারণরূপেও রয়েছে এই চিদ্ ও অচিদ্ বিশিষ্ট ব্রহ্ম বা সৃষ্টির মূল কারণ। নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মকে কারণ বলা তাই অসঙ্গত। শ্রীবরদরাজ সেদিন কৃপা ক'রে এই তত্ত্বই আমাকে তাঁর নিত্যসেবক মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের মুখ দিয়ে বলেছেন।"

যাদবপ্রকাশের প্রশ্নের উত্তরে রামানুজ তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরও কহিলেন, "প্রভু, আমি এ কথাই সার বুঝেছি, মুক্তিতে জীব একেবারে ব্রহ্মে মিশে যায় না, জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্যদাস, তার পক্ষে শ্রীভগবানের নিত্যদাস্যই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি— এই দাস্যে কেবলি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। এতেই রয়েছে পরমা মুক্তি, কারণ, জীব স্বরূপতই যে ভগবানের দাস। এই ভগবৎ-দাস্যরূপ নিজ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয়েই সে দুঃখ পায়।"

"বেশ কথা, এবার তোমার এ মতবাদের সমর্থনে শাস্ত্রীয় যুক্তির কথা বল।"

শিষ্য কুরেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রামানুজ কহিলেন, "প্রভু, শাস্ত্র প্রমাণ সম্পর্কে কুরেশ আপনাকে সব কিছু নিবেদন করতে পারবে। সে যেমন মেধাবী তেমনি সর্বশাস্ত্রবিদ্।"

অতঃপর গুরুর নির্দেশে শিষ্য কুরেশের কণ্ঠ হইতে অনর্গলভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ নির্গত হইতে থাকে।

পূর্বকৃত পাপের অনুতাপে আচার্য যাদবপ্রকাশ এতদিন জ্বলিয়া মরিতেছিলেন। তারপর আসিয়াছে মাতার অনুরোধ। স্বপ্ন দর্শন ও বরদরাজের প্রত্যাদেশের কথাও তাঁহার স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে। তারপর এবার কুরেশের কণ্ঠে ভক্তিমার্গীয় শ্লোকরাশি শুনিয়া পণ্ডিতের অন্তর গলিয়া গেল। সম্মুখে তাঁহার তেজঃপুঞ্জদেহ রামানুজ ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। এবার আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। দীর্ঘদিনের আত্মম্ভরিতার শিলাস্তূপ নবোদগত ভক্তির ভাবপ্রবাহে মুহূর্তে কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল।

পণ্ডিত কাঁদিতে কাঁদিতে রামানুজের সম্মুখে ভূতলে পতিত হইলেন। সানুনয়ে কহিতে লাগিলেন, 'রামানুজ, তুমি সত্যই রাঘবের অনুজ। আমি বিদ্যাভিমানে মত্ত হয়ে তোমার মহিমা বুঝতে পারি নি। আমার সব অপরাধ মার্জনা ক'রে আজ তোমার আশ্রয় দাও।"

আচার্যকে এই অবস্থায় দেখিয়া রামানুজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর প্রেমভরে তাঁহাকে বার বার আলিঙ্গন দিতে লাগিলেন।

সেই দিনই রামানুজের নিকট যাদবপ্রকাশের সন্ন্যাসদীক্ষা সম্পন্ন হইল। নব নামকরণ হইল গোবিন্দদাস। এবার হইতে এক পরম ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিলেন। পূর্বের সে গর্বোদ্ধত মহাতার্কিক, অদ্বৈতবাদী আচার্য আর নাই। এখন তিনি এক ত্যাগ-তিতিক্ষাময় পরমভাগবত সাধকে পরিণত হইয়াছেন। ভক্তি প্রেমের আবেগে নয়নে তাঁহার সদাই প্রবাহিত হইতেছে অশ্রুধারা। পরম দৈন্যময়, শুদ্ধসত্ত্ব এই বৈষ্ণবকে দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের আর সীমা নাই।

কিছুদিন পর রামানুজ একদিন গোবিন্দদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, 'বড় আনন্দের কথা—আপনার চিত্ত এখন নির্মল হয়ে গিয়েছে। আপনি এখন ভক্তি সাধনার পথে যথেষ্ট অগ্রসরও হয়েছেন। পূর্বে বৈষ্ণবদের আপনি কম নিন্দা বিদ্রূপ করেন নি, এবার নব রূপান্তরের পর আপনি বৈষ্ণবের কর্তব্য সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করুন, তাহলেই আপনার পূর্ণ শান্তি লাভ হবে।"

গোবিন্দদাস অচিবে এই কার্যে ব্রতী হইলেন। এই বচনা যখন সমাপ্ত হয, তখন তাঁহাব বযস হইবে প্রায আশি বৎসব। তাঁহাব প্রণীত 'যতিধর্মসমুচ্চ' বৈষ্ণবশাস্ত্রেব এক বিশিষ্ট ভক্তিগ্রন্থবূপে কীর্তিত হইযা বহিযাছে।

বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশকে শিষ্যবূপে গ্রহণ কবাব পব হইতেই সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বামানুজেব নাম ধ্বনিত হইতে থাকে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈষ্ণব আচার্য ও সিদ্ধ মহাপুবুষবূপে তাঁহাব জীবনে সূচনা হয এক গৌববময অধ্যায।

আচার্য বামানুজেব এই খ্যাতিতে শ্রীবঙ্গম মঠেব ভক্তদেব আনন্দেব সীমা বহিল না। মহাপূর্ণ বামানুজেব গৃহ হইতে চলিযা আসিবাব পব হইতে সেখানকাব ভক্তগণ বড দুঃখিত হইযা পডেন। বামানুজ তাঁহাদেব নেতৃত্ব গ্রহণে আব সম্মত হইবেন কিনা, তাহাও তাঁহাবা বুঝিযা উঠিতে পাবিতেছিলেন না। এবাব তাঁহাব সন্ন্যাস গ্রহণ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য-বূপে তাঁহাব অভ্যুদয দেখিযা মঠে আনন্দেব সাডা পডিযা গেল।

এই সমযে মহাপূর্ণ শ্রীবঙ্গনাথেব এক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। প্রভু তাঁহাকে বলেন, "দ্যাখো, তোমবা বামানুজকে কাঞ্চীপুব থেকে নিযে আসতে ব্যস্ত হযেছো। কিন্তু শুধু বামানুজকে অনুবোধ কবলেই তো সম্ভব হবে না। ভক্তি-সঙ্গীতে নিপুণ ববঙ্গকে এখনি তোমবা কাঞ্চীতে পাঠাও। স্তুতি গেযে প্রভু ববদবাজকে সে সন্তুষ্ট কবুক, আব বামানুজকে এখানে নিযে আসবাব প্রার্থনা জানাক্। অনুমতি ছাডা বামানুজ প্রভুব পাদমূল ছেডে আসতে পাববে কেন।"

প্রত্যাদেশ অনুসাবে ভক্তপ্রবব ববঙ্গ শ্রীববদবাজ মন্দিবে গিযা উপস্থিত। প্রার্থিত অনুমতিও সঙ্গে সঙ্গে মিলিল। এবাব বামানুজ সশিষ্য শ্রীবঙ্গম মঠে উপনীত হইলেন। ভক্ত ও সন্ন্যাসিগণ একবাক্যে তাঁহাকেই বঙ্গনাথজীব সেবাব ভাব দিলেন, মঠ-প্রধানেব পদ ও মর্যাদা তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

কথিত আছে, এ সমযে শেষনাগশাযী দেব শ্রীবঙ্গনাথ বামানুজেব প্রতি প্রসন্ন হইযা দুইটি বিশেষ বিভূতিব অধিকাব দান কবেন। তাহাব একটি—মানুষেব সন্তাপ নিবাবণেব ক্ষমতা, অপবটি ভক্ত প্রতিপালনেব উপযোগী ঐশী শক্তি।

শ্রীবঙ্গনাথেব পুণ্যভূমিতে শক্তিমান্ মহাবৈষ্ণব বামানুজ এবাব ভক্তিপ্রেমেব দানসত্র খুলিযা বসেন। দিক্‌বিদিক হইতে বিষ্ণুভক্ত নবনাবী দলে দলে এই বিবাট পুবুষেব কৃপা-লাভেব আশায ছুটিযা আসিতে থাকে।

আচার্য বামানুজ এখন মঠাধীশ, যামুনাচার্যেব আসন তিনি লাভ কবিযাছেন। বাজোচিত সম্মান ও বিবাট বৈষ্ণবসমাজেব নেতৃত্বেব অধিকাবী তিনি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জীবনেব মহাব্রত হইতে ক্ষণতবে বিচ্যুত হন নাই। ভাবতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপনেব ভাব তাঁহাব উপব। এই মহান্ কার্য সাধনেব জন্য শাস্ত্রবাবিধি তাঁহাকে মন্থন কবিতে হইবে, অধ্যাত্ম-সাধনাব সিদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে লোকগুবুব অধিকাবও তাঁহাকে কবিতে হইবে অর্জন। নিবভিমান, মহাবৈষ্ণব বামানুজ তাই এখনও গুবু মহাপূর্ণেব এক শিক্ষার্থীবূপেই শাস্ত্রপাঠ চালাইযা যাইতে থাকেন। তাছাডা, মহাত্মা মহাপূর্ণেব অসামান্য ভক্তিব্যাখ্যাব আলোকে এসমযে তিনি ন্যাসতত্ত্ব, গীতার্থসংগ্রহ সিদ্ধিত্রয, ব্যাসসূত্র পঞ্চবাত্রাগম প্রভৃতি অধ্যযন শেষ কবেন।

তাঁহাব অলৌকিক প্রতিভা দর্শনে শিক্ষাদাতা ও গুবু মহাপূর্ণেব বিস্ময়েব অবধি বহিল না। ইহাব কিছুদিন পবেই নিজেব পুত্রকে তিনি বামানুজেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবান।

মহাপূর্ণ সেদিন বামানুজকে ডাকিযা কহিলেন, "বৎস, ইতিমধ্যেই ভক্তিশাস্ত্রে তোমাব যথেষ্ট অধিকাব জন্মেছে। কিন্তু আবো তোমাব অনেক কিছু তত্ত্ব জানবাব আছে। অবশিষ্ট শিক্ষাব জন্য তোমায এবাব পবম ভাগবত গোষ্ঠিপূর্ণেব চবণতলে শবণ নিতে হবে। এই বৃদ্ধ ও সর্বজনমান্য বিষ্ণু উপাসক মহাত্মা যামুনাচার্যেব এক অন্তবঙ্গ শিষ্য। ভক্তিশাস্ত্রে পাবদর্শিতাব দিক দিযে দাক্ষিণাত্যে তাঁব জুডি নেই। সাধনলব্ধ নিগূঢ অর্থসহ বিষ্ণুমন্ত্র অধিগত কবতে হলে তাঁব কৃপা ছাডা চলবে না। নিকটেই তিবুকোষ্ঠিব-এ তাঁব বাস। তাঁব পদপ্রান্তে তুমি শিগ্‌গীর আশ্রয নাও।"

বামানুজ ভক্তিভবে গোষ্ঠিপূর্ণেব নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই প্রবীণ বৈষ্ণব-সাধক কোনোমতেই তাঁহাকে গ্রহণ কবিতে চান না। বামানুজও ছাডিবাব পাত্র নন। বাব বাব তিবুকোষ্ঠিব-এ গিযা তিনি গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট মনেব আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত কবিতে থাকেন। এই ব্যাকুল মিনতি বাব বাবই ব্যর্থ হইতে থাকে। আঠার বাব প্রত্যাখ্যাত হইবাব পব বামানুজ শ্রীবঙ্গমে আসিয়া হতাশভাবে বসিয়া পডেন, অবিবাম ধাবে ঝবিতে থাকে নযনাশ্রু।

গোষ্ঠিপূর্ণেব এক প্রবীণ প্রিয় শিষ্য এ সমযে সেখানে উপস্থিত। এ দৃশ্য তাঁহাকে বড বিচলিত কবিযা তুলিল। তিবুকোষ্ঠিব-এ ফিবিযা গিযাই গুবুকে তিনি চাপিযা ধরিলেন। কহিলেন, "প্রভু, আমাদেব সকলেব আশা ভবসাব স্থল এই বামানুজ। আপনি কি তাঁব প্রতি নির্দয হযে তাঁকে একেবারে মেবে ফেলতে চান?" আচার্য এবার নরম হইলেন। প্রসন্ন কণ্ঠে উত্তব দিলেন, "বৎস, উক্তম কথা। বামানুজকে আমি তাঁব প্রার্থিত মন্ত্রার্থ দেব। কিন্তু সে যেন শুধু দণ্ড ও কুমণ্ডলু নিযে একাকী এখানে উপস্থিত হয। যখনই সে আমাব কাছে আসে, সঙ্গে দুটো চেলা নিযে হাজিব হয কেন?"

এই সংবাদ পাইবাব সঙ্গে সঙ্গে বামানুজ সেখানে ছুটিযা গেলেন। বরাববেব মতো এবাব তাঁহাব সঙ্গে বহিযাছে দুই পবিকর, দাশবথি ও শ্রীবৎসাঙ্ক। বামানুজকে দেখিযাই গোষ্ঠিপূর্ণ গম্ভীব হইযা কহিলেন, "আমি তো তোমায একলাটি, শুধু দণ্ড কমণ্ডলু সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছি। এদেব তবে সঙ্গে আনলে কেন?"

বামানুজ সহজ কণ্ঠে উত্তব দিলেন, "প্রভু, দাশবথি ও শ্রীবৎসই যে আমাব দণ্ড ও কমণ্ডলু।"

শিষ্যদ্বযেব প্রতি আচার্য বামানুজেব এ কি গভীব ভালোবাসা—একি অদ্ভুত একাত্মতা! গোষ্ঠিপূর্ণেব হৃদয সেই মুহূর্তে গলিয়া গেল। এবাব তিনি তাঁহার প্রতি সদয না হইয়া পারিলেন না, বিষ্ণুমন্ত্র তাঁহাকে প্রদান কবিলেন।

বড জাগ্রত এ মন্ত্র। প্রাপ্তিব সঙ্গে সঙ্গে বামানুজেব হৃদযকন্দব দিব্য আলোকের ছটায উদ্ভাসিত হইযা উঠিল। তিনি তখন এক নূতন মানুষে বূপান্তবিত। গোষ্ঠিপূর্ণ কহিলেন, "বৎস, এ মন্ত্রের মাহাত্ম্য খুব কম সাধকই জানে। তুমি এক শক্তিমান্ আধাব, তাই জেনেই এ মন্ত্র আমি দিযেছি। মন্ত্রচৈতন্যসহ যে কেউ এ বস্তু গ্রহণ কববে সে-ই যাবে বৈকুণ্ঠে। প্রকৃত অধিকাবী ছাডা কাউকে তুমি কিন্তু এই পবমবস্তু দান কববে না।" অলৌকিক অনুভূতি ও দিব্য আনন্দে বামানুজেব দেহ তখন ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। ভক্তিভবে মহাত্মা গোষ্ঠিপূর্ণেব চবণে প্রণিপাত কবিযা তিনি বিদায গ্রহণ কবিলেন।

কথিত আছে দিব্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া বামানুজ ইহাব পব তিবুকোষ্ঠিবস্থিত বিষ্ণু-মন্দিবে ছুটিযা যান। পবম উৎসাহে লোক জডো করিযা এই মন্ত্র তাহাদেব দান কবেন।

এই সংবাদ মহাত্মা গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট পৌঁছতে দেরি হয নাই। তিনি মহাক্রুদ্ধ

হইয়া উঠেন এবং রামানুজ সহাস্যে তাঁহার কাছে উপনীত হইলে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, "নরাধম, এখনই তুমি এখান হ'তে দূর হও। তোমার মুখ দর্শন আমি করতে চাইনে। পবিত্র ও নিগূঢ় মহামন্ত্র তোমার আজ আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু এমনভাবে যে তার অসদ্ব্যবহার করে, সে মহাপাতকী ছাড়া আর কি ? অনন্ত নরকই হচ্ছে তোমার উপযুক্ত স্থান।"

এই তীব্র তিরস্কারের পরও কিন্তু রামানুজকে ভীত হইতে দেখা গেল না। প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "প্রভু, আপনার শ্রীমুখ থেকেই শুনেছি এ মহামন্ত্র যে পাবে, সে লাভ করবে পরমা গতি। আমি এক নগণ্য মানুষ। আমার অনন্ত নরকবাসের বদলে সহস্র সহস্র লোকের ভাগ্যে যদি মুক্তিলাভ ঘটে, তবে সেই অনন্ত নরকই আমার জন্য তোলা থাকুক। বৈকুণ্ঠবাস অপেক্ষা তাই যে আমার পরম কাম্য।"

গোষ্ঠিপূর্ণ চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো। লোকমঙ্গলের জন্য যে মানুষ এমন আত্ম-বিলুপ্তি ঘটাইতে চায়, নিজের মুক্তির সম্পদকে অবহেলায় দূরে নিক্ষেপ করে, পৃথিবীতে তাঁহার তুলনা কোথায় ? মুহূর্ত মধ্যে তিনি গলিয়া গেলেন।

প্রেমভরে রামানুজকে আলিঙ্গন করিয়া প্রবীণ বৈষ্ণব কহিলেন, "রামানুজ তুমি ধন্য —ধন্য তোমার মানবপ্রেম। শিষ্য হয়েও আজ আমায় তুমি তত্ত্বজ্ঞান শেখালে। এমন মহান্ যার হৃদয়, সে তো লোকপিতা—বিষ্ণুর অংশ সে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

রামানুজ গোষ্ঠিপূর্ণের চরণে পতিত হইয়া করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, আপনি আমার নিত্যগুরু। আপনার কৃপাশক্তি পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, আর সেই কৃপাই করছে আজ অগণিত লোকের কল্যাণ সাধন। নিবেদন করি আপনার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম।"

গোষ্ঠিপূর্ণ অতঃপর স্বীয় পুত্রকে রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করান। রামানুজের মতবাদ ও সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে প্রকৃত বৈষ্ণবতত্ত্বের বীজ দেখিতে পাইয়া তিনি পরিতৃপ্ত হন। শুধু তাহাই নয়, প্রবীণ সাধক এ সময়ে নিজে শিষ্যদের নির্দেশ দেন, এখন হইতে সমুদয় বিষ্ণুউপাসনার সিদ্ধান্তকে 'রামানুজ সিদ্ধান্ত' বলিয়া যেন তাহারা অভিহিত করে।

এবার শিষ্যগণসহ রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসেন। এই সময় হইতে জনসাধারণ তাঁহাকে দেবাংশসম্ভূত বলিয়া মনে করিতে থাকে। বহু ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি গণ্য হন শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণের দ্বিতীয় অবতাররূপে।

অন্তরঙ্গ ভক্ত কুরেশ এক সময়ে রামানুজের নিকট হইতে গীতার চরমতত্ত্ব, কৃষ্ণের শরণাগতি-ধর্মের গূঢ়ার্থ শ্রবণ করিয়া ধন্য হন।

অতঃপর ভক্ত দাশরথিও বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কুরেশের মতো গীতার নিহিতার্থ না জানিয়া তিনি ছাড়িবেন না। বারংবার তিনি মিনতি জানাইতে লাগিলেন। দাশরথির বেলায় কিন্তু রামানুজের ব্যবস্থা হইল অন্যরূপ। তিনি জানিতেন, দাশরথি তাঁহার পরমভক্ত হইলেও কিছুটা বিদ্যা-অভিমানী। শিষ্যের সাধনপথের এ বাধা সদ্‌গুরু রামানুজকে এবার চূর্ণ করতেই হইবে। তাছাড়া, গীতার মূলতত্ত্ব অধিগত করাইতে হইলেও তাঁহার এই অহঙ্কার নিষ্কাশন না করিলে নয়।

তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন,"বৎস, এজন্য তোমায় বেশ কিছুদিন শুদ্ধাচারীভাবে থেকে অপেক্ষা করতে হবে।"

ইতিমধ্যে একদিন বড় অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। রামানুজ-গুরু মহাপূর্ণের এক কন্যা

ছিল, তাঁহার নাম অত্তুলা। দূর গ্রামাঞ্চলে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তাঁহাকে নানা দুর্ভোগ ভুগিতে হয়, বিশেষতঃ রান্নাবান্নার কাজ করিতে গেলে কষ্টের অন্ত থাকে না। নিকটে জলের ব্যবস্থা নাই, বহু দূর হইতে জল বহিয়া আনিয়া রান্না করিতে হয়। বৃদ্ধ শ্বশুরকে একদিন একথা জানাইলে তিনি ক্রোধে গালাগালি দিতে থাকেন। —এত টাকাকড়ি তাঁহার নাই যে পুত্রবধূর জন্য পাচক রাখিবেন। এতই যদি অসহ্য হইয়া থাকে, অত্তুলা তাহার বাবাকে বলিয়া জল টানিবার জন্য এক ভৃত্য নিযুক্ত করিলেই পারে? পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়া অত্তুলা তাঁহার বাবাকে এসব কথা জানাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহাপূর্ণ কহিলেন, "মা, এ ব্যাপারে আমার কিছু করবার সাধ্য নেই, তুমি বরং রামানুজকে সব জানাও। সে তোমার বড় ভাইয়ের মতো, যা কিছু করা প্রয়োজন সে-ই করবে।"

শ্রীরঙ্গম মঠে আসিয়া অত্তুলা তাঁহার দুঃখের কাহিনী বলিলেন। সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম শিষ্য দাশরথিও ঠিক সে সময়ে সেখানে উপস্থিত। রামানুজ গুরুকন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "বোন, তুমি এজন্য দুঃখ ক'রো না, আমি এখনি সব বিলি-ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য, এই দাশরথিই আজ থেকে তোমার পাচক হবে। ছদ্মবেশে সে তোমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বাস করবে।"

এ সিদ্ধান্ত শুনিয়া সকলে তো বিস্ময়ে হতবাক্। পণ্ডিতাগ্রগণ্য দাশরথির জন্য গুরুদেবের আজ একি অদ্ভুত ব্যবস্থা। দাশরথি কিন্তু রামানুজের এ কঠিন নির্দেশ তখনি সানন্দে মাথা পাতিয়া নিলেন। বুঝিলেন, গুরুদেব তাঁহার অভিমানের কণ্টকটি সমূলে উৎপাটন করিতে চাহেন। পাচকের কাজ নিয়াই এখন হইতে তিনি দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। সেদিন অত্তুলার শ্বশুরগৃহে এক বিখ্যাত বৈষ্ণবপণ্ডিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে আসিয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একটি শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া বসিলেন। পাচকরূপী পণ্ডিত দাশরথি এ সময়ে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। বাদানুবাদের ফলে তিনি তখন মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাই ঝোঁকের মাথায় ঐ শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য সকলকে না বুঝাইয়া ছাড়িলেন না।

উপস্থিত সকলে ততক্ষণে এই পাচকের পাণ্ডিত্যে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন। এই ছদ্মবেশী বক্তার প্রকৃত পরিচয় আর সেদিন গোপন রহিল না। জানাজানি হইয়া গেল, তিনিই দুর্ধর্ষ পণ্ডিত দাশরথি—রামানুজাচার্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য।

দাশরথিকে সঙ্গে নিয়া এবার সবাই রামানুজের নিকট গিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের মিনতি এড়ানো বড় কঠিন, তাই সেদিন হইতে দাশরথির অজ্ঞাতবাস ও পাচকবৃত্তি ঘুচিয়া গেল। এভাবে নিরভিমান শুদ্ধসত্ত্ব হওয়ার পর গুরুদেবের নিকট হইতে দাশরথি পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

যামুনাচার্যের তিনজন অন্তরঙ্গ শিষ্য—কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ ও গোষ্ঠিপূর্ণের কৃপা রামানুজ ইতিপূর্বেই পাইয়াছেন। বাকি ছিলেন শুধু মালাধর ও বররঙ্গ। এবার এই দুই মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া তিনি বৈষ্ণবতত্ত্বের সকল শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। যামুনাচার্যের এই পঞ্চপ্রধান শিষ্যের প্রত্যেকে গুরুদেবের এক একটি পৃথক ভাবধারা গ্রহণ করিয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবার এই পঞ্চধারা সামগ্রিকভাবে রামানুজের

জীবনে সম্মিলিত হয়। সর্বগুণান্বিত বৈষ্ণবনেতারূপে তিনি দাক্ষিণাত্যের ভক্ত ও জনসমাজে অভিনন্দিত হইতে থাকেন। এমন কি, অনেকে এ সময়ে শ্রীরঙ্গনাথের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি জানাইতে শুরু করে।

রামানুজের আধিপত্য দেখিয়া শ্রীরঙ্গম মঠের প্রধান পূজারী কিন্তু বড় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যেভাবেই হোক এবার নিজের স্বার্থ ও প্রাধান্য রক্ষা করা প্রয়োজন। স্থির করিলেন, অবিলম্বে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে।

পূজারীর গৃহে সেদিন আচার্য রামানুজের ভোজনের নিমন্ত্রণ হইল। পত্নীকে পূজারী গোপনে বলিয়া রাখিলেন, অতিথি খাইতে বসামাত্র বিষ-মিশ্রিত অন্ন যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়।

আদর অভ্যর্থনার পর রামানুজ মহা আনন্দে ভোজনে বসিয়াছেন। পূজারী-পত্নী আহারের থালা হাতে নিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু ঐ বিষাক্ত খাদ্য পাতে তুলিয়া দিতে গিয়াই মহিলার অন্তরে বড় অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। কি দিব্যমূর্তি এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষের। কোন্ প্রাণে তিনি বিষ-মিশ্রিত খাবার তাঁহাকে দিবেন? রামানুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি অনুশোচনায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "বাবা, যদি বাঁচতে চাও তবে অন্য কোথাও গিয়ে আহার করো। এখানকার অন্নে মেশানো রয়েছে প্রাণঘাতী বিষ। এ আমি তোমায় দিতে পারবো না।"

বিস্মিত রামানুজ তখনি থালা ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র সেদিন বিফল হইল।

ব্যর্থকাম হইবার পর প্রধান পূজারীর ক্রোধ আরও বাড়িয়া যায়। স্বহস্তেই এবার তিনি রামানুজের প্রাণনাশে বদ্ধপরিকর। রামানুজ সেদিন সন্ধ্যাবেলায় শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে আসিয়াছেন। প্রধান পূজারী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিলেন বিগ্রহের স্নানাভিষেক-জল। প্রাণঘাতী বিষ ছিল ইহাতে মিশ্রিত।

পরম শ্রদ্ধাভরে রামানুজ এ জল পান করিলেন, আর দেহে মনে জাগিয়া উঠিল অপূর্ব ভাবাবেশ। বিষের আস্বাদ তো দূরের কথা, এ তখন তাঁহার কাছে অমৃতের মতো উপাদেয় বস্তু!

এই পুণ্যবারি পান করিয়া তিনি আনন্দে অধীর। শ্রীরঙ্গনাথকে কহিতে লাগিলেন, "কৃপাময় প্রভু, দাসের প্রতি আজ তোমার একি অহৈতুকী করুণা। আজ আমি স্বর্গের অমৃত তোমার স্নান-জলের ভেতর দিয়ে পান করলাম। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার কৃপা।"

স্তুতিবাদ করিতে করিতে রামানুজ রঙ্গনাথ-মন্দির হইতে বাহিরে আসিতেছেন, আর অপূর্ব আনন্দাবেশে তাঁহার দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। পা দুটি টলটলায়মান। এই ভাবমত্ত অবস্থা দেখিয়া পূজারীর আনন্দ আর ধরে না। ভাবিলেন, বিষের ক্রিয়া এবার তবে শুরু হইয়াছে।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রধান পূজারী আশায় আশায় দণ্ডের পর দণ্ড গুণিয়া চলিয়াছেন, কখন রামানুজের চিতাধূম আকাশে দেখিতে পাইবেন। যে তীব্র হলাহল স্বহস্তে তিনি পান করাইয়াছেন তাহাতে আজ তাঁহার মৃত্যু অবধারিত।

অল্পক্ষণ মধ্যেই অদূরে শোনা গেল হরিকীর্তনের গগনভেদী ধ্বনি। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পূজারী যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

শ্রীরঙ্গমের সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী আজ রামানুজকে নিয়া কীর্তনানন্দে মত্ত। ভক্তপ্রবর দিব্যভাবে বিভোর হইয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়াছেন। আয়ত নয়ন দুটি নিমীলিত, আননে অমানুষী জ্যোতির ছটা। সর্বসত্তা যেন ঠাকুর রঙ্গনাথের পাদপদ্মে সমর্পিত হইয়া আছে।

অলৌকিক শক্তির বিরাট আধার, এই প্রেমিক পুরুষকেই তিনি বিষপ্রয়োগ করিয়াছেন। পূজারীর অন্তরাত্মা এবার তীব্র অনুশোচনায় কাঁদিয়া উঠিল। জনতার বেষ্টনী ভেদ করিয়া তিনি ছুটিয়া গেলেন, পতিত হইলেন রামানুজের পদতলে। কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন, "যতিরাজ, আমি মহাপাতকী, আমায় তুমি রক্ষা করো। আমার মতো দুরাত্মাদের উদ্ধারের জন্যই যে তোমার আবির্ভাব, এ সত্য আমি আজ বুঝতে পেরেছি। আমায় কৃপা করো, চরণে আশ্রয় দাও।"

অনুতপ্ত প্রধান অর্চকের শিরে হাতখানি স্থাপন করিয়া রামানুজ আশীর্বাদ করিলেন। কহিলেন, "ভাই শ্রীরঙ্গনাথস্বামী যে পরম দয়াল। তিনি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছেন। এখন থেকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুমি জীবের সেবায় ব্রতী হও।"

দুর্ধর্ষ প্রধান পূজারী অতঃপর এক পরমভক্ত বৈষ্ণবে পরিণত হন।

দাক্ষিণাত্যবাসী এক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত এই সময়ে সমগ্র উত্তর ভারতে দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহার নাম যজ্ঞমূর্তি। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী রামানুজের অভ্যুদয় ও তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডনের সংবাদ এ পণ্ডিতের কানে গিয়াছে। তাই রামানুজকে পরাস্ত করার জন্য সেদিন তিনি শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে রহিয়াছে শকট বোঝাই শাস্ত্রগ্রন্থ এবং বহুতর শিষ্য।

সতের দিন ব্যাপিয়া রামানুজ ও যজ্ঞমূর্তির মধ্যে তর্কযুদ্ধ ও বিচার চলে। শক্তিধর সন্ন্যাসীর বাগ্‌বিভূতি ও কূট তর্কে রামানুজ শেষের দিকে প্রায় কোণঠাসা হইয়া পড়েন। অবশেষে সেদিন মঠের শ্রীবিগ্রহের কাছে সকাতরে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, তোমার ভক্তিধর্মের অনুপম মহিমা তুমি নিজ কৃপায় কবে জগতে প্রকাশ করবে, বল? মায়াবাদী তার্কিকদের এ প্রচারই বা আর কতদিন চলতে থাকবে।"

রাত্রে ঠাকুর প্রত্যাদেশ জানাইলেন, "বৎস যতিরাজ। তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ো না। বিষ্ণুভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার, ভক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠা যে তোমার ভেতর দিয়েই এদেশে ছড়িয়ে পড়বে।"

প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবার পর রামানুজের মধ্যে সেদিন দেখা গেল এক অলৌকিক শক্তির আবেশ। স্বর্গীয় জ্যোতির আভা তাঁহার মুখে চোখে ঝলমল করিতেছে, অপূর্ব আত্মপ্রত্যয়ে হইয়া উঠিয়াছেন উদ্দীপিত। মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সম্মুখে আচার্য রামানুজ এক অসামান্য দৈবীশক্তিধর পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার অমানুষী দৃপ্তভঙ্গী ও জ্যোতির্মণ্ডিত আনন দেখিয়া তর্কবীর যজ্ঞমূর্তি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উপলব্ধি হইল, এ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তো শুধু মহাশাস্ত্রবিদ্‌ই নহেন, ইনি যে সত্যকার এক ঐশী শক্তিধর মহাপুরুষ। পবিত্রতা, প্রেম ও নিরভিমানতার মধ্য দিয়া ইনি এক পরমবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর শুষ্ক তর্কে বৃথা দিন কাটাইয়া যজ্ঞমূর্তির এযাবৎ কি ফললাভ হইয়াছে? ঈশ্বরপ্রাপ্তি তো দূরের কথা, চিত্তের নির্মলতা ও শান্তিটুকুও জীবনে জুটে নাই।

অমোঘ অলৌকিক আকর্ষণে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রামানুজের চরণে নিপতিত হইলেন। ইহার পর হইতে এই পণ্ডিত এক নিরভিমান বিষ্ণুপন্থী সাধকে পরিণত হন। দেবরাজমুনি নামে দক্ষিণের সর্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

বামানুজেব নির্দেশ অনুসাবে এই বৈষ্ণব পণ্ডিত তামিল ভাষায 'জ্ঞানসাব' ও 'প্রমেযসাব' নামক দুইখানি মূল্যবান শাস্ত্রগ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন।

শিষ্যদেব মধ্যে বৈষ্ণবীয দৈন্য ও ত্যাগ তিতিক্ষা আনযন কবিতে বামানুজেব সতর্কতাব অন্ত ছিল না। একদিকে অপাব স্নেহ ও প্রেম, অপবদিকে কঠোব পবীক্ষা, এই দুযেব মধ্য দিযা তাঁহাব আচার্য জীবনেব লীলা বূপাযিত হইযা উঠিত।

সে-বাব আচার্য বামানুজ শিষ্যগণসহ তীর্থ ভ্রমণে বাহিব হইযাছেন। পথেই পডে অষ্টসহস্র নামক এক গ্রাম। এই গ্রামে আচার্যেব দুই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ শিষ্য বাস কবেন। ইহাদেব একজন অত্যন্ত ধনবান্, নাম যজ্ঞেশ। অপব ব্যক্তি ববদাচার্য, এক কাঙাল ভক্ত—কোনোমতে ভিক্ষা কবিযা তাঁহাব সংসাব চলে।

আচার্যেব সঙ্গে আছেন বহু শিষ্য। ইহাদেব আহাব ও বাসস্থানেব ব্যবস্থা কবা যজ্ঞেশেব পক্ষে কঠিন কাজ কিছু নয। তাই তাঁহাব ওখানেই ভিক্ষা গ্রহণেব সিদ্ধান্ত কবা হইল। গ্রামেব উপান্তে পৌঁছিযাই বামানুজ আগমন-বার্তা পাঠাইলেন।

দুইজন তবুণ শিষ্য দ্রুতপদে যজ্ঞেশেব গৃহে গিযা উপস্থিত। আচার্য বামানুজ কৃপা কবিযা তাঁহাব গৃহে আসিতেছেন, যজ্ঞেশেব আজ তাই আনন্দেব সীমা নাই। গুবুদেবেব সংবর্ধনাব ব্যবস্থা ও প্রযোজনীয জিনিসপত্র সংগ্রহেব জন্য তিনি ব্যস্ত হইযা পডিলেন। কিন্তু শ্রান্ত, ক্ষুৎ পিপাসায কাতব আগন্তুক শিষ্যদ্বযেব পবিচর্যাব কথা তিনি একেবাবে ভুলিযা গেলেন।

বলা বাহুল্য, যজ্ঞেশেব এই ব্যবহাবে তবুণ শিষ্য দুইটি কিছুটা ব্যথিত হন। ফিবিযা আসিযা তাঁহাবা সব কথা বামানুজেব চবণে নিবেদন কবিলেন। যজ্ঞেশেব একি অন্যায আচবণ? গৃহে সমাগত অতিথি বৈষ্ণবেব উপযুক্ত সংবর্ধনা সে কবে নাই? বামানুজ বুষ্ট হইযা কহিলেন, "শোন, যজ্ঞেশেব ভবনে আমাদেব যাওযা হবে না। চল আমবা কাঙাল বৈষ্ণব ববদাচার্যেব গৃহেই আজ ভিক্ষা গ্রহণ কবি।"

সদলবলে বামানুজ এবাব তাঁহাব দবিদ্র শিষ্যেব দ্বাবেই উপনীত হইলেন।

জীর্ণ ঝুলিটি নিযা ববদাচার্য নিত্যকাব ভিক্ষায বাহিব হইযাছেন। সামান্য যাহা কিছু মিলে, তাহাতেই বোজ নাবাযণ বিগ্রহেব সেবা হয তাবপব সাধ্বী পত্নী লক্ষ্মীদেবীসহ তিনি প্রসাদ গ্রহণ কবেন।

শিষ্যগণসহ গুবুদেবকে দেখিযা লক্ষ্মীদেবী আনন্দে অধীব হইযা পডিলেন। সাদব অভ্যর্থনা কবিযা তাঁহাকে বসানোব পবই কিন্তু শুবু হইল ঘোব দুশ্চিন্তা। ঘবে যে তাঁহাব এক মুষ্টি চাল নাই, স্বামীও বাহিবে গিযাছেন। কোথাও কিছু সংগ্রহ হইবে, এমন কিছু ভবসা দেখা যাইতেছে না।

লক্ষ্মীদেবী আচার্যকে কহিলেন, "প্রভু, আমাব স্বামী বহুক্ষণ যাবৎ ভিক্ষায বাব হযেছেন, এখনি ফিববেন। আপনাবা সকলে কিছুটা বিশ্রাম ক'বে সামনেব ঐ পুষ্কবিণীতে স্নানতর্পণ সেবে ফেলুন। এব ভেতব আমি ঠাকুবেব ভোগ নৈবেদ্য তৈবি ক'বে ফেলছি।"

ঠাকুবঘবে আসিযা ব্রাহ্মণ-পত্নী ভাবিতে বসিলেন। আজ একি পবীক্ষায নাবাযণ তাঁহাকে ফেলিলেন। এই ঘোব বিপদ হইতে তিনি কি উদ্ধাব কবিবেন না? কিন্তু এ অল্প সমযেব মধ্যে কোথা হইতে এত লোকের খাবাব যোগাড কবা যায? হঠাৎ মনে পডে প্রতিবেশী এক শ্রেষ্ঠীর কথা। এই ধনাঢ্য বণিক লক্ষ্মীদেবীব বূপে মোহিত, তাঁহাব

জন্য উন্মত্ত। কুপ্রস্তাব করিয়া সে দূতীও পাঠাইয়াছে, ঘৃণাভরে তিনি বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অতঃপর হতাশ হইয়া লোকটি আর অগ্রসর হয় নাই। স্থির করিলেন, তাহার কাছেই এবার তিনি সাহায্য চাহিবেন। প্রয়োজন হইলে কামুক বণিকের লালসার আগুনে নিজেকে দগ্ধ করিতেও দ্বিধা করিবেন না।

মনে মনে কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীগুরু ঈশ্বর-স্বরূপ। তাঁহার সেবায় তিনি দেহাত্মবুদ্ধি কেন রাখিবেন? এই অনিত্য দেহপিণ্ডের শুভাশুভের কথাই বা চিন্তা করা কেন? দ্রাবিড় পুরাণে কলিঙ্গ নামে বিখ্যাত ভক্তের কথা তিনি পড়িয়াছেন। ইষ্ট সেবার জন্য চুরি করিতেও সে পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। ভগবান্ তাঁহার সেবানিষ্ঠায় প্রীত হইয়া দর্শন দান করেন, তাঁহাকে কহেন "মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি পুণ্যায় কল্পতে। মামনাদৃত্য তু কৃতং পুণ্যং পাপায় কল্পতে।"—হে ভক্ত আমার নিমিত্ত কৃত যে পাপ, তা তোমার পুণ্য। আর আমায় অবহেলা ক'রে যে পুণ্য তুমি করবে অর্জন, তাই হচ্ছে পাপ।

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিতে বেশী দেরি হইল না। বণিকের সহিত তখনই দেখা করিয়া জানাইলেন,—অতিথিদের সেবার উপযোগী দ্রব্যাদি তাঁহার এখনই প্রয়োজন। তারপর রজনীযোগে আসিয়া নিজেকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন।

বলা বাহুল্য বরদাচার্যের গৃহে তখনি ভারে ভারে অতিথি সেবার জিনিসপত্র পৌঁছিতে লাগিল। লক্ষ্মীদেবী পরম নিষ্ঠাভরে ভোগান্ন প্রস্তুত করিয়া ইষ্টদেব নারায়ণকে নিবেদন করিলেন। রামানুজ ও শিষ্যদের পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হইল।

গৃহস্বামী বরদাচার্য তো ফিরিয়া আসিয়া বিস্ময়ে হতবাক্। এই কাঙালের গৃহে আগত সশিষ্য গুরুদেব শুধু ভালরূপে অভ্যর্থিতই হন নাই, উপাদেয় খাবারও সকলকে আজ প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করা হইয়াছে।

অন্তঃপুরে গিয়া বরদাচার্য নিভৃতে ব্রাহ্মণীকে প্রশ্ন করিলেন. "কিগো, ব্যাপারখানা কি? এত সব খাবার-দাবার কোথা থেকে তুমি জোটালে?"

লক্ষ্মীদেবী শান্ত ধীর কণ্ঠে স্বামীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন, আজ রাত্রেই যে পাপাশয় বণিকের অভিলাষ পূর্ণ করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইহাও স্বামীকে জানাইয়া দিলেন।

পত্নীর সব কথা শুনিয়া মহাভক্ত বরদাচার্যের আনন্দের সীমা নাই। সোল্লাসে বার বার কহিতে লাগিলেন, "তোমার মতো সহধর্মিণী পেয়ে আমি ধন্য। দেহাত্ম-বুদ্ধি ছেড়ে তুমি ভগবৎস্বরূপ সদ্‌গুরুর সেবা করতে সক্ষম হয়েছ, আর চরম আত্মোৎসর্গ করতে রয়েছ প্রস্তুত। তোমার মতো স্ত্রী ক'জনার ভাগ্যে হয়?"

রাত্রিতে ব্রাহ্মণপত্নী শ্রেষ্ঠীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। স্বামী বাহিরে দণ্ডায়মান। স্ত্রী শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদান্নের থালাটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। কামুক শ্রেষ্ঠীর হাতে ঐ প্রসাদ দেওয়া হইল। উহার আস্বাদ গ্রহণ করামাত্র. কোথা দিয়া কি ঘটিল কে জানে, তাহার সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

লক্ষ্মীদেবীর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল. 'মা তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি কামার্ত হয়ে এতদিন নরপশুতে পরিণত হয়েছিলাম। গুরুদেবের সেবার জন্য যে অতুল আত্মত্যাগ তুমি আজ দেখিয়েছ, তা আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। তোমার মতো সাধ্বী আমার চোখে মাতৃমূর্তিতে অধিষ্ঠিতা। আমার প্রার্থনা তোমার যে গুরুদেবের আগমন উপলক্ষে আমার মতো মহাপাতকীর অনুশোচনা শুরু হল. কৃপা ক'রে তুমি আমায় তাঁরই পদপ্রান্তে পৌঁছে দাও। তিনি যেন আমার উদ্ধার করেন।"

প্রসাদান্নের এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে বরদাচার্যের আনন্দ উথলিয়া উঠিল। প্রেমভরে তিনি বণিককে আলিঙ্গন করিলেন।

অনুতাপদগ্ধ এই বণিক রামানুজের শরণ ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুদেবকে এই সময়ে তিনি প্রচুর ধনরাশিও উপঢৌকন দেন। দরিদ্র ভক্ত দম্পতিকে এসব দান করিয়া তাহাদের দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচাইবেন, ইহাই ছিল রামানুজের ইচ্ছা। কিন্তু বরদাচার্য করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, আপনার আশীর্বাদে আমাদের কোনো অভাববোধই নেই। ভিক্ষান্ন খেয়ে দিন তো কেটেই যাচ্ছে। অর্থ সম্পদ চিত্তের চাঞ্চল্যই শুধু বাড়িয়ে তোলে, এ দাসকে আপনি অ নেবার জন্য আর লোভ দেখাবেন না।" রামানুজ সেদিন ভরপুর মন নিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতিকে আশীর্বাদ করিলেন, বার বার সকলকে তাঁহাদের ভক্তি-সম্পদের কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন।

এদিকে ধনী শিষ্য যজ্ঞেশ রামানুজ স্বামীর এই কৃপালীলার কথা শুনিয়াছেন। ত্রস্তেব্যস্তে তিনি কাঙাল বরদাচার্যের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। গুরুদেবকে কহিলেন, "প্রভু, এ অধমের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করবেন ব'লে দয়া ক'রে নিজেই সংবাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন্ দোষে আমার প্রতি আপনি বিরূপ হলেন? আমার গৃহে পদধূলি দিলেন না, সেবার অধিকার হতেই বা আমায় কেন বঞ্চিত করলেন?"

উত্তর হইল, "বৎস, আমার দুই প্রিয় শিষ্য তোমার নিকট আমার আগমন সংবাদ দেবার জন্য গিয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, তুমি তাদের কোনো আদর-আপ্যায়নই করো নি। শ্রান্ত অতিথিদের বিশ্রাম ও পান-ভোজনের কথা বিস্মৃত হয়ে শুধু আমার জন্যই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়েছিলে। ঐ তরুণ বৈষ্ণবদের কাছে কি তোমার বৈষ্ণব-অপরাধ ঘটে নি? শুধু এই জন্যই সেদিন তোমার গৃহে সেবা গ্রহণ করতে আমার রুচি হয় নি। অথচ দ্যাখো, কপর্দকহীন ব্রাহ্মণ আমায় কি পরিতোষপূর্বকই না ভিক্ষা গ্রহণ করিয়েছে। অভিমানের বালাই তার নেই। তাই তো সে এমনভাবে আমার আত্মার আত্মীয় হতে আজ পারলো। ধনগর্ব ছেড়ে, বৈষ্ণবসেবার ব্রতই জীবনে গ্রহণ করো। তাতে তোমার কল্যাণ হবে।"

শ্রীশৈলতীর্থ দর্শন করিতে গিয়া রামানুজ সেবার এক বৎসর কাল প্রবীণ আচার্য শৈলপূর্ণের গৃহে অবস্থান করেন। শৈলপূর্ণ তাঁহার মাতুল। তাছাড়া, তাঁহার মাসতুতো ভাই ও সতীর্থ, গোবিন্দ, ইহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এক পরমভক্ত বৈষ্ণবসাধকে হইয়াছেন রূপান্তরিত। বাল্যকালে গোবিন্দের সহিত রামানুজের বড় হৃদ্যতা ছিল। আচার্য যাদবপ্রকাশের নিকট উভয়ে একত্রে অধ্যয়ন করিতেন। এই গোবিন্দই সেবার গোণ্ডা-অরণ্যে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আজ তাঁহার জীবনে বৈষ্ণবীয় দাস্যভাবকে অপরূপ রূপে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া আচার্যের বড় আনন্দ হইল।

একদিন রামানুজ লক্ষ্য করিলেন, গোবিন্দ তাঁহার গুরু শৈলপূর্ণের শয্যা নিজহস্তে রচনা করিলেন, তাহার উপর নিজেই কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন। গুরুসেবা করিতে গিয়া একি অন্যায় আচরণ।

শৈলপূর্ণের কানে সংবাদটি যথাসময়ে তোলা হইল। তখনি তিনি গোবিন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি কি জানো না, গুরুর শয্যায় শয়ন করা শিষ্যের পক্ষে মহাপাপ? সব জেনেও তুমি কেন রোজ এ অপরাধ ক'রে যাচ্ছো?

গোবিন্দ ধীর অচঞ্চল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "প্রভু, মহাপাতকের সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও যে এ কাজ আমায় করতে হয়। শয্যারচনা নিখুঁত হয়েছে কিনা আপনার দেবদুর্লভ দেহের পক্ষে সুখকর কিনা, তা জানবার জন্য যে ওতে রোজ শুয়ে পড়ে আমায় পরীক্ষা করতে হয়। আপনার সামান্যতম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে মহাপাপের ভার গ্রহণে আমি সদাই প্রস্তুত। অনন্ত নরকবাসেও ভীত নই।"

স্বীয় সখা, ভক্তপ্রবর গোবিন্দের জীবনে সেবানিষ্ঠার এই অপূর্ব প্রকাশ দেখিয়া রামানুজের আনন্দের সীমা রহিল না।

আর একদিন রামানুজ সেখানে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন গোবিন্দ একটি বিষধর সর্পের মুখবিবরে নিজের হস্ত প্রবেশ করাইয়া আবার তখনি তাহা টানিয়া নিলেন। সাপটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

বিস্মিত হইয়া গোবিন্দকে কাছে ডাকিলেন, কহিলেন—"ভাই বলতো, একি অদ্ভুত আচরণ? সাপের মুখে হাত দেওয়া—নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোন মুহূর্তে তোমার প্রাণনাশ হতে পারতো। তাছাড়া দ্যাখো তো, আঙুলটি সজোরে ঢোকানোর ফলে জীবটি মৃতকল্প হয়ে পড়ে আছে।"

গোবিন্দ সবিনয়ে জানাইলেন,—এ কাজ না করিয়া উপায় ছিল না। সাপটির গলার ভিতরে কাঁটা ফুটিয়া গিয়াছিল, অঙ্গুলী দিয়া উহা বাহির করিয়া না দিলে, কোনো মতেই জীবন রক্ষা হইত না। কণ্টকমুক্ত হইবার পর এখন সে শান্তভাবে পড়িয়া আছে।

জীবের সেবায় গোবিন্দের এরূপ নিষ্ঠা দেখিয়া আচার্য তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শ্রীরঙ্গমে ফিরিবার সময় গোবিন্দকে এবার তিনি সঙ্গে নিয়া যান, এখন হইতে গোবিন্দ তাঁহারই আশ্রমে বাস করিতে থাকেন।

গোবিন্দ নিজের সমগ্র জীবন রামানুজের সেবাপরিচর্যায় নিবেদন করিয়াছেন। এ কাজে তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা দেখিয়া আচার্যের শিষ্যগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। একদিন গোবিন্দকে তাঁহার গুণাবলীর জন্য সকলে খুব প্রশংসা করিতেছেন। তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আপনারা সবাই যা বলছেন তা খুবই ঠিক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার ভেতরকার এসব গুণ সত্যই দুর্লভ, সত্য সত্যই প্রশস্তি পাবার যোগ্য।"

সকলে চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, সেবাযত্নে পটু হইলে কি হয়, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, গোবিন্দের আত্মম্ভরিতা কম নয়। কথাটি সকলে সেদিন রামানুজের কানে তুলিতে ছাড়িলেন না।

গোবিন্দকে সেখানে ডাকানো হইল। আচার্যের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "প্রভু আমার একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। আপনার অপার করুণাতেই আমার সংগুণাবলী স্ফুরিত হয়েছে। স্বভাবতই আমি নিতান্ত হীনমতি, তাই যা কিছু সংপ্রবৃত্তি আমার ভেতর দেখা যায় তা একান্তভাবে আপনারই। তাইতো, আমি এমন প্রকাশ্যে ও অকুণ্ঠভাবে নিজেই আমার এই সব সংগুণ ও সদাচারের প্রশংসা করতে পারি। এ প্রশংসা যে প্রকৃতপক্ষে আমার গুরুরই স্তুতিবাদ।" ভক্তগণ তাঁহার কথা শুনিয়া হতবাক্ হইয়া রহিলেন।

শুদ্ধাভক্তি ও দাস্যভাবের এক জীবন্ত মূর্তি এই গোবিন্দ। সত্বরই রামানুজ স্বয়ং তাঁহাকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। অসামান্য মর্যাদা দান করিয়া এ ভক্তে নামকরণ করিলেন—'মন্নাথ'।

এযাবৎ ভক্তেরা এই নামে একমাত্র রামানুজকেই ডাকিতেন। এবার নূতন ব্যবস্থার বড় গোল বাধিল। দাস্যভাবে ভাবিত পরম বৈষ্ণব গোবিন্দ তাঁহার প্রভুর এ নাম কি করিয়া ব্যবহার করিবেন? তিনি একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। রামানুজকে তখন এক কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। 'মন্নাথ' শব্দটি তামিল প্রতিশব্দ 'এম্‌পেরুমানার' —ইহার প্রথম অংশ 'এম' এবং শেষাংশ 'আর'—এই দুইটি একত্রে সংযোজিত করিলে দাঁড়ায় 'এমার'। অতঃপর এই নামেই গুরু তাঁহার প্রিয় শিষ্য গোবিন্দকে চিহ্নিত করিলেন। উত্তরকালে পুরীধামে যে প্রসিদ্ধ মঠ রামানুজ কর্তৃক স্থাপিত হয় গোবিন্দের নামানুসারেই তিনি উহার নামকরণ করেন। 'এমার-মঠ' নামে উহা পরিচিত হয়।

রামানুজ এই সময়ে শ্রীরঙ্গম মঠে তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া সানন্দে বাস করিতেছেন। দাশরথি, কুরেশ, সুন্দরবাহু, গোষ্ঠিনম্বি, সৌম্যনারায়ণ, যজ্ঞমূর্তি, গোবিন্দ প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে প্রধান। এই সুপণ্ডিত ও পরমত্যাগী ভক্তবীরগণ আচার্য-দেবের মহান্ কর্মের ধারক ও বাহক। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবসমাজে ইঁহারা এ সময়ে 'পীঠাধিপতি' বলিয়া সম্মানিত হইতে থাকেন। বিষ্ণু অর্চনা ও ভক্তিতত্ত্বের প্রচারে ইহাদের উদ্যম উৎসাহের অন্ত ছিল না।

এই প্রতিভাধর শিষ্যদিগকে আচার্য রামানুজ দ্রাবিড় প্রবন্ধমালায় ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, ইঁহাদের মাধ্যমে এই শাস্ত্রনিচয় সমগ্র দক্ষিণ ভারত দ্রাবিড়-বেদরূপে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। যামুনাচার্যের চিতার পাশে দাঁড়াইয়া যে কয়টি সঙ্কল্পবাণী তিনি উচ্চারণ করেন, এই দ্রাবিড়-বেদের প্রচার তাহাদের অন্যতম। আরও একটি সঙ্কল্প তাঁহার ছিল—উহা হইতেছে শ্রীভাষ্য প্রণয়ন। আচার্য এবার এই বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন।

এই মহাভাষ্য রচনার বোধায়ন-বৃত্তির সাহায্য নেওয়া অতি আবশ্যক। কিন্তু এ গ্রন্থ তখনকার দিনে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। সংবাদ পাওয়া গেল কাশ্মীরের সারদাপীঠে উহার একখানি সংরক্ষিত আছে। প্রধান শিষ্য কুরেশসহ অগোণে তিনি কাশ্মীরে উপনীত হইলেন। কিন্তু কাজ বড় সহজ নয়। কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা এই মহাগ্রন্থ ব্যবহার করিতে দিতে রাজী নহেন। তাঁহাকে এড়ানোর জন্য বলা হইল, মন্দিরের গ্রন্থাগারে উহা নাই—কীট দংশনের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ শ্রীরঙ্গম হইতে আচার্য এতদূর পথ এ জন্যেই অতিক্রম করিয়াছেন। তাই তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না।

কথিত আছে, অলৌকিকভাবে রামানুজ এই গ্রন্থ সেদিন লাভ করেন। শ্রান্ত, বিষাদ-খিন্ন আচার্য গভীর রাত্রে শয্যায় শুইয়া আছেন, সহসা সারা কক্ষ স্বর্গীয় আলোকপ্রভায় ভরিয়া উঠে। দেবী সারদা স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হন। হস্তে তাঁহার রহিয়াছে আচার্য বোধায়নের একখণ্ড গ্রন্থ। রামানুজকে তখনি উহা অর্পণ করিয়া দেবী কহিলেন, "বৎস, এ অমূল্য গ্রন্থ এখানে থাকা সত্ত্বেও তোমায় ওরা দিতে চায় নি। তোমার অভীষ্ট সাধনের জন্য এ গ্রন্থ আমি দিয়ে দিলাম। কিন্তু এখনি স্থান ত্যাগ না করলে এ তুমি রাখতে পারবে না।"

কুরেশসহ রামানুজ প্রত্যুষেই দেশের দিকে রওনা হইলেন।

কয়েকদিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সারদাপীঠে এই গ্রন্থের জন্য আলোড়ন পড়িয়া গেল। গ্রন্থাগার হইতে উহা কোথায় নাকি উধাও হইয়াছে। সকলে সন্দেহ করিলেন, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতদ্বয়েরই এই কাজ। কয়েকজন কাশ্মীরী তখনি ঘোড়া ছুটাইয়া রামানুজ ও তাঁহার শিষ্যের পশ্চাদ্ধাবন করে।

পথিমধ্যে আচার্যের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং বলপূর্বক তাহারা গ্রন্থটি ছিনাইয়া আনে।

এ ঘটনায় রামানুজ বড় হতাশ হইয়া পড়িলেন। শ্রীভাষ্য রচনাকে তিনি ঐশনির্দিষ্ট কাজ বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন, অথচ ইহাতে কেন এমনতর বাধা বিঘ্ন আসিয়া পড়িতেছে? পথপ্রান্তে বসিয়া বিষন্ন চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, দেবীর কৃপায় দুষ্প্রাপ্য মহাগ্রন্থ যদিই বা মিলিল আবার তাহা হারাইয়া বসিলেন।

গুরুদেবকে চিন্তিত দেখিয়া কুরেশ করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, আপনি এ নিয়ে একটুও ভাববেন না। এ কয়দিন আমি ঐ বোধায়নবৃত্তিটি পড়বার সুযোগ পেয়েছি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আপনি রাত্রে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হতেন, সেই অবসরে রোজ এ গ্রন্থ আমি পাঠ করতাম। ফলে এর সমস্তটাই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি কয়েকদিনের ভেতরেই সমগ্র গ্রন্থটি আমার স্মৃতি থেকে লিখে ফেলছি।"

দুশ্চিন্তার মেঘ কাটিয়া গেল। প্রতিভাধর শিষ্যকে রামানুজ বার বার আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কুরেশের অসামান্য মেধার বলে বোধায়নবৃত্তির পুনরুদ্ধার ঘটে এবং শ্রীরঙ্গম মঠে ফিরিয়া রামানুজ তাঁহার মহাভাষ্য রচনা সত্বর সমাপ্ত করেন। ইহার পর যে কয়েকখানি অমূল্যগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন তাহা—বেদান্তদীপন, বেদান্তসার, বেদান্তসংগ্রহ ও গীতাভাষ্যম্। আচার্য রামানুজের দার্শনিক মতবাদ এখন হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-রূপে ভারতের সর্বত্র পরিচিত হইয়া উঠে।

শ্রীরঙ্গমে সেদিন গরুড়-মহোৎসব। গরুড়স্কন্ধে সমাসীন রঙ্গনাথজী বাদ্যভাণ্ডসহ সাড়ম্বরে শোভাযাত্রায় বাহির হইয়াছেন। জনতার ভিড়ে পথ অতিক্রম করা কঠিন। আচার্য রামানুজ শিষ্যগণসহ এই রাস্তায় ফিরিতেছেন, সহসা একটি তরুণ ও তরুণীর উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তরুণীটি পরম রূপলাবণ্যবতী। গরুড় যাত্রা দর্শনের জন্য রাজপথে সে উৎসুক হইয়া দণ্ডায়মান। তাহার পাশেই একটি বলিষ্ঠ, সুন্দর সুঠাম যুবা—একহাতে তাহার রহিয়াছে ছত্র, আর এক হাতে একটি পাখা নিয়া তরুণীকে সে ব্যজন করিতেছে। এক মুহূর্তের তরেও সে তাহার চোখ দু'টি রূপসী প্রণয়িনীর আনন হইতে সরাইয়া নিতে রাজী নয়।

এই প্রণয় আতিশয্য জনতার চোখ এড়ায় নাই। অনেকেই নানা উপহাস করিতেছে। যুবকের কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপই নাই।

রামানুজ তখনি তাঁহার এক শিষ্যকে দিয়া ঐ যুবকটিকে নিকটে ডাকাইলেন। কহিলেন, "বৎস, তুমি এই যুবতীর ভেতর এমন কি অমৃতোপম বস্তু পেয়েছো, যার জন্য লজ্জা ভয় ত্যাগে দ্বিধা হয় নি? সবার কাছে এমন উপহাসাস্পদই বা কেন হচ্ছো?"

তরুণ সহজ সরলভাবে উত্তর দিল, "প্রভু, এ পৃথিবীতে যত কিছু সুন্দর ও আনন্দময় বস্তু আছে, আমার কাছে সে সব কিছুর চাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে আমার প্রেমিকার পদ্মের মতো ওই আনন্দনীয় নয়ন দু'টি। আমি বিশ্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে, শুধু ওর চোখ দুটির দিকেই তাকিয়ে থাকতে চাই।"

আচার্যের প্রশ্নের উত্তরে যুবক জানাইল, এ রমণী তাহার বিবাহিত পত্নী নয়। যুবতীর নাম হেমাম্বা, আর তাহার নাম ধনুর্দাস। শ্রীরঙ্গমের কাছেই, নিচুল নগরে যুবকের বাস। এক নিপুণ মল্লবীর বলিয়া এ অঞ্চলে সে বিখ্যাত।

আচার্য বিরক্ত হন নাই, তাহার দিকে তাকাইয়া শুধু প্রসন্নমধুর হাসিতেছেন। এবার ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস ধনুর্দাস, আমি বুঝেছি, তুমি সৌন্দর্যের পূজারী। আচ্ছা, যদি তোমার প্রেমিকার নয়নের চাইতেও সুন্দরতর নয়ন তোমায় দেখাতে পারি, তাহ'লে ? তুমি কি তা এমনিভাবে ভালবাসতে পারবে ?"

ধনুর্দাস প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "প্রভু, আমি জানি, এর চাইতে সুন্দরতর চোখ আপনি আমায় দেখাতে পারবেন না। তা কখনও সম্ভব নয়। যদি সত্যই পারেন আমি কথা দিচ্ছি, এই রমণীর নয়ন ছেড়ে, সেই নয়ন দুটির কাছেই আমি নিজেকে বিকিয়ে দেব।"

কথা রহিল, সায়ংকালে ধনুর্দাস রামানুজের নিকট যাইবে।

যুবকটি কথামতো ঠিক সময় আসিয়া উপস্থিত। যতিরাজ তাহাকে সঙ্গে নিয়া প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার আরতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। চন্দন, ধূপ ও গুগ্‌গুলের সুবাসে মন্দির প্রকোষ্ঠ ভরপুর। কর্পূরের আলোকে উদ্ভাসিত শ্রীবিগ্রহের দেহ হইতে আজ এক অলৌকিক মাধুরীধারা উৎসারিত হইতেছে। আয়ত নয়নপদ্ম দুইটিতে একি অপরূপ সৌন্দর্য ? একি অপার্থিব দ্যুতি ? সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া ধনুর্দাস ভাববিহ্বল, আত্মবিস্মৃত। দুই চোখ বহিয়া কেবলই ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুধারা।

শ্রীবিগ্রহের লোচন-যুগল হইতে যেন অমৃত ক্ষরণ হইতেছে। এমন অনুভূতি ও এমন আকর্ষণ তো কোনোদিনই ধনুর্দাসের হৃদয়ে জাগে নাই ? একি শ্রীরঙ্গনাথের অহৈতুকী কৃপা, না যতিরাজ রামানুজেরই এক অলৌকিক বিভূতিলীলা ? কারণ যাহাই হোক, তরুণ প্রেমিক ধনুর্দাসের জীবনে আসিয়া গিয়াছে পরম লগ্ন। সে আজ কৃতকৃতার্থ। শ্রীরঙ্গনাথের দিব্য নয়নপঙ্কজের অমোঘ আকর্ষণে চিরতরে সে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

ধনুর্দাস পরম দৈন্যভরে সেদিন রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, প্রেমিকা হেমাম্বাকেও আচার্যের চরণাশ্রয়ে টানিয়া আনে।

মঠের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র কুটির নির্মাণ করিয়া প্রেমিক-প্রেমিকা একান্তভাবে সাধন-ভজন শুরু করিয়া দেয়। গুরুভক্তি সরলতা ও নিরভিমানতার গুণে ধনুর্দাস এবং তরুণীটি অচিরে রামানুজের বিশিষ্ট কৃপাপাত্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠে।

আচার্যের এ কৃপাকে কোনো কোনো ব্রাহ্মণ শিষ্য তেমন সুচক্ষে দেখিতে পারেন নাই। রামানুজ ইহা জানিতেন, তাই একবার তিনি এ ব্যাপার নিয়া এক চমৎকার লীলাভিনয় করিলেন।

নিশীথ রাত্রি। মঠের ভক্তগণ গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রামানুজ এই সুযোগে সকলেরই বস্ত্রাঞ্চল হইতে খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া নিলেন।

প্রভাতে উঠিয়াই কিন্তু সাধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল, একে অন্যকে তাঁহারা দোষারোপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামানুজের হস্তক্ষেপের ফলে শান্তি স্থাপিত হইল।

কয়েকদিন পরের কথা। কাজকর্মের শেষে গভীর রাত্রে রামানুজ অনুযোগকারী শিষ্যদের কাছে ডাকাইলেন। কহিলেন, তিনি ভক্ত ধনুর্দাসকে কথাবার্তার ছলে নিজের কাছে বসাইয়া রাখিবেন, তাহারা যেন সেই অবসরে চুপি চুপি ধনুর্দাসের প্রেমিকা হেমাম্বার অঙ্গ হইতে গহনাগুলি খুলিয়া নিয়া আসে। ইহার ফলে সাধক ধনুর্দাস ও তাহার প্রেমিকার কোনো মনোবিকার জন্মে কিনা তাহাও সবাইকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে বলিলেন।

ব্রাহ্মণ ভক্তগণ হেমাম্বার অঙ্গ হইতে আভরণ খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

মঠের সাধুরা অলঙ্কার অপসারণ করিতেছেন, ধরা পাড়য়া পাছে তাঁহারা লজ্জা পান এই ভয়ে হেমাম্বা নিশ্চলভাবে শুইয়া আছে। অঙ্গের এক পাশের গহনা সরানো শেষ হইলে সে ভাবিতে লাগিল, এবার ইঁহাদের কাজে কিছুটা সহায়তা করা দরকার। দেহের অপর দিকে অলঙ্কার খুলিয়া নিতে যাহাতে সুবিধা হয় এজন্য সে পাশ ফিরিয়া শুইল। আচার্যের শিষ্যেরা ভয় পাইলেন, এবার বুঝি হেমাম্বা ঘুম হইতে জাগিয়া পড়ে। তখনি দ্রুতপদে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

ধনুর্দাস কিছুক্ষণ পরেই গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রণয়িনীর সঙ্গে তাহার কি কথাবার্তা হয়, তাহা শুনিবার জন্য রামানুজ-শিষ্যগণ আড়াল হইতে উৎকর্ণ হইয়া আছেন।

হেমাম্বা ধনুর্দাসকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিল, "দেখ, পাশ ফিরে শুয়ে আমি কিন্তু অঙ্গের অপর দিককার অলঙ্কারগুলি তাঁদের দিতে গিয়েছিলাম। অনর্থক ভয় পেয়ে, এগুলো না নিয়েই, তাঁরা পালিয়ে গেলেন। এ আমার মহাদুর্ভাগ্য।"

ধনুর্দাস তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ছি ছি, কেন তুমি পাশ ফিরে শুতে গেলে? ঘোর অন্যায় তুমি আজ করেছ। তোমার আত্মাভিমান কি এখনো যাচ্ছে না? 'আমার অঙ্গ, আমার আভরণ আমি দান করবো।'—এ সব দুর্বুদ্ধি তোমার এখনো রয়েছে কেন? বিষয়বিষ্ঠা ও কাঞ্চন বহনের ভার থেকে নিষ্কৃতি পাবার মহা-সুযোগ তুমি পেয়েছিলে। কিন্তু নিজ দোষে আজ তা হারালে। অলঙ্কার চুরির সময় তোমার উচিত ছিল—ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকা। তাহলে অপহরণকারী সাধুরা তোমায় নিদ্রামগ্ন জেনে কত সহজে সেগুলি নিয়ে যেতে পারতেন। তোমার দেহাত্ম-বুদ্ধি এখনো যায় নি, তাইতো এই বিপদ।"

হেমাম্বা নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়াছে। কাঁদিয়া কহিল, "প্রিয়তম, তুমি ঠিক কথাই তো বলেছ। ভগবান্ আমায় কৃপা করুন, আজকের মতো এমনতর অহংভাব যেন আমার অন্তরে আর কখনো প্রবেশ না করে।"

এই কথোপকথন শুনিয়া আড়ালস্থিত রামানুজ-শিষ্যদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অতঃপর তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে আচার্য তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করার গোপন তথ্যটি ফাঁস করিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ সাধক হয়েও সেদিন তোমরা সামান্য কাপড় ছেঁড়ার জন্য ঝগড়া শুরু করেছিলে। আর দ্যাখো, ধনুর্দাস ও হেমাম্বা তাদের সর্বস্ব হারাতে না পেরে মনস্তাপে পুড়ে মরছে? প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ সাধকের আচরণ কাদের, এবার বিচার করো।"

শিষ্যদের চিত্তশুদ্ধির জন্য রামানুজের দৃষ্টি এমনভাবে সতত সজাগ ও সতর্ক থাকিত, আর প্রকৃত ভক্তের মূল্য নিরূপণের জন্য এমনতর ছিল তাঁহার বিচারপদ্ধতি।

চোল রাজ্যের অধীশ্বর কৃমিকণ্ঠ ছিলেন শৈব। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলিয়া তাঁহার বড় কুখ্যাতি ছিল। সমগ্র রাজ্যে নিজের ধর্মমত তিনি জোর করিয়া চালাইতে চাহিলেন। তাঁহার স্তাবক সভাসদ্ ও শৈব আচার্যদের উস্কানিতে এ গোঁড়ামি আরো বাড়িয়া যায়। বিষ্ণু উপাসক রামানুজের বিরাট প্রতিষ্ঠা ক্রমে চোলরাজের অসহ্য হইয়া উঠে। ভাবিতে থাকেন, এই বৈষ্ণব আচার্যকে দূর না করিতে পারিলে শৈবমত কোনোদিন প্রাধান্য অর্জন করিতে পারিবে না।

রাজধানী কাঞ্চীনগর হইতে চোলরাজ সেদিন রামানুজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রীরঙ্গম মঠের ভক্তগণ আতঙ্কে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেরই আশঙ্কা, আচার্যকে ছলে বলে হত্যা করাই এই বিষ্ণুদ্বেষী রাজার অভিসন্ধি।

ভক্ত-প্রধান কুরেশ বলিয়া উঠিলেন, "গুরুদেব, কোনোমতেই আমরা আপনাকে এই নিশ্চিত অপমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারবো না। আপনি বেঁচে থাকলে ধর্ম ও সমাজ রক্ষা পাবে। শুধু তা-ই নয়, আপনি ছাড়া এই সংসারতাপদগ্ধ জীবের পরমাশ্রয় আর কে আছে? জীবকল্যাণের জন্যই আপনাকে বাঁচতে হবে। অত্যাচারী রাজার সামনে বরং আমিই উপস্থিত হব। আপনার বাবার বস্ত্রটি প'রে গিয়ে রামানুজ ব'লে আমি নিজের পরিচয় সেখানে দেব—এ অনুমতি ভিক্ষা আজ আপনার কাছে আমি চাচ্ছি। আমার একান্ত মিনতি, এখানকার সব শিষ্যদের নিয়ে আপনি শ্রীরঙ্গম মঠ ত্যাগ করুন এখনি দূর বনাঞ্চলে কোথাও চলে যান।"

সকলের নির্বন্ধাতিশয্যে রামানুজকে সেদিন এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইল, সবলকে নিয়া তিনি অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

এদিকে শিষ্য কুরেশ রাজসভায় গিয়া উপস্থিত। চোলরাজ তাঁহাকেই রামানুজ বলিয়া ধরিয়া লইলেন। সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "এই দুর্বৃত্তের উপযুক্ত দণ্ড মৃত্যু। কিন্তু এক সময়ে এ আমার বোনকে দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। তাই প্রাণ সংহার না ক'রে আমি এর দণ্ডবিধান করলাম,—চির অন্ধত্ব। চোখ দুটো তোমরা এখনি শলাকা বিদ্ধ ক'রে নষ্ট করো।"

কুরেশের আনন্দের সীমা নাই, নিজের চোখ দুটির পরিবর্তে গুরুদেবের জীবন রক্ষা তিনি করিতে পারিবেন? ভাবিলেন, ইন্দ্রিয় সুখভোগের স্পৃহা তো অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়াই গিয়াছে। এবার এ চক্ষু না থাকিলেই বা ক্ষতি কি?

দণ্ডাদেশ পালিত হইল। কুরেশ রাজা ও সভাসদ্‌দের ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, তোমরাই আমার প্রকৃত বন্ধু। জীবদেহের নয়ন জৈব বস্তু। পরমপুরুষের সম্মুখে তা পৌঁছায় না—বরং মায়াময় প্রপঞ্চের দিকেই সতত টেনে রাখে। এ হচ্ছে মানুষের পরম শত্রু। এ শত্রুর হাত থেকে তোমরা আমায় বাঁচিয়ে—প্রকৃত বন্ধুর কাজই আজ করেছ। শ্রীরঙ্গনাথ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

অন্ধ কুরেশ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া গেলেন। ইহার অল্পকাল পরেই শোনা গেল, অত্যাচারী চোলরাজ এক উৎকট রোগ যন্ত্রণায় ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

উত্তরজীবনে গুরুর কৃপায় পরমত্যাগী কুরেশের অন্ধত্ব অলৌকিকভাবে ঘুচিয়া যায়। আচার্য রামানুজ তখন কিছুকালের জন্য যাদবাদ্রি নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। কুরেশ সেখানে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রিয়তম শিষ্যকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রামানুজ পুলকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "বৎস, তুমি শ্রীবরদরাজের নিকট নিজের নয়ন দুটি একবার ভিক্ষা চাও, অচিরে এ ধন তুমি ফিরে পাবে।"

গুরুর নির্দেশে কুরেশ কাঞ্চীতে গিয়া বরদরাজের নন্দিরদ্বারে উপনীত হন। কিন্তু শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সেদিন যাহা তিনি প্রার্থনা করিলেন, তাহা বিস্ময়কর। রাজার আদেশে যে ব্যক্তি তাহার চক্ষু বিনষ্ট করিয়াছিল তাহার কল্যাণ, তাহার গ্রামের কল্যাণই তিনি চাহিয়া বসিলেন।

পরমভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া প্রভু বরদরাজ সহাস্যে কহিয়া গেলেন, 'তথাস্তু'।

রামানুজের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল। তিনি কুরেশকে বলিয়া পাঠাইলেন, "বৎস, তোমার উদার শুভবুদ্ধির কথা আমি শুনেছি, পরার্থে এ প্রার্থনা ক'রে তুমি নিজে আনন্দ লাভ করেছ সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ভেতরে নিজ স্বার্থটি দেখার ভাবই বর্তমান রয়েছে। এবার তুমি নিজের বদলে আমাকে—তোমার গুরুকে—আনন্দ দান করো না কেন? তুমি নয়ন ফিরে পেলে, আমার যে পরম আনন্দ। তুমি কি জানো না যে, তুমি, তোমার শরীর ও মন—এ সমস্তই আমার, তোমার কিছুই নয়?"

ভক্ত কুরেশ এ কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "এবার আমি কৃতার্থ। যতিরাজ আমার মতো মহাবিষয়ীকে অঙ্গীকার করেছেন। এবার আমি শ্রীবরদরাজের কাছে নয়ন ভিক্ষা অবশ্যই চাইব।" কথিত আছে, বরদরাজের কৃপায় কুরেশ তাঁহার চক্ষু দুইটি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

একবার যাদবাদ্রিতে (বর্তমানের মেলকোটা) ভ্রমণকালে রামানুজ বল্মীকস্তূপ হইতে যাদবাদ্রিপতির একটি পুরাতন শিলাময় বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। শাস্ত্রীয় প্রথামতো ইহার সংস্কার ও অভিষেক সম্পন্ন হয় এবং পূজাও পুনরায় প্রবর্তিত হয়।

এই বিগ্রহ একদিন তাঁহাকে স্বপ্নযোগে কহিলেন, "বৎস রামানুজ, তুমি আমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে ভালই করেছ, কিন্তু আমার একটি প্রতীক বিগ্রহ আছে, তার নাম—সম্পৎকুমার। সেটি স্থানচ্যুত হয়ে দূরে চলে গিয়েছে। এই প্রতীকের মাধ্যমেই আমি মন্দিরের বাইরে শুভযাত্রা ক'রে থাকি। আমার উৎসবাদি একেই কেন্দ্র ক'রে উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিগ্রহটি রয়েছে দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের অন্তঃপুরে। তাকে তুমি সত্বর আনয়ন করো।"

কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিষ্যসহ রামানুজ অচিরেই দিল্লীতে উপনীত হন। এই দিব্যকান্তি মহাপুরুষের দর্শনলাভ ও তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের পর সম্রাট্ আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। আচার্য তাঁহার নিকট লুণ্ঠিত শিলাবিগ্রহটি চাহিতে আসিয়াছেন শুনিয়া তখনই তিনি উহা ফিরিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

বিগ্রহটি কিন্তু ইতিমধ্যে সম্রাট্‌নন্দিনী লছিমারের বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সর্বদা নানা বেশভূষায় সাজাইয়া তিনি ইঁহার সেবাযত্ন করেন। লছিমার তখন ছিলেন দিল্লীর বাহিরে। তাঁহার অবর্তমানেই সম্রাট্ সেদিন রামানুজকে ইহা ফেরত দিয়া দেন।

পরের দিন রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া লছিমার মহা অনর্থ বাধাইয়া তুলিলেন। এই বিগ্রহ যে তাঁহার প্রাণস্বরূপ। যেভাবেই হোক এখন এটি ফিরিয়া আনিতে হইবে। বার বার অশ্রুসজল চক্ষে পিতাকে তিনি মিনতি করিতে লাগিলেন।

সম্রাটের আদেশে একদল অশ্বারোহী সৈনিক তখনি রামানুজের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরিত হয়। সম্রাট্ দুহিতা লছিমার ও তাঁহার প্রণয়ী কুবেরও এই উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে অগ্রসর হন।

রামানুজ কিন্তু এই বিপদের সম্ভাবনা টের পাইয়াছিলেন। তাই দ্রুতবেগে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াই তিনি যাদবাদ্রিপতির ঐ দ্বিতীয় বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইতিমধ্যে লছিমারও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বিষ্ণু বিগ্রহের প্রতি এই মুসলমান তরুণীর অসামান্য প্রেমভক্তি দর্শনে রামানুজ মুগ্ধ হন, মন্দিরাস্থিত শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে যাইতে তাঁহাকে

সানন্দে অনুমতি দেন। দাক্ষিণাত্যে জনশ্রুতি আছে, ভক্তিমতী লছিমারের দেহ শ্রীসম্পৎ-কুমার বিগ্রহের মধ্যে সেদিন লীন হইয়া যায়। তাঁহার প্রণয়ী কুবেরও নাকি এই সময়ে স্বপ্নাদেশ পাইয়া নীলাচলে গমন করেন এবং অচিরে এক সার্থক বৈষ্ণব সাধকরূপে তিনি রূপান্তরিত হন।

পবিত্রতীর্থ শ্রীশৈলে (তিরুপতি) অবস্থান করার জন্য রামানুজ একবার তাঁহার প্রিয় শিষ্য অনন্তাচার্যকে আদেশ করেন। শিষ্য তখনি গুরু সান্নিধ্যের আকর্ষণ ছাড়িয়া সেখানে চলিয়া যান এবং সস্ত্রীক ঈশ্বর আরাধনায় রত হন।

সে অঞ্চলে তখন বড় জলাভাব। লোকের দুর্দশা দেখিয়া অনন্তাচার্য সঙ্কল্প করিলেন, জলের সুবিধার জন্য তিনি স্বহস্তেই এক সরোবর খনন করিবেন। এ কার্যকে তিনি তাঁহার সাধনা ও ভগবৎ কর্মেরই এক অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া নিলেন।

অনন্তাচার্য নিজে রোজ কোদাল দিয়া মাটি কাটেন, আর তাঁহার স্ত্রী মাটির ঝুড়ি মাথায় বহিয়া নিয়া যান। এমনি করিয়া বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতেছে।

ইতিমধ্যে এক সময় আচার্যের স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা হইয়া পড়িয়াছেন। মৃত্তিকার বোঝা বহিতে আজকাল তাঁহার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু উপায় নাই, ভক্ত দম্পতিকে খনন চালাইতেই হইবে।

সেদিন আচার্যপত্নী বড় বেশী ক্লান্তবোধ করিতেছেন। মৃত্তিকার বোঝা বহন করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিলেন। অদূরেই প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষ শাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শ্রান্তদেহে উহার ছায়াতলে তিনি বিশ্রাম করিতে বসিলেন, কখন যে নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন, হুঁশ রহিল না।

এদিকে অনন্তাচার্য কিন্তু দেখিতেছেন, পত্নী পূর্ববৎ মৃত্তিকা বহন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আগেকার সে মন্থর গতি তো নাই, বরং একটু বেশী কর্মতৎপরতাই দেখা যাইতেছে।

প্রশ্ন করিলেন, "ব্রাহ্মণী, একি অদ্ভুত কাণ্ড। তোমার কর্মক্ষমতা কি ক'রে আজ হঠাৎ এমন বেড়ে গেল ?"

কর্মরতা নারীমূর্তি বোঝা মাথায় নিয়া শুধু এক রহস্যময় হাসি ছড়াইয়া চলিয়া গেল।

এ আবার কি ব্যাপার। আচার্য তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া আসিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, স্ত্রী ক্লান্ত দেহে গভীর নিদ্রায় অভিভূতা, বৃক্ষতলে এলাইয়া পড়িয়া আছেন।

স্ত্রীকে তখনি তিনি জাগাইয়া তুলিলেন, তারপরই ছুটিয়া গিয়া মৃদুহাস্যময়ী অপর নারী মূর্তিটির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। সরোষে কহিলেন, "মায়াবী, একি তোমার নিষ্ঠুর লীলা। আমরা দুজন অতি নগণ্য কিঙ্কর কিঙ্করী। তোমার দাস্য ও সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেছি। সে সৌভাগ্যটুকুও তুমি আজ হরণ করতে এসেছ ? তা তো হতে দিতে পারিনে, প্রভু।"

মধুর হাসি হাসিয়া রহস্যময়ী নারী মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দম্পতির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—পরম রসোজ্জ্বল শ্রীবিষ্ণুমূর্তি। উভয়কে আশীর্বাদ জানাইয়া নিমেষে প্রভু আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

রামানুজ-শিষ্যের খনিত জলাশয়টি আজিও তিরুপতিতে দেখা যায়। অনন্ত সরোবর নামে ইহা পরিচিত। বহু পুণ্যকামী নরনারী এ সরোবরের পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া ধন্য হন।

সে-বার এক মুমুক্ষু ব্রাহ্মণ আচার্য রামানুজের শরণ নিয়া কহিলেন, "প্রভু, আমি আপনার দাস হয়ে একান্তভাবে চরণসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাই। শুধু এর ফলেই আমার সাধনজীবন শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে উঠবে ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি লোক-গুরু, পতিতপাবন—আমায় আপনি কৃপা করুন।"

স্মিতহাস্যে রামানুজ কহিলেন, "বিপ্রবর, দাস্য ও সেবা দ্বারাই মানুষ শুদ্ধবুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। এ সিদ্ধান্ত আমার ঠিকই হয়েছে। কিন্তু আমার এখানে এই দাস্য-সাধনা করতে হলে আপনাকে যা করতে হবে, তাতে কি রাজী হবেন?"

ব্রাহ্মণ ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "প্রভু, আপনি আদেশ প্রদান করুন, এই মুহূর্তে তা পালন করবো।"

আচার্য বলিতে লাগিলেন, "বিপ্রবর, আমি কিন্তু আজ থেকে সংকল্প করেছি, প্রতিদিন বিষ্ণু-আরাধনার আগে ভুবনপাবন ব্রাহ্মণ-পাদোদক পান করবো। আমার মহা সৌভাগ্য, আপনার মতো পবিত্র হৃদয় ব্রাহ্মণ আমার সম্মুখে আজ উপস্থিত। আপনাকে এই মঠে অবস্থান ক'রে রোজ আমায় পাদোদক দান করতে হবে। জানবেন, এতেই করা হবে আমার প্রকৃত সেবা। আমার ভৃত্য হতে চেয়েছিলেন, রোজ এই পাদোদক দানই হবে সেই ভৃত্যের কাজ?"

দাস্যভাবে বিভাবিত সরল ব্রাহ্মণ এই কাজই শুরু করিলেন। তাঁহার নিত্যকার কর্তব্য হইল ভগবৎ-আরাধনার আগে দেশপূজ্য আচার্যকে নিজের চরণধৌত জল প্রদান করা। অটুট নিষ্ঠায় এ কাজ তিনি করিয়া যাইতে থাকেন।

সেদিন রামানুজ এক বিশেষ পুণ্যযোগে কাবেরী তটে গিয়াছেন। স্নান তর্পণ ও পূজা অর্চনায় সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। রাত্রিতেও ভক্তদের নিয়া ধর্মপ্রসঙ্গে কম সময় অতিবাহিত হইল না। সেদিন গভীর রাত্রিতে মঠে ফিরিয়া তিনি দেখেন, তাঁহার পাদোদক-দাতা ব্রাহ্মণ নিত্যকার নির্দিষ্ট স্থানটিতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। কিঙ্করের পদস্পৃষ্ট জল প্রভু রামানুজ ভোর হইতে গ্রহণ করেন নাই, তাই তিনিও সে স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

রামানুজ তাঁহার এ সেবা-পরকাষ্ঠা দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সেবক ব্রাহ্মণের পাদোদক নিজে বার বার পান তো করিলেনই, শিষ্যদেরও গ্রহণ করাইতে ছাড়িলেন না। আচার্য নিজ শিষ্যদের সাধনসত্তায় দাস্যসেবার মাহাত্ম্যটি এমনিভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন।

দীর্ঘ এক শত ত্রিশ বৎসর কাল আচার্য রামানুজ বাঁচিয়া যান। যামুনাচার্যের অভিলষিত কর্মসূচী ইতিমধ্যে তিনি রূপায়িত করিয়াছেন। এই শক্তিধর মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া সারা দাক্ষিণাত্যে সেদিন এক বিরাট বিষ্ণুসেবী সাধকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। ত্যাগ তিতিক্ষা, শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈষ্ণবীয় দৈন্যে ইঁহাদের তুলনা বিরল। সমগ্র ভারতের দিকে দিকে এই রামানুজ-পন্থীদের আদর্শ ও প্রভাব সে সময়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রিয়তম শিষ্য কুরেশ ইতিমধ্যে মরজীবন সাঙ্গ করিয়া পরমপদে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভাধর তরুণ পুত্র পরাশর এখন মণ্ডলীপতি। রামানুজের আশীর্বাদ-ধন্য হইয়া বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নেতৃত্ব এবার তিনিই গ্রহণ করিলেন।

রামানুজ এ সময় অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ তাই একদিন

মিনতি করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আপনি হয়তো যে কোনো দিন এই মর্তলীলায় ছেদ টেনে দেবেন, কিন্তু আপনার দিব্য মূর্তির বিয়োগব্যথা আমরা কি ক'রে সহ্য করবো? কৃপা ক'রে আপনি এর একটা ব্যবস্থা করুন।"

শিষ্য ও ভক্তদের মিনতিতে আচার্যদেব বিগলিত হইলেন। তাঁহার সম্মতি নিয়া এক সুনিপুণ ভাস্করকে ডাকিয়া আনা হইল, নির্মিত হইল শ্রীরামানুজের এক শিলাময় প্রতিমূর্তি। আচার্য নিজেই এ মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

গুরুদেবের জীবন্ত দেহের প্রতিরূপ—তাঁহার জীবিতকালে গঠিত এই ভাস্কর্য এক পরম পবিত্র বস্তু। এটি পাইয়া ভক্তদের আনন্দের সীমা রহিল না।

এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পরেই আচার্য রামানুজের লীলানাট্যের উপর যবনিকাটি নামিয়া আসে। ১০৫৯ শকাব্দে (খ্রীঃ অঃ ১১৩৭) মাঘী শুক্লা দশমীতে অধ্যাত্মগগনের এই মহাজ্যোতিষ্ক লোকলোচনের অন্তরালে নিজেকে অপসৃত করিয়া নেন।

মধুসূদন সরস্বতী

ষোড়শ শতাব্দীব দ্বিতীয পাদেব কথা। দক্ষিণ বাংলাব চন্দ্রদ্বীপে, বর্তমানেব ববিশাল অঞ্চলে, তখন স্বাধীন বাজা কন্দপনাবাযণেব শাসন চলিতেছে। দিল্লীব সেনাবাহিনী ও রাজা মানসিংহেব প্রতাপে সাবা বাংলা সে সমযে ভীত সন্ত্রস্ত। আসন্ন মুঘল ঝটিকাব সম্মুখে এই ক্ষুদ্র হিন্দু বাজ্যটি সেদিন কাঁপিতেছে এক ক্ষীণ দীপশিখাব মতো।

দক্ষিণ বাংলাব নদীনালাব প্রাকৃতিক গড়খাই-এব মধ্যে বসিযা বাজা কন্দর্পনাবাযণ কোনোমতে স্বাধীনতা বক্ষা কবিতেছেন। বাজ্য তাঁহাব ক্ষুদ্র, কিন্তু বাজধানী কচুযাতে বাজগৌবব ও জাঁকজমকেব অন্ত নাই। বিদ্যোৎসাহী ও বদান্য বলিযা চন্দ্রদ্বীপবাজেব খ্যাতিও চাবিদিকে যথেষ্ট। বহু লোকেব তিনি আশ্রয ও আশা ভবসাস্থল। তাই তাঁহাব বাজসভা ঘিবিযা প্রার্থী, আশ্রিত ও জ্ঞানী-গুণীব ভিড় সর্বদা লাগিযাই বহিযাছে। ইহাদেব মধ্যে বিশেষ কবিযা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কবি ও বিদগ্ধজনেব প্রতি গুণগ্রাহী কন্দর্পনাবাযণ সদা মুক্তহস্ত।

কোটালিপাড়াব উনসিযা গ্রামেব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রমোদন পুবন্দবাচার্য সেদিন চন্দ্রদ্বীপেব রাজসভায উপস্থিত হইযাছেন। কবি ও শাস্ত্রবিদ্‌রূপে এই প্রবীণ আচার্যের খ্যাতিব সীমা নাই। বাজা সোৎসাহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কবিলেন।

পুবন্দবাচার্যেব সঙ্গে তাঁহাব বালক পুত্র মধুসূদনও এবাব বাজসভায আসিযাছে।

পুত্রেব সম্বন্ধে আচার্য কিন্তু বড় সচেতন। অসামান্য প্রতিভাধব এই বালক, তাই তাহাব প্রশংসাব বর্ণনায পিতাব আগ্রহ ও উৎসাহেব অবধি থাকে না। সুবিধা পাইলেই তিনি পুত্রগৌবব ঘোষণা কবিযা বসেন। বালককে সম্মুখে আগাইযা দিযা পুবন্দর স্মিতহাস্যে কহিলেন, "মহাবাজ, এটি হচ্ছে আমাব পুত্র শ্রীমান্ মধুসূদন। বযস সবেমাত্র বাবো বৎসব হ'লেও কাব্যবচনা ও শাস্ত্র-জ্ঞানেব দিক দিযে সত্যই এ অসাধাবণ। সাত আট বৎসব বযস থেকেই এব প্রতিভা খ্যাতনামা পণ্ডিতদেব কাছে বিস্মযেব বস্তু হযে আছে। মধুসূদনেব বচনা আপনি কিছুটা শ্রবণ করুন।"

কন্দর্পনাবাযণ প্রসন্ন হাসি হাসিযা উত্তব দিলেন, "আজ্ঞে, তা বেশ বেশ। বালকের কবিতা অবশ্যই শোনা যাবে। আপনাবা দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'বে এসেছেন, আজ বিশ্রাম করুন। পবে অবসব মতো আমবা কাব্যচর্চাব জন্য মিলিত হবো।"

আচার্য এ অবসবে আবেকটি প্রার্থনাও বাজসমীপে নিবেদন কবিতে ভুলিলেন না। স্বগ্রামে যে ভূসম্পত্তি তিনি ভোগ কবেন তাহা চন্দ্রদ্বীপবাজেব অধিকাবভুক্ত। জমিতে বড বড আমেব বাগান বহিযাছে। পুবন্দবাচার্যেব সুবিধাব জন্য বাজা তাঁহাব নিকট হইতে বাজস্ব হিসাবে ধান্য অথবা অর্থাদি নেন না। প্রতি বৎসব তিনি এ হিসাবে এক নৌকা আম্রফল কব-রূপে গ্রহণ কবেন। বিদ্যোৎসাহী বাজাব অনুবোধে এই ফল-কব লইযা আচার্য নিজেই আসেন। এই উপলক্ষে সুকবি ও শাস্ত্রবিশাবদ পুবন্দবেব সঙ্গ লাভে বাজা ও তাঁহাব অমাত্যদেব আনন্দেব সীমা থাকে না। এ সাক্ষাৎকে তাঁহাবা এক পবম সৌভাগ্য মনে কবেন। আচার্য কিন্তু আজকাল বড বৃদ্ধ হইযা পড়িযাছেন, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া রাজসভায় আসা সামর্থ্যে আব কুলায না। তাই এবার রাজার নিকট

নিবেদন করিলেন, এখন হইতে তিনি নিজে না আসিয়া কোটালিপাড়ার সরকারী কর্মচারীর কাছেই ফল-কর জমা দিবেন।

আবেদনটি কিন্তু কন্দর্পনারায়ণের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন, "সে কি কথা আচার্যদেব? এ উপলক্ষে তবুও রাজধানীতে একবার ক'রে আপনার পদার্পণ ঘটে—রাজসভায় আনন্দের তরঙ্গ ওঠে। যতদিন একেবারে অশক্ত না হবেন, দয়া ক'রে দর্শন দানে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।"

এই সুযোগে পুরন্দর আবার রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ। আমার পুত্র মধুসূদনের প্রতিভার পরিচয় কিন্তু এখনো আপনাকে দেওয়া হয় নি। আপনার সভায় আমার পরিবর্তে বরং প্রতি বৎসর সে-ই আসতে পারবে। একবার তার রচিত রসমধুর পদগুলি শুনবেন কি?"

প্রতিভাধর বালক পুত্র যাহাতে রাজসভায় অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা পায় আর নিজেকেও প্রতি বৎসর কষ্ট করিয়া আসিতে না হয়, একথাই পণ্ডিত ভাবিতেছিলেন।

"বেশ তো, বেশ তো। অবসর মতো সময়ান্তরে আপনার ও বালকের কাব্য আমরা সকলে মিলে উপভোগ করবো।" এ কথা বলিয়াই রাজা সেদিন তাড়াতাড়ি সভা ত্যাগ করিলেন।

সকলের সহিত সম্ভাষণাদির পর আচার্য তাঁহার পুত্রসহ রাজার অতিথিভবনে গমন করিলেন। কিন্তু রাজা কন্দর্পনারায়ণকে ধরা তাঁহার পক্ষে এবার যেন বড় কঠিন হইয়া পড়িল। কয়েকদিন অবিরত চেষ্টার পর পণ্ডিত অবশেষে রাজদর্শনের সুযোগ পাইলেন। বালক মধুসূদনের নিজস্ব সদ্যরচিত চমৎকার কিছু শ্লোক কন্দর্পনারায়ণকে শোনানোও হইল। কিন্তু রাজা যেন বড় উন্মনস্ক, বড় উদাসীন। মধুসূদনের কয়েকটি প্রতিভাদীপ্ত কবিতা শুনিয়া তিনি সামান্য কিছু মৌখিক প্রশংসা প্রকাশ করিলেন। তারপর দ্রুতপদে কোথায় কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

অভিমানাহত পুরন্দর ভাবিতে লাগিলেন, এমনতর অমনোযোগ ও উপেক্ষা তো কখনো তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নাই? রাজার বিদ্যোৎসাহ কি আজকাল স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, না ইহা আচার্যের নিজেরই গ্রহ-বৈগুণ্যের ফল। আসল কথাটি কিন্তু অন্যরূপ। কন্দর্পনারায়ণ তখন এক আসন্ন রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখে দাঁড়াইয়াছেন। মুঘলশক্তি তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে পরিবেষ্টন করিতে অগ্রসর হইতেছে, সেই জন্যই সম্প্রতি তিনি বড় চিন্তাকুল। কাব্য-সাহিত্য, শাস্ত্রের আলোচনা বা সুধী-সজ্জনের সঙ্গ তাই তাঁহার কাছে নীরস হইয়া উঠিয়াছে।

অতিথি ভবনে বাস করিয়া পুরন্দরাচার্য আরও দুই চারিবার চেষ্টা করিলেন, রাজাকে তাঁহার অবসর মতো ধরা যায় কিনা। পুত্রের কাব্যপ্রতিভার মূল্য তাঁহাকে বুঝাইয়া তবে তিনি ঘরে ফিরিবেন। কিন্তু পরবর্তী চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু রাজার তখন বড় সময়াভাব, পণ্ডিতের সহিত কোনো কথাবার্তাই তিনি বলিলেন না। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ পুরন্দরাচার্য অগত্যা বাড়ি ফিরিবার জন্য পুত্রসহ নৌকায় আরোহণ করিলেন। কোটালিপাড়ায় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করিয়া তিনি রাজদর্শনে আসিয়াছেন—এখন সত্বর স্বগ্রামে না পৌঁছিলে নয়।

নৌকা চলিতেছে। সৌম্যদর্শন বালক মধুসূদন ছই-এর নিচে নীরবে উপবিষ্ট। বর্ষার জলস্রোতে নদী নালা মাঠ-ঘাট সমস্ত কিছু পরিপ্লাবিত। কখনো খাল-বিলের পথে,

কখনোও বা বাঁশঝাড়ের ভিড় ও ধানক্ষেত ঠেলিয়া নৌকা অগ্রসর হইয়া চলে। মাঝে মাঝে অতর্কিতে দেখা দেয় মাছরাঙা আর পানকৌড়ির দল। ঘন সবুজ গঙ্গা-ফড়িঙের দল ঝাঁকে ঝাঁকে ধানের শিষ ছাড়িয়া নৌকায় উঠিয়া লাফাইতে থাকে। কৌতূহলের এসব কোনো বস্তুই কিন্তু আজ বালক মধুসূদনের মনে দোলা দেয় না। মৌন, বিক্ষুব্ধ বালকের দৃষ্টি শুধু নিঃসীম আকাশের বিস্তারে স্থির নিবদ্ধ।

হঠাৎ মধুসূদন পিতার চরণ ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিলেন। ব্যর্থতার গ্লানি অন্তরে চাপিয়া বৃদ্ধ পুরন্দরাচার্য এতক্ষণ যাবৎ চুপ করিয়াই বসিয়া ছিলেন। পুত্র তাঁহাকে ডাকিয়া শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "বাবা, আমি সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে ফেলেছি, আর আমি গৃহে যাবো না। আপনি একলাই আজ দেশে ফিরে যান। আমি ভেবে দেখলাম, মানুষের আরাধনা না ক'রে ভগবানের আরাধনাই এবার থেকে একান্তভাবে করবো। রাজপ্রসাদ অপেক্ষা দেবতার প্রসাদকেই আমার উপজীব্য আমি করতে চাই। রাজার এই তাচ্ছিল্য কেবল নিজেরই অপমান নয়, আমার পিতারও অপমান হয়ে বুকে বেজেছে। সমগ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজ ও বিদ্যাবত্তার মর্যাদা এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শুধু তাই নয়—এ আমাদের দেশের শাস্ত্র ও ধর্মসংস্কৃতির অপমান, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অপমান।" তেজোদৃপ্ত, অভিমানহত বালকের অধরোষ্ঠ তখন রোষে কম্পিত হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে দৃঢ়কণ্ঠে বালক মধুসূদন আবার কহিলেন, "বাবা, আমি মনে মনে সঙ্কল্প ঠিক করেছি, অবিলম্বে সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নেব। শাস্ত্রে রয়েছে, আপনার মুখেও শুনেছি, ভক্তের ভার ভগবানই বহন করেন। আশীর্বাদ করুন—এখন থেকে একমাত্র ভগবৎ-প্রসাদের উপর নির্ভর ক'রেই আমি যেন চলতে সক্ষম হই। শুনেছি, নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হয়েছে। আমি তাঁরই চরণে শরণ নেব ব'লে ঠিক করেছি। আপনি কৃপা ক'রে আজ আমায় গৃহত্যাগের অনুমতি দিন।"

বৃদ্ধ পুরন্দরাচার্যের মুখে কথা সরিতেছে না। বার বৎসরের ক্ষুদ্র বালক আজ এ কি প্রস্তাব করিতেছে? যুক্তি তাহার অকাট্য। রাজানুগ্রহ অপেক্ষা রাজার রাজা শ্রীভগবানের প্রসাদ যে বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা তো অস্বীকার করার যো নেই। এই শ্রেয়ের পথ যে তিনি নিজেই আজীবন খুঁজিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও মায়ার বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াও যে অভিলাষ তিনি পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই, তাহার বালক পুত্র আজ উহা সাধনা করিতে প্রস্তুত।

মিনতিভরা কণ্ঠে মধুসূদন বার বার পিতার কাছে তাঁহার সম্মতি ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। আচার্য পুরন্দরের মুখ দিয়া অতর্কিতে বাহির হইল, 'বেশ তো বাবা, তাই হবে। আশীর্বাদ করি, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হোক। তোমার শ্রেয়ের পথে আমি বাধা জন্মাবো না। তবে একটা কথা—তুমি আজই এখান থেকে চলে যেয়ো না। আগে বাড়ি ফিরে চল, সেখানে তোমার জননী রয়েছেন। তাঁর সম্মতিও তো নেওয়া দরকার।" বৃদ্ধ পিতার নয়নে তখন অশ্রুর রেখা চক্‌চক্ করিয়া উঠিয়াছে। মধুসূদন তাঁর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে শুধু কহিলেন "বাবা তবে সত্যই আপনার সম্মতি পেলাম। আজ আমার জীবন ধন্য।"

গৃহে উপনীত হইবার পর মধুসূদন জননীর চরণে নিপতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে তিনি ধরিয়া বসিলেন, 'মা, আমার একটি ভিক্ষা চাইবার আছে। আগে আমায় কথা দাও, তুমি তা আমায় দেবে।"

"বল্ বাবা, তুই কি চাস্? তোকে আমার অদেয় কি আছে? যা চাইবি তা দেব বৈকি।"

মধুসূদন যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন, মাকে আজ অনুমতি দিতেই হইবে।

জননীর মাথায় এ যেন এক অতর্কিত বজ্রপাত। ক্রন্দনে, বিলাপে তিনি গৃহ অঙ্গন মুখরিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তাঁহার দেওয়া আশ্বাসের সুযোগে বালক মধুসূদন প্রার্থিত অনুমতিটি আজ পাইয়া গেলেন।

অতঃপর ক্রন্দনরতা জননীকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি কহিলেন, "মা, তুমি অধীর হয়ো না। আমি গৃহ ত্যাগ ক'রে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিনে। শুনেছি, নবদ্বীপধামে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ আজ সাঙ্গোপাঙ্গসহ অবতীর্ণ। আমি সন্ন্যাসী হয়ে তাঁরই চরণতলে জীবন কাটাবো স্থির করেছি। নবদ্বীপ আর তেমন কি দূরের পথ? আমি তো তোমাদের কাছেই থাকবো, মা।'

বৃদ্ধ পুরন্দরাচার্য আগাইয়া আসিয়া পুত্রকে কহিলেন, "বাবা মধুসূদন, আমার একটি কথা তুমি স্মরণ রেখো—প্রকৃত জ্ঞানের উদয় না হ'লে শুধু বাহ্যিক সন্ন্যাস গ্রহণ কিন্তু বৃথা। তুমি নবদ্বীপে যাচ্ছো, যাও সেখানে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের মস্ত বড় সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমার অনুরোধ, আগে যথারীতি জ্ঞান আহরণ ক'রে তারপর তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রো। এখনই যেন তাড়াহুড়া ক'রে সন্ন্যাস নিতে যেয়ো না। আগে এই কঠিন আশ্রমের যোগ্যতা অর্জন ক'রে তারপর এর ভেতর প্রবেশ করবে।"

মধুসূদন সম্মত হইলেন। বেশ তো, শাস্ত্রজ্ঞান আহরণ ও মানসিক প্রস্তুতির পরই তিনি সন্ন্যাস নিবেন। জনক-জননীর আশীর্বাদ নিয়া এক শুভলগ্নে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক চিরতরে অজানার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ক্ষুদ্র বালকের এ গৃহত্যাগকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ববঙ্গের কোটালিপাড়ার সারা সমাজ-জীবন সেদিন আলোড়িত হইয়া উঠে। কিন্তু যে বিপুল সম্ভাবনা ইহার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল তাহার প্রকৃত সন্ধান সেদিন কে পাইয়াছে? ফরিদপুরের এই সংসার-বিরক্ত বালকটির মধ্য দিয়াই উত্তরকালে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদীর অভ্যুদয় ঘটিবে তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল? পরিণত বয়সে এই প্রতিভাধর বালকের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবৈদান্তিক সন্ন্যাসী—আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিদ্যারণ্যের এক মহান্ উত্তর সাধক।

মধুসূদনের সাধনজীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল বড় অপূর্ব। ভক্তিবাদের সহিত ইহাতে অদ্বৈতজ্ঞানের, বিদ্যাবত্তার সহিত যোগসাধনার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়। তাঁর রচিত দার্শনিক মহাগ্রন্থ—অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, বিশ্বের বিদ্বজ্জন সমাজের কাছে এক বিস্ময়কর প্রতিভার নিদর্শন রূপে কীর্তিত হয়। নব্যন্যায়ের বিচারপ্রণালীর সহিত সন্ন্যাসী সাধকের তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির মিশ্রণ ঘটে ইহাতে। অদ্বৈত তত্ত্বের এক অন্যতম মহাগ্রন্থরূপে তাই ইহা চিরচিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান, দৈবী মনীষা ও অধ্যাত্মশক্তির বলে মধুসূদন সরস্বতী সমসাময়িক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীরূপে সেকালে কীর্তিত হইয়া উঠেন।

মধুসূদনের জন্মভূমি উনসিয়া এক ঐতিহ্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম, প্রাচীন বিক্রমপুরের ইহা অংশ বিশেষ। বর্তমান ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল এই স্থান। এক সময়ে এই কোটালিপাড়া মাদারীপুরের অংশরূপে পরিগণিত হইত।

হিমাচলোদ্ভূত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পুণ্যধারা বহুতর বাহু বিস্তার করিয়া এই ভূমির বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতির খেয়ালে নিয়ত এখানে নব নব ভাঙাগড়া লীলাখেলার অন্ত নাই। সাগরোত্থিত এই সমতল দেশের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার নূতন জমি, নূতন পলিমাটি, আর নূতন সৃজনের এক নিরন্তন প্রয়াস।

মানসিকতা ও মনীষার প্রধান উপাদান মধুসূদন তাঁর জন্মভূমি হইতেই প্রাপ্ত হন। অপর এক উপাদান নিহিত ছিল তাঁহার বংশগত মেধা ও সৃজনশীল প্রতিভার মধ্যে। বার শতকের শেষ পাদে এক সময় কাণ্বকুব্জ অঞ্চলটি সাহাবুদ্দীন ঘোরীর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত রামমিশ্র অগ্নিহোত্রী এই সময়ে স্বজনগণসহ নবদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বংশেরই একটি শাখা কালক্রমে কোটালিপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ন্যায় ও বেদবেদান্ত শাস্ত্রে পারদর্শী বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব ইহাদের মধ্যে ঘটে। বঙ্গদেশে বেদের প্রচার সাধনে সেকালে রামমিশ্রের সন্তানদের অবদান ছিল অসামান্য।

এই বংশেরই প্রমোদন পুরন্দরাচার্যের পুত্র—মধুসূদন সরস্বতী। ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যে পুরন্দরাচার্যের অগাধ পাণ্ডিত্য। প্রতিভাধর কবিরূপেও সর্বত্র তাঁহার খ্যাতি ছিল। এই ধর্মনিষ্ঠ প্রতিভাধর পণ্ডিতের গৃহে, আনুমানিক ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন আবির্ভূত হন। পিতার তিনি চতুর্থ পুত্র।

মধুসূদনের প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায় বালক বয়স হইতে।[১] মাত্র আট বৎসর বয়সে কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী হইয়া উঠেন। প্রতিভা ও জ্ঞানবত্তার দিক দিয়া এই বালক সে অঞ্চলে এক পরম বিস্ময়।

পুরন্দর আচার্যের গৃহে প্রায়ই পণ্ডিতমণ্ডলী ও আত্মীয়স্বজনের সমাগম ঘটিত। কৌতূহলী হইয়া সকলে মধুসূদনকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করিতেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই অষ্টম বর্ষীয় বালকের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইত তাঁহার স্বরচিত মনোরম শ্লোকরাশি। বার বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতেই তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি কোটালিপাড়ার পণ্ডিতসমাজে চমক লাগাইতে থাকে।

নিঃসঙ্গ ও কপর্দকহীন অবস্থায় মধুসূদন সেদিন ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। নানা পথ প্রান্তর অতিক্রম করিবার পর সম্মুখে পড়িল স্ফীতকায়া মধুমতী নদী। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই, একখানা নৌকাও দৃষ্টিগোচর হয় না। বালক বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। নদী পার হইবার উপায় কি?

লৌকিক চেষ্টা ত্যাগ করিয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে দেবী জাহ্নবীর শরণ নিতে হইল।

কথিত আছে, ধ্যানাবিষ্ট বালকের সম্মুখে দেবী স্বয়ং সেদিন আবির্ভূতা হন। বলেন "বৎস, আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হয়েছি। আশীর্বাদ করি, অচিরে এ নদী তুমি পার হতে পারবে।"

মধুসূদন উত্তরে বলেন, "করুণাময়ী জননী! আমার শুধু এই নদীটি পার করলেই চলবে না, যাতে ভবনদীও পার হতে পারি সেই বর আমায় দাও।"

'তথাস্তু' বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায়, ভাটার টানে ভাসিয়া মৎস্যজীবীদের একটি নৌকা দ্রুতবেগে

তাঁহার দিকে তীরাভিমুখে আসিতেছে। অসহায় বালকের উপর জেলেদের দয়া হয়, তাহাদের সাহায্যে তিনি নদী অতিক্রম করেন।

বহু দুঃখ কষ্টের পর নবদ্বীপে আসিয়া মধুসূদন যে সংবাদ শুনিলেন তাহাতে তাঁহার মর্মবেদনার অবধি রহিল না। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ চিরতরে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে চলিয়া গিয়াছেন। গৃহত্যাগী বালকের সম্মুখে সে এক মহাসমস্যা। কিছুদিন গৌরভক্তদের মধ্যে থাকিয়া তিনি নামকীর্তন শ্রবণ করিলেন, পুণ্যস্থলগুলি দেখিয়া বেড়াইলেন। তারপর অন্তরে দুশ্চিন্তা হইল—সাধনজীবনে এখন তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন?

বৈরাগ্য ও মুমুক্ষার পথ চিরতরে বাছিয়া নিয়াছেন, সন্ন্যাস গ্রহণ তাঁহাকে করিতেই হইবে। কিন্তু পিতার নিকট যে কথা দিয়া আসিয়াছেন, তাহাও বিস্মৃত হইবার নয়। সন্ন্যাস-জীবনের যোগ্যতা তাঁহাকে আগে অর্জন করিতে হইবে। শাস্ত্রোপলব্ধির মধ্য দিয়াই ধীরে ধীরে ঘটে মোহমুক্তি,—গড়িয়া উঠে সন্ন্যাসের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতির পথেই তিনি আজ হইতে চলিবেন।

অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠে মধুসূদন কৃতসংকল্প। কিন্তু ভারত ভূমির কোথায় কোন্ কেন্দ্রে তাঁহার এই বিদ্যার সাধনা তিনি শুরু করিবেন? বারাণসী, মিথিলা—না নবদ্বীপে?

ভারতীয় শাস্ত্রমঞ্জুষার একটি বড় চাবিকাঠি রহিয়াছে ন্যায়শাস্ত্রে। এ শাস্ত্রে পারদর্শী না হইলে শাস্ত্রজ্ঞ মহলে কেহ মানিতে চায় না। নবদ্বীপে সে সময়ে নব্যন্যায়ের তুমুল চর্চায় আলোড়িত। ভারতের দিক্‌বিদিক্ হইতে বহু শিক্ষার্থী এ অঞ্চলে আসিয়া ন্যায় অধ্যয়ন করিতেছে। খ্যাতনামা আচার্যদেরও কোন অভাব এখানে নাই। মধুসূদন স্থির করিলেন, এখানে থাকিয়া ন্যায়বিদ্যার ভিত্তিকেই সর্বাগ্রে দৃঢ় করিয়া নিবেন।

পণ্ডিত মথুরানাথ এখানকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক। রঘুনাথ শিরোমণির পর এমন প্রতিভাধর পণ্ডিত আর এদেশে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। মধুসূদন একদিন তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত দ্বাদশবর্ষীয় এই শিক্ষার্থীর কবিত্বশক্তি, বিচারবুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়া মথুরানাথ তো চমৎকৃত। এই প্রিয়দর্শন বালককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আচার্যের মনে এক অপত্যস্নেহও জাগ্রত হইয়াছে। তাই নিজের উৎসাহে তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন অধ্যাপনার পরই কিন্তু অধ্যাপকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী এই বালক। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সহিত একের পর এক শাস্ত্রগ্রন্থ সে পাঠ করিয়া ফেলে, ইহার প্রত্যেকটিতে পারঙ্গম হইয়া উঠে। অচিরে নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় অবদান—'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ তাঁহার পড়া হইয়া গেল। তারপর পক্ষধর মিশ্র, রঘুনাথ শিরোমণি ও মথুরানাথের টীকা প্রভৃতি আয়ত্তে আনিতেও বেশী দেরি হয় নাই। অল্পকাল মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রে মধুসূদনের সহজ ও স্বাভাবিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে। স্তব্ধ বিস্ময়ে আচার্য কেবলই তাঁহার বালক শিষ্যের এই দৈবী প্রতিভার কথা ভাবিতে থাকেন।

মধুসূদন ন্যায়শাস্ত্র পড়েন বটে, কিন্তু নবদ্বীপের পরিবেশে,-ভক্ত সাধকদের মধ্যে-থাকিয়া অন্তর তাঁহার ক্রমে রসায়িত হইয়া উঠিতে থাকে। মর্মের মধুরসে দানা বাঁধিয়া উঠে প্রভু শ্রীচৈতন্যের মধুময় বাণী। ব্রজেন্দ্রনন্দনের রসোজ্জ্বল মূর্তির ধ্যান বৈরাগী বালককে দিনের পর দিন করিয়া তোলে রসাবিষ্ট।

শ্রীগৌরাঙ্গ এক অবতার পুরুষ—এই ধারণাটি বালককাল হইতে মধুসূদনের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া আছে। মহাপ্রভুর প্রচারিত তত্ত্ব রসমধুর লীলাকাহিনীও তাঁহাকে কম আলোড়িত করে নাই। ভক্তি রসের প্লাবন তিনি দিগ্বিদিকে বহাইয়া দিয়াছেন, ভক্তিপথের অনুকূল, মাধুর্যময় দ্বৈতবাদ তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন—মধুসূদনের হৃদয়েও রহিয়াছে এই একই সুরের মধু গুঞ্জন। আবার নব্যন্যায় পড়ার ফলে বিচারের দিক দিয়াও সম্প্রতি দ্বৈতবাদে তাঁহার আস্থা দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রমতে ঈশ্বর, জীব জগৎ সব কিছুই পৃথক। তাই এ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত—দ্বৈত। মধুসূদন মনে মনে এবার স্থির করিলেন, আপন প্রতিভা ও বিদ্যাবলে তিনি এমন এক অকাট্য দ্বৈতবাদী মহাগ্রন্থ রচনা করিবেন, যাহা মহাপ্রভুর প্রচারিত মতকে দার্শনিক বিচারের দিক দিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিবে।

কিন্তু এ কাজের প্রধান অন্তরায় শঙ্কর-মত। শঙ্করের অদ্বৈত মত খণ্ডন না করিয়া ভক্তিবাদী দ্বৈতমত তিনি সর্বভাবতে কি করিয়া স্থাপন করিবেন? প্রথমে তাই অদ্বৈত-বাদকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা চাই। অদ্বৈতবাদের দুর্বলতা জানিয়া নিয়া, তাহার দুর্গে বসিয়াই চরম আঘাত তিনি হানিবেন। মধুসূদন স্থির করিলেন, এবার তাঁহাকে যাইতে হইবে বেদান্তবিদ্যার মর্মকেন্দ্র—বারাণসীতে।

নবদ্বীপ হইতে বারাণসী দীর্ঘদিনের পথ। তখনকার দিনে হিংস্র জীবজন্তু, দস্যু ও রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য এ পথে বিপদের অন্ত ছিল না। কিন্তু কিশোর অভিযাত্রীর সঙ্কল্প একেবারে অটুট, তাঁহাকে বাধা দিবার উপায় কোথায়? কপর্দকহীন মধুসূদন সেদিন অসীম সাহসে ভর করিয়া, তাঁহার প্রিয় গ্রন্থের ঝুলিটি কাঁধে নিয়া, পদব্রজে সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন।

কাশীধামে তখন নিরন্তর শাস্ত্রচর্চা ও বিচার-দ্বন্দ্বের আলোড়ন। দিক্‌পাল পণ্ডিতদের অনেকেই সেখানে বহুতর শিষ্য পরিবৃত হইয়া বাস করেন। রামতীর্থ, উপেন্দ্রতীর্থ, নারায়ণ ভট্ট, মাধব সরস্বতী প্রভৃতি মহাপণ্ডিতের প্রতিভার ছটায় চতুর্দিক আলোকিত। ইহাদের মধ্যে বেদান্তকেশরী স্বামী রামতীর্থকেই মধুসূদনের পছন্দ হইল। তাঁহারই নিকট বেদান্তের উচ্চতর পাঠ তিনি নিতে লাগিলেন।

আচার্য রামতীর্থের কাছে এমন শিক্ষার্থী খুব কমই আসিয়াছে। বেদান্ত অধ্যয়নের যে কয়টি গুণ প্রধান, মধুসূদনের মধ্যে তাহা পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায়। ত্যাগবৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত তাঁহার মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে কুশাগ্র বিচারবুদ্ধি, তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার সহিত মিলিত হইয়াছে শ্রমনিষ্ঠা ও দুশ্চর তপস্যা। কঠোরব্রতী ব্রহ্মচারীর জীবনে আন্তর সাধনা ও শাস্ত্রানুশীলন এক সঙ্গেই এবার হইতে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে, আনানুষী প্রতিভাবলে মধুসূদন অগণিত দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। নবদ্বীপে থাকিতেই তিনি ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন। এবার বেদান্তেও পারঙ্গম হইয়া উঠিলেন।

দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নারায়ণ ভট্টের সহিত এই সময়ে একদিন কাশীর প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক নৃসিংহাশ্রম ও উপেন্দ্র সরস্বতীর বিচার-দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এ বিচারে তরুণ নৈয়ায়িক মধুসূদন ও বেদান্তবাদী পণ্ডিতদ্বয়কে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত নারায়ণ ভট্ট ছিলেন এক ধুরন্ধর মীমাংসা শাস্ত্রবিদ্। এই বিদ্যা সহায়ে তিনি ঐ দুই প্রবীণ বেদান্তবাদীকে সভামধ্যে নিরুত্তর করিয়া দেন। এই ঘটনায় মধুসূদন সজাগ হইয়া

উঠিলেন, দৃষ্টি তাঁহার প্রসারিত হইয়া গেল। মীমাংসাশাস্ত্র আয়ত্ত করিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন।

একাধারে নৈয়ায়িক ও মীমাংসক বলিয়া তখন কাশীতে মাধব সরস্বতীর খ্যাতি। মধুসূদন এবার তাঁহারই কাছে শরণ নিলেন। অল্প কিছুকাল মধ্যেই মীমাংসাশাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হন।

গোড়া হইতেই ন্যায়ের দৃঢ় ও পরিমার্জিত ভিত্তির উপর মধুসূদন দণ্ডায়মান। এবার একের পর এক সমস্ত দর্শন ও অধ্যাত্ম শাস্ত্রের উপর তিনি স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। একনিষ্ঠ সাধন ও শাস্ত্রানুশীলনের ফলে তাঁহার জীবনে অতঃপর এক অপরূপ তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি বিকশিত হইয়া উঠে, আর সেই সঙ্গে বেদান্তের নিহিতার্থও ধীরে ধীরে তাঁহার অন্তরসত্তায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে থাকে। মধুসূদনের তত্ত্ববিচার ও সাধনার সম্মুখে অদ্বৈত জ্ঞানের প্রকৃত রহস্যটি উদ্ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু যে ভক্তিবাদের বীজ তাঁহার জীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে তাহার মর্মকথাটিও এই সময়ে নূতন করিয়া ধরা দেয়।

মধুসূদন উপলব্ধি করিলেন—ভগবান্‌কে অন্তরাত্মা বলিয়া না জানিলেও জীবের প্রকৃত ভক্তি, প্রকৃত আত্মসমর্পণ তো সম্ভব হয় না। আর এই আত্মস্বরূপের বোধই যে সাধকের সমস্ত ভেদজ্ঞানকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়—অভেদ ও অদ্বৈত জ্ঞান তাঁহার সত্তায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অন্তরাত্মাই যে আমি স্বয়ং। ভক্তি ও আত্মসমর্পণে তাই সামান্য একটু ভেদজ্ঞান থাকিলেই জীবের 'নিজত্ব' থাকিয়া যায়—দ্বৈত সেখানে আসিয়া পড়ে। বৃহদারণ্যকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই পরম অদ্বৈতজ্ঞানকেই উদ্ঘাটিত করিয়াছেন আত্মপ্রীতির উদাহরণের মধ্য দিয়া—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয় ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি"—অর্থাৎ, শ্রুতি বলিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, নিজের জন্যই পতি প্রিয় হইয়া ওঠে। ইহার নিহিতার্থ প্রকৃত প্রেম হয় আত্মার সাথেই এবং তাহার সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়া ইহা অপরের উপর জন্মে। পূর্ণতম প্রেম ও ভক্তি তাই কেবলমাত্র ভগবান্‌কে—আত্মাকে—উপলব্ধি করলেই সম্ভবপর হইতে পারে। অর্থাৎ পূর্ণ অভেদ জ্ঞানেই পূর্ণ ভক্তি নিহিত রহিয়াছে—অন্যত্র নহে। সাধক মধুসূদন আরও বুঝিতে পারিলেন, সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য শাস্ত্র শ্রুতি প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত ব্রহ্মেরই পরমতত্ত্ব নির্দেশ করিতেছে।

অদ্বৈত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ও সত্যতা সম্বন্ধে এখন মধুসূদনের আর কোনো সন্দেহ নাই। আজ এই সত্য তাঁহার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাই পরিতাপ জাগে, কোন্ ভ্রান্ত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া এ অদ্বৈতবাদকেই তিনি খণ্ডন করিতে আসিয়াছিলেন? শুধু তাহাই নয়, এজন্য কপট আচরণ করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। শিক্ষাগুরু, মহান্ আচার্য, স্বামী রামতীর্থের নিকটে তিনি তাঁহার বেদান্তপাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়াছেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাঁহাকে করিতেই হইবে।

অনুতপ্ত মধুসূদন গুরুকে নিবেদন করিলেন, "ভগবান্, আমি আপনার চরণে গুরুতর অপরাধ করেছি। আপনি আমার এ পাপের জন্য উপযুক্ত দণ্ড দিন।"

স্বামী রামতীর্থ এ কথায় চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "সে কি বৎস! তোমার মতো সদাচারী, গুরুভক্ত বিদ্যার্থী যে আমার এখানে কখনো আসে নি। কোনো অন্যায়

আচরণই তো আমি তোমায় আজ পর্যন্ত করতে দেখি নি। তবে তোমার মুখে এসব কি কথা ?"

মধুসূদন অশ্রুসজল চক্ষে অকপটে তখন সমস্ত কাহিনী বিবৃতি করিলেন, "ভগবান্, আমি কি উদ্দেশ্যে আপনার কাছে বেদান্ত শিক্ষা করতে এসেছিলাম তা খুলে বলবো। ভয় ছিল, আগে সে কথা বললে, আপনি আপনার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ আমায় দেবেন না। সংসার ত্যাগ ক'রে আমি চৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণের জন্য নবদ্বীপে যাই। কিন্তু তাঁর দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে নি, তিনি তখন সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছেন। তারপর পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে নবদ্বীপে শাস্ত্রজ্ঞান আহরণ করতে থাকি। উদ্দেশ্য ছিল, শাস্ত্র পাঠ দ্বারা মন মোহমুক্ত হ'লে আমি সন্ন্যাস নেব। নব্যন্যায়ে আমার ক্রমে অধিকার জন্মালো। তখন সংকল্প করলাম, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ ও দ্বৈতবাদের অনুকূল এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ আমি লিখবো, অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করবো। এই গোপন উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এসেছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অদ্বৈততত্ত্বের পঙ্কে বসে আমি নিমজ্জিত না হয়ে পারি নি। আপনার কৃপা ছাড়া প্রকৃত সত্য ও সিদ্ধান্তের খোঁজ আমি পেতাম না। কপট বিদ্যার্থীরূপে এসে আমি এক মহাপাপ করেছি—আপনি এর দণ্ড আজ আমার দিন।"

রামতীর্থের অন্তর ততক্ষণে হর্ষে বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়াছে। মধুসূদনকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তিনি কহিলেন, "বৎস, সে সময়ে তুমি যে তত্ত্বকে সত্য বলে ধরেছিলে তার সমর্থনের জন্য কপটতার আশ্রয় না নিয়ে পারো নি। কিন্তু আজ তুমি প্রকৃত বস্তুকেই ধরতে সক্ষম হয়েছো। এবার হয়েছো সিদ্ধকাম। অদ্বৈততত্ত্বের স্ফুরণে তোমার শাস্ত্রানুশীলন আজ সার্থক। তবুও তোমার অন্তর থেকে অনুতাপ যদি না-ই যায়, তবে এক কাজ করো। তুমি প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে সন্ন্যাস নাও। সন্ন্যাসে পুনর্জন্ম হবে—পাপেরও মোচন হবে। তুমি মণ্ডলেশ্বর বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করো।"

গুরু রামতীর্থ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আবার মধুসূদনকে কহিলেন, "বৎস, আর একটি কথা শোন। মাধব সম্প্রদায়ের ব্যাসরায়তীর্থ আমাদের অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন ক'রে তার সুবিস্তৃত গ্রন্থ—ন্যায়ামৃত লিখেছেন। এ গ্রন্থ আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। তুমি এর খণ্ডন ক'রে অদ্বৈতমত সিদ্ধ করো, সুপ্রতিষ্ঠিত করো। নবদ্বীপের অসামান্য প্রতিভা সম্পদ তোমার মধ্যে। নব্যশাস্ত্রে তুমি প্রায় অজেয়। তাই এ মহৎ কাজ তুমিই পারবে। এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন ক'রে তুমি আমার সন্তোষ বিধান করো।" সানন্দে সম্মত হইয়া মধুসূদন গুরুর চরণে প্রণত হইলেন।

ইহার পর তিনি বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন। সরস্বতী মহারাজ কহিলেন, "মধুসূদন, তোমার মতো সুযোগ্য শিষ্যই তো আমি চাই। কিন্তু বৎস, শুধু পণ্ডিত হলেই সন্ন্যাসের যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। এজন্য প্রধানত প্রয়োজন বৈরাগ্য ও ভগবদ্‌ভক্তি। আমি প্রথমে দেখতে চাই, তোমার সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকৃতই দৃঢ়, না শুধু মনের আবেগসঞ্জাত। আমি কিছুদিনের জন্য তীর্থ পর্যটনে যাচ্ছি, সেখান থেকে ফিরে এসে তোমায় সন্ন্যাসদীক্ষা দেব। ইতিমধ্যে তুমি গীতার একটি টীকা রচনা করো। তা থেকে তোমার যোগ্যতা আমি বুঝবো।"

সরস্বতী মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী গীতার এক অপরূপ টীকা মধুসূদন প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তিরসের অদ্ভুত বর্ষণ। তীর্থ

হইতে ফিরিয়া আসিয়া সরস্বতীজী এই টীকা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন, ইহার পরেই মধুসূদনকে তিনি সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করেন।

শিক্ষাগুরু রামতীর্থের নিকট মধুসূদন অদ্বৈতবাদ রচনায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সন্ন্যাস নিবার পরও তিনি তাহা ভুলেন নাই। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, বিদ্যাবত্তা ও একনিষ্ঠ শাস্ত্রসাধনার ফলে তাঁহার মহাগ্রন্থ—'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' রচিত হইল। অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য মাধ্ব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রবিদ্‌গণ এযাবৎকাল তর্কযুক্তি উদ্ভাবন করিয়াছেন, আচার্য ব্যাসতীর্থ তাহা অপূর্ব নৈপুণ্য সহকারে তাঁর দ্বৈতবাদী গ্রন্থ ন্যায়ামৃত-এ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, স্বীয় মতবাদ দ্বারা তাহাকে প্রায় অকাট্য করিয়া তুলিয়াছেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক মধুসূদন প্রতি পঙ্‌ক্তি ধরিয়া এই গ্রন্থের খণ্ডন করিলেন, অদ্বৈতবাদকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে করিলেন প্রতিষ্ঠিত।

সারা ভারতবর্ষে সেদিন মধুসূদনের এই মহাগ্রন্থের জয়ধ্বনি উঠে। সমকালীন অধ্যাত্মপন্থীদের মধ্যে দ্বৈতবাদীদের প্রতাপ বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে দিন দিন অদ্বৈতবাদী মত অনেকাংশে স্তিমিত হইয়া আসিতে থাকে। মধুসূদনের সাধনলব্ধ প্রজ্ঞা ও তাঁহার মহাগ্রন্থ 'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' তাই সে সময়ে এদেশে এক ঐতিহাসিক কীর্তি অর্জন করে।

সন্ন্যাসীগুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট এবার বৈদান্তিক মধুসূদনের সাধনভজন শুরু হইয়াছে। কৃচ্ছ্রব্রতী নবীন সন্ন্যাসী এ সময় হইতে এক সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে আত্মসাধনায় রত হন।

মধুসূদন একবার তাঁহার গুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতী ও সতীর্থগণসহ তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। যমুনা তীরের একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছিয়া সরস্বতীজী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বৎস, এ স্থানটি তোমার সাধনভজনের পক্ষে বড় অনুকূল। এখানে কিছুকাল তুমি যাপন কর, তপস্যায় রত হও। আমরা সবাই তীর্থদর্শন ক'রে ফিরবার পথে তোমার সঙ্গে আবার মিলিত হবো।" মধুসূদন গুরুর নির্দেশ মতো নদীতীরে আসন পাতিয়া বসিলেন।

তাঁহার এ অবস্থানকে কেন্দ্র করিয়া শীঘ্রই এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিল। সম্রাট আকবরের এক প্রিয় মহিষী তখন দুশ্চিকিৎস্য শূলরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। কোনো ঔষধেই তাঁহার বেদনার উপশম ঘটিতেছে না। হঠাৎ এক রাত্রে সম্রাটপত্নী স্বপ্ন দেখিলেন যমুনাতীরে এক শক্তিধর সন্ন্যাসী তপস্যানিরত আছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ পাইয়াই যেন তাঁহার রোগমুক্তি ঘটিয়া গেল।

সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকিরের উপর আকবরের ভক্তি বিশ্বাস বরাবরই বেশ কিছুটা ছিল। ব্যাপারটিকে তিনি তাই উপেক্ষা করিলেন না। স্বপ্নের কথা সত্য কিনা ইহা দেখিতে সম্রাট উৎসুক। তাই আদেশ জারী হইল, সত্যই যমুনার তীরে কোনো সাধু আছেন কিনা সন্ধান নিতে হইবে। ধ্যানপরায়ণ সন্ন্যাসী মধুসূদনের সংবাদ অচিরে সম্রাটের নিকট গিয়া পৌঁছিল।

আকবর ছদ্মবেশে মহিষীকে নিয়া নদী তীরে উপনীত হইলেন। তাঁদের সম্মুখে এক অপূর্ব দৃশ্য। কৃচ্ছ্রব্রতী তরুণ তাপস নিজের আসনে বসিয়া ভগবৎ-ধ্যানে বিভোর হইয়া আছেন। উচ্চ বালুকাস্তূপ চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। নিজের দেহ বা জাগতিক পরিবেশের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিবার পর দেখা গেল, তরুণ সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙিয়াছে।

সম্রাটপত্নী সকাতরে তাঁহার রোগ-যন্ত্রণার কথা একবার নিবেদন করিলেন। মধুসূদন কৃপাভরে কহিলেন, "মা, তুমি ঘরে যাও, ভগবৎ-কৃপায় তুমি রোগমুক্ত হয়েছো।"

সম্রাটমহিষী বিস্ময়করভাবে এই শূলব্যাধির কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। আকবর এই সময়ে স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া তরুণ সন্ন্যাসীকে বহু ধনরত্ন উপহার দিতে চাহেন। কিন্তু মধুসূদন নিস্পৃহ। এ সব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, "সম্রাট্, আপনি হচ্ছেন প্রজা ও ধর্মের রক্ষক, সেই পবিত্র কর্তব্য আপনি পালন করতে থাকুন, তাই শুধু আমি চাই।"

তীর্থ প্রত্যাগত বিশ্বেশ্বর সরস্বতী সমস্ত কাহিনী শুনিয়া পরম আনন্দিত হন। উপরোক্ত ঘটনার পর শুধু জনসাধারণের মধ্যেই নয়, সাধু-সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমহলেও মধুসূদন সরস্বতীর সাধনার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

ইহার পর দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে। মধুসূদন সরস্বতী এখন বয়সে প্রবীণ—প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁহার অতুলনীয়। গীতার টীকা ও অদ্বৈতসিদ্ধির পর মহামনীষীর লেখনি হইতে ক্রমান্বয়ে বহুতর অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ ও টীকা নির্গত হইয়া চলিয়াছে। শুধু কাশীধামেই নয়, সমসাময়িক ভারতের শীর্ষস্থানীয় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী—একপত্নী শাস্ত্রবিদ্ তিনি। বারাণসী ভারতের সাধক ও পণ্ডিতদের মর্মকেন্দ্র, আর সেদিন এই কেন্দ্রেরই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা—বেদান্তকেশরী মধুসূদন সরস্বতী। ফরিদপুর কোটালিপাড়ার সেই অখ্যাত বালকের হস্তেই সেদিন বেদান্তধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী রহিয়াছে উড্ডীয়মান। কন্দর্প-নারায়ণের রাজসভার অবজ্ঞাত সেই তেজস্বী বালক আজ তাঁহার প্রাণের আশা পূর্ণ করিয়াছেন, রাজপ্রসাদের পরিবর্তে ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিয়া হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ।

কাশীর গঙ্গাতীরে চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে সে সময়ে মহাবৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর আশ্রমটি অবস্থিত। ভক্ত তুলসীদাস থাকেন ইহার অদূরে, হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নিকটে। তুলসীদাস ইষ্টমন্ত্র রামনামে সদা তন্ময়, পাণ্ডিত্যে ও অলৌকিক শক্তিতেও তিনি অনন্য-সাধারণ। মধুসূদন ও তুলসীদাস এই দুই প্রতিবেশী মহাত্মার মধ্যে বড় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সে সময়ে দেখা যাইত।

তুলসীদাস তাঁহার শিক্ষা ভজনের নির্দেশ তখন সংস্কৃত ভাষায় আর প্রচার করেন না—সাধারণের বোধগম্য ভাষা হিন্দিতেই সব কিছু পরিবেশন করিতে থাকেন। তাঁহার রচিত রামায়ণও তিনি লিখিয়াছেন হিন্দিতে। আচার্য ও লোকগুরু হইয়া একি নিম্নস্তরের রুচি? একদল পণ্ডিত বড় ক্রুদ্ধ হইলেন। তুলসীদাসকে চাপিয়া ধরা হইল, কেন তিনি এরূপ অবাঞ্ছনীয় কাজ করিতেছেন? ভক্তপ্রবর হাসিয়া উত্তর দিলেন,—

> হরি হরি যশ সুর নর গিরা, বরণহি, সন্ত সুজান।
> হাণ্ডী হাটক চারুচীর বান্ধে স্বাদ সমান।

অর্থাৎ, হরি হরের যশ সাধুগণ দেবভাষা অথবা মানবীয় ভাষা যাহাতেই বর্ণনা করুন, সব কিছুই সমান। সোনার হাঁড়ি বা মাটির হাঁড়ি, যাহাতেই রান্না করা হোক—আস্বাদ কিন্তু হয় তাহার একই রকম।

বিক্ষুব্ধ পণ্ডিতেরা এই দোঁহাটি নিয়া পণ্ডিত শিরোমণি মধুসূদনের নিকটে আসিলেন। অবিলম্বে তাঁহারা সকলে জানিতে চান, তাঁহাদের অভিযোগ সম্বন্ধে সরস্বতী মহারাজের কি মতামত। পরমভক্ত তুলসীদাসের অমৃতনিষ্যন্দী কাব্যের সহিত মধুসূদন সরস্বতীর পরিচয় পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ এক রসমধুর শ্লোক রচনা করিয়া তিনি জানাইয়া দিলেন—

পরমানন্দপয়োহয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমরচুম্বিত ॥

অর্থাৎ তুলসীদাসরূপ চলমান তুলসীতরুর গন্ধ পরম আনন্দময়, সেই তুলসীতরুর মঞ্জরী হইতেছে তুলসীদাসের কবিতা—আর সেই কবিতা মঞ্জরী রাম-ভ্রমর দ্বারা চুম্বিত। প্রবীণ বৈদান্তিকের এ কি অপূর্ব ভক্তিভাব ও বৈদগ্ধ্য। এমন উদারতা ও গুণগ্রাহিতাও তো সহজে দেখা যায় না। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা বড় বিস্মিত হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় কবি ও সাধক তুলসীদাসের প্রতি তাঁহারা সবাই সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

মধুসূদনের এই উদার স্বীকৃতি বারাণসীর শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতসমাজকে তুলসীদাসের গুণবত্তা সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তোলে। তুলসীর নবউৎসারিত ভক্তিপ্রবাহকে বাধামুক্ত করিতে মধুসূদন সরস্বতীর অবদান তাই অসামান্য।

স্পষ্টতই বুঝা গেল জ্ঞান ও ভক্তির গঙ্গা-যমুনার ধারা মধুসূদনের জীবনদর্শন ও সাধনায় সম্মিলিত হইয়াছে। দ্বৈতবাদের সমস্ত যুক্তিতর্কাদি খণ্ডন করিয়া যিনি অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করিলেন, তাঁহার লেখায় পাওয়া গেল প্রেমভক্তি-রসে রসায়িত শ্লোক—

অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়া তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥

অর্থাৎ, আমরা অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে আরূঢ় হইলেও ইন্দ্রের বৈভব তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও কোন এক গোপবধূ-লম্পট শঠ কর্তৃক বলপূর্বক দাসরূপেই পরিণত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর রূপ ও তাঁহার উপাসনার উল্লেখ করিয়া মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে পরমতত্ত্ব আর কি আছে, মধুসূদন সরস্বতী তাহা জানেন না—আপাত দৃষ্টিতে তাঁহার একথা অদ্বৈতবাদ বিরোধী মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা কিন্তু মোটেই নয়। যে সাকার কৃষ্ণের উপাসনা করিতে মধুসূদন বলেন, তিনি হইতেছেন 'উপাস্য পরমতত্ত্ব'। উপাস্য-তত্ত্বের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম, কিন্তু তাঁহার 'জ্ঞেয়তত্ত্ব' অবশ্যই নির্গুণ ও নির্বিশেষ। মধুসূদনের মতে তাঁহার এই কৃষ্ণতত্ত্বের কথায় অদ্বৈততত্ত্ব মোটেই খণ্ডিত হয় নাই।

ভগবদ্গীতায় ভক্তির স্তর ভেদের কথা বলিতে গিয়া মধুসূদন যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার জ্ঞান-ভক্তির অপরূপ সমন্বয়বাদকে চমৎকাররূপে ফুটাইয়া তোলে। তাঁহার মতে, প্রথমস্তরে জীব নিজেকে মনে করে ভগবানের দাস। দ্বিতীয় স্তরে মনে করে ভগবান তাহার ভক্তি প্রেমেরই অধীন। তৃতীয় স্তরে আসিয়া নিজেকে সে উপলব্ধি করে ভগবান হইতে অভিন্নরূপে। মহাবৈদান্তিক ও পরমভক্ত সন্ন্যাসী মধুসূদনের মতে কিন্তু এই অভেদ উপাসনাই ভক্তির শেষ স্তর।

মধুসূদনের বিস্ময়কর মনীষা ও তাঁহার মহাগ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধির প্রচার তাঁহাকে অচিরে সারা ভারতে সুপরিচিত করিয়া দেয়। জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়বাদও তাঁহার জনপ্রিয়তা

অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি ইহার সহিত মিলিত হয় তাঁহার অলৌকিক যোগশক্তির খ্যাতি। বলা বাহুল্য, এসব কারণে তাঁহার বারাণসী আশ্রমে বহুতর শিক্ষার্থীর ভিড় জমিতে থাকে এবং অদ্বিতীয় আচার্যরূপে তিনি বেদান্তজগতে কীর্তিত হইয়া উঠেন। তাঁহার কৃতী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—বলভদ্র, শেষগোবিন্দ, পুরুষোত্তম সরস্বতী প্রভৃতি। দুজন অদ্বৈতবাদ-বিরোধী মহা-প্রতিভাধর ছাত্রও মধুসূদন সরস্বতীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের একজন হইতেছেন মধ্ব সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্যাসরাম আর অপরজন—গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক শ্রীজীব গোস্বামী।

মধুসূদনের 'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' দ্বৈতবাদের উপর এক তীব্র আঘাতরূপে নিপতিত হয়। মধ্ব সম্প্রদায়ের পণ্ডিতশিরোমণি ব্যাসরাজের শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবিরোধী গ্রন্থ 'ন্যায়ামৃত' এ আঘাতে অনেকটা হীন হইয়া পড়ে। শিষ্য ব্যাসরামকে এক কূট পরামর্শ দিয়া ব্যাসরাজ বলেন, সে যেন মধুসূদনের কপট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার সমস্ত তর্কযুক্তির রহস্য জানিয়া নেয় এবং অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতিবাদী গ্রন্থ রচনা করে। ব্যাসরামের ছলনা সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানিয়াও পরম উদার, আচার্য মধুসূদন তাঁহাকে যথোপযুক্ত ভাবেই শিক্ষা দান করেন।

উত্তরকালে এই শিষ্যের অদ্বৈতবাদ বিরোধী টীকাখানি হাতে পাইয়া তিনি সহাস্যে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, "বৎস, তুমি যে দ্বৈতবাদী মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত, তুমি যে ব্যাসরাজের নিয়োজিত ব্যক্তি এবং অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য গুপ্তভাবে আমার আশ্রমে অবস্থান করেছো —এ সবই কিন্তু আমি জানতাম। তুমি আমার শিষত্ব গ্রহণ করেছো, তাই আচার্য হয়ে তোমার এ গ্রন্থের প্রতিবাদ বা খণ্ডন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার কোনো শিষ্য পরে একাজ করবে।" মধুসূদনের প্রতিভাধর বাঙালী শিষ্য বলভদ্র তাঁহার 'সিদ্ধি ব্যাখ্যা'তে ঐ গ্রন্থের সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন।

এক সময়ে বারাণসী অঞ্চলের সন্ন্যাসীদের উপর ধর্মান্ধ মুসলমান মোল্লাদের বড় অত্যাচার চলিতে থাকে। এই মোল্লারা দল বাঁধিয়া সশস্ত্র হইয়া চলিত এবং সন্ন্যাসী দেখিলেই আক্রমণ করিয়া বসিত। হত্যাপরাধ অনুষ্ঠিত হইলেও ইহাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা বড় কঠিন ছিল। প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই মোল্লাদের শাস্তি দেওয়া যাইত না। এই সঙ্কটে সাধু-সন্ন্যাসীরা সকলে মিলিয়া মধুসূদন সরস্বতীর শরণ নিলেন। তিনি তখন বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী—প্রবীণতম ধর্মনেতা। সকলে তাই তাঁহার উপরই নির্ভর করিলেন।

অদ্বৈত চিন্তায় সদা নিমগ্ন হইলেও মধুসুদন ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্যকে সেদিন এড়াইয়া যাইতে চান নাই। সন্ন্যাসীদের রক্ষার জন্য তিনি অচিরে যত্নবান্ হইলেন। সম্রাট আকবর তাহার পূর্বপরিচিত। বহু পূর্বে একবার সম্রাটের মহিষীকে তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। তাছাড়া মন্ত্রী টোডরমলের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা কম নয়। কিছুদিন আগে টোডরমলের সহিত একদল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিচার বিতর্ক উপস্থিত হয়—টোডরমলকে তাঁহারা ক্ষত্রিয় না বলিয়া কায়স্থ বলিয়া উপহাস করেন। মধুসূদনের সমর্থনেই সে সময়ে সম্রাটমন্ত্রীর মান মর্যাদা রক্ষা পায়। কাশীর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ হিসাবে সে বিতর্কে মধুসূদন সরস্বতীর মতামত প্রার্থনা করা হয় এবং আচার্য এ সময়ে টোডরমলকে ক্ষত্রিয়বংশীয় বলিয়াই তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

সন্ন্যাসীদের রক্ষার জন্য মধুসূদন রাজা টোডরমলের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। মন্ত্রীপ্রবর ক্রমে সমস্ত ব্যাপার সম্রাটের কানে তুলিতে থাকেন। কিন্তু আকবর সুচতুর ব্যক্তি, সহসা মুসলমান মোল্লাদের চটানো তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কৌশলে কার্য সিদ্ধ করার জন্য তিনি সর্বশাস্ত্রের এক বিচারসভা দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। হিন্দুশাস্ত্রবিদ্‌দের নেতারূপে মধুসূদন এই রাজসভায় উপস্থিত হন। তাঁহার দার্শনিক বিচার পদ্ধতি, বিদ্যার গভীরতা এবং ব্যক্তিত্ব দেখিয়া পক্ষ প্রতিপক্ষ সকলেই মুগ্ধ হইয়া যান। মুসলমান শাস্ত্রবিদ্‌গণও সেদিন মনস্বী মধুসূদনের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। ভারতের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতগণ এই সময়ে মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে যে প্রশস্তি শ্লোক রচনা করেন আজিও তাহা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে—

বেত্তি পারং সরস্বত্যাঃ মধুসূদনসরস্বতী।
মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী॥

অর্থাৎ, জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পার বা সীমা জানেন মধুসূদন, আর মধুসূদনের পার জানেন শুধু দেবী সরস্বতীই।

মধুসূদন এই সুযোগে বাদশাহের নিকট সেদিন সন্ন্যাসীদের রক্ষার্থ এক আবেদন জানাইলেন। মোল্লারাও ইতিমধ্যে তাঁহার প্রতিভা, অধ্যাত্মশক্তি আর গভীর বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। কৌশলী আকবর মোল্লাদের জন্য সরাসরিভাবে কোনো দমন ব্যবস্থা করিলেন না। তিনি শুধু এক আদেশ জারী করিলেন, সন্ন্যাসীরাও আত্মরক্ষা করিতে থাকুন, কিন্তু সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে মোল্লা বা সন্ন্যাসী কোনো পক্ষকেই বিচারালয়ে টানিয়া আনা চলিবে না।

অতঃপর মধুসূদনের সমর্থনক্রমে নাগা সন্ন্যাসীদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। অস্ত্র ব্যবহারে নিপুণ হইয়াও মুসলমান বাদশাহের ভয়ে এযাবৎ তাঁহারা উহা প্রয়োগ করিতে বিরত ছিলেন। এবার মধুসূদন সরস্বতীর কৃপায় তাঁদের সুবিধা হইল। তাছাড়া, অনেক হিন্দু যোদ্ধাকেও এই সময় আচার্যের নির্দেশমত সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করা হয়। এই প্রবীণ বৈদান্তিকের নেতৃত্বে সন্ন্যাসীদলের সংস্কার সাধিত হয়। আত্মরক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠেন।

ইহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। মধুসূদন এসময়ে নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কথিত আছে, এই সময়ে একদিন মহাত্মা মধুসূদনের সহিত মহাযোগী গোরক্ষনাথের বিদেহী-সত্তার সাক্ষাৎকার ঘটে। সেদিন সবেমাত্র গঙ্গাস্নান করিয়া আচার্য তীরে উঠিয়াছেন। এ সময়ে জ্যোতির্মণ্ডিত সূক্ষ্ম দেহে গোরক্ষনাথ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। আত্মপরিচয় দিবার পর যোগীবর প্রসন্নমধুর হাস্যে মধুসূদনের সম্মুখে একটি অমূল্য রত্ন তুলিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "বৎস, এটি হচ্ছে চিন্তামণি রত্ন। এ পরম বস্তু কাকে দেব, সেই খোঁজই আমি করছিলাম, তুমিই হচ্ছো এর প্রকৃত অধিকারী। এইটি তুমি সঙ্গে রাখো, যখনি যে বস্তু তুমি চাইবে, এর প্রসাদে তাই তখনি হবে করতলগত।"

মধুসূদন প্রণতি জানাইয়া কহিলেন, "যোগীরাজ, আমার অভাব কোনো কিছুরই নেই। তাই এতে আমার কোনো প্রয়োজনও দেখছিনে। আপনি যোগ্যতর পাত্র খুঁজে নিয়ে এ অমূল্য বস্তু তাকে দিন।"

গোরক্ষনাথ পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে মধুসূদন বলিলেন, "দেখছি আমার প্রতি

আপনার কৃপা অপরিসীম, আমায় ছাড়া আর কাউকে এ রত্ন আপনি দেবেন না। কিন্তু এর অধিকারীরূপে আমি আমার ইচ্ছেমতো কাজ করবো, এতে আপনি নিশ্চয়ই রাজী আছেন ?”

যোগীবর সম্মতি জ্ঞাপন করিলে মধুসূদন তাঁহার হাত হইতে রত্নটি গ্রহণ করিলেন। মুহূর্তমধ্যে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। গোরক্ষনাথও কম নহেন। অধরে চতুর হাসি টানিয়া আনিয়া তিনি কহিলেন, “মধুসূদন, এবার ভেবে দেখ দেখি, চিন্তামণি আমি প্রকৃত অধিকারী পুরুষকেই দান করেছি কিনা।”

আনুমানিক ১০৩২ সালের কথা। মধুসূদনের বয়স তখন ১০৭ বৎসর। শেষবারের জন্য তিনি হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন। সিদ্ধপুরুষ এবার যোগশক্তিবলে জানিয়াছেন, তাঁহার মহাপ্রয়াণের লগ্নটি অতি নিকটে। বহিরঙ্গ জীবনের যত কিছু কার্যকলাপ, শাস্ত্রচর্চা ও উপদেশ দান সমস্ত কিছু হইতে নিজেকে তিনি প্রত্যাহৃত করিয়া নিলেন। বিদায় লগ্নের কথা ভক্ত ও শিষ্যদের পূর্ব হইতে জানাইয়া রাখিলেন। তারপর মোক্ষদায়িনী হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে, নির্দিষ্ট পুণ্যলগ্নে আপ্তকাম মহাপুরুষ হইলেন সমাধিমগ্ন। সেই সমাধিই তাঁহার মহাসমাধি। মহাসাধক মধুসূদন আর তাহা হইতে ব্যুত্থিত হন নাই।

ভক্ত দাদু

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বেলা। সারা আকাশ মেঘে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। দমকা বাতাসের দাপাদাপির সঙ্গে বৃষ্টিও প্রায় আসিয়া পড়িল। আমেদাবাদের উপকণ্ঠে চর্মকার পল্লীর পাশ দিয়া সাধক কমাল খুব দ্রুতবেগে চলিয়াছেন। আসন্ন এই বর্ষণকে এড়ানো বড় কঠিন হইবে। দুই এক ফোঁটা জল দেহে পড়িতেই এক অচেনা ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে হঠাৎ তিনি থামিয়া পড়িলেন।

বৃষ্টি তেমন বেশী হইতেছে না, বারান্দায় না উঠিয়া ছাঁচতলায় তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। গৃহের মধ্যে মুচি তাহার নিজের কাজে মহাব্যস্ত। একমনে জল বহনের মশক্ সে সেলাই করিতেছে।

কমাল ভাবিলেন, কুটিরের ভিতর ঢুকিয়া কেন লোকটিকে আর ব্যতিব্যস্ত করা? তাছাড়া, গরীব মানুষটির কাজে বাধা জন্মাইতে তাহার মন চাহিল না।

চর্মকার দেখিয়াছে, দুয়ারে তাহার এক আগন্তুক দণ্ডায়মান। ঝড় বাদলে নিশ্চয়ই লোকটি আশ্রয় চায়। ত্রস্তেব্যস্তে বাহিরে আসিয়া সেলাম জানাইয়া কহিল, "বাবা, এ ঘর এ গরীব চামারের—তাই কি ঢুকতে চাচ্ছেন না?"

উত্তর হইল, "না বাবা, তা মোটেই নয়। আমি যে দীনদয়াল হরির এক হীন দাস। আমার কি কখনো অভিমান সাজে? ভাবছিলাম পাছে তোমার কাজে বাধা হয়, মজুরি তোমার কমে যায়।"

চর্মকার ছাড়িবার পাত্র নয়। নমস্কার জানাইয়া কমালকে বার বার অনুরোধ জানাইতে থাকে। অগত্যা তিনি গৃহের অভ্যন্তরে ঢুকিলেন। একখণ্ড মলিন চামড়া ঝাড়িয়া নিয়া গৃহস্বামী তাহার বিশিষ্ট অভ্যাগতকে বসিতে দিল। কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার! আগন্তুক তাঁহার আসনে বসিবামাত্রই এমন আকুলভাবে কাঁদিতেছেন কেন? হাত দুইটি অঞ্জলিবদ্ধ, অর্ধনিমীলিত নয়ন হইতে অশ্রুধারা কপোলে গড়াইয়া পড়িতেছে। চর্মকার বড় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "বাবা, আমি ইচ্ছে ক'রে কিন্তু আপনার মনে আঘাত দিই নি। এ গরীবখানায় চামড়ার টুকরো ছাড়া আসন দেবার মতো আর যে কিছুই নেই।"

প্রকৃতিস্থ হইয়া কমাল কহিলেন, "না ভাই, তা নয়। তুমি চামড়ার আসন দিয়েছ বলে আমার এ কান্না নয়। তোমাকে দেখে আজ আমার নিজের ভেতর চোখ পড়েছে আর সেই জন্যই উথলে উঠেছে এই অশ্রুরাশি। যা কিছু বস্তু তোমার আছে—সরল প্রাণে একান্ত প্রেমে তাই তো তুমি আমার সম্মুখে বিছিয়ে দিয়েছ। এখানে বসে নিজের অন্তস্তলে আজ চেয়ে দেখলাম—এমন সহজ, এমন সার্থক তো আমি আজো হয়ে উঠতে পারি নি। আজকের দিনে আমি তোমার ঘরের ছাঁচতলায় যেমনটি দাঁড়িয়েছিলাম, আমার প্রাণপ্রভু যে তেমনি ক'রে রোজ এই জীবনের দ্বারদেশে অপেক্ষমান থাকেন, আর রোজই তিনি ব্যথাতুর অন্তরে ফিরে ফিরে যান। যা কিছু সামান্য বস্তু আমার আছে, তা তো আমি তোমার মতন এমন সহজ হয়ে, এমন নম্র ও নিরভিমান হয়ে, তাঁর সামনে আজো বিছিয়ে দিতে পারিনে। অহঙ্কারের কত সূক্ষ্ম গ্রন্থি জড়ানো রয়েছে আমার

জীবনে, আমাব সাধনায। তাই তো প্রেমভিখাবী প্রভু আমাব এমন ক'রে বাব বাব যান ফিবে। নিজেব দোষেই যে তাঁকে এমন ক'বে আমি ফেবাচ্ছি। সেই কথা মনে ক'বেই তো বেদনাব অশ্রু এমন ক'রে ঝবে পডছে।"

সবলপ্রাণ নিবক্ষব চর্মকাব সাধক কমালেব এ হৃদযবেদনা ও ভাবাবেগেব অনেক কিছুই হযতো বুঝিতে পাবে নাই। কিন্তু তাহাব সবল স্বচ্ছন্দ জীবনেব মর্মকোষে এই অশ্রুজল, বিবহ-বেদনাব এই কবুণ দৃশ্য অজানা ব্যথাব স্পন্দন জাগাইযা তুলিল।

সসঙ্কোচে প্রশ্ন কবিল, "কিন্তু, কে আপনাব এই প্রভুটি ?"

"বৎস, সবাব যিনি প্রভু, তিনিই আমাব জীবন-প্রভু।"

"তিনি কি তাহ'লে আমাবো প্রভু ? আমাব এই জীবনেব দোবগোড়াযও কি তিনি এমনিভাবে অপেক্ষা ক'বে আছেন ?"

"হ্যাঁ গো—হ্যাঁ, সবাব তিনি, সর্বমানবেবই জীবনেব দ্বাবে অতুল ধৈর্য নিযে দিনেব পব দিন তিনি অপেক্ষা ক'বে থাকেন। তিনি তোমাব জন্যও বযেছেন। শুদ্ধ হযে, প্রেমে গলে, সহজ হযে, তবে তাঁকে তুমি আহ্বান ক'বে নাও। এই তো মানুষেব সাধনাব মূলকথা—মর্মকথা।''

বাহিবেব ঝড়-জল ততক্ষণে থামিযা গিযাছে। কিন্তু চর্মকাবেব মর্মতলেব ঝড়-জল থামিতেছে কই ? তাহাব উদাস নযন দুইটি হইতে অবিবাম ধাবে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইযা পডিতেছে।

সন্ধ্যাব ঘনাযমান অন্ধকাবে সাধক কমাল আশ্রযদাতা মুচিকে আশীর্বাদ জানাইযা বিদায নিলেন। সেদিনকাব এই আশীর্বাদপূত চর্মকাবই ভাবতবিশ্রুত পবমভক্ত দাদু, মধ্যযুগেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ মবমিযা সাধক। আব তাঁহাব গৃহে আগত এই কমাল হইতেছেন লোকগুবু কবীবেব পুত্র ও সার্থকনামা শিষ্য।

এই দুর্জ্ঞেয ঐশ বিধানে নির্দিষ্ট পবম লগ্নটিতে দাদুব গৃহে প্রবেশ কবিযা কমাল তাহাব অন্তরটিকে সেদিন বাঙাইযা দিযা গেলেন। এই অনুবঞ্জনেব স্পর্শ উত্তবকালে সমগ্র উত্তবভাবতেব ভক্তসমাজে বিস্তাবিত হইযা পডে।

কমাল চলিযা গিযাছেন। দাদুব হাতেব কাজ তখনও অসমাপ্ত। কুটিবেব ক্ষীণ প্রদীপটি জ্বালাইযা আবাব তিনি চামডাব মশক সেলাই কবিতে বসিলেন। ইহাই যে তাহাব জীবিকা। কিন্তু মন যেন বাব বাব কোথায উধাও হইযা যায, হাতেব সূচসুতা অতর্কিতে থামিযা পডে। অন্তবেব অন্তস্তলে ধ্বনিত হয অস্ফুট বিবহ গুঞ্জন, '—আমাব জীবন মবণেব প্রভু! যুগ যুগ ধবে এমনি ক'বেই কি তুমি দাঁডিযে বযেছো ? সহজ হযে একান্ত হযে, কবে তোমায আমাব হৃদযে স্থাপন কবতে পাববো, তা আমায বলে দাও।'

দযাল কমাল সেদিন দাদুব জীবনেব রুদ্ধ স্রোতকে উন্মুক্ত কবিযা দিযা গিযাছেন। দীন ভক্ত তাই দিনেব পব দিন তাঁহাব নিকট গিযা যুক্তকবে দণ্ডাযমান হন। মিনতি কবিযা বলেন, "বাবা, প্রভুব কথা বলে সেদিন আমায পাগল ক'বে এসেছো, এবাব তাঁকে এনে আমাব হৃদযাসনে বসাবাব উপায বলে দাও। আলোবেব সন্ধান কোথায পাবো, কৃপা ক'বে তুমি আমায বলো। আমাব চাবিদিকেই যে বযেছে কেবল পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকাব।"

সাধক কমাল আশ্বাস দিযা বলেন, "ভাই, তোমাব দুর্ভাবনাব প্রযোজন নেই। তিনি প্রভু—আবাব তিনিই যে গুবু। ব্যাকুলতা, প্রেম তোমাব যেমন বাড়বে, তেমনি সাধনাব

পথও সুস্পষ্ট, সুগম হয়ে উঠতে থাকবে। আলোকোদ্ভাসিত হবে প্রভু তখন নিজেই যে দেবেন দর্শন।"

জন্মজন্মান্তরের তপস্যার আগুন সঞ্চিত হইয়া আছে এই কাঙাল চর্মকারের জীবনসত্তায়। ইহারই উত্তাপে জীবন ভরিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া ফিরিয়াছেন, অজানা বেদনার বোঝা বুকে বহন করিয়া প্রিয়মিলনের লগ্নটির জন্য এতদিন রহিয়াছেন প্রতীক্ষমাণ। মরমিয়া সাধক কমালের স্পর্শ তাহার মধ্যে আজ এক নূতন রূপান্তর ঘটাইয়া দিল। প্রেমের তপস্যায় তিনি ব্রতী হইলেন, আলোকময় সাধনবর্ত্মটি খুলিয়া গেল। দাদুর বাণীতে ইহার নিদর্শন রহিয়াছে—

গৈব মাঁহি গুরুদেও মিলা পায়া হম পরসাদ।
মস্তক মেরা কর ধরা দীক্ষ্যা হুয়া অগাধ॥

—বন্ধ্রহীন তিমির ভেদ ক'রে গুরু আমার প্রকাশিত হলেন, তাঁর প্রসাদ আমি লাভ করলাম। আমার শিরে হাত রেখে তিনি দিলেন আশীর্বাদ আর আমি পেলাম তার অগাধ দীক্ষা।

১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে, শুক্লাষ্টমী তিথিতে বৃহস্পতিবার দিন ভক্ত দাদু আবির্ভূত হন। এক দীনহীন মুসলমান ধুনকরের পুত্ররূপে তাঁহার জন্ম। ধনবান ও ঐতিহ্য-সম্পন্ন হিন্দু বা মুসলমান গৃহে যে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ আছে তাহা কোনোদিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অশিক্ষিত এই চর্মকার বালকের মধ্যে দৃশ্যতঃ এমন কিছুই সেদিন দেখা যায় নাই যাহা তাঁহার উত্তরজীবনের পরিণত ও পুষ্পিত রূপটির সম্ভাবনা জানাইয়া দেয়।

অন্তরের সহজ প্রেম ও নিরভিমানতাই ছিল দাদুর জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য। ইহার মধ্য দিয়া মরমিয়া সাধনার রসোজ্জ্বল ধারাটি ধীরে ধীরে বিস্তৃততর হইয়া উঠে।

এই পরম ভক্তের বাল্যজীবনের তথ্য খুব কমই পাওয়া যায়। শুধু জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম ছিল লোদি, আর মাতা ছিলেন বসীবাঈ। চামার পল্লীর দারিদ্র্য ও অশিক্ষার মধ্যে থাকিয়া, নিজের সহজাত গুণাবলীর উপর নির্ভর করিয়াই দাদু অগ্রসর হন।

বাল্য ও কৈশোরের পর যৌবনেও কোনো অসাধারণত্ব তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইতে দেখা যায় নাই। দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট সাধারণ গৃহস্থের জীবনই তিনি অনুসরণ করিয়া চলেন। প্রেমময়ী পত্নী 'হওয়া' এবং চারটি পুত্রকন্যা নিয়া ছিল তাঁহার সংসার। উত্তরকালের সাধন জীবনে নশ্বর ও দুঃখময় বলিয়া এই সংসারকে দাদু কিন্তু অস্বীকার করেন নাই। নিত্য ও অনিত্য, সৎ ও অসৎ তাঁহার দৃষ্টিতে একাকার হইয়া যায়।

দাদুর জ্যেষ্ঠ পুত্র গরীবদাস পরবর্তীকালে সুবিখ্যাত মরমিয়া সাধকরূপে কীর্তিত হইয়া উঠেন। কনিষ্ঠ পুত্র মস্‌কীনদাস এবং কন্যাদ্বয়—ননীবাঈ ও মাতাবাঈও আধ্যাত্মিক জীবনের পথে বহুদূর অগ্রসর হন।

জীবনের বাতায়নে এবার দেখা দেয় নূতন আলোকের অভ্যুদয়, এ আলোকের হাতছানিতে দাদু ঘরের বাহির হইয়া পড়েন। দেশ দেশান্তরে এ সময়ে শুরু হয় তাঁহার পর্যটন। কাশী, বিহার এবং বাংলার বহু স্থানে তিনি পরিব্রাজক সাধকরূপে ঘুরিয়া বেড়ান। সহজ মত, শূন্যবাদ, নিরঞ্জনবাদ, নাথপন্থের সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক কিছুই আস্বাদন করিয়া এসময়ে তাঁহার দিন কাটে। কথিত আছে, নাথপন্থের যোগসাধনায় দাদু এক সময় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন এবং 'কুম্ভারীপার' নামে তিনি নাথযোগীদের

মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন। কুম্ভারীপার রথাটি ছিল এই পন্থের এক প্রাচীন মহাযোগীর যোগবিভূতির দ্যোতক। দাদুপন্থী যোগীদের মধ্যে আজিও কোথাও কোথাও কুম্ভারীপার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ সযতনে রক্ষিত আছে। এই সব গ্রন্থের নাম—অজপা গায়ত্রী গ্রন্থ, বিরাট বিরাট পুরাণ যোগশাস্ত্র, অজপা গ্রন্থ অথব অজপা শ্বাস।

সাধক দাদু তাঁহার পরিব্রাজনকালে বাংলায় আসিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন। এই সময় বাঙালী নাথপন্থ যোগীদের সান্নিধ্য ও শিক্ষা হইতে তিনি উপকৃত হন। দাদু-পন্থীদের বাণী সংগ্রহের মধ্যে বাঙালী নাথযোগীদের ভাব ও ভাষার বিস্ময়কর নিদর্শন রহিয়াছে—

দাদু হিন্দু তুরুকন হোইবা সাহেব সেতী কাম।
ষড দর্শনকে সংগ ন জাইবা নিরপথ কহিবা রাম॥

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের পর দাদু রাজপুতনার অন্তর্গত সাংভরে অবস্থান করেন। এবার শিষ্যমণ্ডলী ও পরিবারবর্গসহ এক পূর্ণাঙ্গ ও সুসমঞ্জস জীবন রচনায় তিনি ব্রতী হন। স্বজনবর্গের সঙ্গে তিনি নিজেও প্রতিদিন জীবিকা অর্জনের জন্য কিছুটা পরিশ্রম করিতেন। বলাবাহুল্য, এ সময়ে শিষ্যগণ সমেত তাঁহার পোষ্যদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। তাই কষ্টেই তাঁহার দিনাতিপাত হইত। তবে, ভরণপোষণের জন্য শ্রীভগবানের শক্তিই অন্তরাল হইতে কাজ করিতেছে—সর্বসময় ইহাই ছিল ভক্ত দাদুর দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার বাণীতে রহিয়াছে—

দাদু রোজী রাম হৈ রাজিক সিজক্ হমার।
দাদু উস পরসাদে সোঁ পোষ্যা সব পরিবার॥

অর্থাৎ, হে দাদু, রামই আমার প্রতিদিনকার অন্ন, তিনিই আমার বৃত্তি, তিনি আমার জীবিকা। তাঁর প্রসাদ পেয়েই তো চলে আমার সমস্ত পরিবারের পোষণ।

মন্দির মসজিদের গণ্ডী মানিবার বালাই দাদুর নাই, হিন্দু ও মুসলমানের ভেদরেখাও তাঁহার সাধনোজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সকল মানবের কল্যাণের জন্য সত্যানুসরণের সহজ সর্বজনীন পথটি তাই তিনি খুলিয়া দিলেন।

সনাতনপন্থী হিন্দু সাধক ও মুসলমান উলেমারা আসিয়া কহিতেন, "দাদু, ধর্মসাধন বা সেবাকার্য যা কিছুতেই মানুষ ব্রতী হয়—একটা সম্প্রদায়ে থেকেই তো সে তা করে। তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের ?"

উত্তরে তিনি বলিতেন, "ভাই—চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, জল—এরাও তো নিরন্তর সেবাকর্মে রত। এরা কোন্ দল বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের অন্তর্ভুক্ত, বল তো ?"

প্রকাশের সহজ দীপ্তিতে, সহজ করুণায় যে জগদ্গুরু পরমেশ্বর চির বর্তমান তাঁহার সাথেই দাদুর অন্তরঙ্গতা ও নিবিড় পরিচয়। তাঁহার পরমাশ্রয় ছাড়া যে তিনি আর কিছুই জানেন না, জানিতেও চাহেন না। তাই তিনি জিজ্ঞাসুদের জানাইয়া দেন, 'অলখ্ ইলাহী জগৎগুরু দূজা কোঈ নাঁহি।' সেই অলখ্ ঈশ্বরই জগৎগুরু, দাদুর চোখে আর দ্বিতীয় কেহই নাই। উদার সাধক দাদুর অনুবর্তী ও অনুরাগী ভক্তদের লোকে এই সময় হইতে 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' বলিয়াও অভিহিত করিতে থাকে।

নৈষ্ঠিক ও সনাতন পথের বাঁধা-ধরা পদ্ধতির সাধক দাদু ছিলেন না, শুষ্ক জ্ঞানমার্গীর পথকেও তিনি সযত্নে পরিহার করিতেন। প্রেমে ও ভক্তিতে রসায়িত হইয়া মধুর সাধনার মধ্য দিয়া প্রতি ভক্তের জীবন শতদলকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতেন। রঙে, রসে, উচ্ছলো

তাঁহার এই সাধনার ঐশ্বর্য উপচিয়া পড়িত, গভীর আত্মিক সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য ও ভক্তগণ সহ তিনি ভজন ও নৃত্যগীতে আনন্দে বিভোর হইতেন। গুজরাটের কাঠিয়াবাড় অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে করিতে দাদু একবার ভজনিয়া দলের মন্দিরা বাদ্য এবং নৃত্য দেখিয়া মোহিত হন। ইহার পর নিজের পরিকরদের মধ্যে উৎসাহ সহকারে তিনি নৃত্যগীতের প্রচলন করিয়াছিলেন।

এই নৃত্যগীতময় সাধনভজনে দাদু কিন্তু অন্তরের আকুতি ও ভাবময়তার উপরই জোর দিতেন। একবার এক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী দাদুর কীর্তন-সভায় বসিয়া গান গাহিতেছেন। তাঁহার সঙ্গীত-শৈলীতে তান কর্তবোর প্রবাল্য বড় বেশী। ভক্তপ্রবর দাদু এই কালো-য়াৎটিকে ডাকিয়া পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিলেন ভাই প্রভুর স্তুতি এমন করে গাইতে হয় কি? এমনভাবে সদাই গাইবে যাতে তাঁকেই প্রধানতঃ প্রকাশ করা হয়। সতর্ক থাকবে, কখনো তোমার নিজের প্রকাশটা যেন সেখানে বড় না হয়ে ওঠে তা'হলে সে ভজন-স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার এ ললিতকলাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

সেবার নারায়ণ গ্রামে সাড়ম্বরে হোলী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রসিদ্ধ গায়ক বখ্‌নাজী এই উপলক্ষে সোৎসাহে বসন্তের গান গাহিয়া আসর মাৎ করিতেছেন। দাদু আবেগভরা কণ্ঠে হঠাৎ শিল্পী বখ্‌নাকে কহিলেন, "ভাই, আজ এই বসন্তকে তোমার সঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলবার যত কিছু প্রয়াস সবই যে অর্থহীন সমস্ত উৎসবই যে ব্যর্থ—যদি স্বামীর সঙ্গে, প্রিয়তম প্রভুর সঙ্গে তোমার মিলন না ঘটে। যত কিছু শোভা নাচ গানের আড়ম্বর একেবারেই যে বৃথা। —'ঐসি দেহ রচী রে ভাই রাম নিরঞ্জন পাবো আই।'— এমন দেহ অমন আনন্দ, যাঁর রচনা, তাঁর গুণগান করো, ভাই।"

কালোয়াৎ বখ্‌নার জীবনের নির্দিষ্ট শুভলগ্নটি সেদিন আসিয়া গিয়াছে, তাই দাদুর মধুর প্রেমময় বাণী অশ্রুসজল নয়ন দুইটি শিল্পীর সমগ্র জীবনের ভিত্তিটি টলাইয়া দিল। বখ্‌না ঈশ্বরের নাম সুধায় মত্ত হইলেন। দাদুর পরমাশ্রয় প্রাপ্তির পর এক শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে তাঁহার রূপান্তর ঘটিয়াছিল।

পরবর্তীকালে দাদু চৌদ্দ বৎসর কাল রাজপুতনার আম্বেরে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অনুগামী সাধকদের সংখ্যা ক্রমে আরও বাড়িয়া উঠে। শিষ্য ও ভক্তদল নিজেদের গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিতেন; কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে দাদুর নেতৃত্বে তাঁহারা মিলিত হইতেন। কখন কখন বিভিন্ন ধর্মের আচার্য ও উলেমাদেরও এখানে দেখা যাইত। ধর্মচর্চা আর ভজন-কীর্তনে এই মিলনসভায় অধ্যাত্ম-আনন্দের বাণ ডাকিত। এই মিলন-কেন্দ্রটি ছিল প্রত্যেক ভক্ত ও সাধকের এক পরম আশ্রয়স্থল, তত্ত্ব ও সাধনার আদান-প্রদানের এক উদার ক্ষেত্র। দাদুপন্থীরা ইহার নাম দেন অলখ্‌দরীবা—অলখ্ নিরঞ্জনের আনন্দ হাট।

একদিকে এই আনন্দ হাট ও ইষ্টগোষ্ঠী অন্যদিকে আন্তর সাধনার গভীর রসে দাদু নিমজ্জিত। প্রেমের সাধনায় তখন তিনি একেবারে সর্বস্ব পণ করিয়াছেন। সকল আকর্ষণ, সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া, দাদু আপন স্বামীর মধ্যে ডুবিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে চাহেন। তাঁহার সমসাময়িক বাণীতে পাই—

দাদু হৈ কো ভয় ঘণা নাঁহী কোঁ কুচ নাহি
দাদু নাহী হোই রহু আপনে সাহিব মাঁহি।

—হে দাদু, যাহার অনেক কিছু আছে তাহার যে ভয়ও আবার অনেক, যাহার কিছু

নাই তাহাব ভযও তেমিন নাই। হে দাদু, আপন স্বামীব মধ্যে তাই 'নাই' হইযাই থাক—আপন সত্তা ও 'আমি'কে নিঃশেষিত কবিযা দাও। পবমভাগবতেব দৃষ্টিতে সাধনার যে মূলতত্ত্বটি ধরা পডিযাছে তাহাও তিনি ভক্তদেব শুনাইলেন—

জহাঁ বাম নহীঁ মৈ তহঁ নাহি বাম।
দাদু মহল বাবিক হৈ দাউ কু নাহী ঠাও॥

—যেখানে আমাব বাম (ঈশ্বব) আছেন সেখানে আমিত্বেব লেশ নেই। আব যেখানে 'আমি' বযেছি সেখানে নেই বাম। হে দাদু, বড সূক্ষ্ম বড অপবিসব সে মন্দিব—ঐ দুবেব সেখানে ঠাঁই নেই।

শ্রীভগবানেব সহিত ভক্ত সাধকেব শুদ্ধ সত্তাব এই পবম মিলনই যে পবম প্রাপ্তি। ইহাবই প্রতীক্ষায যে দাদুব হৃদয তখন আকুল হইযা উঠিযাছে। একৈকনিষ্ঠাব ফলে তাঁহাব সাধনজীবনে শুদ্ধতা আসিযাছে, প্রেম বসেব অমৃতধাবাও উদ্গত হইতেছে, কিন্তু প্রেমাস্পদেব দর্শন মিলে কই? সাধক দাদুব সমগ্র সত্তায তখন সকবুণ আবেদন ধ্বনিত হইতেছে—

দাদু পেযালা প্রেমকা সাহিব বাম পিলাই।
পবগাট পেযালা দেহু ভবি মিবতক লেহু জিলাই॥

—হে ভগবান, হে আমাব স্বামী, প্রেমেব পেযালা তো তুমি পান কবালে, বুঝলাম। কিন্তু এবাব তোমাব দিব্য দর্শনবূপ প্রত্যক্ষ পেযালাটি পূর্ণ ক'বে দাও, এই মৃতকে এবার জীবন দান কবো।

দাদুব এ প্রেমেব সাধনা আত্ম-নিবেদনেব মাধুর্য ও সৌবভে ভবপুব। একান্ত শরণাগতি ও একনিষ্ঠাব মধ্য দিযা ইহা সেই পবম একেব মধ্যেই আপনাকে নিঃশেষে বিলুপ্ত কবিযা দিতে চাহিযাছে। শত শত বৎসবেব অন্তবালে আজিও এই মবমিযা সাধকের আকুল আবেদন সমগ্র ভাবতেব ভক্তসমাজেব ভজনে ও গানে অনুবণিত হইযা ফিবে—

তুম্হ কু হমসে বহুত হৈঁ হমকু তুম্হ সা নাহিঁ।
দাদুকু জিন পবহবৈ ভু' বহু নৈনহু মাহিঁ।
তুম্হ থৈ তবহাঁ হোই সব দবশ পবশ দবহাল।
হম থৈ কবহু না হোইবা জে বীতহিঁ জুগ কাল॥
তুম্হী তেঁ তুম্হ কু মিলে এক পলক মৈঁ আই
হম থৈ' কবহু' ন হোইগা কোটি কলপ জে জাই।

—হে বাম। আমাব মতো তোমাব অনেক আছে, কিন্তু তোমাব মত আমাব যে আর কেউ নেই! দাদুকে কখনো ক'বো না পবিত্যাগ। থাক সদাই আমাব নযনে নযনে। তোমা হতেই হবে সব কিছু—দরশ, পবশ ও প্রেমবৈবশ্য। আমি জানি, আমা হতে হবে না কিছুই যুগ-যুগান্ত কাটলেও। প্রভু, তোমাব কৃপা হলে যে এক পলকেব ভেতব তোমায় লাভ কবি, কিন্তু আমাব শক্তি দিযে কোটি কল্পকালেও যে তা হবে না।

দযিতেব সহিত দাদুব মিলনেব এই সাধনা কিন্তু দুশ্চব তপস্যা ও দৈন্যময জীবনেব পথে নয। অনাবিল প্রেমবসে বসাযিত হইযা, শোভায, সৌন্দর্যে পূর্ণ হইযা, এ এক আনন্দমধুব প্রিয পথ-যাত্রা। দাদুব অন্তবঙ্গ শিষ্য বজ্জবেব সাধন ও আচবণে এই বসোজ্জ্বল তত্ত্বটি পবিস্ফুট হইযা উঠিতে দেখা যাইত। তাঁহাব প্রেমসাধনায ভাবতন্মযতাব সহিত মিশ্রিত থাকিত ববেবেশেব অনুবূপ সাজসজ্জা। কেহ তাঁহাব এই বেশভূষা সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিলে

দাদুর এই বিখ্যাত পরিকর কহিতেন, "ভাই, আমার প্রিয়তমের সঙ্গে কি দীন হীন, অশুচি বেশে মিলিত হওয়া শোভন হয়? প্রেম, আনন্দ আর ঐশ্বর্যই যে এ মহামিলনের পাথেয়।"

ভক্ত দাদুর একটি মনোরম বিরহ অঙ্গের প্রার্থনায় তাঁহার নিজের প্রেমমধুর জীবনদর্শন যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল—

আজ্ঞা অপরংপারকী, বসি অংবর ভরতার।
হরে পটংবর পহিরি করি ধরতী করৈ সিংগার॥
বসুধা সব ফুলৈ ফুলৈ, পিরথী অনংত অপার।
গগন গরজি জল থল ভরৈ, দাদু জৈ জৈ কার॥
কালা মুহু করি কালকা, সাই সদা সুকাল।
মেঘ তুম্হারে ঘরি ঘণা, বরসহু দীন দয়াল॥

অর্থাৎ, অনন্তের মহা নির্দেশ—আকাশ পরিপূরিত ক'রে স্বামী আমার বিরাজমান! তাই তো সবুজ পট্টাম্বরে ধরিত্রী ধরেছে এমন শৃঙ্গারবেশ। সারা বসুধা আজ ফলে ফুলে শোভিত, পৃথিবী অনন্ত অপার—গগনের গরজনে জলস্থল উঠ্‌ছে ভরে। হে দাদু, শোন প্রভুর জয়জয়কার। কালের মুখে কালি লেপন ক'রে স্বামী আমার সদাই সুকালরূপে বিরাজমান। তোমার আলয়ে রয়েছে অজস্র ঘন মেঘের রাশি—হে দীন দয়াল, আজ তা কারো বর্ষণ।

বিরহের জ্বালা ও সাধনের মন্থনে দাদুর জীবনে তাঁহার পরম প্রার্থিত অমৃত উদ্গত হইল, ভগবৎ দর্শন পাইয়া এবার তিনি কৃতার্থ হইলেন। এই সাধনা ও সিদ্ধির ইঙ্গিত ভক্তপ্রবর তাঁহার বাণীতে রাখিয়া গিয়াছেন—

মথি করি দীপক কীজিয়ে, সবঘটি ভয়া প্রকাশ।
দাদু দীওয়া হাথি করি গয়া নিরংজন পাস।

—এই সাধনসত্তারূপ ঘটকে মন্থন ক'রে ঘৃতের প্রদীপ দাও জ্বালিয়ে। সে আলোতে সব ঘটই হয়ে গেল প্রকাশিত। দাদু, সেই প্রদীপ হাতে নিয়ে দাঁড়ালাম আমি নিরঞ্জনের পাশে।

সাধনার সার্থকতা এবার দাদুর জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়, সদ্গুরুর কৃপায় অতীন্দ্রিয় জীবনের রুদ্ধদ্বার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়। মহাজীবনের পদ্মটি রঙে রসে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সৌরভে তাহার চারদিক আমোদিত। অজানা আকর্ষণে দিক্‌বিদিক হইতে মুক্তি-লোভী মুমুক্ষুদল লুব্ধ ভ্রমরের মতো আসিয়া ভিড় করিতে থাকে, একের পর এক ভক্ত সাধকদল আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। দাদুর এই সব প্রধান শিষ্যের সংখ্যা বাহান্নজন, আর তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রজ্জবজী, সুন্দরদাস (ছোট), জাইসা, মাধোদাস, প্রয়াগদাস, গরীবদাস, বখ্‌নাজী, বনওয়ারীদাস, শঙ্করদাস, জন-গোপাল, জগজীবন ইত্যাদি। সমসাময়িক কালে ইহারা প্রত্যেকেই দাদুপন্থীদের ভাষায় এক একটি থাম্বা বা সাধনস্তম্ভের প্রবর্তকরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন।

সাধনার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মহাজীবনেই অতিপ্রাকৃত শক্তিলীলা স্ফুরিত হইয়া উঠে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে যাহা নিতান্ত অলৌকিক ও বিস্ময়কর, লোকোত্তর মানবদের জীবনে তাহাই হইয়া উঠে নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। পরমভাগবত দাদুর মধ্যেও এ শক্তির বিচ্ছুরণ মাঝে মাঝে দেখা যাইত। দাদুপন্থীদের গ্রন্থে গুরুর এই বিভূতি প্রকাশের নানা উল্লেখ রহিয়াছে।

একবার ভক্ত দাদু চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে আঁধি গ্রামে কিছুদিন বাস করেন। বহুপ্রার্থিত বৃষ্টিপাতের কোনো লক্ষণই এ সময় সেখানে দেখা যাইতেছে না। অজন্মা ও শস্যহানির ভয়ে জনসাধারণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। সকলে মিলিয়া তখন সাধক দাদুকে চাপিয়া ধরিল, বারি বর্ষণের একটা ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতেই হইবে। কথিত আছে, দাদুর এক মিনতিপূর্ণ ভগবৎ সংগীতে অবিলম্বে সেখানে প্রচুর বারিপাত ঘটিয়াছিল।

টোঁক অঞ্চলে একবার বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্ত ও সাধু-সন্তের আগমনে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠে। অতিরিক্ত জনসমাগমের ফলে এই সময়ে খাদ্য দ্রব্যের টান পড়িয়া যায়। উদ্যোক্তারা ভীত হইয়া ভক্তপ্রবর দাদুর শরণ নিলেন, তাঁহার কৃপা ছাড়া যে এ বিপদ হইতে উদ্ধারের কোনোই আশা নাই। দাদু-পন্থীদের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, দাদু তাঁহার উপাস্যের ভোগ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে ভোজ্যের ভাণ্ডার সেদিন যেন অক্ষয় হইয়া উঠিল। মহোৎসবের আয়োজনের অনুপাতে অতিথি অভ্যাগত সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী ছিল। কিন্তু দাদুর অলৌকিক শক্তি প্রকাশের ফলে সকলকেই পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতে সেদিন কোনো অসুবিধা হয় নাই।

এই ধরনের বিভূতি বা সিদ্ধাই প্রদর্শনের পক্ষপাতী দাদু নিজে কিন্তু কখনো ছিলেন না। শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই কৃপা করিয়া কখনো কখনো তিনি ইহা ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে প্রকাশ করিতেন। পতিব্রতার মতো একান্ত নিষ্ঠা ও স্মরণ মনন ছিল এ পরমভাগবতের স্বভাবধর্ম। ভক্তি-প্রেমের এই অনন্য সাধনা তাঁহার কাছে ছিল জীবনের মূলে রস সিঞ্চনের মতো। স্বামীর সাথে যুক্ত হইলেই তো তাঁহার সব ঐশ্বর্য মুহূর্তে করতলগত হইয়া যায়—দাদুর বাণীতে এই সুরটিই পরিস্ফুট—

> নাউঁ নিমিত্ত হরি ভজে। ভগতি নিমিত্ত ভজি সোই ॥
> সেবা নিমিত্ত সাঁই ভজে। সদা সঁজীবনী হোই ॥
> হিরদৈ রাম রহৈ জা জন কৈ ॥ তা কৌঁ ঊনা কৌন কহৈ।
> অঠ সিধি নও নিধি তাকৈ আগৈ সম্মুখ ঠাঢী সদা রহৈ ॥

অর্থাৎ নামের নিমিত্তই করতে হবে যে হরির ভজন, ভক্তির নিমিত্তই করতে হবে ভজন, সেবার নিমিত্তই করতে হবে ভজন, সেবার নিমিত্তই করতে হবে স্বামীর পূজো। সদা সঞ্জীবনী রসরূপে যে তিনিই বর্তমান সর্বত্র। যাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন রাম, কে তাকে বলবে ক্ষুদ্র বা ঊন? অষ্টসিদ্ধি নবনিধি সব কিছুই যে কিঙ্করের মতো থাকে দণ্ডায়মান সে ভক্তের কাছে।

দাদু কহিয়াছেন, "যোগ সমাধি সুখ সুরতি সৌঁ, সহজৈ সহজৈ আর।" একদিকে যোগ সমাধি সাধনবর্ত্ম, আর অপর দিকে আনন্দ সুরতি—ইহার মধ্যে দিয়া যে সহজ পথ তাহাই দাদু প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়া যান। কিন্তু যোগীর সাধনাকে এই মহাপ্রেমিক কি একেবারে এড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি বিশিষ্ট বাণীতে কিন্তু ইহার ইঙ্গিত রহিয়া গিয়াছে। "হে দাদু সবদ (সংগীত) হলো সূচ, প্রেমধ্যান হলো সুতো, এই কায়াকেই করলাম আমার কন্থা যোগী যুগের পর যুগ এই কন্থাই করেন পরিধান, এ তো কখনো হয় না ছিন্ন।"

দাদু তখন আম্বেরে বাস করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে মুমুক্ষু হিন্দু মুসলমান সাধকদের ভিড়। মরমিয়া সিদ্ধপুরুষরূপে তখন সারা উত্তর ভারতে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এ খবর সম্রাট্ আকবরের কানে পৌঁছিতেও দেরি হয় নাই। সাধুসন্ত দর্শনে সদা উৎসাহী সম্রাট্ দিল্লী হইতে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

দাদুর নিকট উপস্থিত হইয়া দূত নিবেদন করিল, "সম্রাট্ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হয়েছেন।"

ভক্ত দাদুর কাছে এ যেন এক রহস্যের প্রস্তাব। ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ভাই, আমি বুঝতে পাচ্ছিনে, আমার সাথে দিল্লীর বাদশাহের সাক্ষাতের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? আমায় নিয়ে এমন টানাটানি কেন বলতো? আমি তো ভাই যেতে পারবো না।"

দূতের মুখে সব কথা শুনিবার পর সম্রাট্ কহিলেন, "শোন, এই মহাসাধকের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে তুমি ভাল করো নি। তুমি আবার সেখানে যাও। তাঁকে নিবেদন করো, ভগবৎপ্রসঙ্গ-লুব্ধ আকবর আপনার দর্শন প্রার্থনা করেছেন। কবে কোথায় সাক্ষাৎ হবে, আপনি দয়া ক'রে বলুন।"

ভক্ত দাদু এবারও স্পষ্ট কথা বলিতে ইতস্তত করিলেন না। জানাইলেন—ঐশ্বর্যময় দিল্লীতে গিয়া দেখা করিলে সম্রাট্ যেমন তাঁহাকে ঠিক মতো চিনিতে পারিবে না, তেমনি তাঁহার নিজেরও অসুবিধা হইবে যথেষ্ট। ঐ ভিড় ও আড়ম্বরের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইবে।

আকবর উত্তরে জানাইলেন, "রাজধানীর রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে আপনাকে ডেকে আনবো এমন মূঢ় আমি নই। সাগর থেকে একপাত্র জল নিয়ে এসে সাগরের রূপ কি কখনো দেখা যায়? উত্তরাখণ্ডের একখণ্ড শিলা এনেই বা হিমালয়ের মহিমা কি বুঝবো আমি? আপনাকে আপনার নিজস্ব পরিবেশে ভক্তসাধকের কেন্দ্রস্থলেই দর্শন করতে যেতাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি এই দেশের সম্রাট্। আমি আপনার ওখানে গেলে আলোড়ন হবে, আপনার সাধনস্থলটি কম উপদ্রুত হবে না। আপনি বা আমি কেউ-ই স্বস্তি পাবো না।" অতঃপর স্থির হইল, উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে ফতেপুর সিক্রির নিকটে এক নির্জন প্রান্তরে।

কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিষ্যসহ দাদু সম্রাটের সহিত মিলিত হইতে চলিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার একজন ভক্ত উৎসাহভরে সেদিন কহিতেছিলেন, "আপনার এই অলখ্‌পন্থী ব্রহ্মসম্প্রদায়ের কাজে সম্রাটের সাহায্য নিলে কত সুবিধা হয়। প্রচার সংগঠনের কাজও কত এগিয়ে যেতে পারে।"

দাদু গম্ভীর হইয়া উত্তর দিলেন, "ভাই, যাঁকে প্রতিষ্ঠা করার ব্রত নিয়েছি, পূর্ণ নির্ভর যে তাঁর উপরেই সবচেয়ে বেশী থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, বল দেখি, আমিই যদি আমার প্রভুকে ত্যাগ করি, আমিই যদি তাঁর নামের ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠায় বিরত থাকি, তবে কে তাঁর দিকে অগ্রসর হবে? পরম সত্য যুগে যুগে ধীর গতিতেই যে আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য ব্যস্ত হয়ে রাজরাজড়ার সাহায্যের দিকে তাকানোর কোনো দরকার নেই।"

দাদুর সঙ্গে সম্রাট্ আকবরের ধর্মালাপ চলে প্রায় চল্লিশ দিন ব্যাপিয়া। বিশিষ্ট দাদু-ভক্তদের লেখায় এ তথ্য পাওয়া যায়। জ্ঞানপিপাসু বাদশাহ প্রাণ ভরিয়া কেবলি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন—আর সিদ্ধপুরুষ দাদু তাহার উত্তরদান প্রসঙ্গে এক পুণ্য-পরিবেশ ও অনাবিল আনন্দধারা সৃষ্টি করিতে থাকেন।

আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্, কৃপা ক'রে আমায় বলুন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ক্রম কি। আল্লাহ প্রথমে কোন্ বস্তু রচনা করলেন—আকাশ, বায়ু, জল, না ভূমি?"

দাদু স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "সে কি সম্রাট্‌। আমার প্রভুর শক্তিকে এমন সীমিত করা কেন? সর্বশক্তির আধার যিনি, তাঁর কাজ আবার কোন্‌টি আগে আর কোন্‌টি পরে করবার প্রশ্ন ওঠে কোথায়?"

এক সবদ সব কছু কিয়া ঐসা সম্রথ সেই।
আগেঁ পীছেঁ তৌ করৈ জৈ বলহীনা হোই।

অর্থাৎ, প্রভু আমার এমনই সমর্থ যে, একটি আনন্দধ্বনিতেই সমস্ত কিছু একযোগে তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। কোনো কিছু আগে পিছে তৈরি করবার প্রশ্ন তাঁর সম্পর্কেই ওঠে—যিনি বলহীন।

কথাপ্রসঙ্গে সম্রাট্‌ আকবর কহিলেন, "সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে, সন্ত কবীর তাঁর সাধনার মধ্য দিয়ে যত কিছু অধ্যাত্মতত্ত্বের নবনী উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এ কথার অর্থ কি?"

কবীরের প্রচারিত মরমিয়া সাধনাই ভক্তপ্রবর দাদুর সাধনা। অবশ্য যদিও তিনি নিজ সামর্থ্যে সে সাধনার ধারাকে বিস্তৃততর করিয়াছেন। পুরোগামী মহাসাধক কবীরকে তিনি গুরুর ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিরও সীমা নাই।

আকবরের এ প্রশ্নের সত্যনিষ্ঠ সাধক উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। উত্তর দিলেন, "সে কি কথা! যত বড় সাধকই হোন না কেন, এ ভগবৎরস-সাগরকে কে ফুরিয়ে ফেলতে পেরেছে? পাখি তার চঞ্চু দিয়ে সাগরের কতটা গ্রহণ করতে সক্ষম? একথা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির কথা, সঙ্কীর্ণ চিত্তের কথা। যদিও কবীর আমার গুরুস্বরূপ তবু আমি গুরুর নাম ক'রে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারিনে। আমার গুরুকে লাঠিরূপে ব্যবহার ক'রে অপরের মাথা ভাঙতে যাবো—সে যে আমার গুরুরই চরমতম অপমান।" এই উদার অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠার প্রকৃত মূল্য নিরূপণে সেদিন আকবরের ভুল হয় নাই।

বাদশাহের সঙ্গীয় পণ্ডিতেরা এই নিরক্ষর চর্মকারের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় বড় বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। অবশেষে তাঁহারা দাদুকে প্রশ্ন করিলেন, "সবই বুঝলাম, কিন্তু আপনি এবার স্পষ্ট ক'রে বলুন—আপনার শাস্ত্র কি, সাধনার পদ্ধতি ও মন্ত্রই বা কি?"

উত্তর হইল, "আমার এই কায়া মহলেই আমি নেমাজ পড়ি—সেখানে কোনো জনপ্রাণী আসতে পারে না। মনের মালায় নিরন্তর আমার জপ চলে, তাই স্বামীর মন তুষ্ট। চিত্তসাগরে আমার স্নান ও 'ওজু' চলে, তারপর নির্মল চিত্তখানি বিছিয়ে দিই, প্রভুকে আমার বন্দনা করি, তাঁর কাছে করি আত্মসমর্পণ।"

পণ্ডিতজন পরিবৃত সম্রাট্‌ বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে, এই সিদ্ধপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দাদু তখন ভক্ত ও পরিবারবর্গসহ আম্বেরে বাস করিতেছেন। অঞ্চলটি এ সময়ে ছিল জয়পুররাজ ভগবন্তদাসের অধিকারে। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই রাজাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাঁহার সঙ্গে সৌজন্যমূলক দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কেহ বা অনুগ্রহ ও সাহায্যের প্রত্যাশী হইয়াও রাজসভায় যাতায়াত করেন। রাজার কানে প্রায়ই দাদুর সুখ্যাতির কথা আসে। কিন্তু কই? এ ভক্ত সাধকটি যে একবারও রাজধানীতে দেখা করিতে আসেন না। আম্বেরপতির অভিষেকের দিনেও দাদু অভিনন্দন জানাইতে যান নাই। নিজের আন্তর সাধনায় তিনি তখন একেবারে ডুবিয়া আছেন, কোনো সামাজিকতা ও

লৌকিকতার ধারই ধারেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, রাজা ভগবন্তদাস দাদুর এই উদাসীন ব্যবহারের কথা বিস্মৃত হইলেন না।

ভারত সম্রাট্ আকবরের সংবর্ধনার ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি ক্রমে দাদুর উপর আরও বেশী পড়িতেছে। সিক্রিপুরে বসিয়া সর্বত্র তাঁহার খ্যাতি তখন প্রচারিত।

আম্বেরপতি অতঃপর হঠাৎ একদিন তাঁহার রাজ্যের এই বিখ্যাত সাধকটিকে দেখিতে আসিলেন। রাজা প্রশ্ন করিলেন "আপনি কতদিন আম্বেরে রয়েছেন?" দাদু উত্তর দিলেন, "মহারাজ বহু বৎসর যাবৎই আছি।

ভগবন্তদাস নিজের আত্মাভিমানকে সংযত করিয়া সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, 'কই, আপনাকে তো কখনো দেখি নি!" রাজার কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা রহিয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না! সাধক কিন্তু সব বুঝিয়াও চুপ করিয়া রহিলেন।

দাদুর মেয়ে দুইটি বড় হইয়াছে, বিবাহ দেওয়া হয় নাই। সামাজিক সংস্কার এবং আচারনিষ্ঠা—তাহা হিন্দু বা মুসলমান যাহারই হোক ভগবন্তদাস মনেপ্রাণে সদাই সমর্থন করিতেন। দাদুর উদার মতবাদ ও তাঁহার বাচনভঙ্গী রাজার মোটেই ভাল লাগিল না। মেয়েদের দেখাইয়া দাদুকে জিজ্ঞেস করিলেন, তাহাদের বিবাহের বয়স কি পার হইয়া যাইতেছে না? দাদু সবিনয়ে জানাইলেন মেয়েরা অধ্যাত্মজীবনকেই একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, সাধনভজনেই তাহারা মত্ত। আর বিবাহ? তাহারও তো উপায় দেখা যাইতেছে না 'জো পতি বর্যো কবীরজী সো করি বরো নিচাহি।—কবীর যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন মেয়েরা যে তাঁহাকেই পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে! সমাজবিধি সম্বন্ধে সদা সজাগ আম্বেররাজের কানে কথাগুলি কিছু তেমন ভাল লাগে নাই।

সেদিনের সাক্ষাতের পর ভগবন্তদাস চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাজার সহিত দাদু ও দাদুপন্থীদের মধ্যে বিরোধ যেন বাধিয়াই রহিল। ইহার কিছুকাল পরে দাদু বিরক্ত হইয়া আম্বের ত্যাগ করিয়া যান। অতঃপর মারওয়াড় বিকানীর কল্যাণপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি শেষকালে নারায়ণায় উপস্থিত হন।

দাদুর সাধনার পথ হইতেছে 'সহজ পথ'। দৈনন্দিন জীবন শাশ্বত জীবনের মধ্যে সহজ যোগাযোগ স্থাপনের মধ্যে দিয়াই ইহার পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা। তিনি তাই বলিয়াছেন "নদীর মত এরই সঙ্গে প্রতিদিনের সাধনা ও শাশ্বত সাধনার মধ্যে নিজেকে ঢেলে দাও। অনর্থক সংসারের কর্তব্যকে বাধা দিয়ে অস্বাভাবিকতার বেড়া টেনে দিও না। একই সঙ্গে তোমার সেবার দ্বারা দুই তীরের সকলকে তৃপ্ত করে তোল আবার সহজ যোগের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে মহাসাগরে মিলনানন্দ উপভোগ কর। ভক্ত সাধকের জীবনে নদীর ধর্ম ও দ্বৈতসাধনা বিকশিত হয়ে উঠুক।'

কিন্তু দাদুর এই মতবাদ তাঁহার বিপুল সংখ্যক শিষ্যের মধ্যে সকলেই অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সংসারত্যাগী সাধকের সংখ্যাও খুব কম ছিল না। তা ছাড়া, দাদুপন্থী নাগা সন্ন্যাসীদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তাহাদের প্রভাব উত্তরকালে ভারতের বহুস্থানে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

ভক্তদের সাধনভজনের সুবিধার জন্য দাদু ভক্তিরসাশ্রিত পদের দুইটি বিস্তৃত 'সংগ্রহ-গ্রন্থ' রচনার নির্দেশ দেন। তদনুসারে তাঁহার হিন্দু শিষ্য জগন্নাথজী এবং মুসলমান শিষ্য রজ্জবজী যথাক্রমে 'গুণগঞ্জনামা' এবং 'সর্বাঙ্গী' নামক দুইটি ভক্তিগ্রন্থ সংকলন

করেন। মরমিয়া সাধনার পদ এবং সংগীতের সমাবেশ যেমন এগুলিতে আছে, তেমনি নানা সম্প্রদায়ের ভক্তিসাধকদের রচনায়ও এগুলি সমৃদ্ধ।

দাদুর সাধনার মূল কথা ঈশ্বর প্রেম ঈশ্বর-বিরহ। তাঁহার দৃষ্টিতে এই প্রেম ও বিরহই পরম সত্য। কারণ, মানুষের 'আত্মসত্তা' যে পরম প্রভুরই সৃষ্টি, সেই পরম প্রভুর রসসিঞ্চনে তাহা জীবন্ত। প্রভুর জন্য ভক্ত যেমন কাঁদিয়া বেড়ায় ভক্তের জন্য প্রভু আমাদের তেমনিই কি ব্যাকুল ও বিরহ-বিধুর নহেন ? পরমতমের প্রেমাকর্ষণই যে মানুষের সাধনার রসসাগরকে অবিরত উদ্বেল করিয়া তুলিতেছে। ঈশ্বরের দিক হইতে ভক্তের জন্য এই যে চিরন্তন বিরহ বেদনা, দাদুর বাণীতে তাহার রূপায়ণ বড় অপূর্ব,

হাঁ মাঈ,

মহারো লাগি রাম বৈরাগী তজ্যা ন'হী জাঈ।
প্রেম বিথা করত উর অন্তর বিসুরি সুখ ন'হী পাঈ।
জোগিনী হ্বয়ৈ ফিরৃ'গী বিদেশ জীউকি তপনী মিটাঈ।
দাদু কো স্বামী রে উদাসী ঘর সুখ রহ্যা কিনি জাঈ।

অর্থাৎ, ওগো হায়। আমারই লাগি প্রভু রাম আমার বৈরাগী, তাঁকে তো তাই আর ত্যাগ করা যায় না। অন্তর আমার প্রেমের বেদনায় আর্ত, তাঁকে বিস্মৃত হয়ে তো কোনো সুখই পাই না ? যোগিনী হয়ে এবার আমি ঘুরে বেড়াবো দেশ-বিদেশে। ওরে দাদুর স্বামী যে হয়েছেন তার তরে উদাসী, তবে আর কেমন ক'রে যায় ঘরে থাকা ?

ভক্ত দাদুর এই প্রেমের সাধনায় নামজপের স্থান খুবই উচ্চে। "মন পবনা গহি সুরতি সোঁ দাদু পাঠৈ স্বাদ"—মন ও পবন দ্বারা, অর্থাৎ মনদ্বারা প্রতি শ্বাসযোগে প্রেমের সহিত নাম নিলে, হে দাদু, পাবে তুমি অমৃতের আস্বাদ। তাঁহার এই নামজপের ক্রম সম্বন্ধেও তিনি বলিয়া গিয়াছেন—প্রথমে হয় নাম শ্রবণ, দ্বিতীয়ে উপজিত হয় নামে রস, তৃতীয়ে হৃদয় মধ্যে ধ্বনিত হয় নামগান, চতুর্থে মন হয় মগ্ন, প্রতি রোমকূপে উপচিয়ে উঠে ভক্তি ও প্রেমরস।

দাদুর 'সহজ-পংথ' ভক্ত ও সাধকের সম্মুখে সহজ তীর্থেরই পথ খুলিয়া দিয়াছিল—'সহজ সমর্পণ সুমিরণ সেবা, তিরবেশী তট সঙ্গম সপরা।'—সহজ আত্মসমর্পণ, স্মরণ ও সেবার মধ্যে দিয়াই এই পুণ্যত্রিবেণীতে সাধক উপনীত হইতে সমর্থ। কায়ার মধ্যে কায়াহীনের, সীমার মধ্যে পরম অসীমের, যে দর্শন দাদু লাভ করিলেন তাঁহার পরচা অঙ্গের বাণীতে সেকথা তিনি জানাইয়াছেন—'কায়ার অন্তরেই পেলাম আমি ত্রিকুটীর তীর। সহজেই প্রভু আপনাকে করলেন প্রকাশ, সর্বশরীরে হলেন তিনি পরিব্যাপ্ত। কায়ার অন্তরেই পেলাম সেই নিরাধার নিরাকারকে, সহজেই সেখানে তিনি নিজেকে করলেন প্রকাশিত স্বামী আমার এমনি সমর্থ। আমার কায়ার ভেতরেই উপলব্ধি করলাম তাঁর অসীম অনাহত বেণুর ধ্বনি। শূন্য মণ্ডলে বিরাজিত আপনাকে তিনি করলেন সুপ্রকট, কায়ার অভ্যন্তরেই দর্শন করলাম সেই দেবগণের দেবকে, সহজেই আপনাকে তিনি করলেন প্রকাশিত—প্রভু আমার এমনি অলখ্ এমনি অনির্বচনীয়।'

এই অপরূপ দিব্য ধামের আভাস সিদ্ধপুরুষ দাদু তাঁহার অন্তরের স্বতোৎসারিত এক সংগীতে দিয়াছেন—

বাম তহা পবঘট বহে ভরপুর।
আতম কমল জহাঁ, পবমপুবুষ তহাঁ,
ঝিল মিলি ঝিল মিলি নুব ॥
কোমল কুসুম দল,
নিবাকাব জ্যোতি জল।
বাব নহি পাব।
শূন্য সবোবব জহাঁ
দাদু হংস বহৈ তহাঁ
বিলসি বিলসি নিজ সাব ॥

—ভগবান্ সেই আত্মকমলে আছেন প্রকট হয়ে। পরমপুরুষ যেখানেই বিরাজিত জ্যোতি নিবন্তব করছে ঝিল্‌মিল্। কোমল কুসুম দল, নিবাকার জ্যোতির সলিল—শূন্য সরোবব যেখানে, সেখানে নেই কূল কিনারা। হংস হযে দাদু বহে সেখানে, বিহার ও বিলাসে আপনাকে ক'রে তোলে সার্থক।

মরমিয়া সাধক দাদুব আত্মানুভূতিতে এক অপূর্ব প্রিয মিলন, অপূর্ব আত্মিক যোগেব তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইযা উঠিযাছে—'তেজঃপুঞ্জেই রচিত এই সুন্দবী জীবাত্মা, আর তেজঃপুঞ্জেরই এই কান্তা, পরমাত্মা। তেজঃপুঞ্জেবই এই মধুব মিলনে বসন্ত হবে উঠেছে উৎসারিতা প্রেমেব পুষ্প সদাই হচ্ছে বর্ষিত। শ্রীহরির ভক্তগণ ফাগ খেলায় প্রমত্ত। দাদু তোমার পবম সৌভাগ্য যে এমন আনন্দবঙ্গ কবছো তুমি দর্শন। তাকিয়ে দ্যাখো—পরব্রহ্ম বর্ষণ করছেন অমৃতধাবা, জ্যোতিঃপুঞ্জ ঝরছে ঝিল্‌মিল্ ক'বে। সাধক পান ক'বে চলেছেন সে অমৃত। রসেব মধ্যেই যে হবে রসের বর্ষণ। তাই অনন্তকোটি ধারায় সেই বর্ষণই তো চলেছে ব'যে। দাদু সেখানে মন নিশ্চল ক'বে রাখো, তবেই তোমার ভেতর বসন্ত থাকবে সদা বিবাজিত।'

প্রেম-সাধনার সার্থকতা দাদুব সত্তাকে পূর্ণ করিযা তুলিযাছে। বহিবঙ্গ জীবনেব উপর মহাসাধক ধীবে ধীরে এক যবনিকা টানিয়া দিতেছেন। অন্তর্লোকে চলিযাছে অবিরাম আনন্দ সম্ভোগ। কিন্তু এই দিব্য অনুভূতি কাহাকেও বুঝাইতে যাওযাব মতো মন তাঁহার কোথায ?—'গূংগেকা গুড়কা কহু' মন জানত হৈ খাই, বাম বসাইন পীবতা সো সুখ কহ্যা ন জাই।' অর্থাৎ, এ যে বোবাব গুড় ভোজন। কি বলবে আব, শুধু মনই জানছে এর তত্ত্ব—বামবসামৃত পান কবার যে কি আনন্দ, তা তো মুখে যায না বলা।

দাদু আজকাল কিছুটা মৌন হইযা গিয়াছেন। ভক্তপ্রবব বাজিন্দ্ খাঁ একদিন তাঁহাকে অনুযোগ দিযা কহিলেন, "তুমি আগে ভক্ত ও মুমুক্ষু মানুষকে কত সঙ্গ দিতে, তাদের নিযে কত আনন্দবঙ্গ কবতে। এখন কেবল ভগবান্ নিযেই দিনবাত মত্ত হয়ে আছো। ভগবান্-সৃষ্ট মানুষেব কি কোনো মূল্যই আব তোমাব কাছে নেই ?"

উত্তবে ভক্তপ্রবব দাদু কহিলেন, "নিশ্চয়ই আছে ভাই। মানুষকে সত্যিকাব রূপে যে পেতে চায়, তাকে ভগবানেব মাধ্যমেই তা পেতে হবে। পবমপ্রভুব মধ্যেই যে সকলে বিধৃত। তাই তার ভেতর দিয়ে দেখাই তো যথার্থ দেখা, সেই পাওয়াই তো যথার্থ পাওয়া—

দেব নিবঞ্জন পূজিয়ে সব আয়া উস মাহিঁ।
ডাল পাত ফল ফুল সব দাদু ন্যারে নাহিঁ।

' অর্থাৎ দেব নিরঞ্জনকেই করো পূজা, তবেই বিশ্বের সকল কিছু এসে মিলবে তারই ভেতর। ডাল পাতা ফলফুল সব রয়েছে মূলদ্বারা বিধৃত। হে দাদু, এই সমস্ত বস্তুসম্ভার মূল থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

মনের গোপন মণিকোঠায় প্রেমময় স্বামীর সহিত সদাই চলে দাদুর রস-রঙ্গ, অনির্বচনীয় লীলা-বিলাস। শ্যামসুন্দর বনমালী আজ যে দাদুর মনমালীরূপে অবতীর্ণ! পরমভক্তের অধ্যাত্মসত্তায় উপবনটি রচনা করিয়া, পুষ্প-আকীর্ণ অঙ্গনে, পরমপ্রভু আজ কি মধুর খেলাই খেলিতেছেন।—

মোহন মালী সহজি সমানাঁ
কৈ জানৈ সাধু সুজানাঁ।
কায়া বাড়ী মাঁহে
মালী তহাঁ বাস বনায়া।
সেবক সোঁ স্বামী খেলন কোঁ
আপ দয়া করি আয়া॥
বাহরি ভীতরি সব নিরংতরি
সব মৈঁ রহ্যা সমাই।
পরগট গুপত গুপত পুনি পরগট
অবিগতি লখ্যা ন জাঈ॥

—মোহনমালী পরিপূর্ণ ক'রে আছেন আমার অন্তরে সহজ লোক, সাধু সুজনই শুধু জানে একথা। কায়া ফুলবনের মাঝে বিরাজিত মালী, সেখানেই তিনি রচনা করলেন বাস। সেবকের সাথে খেলা করার জন্য স্বামী আমার সেখানে দয়া ক'রে আপনিই এসে উপস্থিত!

অন্তরকুঞ্জে রাসের এই রসমাধুর্য, এই অমৃত ত্যাগ করিতে দাদু চাহিবেন কেন? তাই তিনি তাঁহার আকুতি জানাইলেন হৃদয়নাথকে—'জুগি জুগি তারণহার জুগি জুগি দরশন দেখিবে, জুগি জুগি মঙ্গলাচার, জুগি জুগি দাদু গাইবে।' অর্থাৎ, যুগে যুগে তিনিই তারণকর্তা, যুগে যুগে তাঁকেই করো দরশন, যুগে যুগে মঙ্গল আচার, যুগে যুগে দাদু করছে স্তব গান।

অদ্বৈতজ্ঞানে পরমভাগবত দাদুর প্রয়োজন নাই—যুগে যুগে তিনি পরমপ্রভুকে দয়িতরূপেই পাইতে চাহেন, তাঁহার প্রেমের রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহেন। চিনি হইবার প্রয়োজন তাঁহার নাই, চিনি খাইতেই তিনি চির-অভিলাষী—ভক্ত প্রাণের এই পরম আকাঙ্ক্ষা দাদুর বাণীতে ব্যক্ত:

প্রেম পিয়ালা নূরকা আসিক ভরি দীয়া।
দাদু দর দিদার মৈ মতওয়ালা কীয়া॥
দাদু অমলী মিকা রস বিন রহ্যা ন জাই।
পলক এক পীবৈ নহী' তলফী তলফী মরি জাই॥
দাদু রাতা রামকা পীবৈ প্রেম অঘাই
মতওয়ালা দীদারকা মাঁগৈ মুকুতি বলাই॥[১]

---

১ দাদুপন্থী সম্প্রদায়কা হিন্দী সাহিত্য: চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী

অর্থাৎ, জ্যোতির পেয়ালায় প্রেমময় তাঁর প্রেম দিলেন ভরপুর ক'রে। হে দাদু, প্রত্যক্ষ মধুর রূপটি দেখিয়ে আমায় যে তিনি ক'রে নিলে মাতাল। দাদু হয়ে গেল রামের মাতাল, রস বিনা তার বাঁচা কঠিন, এক পলক যদি সেই রস পান না করতে পায়, তবে ছটফট ক'রে মরতে হয় তাকে। দাদু হয়েছে রামে অনুরাগী, প্রাণ ভরে সে প্রেমরস করছে পান। ওগো, রামের প্রত্যক্ষ রূপমাধুর্যে যে হয়ে গিয়েছে মাতাল, সে কি আর মুক্তির বালাই খুঁজে ফিরে ?

রসোজ্জ্বল সাধনার দীর্ঘ পথটি বাহিয়া দাদু তাঁহার জীবনপরিক্রমার শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজপুতানার ক্ষুদ্র জনপদ নারায়ণায় তখন তিনি বাস করিতেছেন।[১] মহাসমাধির পরম লগ্নটি আসিয়া গিয়াছে, সাধকের তাহা আর অজানা নয়। এই চিহ্নিত সময়টিতে শুধু তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত-শিষ্যেরাই সেদিন উপস্থিত ছিলেন না, একদল উচ্চকোটির সাধুও কোথা হইতে যেন হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্ত দাদু ভক্তির মহিমা বাড়ানোর জন্য শেষ সময়ে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

দাদু কম সির মোটে ভাগ
সাধূঁকা দর্শন কিয়া।
কহা করৈ জম কাল
রাম রসাইন ভরি পিয়া।

—কি মহাসৌভাগ্য আমার! এ সাধুদের দর্শন এসময়ে পেলাম, রাম-রসায়ন প্রাণ ভ'রে করলাম পান, এখন কালমৃত্যু আর আমার কি করবে বলতো ?

১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, শনিবার। প্রেমিক সাধক তাঁহার নরদেহখানি এই দিন ত্যাগ করিয়া গেলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় উনষাট বৎসর। নারায়ণায় আজিও দাদুর 'গাদী' পরম শ্রদ্ধাভরে পূজিত হয়, তাঁহার পবিত্র 'গ্রন্থের' সম্মুখে দেশ-দেশান্তরের সাধকদের ভক্তি-আপ্লুত শির লুটাইয়া পড়ে।

---

১ দাদু : ক্ষিতিমোহন সেন

লোকনাথ ব্রহ্মচারী

রহস্যময় উন্মাদ সন্ন্যাসী। উলঙ্গ হইয়া সে পথে প্রান্তরে আর নদীর সৈকতে ঘুরিয়া বেড়ায়। নারায়ণগঞ্জের বারদী গ্রামে সে নবাগত। কিন্তু এ অঞ্চলের নিস্তরঙ্গ জনজীবনে সে যেন এক আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে। স্নানের ঘাটের নরনারী এ অসভ্য পাগলকে দেখিলেই প্রহার করিতে আসে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকাইয়া সে খল্‌খল্ করিয়া হাসিতে থাকে। ঢিল ছুঁড়িয়া বালকের দল বড় বেশী উত্ত্যক্ত করিলে অঞ্জলিপূর্ণ মূত্র নিক্ষেপ করিয়া পাগল তাহাদের বিতাড়িত করে। গ্রামের মানুষ এই উন্মাদ পুরুষকে বোঝে না, আর সেও বুঝি ধরা দিতে সম্মত নয়। উদার স্বচ্ছ নীল আকাশ আর দিগন্ত প্রসারিত হরিৎ ক্ষেত্রের সহিত তার একান্ত মিতালী। মেঘনার কালো কালো উত্তাল ঢেউ দুরন্ত উচ্ছ্বাসে বালুকা তটে আছড়াইয়া পড়ে, তাহাদেরই সহিত যেন এই পাগলের নিবিড় পরিচয়। পথে-প্রান্তরে, নদীতীরে কেন সে উলঙ্গ হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় কে তাহা বলিবে?

জনসমাজে তাহার পরিচয়-লগ্নটি কিন্তু শীঘ্রই উপস্থিত হয়। বারদীগ্রামের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এক জায়গায় বসিয়া সেদিন যজ্ঞোপবীত তৈরী করিতেছেন। সূত্রগুলি হঠাৎ এক জটিল বন্ধনে জড়াইয়া গেল। বহু চেষ্টায়ও তাহা আর কোনোমতে খোলা যাইতেছে না, এমন সময় এই উন্মাদ সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আচার-বিচারহীন যত্রতত্র বিচরণকারী পাগলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। প্রকৃত পরিচয় কাহারো জানা নাই। অস্পৃশ্য না অন্ত্যজ, তাহাই বা কে জানে? সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল, সে যেন নিকটে না আসে।

পাগল স্মিতহাস্যে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "পৈতার প্যাঁচ কি ক'রে খুলতে হয় গো?"

"কেন? গায়ত্রী জপ ক'রে।"

"তবে তা করছো না কেন?"

ব্রাহ্মণদের মনে চিন্তা খেলিয়া গেল, পাগলের ভিতরে কোন্ বস্তু লুকাইয়া আছে কে জানে? কৌতূহলী হইয়া একজন তাহাকে অনুরোধ জানাইলেন, "বেশ তো, তুমিই খুলে দাও না কেন?"

যজ্ঞোপবীতের উপর হস্ত রাখিয়া উন্মাদ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিল। তারপর জপ শেষে একটি করতালি দিয়া সূতার দুই প্রান্ত ধরিয়া সজোরে দিল এক টান। তাইতো! এ যে বড় অদ্ভুত কাণ্ড! জটিল গ্রন্থিগুলি অকস্মাৎ সরল হইয়া খুলিয়া গিয়াছে!

ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই এই রহস্যময় মানুষটির আবরণ সেদিন কিছুটা উন্মোচিত হয়।

এক শক্তিশালী প্রচ্ছন্ন সাধকরূপে গ্রামের জনগণ তাঁহাকে অতঃপর দেখিতে শিখে। আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনে সেদিনের ঐ ঘটনাটি যেন তাঁহার অলৌকিক শক্তির এক ক্ষীণতম আলোকপাত। কিন্তু ইহারই ধারাপথ বাহিয়া উত্তরকালে এক শক্তিধর মহাপুরুষের প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায়। জনসমাজে ইহাই হয় মহাযোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অভ্যুদয়

কাহিনীর সূচনা। উত্তরকালে সমগ্র বাংলার অন্তর্লোকে ধীরে ধীরে এই শক্তিধর মহাত্মার করুণাঘন লীলা রূপায়িত হইয়া উঠে।

অলৌকিক যোগবিভূতির নানা ঐশ্বর্য এই বিরাট মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হয়। ধনী নির্ধন ও জাতি বর্ণ নির্বিশেষে তিনি বহু নরনারীর আশ্রয়দাতারূপে পরিচিত হন, সর্বজনবন্দনীয় সিদ্ধ সাধক বারদীর ব্রহ্মচারীরূপে দেশ-দেশান্তরে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন।

হিমালয় শিখরের দুশ্চর তপস্যা ও দিগ্‌বিদিকের পরিক্রমা তখন শেষ হইয়াছে। এবার শুরু হয় এক ঐশ নির্দিষ্ট কল্যাণব্রতের পালা। ব্রহ্মচারী লোকনাথ তাই বুঝি পূর্ববাংলার সমতলভূমিটিতে অবতরণ করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইবে প্রায় দেড়শত বৎসর। ইহার পর একাদিক্রমে প্রায় ছাব্বিশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া তিনি এই বারদীগ্রামেই অবস্থান করেন। ত্রিতাপক্লিষ্ট অসহায় নরনারী দলে দলে তাঁহার চরণাশ্রয় লাভে ধন্য হয়।

আনুমানিক ১১৩৮ সনের কথা। চব্বিশ পরগনার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত চাকলা সেই সময়কার এক বর্ধিষ্ণু এবং বিখ্যাত গ্রাম। এই গ্রামের রামকানাই ঘোষাল তৎকালে এক ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ঘোষাল মহাশয়ের পত্নী কমলাদেবীর চতুর্থ গর্ভের সন্তানই মহাপুরুষ লোকনাথ।

রামকানাইর বড় ইচ্ছা, তাঁহার একটি সন্তান সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করুক—তাঁহার কুল পবিত্র হইয়া উঠুক। কিন্তু পত্নী কমলাদেবীর নিরন্তর বাধা দানের ফলে তাঁহার এ আশা এযাবৎ পূর্ণ হইতে পারে নাই। লোকনাথের বেলায় কিন্তু কি জানি কেন অবিলম্বে তাঁহার মাতার সম্মতি মিলিল। কনিষ্ঠ পুত্র লোকনাথের ভাবী জীবনের পথ-পরিক্রমা এইরূপে তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল।

পুত্র বড় হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষার কি হইবে? নিকটেই সুপণ্ডিত ভগবান গাঙ্গুলীর বাস। সর্বশাস্ত্রবেত্তা আচার্য এবং বিশিষ্ট সাধকরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নাই। রামকানাই ঘোষাল এই শ্রদ্ধেয় আচার্যের হস্তেই পুত্রের অধ্যাত্ম-জীবন গঠনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

লোকনাথের উপবীত গ্রহণের সময় কিন্তু এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে দেখা গেল। ভগবান গাঙ্গুলী হঠাৎ স্থির করিলেন, আচার্যরূপে তিনি বালকের সংস্কার সম্পন্ন করাইবেন, আর তাহার অব্যবহিত পরেই এই দণ্ডী ব্রহ্মচারী বালককে সঙ্গে নিয়া তিনি চিরতরে গ্রহণ করিবেন প্রব্রজ্যা। বড় চাঞ্চল্যকর কথা। ভগবান গাঙ্গুলীর গৃহত্যাগের এ সঙ্কল্প তখনই রাষ্ট্র হইয়া গেল। চারিদিকেই তখন এ প্রসঙ্গ নিয়া মহা তোলপাড় চলিতেছে। এ সময়ে লোকনাথের বাল্যসখা বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ও আর এক আলোড়ন তুলিয়া বসে। ইঁহাদের সঙ্গে সেও সেদিন গৃহত্যাগ করিতে চায়। বহু চেষ্টায়ও বালককে নিবৃত্ত করা সম্ভবপর হইল না। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী উভয় বালকেরই গুরুরূপে তাহাদের সংস্কার ও দীক্ষাকার্য সম্পন্ন করিলেন। উপনয়ন বাসরে সেদিন কৌতূহলী জনতার ভিড় জমিয়া গিয়াছে। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী দুই বালক ব্রহ্মচারীসহ ধীরে ধীরে গৃহ হইতে চিরতরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার বয়স তখন ষাট উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর শিষ্যদ্বয়ের বয়স হইবে প্রায় দশ বৎসর।

পরিব্রাজনের পথে শিষ্যদ্বয়সহ আচার্য কালীঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ নূতন জীবনের অর্থ বোধ হওয়া দূরের কথা, লোকনাথ ও বেণীমাধবের তখন উদ্দাম বালচাপল্যই যায় নাই। বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞানপন্থী সাধক ভগবান গাঙ্গুলী একান্ত দুঃসাহসের সহিত এই দুইটি বালক শিষ্যসহ অরণ্য-জীবন যাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। এ সময়কার ব্রহ্মচারী-জীবনের নানা কাহিনী লোকনাথ উত্তরকালে বিবৃত করিতে ভালবাসিতেন।

কালীঘাট তখন ছিল জঙ্গলে বেষ্টিত। জটাজূটধারী সন্ন্যাসীরা দূর-দূরান্ত হইতে এই মহাজাগ্রত শক্তিপীঠে আসিয়া জড় হইত। সদা চঞ্চল লোকনাথ ও বেণীমাধব তাঁহাদের প্রায়ই বড় উত্ত্যক্ত করিতেন।

লোকনাথ বলিয়াছেন, "আগন্তুক সাধু সন্ন্যাসীরা যখন ধ্যানে বসতেন, আমি ও বেণী চপলতা বশতঃ এই অভিনব জীবদের জটায় হস্তার্পণ করতাম। কাবুর বা লেংটি আমরা স্পর্শ করতাম। তাঁরা কিন্তু কিছুই বলতেন না, তাই প্রশ্রয় পেয়ে জটা ও লেংটি ধরে টান দিয়ে আমরা দৌড়ে পালাতাম। উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে সাধুরা শেষটায় গুরুদেবকে এসব জানাইলেন। তিনি কিন্তু বড় সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন,—'আমার কাছে আবার এ অভিযোগ কেন? আমি তো একজন গৃহী। এরা আপনাদেরই লোক। ইচ্ছেমত আপনারাই এদের প্রস্তুত ক'রে নিন। আমি তো আপনাদেরই লোককে ঘর থেকে বার ক'রে এখানে এনেছি মাত্র, দায়িত্ব তো আপনাদের।'

"সাধুরা এ-কথার উত্তরে আর কী বলবেন? গুরুদেব আমাদের তখন বলতেন, 'তোমরা বড় হলে তোমাদেরও জটা আর লেংটি থাকবে, তখন কেউ যদি তা ধরে টানাটানি করে তবে তখন কি উপায় হবে?" বিস্মিত বালকদের দৃষ্টির সম্মুখে জাগিয়া উঠিত ভাবী জীবনের রহস্যঘনচিত্র; তাঁহার তাৎপর্য বুঝার মতো বয়স তখনও তাহাদের হয় নাই।

ইহার পরে আসে অরণ্যবাসের পালা। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলীমহাশয় এবার বালকদের জীবনে ব্রহ্মচর্যের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠনে উদ্যোগী হইলেন। শাস্ত্রীয় বিধিসম্মত নিয়মনিষ্ঠ এবং কৃচ্ছ্রব্রতের মধ্যে দিয়া গুরু এ সময়ে তাহাদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিষ্য দুটির শিক্ষাদান ও সেবা পরিচর্যায় আচার্য নিজেই তৎপর থাকিতেন। গুরুর চরণে লোকনাথ ও বেণীমাধবের আত্মসমর্পণ তাই এমন সহজ এমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল।

উত্তরকালে লোকনাথ এই সম্বন্ধে বলিতেন, "ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপনকালে গুরুদেব স্বয়ং তাঁর প্রিয় শিষ্যদের এবং নিজের ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতেন। নানা কঠিন ব্রতানুষ্ঠান চলতো, কিন্তু তিনি আমাদের কায়িক পরিশ্রম বেশী করতে দিতেন না। এমন কি মাসাহ ব্রতের দীর্ঘ উপবাসাদির কালে আমাদের অঙ্গ সঞ্চালন করিতেও দিতেন না। মলমূত্র ত্যাগকালেও নড়াচড়া করার উপায় ছিল না। এমন কি অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে উপবাস ব্রতের ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য স্বয়ং আমাদের শৌচকর্মও তিনিই করিয়া দিতেন। মলের ভাণ্ড নিজেই অপসারণ করতেন।"

এমনই ছিল ব্রহ্মচারী শিষ্যদের প্রতি গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব পালনের অপূর্ব নিষ্ঠা।

অরণ্যবাস ও কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্য দিয়া প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হইল। শিষ্যদ্বয় এখন পূর্ণ যুবক। বৃদ্ধ গুরুর এই পরিশ্রম কিন্তু শিষ্য লোকনাথের

প্রায়ই অসহ্য বোধ হয়। একদিন তিনি মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আমরা যুবক শিষ্য দু'জন জঙ্গলে বসে থেকে খাই, আর তুমি বৃদ্ধ গুরু লোকালয়ে ঘুরে ঘুরে আমাদের ভিক্ষান্নের যোগাড় করো। এটা কিন্তু মোটেই আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। তুমি আমাদের এ কাজে লাগাচ্ছো না কেন, বলতো ?"

গুরুদেব উত্তর দিলেন, "না বাবা, তা করলে তোদের একনিষ্ঠ একাগ্রতা এখন ঠিক থাকবে না। গৃহস্থদের নানা ভাব দেখলে তোদের মনেও ঐ সব চিন্তা উঠবে, ফলে যোগ সাধনার ব্যাঘাত ঘটবে প্রচুর।"

হিমালয় অঞ্চলে দীর্ঘকাল সাধনা করার পর লোকনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত এক মহাযোগীর সাক্ষাৎ হয়। ইঁহার নাম হিতলাল মিশ্র। অতি বৃদ্ধ ভগবান গাঙ্গুলী এই মহাসাধকের হাতেই লোকনাথ ও বেণীমাধবকে অর্পণ করিয়া যান। লোকান্তর প্রাপ্তির পূর্বে সাশ্রুনয়নে আচার্য যোগীবরকে বলিয়াছিলেন, "বাবা, এর পর থেকে আমার এই বালক দু'টির ভার তোমার ওপর ন্যস্ত রইলো।" বলা বাহুল্য, আচার্য ভগবান গাঙ্গুলীর এই 'বালকদু'টির' বয়স তখন প্রায় নব্বুই বৎসর।

যোগী হিতলালের আশ্রয় ও সাধনোপদেশ গ্রহণ করিয়া ইঁহারা অপূর্ব যোগসামর্থ্য অর্জন করেন। তারপর দীর্ঘ সাধনার মধ্য দিয়া লোকনাথ প্রতিষ্ঠিত হন ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষরূপে।

তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের এই নিগূঢ় কাহিনী আজ আর জনমানসের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইবার উপায় নাই। উত্তরকালে নানা কথার প্রসঙ্গে তিনি যৎসামান্য ইঙ্গিত মাত্র দিতেন। মহাযোগী হিতলালের কথা উঠিলেই তাঁহার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এই মহাত্মার করুণাই যে তাঁহার উত্তরজীবনকে রূপান্তরিত করিয়াছিল।

হিতলালকে লোকনাথের কোনো কোনো জীবনীকার কাশীধামের শক্তিধর যোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীরূপে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই মহাসাধকের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক, তাঁহার সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধানে আসিয়া লোকনাথ ও বেণীমাধব হিমালয় এবং তিব্বতের নানা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাছাড়া, আত্ম-সমর্পণ ও দীর্ঘ সান্নিধ্যের ফলে স্বভাবতই এই যোগীর অধ্যাত্মশক্তি তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, অপরিমেয় যোগশক্তির সহিত সমন্বিত হয় ঐশ্বরীয় করুণার ধারা।

তুষারাবৃত অঞ্চলে বহুকাল ভ্রমণের পর হিতলাল তাঁহার এই দুই অনুগামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। এ সময়ে ইঁহাদের তিনি জানাইয়া দেন, "তোমাদের নিম্নভূমিতে কর্ম রয়েছে, আমার সাথে এ অঞ্চলে থাকবার আর প্রয়োজন নেই।"

যোগীবরের সঙ্গচ্যুত লোকনাথ ও বেণীমাধব হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল দিয়া বাংলাদেশে অবতরণ করেন। পরে দুই সতীর্থকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। বেণীমাধব কামাখ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন, আর লোকনাথ অগ্রসর হন পূর্ববঙ্গের মহাপীঠ চন্দ্রনাথের পথে। তুষারে আবৃত পর্বতশিখরে দীর্ঘকাল পরিক্রমার ফলে তাঁহার দেহের ত্বকে তখন এক অদ্ভুত ধরনের শুভ্র আবরণ পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বাঞ্চলের বনাকীর্ণ পাহাড় পর্বতে কিছুকাল বাস করার পর মেঘনার কাছে বারদীতে তিনি পদার্পণ করেন।

বারদীতে তাঁহার আগমন বড় বিচিত্র। পূর্বপরিকল্পিত ঐশ ব্যবস্থা যেন এজন্য পূর্ব হইতেই ঠিক হইয়া রহিয়াছে। উলঙ্গ সন্ন্যাসী লোকনাথ নানাস্থানে বিচরণ করিয়া সেদিন ত্রিপুরার দাউকান্দি গ্রামে আসিয়াছেন। এক বটবৃক্ষতলে তিনি নীরবে ধ্যানাবিষ্ট।

এই সময়ে ভেঙ্গু কর্মকার নামে এক ব্যক্তি তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া পড়ে—ফৌজদারী মামলার আসামী হইয়া সে বড় বিপন্ন।

লোকনাথের কৃপায় অচিরে সে বিপদ্মুক্ত হয়, তার পরই সন্ন্যাসীর পা দু'টি জড়াইয়া ধরে। বারদীতে তাহার বাস, সেখানেই সে বাবাকে নিয়া যাইতে চায়। দয়ার্দ্র লোকনাথ বারদীতে আসিয়া তাহারই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে আত্ম-গোপনের পালাটি শেষ হয়, দেখা দেয় মহাপুরুষ লোকনাথের প্রকাশের লগ্ন। তাঁহার অলৌকিক যোগ-বিভূতির কাহিনী ধীরে ধীরে জনসমাজে প্রচারিত হয়।

লোকনাথের আবাহনকারী প্রথম ভক্ত ভেঙ্গু কর্মকার ইতিমধ্যে মারা গিয়াছে। এবার তাই তাঁহাকে এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। স্থানীয় জমিদার নাগবাবুদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ইতিমধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেছেন। ইঁহাদের উৎসাহে 'গোঁসাই'র নিজস্ব একটি কুটির নির্মাণের প্রস্তাব হইল। লোকনাথ তাঁহার ভক্তদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কহিলেন, "যদি এমন একটা জায়গা আমায় দাও যার জন্য কখনও কর দিতে হয় না, তাহলে আশ্রম ক'রে থাকতে পারি।" গ্রামের উপান্তে এক পরিত্যক্ত শ্মশান রহিয়াছে, উহার জন্য কোনো কর ধার্য করা নাই। মালিকদের সম্মতিক্রমে এইখানেই নির্মিত হইল এক আশ্রম। লোকনাথ ব্রহ্মচারী হৃষ্টচিত্তে তাঁহার আসন পাতিয়া বসিলেন।

লোকনাথের যোগ-বিভূতির খ্যাতি অল্প সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। মুমুক্ষু ভক্তবৃন্দ ও রোগ-শোক-ক্লিষ্ট নরনারীর ভিড় জমিতে থাকে তাঁহার চারিদিকে।

কিন্তু লোকনাথের লোকাতীত সত্তার সহিত পরিচয় ঘটে কয়জনের? এই মহা-জীবনের বহিরঙ্গ স্তর ভেদ করিয়া খুব কম সংখ্যক লোকই সেদিন যোগসূত্র রচনা করিতে পারিয়াছে, তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছে! নিজের বাহ্য ও আন্তর রূপের এই পার্থক্যটির উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মচারী ভক্তদের বলিতেন, "ওরে আমার চিনতে পারে কে? আমি ইচ্ছে ক'রে ধরা দিই, তবেই না তোরা আমায় বুঝতে পারিস?" লৌকিক এবং ব্যবহারিক জীবনে এই দুর্বোধ্য এবং রুক্ষভাষী সন্ন্যাসীকে নিয়া তাই গোলযোগ ও বিভ্রান্তি অনেক সময় দেখা দিত।

একবার বারদীর নাগ জমিদারদের কোনো উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের সহিত ব্রহ্মচারীর এক পশ্চিম দেশীয় শিষ্যের দাঙ্গা বাধে। তারপর ইহা লইয়া এক জটিল ফৌজদারী মামলা বাধিয়া যায়। ইহাতে সাক্ষ্য দিবার জন্য ব্রহ্মচারীকে সমন দেওয়া হইল। কৌতূহলী জনতার ভিড়ে সেদিন আদালতে তিল ধারণের স্থান নাই।

ব্রহ্মচারী-বাবাকে প্রশ্ন করা হইল, তাঁহার বয়স কত? তিনি উত্তর দিলেন, "দেড় শত বৎসর!" অপর পক্ষের মোক্তার সরোষে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "দেখুন সাধুবাবা, এটা কিন্তু সরকারী আদালত, এখানে ওরূপ ধরনের অসম্ভব কথাবার্তা বলা চলে না।"

উত্তর হইল, "তবে তোমাদের যা ইচ্ছে লিখে নাও।"

স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখা এই অতিবৃদ্ধ সাক্ষীর পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, বিপক্ষের মোক্তার ইহাই জেরার মধ্য দিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান। তাই তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, "আপনার বয়স তো দেড়শত বৎসর হয়েছে? এ বয়সে দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই বেশী দূর যায় না। অথচ আপনি ঘরের মধ্যে বসে কি ক'রে স্বচক্ষে দেখলেন?"

ব্রহ্মচারী হাসিলেন। দূরস্থিত একটি বৃক্ষের দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দেখ তো, ঐ গাছে কোনো প্রাণী আরোহণ করছে কি না ?"

সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকলেই স্বীকার করিলেন, তাঁহারা এমন কিছুই সেখানে দেখিতে পাইতেছেন না। ব্রহ্মচারী কৌতুকভরা হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের বয়স কম, দৃষ্টিশক্তি বেশী। অথচ কোনো কিছুই নজরে পড়ছে না ? আমি কিন্তু বেশ দেখছি, সারি সারি লাল পিঁপড়ে গাছটার গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে।" আদালতের লোকেরা বৃক্ষের নিকটে গিয়া এ দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল। সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

বারদী গ্রামটি অবস্থিত পরম পবিত্র ব্রহ্মপুত্র নদের খুব নিকটে। পুণ্যলোভী নরনারী ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে গেলেই এই সন্ন্যাসীর চরণধূলি নেবার জন্য বারদীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবন্ত ব্রহ্মপুত্র দর্শনে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে। শতবর্ষব্যাপী যোগ-সাধনার সিদ্ধ-মহাপুরুষ যে এবার গহন অরণ্য, গিরিচূড়া ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে অবতীর্ণ।

লোক-কল্যাণের ব্রত আজ তাঁহাকে উদার আকাশের তল হইতে এই আশ্রম ও সদাব্রতের ভিড়ে টানিয়া আনিয়াছে, উলঙ্গ সন্ন্যাসীর কটিতে তুলিয়া দিয়াছে কৌপীন, দেহে জড়াইয়াছে উত্তরীয়ের আবরণ। মহামুক্ত জীবনের স্রোতধারা এবার জনসমাজের স্তরে স্তরে প্রাণরস ঢালিয়া চলিয়াছে।

মহাপুরুষের সুঠাম দেহ আর দিব্যোজ্জ্বল কান্তির দিকে চাহিয়া দর্শনার্থীরা মুগ্ধ হইয়া যায়। সুদীর্ঘ দেহে আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, সর্ব অঙ্গে মেদ মাংসের বাহুল্য মাত্র নাই। প্রদীপ্ত, সুতীক্ষ্ণ নয়ন-যুগল যেন অগ্নিবর্ষী—দৃষ্টি পড়া মাত্র মানুষকে এক পার্থিব লোকে টানিয়া নিতে চায়। সর্বভেদী এই দৃষ্টিতে লোকনাথের অলৌকিকত্ব হয় সদা বিচ্ছুরিত।

লোকে দেখিয়া অবাক হয়—মহাপুরুষের দৃষ্টি প্রায় সময়ে থাকে নিষ্পলক। সামান্য একটু অন্তর্মুখীন হইলেই তাঁহার অক্ষিতারকা দুইটি নাসিকার কোণে আসিয়া স্থিরনিবদ্ধ হইয়া যায়। লৌকিক দৃষ্টি হইতে এ যেন কত পৃথক্, কত দূরের।

লোকনাথের ভক্ত বারদীর দুর্গাচরণ কর্মকার একবার কুম্ভমেলায় গিয়াছেন। সে সময়ে মেলায় এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাঁহার হাতে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর একটি ছবি দেখিতে পান। এটি হাতে নিয়া এ সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, এ অলৌকিক দৃষ্টি যাঁর, তিনি কেমন ক'রে নিম্নভূমিতে বাস করছেন ? এমন মহাপুরুষ তো কখনো লোকসমাজে বড় একটা থাকতে পারে না! তোমরা ধন্য, এমন মহাত্মার সান্নিধ্য জীবনে পেয়েছিলে!"

লোক-মঙ্গলের জন্যই জনসমাজে লোকনাথের আবির্ভাব। করুণার্দ্র হইয়া তিনি তাঁহার এক প্রিয় শিষ্যকে ইহারই ইঙ্গিত স্বয়ং দিয়া গিয়াছিলেন—"আমি পাহাড় পর্বতে ঘুরে ঘুরে বড় একটা ধন অর্জন ক'রে এনেছি—কত বরফ এ শরীরের উপর দিয়ে জল হয়ে গিয়েছে। তোরা সে ধন বসে বসে খাবি।"

ব্রহ্মচারীর প্রিয় শিষ্য রজনীকান্ত চক্রবর্তী একবার তাঁহাকে বলিতেছিলেন, "বাবা, আপনার ঋণ আমার পক্ষে কখনো শোধ্‌বার নয়।" লোকনাথের প্রদীপ্ত নয়নদ্বয় মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া গেল। অশ্রুসজল চক্ষে বলিলেন, "তুই আবার কিসের ঋণী রে ? বরং আমিই তোর খাতক হয়েছি। তোকে আমি গাঁটেরটা খাওয়াচ্ছি, তোর হাতে পায়ে ধরছি, উদ্দেশ্য—তোকে আসল বস্তু কিছু দিয়ে যেতে পারি কিনা!"

অধ্যাত্মসম্পদের ভাণ্ডারী মহাপুরুষ লোকনাথের এ এক অপরূপ করুণাঘন রূপ।

বারদীর ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চে এবার আসিয়াছে বৃহত্তর প্রকাশের পালা। ব্রহ্মচারী লোকনাথ ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের মিলনের মধ্য দিয়া ইহার সূচনা দেখা দেয়। ব্রহ্মচারী সেদিন বারদী আশ্রমে বিল্ববৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। সম্মুখে ভক্ত কামিনী নাগ দণ্ডায়মান। সহসা শ্রীযুক্ত নাগকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "কামিনী, বিজয় আসছে।" এই অতিথি নৌকায় কোন্ পথ ধরিয়া বারদীতে আসিতেছেন অস্ফুটস্বরে তাহাও বলিতেছেন। বিজয়কৃষ্ণ অচিরেই সদলবলে সেখানে উপনীত হইলেন।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ তখন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত আচার্য। সমগ্র পূর্ববাংলার এক অদ্বিতীয় ধর্মবক্তারূপে তখন তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠা। অধ্যাত্মসাধনার গভীরতর স্তরে প্রবেশের জন্য সাধক গোস্বামীজীর অন্তরে এ সময়ে আকুলতার অন্ত নাই। লোকনাথের বিস্ময়কর যোগশক্তি এবং কৃপা বিতরণের কথা শুনিয়া তাই আজ বারদীতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি আশ্রমভবনে প্রবেশ করিলেন। ইহার পরই এক অলৌকিক ব্যাপার সেখানে সংঘটিত হইল।

ব্রহ্মচারীর ভক্ত ও জীবনীকার শ্রীকেদারেশ্বর সেন এই মিলনদৃশ্যের এক মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন—"লোকনাথের প্রদীপ্ত নয়নযুগল হইতে অপূর্ব তেজোরাশি বহির্গত হইয়া সে সময়ে গোস্বামীমহাশয়ের শরীরে প্রবেশ করিল। অমনি লোকনাথ হস্ত প্রসারণ করিলেন —গোস্বামীমহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। লোকনাথ পুত্রবৎসল পিতার ন্যায় গোস্বামীমহাশয়কে তখনই নিজ কক্ষে টানিয়া লইলেন। সেই সময় লোকপাবন লোকনাথের কৃশ তনু হইতে এক অদ্ভুত তড়িৎ-প্রবাহ বহির্গত হইয়া গোস্বামীমহাশয়ের বিরাট দেহখানিকে বেতসলতার ন্যায় কম্পিত করিতে লাগিল, এবং সেই প্রবাহসম্ভূত হুহুধ্বনিতে গৃহভিত্তি যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। লোকনাথ তখন গোস্বামীমহাশয়কে ছাড়িয়া দিলেন। গোস্বামীমহাশয় মহাপুরুষের শক্তি সঞ্চালনে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রমে হইলে আশ্রমের জনৈক ভক্ত তাঁহাকে বসিবার জন্য একখানি আসন প্রদান করিলেন। গোস্বামীমহাশয় তাহাতে উপবেশন করিলেন।"

গোস্বামীজী কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইলে উভয়ের মধ্যে আদর ও স্নেহপূর্ণ কথাবার্তা চলিতে লাগিল। গোস্বামীজী অনুযোগের সুরে কহিলেন, "বাবা, এতদিন আমার প্রতি কৃপা হয় নি কেন?"

করুণা-বিগলিত কণ্ঠে ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন, "ওরে, তুইও তো পাষাণ।"

উভয়ের এই মিলন সময়ে আশ্রমে অনাবিল আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। বিজয়কৃষ্ণ তখন ভাবাবেগে একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। লোকনাথবাবার অন্তরও বাৎসল্যরসে রসায়িত।

মহাপুরুষ স্মিতহাস্যে এ সময়ে পূর্বেকার এক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিলেন। কহিলেন, "ওরে বিজয়কৃষ্ণ, তোর চন্দ্রনাথের দাবানলের কথা মনে আছে?"

বিজয়কৃষ্ণ সচকিত হইয়া উঠিলেন। এ কি পরম বিস্ময়। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের বনের ভিতর একবার তিনি দাবানলের কবলে পতিত হন, প্রাণরক্ষার কোনো আশাই ছিল না। অকস্মাৎ কোথা হইতে এক মহাপুরুষ বিদ্যুৎবেগে অগ্নিব্যূহ ভেদ করিয়া আবির্ভূত হন এবং তাঁহাকে কোলে করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া যান। গহন বনের সেই ঈশ্বর-

প্রেরিত যোগীই যে লোকনাথ, বিজয়কৃষ্ণ আজ তাহা উপলব্ধি করিলেন। মহাপুরুষ কিন্তু ততক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া সুস্মিত হাসি হাসিতেছিলেন।

ঘটনাটি বিশদভাবে উল্লেখ করিয়া বিজয়কৃষ্ণের অন্যতম জীবনীলেখক অমৃতলাল সেনগুপ্তমহাশয় লিখিয়াছেন,—অপর এক সময় চন্দ্রনাথ তীর্থের কোনো একটি জঙ্গলের মধ্যে গোস্বামীমহাশয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভগবৎসত্তায় নিমজ্জিত হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। অকস্মাৎ হস্তী, মহিষ প্রভৃতি বন্য জন্তুর ভীষণ চীৎকার ধ্বনিতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, চারিদিকে ভয়ঙ্কর দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এখন একমাত্র ভগবৎকৃপা ছাড়া পরিত্রাণের আর কোনো উপায় নাই। ইহা দেখিয়া তিনি সর্ববিঘ্ন-বিনাশন মধুসূদনে আত্মসমর্পণপূর্বক পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একজন অপরিচিত সাধু আগমন করতঃ গোস্বামীমহাশয়কে বক্ষে ধারণপূর্বক নিবিড় ধূম্রসংযুক্ত দাবানলের মধ্য দিয়া তীব্রবেগে নিরাপদ স্থানে উপনীত হইলেন। গোস্বামীমহাশয় এই অযাচিত কৃপা স্মরণ করিয়া ভাববিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইত্যবসরে এই ভগবৎপ্রেরিত সাধু অন্তর্হিত হইলেন। *শুনিয়াছি গোস্বামীমহাশয়ের সঙ্গে ঢাকা বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎকালে নিজেকে তিনি উক্ত সাধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।*"

ব্রহ্মচারীবাবার সহিত সাক্ষাতের সময় পরমভাগবত বিজয়কৃষ্ণের এক অলৌকিক দর্শন হইতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিতেছিলেন—মহাপুরুষ লোকনাথের সর্বাঙ্গ দেবদেবীময়, গাত্রবস্ত্র ও বাসগৃহও দেবদেবীতে ওতপ্রোত। সেদিন আশ্রম হইতে বহির্গত হইবার পর প্রভুপাদ তাঁহার অন্যতম গুণগ্রাহী ভক্ত বারদী গ্রামের কামিনী নাগমহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "এ স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যা শুনে এসেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী দেখতে পাচ্ছি। ব্রহ্মচারীবাবা নিবৃত্ত্যাত্মক পুরুষ, ইচ্ছে হ'লে সব ফেলে দিয়ে এখনই চলে যেতে পারেন। আমায় এক সেকেণ্ডও যে কৃপা করেছেন, তাতেই আমি ধর্মজীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবো। বারদী আমার ধর্মজীবনের জন্মস্থান। তোমরা আমার ভাই।"

আচার্য বিজয়কৃষ্ণ বারদীগ্রাম হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া লোকনাথের মাহাত্ম্য ও যোগশক্তির প্রভাব বর্ণনা করিতে থাকেন। হিমালয়ের নিচে এমন মহাপুরুষ দুর্লভ—গোস্বামীজীর এ ঘোষণা দিকে দিকে লোকনাথ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত করিয়া দেয়, এই শক্তিধর মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে বহু নরনারীকে আকর্ষণ করিয়া আনে। সমাগত ভক্তদের জীবনে এই মহাপুরুষের বিভূতিলীলা বিচিত্ররূপে রূপায়িত হইতে থাকে।

সেবার ঢাকা হইতে কয়েকজন ব্রহ্মচারীবাবাকে দর্শন করিতে আসেন। ফিরিবার সময় তাঁহারা পদব্রজেই চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড মধ্যাহ্নসূর্য চারিদিকে অগ্নি বর্ষণ করিতেছে, তাই তাহারা রওনা হইবার প্রাক্কালে কিছুটা ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। লোকনাথ সস্নেহে বলিলেন, "বাবা, তোমরা রওনা হয়ে যাও। রোদের জন্য ভুগতে হবে না।"

নবাগতেরা যাত্রা শুরু করিলেন। আশ্রমের সীমানা ছাড়াইয়া তাঁহারা আসিয়াছেন, এমন সময় দেখা গেল, একখণ্ড মেঘ কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়া সূর্যকে আচ্ছাদন করিয়া দিল। ইহাতে তাঁহাদের কৌতূহল জাগিয়া উঠে, শক্তিধর যোগী বারদীর গোঁসাইর যোগশক্তির আরও পরিচয় তাঁহারা পাইতে চান। এই উদ্দেশ্য নিয়া তাঁহারা

তখনই আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারীকে সকলে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আমাদের বলে দিন, ঠিক কোথায় এই মেঘের আচ্ছাদন অপসৃত হবে ?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তোমরা ঢাকার উপকণ্ঠে দয়াগঞ্জ অবধি পৌঁছিলে তবে এ মেঘের আবরণ সরে যাবে, তারপর কড়া রৌদ্র উঠবে।" ঠিক নির্দিষ্ট স্থানটিতে পৌঁছামাত্রই মেঘের স্নিগ্ধাঞ্চলের আবরণ টুটিয়া গেল। খরতাপ জর্জরিত গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে আবার তৎক্ষণাৎ এই ভদ্রলোক কয়টি বারদীতে প্রত্যাবর্তন করেন ও লোকনাথের চরণে নিপতিত হন। করুণাময় ব্রহ্মচারীকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইয়া যাইতে তখনি তাঁহারা বড় ব্যাকুল হইয়াছিলেন—তাই বিন্দুমাত্র বিলম্ব সহে নাই।

শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরিজীর এক শিষ্য, গৌরগোপাল রায় একবার বারদীতে উপস্থিত হন। ইনি পুলিশের একজন কর্মচারী, কোনো কার্যোপলক্ষে ঐ অঞ্চলে আসিয়াছেন। বারদী আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বাবার পদবন্দনার পর তিনি সম্মুখে উপবেশন করিলেন। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক এক বাটি ঘন দুগ্ধ নিয়া সেখানে উপস্থিত। লোকনাথ অমনি ব্যাকুল হইয়া উচ্চ স্বরে "আয় আয়" বলিয়া কাহাকে যেন ডাকিতে লাগিলেন।

গৌরবাবু প্রথমটায় বুঝিতে পারেন নাই, কাহাকে এমন আদর করিয়া ডাকা হইতেছে। পরে সবিস্ময়ে দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড বিষধর সর্প কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে ব্রহ্মচারীর কোলের কাছে উপনীত হইল। তিনিও পরম আদরে উহার ফণাটি এক হাত দিয়া ধরিয়া দুধের বাটিতে চুমুক দেওয়াইতে লাগিলেন। পান শেষ হইবার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ব্যাস্ এবার তুমি যাও।"

সর্পটি পোষমানা জীবের মতো তখনি প্রস্থান করিল। গৌরবাবু এতক্ষণ বিস্মিত হইলেও ভয় পান নাই, কারণ মহাপুরুষের অসামান্য যোগশক্তির কথা তিনি শুনিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন ঐ পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ-সর তাঁহাকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন তখন তিনি বড় ভীত হইলেন। "ওরে, নে নে, কোনো ভয় নেই" বলিয়া মহাপুরুষ কেবলি তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন। গৌরবাবুকে তাই এ প্রসাদ নিতেই হইল।

বারদীর উষাপ্রসন্ন নাগমহাশয়ের স্ত্রী একটি শিশুপুত্র রাখিয়া হঠাৎ মারা যান। এই শিশুর জীবন রক্ষা কি করিয়া হইবে উহা ভাবিয়া সকলের উৎকণ্ঠার অবধি নাই। শিশুর পিসীমা সিন্ধুবাসিনী একদিন তাহাকে কোলে নিয়া লোকনাথের চরণতলে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার একান্ত মিনতি, ব্রহ্মচারীবাবাকে এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে। অসহায় শিশুটির জীবনরক্ষার জন্য মহিলাটি বড়ই কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।

লোকনাথ বলিয়া উঠিলেন, "এত গোল কিসের ? তুমিই তোমার স্তন-দুগ্ধ দিয়ে শিশুটিকে বাঁচাও না গো।"

সিন্ধুবাসিনী চমকিয়া উঠিলেন। তিনি সধবা বটে, কিন্তু তিনি যে চিররন্ধ্যা। সকাতরে নিবেদন করিলেন, তাঁহার স্তনে দুগ্ধ থাকিলে দুশ্চিন্তার আর কারণ কি ছিল ? কিন্তু তাহা তো হইবার নয়।

বাবার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। সিন্ধুবাসিনীকে কহিলেন, "তোমাকে বন্ধ্যা কে বলে গো ? জানতো, আমি হচ্ছি শিশু, আর তুমি যে আমারই মা। একবার কাছে এসে বোস, আমি তোমার স্তন-দুগ্ধ পান করবো।"

মহাযোগী লোকনাথ তখন যেন সরল শিশুটি। মাতৃজ্ঞানে তিনি সেদিন এই বন্ধ্যা নারীর স্তন্যধারা পান করেন, আর ইহার পর হইতে সন্তানবতী নারীর মতোই সিন্ধুবাসিনীর

বক্ষে স্বাভাবিক দুধের সঞ্চার হইতে থাকে। এই স্তন্যধারা পান করিয়াই শিশুটির প্রাণ রক্ষা পায়। ব্রহ্মচারীবাবার কৃপায় বাঁচিয়া উঠে, তাই তাহার নাম রাখা হয়—ব্রহ্মপ্রসন্ন।

সেদিন লোকনাথ তাঁহার আশ্রমকুটিরে ভক্তদল পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ এক সময়ে নিজের দীর্ঘ হস্তটি প্রসারিত করিয়া পরম করুণাভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আহা হা, রাখো, রাখো।" তারপরই একেবারে নীরব নিশ্চল। ভক্তদল চুপচাপ বসিয়া এ উঁহার মুখের দিকে-চাহিতেছেন। কেহই বাবার এ আচরণের রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই।

ইহার কিছুদিন পর ঢাকার উকিল বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়মহাশয় ব্রহ্মচারীজীর চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইনি বাবার বিশেষ ভক্ত ও অনুগৃহীত। লোকনাথ তাহাকে দেখিবামাত্র প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "কি হে বিহারী, এর ভেতর কি তুমি আমার খুব বেশী স্মরণ করেছিলে?"

"আজ্ঞে, কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে এসে আপনার চরণ দর্শনের ইচ্ছা খুবই হয়েছিল।"

"সে কথা নয় হে। জলপথে জাহাজ থেকে আমার ব্যাকুল হয়ে ডাকাডাকি করার কথাই বলছি।"

বিহারীবাবুর তখন সব কথা মনে পড়িল। কিছুদিন পূর্বে মেঘনার উপর দিয়া স্টীমারযোগে তিনি আসামে যাইতেছিলেন। পথে ঝড়ের প্রবল আক্রমণ হয় এবং প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিহারীবাবু বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিতেছেন। ঐ সময়ে কয়েকজন আর্ত যাত্রী নাকি স্টীমারের মধ্যে একখানি অলৌকিক অভয়হস্তও দর্শন করেন। ইহার পরেই ঝঞ্ঝার বেগ কমিয়া যায়, নদী শান্ত হয়। সেদিনকার সমস্ত ঘটনা বিহারীবাবুর স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল, লোকনাথের করুণা ও বিভূতিলীলার কথা ভাবিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে পতিত হইলেন।

ঢাকা কলেজের কয়েকটি ছাত্র লোকনাথের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আসে। তাহারা বলিতে থাকে, "বাবা, আমরা আপনার কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে এসেছি। আপনি দয়া ক'রে আমাদের কিছু তত্ত্বোপদেশ দিন।"

ব্রহ্মচারী মনের আনন্দে এই তরুণদের নিয়া নানা রহস্যালাপ করিতে বসিলেন। তাহাদের কহিলেন, "জানতো বাবা, অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম, তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। অর্থাৎ, যা অখণ্ড মণ্ডলাকার, যার দ্বারা সর্ব চরাচর ব্যাপ্ত—এ হেন ব্রহ্মকে যিনি দেখিয়ে দেন সেই গুরুকে নমস্কার করি। তোমাদের ব্রহ্মবস্তু কি জানো? তা হচ্ছে—টাকা। লক্ষ্য করো নি? টাকাগুলা অখণ্ড, মণ্ডলাকার? জগৎসুদ্ধ এই টাকার প্রভাবই ব্যাপ্ত রয়েছে—এরই প্রতিপত্তি চলেছে। তোমরা এই টাকা-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের জন্যই দীক্ষা নিয়েছো। আর কলেজের অধ্যাপকেরাই হচ্ছেন সেই গুরু, যারা ঐ ব্রহ্মের দর্শনলাভে সাহায্য ক'রে থাকেন। অতএব বাবাজীরা, আপাতত ঐ অধ্যাপক গুরুরই অনুসরণ ক'রে যাও। তারপর টাকাকড়ি পেয়েও তা ত্যাগ ক'রে এসে যদি আসল ব্রহ্ম দেখবার ইচ্ছে হয়, তা হলে আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার উপদেশ দেবো।"

লোকনাথের কঠোর ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চর্যার মতো তাঁহার পরিব্রাজনের কাহিনীও অনন্য-

সাধারণ। অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে তিনি তাঁহার দূর-দূরান্তের পথ-পরিক্রমার নানা মনোজ্ঞ কাহিনী বলিতেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝা যাইত, হিমাচল ও মেরুপ্রদেশের দুর্গম তুষারাবৃত অঞ্চল হইতে শুরু করিয়া চীন, আরব ও ইয়োরোপের নানা দেশ পর্যটন তিনি বাদ রাখেন নাই।

মেরুপ্রদেশ পরিক্রমণের সময় লোকনাথের সহিত তাঁহার যোগ-শিক্ষাগুরু হিতলাল ও সতীর্থ বেণীমাধবও ছিলেন। উলঙ্গ, জটাজুট সমন্বিত সন্ন্যাসীদের গাত্রচর্ম বিবর্ণ, কৃচ্ছ্রব্রতের কঠোরতায় দেহ বিশীর্ণ। স্বাভাবিক মনুষ্য বলিয়া তাঁহাদিগকে চেনাই দুষ্কর। তাই চীনদেশের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্তনের কালে সরকারী রক্ষীদল তাঁহাদের গতিরোধ করে। কিছুকাল বন্দী অবস্থায় রাখিবার পর চীন সরকার বুঝিতে পারেন, সাধুরা কঠোর তপশ্চর্যায় নিরত ভারতীয় যোগী, তাই তাঁহাদের মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

বহু মুসলমান ভক্তও লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিবার জন্য বারদীতে আসিতেন। এই ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ মক্কা হইতে প্রত্যাগত। ইহাদের সহিত আলোচনায় লোকনাথের মক্কা মদিনার প্রত্যক্ষ দর্শন ও পর্যটনের কথা অনেক সময় প্রকাশ পাইত। কোনো কোনো ইংরেজ রাজপুরুষও এই যোগীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তখন কথাপ্রসঙ্গে লোকনাথ রহস্যভরে কখনও কখনও দেখাইতেন ফরাসীরা কোন্ কোন্ ইংরেজী শব্দ কিভাবে বিকৃত করিয়া উচ্চারণ করে। স্পষ্টই বুঝা যাইত, আটলান্টিকের তীর অবধি সিদ্ধাবস্থায় তিনি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

মুসলমান তীর্থ মক্কায় যাওয়া সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন, "আমি হেঁটে হেঁটে মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়েছিলাম। ওখানকার মুসলমানরা আমায় খুব আদরযত্ন দেখায়, অতিথিসংকার করে। তারা আমায় বলেছিল,—"আপনি স্বয়ং রসুই ক'রে খেতে চান তো সিধা গ্রহণ করুন আর আদেশ পেলে আমরাও রসুই ক'রে দিতে পারি। ওদের হাতের রান্না খেতে আমার কোনো আপত্তি না থাকায় ওরা পবিত্রভাবে, কাপড় দিয়ে নিজেদের মুখ বেঁধে, আমায় বেঁধে খাওয়ায়।"

লোকনাথ ব্রহ্মচারী মদিনায়ও গিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার সাধন-আসনের সম্মুখে প্রত্যহই স্থানীয় ভক্ত মুসলমানেরা প্রচুর পরিমাণ লাড্ডু রাখিয়া যাইত। উহা হইতে তিনি যৎসামান্য কিছু গ্রহণ করিলে তবে তাহারা প্রসাদ গ্রহণ করিত।

মরুভূমির মধ্য দিয়া কয়েকদিনের পথ অগ্রসর হইয়া লোকনাথ সেবার এক শক্তিধর মুসলমান ফকীরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইহার নাম আবদুল গফুর—তৎকালে ইহার বয়স ছিল প্রায় চারিশত বৎসর। এই ফকীরের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকনাথ বরাবরই অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাকে মাঝে মাঝে বলিতে শুনা যাইত, "দেশ-বিদেশের বহু স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও আবদুল গফুরের মতো 'ব্রাহ্মণ' দেখি নি।" তত্ত্ববিদ্ লোকনাথের দিব্যদৃষ্টিতে সার্থক-সাধক আবদুল গফুর এক ব্রাহ্মণ তপস্বীরূপেই প্রতিভাত হইতেন।

সমদর্শী লোকনাথের দৃষ্টিতে শুধু জাতিবর্ণের ভেদযুক্ত মানুষ কেন কোনো জীবজন্তুর পার্থক্যও বুঝি ধরা পড়িত না। তিনি নিজেই এ বিষয়ে নানা বিস্ময়কর কাহিনী ভক্তদের শুনাইতেন।

সমতলভূমিতে অবতরণের পূর্বে লোকনাথ ও তাঁহার সঙ্গী বেণীমাধব চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। জনমানবহীন দুর্গম পার্বত্য অরণ্যে সিদ্ধ সাধকদের তাঁহাদের

নিভৃত আশ্রয় স্থানটি তখন বাছিয়া নিয়াছেন। সেদিন এই গহন বনে দুইজনই হইয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট। সহসা তাঁহারা দেখিলেন, অদূরে এক হিংস্র বাঘিনী ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, তাহারি গর্জনে চারিদিক প্রকম্পিত। তাহার সম্মুখে সদ্যোজাত কয়েকটি শাবক। বাঘিনীর ভয় হইয়াছে, সাধুরা পাছে তাহার শাবকগুলি অপহরণ করিয়া নেয়।

লোকনাথ আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, বাঘিনীর সম্মুখে গিয়া, নিজের ভাষাতেই কহিলেন, "ওগো, তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি তোমার সন্তানদের নিয়ে এখানে ঘুমিয়ে পড়ো। আমরা সাধু, আমাদের দ্বারা তোমার কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা নেই।"

আশ্চর্যের কথা সিদ্ধ যোগীর ঐ প্রেমপূর্ণ বচনের তাৎপর্য বুঝিতে হিংস্র পশুর ভুল হয় নাই। অতঃপর আর গর্জন না করিয়া শান্ত মনে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

পরদিনও আবার ভীম নিনাদ। লোকনাথ ধ্যানস্থ অবস্থায় ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বাঘিনীটি এক নবপ্রসূতি। শাবকদের জন্য তাহার আহার সংগ্রহ করা দরকার। অথচ উহাদের সে কোথায় রাখিয়া যাইবে, কি করিয়া উহারা রক্ষা পাইবে, সে দুশ্চিন্তাও তাহার কম নয়। উচ্চনাদের তাৎপর্য বোঝা গেল। লোকনাথ বলিলেন, "ওগো, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শিকারে যাও। এদের জন্য তোমার ভয় নেই, আমরাই দেখাশুনা করবো।"

বাচ্চাদের সাধুদ্বয়ের কাছে রাখিয়া বাঘিনী নিজ কাজে বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়াই আবার গর্জনের পর্ব —অর্থাৎ, 'আমি এসে পড়েছি। এখনকার মতো দায়িত্বভার আমার। সাধুরা এবার অবসর নিতে পারে।'

এমনি করিয়া কয়েকদিন ব্যাঘ্রী ও মানবের পারস্পরিক সহযোগিতার পালা চলিতে থাকে। ইহার পর লোকনাথ ও বেণীমাধব সেই বন হইতে একদিন আসন উঠাইলেন। তাঁহাদিগকে এবার অন্যত্র যাইতে হইবে। কিন্তু বিপদ কম নয়, কিছুদূর যাইবার পর তাঁহারা শুনিলেন, বাঘিনী বনভূমি কাঁপাইয়া বার বার তাঁহাদের উদ্দেশে গর্জন করিতেছে।

লোকনাথের হৃদয় বিগলিত হইল। বেণীমাধবকে কহিলেন, "বেণী, আজ তো তবে আর যাওয়া হলো না।" ফিরিয়া আসিয়া বাঘিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, দ্যাখো থেকেই গেলাম। যতদিন তোমার বাচ্চারা তোমার সঙ্গে শিকারে যাবার মতো উপযুক্ত না হয়, আমরা এখানেই থাকবো।"

সিদ্ধান্ত শুনিয়া বাঘিনী তৎক্ষণাৎ চুপ। তাহার আনন্দের আর সীমা নেই।

সঙ্কল্প অনুযায়ী লোকনাথ ও তাঁহার সঙ্গী একমাস অরণ্যের ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করেন। অতঃপর একদিন তাঁহারা দেখিলেন, শাবকদল সহ ব্যাঘ্রী মাতা কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। আর তাহারা সেদিকে প্রত্যাবর্তন করে নাই। অঙ্গীকার রক্ষা হইয়াছে জানিয়া লোকনাথ এবার ঐ অঞ্চল ত্যাগ করেন।

মানুষ ও সর্ব জীবজন্তুর উপর যোগীবর লোকনাথের কৃপা সমান আন্তরিকতার সহিত বর্ষিত হইত। তাঁহার বারদী আশ্রমের জীবনে ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

খেয়ালী লোকনাথের সেবার সখ হইল, তিনি আশ্রমের জন্য কিছু কিছু কৃষিকাজ করাইবেন। জমিদার নাগমহাশয়দের অনেকে তাঁহার অনুগত ভক্ত, তাই কাজ শুরু হইতে দেরি হয় নাই। কিন্তু শস্য আহরণ করা কঠিন ব্যাপার। প্রায়ই দেখা যাইত, বন্য শূকরের দল ক্ষেতে ঢুকিয়া সব কিছু নষ্ট করিয়া যাইতেছে।

এই পশুদের দমন না করিলে চলে না। তাই আশ্রমবাসীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া

নিঃশব্দে রাত্রিতে ক্ষেতে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু রোজই দেখা যাইত, শূকরেরা একটু আগেই সরিয়া পড়িয়াছে। তবে কি তাহাদের কেউ সতর্ক করিয়া দেয় ? বার বারই এ ঘটনা ঘটিতে থাকায় সকলে বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন।

অতঃপর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর এক অন্তরঙ্গ ভক্ত এই রহস্য ভেদ করিলেন। তিনি সেদিন স্বকর্ণে শুনিলেন, আশ্রমকুটিরে একান্তে বসিয়া লোকনাথ ক্ষেতের শূকরদের উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "ওরে শিগ্‌গীর কাজ শেষ ক'রে সরে পড়, ঐ দ্যাখ লাঠি-সোটা নিয়ে তোদের মারতে আসছে। সবাই পালা—পালা।"

আশ্রমের কাক, শালিক প্রভৃতি পাখি—কুটির মধ্যস্থ কীট ও পিঁপড়ার দল সকলেই যেন এই পরম কারুণিক মহাপুরুষের সহিত এক নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। শক্তিধর সাধকের কঠোর বাহ্য আবরণটি ভেদ করিয়া অন্তস্তলে কোন্ মধুর রসের সন্ধান তাহারা পাইয়াছে কে বলিবে ?

আশ্রমের বেলগাছের শাখায় নানা রকমের পাখি উড়িয়া আসে। লোকনাথবাবার আহ্বানে ইহারা সানন্দে ছুটিয়া আসে, কখনো পিঙ্গল জটাজালে, কখনো স্কন্ধে ও ক্রোড়ে উপবেশন করে। সারিবদ্ধ পিপীলিকার সম্মুখে চিনি মিছরী ছড়াইয়া দিয়া মহাপুরুষ একান্ত আগ্রহে বসিয়া থাকিতেন, চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিত বালকের ক্রীড়াচঞ্চলতা। দেখিয়া কে বুঝিবে, এই মহাত্মার ইঙ্গিতে কত অপ্রাকৃত ঘটনা অবলীলায় ঘটিতেছে।

লোকনাথের জীবনরক্ষার জন্য বারদীর আশ্রমপ্রাঙ্গণে একবার একটি হিংস্র ব্যাঘ্রের আবির্ভাব হয়। অলৌকিক যোগবিভূতির সহিত মহাপুরুষের অন্তস্তলে যে গূঢ়সঞ্চারী প্রেম-প্রবাহ সদা বর্তমান ছিল, এ অলৌকিক ঘটনায় তাহার নিদর্শন মিলে।

সেবার দুইটি উচ্ছৃঙ্খল যুবক লোকনাথ ও আশ্রমের অধিবাসীদের উপর মারপিট করিতে আসে। গভীর রাতে মারাত্মক অস্ত্রাদি হাতে নিয়া তাহারা আশ্রমপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করে।

আততায়ীরা অগ্রসর হইবামাত্র সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। হঠাৎ দেখা যায়, একটি প্রকাণ্ড হিংস্র বাঘ গর্জন করিতে করিতে আশ্রমের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঘের গর্জন শুনিয়া লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাড়াতাড়ি আশ্রমপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুষ্টেরা তো বাঘের আগমনে মহা সন্ত্রস্ত। আত্মরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি তাহারা একটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। ব্রহ্মচারীর জীবনীকার শ্রীকেদারেশ্বর সেন ইহার বর্ণনা দিয়াছেন।

"ভীতত্রস্ত লোক দুইটি এই সময়ে বেড়ার ফাঁক দিয়া বিস্ফারিত নয়নে দেখিতেছে, ব্যাঘ্রটি কোনোরূপ অনিষ্ট না করিয়া লোকনাথের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। লোকনাথ তখন ব্যাঘ্রটির গলায় ও মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "না গো, তোমার এ আশ্রমে আসা সঙ্গত হয় নি। এখানে সর্বদাই লোকের সমাগম, অতএব তুমি অবিলম্বে জঙ্গলে চলিয়া যাও, সেখানে তোমার আহার্য মিলবে।"

কথা কয়টির তাৎপর্য বুঝিতে বাঘটির দেরি হয় নাই। তখনি এক লম্ফে সেখান হইতে সে প্রস্থান করিল।

যুবক দুইটি এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া ততক্ষণে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী বাবা যে কত বড় শক্তিধর সাধক ইহা বুঝিতে আর তাহাদের বাকী নাই। অনুতপ্ত হৃদয়ে এই মহাপুরুষের চরণে তাহারা বার বার ক্ষমা চাহিতে লাগিল, দয়ার্দ্র লোকনাথও তাহাদের মার্জনা করিলেন।

বারদীর আশ্রমে ভক্তজনের সমাগম দিন দিন বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চল হইতে দলে দলে ভক্ত, দুঃস্থ ও আর্ত রোগীরা আসিতে থাকে। এই আগন্তুকদের জন্যে ক্রমে এই স্থানে একটি সদাব্রতও স্থাপিত হয়। কমলা নামে এক গোয়ালার মেয়ে আশ্রমের নিকটেই থাকে। লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে সে রোজ দুধ যোগায়। লোকনাথ তাহাকে 'গোয়ালিনী মা' বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহার কৃপায় এই নারীর অপরূপ রূপান্তর সাধিত হয়। বারদী আশ্রমের অনেক কিছু কাজ— অতিথিসেবা, প্রসাদ বিতরণ, রোগীদের পরিচর্যা, সবকিছু বাবার এই গোয়ালিনী মায়ের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইত।

সেবিকা নারীটি ছিলেন অতিবৃদ্ধা। বয়স তাঁহার প্রায় আশী বৎসর। এ বয়সেও বৃহৎকর্মের দায়িত্বভার তিনি অপূর্ব শক্তিবলে বহন করিয়া চলিতেন। আশ্রমে সমাগত শত শত ব্যক্তির রান্নার কাজ অবলীলায় তাঁহাকে করিতে দেখা যাইত।

ভক্তদের উপর লোকনাথ অজস্র কৃপা বর্ষণ করিতেন, আর এই সঙ্গে তাহাদের উপর তাঁহার সতর্ক দৃষ্টিপাতেরও অভাব কিন্তু ছিল না। পূর্ণানন্দ নামে একটি পশ্চিম দেশীয় ভক্ত বারদীর আশ্রমে বাস করিতেন। একদিন কোনো এক উৎসব উপলক্ষে বহু নর-নারীর সমাগম হইয়াছে। পূর্ণানন্দ এ সময়ে সুযোগমতো একটি বন্ধনরতা তরুণী বিধবার সহিত রহস্যালাপের চেষ্টা করিতে ছিল। দূরে নিজ কুটিরের অভ্যন্তরে লোকনাথ তখন উপবিষ্ট। ঘটনাটি সর্বজ্ঞ যোগীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। ভক্ত পূর্ণানন্দকে তখনি তিনি নিকটে ডাকাইলেন, সস্নেহে তাহার শিরে কিছুক্ষণ নিজের হাতটি বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "পূর্ণানন্দ, বল দেখি, স্ত্রীলোক ও পুরুষ নির্জনে একত্র হ'লে কে আগে টলে ?"

ভক্তটি একেবারে নিরুত্তর। ব্রহ্মচারী এবার দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "স্ত্রীলোক আধার বলে প্রথমে টলে না। পুরুষই কিন্তু প্রথমে টলে। শোন, এখন থেকে খুব সতর্ক হয়ে চলবে।"

পূর্ণানন্দ কিন্তু সতর্ক হতে পারে নাই, তাই উত্তরকালে এই আশ্রম হইতে তাহাকে বিদায় নিতে হইয়াছিল।

ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনী জগদ্বন্ধু পোদ্দারের পুত্র কালীচরণ সেদিন ভক্তিভরে ব্রহ্মচারী বাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এক দুরারোগ্য রোগে তিনি ভুগিতেছেন, বাবার কাছে এ জন্যেই সেদিন তাঁহার আগমন। সঙ্গে রহিয়াছে উর্দিপরা দারোয়ান ও পরিচারকের দল। কালীচরণ পোদ্দার একটি বৃহৎ মাটির ভাঁড়ে দুধ আনিয়া বাবার কুটিরের বারান্দায় তুলিয়া রাখিলেন। ব্রহ্মচারী কিন্তু হঠাৎ বড় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, ধমক দিয়া কহিলেন, "না না, তোর ও দুধ রাখা যাবে না, এখনি সরিয়ে ফেল।"

আর্তভক্ত কালীচরণ গলবস্ত্র হইয়া বার বার মিনতি করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা সরোষে বলিয়া উঠিলেন—"দ্যাখ, তুই ধনী লোকের ছেলে। একটা নূতন ভাল পাত্রসহ যদি দুধ দিতে পারিস, তবে তা রাখা যাবে।" বাজার হইতে তখনই এক নূতন ভাঁড় আনিয়া এই দুধ রাখা হইল। তবুও বাবার ক্রোধ যায় না। উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "না না, ও দুধ কখ্‌খনো রাখা যাবে না।"

নির্দেশমতো দুগ্ধভাণ্ড নিচে আঙ্গিনায় নামাইয়া রাখা হইল। ঠিক এমন সময়ে বাবার আশ্রমের একটি পালিত কুকুর সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভাঁড়ে মুখ লাগাইয়া কুকুরটি পরমানন্দে চুমুক লাগাইয়া দিল। কালীচরণ পোদ্দার তো একেবারে মারমুখী। "দূর দূর বলিয়া কুকুরটির পশ্চাদধাবন করিয়া আশ্রম সীমানার বাহিরে উহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

লোকনাথ নিকটেই উপবিষ্ট। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "দ্যাখ্, এই জন্যই তোর দেওয়া দুধ আমি এতক্ষণ গ্রহণ করি নি। যে দুধ তুই আমাকে দিয়েছিস, নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই কি তাতে তোর স্বত্ব লোপ পায় নি? তবে আশ্রমের কুকুরটাকে তাড়াবার তোর কি অধিকার আছে বলতো?"

ধনী ভক্তের আত্মাভিমান দমনের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার আশ্রমকুটির সর্বজনীন ধর্মপীঠ—মানুষ ও পশু, আশ্রমের সমস্ত জীবেরই রহিয়াছে এখানকার দ্রব্যের উপর সমান অধিকার।

কালীচরণ পোদ্দারের দুধের ভাঁড় আঙ্গিনাতেই পড়িল রহিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, ঐ অঞ্চলের কোনো কুকুর বা বিড়াল আর তাহা স্পর্শও করে নাই। অবশেষে সবটা দুধই মাটিতে ঢালিয়া দেওয়া হইল।

দিকে দিকে তখন 'বারদীর গোঁসাইর' মহিমা ও নানা সিদ্ধাইর কাহিনী প্রচারিত। চারিদিক হইতে ভক্ত, আর্তের দল এখানে ভিড় করিতেছে। এমন সময়ে একদিন ভাওয়ালের প্রতাপান্বিত জমিদার রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মচারীবাবাকে দর্শন করিতে আসেন। পথিমধ্যে হাতির পিঠে বসিয়া তিনি পারিষদদের সঙ্গে আলোচনা করিতে-ছিলেন, ব্রহ্মচারী লোকনাথকে তাঁহারা সকলে প্রণাম করিবেন কিনা। শক্তিধর মহাপুরুষ হইলে কি হয়,, জাতের তো কোনো ঠিক নাই। তাই বহু পরামর্শের পর স্থির হইল, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা অথবা চরণধূলি নেওয়া ঠিক হইবে না। শুধু নমস্কার ও সম্মান প্রদর্শনই তাঁহারা করিবেন।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু অন্যরূপ ঘটিল। লোকনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া সশ্রদ্ধভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। চরণধূলি নিয়া দাঁড়াইতেই ব্রহ্মচারী সকলকে বিস্মিত করিয়া কহিলেন, "কেনরে বাবা? প্রণাম করবে না ব'লেই তো সবাই স্থির করেছিলে।" ঐ ভক্ত ভূম্যধিকারীর চেষ্টায়ই মহাত্মার বহু প্রচারিত আলোকচিত্রটি নেওয়া সম্ভবপর হয়।

সামাজিক সম্বন্ধ ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্রহ্মচারীর মতামত বড় সুস্পষ্ট ছিল। লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্দেশাদি দিতে তাঁহার কখনো ভুল হইত না। মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে একবার তিনি অন্যতম ভক্ত মদন চক্রবর্তীকে বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ্, মাতা-পিতার ভরণপোষণ ও আনন্দবিধান যে করে সেই তো প্রকৃত পুত্র।"

তারপর রহস্যভরে সহাস্যে মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন, "গয়ায়াং পিণ্ডদানঞ্চ, এর তাৎপর্য শুনেছিস তো? গয়াসুরকে পিণ্ডদান না করলে সে একেবারে ক্ষেপে যায়। তখন এই ক্ষিপ্ত অসুরকে থামানো তোদের বিষ্ণুপাদপদ্মের কর্ম নয়—সে শক্তি পিণ্ডেরই রয়েছে। আচ্ছা তোর মধ্যে যে একটা গয়াসুর রয়েছে, তাকে পিণ্ড বা আহার্য না দিলে ওটা ক্ষেপে যায় কিনা বল দেখি? তাই যদি হয়—তবে এই গয়াসুরধৃত বাপ-মাকে যে খাওয়ায় পরায় সে-ই কি প্রকৃত পুত্র নয়?"

উপরোক্ত ভক্তটির মাতার পায়ে একবার পচনশীল দুষ্ট ব্রণ হইয়াছিল। লোকনাথের আশ্রম-অঙ্গনে কিছুদিন থাকার পর তাঁহার কৃপায় চক্রবর্তীমহাশয়ের বৃদ্ধা মাতা আরোগ্য লাভ করেন। রোগীকে বিদায় দিবার সময় লোকনাথবাবা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় কহিলেন, "মদন, তোর মা ভাল হয়ে গিয়েছে, এইবার তাকে বাড়ি নিয়ে যা। আর দ্যাখ্, তুই যেমন আমাকে ভক্তি ক'রে বাবা ডাকিস, তোর মা কি সেই ভাবে আমাকে

তাতার ভাবতে পারে না ?" হেঁয়ালিপূর্ণ ও রুচিবিগর্হিত ঐ উক্তির নিহিতার্থ—সত্যকার যে কোনো আপন ভাবের মধ্য দিয়া ভক্তের আত্মনিবেদনটি সম্পন্ন হইলেই লোকনাথ দিবেন তাঁহার পরমাশ্রয়।

সাধনপথে অগ্রসর হইতে গিয়া রাজমোহন চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির নানা বিভ্রান্তি জন্মে। উগ্র ও জ্ঞানাভিমানী ভক্তিতে প্রায়ই তিনি বলিতেন, "শালগ্রাম শিলাকে আমি কেন পুজো করবো ? ওটা পাথরের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয় !" পবিত্র শিলার উপর তিনি একদিন পা দিয়াও দাঁড়ান।

চক্রবর্তী মহাশয়কে লোকনাথের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হয়। মহাপুরুষের নিকট তাঁহার সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই, কিন্তু তিনি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই গর্জিয়া উঠিলেন।

কহিলেন, "আমার কাছে তো কত দিগ্‌দেশের লোক আসা যাওয়া করে, কত লোক কত রকমের ফল পাচ্ছে, কিন্তু আমি তো কখনো তোর মতো নিজেই নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রকাশ করিনে—আর শালগ্রামের ওপর পা দিয়েই লোকের মনঃপীড়ার কারণ হই নে।"

লোকনাথের জীবনলীলা এ সময়ে শুধু মানবকল্যাণকে কেন্দ্র করিয়াই যেন আবর্তিত হইতে থাকে। শত শত দুঃখ দৈন্য প্রপীড়িত নরনারীর আর্ত আবেদন এই মহাযোগীর অন্তরে তরঙ্গ তুলিয়া দিত—ঐশী শক্তির করুণাঘন প্রকাশ তাঁহার মধ্যে সম্ভব করিয়া তুলিত।

শক্তিধর ব্রহ্মচারীজীর মধ্যে দুইটি রূপ এই সময়ে ফুটিয়া উঠিতে দেখি। একটিতে তিনি সামাজিক আদর্শ, লোকাচারের বন্ধন মানিয়া নিতেছেন—আর অপরটির মধ্য দিয়া এই সর্ববন্ধনমুক্ত মহাপুরুষ অবলীলায় তাঁহার যোগসিদ্ধির কল্যাণধারাকে দিগ্বিদিকে বিস্তারিত করিতেছেন।

ব্রহ্মচারী লোকনাথ কিন্তু লোকাচার মানিয়াই চলিতেন। তাই দেখি, শত বৎসরকাল উন্মুক্ত তুষারাঞ্চলে বাস করিয়া আসিয়াও বারদীতে থাকাকালে তিনি শীতবস্ত্র ও বালাপোশ ব্যবহার করিতেছেন। দীর্ঘকাল উলঙ্গভাবে বিচরণ করার পরও সামাজিক পরিবেশের উপযোগী পরিচ্ছদ ব্যবহারে, এমন কি উপবীত ধারণে তাঁহার আপত্তি হইতেছে না। ফল ও কন্দমূল আহারের অভ্যাসের স্থলে অন্ন ভোজনে তিনি পশ্চাদ্‌পদ নহেন। সর্বপ্রকার মায়া ও বিকারের ঊর্ধ্বে অবস্থিত মহাপুরুষের নয়নে ভক্তের আর্তিতে করুণার অশ্রুও ঝরিতেছে।

গ্রামের সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই মুখ্যতঃ ব্রহ্মচারীর এই লীলানাট্য অভিনীত হইত। সাধারণ মনুষ্যজীবনের পাপ-তাপ, দুঃখদৈন্য শক্তিধর মহাপুরুষ তাঁহার অপরিমেয় সামর্থ্য দ্বারা ধারণ করিতেন। তাঁহার কৃপাবৈভব সকলের জন্যই উন্মুক্ত—স্থান কাল ও পাত্রের হিসাব সেখানে নাই। হৃদয়ের প্রার্থনা একবার আর্তস্বরে নিবেদন করার সুযোগ পাইলে তাঁহার করুণালাভে কেহ বঞ্চিত হইত না।

যে পাপী ও পাষণ্ডগণ তাঁহার অহৈতুকী কৃপা লাভে সমর্থ হইয়াছে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। মহাত্মার এই কৃপা কিন্তু তাঁহার যোগবিভূতির মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করিত, স্থানে অস্থানে সর্বত্র তাহা ঝরিয়া পড়িত। ইহা যেন ছিল তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই নিতান্ত স্বাভাবিক।

লোকনাথের যোগ সামর্থ্যের এক বিশেষ প্রকাশ—সূক্ষ্মদেহে যত্রতত্র বিচরণ। ভক্ত ও আশ্রিতদের কল্যাণের জন্য, তাহাদের প্রাণদানের জন্য ব্রহ্মচারীকে বহুবারই লোকোত্তর শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। লোকনাথের শিষ্য ও অন্যতম চরিতকার ব্রহ্মানন্দ ভারতী ইহা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "বাবা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন, তখনও কিন্তু তিনি আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। দেহ দেওয়ালটিতে ঠেস দিয়া নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকিত। পার্শ্বস্থ পরিচারকেরা তখন বলিত—গোঁসাই মরিয়াছেন, কিছু পরেই বাঁচিয়া উঠিবেন। এইরূপ দেহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার বিষয় স্বয়ং তিনি স্বীকার করিয়াছেন।"

একবার দ্বারভাঙ্গায় অবস্থানকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয় মরণাপন্ন হইয়া পড়েন। দুঃসাধ্য উদরী রোগে তিনি তখন আক্রান্ত। ডাক্তারেরা এই রোগীর প্রাণ রক্ষা সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া গিয়াছেন। আর আত্মীয়স্বজনরাও অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষায় শুধু ভগবানের নাম স্মরণে রত। এই সময়ে এই সঙ্কটকালে হঠাৎ সেদিন গোস্বামীমহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্যামাচরণ বক্সীমহাশয় দ্রুতপদে বারদী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মচারীকে তিনি ধরিয়া পড়িলেন—তাঁহার গুরু, গোস্বামীজীর প্রাণরক্ষা এবার করিতেই হইবে। কাঁদিতে কাঁদিতে অনুনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাবা আমার আয়ু দিয়ে আপনি গোঁসাইজীকে বাঁচিয়ে দিন।"

লোকনাথবাবা বিজয়কৃষ্ণকে বড় ভালবাসেন। তাহার উপর শ্যামাচরণের এ ক্রন্দন ও করুণ মিনতিতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। কহিলেন, "বাবা, তুমি ঢাকায় ফিরে যাও, ভেবো না। আমি গোঁসাইর কাছে যাবো। আগামী পরশু তোমরা সংবাদ পাবে।"

ব্রহ্মচারী কিন্তু বরাবরের মতো বারদীতেই বাস করিতেছিলেন। অথচ এই সময়ে দ্বারভাঙ্গায় মরণাপন্ন বিজয়কৃষ্ণের শয্যার পাশে শুশ্রূষাকারীরা তাঁহাকে একদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে, বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া যায়। গোস্বামীজীর জীবনীকার অমৃতলাল সেনগুপ্ত এই অলৌকিক ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন।

ভক্তদলে পরিবেষ্টিত হইয়া লোকনাথ একদিন আশ্রমে বসিয়া আছেন। ডাকহরকরা এসময়ে একগাদা চিঠি হাতে নিয়া উপস্থিত। উপরের চিঠিখানা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দ্যাখ্‌ তো. পার্বতীর চিঠি নাকি ? কি লিখেছে ?" পার্বতী-চরণ রায় বাবার এক ভক্ত—তখন তিনি দার্জিলিং-এর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। শিক্ষায় এবং আচরণে সাহেবী ভাবাপন্ন রায়মহাশয় ব্রহ্মচারীবাবার মধ্যে কি বস্তু দর্শন করিয়া-ছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। নানা সময়েই এই মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপা তাঁহার উপর বর্ষিত হইত। পার্বতীবাবু সেদিন তাঁহার ঐ চিঠিতে লিখিয়াছেন—তিনি সম্প্রতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। তিনি কিন্তু এ চিঠি লেখার পূর্বদিন হঠাৎ শয্যাপার্শ্বে ব্রহ্মচারীবাবাকে সশরীরে দর্শন করেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার রোগ সারিয়া যায়। বাবার কৃপাদৃষ্টি যেন এমনি অব্যাহত থাকে. ইহাই তাঁহার প্রার্থনা।

ইহার কয়েকদিন পরে পার্বতীবাবু ছুটি নিয়া লোকনাথের চরণ দর্শনের জন্য বারদী গ্রামে আসিলেন। পৌঁছিয়াই মহাপুরুষকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন. "বাবা, সত্য ক'রে বলুন তো, আপনি কি এর ভেতর দার্জিলিং-এ গিয়েছিলেন ?" লোকনাথ কৌতুকভরে উত্তর দিলেন, "আমি কি কখনো বারদী গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাই রে ?"

পার্বতীবাবু অবাক হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তিনিও ছাড়িবার পাত্র নহেন। বার বাব বলিতে লাগিলেন, “কিন্তু বাবা, আমি তো আপনাকে স্বপ্নে দেখি নি। জাগ্রত অবস্থায—শযনঘবে আপনাকে স্থূলদেহে, জীবন্তরূপেই যে দেখেছি। আব তাব পবেই আমাব ব্যাধি থেকে মুক্তি পেযে গেলাম।

বাবা শুধু সংক্ষেপে উত্তব দিলেন, “আমি যে তোব কথা তখন চিন্তা কবছিলাম।”

লোকনাথেব সূক্ষ্মদেহে বিচবণেব আবও একটি চমকপ্রদ কাহিনী বহিযাছে। ঘটনাটি ঘটে আমেরিকায। ডাঃ নিশিকান্ত বসু কিছুকাল আমেবিকাব চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী ছিলেন। একদিন এক সম্ভ্রান্ত মার্কিন মহিলা তাঁহাব নিকট আসিযা উপস্থিত। ইনি দুশ্চিকিৎস্য কলিকেব ব্যথায এ সমযে খুব ভুগিতেছেন। পাশ্চাত্যেব আধুনিকতম চিকিৎসাব অনেক কিছু ব্যবস্থাই একে একে ব্যর্থ হইযাছে। বোগিনী এবাব ভাবতের প্রাচীন প্রথার চিকিৎসা কবাইযা দেখিতে চাহেন। ভাবতেব প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ অপবিসীম। তাই তিনি নিতান্তই শেষ চেষ্টা হিসাবে অলৌকিক যোগশক্তির দেশ ভাবতীয চিকিৎসা পদ্ধতিব শবণ নিবেন।

কিন্তু ডাক্তাব বসু আমেবিকান মহিলাটিকে বাব বাব বলিতে লাগিলেন—ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান তাঁহাব মোটেই জানা নাই। আব এই বিষযে অভিজ্ঞতাও তাঁহাব নিতান্ত কম। কাজেই কি কবিযা তিনি এই চিকিৎসা কবিবেন ? অনুবোধ উপবোধ চলিতেছে, মহিলাটি এমন সময হঠাৎ সবিস্ময়ে চীৎকাব কবিযা উঠিলেন, “একি অদ্ভুত ব্যাপার ! ডাক্তার, আপনাব পেছনে যিনি দাঁড়িযে আছেন উনি কে ?”

আমেবিকান মহিলাটি সে সমযে ডাক্তাবেব পশ্চাতে দণ্ডায়মান এক দীর্ঘকায জটাজুট-মণ্ডিত ভারতীয় মহাপুরুষেব অলৌকিক মূর্তি দর্শন কবিতেছিলেন। পিছনেব দিকে আবির্ভূত বলিয়া ডাক্তার বসু এ মূর্তি দেখিতে পান নাই।

বোগিনী পবমুহূর্তেই বলিযা উঠিলেন, “ডাক্তাব। আমি কিন্তু আমাব বোগেব ঔষধ পেযে গিযেছি।”

এ এক অলৌকিক কাণ্ড। ডাক্তার বসু প্রত্যক্ষ দেখিলেন, তাঁহাব সম্মুখে দণ্ডাযমান রোগিনীব হাতের মুঠোতে একটি ভাবতীয ঔষধ কে যেন চকিতে গুঁজিযা দিযা গিযাছে।

মার্কিন মহিলাটি তাঁহাব অপ্রাকৃত দর্শনেব যে বিবরণ দিলেন, তাহাতে ডাক্তাব বসুর বিস্ময চরমে উঠিল। দৃষ্ট মহাপুরুষেব বর্ণনা হুবহু লোকনাথ ব্রহ্মচাবীব সহিতই মিলিয়া যায। চিকিৎসাবিদ্ নিশিকান্ত বসু লোকনাথেব পবমভক্ত বাবদী গ্রামেব নাগদেব আত্মীয়। কিছুদিন পবে ভারতে ফিবিযা তিনি বাবদীতে আসেন ও সর্বসমক্ষে এই চাঞ্চল্যকব তথ্য প্রকাশ কবেন।

লোকনাথেব যোগবিভূতিব নানা বিস্ময়কব প্রকাশ ঘটিত এবং যোগী হিসাবে ইহাই ছিল তাঁহাব স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। কাতব প্রার্থনা ও আর্তি মুহূর্তমধ্যে তাঁহাব করুণা জাগাইযা তুলিত, আব এই করুণা যে কত আর্ত ও বোগগ্রস্তকে বাবদীব আশ্রম-প্রাঙ্গণে টানিযা আনিযাছিল তাহার সংখ্যা কে কবিবে ?

পূর্ণচন্দ্র ঘোষমহাশযেব ব্যাধি নিবাময়েব ঘটনাটি এই শ্রেণীব কৃপাবই এক নিদর্শন মিলে। উৎকট কুষ্ঠবোগে ভুগিযা ভুগিযা এক সমযে তাঁহার প্রাণসংশয হয। অবশেষে বাবদীতে গিয়া বাবাব চবণাশ্রয লাভেব পর তিনি সম্পূর্ণরূপে বোগমুক্ত হন।

পববর্তীকালে পূর্ণবাবু কিছুদিন অবধি প্রকাশ্যে ঢাকাব বুড়িগঙ্গাব তীবে গায়ে

মৃত্তিকা মাখিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একদিন সেখান দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। সমস্ত গায়ে মাটি লেপন করিয়া এইভাবে কিম্ভূতকিমাকার সাজিয়া ঘোষমহাশয়কে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি রহস্যভরে বলিলেন, "কিগো ডেপুটীবাবু, তোমার এমন দুর্দশা কেন ?"

পূর্ণবাবু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ভাই, মহাব্যাধির কবলে আমি পড়েছিলাম। লোকনাথ-বাবার কৃপায় একেবারে তা দূর হয়েছে। আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছি। তারপর বাবা আমায় নির্দেশ দিয়েছেন, কয়েকদিন বুড়িগঙ্গার মাটি মেখে থাকতে হবে। তা'হলে এই রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকবে না। তাই আমি মাটি মাখছি। আর এ বস্তু গায়ে মেখে যে প্রকাশ্য স্থানে বসে আছি তার উদ্দেশ্য—অবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাহীন পাষণ্ডদের কাছে বাবার মাহাত্ম্য ঘোষণা হোক। হতভাগারা জানুক, এখনও ভারতে এমন সব শক্তিধর মহাপুরুষ বর্তমান রয়েছেন—আর তাঁরা শুধু শ্রদ্ধাবান লোকের সামনেই প্রকট হন।"

জীবের প্রতি লোকনাথের এ করুণা ও ব্যাধি মোচনের প্রসঙ্গে একবার শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতীমহাশয় তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। বাবা যে উত্তর দেন তা বড় তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁহাকে জিজ্ঞেস করা হয়—"বাবা, তুমি রোগীর রোগ নিজে নাও না দেখি, অথচ এই রোগীরা আরোগ্যলাভ কি ক'রে করে ?"

"ব্যাধিগ্রস্তের ওপর আমার দয়া হলেই আমার শক্তিবলে রোগ দূর হয়।"

"তোমার দয়া হয় কিরূপে ?"

"আমাকে তুষ্ট ক'রে—আমার ইচ্ছে ও ভালোবাসা জাগিয়ে তুলে ?"

"তুমি প্রকৃতপক্ষে তুষ্ট হও কিসে ? তোমার ভালবাসাই বা জাগানো যায় কি ক'রে ?"

গূঢ়ার্থটি প্রকাশ না করিয়া লোকনাথ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "তা তো জানি নে।"

লোকনাথের করুণাঘন রূপটি থাকিত এক বিভ্রান্তিকর আবরণে আবৃত। নীরস তপঃক্লিষ্ট দেহের ব্যবধান ও মর্মভেদী বাক্যবাণ এড়াইয়া একবার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাইতে পারিলে আর কোনো কথা ছিল না, অন্তরের স্নেহরসে অবগাহন করিয়া ভক্তেরা ধন্য হইত। কিন্তু বহিরঙ্গ জীবনের ঊষর বালুকারাশি অপসৃত করিয়া খুব কম লোকই তাঁহার ফল্গুধারার সন্ধান পাইয়াছে। লোকনাথের মহাজীবনে কঠোর ও কোমলের এ বৈপরীত্য সত্যই বিস্ময়কর।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এক বিশিষ্ট শিষ্য সেবার বারদীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবা এই ভদ্রলোকের নিকট তাঁহার গুরুদেবের বহুতর নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। গোস্বামীজীর প্রিয় শিষ্যটি ইহা শুনিয়া তো ক্ষিপ্তপ্রায়। প্রত্যুত্তরে মহা-পুরুষকে নানা কটূক্তি করিয়া উত্তেজিতভাবে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

লোকনাথ কিন্তু তখন এক পরিহাসপূর্ণ অভিনয়ই করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার গোস্বামীজীর সেই শিষ্যটিকে ডাকাইয়া আনিয়া নানাভাবে তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ বারদী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া লোকনাথ তখন তাঁহাকে সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "জীবনকৃষ্ণ, দেখলাম তোর বেশীর ভাগ শিষ্যই তোকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে।" বিজয়কৃষ্ণকে তিনি আদর করিয়া ডাকিতেন 'জীবনকৃষ্ণ'। বহুবার দেখা গিয়েছে, এই মহাপুরুষের কল্যাণদৃষ্টি গোস্বামীজীর প্রতি সতত প্রসারিত থাকিত। সেদিন

ঐ শিষ্যটির নিকট তাঁহার নিন্দা ও বিদ্রূপ করিয়া কি গোলযোগেরই না সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অপর ঘটনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য দুর্গাচরণ নাগমহাশয়কে কেন্দ্র করিয়া ঘটে। সাধু নাগমহাশয় দেওভোগের অধিবাসী—বারদী গ্রামের অনতিদূরেই তিনি অবস্থান করেন। একদিন এই বহুখ্যাত মহাপুরুষকে দর্শন করার জন্য তিনি তাঁহার আশ্রমে আসিয়াছেন। নাগমহাশয় দৈন্য নিরভিমানতার প্রতিমূর্তি—নিতান্ত কাঙালের বেশেই সর্বদা তিনি চলাফেরা করেন। শরীরখানি এক জীর্ণ চাদরে আবৃত। পরিধেয় বস্ত্রটি অত্যন্ত মলিন, চুল অবিন্যস্ত ও অপরিচ্ছন্ন। এই বেশে নাগমহাশয় বারদীর আশ্রমে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই লোকনাথ ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তোর এমন বেশ কেন ? চুলগুলো, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার থাকলে কি ধর্ম হয় না রে ?"

সাধু নাগমহাশয় একেবারে চুপ করিয়াই আছেন। কিন্তু লোকনাথবাবা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোর গুরু কে ?"

নাগমহাশয় সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।" কিন্তু একথা বলিয়াই বা রক্ষা কোথায় ? লোকনাথ আবার শ্লেষাত্মক সুরে বলিতে লাগিলেন, "তোর গুরু কি তোকে এরূপভাবে থাকতে বলেছে ?" নাগমহাশয়নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার পরিহাস কিন্তু এখানেই সেদিন শেষ হইল না। নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরেই যেন বলিতে লাগিলেন, "তাহলে তো দেখছি যেমন গুরু তেমনি হয়েছে তাঁর শিষ্য !"

কথাগুলি গুরু-সর্বস্ব নাগমহাশয়ের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। উত্তরে একটি কথাও উচ্চারণ না করিয়া তিনি অবিলম্বে আশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, লোকনাথবাবার মতো মহাসিদ্ধ যোগীর নিকট ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরিচয় অবিদিত ছিল না, সাধু নাগমহাশয়ের সাধনোৎকর্ষও তাঁহার অজানা নয়। অথচ মনে ও মুখে এই বৈপরীত্য দেখাইয়া তিনি কি বিভ্রান্তিকর এক ধূম্রজালেরই না সৃষ্টি সেদিন করিলেন। ইহাই কিন্তু ছিল কঠোরদর্শন, অথচ পরমকারুণিক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মানবীয় লীলার এক বিচিত্র ভঙ্গী।

বহিরঙ্গ কথাবার্তা ও বাহ্যিক আচরণের মধ্য দিয়া লোকনাথকে ধরা বড়ই কঠিন ছিল। তাঁহার দ্ব্যর্থবোধক কথার প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিতে পারায় প্রায়ই গোলযোগের সীমা থাকিত না।

লোকনাথ বলিতেন, "দ্যাখ, বিভূতি-টিভূতি আমি প্রস্রাব বলে গণ্য করি।" অথচ এই যোগবিভূতির কত লীলাই না দিনের পর দিন তাঁহার জীবনের স্তরে স্তরে অপরূপ মহিমায় বিকশিত হইয়াছে। মানবকল্যাণের জন্য করুণাঘন মহাপুরুষের অন্তরে যখনই আলোড়ন উঠিয়াছে—যোগবিভূতি আজ্ঞাবহ কিঙ্করীর মতোই তাঁহার আদেশ পালন করিতে আসিয়াছে।

এবার লোকনাথ ব্রহ্মচারীর এইরূপ এক রহস্যপূর্ণ বাক্য বিভ্রান্তি জাগায়, বারদীগ্রামে প্রবল উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়। বাবার এই আশ্রমে শত শত লোক আসা যাওয়া করে—যোগী, প্রার্থী এবং মুমুক্ষু জনতার ভিড়ের অন্ত নাই। একদিন স্থানীয় কর্মকারগণ খোল করতাল এবং ভাঁড়ভর্তি বাতাসা ইত্যাদি নিয়া সেখানে উপস্থিত। সোৎসাহে লোকনাথের কুটিরের কাছে আসিয়া তাহারা জানায় আজ গোঁসাইয়ের আশ্রমে তাহারা হরির লুট দিবে।

লোকনাথ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে যা যা, এখান থেকে চটপট সরে পড়।

এখানে তোদের হরির্টব নেই। যেখানে হরি থাকে সেখানে গিযে হুল্লোড কর্ আর লুট দে।"

কীর্তনিযা দল তো মহারুষ্ট। উঠানে দাঁড়াইযা নানা বিরুদ্ধ মন্তব্য তাহারা করিতেছে। বাবা ইহাতে আরো ক্রুদ্ধ হইযা কহিতে লাগিলেন, "ওরে, শোন্ তা'লে, তোদের হরির মুখে আমি প্রস্রাব করি!"

'গোঁসাইর' এরূপ কটূক্তি শুনিযা সকলে মহাউত্তেজিত হইযা আশ্রম ত্যাগ করিল।

তাঁহাদের মোড়ল নবীন কর্মকার ব্রহ্মচারীবাবার এক পরম ভক্ত। সেদিন সেখানে সে উপস্থিত ছিল না, এই ঘটনাটি পরদিন তাহার কানে গেল। বন্ধুবান্ধবদের নানাভাবে বুঝাইযা রাখিযা নবীন লোকনাথের আশ্রমে আসিযা উপস্থিত। গোঁসাইর নিকটে সে ঘটনার প্রকৃত বিবরণটি শুনিতে চায। তাঁহার মতো মহাসিদ্ধ যোগীপুরুষ এমন দাযিত্ব-জ্ঞানহীন উক্তি কেনই বা করিবেন? প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য নবীন বাবাকে চাপিয়া ধরিল।

লোকনাথ নির্বিকারভাবে বলিলেন, "দ্যাখ্, সব শালা ভণ্ডের দল সেদিন শুধু শুধু এখানে হৈ-চৈ করতে এসেছিল। এই কপট আচরণ এখানে আমি ওদের করতে দিই নি। তাছাড়া, বেটাদের সাহস দ্যাখ্। ওরা আমার কথা অমান্য ক'রে তর্ক করতে লাগলো। এই জন্যই তো আমি বললাম—"তোদের হরির মুখে প্রস্রাব করি।"

তারপর স্মিতহাস্যে তিনি কহিলেন, "একথা শুনে কিন্তু ওরা সব রাগ ক'রে আশ্রম ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সত্যই রাগ করবার কিছু ছিল কি? তুই ভেবে দ্যাখ্, আমি অশাস্ত্রীয কথা কিছু তো বলি নি। পুরাণশাস্ত্রে আছে, হরি যশোদাকে হাঁ ক'রে নিজের মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখান। আমি যখন ব্রহ্মাণ্ডের একজন, আর প্রস্রাবও এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই করি, তবে 'হরির মুখে প্রস্রাব করি' এ কথাটা বলতে দোষটা কি হ'ল বলতো?"

বাবার এই কথার ভাবে ও ভঙ্গীতে নবীন কর্মকার ও তাহার অনুবর্তীদের মনের খেদ দূর হইল। সকলে বুঝিল, অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চতর স্তর হইতে, অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়াই মহাপুরুষ তাঁহার দ্ব্যর্থবোধক মন্তব্য উচ্চারণ করেন। কিন্তু সাধারণের কাছে এসব কথা সহজে বোধগম্য হইবে কেন?

আর একদিনও অনুরূপ এক ঘটনা নিযা বাবার আশ্রমকুটিরে কম আলোড়নের সৃষ্টি হয় নাই। লোকনাথ সেদিন তাঁহার আশ্রমে বহুজন পরিবৃত হইযা বসিযা আছেন। এমন সময পুরীর জগন্নাথদেবের এক পাণ্ডা সেখানে আসিযা উপস্থিত হয। হাতে তাহার নীলাচলনাথের মহাপ্রসাদ।

ব্রহ্মচারীবাবাকে উহা খাওনোর জন্য পাণ্ডাটি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইযা আসে। ইহা দেখিযা মহাপুরুষ হঠাৎ উচ্চরবে বলিযা উঠিলেন, "থামো—থামো, আমি যে মুসলমান।" পাণ্ডা তখনি থামিযা গেল। কথাটা শুনিযা উপস্থিত সকলেই হতবাক্ হইযা গিযাছে,—তাহাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি লোকনাথের মুখের উপর নিবদ্ধ।

পাণ্ডাটিকে কিছু পযসা দিযা তাড়াতাড়ি বিদায করা হইল। লোকনাথ চতুর হাসি হাসিযা ভক্তদের কহিতে লাগিলেন, "তোরা বড় অবাক হযে গিযেছিস না? আরে আমি যে 'মুছল্লুম ইমান— মুছলমান'। অর্থাৎ আমার ষোল আনা 'ইমান' বা ধর্ম বজায রয়েছে। কাজেই আর বেশী 'ইমান' পাবার জন্য প্রসাদ ভক্ষণের প্রযোজন নেই।"

ব্রহ্মচারীবাবার আরবী ভাষার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কযেকজন এ বিষযে তাঁহাকে প্রশ্ন

করেন। তিনি উত্তর দেন, "আমি আর আমার গুরু (আচার্য ভগবান্ গাঙ্গুলীমহাশয়) উভয়ে মিলে পরিব্রাজনকালে কাবুলে উপস্থিত হই। সেখানে মোল্লাসাদীর বাড়িতে থেকে কিছুকাল কোরাণ পাঠ করেছিলাম।" মহম্মদীয় ধর্মে সিদ্ধিলাভের কোন্ কোন্ পন্থা আছে সাধক লোকনাথ তাহা জানিবার জন্যও এই সময়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাই সর্ব ধর্মের সমন্বয় ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের উদারতার দিক দিয়া তিনি ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরই এক পূর্বসূরী।

নিজের সাধন-সাফল্য ও আত্মসাক্ষাৎকারের বর্ণনা লোকনাথ ব্রহ্মচারী স্বকীয়বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ ভঙ্গীতে বার বার দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ওরে, আমি শতবৎসরেরও বেশী পাহাড় পর্বতে পরিব্রাজন ক'রেছি। এই শরীরের ওপর কত বরফ জল হয়ে গিয়েছে কিন্তু তোদের ঈশ্বরের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নি—আমি দেখেছি আমাকে।" আত্মজ্ঞানীর পরম অনুভূতিরই এক নিদর্শন তাঁহার এই উক্তি।

অধ্যাত্মচেতনার তুঙ্গ শিখরটি হইতে অবতরণ করিয়া লোকনাথ আপনাকে জনারণ্যে মিশাইয়া দিয়াছিলেন। এই কঠোরদর্শন, শুষ্ক আত্মজ্ঞানীর হৃদয়ে তাই প্রেম ও সহানুভূতির যে অন্তঃসঞ্চারী ধারা গুপ্তভাবে প্রবাহিত হইত, তাহার সংবাদ কিন্তু অনেকেই রাখিত না। শুধু লোকমঙ্গলের জন্য দয়ার্দ্র হইয়া উঠিলেই তাঁহার করুণাঘন রূপটি উন্মোচিত হইয়া পড়িত। শুধু মানব নয়, মানবেতর জীবের জন্যও তাঁহার বিরাট হৃদয়ে করুণার অভাব ছিল না, আর এই করুণার স্রোতটিকে তিনি আশ্রিতদের হৃদয়েও বহাইয়া দিতে পারিতেন।

একবার এক মুমুক্ষু, সাধন লাভেচ্ছু ব্যক্তি বারদীতে আসিয়া লোকনাথের চরণে পতিত হয়। মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া সে কৃতকৃতার্থ হইতে চায়। তাহার সেদিন-কার তীব্র আর্তি ও অনুনয়-বিনয় কিন্তু কোনো কাজেই আসিল না। বাবা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, তুই তোর স্ত্রীকেই ভালবাসতে পারিস নি—আর আমাকে ভালবাসবি কি ক'রে? যা, যা এখনি এখান থেকে উঠে চলে যা।" পরে প্রকাশ পায় আগন্তুক লোকটি অধ্যাত্মপথে চলিতে চাহিলেও, গৃহে সে তাহার স্ত্রীর সহিত বড় অসদ্ব্যবহার করে। এজন্যই লোকনাথের পদতলে আশ্রয় তাহার সেদিন মিলে নাই।

আশ্রমে বহুশ্রেণীর লোক আসা যাওয়া করে। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তির সাধারণ মানবতাবোধ ও মমত্ববোধটুকুও নাই। এই সব বিষয়াসক্ত লোককে প্রায়ই অপ্রিয় সত্যভাষী লোকনাথের বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইত। বাবা একদিন স্বীয় কুটিরে ভক্তদল পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখা গেল, তিনি নেপথ্যস্থিত কোন্ এক অপরাধী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আপন মনে ভর্ৎসনা করিয়া চলিয়াছেন। সকলে ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া শুধু একে অন্যের মুখের দিকে চাহিতেছেন। কিছুক্ষণ মধ্যেই এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। বারদীতে সে জীবনে কখনো আসে নাই। এ আগন্তুককে দেখিয়াই লোকনাথ হঠাৎ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, প্রচুর কটূক্তি ও তিরস্কার তাহার উপর অনর্গল ধারায় বর্ষিত হইতে লাগিল।

যে কোনো অভ্যাগতের পক্ষে এ ধরনের রোষ ও গালাগালি সহ্য করা কঠিন। আগন্তুক তাই কিছুক্ষণ পরে গোঁসাই-এর আশ্রম হইতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় গ্রহণ করিলেন ততক্ষণে আশ্রমে উপস্থিত অন্যান্য লোকজন এই ব্যাপারে বড় চঞ্চল হইয়া

উঠিয়াছে। সত্যই তো, গোঁসাইর কি বিচিত্র খেয়াল ও হৃদয়হীন ব্যবহার। আসামাত্র লোকটির প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার না করলেই কি চলত না?

কিছুকাল পরেই কিন্তু ইঁহাদের মনের ভাব কাটিয়া যায়। ব্রহ্মচারী বাবা নিজেই তাঁহার দুর্জ্ঞেয় ব্যবহারের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলেন। কহিলেন, "কিরে, তোরা সব মনে দুঃখ পেয়েছিস নাকি? জানিস, এই বামুনের এক বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে। বরপক্ষ থেকে পণ নিয়ে সে মেয়ে বিয়ে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু ব্যাটা শুধু টাকার অঙ্কই বাড়াচ্ছে, মেয়ে সুপাত্রে কি অপাত্রে পড়লো তার জন্য কোনো মাথাব্যথা নেই। ব্যাটা যেন নরমাংস বিক্রেতা কসাই! তাই তো ওকে আমি আশ্রম থেকে তাড়ালাম।"

ইতিমধ্যেই কয়েকজন লোক কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা দৌড়িয়া গিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিলেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, বাবার উক্তি সর্বাংশে সত্য। লোকটির কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াই তিনি এমন নিষ্ঠুরভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। সে তাহার কন্যার বিবাহে একাধিক বরপক্ষের কাছে পণের দাবি আটশত টাকায় উঠিয়াছে। টাকার অঙ্ক আর বাড়িবে কিনা, এ কথাটি জানিতেই এই অর্থবিষয়ী ব্যক্তি আজ বারদীতে আসিয়াছিল। লোকনাথের তিরস্কারের ফলে কন্যার কল্যাণের দিকে তাহার দৃষ্টি এবার ফিরিয়া যায়। অনুতপ্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে একথা সকলের কাছে সে স্বীকার করে।

মানবেতর জাতির জন্যও লোকনাথের সহানুভূতি ও কৃপার ধারা এমনই ভাবে সর্ব সময়ে উদ্বেল হইয়া উঠিত। ঢাকা মীরপুর স্কুলের এক পণ্ডিতমহাশয় সেদিন বাবার চরণ দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। সাক্ষাৎকারের কালে দেখা গেল, লোকনাথ এই আগন্তুকের প্রতি বড় বিরূপ ও কুপিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। পণ্ডিত অনুনয়-বিনয় করিলে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, কাকগুলো তোর বাড়িতে ফেলে দেওয়া দুটো ভাত খেতে এসেছিল। ওদের তাচ্ছিল্য ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে তুই আমার কাছে এসেছিস কেন, বল্‌তো? কাকের শব্দ তোর কানে বিকৃত আর কর্কশ মনে হয়—না? কিন্তু তোদের মতো বিষয়ী লোকের কথাবার্তাও তো আমার কাছে ঐ রকমই অসহ্য লাগে। কিন্তু আমি কি তোদের কখনো ওরকম ক'রে তাড়িয়ে দিই?"

একবার কোনো এক ভক্ত তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে লোকনাথকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা এই উপলক্ষে মহাপুরুষের পবিত্র পদরজ তাঁহার বাড়িতে পড়ে। লোকনাথ-বাবা কিন্তু বৈষয়িক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে কোথাও বড় একটা যান না। কিন্তু সেদিন এই ভক্তটির অনুরোধ এড়ানো দায় হইল। বাধ্য হইয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি যাবো।"

এদিকে শ্রাদ্ধবাসরে লোকনাথকে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি মনে বড় আঘাত পাইয়াছেন। পরদিন আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বার বার সখেদে কহিতে লাগিলেন, "বাবা, আমি বড় আশা করেছিলাম, কিন্তু আপনি গেলেন না, নিজের কথাটাও রাখলেন না।'

লোকনাথ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি তো গিয়েছিলাম রে। তুই-ই তো আমায় তাড়িয়ে দিলি।"

"আমি আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছি? একি অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য কথা বাবা।'

"তুই আমায় ঠিকই তাড়িয়েছিস। তোর দই-ক্ষীরের ঘরে একটা কুকুর দু-দু বার আহারের জন্য ঢুকেছিল, মনে আছে? তুই দু'বারই আমায় লাঠি দিয়ে তাড়া করেছিস। আমি ঠিকই গিয়েছিলাম, কিন্তু তুই থাকতে না দিলে কি করবো বল্?"

১২৯৭ সালেব কথা। প্রাব সাতাইশ বৎসর পূর্বে ১২৭০ সালে লোকনাথ ব্রহ্মপুত্রেব নিকটে এই বাবদী গ্রামে উপনীত হন। গ্রাম্য জনজীবনেব মধ্যে আসনটি পাতিযা বসিয়া মহাশক্তিধব যোগী একাদিক্রমে বহু বর্ষ কাটাইযা দিযাছেন। এইবাব তাঁহাব লীলা সংববণেব পালাটি উপস্থিত।

আশ্রম কুটিবে ব্রহ্মচাবী এ সমযে একদিন নিজেই ইহাব ইঙ্গিত দিলেন। অন্তবঙ্গ ভক্তদেব সাথে তিনি বাক্যালাপ কবিতেছিলেন, অকস্মাৎ কি জানি কি ভাবিযা বলিতে লাগিলেন, "এই দেহটি যেন একটা পাখিব খাঁচা ···আমাব ওবা সব মানুষ ভাবে।···ভব-রোগী মোটে দেখলাম না। একটি ভক্ত মহিলা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'কি বললে বাবা, তোমাকে সকলে মানুষ ভাবে ? কোন্ বিস্মৃত মুহূর্তে মহাপুবুষের মনেব দুযাবখানি একটু বুঝি খুলিযা গিযাছিল। সঙ্গে সঙ্গেই আত্ম-সংবিৎ পাইযা চমকিযা উঠিযা তিনি কহিলেন, 'ঐ দেখেছিস ? যাঃ, আমাব ভুল হযে গিযেছিল। দেহটা যে আছে, তা স্মবণই ছিল না।' এই আত্মবিস্মৃতিব মধ্য দিযাই লোকনাথ তাঁহার মহাপ্রয়াণের আভাসটি সেদিন দিয়াছিলেন ।

দেহত্যাগ করিবাব পথটিও কি ব্রহ্মচাবী বাবা নিজেই প্রস্তুত কবিযা নিলেন ? বারদীব একটি দুঃস্থ লোক যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া মৃতকল্প হয। লোকনাথ তাঁহাব দুঃসহ রোগ-ভার নিজ দেহে উঠাইযা নিলেন। অতঃপব এ রোগ তাঁহাকে আব ত্যাগ কবিতে দেখা যাব নাই। ধীরে ধীরে শেষেব দিনটির দিকে তিনি আগাইয়া যান।

মরলীলা সমাপ্তিব দিনটি নিজেই তিনি চিহ্নিত করিয়া দিলেন। ১২৯৭ সালেব ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তাবিখে দেহত্যাগের পব কোন্ প্রথায় তাঁহার সৎকাব হইবে সেই প্রশ্নটিব মীমাংসা কবিবা দিতেও ভুলিলেন না। লোকনাথেব এক অন্তবঙ্গ শিষ্য শ্রীবজনী চক্রবর্তী লিখিযাছেন, "লীলা সংবরণের আট দিবস পূর্বে উপস্থিত ভক্তদের গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল দেখি, চাব রকমেব সৎকার ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ উপাযে মবদেহ শীঘ্র লয পায় ? ভক্তগণ উত্তব দিলেন,—আগুন দিলেই দেহ সত্বব লয প্রাপ্ত হয়। একথাব উত্তরে গোঁসাই বলিয়াছিলেন, 'দ্যাখ্‌, আমার দেহপাত হলে তোরা কিন্তু এটাকে আগুন দিযে দগ্ধ ক'বে ফেলিস।'

১৮ই জৈষ্ঠের প্রভাত। লোকনাথ বাবা আশ্রমস্থ ব্যক্তিদেব ভোজনপর্ব শীঘ্র শেষ কবাব জন্য বাব বাব তাড়া দিতে থাকেন। ভক্তদের সকলেরই আহাব শেষ হইযাছে কিনা জানিযা নিবাব পব মধ্যাহ্নেব কিছু পূর্বে মহাযোগী তাঁহাব ধ্যানাসনে গিযা উপবিষ্ট হন। ধীবে ধীবে ব্রহ্মবন্ধ্রপথে ঘটে তাঁহাব প্রাণবাযুব উৎক্রমণ।

সহস্র সহস্র ভক্ত আশ্রিত জনগণ সাশ্রুনযনে সেদিন তাহাদের প্রিয় 'গোঁসাই'ব শেষ-কৃত্য সম্পাদনেব জন্য আসিযা জুটে। আশ্রমেব দক্ষিণ পার্শ্বে, ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠ সহযোগে মহাপুরুষেব পবিত্র দেহটি ভস্মীভূত কবা হয।

বাবদীতে দেহ বক্ষা কবিবার পবও কিন্তু ব্রহ্মচাবী তাঁহাব পবম প্রিয 'জীবনকৃষ্ণ'কে বিস্মৃত হন নাই। দেহান্তেব বিশেষ ক্ষণটিতে বৃন্দাবনে প্রভুপাদ বিজযকৃষ্ণ গোস্বামী ধ্যানমগ্ন ছিলেন। লোকনাথ এই সমযে সূক্ষ্মদেহে তাঁহাকে দর্শন দিয়া নিজেব মবলীলা সমাপ্তিব কথা জানাইযা আসেন। ধ্যানাসন হইতে উঠিযাই বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাব ভক্তদের কাছে বাবাব মহাপ্রযাণেব সংবাদ দেন।

কিছুকাল পবেব কথা। কুমিল্লাব বিচাবালয় হইতে চাঞ্চল্যকব এক খুনেব মামলাব

রায় বাহির হইয়াছে। আসামী নিবারণচন্দ্র রায় নিম্ন আদালতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে আছেন। হাইকোর্টে তাঁহার মামলা তখন বিচারাধীন। আপীলের শুনানীর দিনটি খুবই নিকটবর্তী—আসামীর অন্তরে উদ্বেগের অবধি নাই। আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের বিভীষিকায় তিনি ছটফট করিতেছেন। কিন্তু ইহারই মাঝে মাঝে বিপদতারণ বারদীর গোঁসাইর পবিত্র নাম স্মরণ করিতে তাঁহার ভুল হইতেছে না।

এই সময়ে নিবারণবাবু একদিন দেখিলেন, এক জটাজূট সমন্বিত দীর্ঘকায় মহাপুরুষ অর্গলবদ্ধ কারাগারের লৌহদ্বার ভেদ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। প্রহরীরা এই মূর্তিকে লক্ষ্য করে নাই, নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে অদূরে তাহারা পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে।

অলৌকিক পুরুষটি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে বন্দী নিবারণবাবু ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনি কে?" সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আগন্তুক সন্ন্যাসী গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "ওরে, আমি যে আজ তোর মোকদ্দমার রায় লিখিয়ে দিয়ে এসেছি, তুই খালাস হয়েছিস।"

নিবারণবাবুর তখন বাক্‌স্ফূর্তি হইতেছে না। কোনোমতে আবার প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু—আপনি কে?"

"আমায় চিনলি নে? আমি বারদীর ব্রহ্মচারী।'

কারাগারের বন্দীকে এবার উন্মত্তের মতো চীৎকার করিতে শুনা গেল, "ধর্‌ ধর্‌, ঐ যে গেল গেল।" প্রহরীরা সকলে তখন তড়িৎবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে। সন্ধান করিয়া দেখা গেল, কেহই কোথাও নাই—অলৌকিক মূর্তি তৎক্ষণে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

নিবারণবাবুর নিকট পরদিনই এক টেলিগ্রাম পৌঁছিল,—তাঁহার প্রাণদণ্ড রদ হইয়াছে, অভিযোগ হইতে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন। এই ভদ্রলোকটি কিছুদিন পর বারদীতে আসেন। ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমস্থ তৈলচিত্রখানি দেখিয়াই তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠেন, "এই তো সেই মহাপুরুষ, সেদিন যিনি হাজতে ঢুকে আমায় কৃপা ক'রে এসেছিলেন।"

লোকনাথের নরদেহের লীলা পূর্বেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সূক্ষ্মলোকচারী বিদেহী লোকনাথের অলৌকিক জীবনের উপর, তাঁহার করুণালীলার উপর যবনিকা সেদিনও নিপতিত হয় নাই।

ভগবানদাস বাবাজী

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অম্বিকা-কালনার নামব্রহ্ম বিগ্রহের মাহাত্ম্যটি দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভগবানদাস বাবাজী এই শ্রীমূর্তির সেবা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তিবলে ইহা হইয়া উঠিয়াছে পরম জাগ্রত। কালনার এ শ্রীপাটে তাই ভক্ত ও বৈষ্ণবজনের ভিড়ের অন্ত নাই।

ঠাকুরের উপলভোগ সেদিন সবেমাত্র সমাপ্ত হইয়া গেল। কাঁসর ঘণ্টার রব স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। বাবাজী মহারাজ তাঁহার ঝুলি ও মালাটি নিয়া নিকটস্থ ভজনকুটিরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ জপ ও নামব্রহ্মের অনুধ্যানের পর দেখা দিল গভীর ভজনাবেশ। মহাসাধকের নয়ন দুইটি অর্ধনিমীলিত, হাতের মালাগাছটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া কখন থামিয়া গিয়াছে।

এমন সময় বাবাজী মহারাজের ভজনকুটিরে এক বিশিষ্ট দর্শনার্থী প্রবেশ করিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলের প্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারী বর্ধমানের মহারাজা। কোথা হইতে কি ঘটিল —বাবাজী মহারাজ হাতের মালাটি আসনের উপর রাখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে, মার্ মার্, তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে।" দর্শনার্থী মহারাজ হতাশায় মুষড়িয়া পড়িলেন। সিদ্ধ সাধুর ভজনকুটিরে প্রণাম করিতে আসিয়া এ কোন্ বিপত্তি! ভাবিলেন, হয়তো বিষয়ী লোকের সংস্পর্শ এড়াইতে চাহেন বলিয়াই বাবাজী মহারাজের এই কোপ। কিন্তু ইহার পরই সিদ্ধ ভগবানদাস হঠাৎ একেবারে নীরব হইয়া পড়িলেন। নয়ন দুইটি তাঁহার পূর্বের মতোই মুদিত, দেহটি একেবারে নিস্পন্দ। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত বৈষ্ণব মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া বর্ধমানরাজ ভাবিতেছেন, বাবাজীর সংবিৎ ফিরিয়া আসুক— তাহার পর এই আকস্মিক ক্রোধ প্রকাশের হেতুটি কি তাহা জানিয়া তিনি এস্থান হইতে উঠিবেন।

কিছুক্ষণ পরে ভগবানদাস বাবাজীর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মালাগাছটি কুড়াইয়া নিয়া সম্মুখে তিনি দৃক্‌পাত করিলেন। বিশিষ্ট অতিথিকে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বাবা, কখন আপনার আসা হয়েছে? ঠাকুর আনন্দে রেখেছেন তো? শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের প্রসাদ কি এখানে পেয়েছেন?"

মহারাজের বিস্ময়ের অবধি নাই। যে বাবাজী মহারাজ কিছুক্ষণ আগেই তীব্র চীৎকার করিয়া তাঁহাকে তাড়াইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার একি অদ্ভুত রূপান্তর? এত কটুকাটব্যের পর কেনই বা আবার এত সমাদর?

এবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বাবাজীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আমি ভজনকুটিরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এমন মারমুখী হয়ে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন কেন? আমি বিষয়ী হতে পারি, কিন্তু নামব্রহ্মের দর্শনার্থী তো বটে, তবে এমনতর কটুকথা আমায় কেন বললেন?"

"সে কি গো! সর্বত্রাভ্যাগতো গুরু।—অভ্যাগত ব্যক্তি মাত্রেই সে বৈষ্ণবের কাছে পরম আরাধ্য। তাঁকে কোনো কটুকথা বললে যে শ্রীভগবানকেই অসম্মান করা। আপনাকে আবার কখন আমি ওসব বললাম?"

"আজ্ঞে, আমি আপনার চরণ দর্শন করতে আসামাত্রই তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে ব'লে আমার প্রতি রোষ প্রকাশ করছিলেন।"

বাবাজী মহারাজ বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। এবার তিনি কোমল, সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "না বাবা, আপনি মনে দুঃখ করবেন না। আমি আপনাকে উদ্দেশ ক'রে ওসব কিছু বলি নি। আপনি কখন এসেছেন তা এই স্থূল চোখে দেখিও নি। সে সময়ে শ্রীবৃন্দাবনধামে গোবিন্দ মন্দিরের তুলসীমঞ্চের ওপর উঠে একটা ছাগল তুলসীপাতাগুলো খেয়ে ফেলছিল। প্রভুর সেবায় বিঘ্ন হবে ভেবে আমি তখন ওটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। ঐ ছাগলটাকে লক্ষ্য ক'রেই আমার এই গালিগালাজ।"

রাজাবাহাদুরের বিস্ময় এবার চরমে উঠিয়াছে। বর্ধমান-কাল্‌নার ভজনকুটিরে উপবিষ্ট এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ কি করিয়া বৃন্দাবনধামে স্থূলদেহে উপস্থিত হইলেন, ছাগল বিতাড়িত করিলেন ইহা কিছুতেই তাঁহার বোধগম্য হইতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে কি জানি কি ভাবিয়া পকেট ঘড়িটা বাহির করিয়া ঠিক সময়টি দেখিয়া নিলেন। অতঃপর বাবাজী মহারাজের সহিত কিছুক্ষণ আলাপের পর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বর্ধমানরাজ ভাবিলেন, গোবিন্দ মন্দিরে এই সময়ে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে কিনা ইহা জানা দরকার। সেদিনই তিনি বৃন্দাবনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকট তার প্রেরণ করিলেন। উত্তরে সংবাদ জানা গেল, তাঁহার উল্লিখিত সময়ে গোবিন্দজীর তুলসীমঞ্চস্থিত চারাগাছটি ছাগল কর্তৃক সত্যই ভক্ষিত হইতেছিল। কাল্‌না নিবাসী ভগবানদাস বাবাজী হঠাৎ সেই সময়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হন এবং লাঠি হস্তে চীৎকার করিতে করিতে ছাগলটিকে তাড়াইয়া দেন।

এই অলৌকিক ঘটনার কথা জানিয়া রাজাবাহাদুর ও স্থানীয় জনগণের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। বুঝা গেল, ভজনাবেশের মধ্য দিয়া শক্তিধর বাবাজী স্থূলদেহেই বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন।

যে মহাবৈষ্ণবের জীবনে এই অপূর্ব ভজনসিদ্ধি সম্ভবপর হয়, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন উড়িষ্যার কোনো অখ্যাত গ্রামের এক নগণ্য বালক। প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির প্রবাহ উড়িষ্যার জনজীবনকে শত শত বৎসর ধরিয়া অভিসিঞ্চিত করিয়াছে, সার্থকনামা বৈষ্ণব সাধকদের সেখানে আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। উত্তরকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইহারই একটি ধারা অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষু বালক ভগবানদাসের অধ্যাত্মজীবন অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। অতঃপর এক কাঙাল বৈষ্ণবের বেশে তিনি বৃন্দাবনধামে চলিয়া যান।

বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী তখন গোবর্ধনে ভজন নিরত। উৎকল দেশীয় এই মহাবৈষ্ণবের চরণপ্রান্তে তৎকালে নানা দিগ্‌দেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আশ্রয় নিতে আসিতেছেন। উড়িষ্যাবাসী তরুণ বৈষ্ণব ভগবানদাসও সেদিন এ মহাপুরুষের পদেই আত্মসমর্পণ করিলেন, তাঁহার নিকট করিলেন ভেক গ্রহণ।

অতঃপর গুরুদেবের আশ্রয়ে গোবর্ধনে থাকিয়া দীর্ঘদিন তিনি রাগানুগা সাধনের নিগূঢ় নির্দেশ প্রাপ্ত হন, বিবিধ ভক্তিশাস্ত্রেও তাঁহার প্রচুর অধিকার জন্মে। গুরু কৃষ্ণদাস বাবাজীর আদেশমতো তরুণ সাধক পরবর্তীকালে বর্ধমানের অম্বিকা-কাল্‌নায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই শক্তিমান্ বৈষ্ণবের সাধনার মধ্য দিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম বিগ্রহের সেবা প্রকট হয়।

এই উৎকলীয় বৈষ্ণব ক্রমে গৌড়ীয় ভক্ত ও সাধকসমাজের এক মহাসমর্থ আচার্যরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। উড়িষ্যার ভক্তি-তরুটি বাংলার বুকে, পবিত্র বৈষ্ণবভূমি কালনার ধীরে ধীরে তাঁহার দীর্ঘায়ত স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তারিত করিয়া দেয়।

রাগানুগা সাধনের যে নিগূঢ় তত্ত্ব ভগবানদাস বাবাজীর জানা ছিল, দীর্ঘ পরীক্ষা ব্যতীত সহজে তিনি ইহা ভজনকারী শিষ্যদের প্রদান করিতেন না। তাছাড়া, এই সাধনের যে সিদ্ধি তিনি করায়ত্ত করেন আপন সত্তার গভীর স্তরে অবলীলায় তিনি তাহা সঙ্গোপিত রাখিতে পারিতেন—এমনই ছিল তাঁহার ভজন সামর্থ্য। উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেশ বর্জিত, সদা গম্ভীর-মূর্তি, এই মহাবৈষ্ণব সমকালীন-ভক্তসমাজে এক পরম শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্দিরের ভোগারতি শেষ হইলে সিদ্ধবাবার জন্য মহাপ্রসাদ আনীত হইত। প্রথমেই কিন্তু তিনি ইহা স্পর্শ করিতেন না। একটি বিষধর প্রাচীন সর্পের প্রতীক্ষায় তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে দেখা যাইত। কোথা হইতে এই সর্প তাঁহার ভজনকুটিরে ধীরে ধীরে উপনীত হইত, কেহ জানিত না। আশ্চর্যের বিষয়, সাপটি প্রসাদের কিছুটা অংশ গ্রহণ না করা পর্যন্ত বাবাজী মহারাজ ইহার এক কণাও গলাধঃকরণ করিতেন না।

একদিন সিদ্ধ ভগবানদাসের একজন ভক্ত এই সর্পটিকে যষ্টি সাহায্যে তুলিয়া আঙিনার বাহিরে দূরে নিক্ষেপ করেন। এই কথা শুনিয়া বাবাজী মহারাজের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। বিষাদখিন্ন স্বরে তিনি তাঁহার ঐ ভক্তটিকে বলিতে লাগিলেন, "উনি হচ্ছেন আমার নামব্রহ্মের বড় ভাই—অনন্তদেব। আর তুমি কিনা আজ ওঁরই সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে? যাও! কখনও তুমি আমার এ আশ্রমে আর প্রবেশ ক'রো না।" দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বাবাজী মহারাজের অন্তরে সেদিনকার এই ঘটনাটির করুণ স্মৃতি বর্তমান ছিল। ঐ দুষ্কৃতকারীর প্রতি তাঁহার অসন্তোষও সহজে দূর হয় নাই।

ভজনসিদ্ধ মহাসাধক একান্ত নিষ্ঠা সহকারে সতত তাঁহার ইষ্টের আরাধনায় ব্যাপৃত থাকেন—গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাহার জপ তপ চলিতে থাকে অব্যাহত গতিতে। কোনো কোনো দিন ভজনের সম্যক্ স্ফুরণ না হইলে ভগবানদাস বাবাজী কোনো আহার্য বস্তুই গ্রহণ করেন না। কখনো কখনো একাদিক্রমে এইরূপে দুই চারিদিনও কাটিয়া যায়। আবার জপ ও ভজনের ফলে দিব্য আনন্দ ও রসাবেশ সঞ্চারিত হয়। তখন তিনি বালকের মতো আহার্যের অন্বেষণে ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়েন।

গভীর রাত্রে একদিন তিনি বড় ক্ষুধার্ত হইয়াছেন। খাবার তখনই কিছু চাই-ই। দ্রুতবেগে তখনই বাজার হইতে নানাপ্রকার মিষ্ট দ্রব্যাদি কিনিয়া আনা হয়, তবে তাঁহাকে কোনোক্রমে শান্ত করা যায়। আনন্দে উৎফুল্ল সিদ্ধবাবা বিগ্রহের চরণামৃতের ছিটা দিয়া বাজার হইতে সংগৃহীত এই আহার্যকে শুদ্ধ করিয়া নেন, তারপর পরমানন্দে উহা ভোজন করেন।

বাবাজীর জীবপ্রেমের নানা অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া শিষ্যেরা প্রায়ই বিস্মিত হইয়া যান। কালনার এই আশ্রমে তাঁহার একটি পোষা প্রিয় বিড়াল আছে, রোজই সে প্রসাদান্নের অংশ গ্রহণ না করিয়া ছাড়ে না। ভজনাবিষ্ট সিদ্ধবাবা যেদিন প্রসাদান্ন ভোজনে দেরি করেন, রোজকার অভ্যাসমতো এই বিড়াল তাঁহার চারিদিকে ডাকিয়া ডাকিয়া ঘোরাফেরা করে। বাবাজী থালার ঢাকনাটি খুলিয়া দিলে মার্জারীর পরমানন্দ।

মনেব সুখে তাহাব নিজস্ব অংশটি উদবস্থ কবিযা সে সাবিযা পড়ে। অবশিষ্ট আহার্য সিদ্ধবাবা মহাবাজ তাঁহাব সুবিধামতো পবে গ্রহণ কবেন।

বাবাজী মহাবাজেব শুদ্ধাভক্তি ও নিবভিমানতা ছিল অতুলনীয। একবাব প্রভুপাদ বিজযকৃষ্ণ গোস্বামী সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন কবিতে কালনায আসেন। গোস্বামীজী তখন ব্রাহ্মসমাজেব এক বিশিষ্ট আচার্য। বিজযকৃষ্ণেব পবিচয় পাওযামাত্র সিদ্ধবাবা মহাবাজ সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চবণে প্রণত হইলেন—গোস্বামীমহাশয যে তাঁহার পবমাবাধ্য শ্রীঅদ্বৈতেব বংশোদ্ভব। বিজযকৃষ্ণ সেদিন শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রণামবত বাবাজীকে নিবস্ত কবিতে পাবেন নাই।

গোস্বামীজী পথশ্রান্ত, পিপাসার্ত হইযা আসিযাছেন। আশ্রমেব এক সেবকের নিকট তিনি তাই পানীয জল চাহিলেন। ভগবানদাস বাবাজী তৎক্ষণাৎ কুটিব হইতে ছুটিযা বাহিব হইলেন। নিজেব ব্যবহাবেব কবঙ্গখানি সযত্নে মাজিয়া ঘষিয়া উহাতে প্রভুপাদেব জন্য জল নিযা আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সযত্নে গোস্বামীপাদেব জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রসাদেবও ব্যবস্থা কবা হইল।

সিদ্ধবাবাব এ আচবণ দেখিযা বিজযকৃষ্ণ তো অবাক! স্বভাব সিদ্ধ সবল ভাষায় তিনি বলিযা বসিলেন, "বাবা, আমি কিন্তু ব্রাহ্ম, আমাকে আপনাব পবিত্র কবঙ্গ থেকে জলপান কবতে দেবেন না। তাছাড়া আমি জাতিভেদও মানিনে—যত্রতত্র যাব তাব ছোঁযা ভাত খেযে ঘুবে বেড়াই।"

দৈন্য ও বৈষ্ণবতাব প্রতিমূর্তি ভগবানদাস বাবাজী কবজোড়ে গোঁসাইজীব সম্মুখে দণ্ডাযমান। স্মিতহাস্যে তিনি কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, জাতিবুদ্ধি ও ভেদবোধ থাকতে কি ভক্তিদেবীব কৃপা কখনো হয? আপনি এ অধমকে আব পবীক্ষা কববেন না। কৃপা ক'রে জল পান কবুন।" সিদ্ধবাবাজী মহাবাজ এইখানেই কিন্তু থামিবাব পাত্র নহেন। প্রভুপাদ জল পান কবিযা কবঙ্গটি নিচে বাখামাত্র ভক্তিভবে তিনি শিবে ঠেকাইলেন, তারপব উহাব অবশিষ্ট জল পবমানন্দে গলাধঃকবণ কবিযা ফেলিলেন।

উভযেব এই মিলন সমযে আশ্রমকুটিরে সেদিন আরও কযেকজন অভ্যাগত উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন হঠাৎ সেখানে বসিযা মন্তব্য করেন, "গোস্বামীমশাই দেখছি ব্রাহ্মণ হযেও পৈতাটি ত্যাগ কবেছেন!"

বাবাজী মহারাজ তাহাকে বাধা দিযা কোমল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, ও কথা কখনো বলতে নেই। জানতো আমার অদ্বৈত সন্তানেব কি মহিমা! ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছেন বটে, কিন্তু সেখানেও ঠিক আচার্যটি হযেই বসে আছেন।"

মন্তব্যকাবী ব্যক্তিটি এবাব আবো বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিযা উঠিলেন, "কেমন আচার্য তা তো দেখাই যাচ্ছে, জামা-জুতা পবা আধুনিক আচার্য।" ভক্তিসিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীব চোখে এইবার অশ্রুরাশি উদ্‌গত হইল। সখেদে ঐ ভদ্রলোকটিকে কহিতে লাগিলেন, "একথা বলা যে মহা অপবাধ, বাবা! আমাদেব প্রভুকে সুন্দব ক'বে সাজানো, সে যে আমাদেবই কর্তব্য। অথচ আমবা এমনই দুর্ভাগা যে—তাঁব জন্য কিছুই কবতে পাবি নি। আব যদিবা তিনি নিজে প্রযোজনমতো কিছুটা সংগ্রহ ক'রে নিযেছেন, তা দেখে যে আমবা একটু আনন্দ কববো, সে সৌভাগ্যও আমাদের নেই।" সমালোচকের উদ্ধত শির তখন লজ্জায অবনত হইযা পড়িযাছে।

ভগবানদাস বাবাজী মহারাজের ভজননিষ্ঠার খ্যাতি শুধু কাল্‌নায় নয, সমগ্র দেশের

দিগ্‌দিগন্তে সে সময়ে প্রচারিত। উৎকল দেশ হইতে আগত এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ বাংলার জনজীবনের সহিত সেদিন নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, ভজনসিদ্ধি ও নেতৃত্ব শক্তির বলে গৌড়ীয় সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপেও তিনি পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন।

রাগানুগা ভজনের নিগূঢ় ধারাপথটি বাহিয়াই সিদ্ধবাবাজীর সাধনা গোপনে অগ্রসর হইয়া চলিত। তাই এই নিষ্কিঞ্চন ভাবগম্ভীর বৈষ্ণবের বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া সত্যকার রসমধুর স্বরূপটি দর্শনের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হইত। মধুর ভজনের ভাবোচ্ছ্বাসকে সুসংহত করিয়া রাখিবার শক্তি বাবাজী মহারাজ যেন অতি স্বচ্ছন্দে ধারণ করিতেন—আর ইহাই ছিল তাঁর সাধনজীবনের এক পরম বৈশিষ্ট্য।

নিজে কাঙাল বৈষ্ণব হইলে কি হয়, ভগবানদাস বাবাজীর প্রতিষ্ঠা তাঁহার শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্য দূর-দূরান্ত হইতে শত শত ভক্তকে নিয়ত আকর্ষণ করিয়া আনিত। তাঁহার স্থাপিত নামব্রহ্ম ছিলেন এক মহাজাগ্রত বিগ্রহ, বহু ভক্তের আনন্দোৎসব ও ভজনাবেশ এই শ্রীমূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইত। পরিপাটি রূপে ইঁহার সেবা অনুষ্ঠান করিতে ভক্তদের উৎসাহের অবধি থাকিত না।

একবার আশ্রম হইতে নামব্রহ্মের কতকগুলি মূল্যবান্ আভরণ অপহৃত হয়। বিগ্রহের পূজারী ব্রাহ্মণই গোপনে এই দুষ্কার্যটি করিয়া হঠাৎ পলায়ন করে। ইহা নিয়া কাল্না শহরে সেদিন আলোড়নের অন্ত নাই। ভক্তেরা সবাই মহা উত্তেজিত। পুলিশের সাহায্য নিয়া অপহৃত স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি তাঁহারা উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু বাবাজী তাহাতে একেবারেই সম্মত নহেন। সকলকে প্রবোধ দিয়া তিনি স্মিতহাস্যে কহিতে লাগিলেন, "আহা! তোমরা ব্যস্ত হচ্ছো কেন? নামব্রহ্মের অলঙ্কার পরবার হয়তো এখন ইচ্ছে নেই। তাইতো পূজারীকে এগুলো নিয়ে যেতে দিয়েছেন। বেশ তো,এখন কিছুকাল এমনিই থাকুন না।"

ইহার পর কয়েকমাস গত হইয়াছে। হঠাৎ একদিন প্রভাতে দেখা গেল, সেই পলাতক পূজারী ব্রাহ্মণটি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। একটি পুঁটুলিতে বাঁধিয়া বিগ্রহের সমস্ত অলঙ্কারই সে ফিরাইয়া আনিয়াছে। বাবাজী মহারাজের সম্মুখে ইহা রাখিয়া ভয়ার্ত লোকটি উচ্চ স্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে স্বীকার করিল, "বাবা, লোভে পড়েই নামব্রহ্মের এই সমস্ত গহনা নিয়ে পালিয়েছিলাম। কিন্তু শেষকালে এগুলোকে ভেঙে ফেলতে মন চায় নি। অনুতাপে ও প্রাণের অশান্তিতে আমি এতদিন কষ্ট পেয়েছি। এগুলো তাই ফিরিয়ে দিলাম। বাবা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

এই অনুতপ্ত, ক্রন্দনরত, ব্রাহ্মণকে সিদ্ধবাবা আশ্বস্ত করিলেন। তারপর জগদীশবাবা প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত-সেবকদের ডাকিয়া কহিলেন, "এই দেখ আর এক কাণ্ড। নামব্রহ্মের আবার অলঙ্কার পরবার ইচ্ছে হয়েছে। তাই তো আবার ওসব আনিয়ে নিলেন। ফচ্‌কে ফচ্‌কে। চিরকালের ফচ্‌কে। কখন তাঁর কি ইচ্ছে হয় কিছুই ঠিক নেই। যাও, এখনি ওসব নিয়ে যাও, আবার সব গয়না পরিয়ে দাও।" বলা বাহুল্য, দুষ্কৃতকারী মন্দিরপূজারী আবার তাহার পুরাতন পদে নিযুক্ত হইল।

অলৌকিক শক্তির প্রকাশ সিদ্ধবাবা ভগবানদাসজীর জীবনে দিনের পর দিন দেখা গিয়াছে। কিন্তু সাধারণত নিজে তিনি ইহা সতর্কভাবে গোপন করিয়া রাখিতেই চাহিতেন। ভক্ত ও শিষ্যদের জীবনে অকপট ভজননিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারী জীবনের আদর্শকে

স্থাপিত করার উপরই তিনি জোর দিতেন বেশী। শিষ্যদের পক্ষে কোনো লৌকিক কর্তব্য ও আচরণের ব্যতিক্রম করার উপায় ছিল না। ভাবের ঘরে চুরি করিতে গেলে দুর্বল সাধককে সিদ্ধবাবার কঠোর আঘাত অনিবার্যরূপে সহ্য করিতে হইত।

একবার বিষ্ণুদাস নামে আশ্রমের এক শিষ্য জ্বরে আক্রান্ত হয়। অসুখ সারিবার কোনো চিহ্ন তো নাই-ই বরং কেবলই তাহা বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে। ভগবানদাস বাবাজী ব্যস্তসমস্ত হইয়া রোগীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে বিষ্ণুদাস, তোর জ্বর তো সারছে না। ডাক্তারকে দেখিয়ে কিছু ওষুধ-পত্র খা না?"

বিষ্ণুদাস একজন স্বভাবভক্ত সাধক। সবিনয়ে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে ওষুধ-টষুধ কি আর খাবো, ওতে কি-ইবা হবে? নামব্রহ্মের কৃপায়ই ভাল হয়ে যাবো।"

বাবাজী মহারাজ রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "হ্যাঁ, যেন আজই তুই এক মস্ত সিদ্ধপুরুষ হয়ে গিয়েছিস্, আর প্রভু শ্রীনামব্রহ্মকে আজ তোর জন্য ডাক্তার হতে হবে। রোগ হয়েছে— ঔষধপত্র খা, তবে তো? এসব প্রায়শ্চিত্তের অন্তর্গত—এটা জেনে রাখবি। যা কিছু কর্তব্য তোর করবার, তার জন্য শ্রীনামব্রহ্মের উপর ভার দিবি কেন বল্ দেখি?"

বিষ্ণুদাসজীকে গুরুর নির্দেশে চিকিৎসকের ঔষধপত্র খাইতেই হইল। অতি সত্বর তিনি সুস্থ হইয়াও উঠিলেন।

এক এক সময়ে সিদ্ধবাবাজীর বড় বিচিত্র এবং বালকোচিত ঝোঁক দেখা দিত। একবার তাঁহার অদ্ভুত খেয়াল হয়, তিনি কাল্‌নায় শ্রীনামব্রহ্মের আঙ্গিনার সম্মুখে এক পুষ্করিণী খনন করাইবেন, তারপর তাহাতে এক 'টুঙ্গি' বা মঞ্চ বাঁধিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ধ্যান জপে নিবিষ্ট হইবেন।

আদেশ দেওয়া হইল, "কাল ভোরবেলা থেকেই লোকজন লাগিয়ে অবিলম্বে এক পুকুর খোঁড়াও।" ভক্ত ও শিষ্যগণ তখনি কর্মতৎপর হইয়া উঠিলেন। বহু মজুর নিযুক্ত করিয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমের একটি পুকুর খনন করা হইয়া গেল। বাঁশের এক উঁচু টুঙ্গি বাঁধিতেও দেরি হইল না।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাবাজী মহারাজের আনন্দের সীমা নাই। পরম উৎসাহের সহিত তিনি এই নবরচিত বংশমঞ্চে উঠিয়া ভজন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এক আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার পরিকল্পনাটি বিপর্যস্ত হইয়া গেল। সিদ্ধবাবাজী মহারাজ কয়েকদিন এখানে বসিয়া ভজনরত রহিয়াছেন। হঠাৎ সেদিন লক্ষ্য করিলেন, একটি গোবৎস তীর হইতে পা ফস্‌কাইয়া পুকুরের জলে পড়িয়া গেল। সে কি? শেষে কি এখানে গোবধ হইবে? বাবাজী মহারাজ তখনই উচ্চ সোরগোল আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার চীৎকারে ভক্তদের ভিড় জমিয়া গেল, সকলে মিলিয়া ঐ বিপন্ন বাছুরটিকে জল হইতে উত্তোলন করিলেন। সেবা পরিচর্যায় কোনোক্রমে সেদিন জীবটির প্রাণ রক্ষা হইল।

যে বিচিত্র খেয়াল বাবাজীর মনে উদ্‌গত হইয়াছিল, এবার তাহা তিরোহিত হইয়াছে। মৃতকল্প গোবৎসটির এই দুর্দশা তাহার সমস্ত ব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দিয়াছে। জগদীশবাবা, প্রাণকৃষ্ণবাবা প্রভৃতি ভক্তদের ডাকিয়া সিদ্ধিবাবাজী তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন, "ওরে, আর আমার পুকুরে বসে ভজন ক'রে কাজ নেই। এবার এখনি এটাকে তোরা বুজিয়ে ফেল। শেষকালে কি গোবধের পাপে লিপ্ত হবো?" যেমন ক্ষিপ্রগতিতে পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল, তেমনিভাবে আবার উহা ভরাট হইয়া গেল।

আশ্রমের সেবকরা রান্নার জন্য কাঠ ক্রয় করেন, ইহার বাজার মূল্য, প্রতি বোঝায় তিন আনা। কিন্তু স্থানীয় এক বৃদ্ধা কাষ্ঠবিক্রেত্রীকে নিয়ে সকলকে বড় বিব্রত হইতে হয়। ভগবানদাসবাবা সেদিন কাঠের বোঝার জন্য তাহাকে তিন আনা দিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। নানা প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, এই বৃদ্ধার ঘরে কয়েকটি পোষ্য রহিয়াছে, অথচ অন্নের কোনো সংস্থান নাই। বাবাজী মহারাজ অমনি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, "এ তোমাদের কেমন কথা। তিন আনায় এর সংসার কি ক'রে চলবে ? এর এতগুলো পোষ্য—একে দ্বিগুণ ক'রে দাম দিতে হবে।" আদেশ পালিত হয় বটে, কিন্তু আশ্রমের সেবকরা পারতপক্ষে এই কাষ্ঠবিক্রেত্রীকে আর বাবাজী মহারাজের সামনে পড়িতে দিতে চাহিতেন না।

সিদ্ধ ভগবানদাসের সমসাময়িক কালে নবদ্বীপধামের সাধক চৈতন্যদাস বাবাজীরও খুব প্রসিদ্ধি ছিল। দুই মহাপুরুষের মিলনে অপরূপ আনন্দরস উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। প্রেমলীলা ও কৃত্রিম কোপ প্রকাশের মধ্য দিয়া উভয়ে এ মিলনকে এক মনোজ্ঞ প্রেম-নাট্যে রূপায়িত করিয়া তুলিতেন।

ভাব-গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি, সিদ্ধ ভগবানদাস কিন্তু বহিরঙ্গ জীবনে এই চৈতন্যদাস বাবাজী হইতে এক ভিন্নতর ভঙ্গিমায়ই চলাফেরা করিতেন। চৈতন্যদাস বাবাজীর সখীবেশ, রসানুভূতির উচ্ছলতা ও উন্মাদনার প্রতি কৃত্রিম কটাক্ষ করিয়া ভগবানদাস বাবাজীকে প্রায়ই সকৌতুকে বলিতে শুনা যাইত, "ফচ্‌কে ফচ্‌কে—একেবারে নির্লজ্জ, ফচ্‌কে।" অথচ চৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত সিদ্ধবাবার সখ্য ও অন্তরঙ্গতার সীমা ছিল না।

সেবার ভগবানদাস বাবাজী মহারাজ কাল্‌না হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছেন। প্রধান উদ্দেশ্য, শ্রীমান্ মহাপ্রভুর মন্দিরে বসিয়া গৌরসুন্দরের সদাজাগ্রত মোহনমূর্তিটি দর্শন করা। এই উপলক্ষে চৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে উহাও তিনি জানেন। কারণ, চৈতন্যদাস বাবাজী তৎকালে মহাপ্রভুর মন্দিরের একটি নির্জন কুটিরে তাঁহার রাগানুগা সাধনে মত্ত রহিয়াছেন।

ভগবানদাস বাবাজী মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গৌরপ্রেমিক, সদা ভাবোন্মত্ত চৈতন্যদাস আঙিনাটি ঝাঁট দিতেছেন। বহু ভক্তজন পরিবৃত ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিয়াই চৈতন্যদাস সেদিন এক অদ্ভুত আচরণ করিলেন। হস্তস্থিত সম্মার্জনীটি উঠাইয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। তারপর ভগবানদাসজীকে উদ্দেশ করিয়া কোপভরে কহিতে লাগিলেন, "তুই বুঝি আমার প্রাণবল্লভকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিস। এই মুহূর্তে বের হয়ে যা—নইলে তোকে ঝাঁটাপেটা ক'রে ছাড়বো।" উপস্থিত বৈষ্ণব-মণ্ডলী তো বিস্ময়ে হতবাক্। নবদ্বীপে আগত অতিথি, সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর প্রতি একি অদ্ভুত অপমানকর ব্যবহার ? অনেকেই ক্ষুব্ধ হইলেন।

বাবাজী মহারাজ কিন্তু অচঞ্চলভাবে আঙিনায় দাঁড়াইয়া আছেন আর মৃদু মধুর হাসিতেছেন। অতঃপর চৈতন্যদাসজীর ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনিও কহিতে লাগিলেন, "ওগো, তুমি আমার ওপর শুধু শুধু এত রাগ করছো কেন, বলতো ? আমি তো তোমার প্রাণবল্লভকে নদীয়া ত্যাগ করাতে চাইনে। কিন্তু তিনি নিজেই যে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার অগোচরে প্রায় সময়েই কাল্‌নায় চলে যান। কাজেই তুমি বরং তাঁর দিকেই আরো একটু বেশী দৃষ্টি রেখো।"

চৈতন্যদাস অভিমানাহত হইযা মন্দিবে ঢুকিলেন ও সশব্দে দ্বাবটি বুদ্ধ কবিযা দিলেন। বাহিবে জনতাব কানে তখন শোকে মুহ্যমান মহাপ্রেমিক চৈতন্যদাস বাবাজীর মর্মভেদী আর্তি কেবলি ভাসিযা আসিতেছে। কিছুক্ষণ পব সুস্থ হইযা চৈতন্যদাস বাবাজী মন্দিব হইতে বাহিব হইযা আসিলেন। এইবাব তিনি পবম সুহৃদ্ ভগবানদাসজীব হস্তটি ধাবণ কবিযা তাঁহাকে মন্দিবেব অভ্যন্তবে নিযা গেলেন। দুই প্রেমিক সাধকেব আনন্দনর্তনে প্রেমেব বন্যা প্রবাহিত হইল।

সিদ্ধবাবা ভগবানদাসেব আচাব-আচবণে বসাবেশেব চাঞ্চল্য বড কম দেখা যাইত। বাগানুগা ভজনেব তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট সাধক, কিন্তু প্রেমোচ্ছল বসধাবাকে তাঁহাব বহিবঙ্গ জীবনে যখন তখন উপচিযা পডিতে খুব কম লোকেই দেখিযাছে। কিন্তু এই অন্তর্মুখীন প্রেমেব প্রবাহকে ভগবানদাস তাঁহাব ভাগ্যমান্ শিষ্যদেব সাধনজীবনে অবলীলায সঞ্চালিত কবিযা দিতে পাবিতেন। এই নিগূঢ প্রেমবসেব ধাবাকে ধাবণ কবা অনেকেব পক্ষেই হযতো সহজ ছিল না, তাই শুধু অল্প-সংখ্যক অন্তবঙ্গ শিষ্যই তাঁহাব নিকট হইতে এই পরম বস্তু প্রাপ্ত হন। বৈষ্ণব সাধনার বহিরঙ্গ স্তরেও সিদ্ধ বাবাজীব অবদান কম ছিল না। ভজন ও সেবাব আদর্শটি এই সমর্থ আচার্য এক অপবূপ মহিমায বিস্তারিত কবিযা দিযা যান। নিত্যলীলায প্রবিষ্ট না হওযা অবধি এ ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁহাব কোনোদিন ত্রুটি হয নাই।

ভোলানন্দ গিরি

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর ঘিরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। দিক-চক্রবালে অস্তমান সূর্যের শেষ রেখাটুকু তখন বিলীন প্রায়। পথচারী সংসারবিরাগী যুবক ভোলাদাস এ সময়ে দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিয়াছেন। অন্ধকার আরো গাঢ় হইবার আগেই যে তাঁহাকে পস্তানা গ্রামে পৌঁছিতে হইবে। যোগীবর গোলাপগিরিজীর প্রসিদ্ধ আশ্রম ও মহাপুরুষের চরণাশ্রয়ই আজ তাঁহার লক্ষ্য। সেই দিকেই ব্যগ্রভাবে তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন।

সর্বময়কে লাভ করার আশায় যুবক ভোলাদাস আজ হইয়াছেন সর্বস্বত্যাগী। জীবনের প্রথমকাল হইতেই বৈরাগ্যের যে হাতছানি তাঁহাকে নিরন্তর চঞ্চল করিয়া তুলিত তাহারই অমোঘ আহ্বান এবার আসিয়া গিয়াছে। এ আহ্বান এড়াইবার উপায় কই ?

পাঞ্জাবের মালের কোট্‌লাস্থিত খুরদা গ্রামে ভোলাদাসের বাস। পদব্রজেই সমস্তটা দুর্গম পথ তিনি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। পস্তানা এখান থেকে আরো আড়াই ক্রোশ দূরে। সেখানে পৌঁছিয়া যোগীগুরুর চরণে চিরতরে আত্মসমর্পণ না করিতে পারিলে তাঁহার শান্তি নাই।

প্রাসাদোপম এক অট্টালিকায় গিরিমহারাজের বাস। চৌদ্দশত গাভী ও পাঁচশত মহিষ সহ বিস্তীর্ণ ভূমির তিনি মালিক। ভক্ত ও সাধক শিষ্যের সংখ্যাও তাঁহার এখানে কম নয়। শিবকল্প মহাতপস্বীরূপে সারা কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে গোলাপগিরিজীর খ্যাতির অন্ত নাই। যোগ ও ভোগের যুগ্ম-রশ্মিকে এ অধ্যাত্ম-মহারথী নিতান্ত অবলীলায় যেন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আগ্রহ-অধীর ভোলাদাস সে রাত্রিতে এই রাজসন্ন্যাসীর দরবারে কম্পিত হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন।

গোলাপগিরি মহারাজের বয়স আশি পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যোগীদেহে বার্ধক্যের ক্ষীণতম চিহ্নই নাই। দীর্ঘায়ত সুন্দর সুঠাম দেহখানিতে লাবণ্যশ্রী টলমল করিতেছে। পরম প্রাপ্তির মহিমায় আননখানি সদা হাস্যোজ্জ্বল। নয়ন হইতে দিব্য আনন্দের জ্যোতি সতত হইতেছে বিচ্ছুরিত। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ভোলাদাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যুক্তকরে যোগীবরের পরমাশ্রয় প্রার্থনা করিয়া জানাইলেন হৃদয়ের আকুতি। মহাপুরুষের প্রসন্ন উজ্জ্বল দৃষ্টি তখন এই আনন্দ্যসুন্দর তরুণের সারা দেহ মনে যেন সান্ত্বনার অমৃত প্রলেপ বুলাইয়া দিল।

মুমুক্ষু ভোলাদাসকে গোলাপগিরি মহারাজ গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহা উপলব্ধি করিতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না, সাধন-গ্রহণেচ্ছু বিংশতি বর্ষীয় এই তরুণ এক ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি—উত্তর জীবনে ইহারই আলোক-উদ্ভাসন অগণিত অধ্যাত্ম সাধককে দেখাইবে পরম পথের সন্ধান।

ভোলাদাস এই যোগীগুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—তাঁহার নব নামকরণ হইল নারায়ণ গিরি। উত্তরকালে সর্বসাধারণ্যে শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি নামেই কিন্তু তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠেন, অতুলনীয় ঋদ্ধি ও সিদ্ধির অধিকারী হইয়া বিরাট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ-রূপে সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা অর্জনে তিনি সমর্থ হন।

আশ্রমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুজী আজ্ঞা দিলেন, নব দীক্ষিত শিষ্যকে প্রতিদিন গোচারণে বাহির হইতে হইবে। আশ্রমের শত শত গাভী ও মহিষগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে যুবক শিষ্যের দল। আর এই কর্তব্য সাধনের মধ্য দিয়াই গোলাপগিরিজী তাঁহার শিষ্যদের নিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্য নিরূপণ করেন। কঠোর পরিশ্রমী ভোলানন্দকে বেশী দিন কিন্তু এই পরীক্ষা দিতে হয় নাই।

গুরুদেব তাঁহার সাধনার জন্যও এক নির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রাত্রি তিনটার শয্যাত্যাগ করিয়া তরুণ শিষ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আশ্রমের শিব পূজার ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইল। ইহার উপর গুরুজী এবং আশ্রমের শিষ্য ও অতিথি অভ্যাগতদের আহার্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে হইত। এক মণ দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন তোলা ছিল তাঁহার নিত্যকার এক বড় কাজ। তদুপরি রাত্রিতে আবার পূজা, আবৃত্তি ও সাধন-ভজন নির্দিষ্ট ছিল। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে ভোলানন্দ তাঁহার এই কর্তব্য-গুলি রোজ সম্পন্ন করিতেন। ইহা সত্ত্বেও গুরুদেবের শাসনের কঠোরতা কমিতে দেখা যাইত না। বিন্দুমাত্র শৈথিল্যের কোনোরূপ ক্ষমা তো ছিলই না অযথা ভর্ৎসনা ও নির্যাতনে তিনি শিষ্যদের সদাই অস্থির করিয়া তুলিতেন। গোলাপগিরিজীর আপাত-কঠোর ব্যবহারের আড়ালেই কিন্তু সঙ্গোপিত ছিল এক কল্যাণময় শুভেচ্ছার ধারা।

শিষ্যদের পরিশুদ্ধির জন্যই যে তাঁহার এ শাসন ও তিরস্কার ইহা উপলব্ধি করিতে কিন্তু সাধক ভোলানন্দের বিলম্ব হয় নাই। তাই এই নিগ্রহকে তিনি গুরুর অনুগ্রহরূপেই মনে করিতেন, অম্লানবদনে সর্বদা সব কিছু সহ্য করিতেন।

উত্তরকালে গুরুর শাসন কাহিনীর প্রসঙ্গে ভোলাগিরিকে বলিতে শুনা যাইত, "আমি আর শিষ্যদের তেমন শাসন করি কই? এরা তো দুর্বল। সামান্য কটু বাক্যের আঘাতে সহজে এলিয়ে পড়ে। আমার গুরুজী বিনা কারণে সর্বদা আমায় কি কঠোর ভর্ৎসনাই না করতেন। গোড়ার দিকে মনে বড় দুঃখ হ'ত। পরে কিন্তু বুঝে ফেল্‌লাম—আমার ভক্তির দৃঢ়তা ও গুরুনিষ্ঠা পরীক্ষার জন্যই যে তাঁর এ দৃঢ় আচরণ। কঠোর শাসনের ভেতর দিয়ে এ ছিল এক প্রচ্ছন্ন কৃপা। তাছাড়া, ভাবতাম কটু কথা বা শব্দও তো মিথ্যা—মায়া, এর ফলে কেন আমরা হৃদয়ের শান্তি নষ্ট হ'তে দেবো? তখন থেকে গুরুমহারাজের কঠোর কথা শুনে আমি বরং গোপনে হাসতাম। কিন্তু বড় আশ্চর্যের কথা, এভাবে আমাকে হাসতে দেখে গুরুজী অতঃপর আর কটুবাক্য সহসা বলতেন না।"

একবার এক তীব্র শীতের রাতে গোলাপগিরিজী অকস্মাৎ ভোলানন্দের উপর কেন যেন কুপিত হইয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তরুণশিষ্যকে কহিলেন, "ভোলা, তুই এই মুহূর্তে শুধু এক কৌপীন প'রে আশ্রম থেকে দূর হয়ে যা, তোর মতো অপদার্থ শিষ্যকে দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই, আজ থেকে আমার বা আমার আশ্রমের সাথে তোর কোনো সম্পর্ক নেই।"

এ আদেশ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। জ্ঞাতসারে ভোলানন্দ গুরুর চরণে কোনো অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তো স্মরণে আসিতেছে না। যাই হোক, আদেশ লঙ্ঘন করিবার দুঃসাহসও তাঁহার নাই। 'জয় গুরুজী' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া ভোলানন্দ আশ্রম সীমানা ত্যাগ করিলেন, রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাঘের প্রচণ্ড শীত। অথচ সন্ন্যাসী ভোলানন্দের পরিধানে রহিয়াছে শুধু একফালি সরু কৌপীন। সারা দেহটি তাঁহার অনাবৃত, আশ্রমপ্রদত্ত কোনো আচ্ছাদনই যে সঙ্গে

নিতে পারে নাই। উদ্‌গত অশ্রু চাপিয়া ভোলাগিরিজী ভাবিতে বসিলেন, যাহার জন্য তিনি সর্বস্ব ছাড়িয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহার চরণাশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন? জাগতিক যে বন্ধনসমূহ নিজ হাতে কাটিয়া ঘরের বাহির হইয়াছেন আজ তো তাহা নিঃশেষিত প্রায়। তাঁহার জীবন-মরণের প্রভু এই গুরুদেব। তিনি ছাড়া এই বিশাল জগতে আপনার বলিবার আর কে আছে?

আশ্রমের বাহিরে গিয়াই চরণ কিন্তু থামিয়া গিয়াছে। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই তিনি সারা রাত্রি অপেক্ষমান রহিলেন। অন্তরে চিন্তার ধারা বহিতে লাগিল, —এই দেহ শ্রীগুরুতে সমর্পিত, তাঁহারই আদেশে প্রাণান্তকর শীতে তিনি কৌপীনবস্ত হইয়া বাহির হইয়াছেন। এ দেহ রক্ষা করিবার হইলে গুরুদেবই তাহা করিবেন। তাছাড়া এ ভঙ্গুর বস্তু বিনষ্ট হইলেই বা ক্ষতি কি। এ রক্তমাংসের খাঁচাটার জন্য অনর্থক মমত্ববোধই বা কেন?

দুঃসহ শীতের রাত্রি কোনোমতে প্রভাত হইল। তখন ভোলানন্দের দেহ ঠাণ্ডার জমিয়া যাইবার মতো হইয়াছে। সকালবেলায় আশ্রম সীমানার বাহিরে আসিয়া গোলাপগিরি মহারাজ শিষ্যকে যুক্তকরে দণ্ডায়মান দেখিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "যা, এবার আশ্রমে গিয়ে কাপড়-চোপড় পরে শিবপূজা সমাপন কর।"

বহু সংখ্যক ভক্ত ও শিষ্যের মধ্যে সাধক ভোলানন্দ গুরুদেবের বিশেষ স্নেহ এবং কৃপালাভে সমর্থ হন। শক্তিমান্ যোগী গোলাপগিরিজীর অসামান্য কৃপার ধারা এই কৃচ্ছ্রব্রতী তরুণ শিষ্যের শিরে অজস্রধারে বর্ষিত হইতে থাকে। সাধনা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গুরুজীর সেবায় পস্তানা আশ্রমে ভোলানন্দ দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, ইহার পর গুরু একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভোলা, একবার তোর জন্মভূমিতে গিয়ে জননীকে প্রণাম ক'রে আয়—কিন্তু দেখিস—মায়ের কাছে পরিচয়টি যেন প্রকাশ না পায়।"

সাধক ভোলানন্দের অন্তরপটে বিস্মৃত প্রায় পুরাতন স্মৃতি এবার ভাসিয়া উঠিতে থাকে। দীর্ঘদিন পূর্বে তাঁহার প্রপিতামহ ভক্তপ্রবর ভাইসাওন খুরদা গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইঁহারা ছিলেন সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই বংশেরই এক পরম নিষ্ঠাবান্ সন্তান, ব্রহ্মদাসের দ্বিতীয় পুত্ররূপে সাধক ভোলাগিরি মহারাজ আবির্ভূত হন।

ব্রহ্মদাসজী এবং তাঁহার পত্নী নন্দাদেবীর শিবারাধনার বড় নিষ্ঠা ছিল। সংসারে কোনোদিনই তেমন অর্থসাচ্ছল্য নাই, তবুও সাধুসন্ন্যাসীর সেবায় ভক্ত দম্পতির উৎসাহের অবধি ছিল না।

এই শুদ্ধসত্ত্ব পরিবারের পুত্রকন্যাদের বৈশিষ্ট্যও বড় চমৎকার। প্রথম সন্তানের নাম রতনদাস, পিতা মাতার সে পরম আদরের ধন। কিন্তু শৈশব হইতে বৈরাগ্য-সংস্কার নিয়াই যেন সে জন্মিয়াছে। কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-বিরক্ত রতনদাস এক রাত্রিতে ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল—অতঃপর আর তাহার সন্ধান মিলে নাই। দ্বিতীয় পুত্র ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ ভোলাগিরি মহারাজ। তৃতীয়ের নাম শঙ্করদাসজী —অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী শঙ্করানন্দ নামে তিনি পরিচিত হন। তাছাড়া এক বিশিষ্ট মঠাধীশরূপেও উত্তরকালে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

বৈরাগ্যপ্রবণ মানসিকতাই ছিল খুরদার এই ব্রাহ্মণ পরিবারের বিশেষত্ব। ভোলানন্দের সহজাত বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা বীজাকারে ছিল তাঁহার বংশধারার মধ্যেই নিহিত।

প্রথম পুত্র রতনদাস কিছুদিন পূর্বে ঘরসংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মদাস এবং নন্দাদেবীর হৃদয়ে তাই সদাই জ্বলে অশান্তির দহন-জ্বালা।

শিবপূজায় বসিয়া সন্তানবিচ্ছেদবিধুরা জননী অন্তরে শান্তি খুঁজিয়া পান না—ইষ্টের চরণে শুধু মাথা খুঁড়িয়া মরেন।

এক নিশীথে নন্দাদেবী বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছেন, "আমি তোমার ও তোমার স্বামীর ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে পরম প্রীত হয়েছি। পুত্র রতনদাস সন্ন্যাসী হয়েছে, কিন্তু সেজন্য তোমার শোক কেন? সে তো গৌরবেরই কথা। আমি প্রসন্ন হয়ে বর দিচ্ছি—তোমরা আরো তিনটি পুত্র লাভ করবে। এদের প্রথমটি হবে এক বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ, দ্বিতীয়টি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তৃতীয়টিকেই শুধু তোমরা সংসারে পাবে।"

শিবজীর জ্যোতির্মণ্ডিত মূর্তিটি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল। নন্দাদেবী ত্রস্তেব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। স্বামীকে জাগাইয়া তুলিয়া স্বপ্নকথাটি তখনই তাঁহাকে বলিলেন।

এ অলৌকিক স্বপ্ন শীঘ্রই সফল হয়—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদাস ও নন্দাদেবীর এক পরমসুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই নবজাতকই আমাদের ভোলাগিরি মহারাজ। দেবাদি-দেবের বর পুরাপুরিই ফলিয়া গিয়াছিল। ভোলানন্দের পরবর্তী ভ্রাতা তাঁহার জ্যেষ্ঠদের মতোই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দরদাসজীই গৃহীরূপে বাস করিয়া মাতাপিতার সেবা পরিচর্যা করেন।

গুরুর আদেশ—গর্ভধারিণী জননীর চরণবন্দন ও জন্মভূমি দর্শন করিয়া আসিতে হইবে। সন্ন্যাসী ভোলানন্দ অবিলম্বে তাই খুরদা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। বাল্য কৈশোর ও যৌবনের নানা স্মৃতি বিজড়িত এই তাঁহার চির-প্রিয় গ্রাম। ধীরে-ধীরে তিনি ব্রহ্মদাসের গৃহাঙ্গনে উপনীত হন। 'শিবশঙ্কর' বলিয়া উচ্চ রবে ভিক্ষা মাগিতেই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান তাঁহার জননী।

ভিক্ষা গ্রহণের পরই দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর একটি অদ্ভুত কাণ্ড, নন্দাদেবীর চরণে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বসিলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি অনুযোগ দিতে লাগিলেন, "ছি-ছি বাবা, আপনি সন্ন্যাসী, সর্বজনের প্রণম্য। এভাবে প্রণাম ক'রে কেন আপনি আমার পাপের মাত্রা বাড়ালেন।"

"ভয় নেই। মাতৃবুদ্ধিতেই এ প্রণাম করেছি, এতে আপনার কোনো পাপ হবে না। কথা কয়টি বলিয়াই ভোলানন্দ দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিলেন। দীর্ঘদিন পরে জননীর সান্নিধ্যে আসিয়াও তিনি আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন করিলেন না, অন্তরে উদ্‌গত ভাবরাশি চাপিয়া গুরুজীর আজ্ঞাই পালন করিলেন।

সৌম্য, প্রিয়দর্শন তরুণ সাধুটিকে দেখিয়া নন্দাদেবীর বড় ভাল লাগিতেছিল। অপূর্ব মমত্ববোধ ও আনন্দময় অনুভূতিতে তাঁহার মাতৃহৃদয় একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে। সন্ন্যাসীর উপস্থিতি যেন এতক্ষণ তাঁহাকে মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এইবার তাঁহার অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁহার সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। প্রিয়তম পুত্র ভোলাদাসের মুখখানিই আজ কেন স্মৃতি মন্থনের মধ্য দিয়া মানসপটে বার বার ভাসিয়া উঠিতে চায়? নন্দাদেবী চমকিয়া উঠিলেন। তাইতো। কে এই যুবক সন্ন্যাসী যে আজ তাঁহার সর্বসত্তায় এমন প্রচণ্ড নাড়া দিয়া চলিয়া গেল? তাঁহার পরাণ-পুতলী -

ভোলাদাস নয় তো? মনে হইতে লাগিল, এই সন্ন্যাসীর সহিত যে তাঁহার ভোলাদাসের চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। পুত্রের বিয়োগব্যথা মাতৃহৃদয়ে আজ দ্বিগুণভাবে জাগিয়া উঠিল। শোকাভিভূতা জননী অঙ্গনে মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পন্তানা আশ্রমে গুরুর আশ্রয়ে ভোলানন্দকে একাদিক্রমে বার বৎসর কৃচ্ছ্রব্রত ও সাধনায় নিযুক্ত থাকিতে হয়। অতঃপর গোলাপগিরিজী একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভোলা, এখন তুই অন্যত্র গিয়ে আপন আসন স্থাপন কর, একাগ্র সাধনায় ব্রতী হ'। তোর গুরুভক্তির আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠা দেখে আমি সত্যিই বড় প্রসন্ন হয়েছি। আমার আশীর্বাদ রইলো—তোর যোগ ও ভোগ দুই-ই লাভ হবে।"

পরম প্রাপ্তির সহিত ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রভৃতি শিষ্যের করতলগত হইবে এই বরই গুরুদেব সেদিন তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

দীর্ঘদিন গুরু-সান্নিধ্যে থাকিবার পর এবার বিচ্ছেদের পালা উপস্থিত। বিষাদখিন্ন হৃদয়ে তরুণ সাধক গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া পন্তানা আশ্রম ত্যাগ করিলেন। তাঁহার গন্তব্যস্থল—মুক্তিকামী সাধকদের পরম আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্র, দেবতাত্মা হিমাচল। কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত ভোলাগিরিজী গুরু-নির্দেশে নূতনতর তপস্যার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হিমালয়ে উপনীত হইয়া গিরিমহারাজ তাঁহার সঙ্গী সাধকদল হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিলেন। নিভৃত পর্বতকন্দরে বসিয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইতে এবার তিনি দৃঢ়সংকল্প। উত্তরাখণ্ডে তখন তীব্র শীত নামিয়াছে। উত্তুঙ্গ পর্বতমালা জমাট তুষারের স্তূপে দুরধিগম্য। নিম্নাঞ্চলে প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে মানুষের গতিবিধি একেবারে নাই বলিলেই চলে। জাগতিক কর্মকোলাহলের ঊর্ধ্বে এই নির্জন শান্ত পার্বত্য পরিবেশ স্বভাবতই মানুষকে বড় অন্তর্মুখীন করিয়া তুলে—ঊর্ধ্বায়িত মৌনী গিরিমালার সহিত সাধককে একাত্মকতায় করে উদ্বুদ্ধ। নবীন যোগী ভোলানন্দ এক পর্বত গুহায় তাঁহার ধ্যানাসনটি পাতিয়া বসিলেন। কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সাধনা অগ্রসর হইয়া চলিল।

চারিদিকে বরফ পড়িতেছে। এই মরণাহত তুষার ও পার্বত্য বাতাসের আক্রমণ সহ্য করা নিতান্ত কঠিন। এ সময়ে কঠোরতপা ভোলানন্দের শরীরে কোনো আচ্ছাদনই প্রায় নাই, পরিধানে রহিয়াছে শুধুমাত্র একটি কৌপীন। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপের ফলে একদিন তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন। নিকটে পরিচর্যাকারী কেহ কোথাও নাই, ব্যাধির যন্ত্রণায় ভোলানন্দ একদিন একেবারে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল তখন তিনি বড় তৃষার্ত—পানীয় জলের জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। নিকটস্থ কমণ্ডলুটি উঠাইয়া দেখিলেন, এক বিন্দু জলও তাহাতে নাই। গুহার অনতিদূরেই রহিয়াছে একটি পার্বত্য নদী। কোনোমতে গড়াইয়া গড়াইয়া ভোলানন্দ উহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। অঞ্জলি পুরিয়া জল পান করিতে যাইবেন এমন সময় দুর্বল দেহ এক বিপত্তি ঘটাইয়া বসিল। পদস্খলিত হইয়া তিনি জলস্রোতে পড়িয়া গেলেন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসার পর ভোলাগিরি মহারাজ দেখিলেন, একটি পাহাড়িয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় রত। পার্বত্য নদীর খরস্রোতে ভাসিয়া তিনি ইতিমধ্যে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছেন। গিরিজীর সেবার জন্য পাহাড়িয়া আশ্রয়দাতার চেষ্টার অবধি নাই।

অপূর্ব তাহার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। পরম যত্নে সে তাঁহার জন্য বনৌষধি সংগ্রহ করিতেছে, পথ্যাদি দিতেছে। এই পার্বত্য পরিবারের সেবায় ভোলানন্দ ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন।

পাহাড়ী মানুষটি কিন্তু ইতিমধ্যে গিরিজীর সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য মমতা ও প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। দৈবানুগ্রহে এই নবীন সন্ন্যাসীর সহিত তাহার মিলন ঘটিয়াছে, তাই তাঁহার নিকটেই সে দীক্ষা গ্রহণ করিতে চায়। সরল, শ্রদ্ধাবান্ এই আশ্রয়দাতার অনুরোধ ভোলানন্দ এড়াইতে পারিলেন না, দীক্ষা তাহাকে দিতেই হইল। এই ব্যক্তিই তাঁহার প্রথম শিষ্য।

শরীর কিছুটা সুস্থ হইলে ভোলানন্দ পস্তানায় ফিরিয়া আসিলেন, নব দীক্ষিত সেই পাহাড়িয়া শিষ্যটিও তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। পস্তানা আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য—গুরুদেবের চরণ দর্শন। তাহার পর হৃত স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া তপস্যার জন্য আবার তিনি হিমালয়ে যাইবেন।

গুরু গোলাপগিরিজী তাঁহার প্রিয় শিষ্যের দুর্ঘটনার কথা শুনিলেন। পাহাড়িয়াটির আন্তরিক সেবা ও যত্নে পুত্রপ্রতিম ভোলানন্দের জীবন রক্ষা হইয়াছে, ইহা জানিয়া তাঁহার বড় আনন্দ। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে তিনি পাঁচশত টাকা পারিতোষিক প্রদান করিলেন। পাহাড়ী ভক্তটিকে প্রথমটায় এই অর্থ গ্রহণে কিছুতেই রাজী করানো যায় নাই। ভোলানন্দ নানাভাবে তাহাকে বুঝানোর পর পরমগুরু গোলাপগিরিজীর প্রসাদ জ্ঞানে সে ইহা গ্রহণ করে।

কিছুদিন পর ভোলানন্দ আবার তাঁহার তপস্যার পথে বহির্গত হন। কখনও কনখল হরিদ্বারের নিকটে বিল্বকেশ্বর পর্বতে, কখনও বা হিমালয়ের গুহা গহ্বরে নবীন তপস্বী তাঁহার যোগ সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, সেদিকে কোনই হুঁশ নাই। যোগক্রিয়া ও ধ্যান-তন্ময়তার মধ্যে নিরন্তর ডুবিয়া থাকেন।

নিজের অনুষ্ঠিত দুশ্চর তপস্যার কথা বলিতে গিয়া ভোলাগিরিজী উত্তরকালে ভক্তদের বলিতেন, "ওরে, শিষ্যের পুরুষকার বা তপস্যাই সর্বদা গুরুকৃপাকে আকর্ষণ করে, কঠোর-ভাবে তপস্যা না করলে তা কখনো লাভ হয় না। এই দ্যাখ্ না, আমাকেও কত কঠোর তপস্যা করতে হয়েছে, তবেই তো গুরুজীর কৃপা আমি পেয়েছি। চাই তীব্র বৈরাগ্য, আর গুরু উপদিষ্ট প্রণালী ধরে একনিষ্ঠ তপস্যা। এ নইলে পরম বস্তু কখনো লাভ করা যায় না। সংসারে দেখিস তো, বাপ-মা ছেলেকে লালন-পালন করেন, শিক্ষাদীক্ষা দেবার পর বিয়ে দিয়ে দেন। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। এর পরে কিন্তু বংশরক্ষা করার দায়িত্ব তাঁহাদের ঐ সংসারী পুত্রের। অধ্যাত্মজীবনে গুরুর কাজও অনেকটা এমনি। শিষ্যকে দীক্ষা দান করবার পর তিনি সাধন দান করেন। এই সাধনরূপ পত্নীর সঙ্গ না করলে—কঠোর তপস্যায় ব্রতী না হলে, মোক্ষরূপ পুত্রলাভে সে তো বঞ্চিতই থাকবে। এ জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী হবে শিষ্য নিজে—তার গুরু নয়।

"জানিস তো, আমার গুরুদেব আমায় কত ভালবাসতেন। শুধু গুরুকৃপায় ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব হলে কি তিনি আমায় এরকম কৃচ্ছ্র ও কঠোর সাধনা করতে দুর্গম পাহাড়ে পাঠাতেন? কত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে আমার সাধনজীবন কেটেছে, তার খোঁজ কজন রাখে? আজ তোরা দেখছিস—ভোলাগিরি মহারাজ কেমন বাবু, হাতে সোনার আংটি,

পায়ে জুতো, পকেটে সোনার ঘড়ি, মাথায় সিল্কের পাগড়ী, আরও কত কি ? ঝুড়ি ঝুড়ি কত উপাদেয় ফল খাবার সব দূর দেশ থেকে আসছে। কত টাকা, কত জিনিস। আমি শুধু জানি, এসব আমার গুরুজীরই ইচ্ছায় ঘটছে—যোগ ও ভোগ এ দুয়েরই আশীর্বাদ যে তিনি আমায় দিয়ে ফেলেছিলেন।

"সাধক-জীবন কি কঠোর ছিল, আজ তা খুব মনে পড়ে। এই বিল্বকেশ্বর পর্বতের গুহায়ই আমার কত বৎসর তপশ্চর্যায় কেটে গেছে।

"তখন হরিদ্বারে রেলগাড়ি হয় নি—পাহাড় ও বনে কত বড় বড় বাঘ হাতি আর ভালুক দেখা যেত। এই সব গুহায় যখন তপোমগ্ন ছিলাম তখন কত বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। সাধনাবস্থায় নিদ্রাকে কোনোদিনই আমি প্রশ্রয় দিই নি—দিবা-রাত্রি জপ ধ্যানে ডুবে থেকেছি।"

একবার ভোলাগিরি মহারাজ তাঁহার তিনজন গুরুভ্রাতা সহ হিমালয়ে বসিয়া যোগ সাধনায় রত রহিয়াছেন। ধুনির অদূরে সেদিন হঠাৎ একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্রের আবির্ভাব হইল। ভোলানন্দ তাঁহার সঙ্গীয় সাধুদের সাহস দিয়া কহিলেন, "এসো ভাই, আমরা এ হিংস্র বাঘকে উপেক্ষা ক'রে প্রত্যেকেরই নিজস্ব বীজমন্ত্র জপ করতে থাকি। জপের শক্তি অমোঘ, এতে অসাধ্য সাধন হয়।"

সকলে ব্যাঘ্রের উপস্থিতি গ্রাহ্য না করিয়া জপে নিবিষ্ট হইলেন। একটি সাধু কিন্তু আতঙ্কিত হইয়া বড় বিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। নিজের আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যেই তিনি ত্রস্তেব্যস্তে পলায়ন করিতে যাইতেছেন অমনি বাঘটি আচম্বিতে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার গলদেশ কামড়াইয়া ধরিয়া অরণ্যমধ্যে টানিয়া নিয়া গেল।

গুরুভ্রাতাটির শোচনীয় মৃত্যুতে সবাই বড় শোকাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বীর সাধক ভোলানন্দ এই সময়ে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাইসব, মন্ত্রজপের ওপর আমাদের বন্ধুটির বিশ্বাস ছিল না, তাই আজ তার এই দুর্দৈব। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—মৃত বন্ধু বা আত্মজনের জন্য মায়া থাকা আমাদের উচিত নয়। কাজেই তার জন্য শোক না ক'রে এসো আমরা আবার সাধনা শুরু করি।" তাঁহার এই বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলে আবার ধ্যান শুরু করিলেন।

ভোলাগিরি মহারাজ নিঃসঙ্গভাবে সেবার হিমালয়ের দুরধিগম্য অঞ্চলে যোগসাধনা করিতেছেন। এ সময়ে একদিন তাঁহার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটে। অরণ্যবেষ্টিত এক পাহাড়ের গুহায় বসিয়া তিনি ধ্যানাবিষ্ট রহিয়াছেন। হঠাৎ একটি ভালুক সেখানে প্রবেশ করিয়া সবলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে ভোলাগিরিজীর ধ্যান সহসা টুটিয়া যায়।

এ বিপদে তাঁহাকে সেদিন কিন্তু ঘাবড়াইয়া পড়িতে দেখা গেল না। উপস্থিত বুদ্ধি নিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ভালুকটির নাক ও মুখ জোরে চাপিয়া ধরিলেন। তারপর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় উহাকে টানিয়া নিয়া চলিলেন।

পাহাড় চূড়ার অদূরে এক গভীর খাদ। ভোলাগিরিজী খাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভল্লুকটিকে কহিলেন, "ভাইয়া, অব তুম আপনা রাস্তা লেও, ম্যভি আপনা রাস্তা লেতা হুঁ।" সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারী ভল্লুকটিকে সবলে নিচে নিক্ষেপ করিলেন, আবার ফিরিয়া আসিলেন নিজের ধ্যান-গুহায়।

কঠোব তপস্যা ও গুবুকৃপাব বলে ভোলানন্দ নানা আধ্যাত্মিক অনুভূতি যেমন লাভ কবিতে থাকেন, পবমপ্রাপ্তিব সঙ্কল্পও তেমনি তাঁহাব মনে দৃঢ় হইযা উঠিতে থাকে। কৃচ্ছ্রসাধনেব জন্য শবীব তখন একেবাবে শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া উঠিযাছে। ধ্যানতন্ময়তার ফলে দেহশুদ্ধি তাঁহাব বিলুপ্তপ্রায। এই কঠোব তপস্যাব ফল অবশেষে একদিন ফলিযা উঠিল। অন্ধকাবাচ্ছন্ন পর্বতগুহা উদ্ভাসিত কবিযা দেবাদিদেব শঙ্কব সেদিন তবুণ সাধকেব সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ইষ্ট-দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞানেব স্ফুবণে ভোলাগিবিজীর সাধন-সত্তায সেদিন সাধিত হইল এক অপবূপ বূপান্তব।

গিবি মহাবাজেব তীর্থ পবিক্রমা ও দেশ পর্যটনেব নানা বিচিত্র কাহিনী উত্তবকালে তাঁহাব নিকট হইতে শুনা যাইত। ভাবতবর্ষেব দূব-দূবান্তবে তীর্থস্থলগুলিই শুধু নয় বহির্ভাবতেব দুর্গম তীর্থগুলিও তিনি একসময ভ্রমণ কবিযা আসিযাছিলেন। ভাবত, তিব্বত ও সাইবেবিযাব নানা অঞ্চলে পবিব্রাজন কবাব কালে এক একবাব তাঁহাকে সঙ্কটে পড়িতে হয। এই সব কাহিনী উত্তবকালে মাঝে মাঝে তাঁহাব অন্তবঙ্গ শিষ্যদেব তিনি শুনাইতেন।

সামাজিক জীবনেব মুখোমুখি দাঁড়াইযা স্বামীজী মাঝে মাঝে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবিতেন তাহাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয। সেবাব ঘুবিতে ঘুবিতে বোম্বাই শহবে তিনি আসিযাছেন। মাধুকবী কবিযা প্রতিদিন তাঁহাকে আহাব সংগ্রহ কবিতে হয। সেদিন ভিক্ষা নিবাব জন্য সেখানকাব এক ধনীব প্রাসাদে ঢুকিযা পড়িলেন। কি জানি কেন স্বামীজীকে দেখিযাই এই ধনী ব্যক্তি ও তাঁহাব স্ত্রীব বড় মমতা জাগিযা উঠে। উভয়ে ভাবিতে থাকেন—গৌবতনু, দিব্যকান্তি এই তবুণ সন্ন্যাসীকে স্নেহেব বাঁধনে চিবতরে বাঁধিযা বাখিতে পাবিলে মন্দ কি? তাঁহাদেব পুত্র নাই, আছে শুধু এক বিবাহযোগ্য সুন্দবী কন্যা। সন্ন্যাসীব সহিত তাঁহাব বিবাহ দিবাব জন্য উভযে ব্যস্ত হইযা উঠিলেন। সে গৃহে গিবিজীব সমাদবেব অবধি বহিল না।

বিবাহেব প্রস্তাব কবিযা ভদ্রলোকটি কহিলেন, ভোলানন্দ ইহাতে সম্মত হইলে স্বামী স্ত্রী উভযে নিশ্চিন্তে তীর্থবাসী হইবেন। এই বিপুল সম্পদ গিবিজীই পবমানন্দে ভোগ করিবেন।

ভোলাগিবি মহাবাজ নীববে সমস্ত কিছু শুনিলেন। তাবপব সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "আপনাদেব প্রস্তাবে আন্তবিকতা বযেছে ঠিকই। কিন্তু আমায বলুন তো, এ বিপুল ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'বে আপনাবা কেন তীর্থবাসী হতে চান? দীর্ঘকাল সংসারে কাটিযে কি শান্তি ও আনন্দ আপনাবা লাভ কবেন নি?"

উত্তব হইল, "বাবা, সত্যিই এই বিষয-সুখেব মধ্যে আমবা প্রকৃত আনন্দ এ যাবৎ খুঁজে পাই নি। তাই তো শেষ বযসে এব সন্ধানে বেবিযে পড়তে চাই।"

"তবেই দেখুন, যে পার্থিব সম্পদ আপনাদেব সুখী কবতে পাবে নি, তা যে আমাকে আনন্দ দেবে এমন নিশ্চযতা কোথায? আমাকে আপনাবা ক্ষমা কবুন, আমার জীবনেব পথ চিবতবে চিহ্নিত হযে গিযেছে, আব তা থেকে ফেববাব উপায নেই।"

বিস্মিত ও দুঃখিত ধনী দম্পতির প্রাসাদ হইতে ধীবে ধীবে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আব একদিন ভোলাগিবিজী শহবে ভিক্ষার জন্য বাহিব হইযাছেন, এক সম্পন্ন গৃহস্থের অঙ্গনে প্রবেশ করামাত্র স্বামীজীকে সে তীব্র ভাষায গালিগালাজ কবিতে লাগিল

—'ব্যাটা ভণ্ড সাধু কোথাকার! লোক ঠকাবার আর জায়গা পাও নি? লেখাপড়ার ধার ধারো নি, কাজকর্মে ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়েছো, তাই সাধুর বেশ ধরে এখন লোক ঠকাবার চেষ্টা? পরের বাড়িতে ভালো খেয়ে-দেয়ে চেহারাটি তো বাবা বেশ হৃষ্টপুষ্ট করেছো। এই জোচ্চুরি ব্যবসা ছেড়ে, সৎ উপায়ে পরিশ্রম করে, নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারো না? যাও, এখনি দূর হয়ে যাও।"

স্বামীজী কিন্তু এই কটু বাক্যগুলি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উপভোগ করিতেছেন। গৃহস্বামীর কথা শেষ হইলে সহাস্যে কহিলেন, "কি নিরস্ত হলেন যে! আপনার গালিগালাজের ভাণ্ডার কি এরই ভেতর শেষ হয়ে গেল?"

হঠাৎ গৃহস্বামীর আচরণে দেখা গেল বিস্ময়কর পরিবর্তন। আগন্তুক সন্ন্যাসীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া এবার তিনি স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। গিরিজী তাঁহার এই বিপরীত আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি এভাবে তিরস্কার ক'রে সাধুদের পরীক্ষা করি। কঠোর বাক্য শুনে কেউ যদি উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয় তবে বুঝতে পারি—সে নিম্নস্তরের সন্ন্যাসী, রাগদ্বেষ সে জয় করতে পারে নি। আপনার আচরণে বেশ বুঝতে পারছি, আপনি সমদর্শী—যথার্থ সন্ন্যাসী। তাই ভূলুণ্ঠিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।"

গিরি মহারাজ শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, দেখুন, প্রকৃত সাধক বা সন্ন্যাসী চিনে নেবার ক্ষমতা কি আপনার হয়েছে? তবে এ মিথ্যা আত্ম-অভিমান কেন? ছদ্মবেশে বহু উচ্চস্তরের সন্ন্যাসী জনসমাজে বিচরণ ক'রে থাকেন. তাঁদের কাছে আপনার কি পরিমাণ অপরাধ হয় একবার ভাবুন তো? তাছাড়া, কটু কথা দিয়ে মানুষের হৃদয়ে আঘাত করা যে মহাপাপ। এ যে একপ্রকার কসাইগিরি! আপনি এখন থেকে নিরস্ত হোন, তাতে আপনার কল্যাণই হবে।"

অনুতপ্ত গৃহস্বামী সশ্রদ্ধভাবে গিরিজীর নিকট তত্ত্বোপদেশ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি ইঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

ভোলানন্দ সেবার গুজরাট অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন। এই সময় স্থানীয় এক বিখ্যাত ধনীর গৃহে তিনি অতিথি হন। পরিবারের সবাই তাঁহার সেবাযত্ন করিতে থাকেন।

এ গৃহের এক রূপসী তরুণী তাঁহার দিব্যকান্তি সৌষ্ঠবে মোহিত হন, সুযোগ বুঝিয়া একদিন তাঁহার প্রণয় যাচ্ঞা করিয়া বসেন।

ধীরকণ্ঠে গিরিজী বলেন, 'দেখুন আপনি কিন্তু আমার দেহটিকেই ভালোবেসেছেন, এর সঙ্গলিপ্সাই আপনার জন্মেছে। কিন্তু আমিও যে আমার এ দেহটিকে ভালোবাসি, এর ব্রহ্মচর্য ও শুদ্ধতা রক্ষায় আমিও যে বদ্ধপরিকর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই দেহের জন্য আমরা দুজনেই প্রতিদ্বন্দ্বী। এ অবস্থায় আমাদের মিলন কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? রমণী লজ্জায় অধোবদন হইয়া গিরি মহারাজের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যান।

তীর্থপরিক্রমা ও দেশের নানা অঞ্চলে পর্যটন শেষ হইল। ভোলানন্দের সাধনলব্ধ অনুভূতি ও সিদ্ধিসমূহ বহির্জীবনের কষ্টিপাথরে বেশ বার বার পরীক্ষিত হইয়া গেল। এবার গুরুদেবের চরণ দর্শনের জন্য তিনি আবার সত্তাল গ্রামে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে গুরু শিষ্যের পুনর্মিলন আশ্রমে তাই আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। আত্মকাম, সিদ্ধসাধক ভোলানন্দকে গোলাপগিরিজী তাঁহার প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ গোলাপগিরিজী এই সময়ে কিছুদিনের জন্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া নিভৃত বাসের জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। গুরুর সেবায় অভিলাষী ভোলানন্দও এবার তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। অমৃতসরের কাছে গহন অরণ্যে এক পর্ণকুটির বাঁধিয়া গুরু শিষ্য উভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। মহাযোগী গোলাপগিরিজী এই সময়ে অধ্যাত্ম-অনুভূতির শিখরে সদা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ধ্যানতন্ময়তা এবং সমাধির মধ্য দিয়া দিবারাত্র তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া থাকেন। কোনো কোনো সময়ে গুরুদেবের সমাধি-ভঙ্গের জন্য ভোলানন্দকে দশ বার দিনও প্রতীক্ষমাণ থাকিতে হয়।

ভিক্ষার জন্য ভোলাগিরিজী একদিন অরণ্য-সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে গিয়াছেন। বৃদ্ধ গোলাপগিরি মহারাজ তাঁহার পর্ণকুটিরের সম্মুখে ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানাবিষ্ট। এমন সময় কয়েকজন দুর্বৃত্তের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়ে। ইহারা ভাবে, এ বৃদ্ধ সাধু সত্য সত্যই কোনো শক্তিধর যোগী কিনা তাহা আজ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ধুনি হইতে একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ উঠাইয়া নিয়া দুষ্টের দল বৃদ্ধ স্বামীজীর উরুদেশে তাহা স্থাপন করে ও কৌতুক দেখিতে থাকে। ধ্যানমগ্ন আত্মসমাহিত যোগীর কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্পন্দভাবে তিনি আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আর পায়ের মাংস আগুনের উত্তাপে ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

এদিকে ভিক্ষারত শিষ্য ভোলানন্দের হৃদয় কি এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সামান্য যাহা কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা নিয়াই তিনি দ্রুতপদে গুরুদেবের পর্ণকুটিরে ছুটিয়া আসিলেন। সাধুর শিষ্যকে হঠাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়াই দুষ্কৃতকারীর দল অবিলম্বে স্থানত্যাগ করিল।

ধুনির সম্মুখে গিয়া ভোলানন্দের বিস্ময় ও ক্রোধের সীমা রহিল না। গুরুদেবের পায়ের উপর জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তখনও জ্বলিতেছে—আর তিনি নির্বিকার হইয়া বসিয়া আছেন।

তৎক্ষণাৎ আগুন সরাইয়া ফেলিয়া গিরিজী গুরুর শুশ্রূষায় ব্রতী হইলেন। ঐ দুর্বৃত্তের দল কিন্তু পরের দিনই ফিরিয়া আসে এবং সাশ্রুনয়নে নিজেদের দুর্দৈবের কথা নিবেদন করে। দুষ্কার্য করার পর হইতেই নাকি তাহাদের উপর পড়িতে থাকে দৈবের চরম আঘাত। কাহারো প্রিয়জন বিয়োগ ঘটে, কেহ বা নিজের আকস্মিক ব্যাধির ফলে হয় মৃতকল্প। তাই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাহারা বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে।

গোলাপগিরি মহারাজ মধুর বচনে দুর্বৃত্তদের আশ্বাস দিয়া জানাইলেন,—নিজের দিক হইতে ইহাদের উপর বিন্দুমাত্র ক্রোধও তাঁহার হয় নাই। যাহা ঘটিবার দৈবরোষে তাহা ঘটিয়া গিয়াছে—আর তাহাদের কোনো ক্ষতি হইবে না। এবার সকলে নির্ভয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে।

যোগীবর আরও বলিয়া দিলেন, "দ্যাখো, সর্বদা স্মরণ রেখো তোমাদের যে কোনো অন্যায় আচরণ বিকাররহিত, সমদর্শী যোগীর অন্তরে রেখাপাত করে না। কিন্তু যে চৈতন্যময় মহাশক্তিতে যোগীর সত্তা বিধৃত তার ভেতরে প্রতিক্রিয়া হয় অনিবার্যরূপে। তাকে তো এড়াবার যো নেই। তবে আমি অভয় দিচ্ছি, এ অপরাধের জন্য আর কোনো বিপদে তোমরা পড়বে না।"

গহন অরণ্যের নিভৃত বাসে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া যায়। ভোলানন্দ

মহারাজ তাঁহার প্রাণের আশা মিটাইয়া শিবকল্প মহাযোগীর সেবায় নিরন্তর রত রহিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ গুরুজী তখন অধ্যাত্মলোকের উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত। সাধক ভোলানন্দের জীবনে তাই এ পুণ্যময় সান্নিধ্য ও সহবাস অপূর্ব কল্যাণ বহন করিয়া আনে। একান্ত সেবার ফলে তিনি গুরুময় হইয়া যান, গুরুদেবের আত্মিক মহিমায় হন ওতপ্রোত।

গুরুদেব সেদিন প্রিয় শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভোলা, প্রায় ছমাস হলো আমরা আশ্রম ছেড়ে এসেছি। এবার আমাকে পন্তানায় ফিরতে হবে। এ শরীরের ভোগ শেষ হয়ে এসেছে, শিগগীর আমি এটা ত্যাগ করবো।"

উভয়ে তাড়াতাড়ি পন্তানায় চলিয়া আসিলেন। তারপর শিষ্যমণ্ডলীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া এই বিরাট যোগীপুরুষ নরজগতের সর্ব বন্ধন ছিন্ন করিলেন। গোলাপ গিরিজীর শেষ নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার গুরুদেব দ্বাদশগিরির মহারাজের সমাধিস্থানে মরদেহটি সমাহিত করা হইল।

ইহার পর পন্তানার আশ্রম ত্যাগ করিয়া ভোলানন্দ পুণ্যভূমি হরিদ্বারে উপনীত হন। পবিত্র গঙ্গাবারি বিধৌত লালতারাবাগে স্বামীজী তাঁহার সাধন আসনখানি বিছাইয়া বসেন। এই পবিত্র পরিবেশে এবং এই আসনেই ভারতবিখ্যাত মহাযোগী ভোলানন্দ গিরির আচার্যজীবনের ভূমিকাটি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। অতুলনীয় জ্ঞান, যোগশক্তি ও শুদ্ধাভক্তির এক জীবন্ত বিগ্রহরূপে অগণিত ভক্তের অন্তরে তিনি হন প্রতিষ্ঠিত।

লালতারাবাগের আশ্রমে ভোলাগিরি মহারাজ তাঁহার আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। শুধু উত্তরাখণ্ড অঞ্চলের জনগণই নয়, দিগ্‌দিগন্তের তীর্থযাত্রী ভক্তগণ এই দিব্যকান্তি-শক্তিধর মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য আসিতে থাকে। শ্রদ্ধাভরে স্বামীজীকে যে সমস্ত ভেট দর্শনার্থীরা নিবেদন করে, তাহার কোনো কিছুই তিনি নিজে সঞ্চয় করেন না। অর্থ ও খাদ্যাদি বেশী পরিমাণে মিলিলে তখনি সোৎসাহে তাহা দিয়া সাধুদের ভাণ্ডারা লাগাইয়া দেন। হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, ভীমগোড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বহু সাধু এ সময়ে লালতারাবাগে আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। দরিদ্রদের মধ্যে আহার্য ও অর্থ বিতরণেও স্বামীজীর উৎসাহের অন্ত ছিল না।

গিরিজীর বৈশিষ্ট্য—তাঁহার অপরিমেয় যোগশক্তি ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি। ইহাই তাঁহাকে হরিদ্বারের সাধুসমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা দান করে। ধীরে ধীরে তাঁহার ভক্ত, শিষ্য ও দর্শনার্থীর সংখ্যাও বিপুলভাবে বাড়াইয়া তোলে। এই সময়ে কৈলাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা ধনরাজ গিরি এবং হরিদ্বারের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধু স্বামী এলাচীগিরিজীর সহিত ভোলাগিরি মহারাজের খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইঁহাদেরই একান্ত অনুরোধে এখানে তিনি একটি নিজস্ব আশ্রম স্থাপন করেন। কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী ও সাধক তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া শাস্ত্র পাঠ ও সাধন-ভজনে রত হন। ক্রমে লালতারাবাগের এই আশ্রমই জন-সাধারণের নিকট 'ভোলাগিরি আশ্রম' রূপে পরিচিত হইয়া উঠে।

১৮৯৩ সালের কথা। প্রয়াগ ক্ষেত্রে তখন পূর্ণকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে লক্ষ লক্ষ তীর্থকামী নরনারী ও সাধু-সন্ন্যাসী এ উপলক্ষে সমবেত হইয়াছেন। এই বিরাট ধর্মমেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ভোলাগিরি মহারাজ। সাধুসন্তের দল, বিভিন্ন আখড়ার মণ্ডলীশ্বর ও মোহান্তদের মধ্যে দেখা যায় গিরিজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব।

সন্ন্যাসীদল পরিবৃত গিরিমহারাজকে সাড়ম্বরে বাদ্যভাণ্ড সহকারে স্নানের শোভাযাত্রায় নিয়া যাওয়া হয়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সুগৌর কান্তি সৌম্যদর্শন এই মহাযোগী সেদিন সাধুমণ্ডলীতে শোভা পাইতে থাকেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো।

এই কুম্ভমেলার অঙ্গনে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে নিয়া সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। গোস্বামীজী ইঁহাদের নির্দিষ্ট স্থানে তাঁবু ফেলিতে গেলে অনেকে আপত্তি করিতে থাকেন। সামাজিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তিনি গৃহী—মেলার একদল সন্ন্যাসী তাই নিজেদের মধ্যে তাঁহাকে স্থান দিতে সম্মত নন। দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ ভোলাগিরিজী তখন সকলের ভ্রম অপনোদন করেন। গোস্বামীজী যে এক সমর্থ মহাপুরুষ, এ কথাটি সেদিন গিরি মহারাজের মুখে শুনিয়া সাধুরা শান্ত হন এবং গোস্বামীজীকে সানন্দে তাঁহাদের স্বীকৃতি প্রদান করেন।

বিজয়কৃষ্ণের কাছেও কিন্তু যোগীরাজ ভোলানন্দের পরিচয়টি অজ্ঞাত ছিল না। গিরিজীর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া একবার তিনি তাঁহার নিজের শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "ভোলাগিরিবাবার মতো মহাপুরুষ আজকাল ভারতবর্ষে দুর্লভ। এই শক্তিধর মহাযোগী সারা জগৎকে ধ্বংস ক'রে আবার নূতনভাবে তা সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই অপরিমেয় যোগশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ'র ব্যবহার নিতান্ত নম্র। ইনি হচ্ছেন অসীম করুণার আধার—সাক্ষাৎ শিব।"

ভোলাগিরি মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে সস্নেহে 'মেরে আশুতোষ' বলিয়া ডাকিতেন। প্রয়াগ কুম্ভমেলার পর হইতে, বিশেষত গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের মুখে নানা প্রশস্তি শুনিয়া বাংলার বহু ভক্ত-নরনারী গিরি মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণে উদ্‌গ্রীব হয়। তাঁহাদের মিনতি-পূর্ণ আমন্ত্রণের উত্তরে ভোলাগিরিজী কহিতেন, "দ্যাখো, আশুতোষ থাকতে তোমাদের বাংলাদেশে এখন আমার কিছু করবার নেই। আশুতোষ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, তিনিই তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন। তার নিকট থেকে তোমরা সাধন ও উপদেশ গ্রহণ করো।" প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়াছে, প্রভুপাদের জীবিতাবস্থায় ভোলানন্দজী বাংলায় খুব কম লোককেই দীক্ষা দিয়াছেন।

গোরখপুরের বিখ্যাত যোগী গম্ভীরনাথজীর সহিতও ভোলানন্দ এক মধুর সৌহার্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। গিরিজীর নিকট বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যদের মতো ইহার শিষ্যরাও বড় আদরের বস্তু ছিল। হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময়ে আশ্রমিকদের ডাকিয়া তাই তিনি বলিতেন, "তোরা শুনে রাখিস্, আমার এ আশ্রমে আশুতোষ ও গম্ভীরনাথজীর শিষ্যদের স্থান প্রথমে। তারপরে যদি সম্ভব হয়, তবে আমার শিষ্যদের জায়গার বন্দোবস্ত করা হবে।"

উত্তরাখণ্ডের সাধু যোগী ও বৈদান্তিকসমাজে ভোলাগিরিজীর বিরাট মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সেবার হৃষীকেশের বহুবিশ্রুত কৈলাসাশ্রমের মোহান্ত ও নিরঞ্জনী আখড়ার মণ্ডলীশ্বর মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। নূতন মণ্ডলীশ্বর নির্বাচিত হইবেন, তাই বিশিষ্ট ধর্ম-নেতাদের আমন্ত্রণ করা হইল। বিভিন্ন মঠ, আখড়া ও মণ্ডলীর বিশিষ্ট সাধু ও আচার্যগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভোলাগিরি মহারাজ সভার কেন্দ্রস্থলে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার জ্যোতির্মণ্ডিত আনন ও দিব্যকান্তি দর্শনে সকলেই অভিভূত হইয়া গিয়াছেন।

অভিষেকের লগ্ন উপস্থিত। কিন্তু সভাস্থ সকলে এ সময়ে এক সঙ্কটে পড়িলেন।

নব নির্বাচিত মণ্ডলীশ্বর ও মোহান্ত, স্বামী গোবিন্দানন্দ, এই দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণে কিছুতেই রাজী হইতেছেন না। বরং আশ্রমের অন্যতম আচার্যরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া একান্তভাবে নিজস্ব জ্ঞানসাধনায় ব্রতী থাকিতেই তিনি ইচ্ছুক।

অনন্যোপায় হইয়া সভাস্থ সকলে ভোলাগিরিজীর শরণাপন্ন হইলেন, এ ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ না করিলে যে বড় বিপদ। কৈলাস আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ব্রহ্মবিদ্ আচার্য ধর্নাগিরি মহারাজ ছিলেন গিরিমহারাজের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও সহাধ্যায়ী। এ আশ্রমের শিষ্যগণ তাই গিরিজীকে অপরিসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকেন।

গোবিন্দানন্দকে ডাকিয়া এবার তিনি শুধু কহিলেন, "দেখুন, আমার একান্ত ইচ্ছে, এ আশ্রমের মোহান্ত ও নিরঞ্জনী আখড়ার মণ্ডলীশ্বরের পদ আপনিই গ্রহণ করুন।"

এ যেন তাঁহার অনুরোধ নহে—আদেশ। নত শিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গোবিন্দানন্দজী শান্ত স্বরে গিরিজীকে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার গুরুস্থানীয়। আপনার আদেশ পালন না ক'রে উপায় নেই।" উত্তরাখণ্ডের আশ্রমসমূহ ও সাধুসমাজে এমনি ছিল গিরি মহারাজের প্রতিপত্তি।

লালতারাবাগের ভোলাগিরিজীর নিজস্ব আশ্রমটি ছিল নিতান্ত আড়ম্বরহীন। যখনি যৎসামান্য কিছু আহার্য ও অর্থাদি সেখানে সঞ্চিত হইত বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ তখনি তাহা সাধুসন্তদের ভোজনে ব্যয় করিয়া পরম নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতেন।

প্রসিদ্ধ দানব্রতী ঝুনঝুনওয়ালা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীজীকে সেবার নিবেদন করেন লালতারাবাগ আশ্রমে একটি অট্টালিকা নির্মাণের জন্য দুই লক্ষ টাকা তিনি দান করিতে চান।

ভোলাগিরি মহারাজ তখনি এ প্রস্তাবের উত্তরে বলিয়া উঠেন, "আপনি আপনার নিজ ইচ্ছে পূর্ণ করতে পারেন, আমি তাতে বাধা দেব না। কিন্তু আমি কমণ্ডলু ও কৌপীন সম্বল ক'রে আশ্রমের বাইরে ঐ বট-বৃক্ষমূলেই বাস করতে থাকবো।" মহাপুরুষের এ মন্তব্য শুনিয়া শেঠজী সাহস করিয়া আর অগ্রসর হয় নাই।

গিরি মহারাজ লালতারাবাগে এক রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব জ্যোতির্ময় রূপে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া ঠাকুর কহিলেন, "বৎসে ভোলানন্দ, আমার এক বিগ্রহ তোমার এ আশ্রমের প্রান্তে মাটির নিচে অবস্থান করছে। অগৌণে তুমি আমাকে ওখান থেকে উঠিয়ে এনে এ আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করো। তোমার মতো প্রিয় ভক্তের নিত্যকার পুজোর জন্য আমি অভিলাষী হয়েছি।"

গিরি মহারাজের নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সেই রাত্রেই তিনি নির্দিষ্ট স্থানটির দিকে ছুটিয়া গেলেন। সেখানকার মৃত্তিকা কিছুটা খনন করিতেই স্বপ্নকথিত শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, এই পবিত্র শিলা প্রতীককে বেষ্টন করিয়া আছে এক বৃহদাকার সর্প। আপনা হইতেই কিন্তু সর্পটি ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

আশ্রমিকগণসহ স্বামীজী তাঁহার নবলব্ধ শিবলিঙ্গকে বার বার ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে প্রণাম নিবেদন করেন। অতঃপর সাড়ম্বরে বিগ্রহের পূজা সম্পন্ন হয় ও আশ্রমে করা হয় ইহাকে প্রতিষ্ঠিত। গিরি মহারাজ ইঁহার নামকরণ করেন—গৌরীশঙ্করজী। নিজেই তিনি রোজ এই শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। তাছাড়া, শিষ্যদের ডাকিয়া

বলিতেন, "দ্যাখ্, স্মরণ রাখবি, এই শিবলিঙ্গ বড় জাগ্রত। ভক্তি সহকারে এর পুজো করলে মানবের সর্ব কামনা সিদ্ধ হয়।"

১৯০২ সালের কথা। ভোলানন্দ মহারাজের চক্ষুতে কিছুদিন যাবৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিতে থাকে। ফলে তাঁহার দুইটি চক্ষুই একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। কলিকাতায় আনিয়া ভক্তেরা বহু চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু কোনো ফল হইল না। গিরিজী তাঁহার দুই নয়নের দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিলেন।

হরিদ্বারে ফিরিয়া গিয়া লালতারাবাগ আশ্রমের শান্ত পরিবেশে ভোলানন্দ মহারাজ তখন বাস করিতেছেন। এই সময় এক তরুণ মাড়োয়ারী সন্ন্যাসী একনিষ্ঠভাবে তাঁহার সেবায় ব্রতী হন। ইহার নামও ভোলাগিরি। এ শিষ্যটি প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, আর গুরুদেবের দৃষ্টিহীনতার জন্য সদাই বোধ করিতেন তীব্র মর্মবেদনা।

ভোলানন্দজীর অন্তরে কিন্তু এ জন্য বিন্দুমাত্র খেদ নাই। সর্ব অন্তর ও সর্ব সত্তা তখন তাঁহার অন্তর্মুখীন। ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জিত হইয়া দিবারাত্র থাকেন তিনি আত্মবিস্মৃত।

ভক্তদের ডাকিয়া গিরিজী প্রায়ই এসময়ে কহিতেন, "তোমরা আমার জন্য কেন মর্মপীড়া ভোগ করছো তা আমি বুঝতে পারিনে। আমি নিজে কিন্তু পরম আনন্দেই আছি। অন্ন গ্রহণে বা যে কোনো সেবা গ্রহণে আমার অসুবিধা নেই। আমার প্রিয় সেবানিষ্ঠ ভক্ত ভোলা সর্বদা এজন্য তৎপর হয়েই রয়েছে। পুত্রাধিক মমতা নিয়ে আমার সেবা ক'রে যাচ্ছে।" জীবন মৃত্যু, লাভ ক্ষতি সমস্ত কিছু এই পরম নির্লিপ্ত মহা-যোগীর কাছে তখন একাকার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্রমে শিষ্যদের অন্তরে গুরু-দেবের এই দৃষ্টিহীনতার জন্য ক্ষোভের অন্ত নাই।

পূর্বোক্ত সেবক-শিষ্য ভোলাগিরির অন্তরে গুরুজীর পীড়ার এই দুঃখ এক শেলের মতো বাজিয়াছে। দিনরাতই তিনি গিরিমহারাজের দৃষ্টিহীনতার জন্য শোকাকুল হইয়া থাকেন। ইহার কিছুদিন পরে এই শিষ্য নিজে এক দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য আশ্রমিকদের সমস্ত কিছু সেবা যত্ন ও চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। অন্তিম-শয্যায় শায়িত অবস্থায়ও কিন্তু গুরুর জন্য তাঁহার দুশ্চিন্তার অবধি নাই। বার বার সখেদে তিনি কহিতে থাকেন, "আমার সব চাইতে বড় দুঃখ, বৃদ্ধ গুরুজীর অন্ধত্ব মোচন হওয়াটা আর দেখতে পেলাম না। হে শিব, তোমার কাছে আমার প্রাণের আকুল নিবেদন—তুমি কৃপা ক'রে তাঁকে দৃষ্টিশক্তি দাও, আমার চোখ দুটির বদলে তাঁর চোখের আলো ফিরিয়ে দাও। এই কামনা নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস আমি ত্যাগ করতে চাই।"

এই পরমভক্ত সেবক-শিষ্য ইহার অব্যবহিত পরেই দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু গুরুদেবের রোগমুক্তির জন্য তাঁহার আকুতির মূর্ছনা যেন ইহার পরও বার বার আশ্রমের আকাশ বাতাসকে আলোড়িত করিয়া তোলে।

কয়েকদিন পরের কথা। ভোলাগিরি মহারাজ লালতারাবাগে সেদিন নিজের আসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, মধুর কণ্ঠে কাহারা তাঁহাকে যেন বলিতেছেন, "ভোলা, চেয়ে দ্যাখ্ আমরা কে।"

চোখ তুলিয়াই গিরিজীর আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলেন, চারিদিক আলোয় আলোময় করিয়া হরপার্বতী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন।

আশুতোষ তাঁহার বরাভয় দানকারী হস্তটি উত্তোলন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "ভোলা আজ থেকে তুই তোর একটি চক্ষু লাভ করলি।"

ভোলানন্দ মহারাজ পুলকিত দেহে আরাধ্য দেবদেবীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। ধীরে ধীরে এই দিব্য যুগলমূর্তি অদৃশ্য হইয়া গেল এবং ইহার পরেই মহারাজ তাঁহার একটি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন।

সন্ন্যাসী শিষ্যদের জীবন গঠনে কোনোদিনই গিরি মহারাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাব ছিল না। তাহাদের বাহ্য সন্ন্যাস অপেক্ষা তিনি সত্যকার বৈরাগ্যকেই গুরুত্ব দিতেন বেশী। সন্ন্যাস ব্যতীত ঈশ্বরপ্রাপ্তি কি করিয়া হইবে—গৃহীদের এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে প্রায়ই বশিষ্ঠের শত পুত্রের উল্লেখ করিতে শুনা যাইত। সংসারাশ্রমীদের তিনি ভক্তি-পথে থাকিতে ও দানকর্মে আত্মনিয়োগ করিতে নির্দেশ দিতেন। সন্ন্যাসী শিষ্যদের লোক দেখানো বৈরাগ্য দেখিলে তাঁহার বিরক্ত চরমে উঠিত।

একবার আশ্রমের এক নবীন সন্ন্যাসীর মাতা স্বামীজীর নিকট অভিযোগ করিয়াছেন, পুত্র তাঁহার নিকট দীর্ঘদিন পত্র দেয় নাই। শিষ্যকে ডাকাইয়া তখনি তিনি সব কথা জানিতে চাহিলেন।

শিষ্য কহিলেন, তিনি সন্ন্যাসী, পিতামাতার মায়িক সম্বন্ধ তো কাটাইয়া দিয়াই আসিয়াছেন। পত্র লেখার পর্ব আর কেন?

ভোলানন্দ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে, নূতন সন্ন্যাসী হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখছি আচার্য শঙ্করের চেয়েও তুই জ্ঞানী হয়ে পড়েছিস। শঙ্কর নিজের হাতে তাঁর মায়ের পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, আর তুই কিনা তোর মাকে একখানা চিঠিও দিতে পারিসনে? সাবধান, এরকম আর কখনো করবিনে। নকল জ্ঞানী না হয়ে প্রকৃত জ্ঞানী হতে চেষ্টা করবি। কঠোর বৈরাগ্য ও তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে মন ইষ্টদেবে যুক্ত রাখবি। বাহ্য ব্যবহারটি ঠিক রাখবি, কিন্তু অন্তরে সজাগ থেকে লক্ষ্য রাখবি, মনে যেন কোনো রকম আসক্তি না আনতে পারে।"

আশ্রম-কার্যের উপর গিরি মহারাজ অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেন। নূতন যুবক শিষ্যদের কাছে ডাকিয়া প্রায়ই বলিতেন, "তোদের বয়স অল্প, খুব নিষ্ঠা নিয়ে আশ্রমের জন্য পরিশ্রম করবি আর তপস্যা করবি। কিরে, আশ্রমের কাজ তোদের বুঝি তেমন ভাল লাগে না? মাটি কাটা, ঘাস কাটা, কুয়ো থেকে জল তোলা, বাজার থেকে মাথায় ক'রে জিনিসপত্র নিয়ে আসা—এগুলো করতে তোদের বুঝি খুব সঙ্কোচ বোধ হয়? তা হতেও পারে। তোরা সব বাবু ছিলি, এখন এই চাষী গুরুর কাছে এসে তোদের চাষীগিরি করতে হচ্ছে। তা কি আর করবি বল্? হয়তো আর কোনো পণ্ডিত আচার্যের কাছে দীক্ষা নিলে তোদের এত কষ্ট সহ্য করতে হতো না। দিন-রাত শাস্ত্র পাঠ ক'রে কাটিয়ে দিতে পারতিস।"

কোনো কোনো শিষ্য হাসিয়া বলিতেন, "গুরুজী, চাষী আপনি ঠিকই—বরং উত্তম চাষী। অনেক পতিত জমিতে চাষ-আবাদ ক'রে আপনি সত্যই সোনার ফসল ফলিয়েছেন।

নিত্যকার কর্মের মধ্য দিয়া অধ্যাত্মসাধন অনুষ্ঠান করা ও প্রতিটি অনুভূতিকে যাচাই করিয়া চলা—শিষ্যদের কল্যাণের জন্য ইহাই ছিল গিরিমহারাজের নির্ধারিত ব্যবস্থা।

ইহাই তাঁহাব আশ্রমিক কর্মসূচীব প্রধান অঙ্গ। বিশেষ কবিযা নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীদেব পক্ষে এ কাজ তিনি কল্যাণকব মনে কবিতেন। কিন্তু মূল কথাটিকে আডালে বাখিযা শিষ্যদেব বুঝাইতেন, "না বেটা, কর্মে আলস্য কবতে নেই। কর্ম না ক'বে বসে বসে অন্ন খেলে পাপ হয। দ্যাখ্, গৃহস্থেবা কষ্ট ক'বে নিজেদেব অন্ন থেকে কিছুটা বাঁচিযে সাধুদেব দান কবে। কাজ না ক'বে খেলে তপস্যাব ফল কমে যায। এই দ্যাখ্, আমি নিজে কত মেহনত ক'বে খাই—আমাব কি অভাব বল্‌তো ? তবু এই বৃদ্ধ শবীব নিযে তোদেব সঙ্গে এত কাজ কবি কেন ?"

আশ্রমেব বাগানে বড বড ঘাস জন্মে। গাভীদেব জন্য এগুলি কাটিযা বাছিযা শুকাইযা বাখিতে হয। ভোলানন্দজী একদিন অঙ্গনে বসিযা ঘাস বাছিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিযা উঠিলেন, "হ্যাঁ ভাই, তোদেব সত্যকাব দৃষ্টি কোথায বল্‌তো ? ঘাস বাছাই-এব কাজ কবতে কবতে ঘাসকে বুঝি তোবা সকলে ঘাসবূপেই দেখছিস্ ? না ভাই, ওভাবে কখনো দেখতে নেই। কর্মে ব্রহ্মদর্শন কবতে হয। মনে কববি যে ঘাস হলো ব্রহ্ম বা পবমাত্মা আব আগাছা হলো যেন শবীব, ইন্দ্রিয় এইসব। আগাছাবূপ শবীব ও পঞ্চেন্দ্রিয প্রভৃতি থেকে পৃথক ক'বে তোবা ঘাসবূপী ব্রহ্মকে জান্‌বি। এভাবে সব সময বিচাব কববি এবই নাম হচ্ছে কর্মে ব্রহ্মদর্শন। হাতে কাজ কববি, আব সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কাজ হতেই তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ কববি।"

শিষ্য ধ্রুবানন্দজীব সহিত গিবি মহাবাজ সেদিন আশ্রমে গোশালাব নর্দমা পবিষ্কাব কবিতেছেন। কিছুক্ষণ কাজ কবাব পব দুর্গন্ধেব জন্য শিষ্য অস্থিব হইযা উঠিলেন। কাপড দিযা নাক না বাঁধিযা কোনো উপায বহিল না। ভোলাগিবি মহাবাজ ইহা লক্ষ্য কবিযা কহিতে লাগিলেন, "বেটা। আমি এই বৃদ্ধ বযসে দুই হাতে নর্দমা ঠেলে এ দুর্গন্ধ সহ্য কবছি, আব তুই পাবছিস না ?"

শিষ্য তখনই বলিযা উঠিলেন, "বাবা, আপনাব কথা আলাদা। আপনি ব্রহ্মজ্ঞ-পুবুষ, সমদর্শী— সুগন্ধ দুর্গন্ধ সবই আপনাব কাছে একাকাব হযে গিযেছে। আমবা তো এখনো তেমন হতে পাবি নি।"

গিবি মহাবাজ স্মিতহাস্যে উত্তব দিলেন, "না বেটা। এ সব কাজে কোনোবূপ ঘৃণাবোধ থাকতে নেই। গবু যে আমাদেব মাতৃস্থানীযা, দুধ খাইযে আমাদেব বাঁচায। মাযেব সেবায কি ঘৃণা করতে আছে বে ? এই দেখছিস না আমি বুড়ো মানুষ বলে বড বড় সাধুবা কখনো আমাব সেবা গ্রহণ কবে না। তাই তো আমি নিজেকে এমন ক'বে গোমাতাব সেবায নিযোজিত কবেছি।"

উত্তবাখণ্ডেব সাধুদেব ভোলাগিবি মহাবাজ প্রাযই তাঁহাব লালতাবাবাগ আশ্রমে নিমন্ত্রণ কবিযা খাওযাইতেন। সেবাব হবিদ্বাব, কনখল, ভীমগোডা প্রভৃতি স্থানেব বহুতব বিশিষ্ট সাধু-সন্ন্যাসীদেব নিমন্ত্রণ কবা হইযাছে। লাড্ডু, পুবী, কচুবী তৈবি কবাব জন্য আশ্রমেব খুব ব্যস্ততা। বাত্রিতে আহাবান্তে স্বামীজী স্বযং তাঁহাব শিষ্যগণসহ দুই মণ আলুব খোসা ছাডাইতে বসিলেন। তাবপব বাত গভীবতব হইলে নিজে শয্যায শুইতে গেলেন কিন্তু নির্দেশ বহিল—কেহ যেন কাজে কোনো অবহেলা না কবে। পবদিন প্রায চাব শত সাধু এ আশ্রমে ভিক্ষা গ্রহণ কবিবেন।

গিবিমহাবাজ চলিযা যাইবাব পবই কিন্তু পবিশ্রান্ত আশ্রমিকেবা ধীবে ধীবে নিদ্রা

নিজ শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। শেষ রাত্রিতে মহারাজ হঠাৎ আবার উঠিয়া আসিয়াছেন। শিষ্যদের এই কর্মশৈথিল্য দেখিয়া তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তীব্র ভর্ৎসনা ও উচ্চ চীৎকারে শিষ্যগণ প্রমাদ গণিলেন। ইতিমধ্যে শয্যা ত্যাগ করিয়া ভয়ে কেহ খাটের নিচে কেহ বা গৃহের বাহিরে গিয়া লুকাইয়াছেন।

একটি মাদ্রাজী সন্ন্যাসী এই আশ্রমে নবাগত। গিরি মহারাজের এত হৈচৈ শুনিয়া ভীতত্রস্ত অবস্থায় তিনি নিজের শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছেন। ক্রোধোদ্দীপ্ত ভোলানন্দজী এই নবাগত সাধুর পিঠেই সহসা এক লাথি মারিয়া বসিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের কারুর কোনো আক্কেল নেই? এতগুলো সাধু মহাত্মা কাল আশ্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন—আর তোমরা সব নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছো?"

ধীরে ধীরে সব আশ্রমিকই পুনরায় কাজে আসিয়া বসিলেন। মাদ্রাজী সন্ন্যাসীটিকে লক্ষ্য করিয়া এক আশ্রমবাসী এই সময়ে কহিতেছিলেন, "কি দুঃখের কথা। আপনি শিষ্য নন, আশ্রমে নবাগত অতিথি। অথচ স্বামীজী আপনাকেই পদাঘাত ক'রে বসলেন!"

সন্ন্যাসীটি হাসিয়া বলিলেন "ভাই, এ মহাপুরুষের কি আর আত্মপর ভেদজ্ঞান আছে? শিষ্য ও অশিষ্যের ভেদরেখা এঁর কাছে তো কিছুই নেই। এঁর পদাঘাত পাবার সৌভাগ্যে আমি সত্যই আজ ধন্য হয়েছি। তাছাড়া, আপন মনে না করলে কি ইনি কখনো আমায় মারতে পারতেন? এঁরা কখনো বা বজ্রের মতো কঠোর, কখনো বা একেবারে ফুলের মতো কোমল—কখনো রুদ্র, কখনো বালকস্বভাব। আজ মহাত্মার রুদ্ররূপ দেখে আমার বড় আনন্দ হয়েছে।"

শিষ্যদের উপর কখন কিভাবে যে এই মহাপুরুষের রোষ নিপতিত হইত তাহা বুঝিবার জো ছিল না। একদিন সন্ধ্যারতির সময় ভোলাগিরি মহারাজ মন্দির-বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাদ্য বাজাইতে উদ্যত হইয়াছেন। বৃদ্ধ গুরুমহারাজের কষ্ট হইবে মনে করিয়া তরুণ সন্ন্যাসী ধ্রুবানন্দ তাঁহার হাত হইতে এটি নিতে গেলেন। গিরি মহারাজ এই সামান্য ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া সেদিন যে কাণ্ড করিয়া বসিলেন তাহাতে সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। একটি বৃহৎ বংশদণ্ড দিয়া সজোরে ধ্রুবানন্দজীর মস্তকে তিনি আঘাত করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, সেদিন শিষ্য গুরুজীর এই কঠোর আচরণের মর্ম বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

পরদিন প্রভাতে উভয়ের দেখা। স্বামীজী সস্নেহে ধ্রুবানন্দজীকে নিকটে বসাইলেন। বলিতে লাগিলেন, "বেটা, কাল তোর মাথায় লাঠি দিয়ে জোরে মেরেছিলাম। খুব লেগেছিল, না?"

শিষ্য উত্তরে সবিনয়ে কহিলেন—হয়তো তাঁহার কোনো অন্যায় সত্যই হইয়াছিল, নতুবা কৃপালু গুরুজী এমন কঠোর হইয়া উঠিবেন কেন? এ কথাটি ভাবিয়াই, এ প্রহারে তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই, ইহাও তিনি জানাইলেন। ভোলাগিরি মহারাজ তখন স্নেহভরা কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ বেটা, বেশ। গুরু শাসন করলে কখনো ক্রোধ করতে নেই। গুরু যা কিছু করেন, তা শিষ্যের মঙ্গলের জন্যই। সর্বদা একথা মনে রাখবি, কর্মকার যেমন লোহাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে উত্তম যন্ত্রপাতিতে পরিণত করে, সাধনপথে সদ্গুরু তেমন শাসন ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে শিষ্যকে সার্থক ক'রে তোলেন।"[1]

---

১ শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত—স্বামী ধ্রুবানন্দ

সেদিন সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। ভোলাগিরিজী আশ্রমের এক ব্রহ্মচারীর কক্ষে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারীটি তো অবাক। প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী মহারাজ খুব উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোকে লাথি মারবো না তো পুজো করতে হবে নাকি? বেলা সাতটা বেজে গিয়েছে, এখনো তোর গাত্রোত্থান করার সময় হয় নি। বাঃ রে আমার ব্রহ্মচারী। ঘরে বুঝি খাবার ছিল না, তাই আশ্রমে এসে মজা ক'রে ভোলাগিরির পাৎলা রুটি বসে বসে খাচ্ছিস। এই মুহূর্তে বাগানে যা, সেখানে গিয়ে কাজ কর।"

অভিমানে ব্রহ্মচারীর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আপনি এমন কঠোর কথাটি আজ আমায় বলে বসলেন? আপনি তো নিজে ভালো ক'রেই জানেন, কোনোদিন আমার খাওয়ার অভাব ছিল না।"

গিরি মহারাজ তাঁহাকে আরও নানা মর্মভেদী বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে ছাড়িলেন না —"ওরে তোর ঘরে খাবার নেই, আবার পেটে বিদ্যাও নেই, তাই তো আশ্রমের রুটি খাবার জন্য এখানে এসে জুটেছিস।" তিনি যতই শ্লেষ প্রয়োগ করেন ব্রহ্মচারী ততই অভিমানে ফুলিতে থাকেন। গুরুদেবকে তিনি জানাইয়া দেন—কাজকর্মের শেষে আজ রাত্রেই হৃষীকেশের যে কোনো ছত্রে চলিয়া যাইবেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় পণ। বাগানের কাজে তিনি যোগ দিলেন সত্য, কিন্তু দুই চোখ বাহিয়া কেবলই তাঁহার অশ্রুধারা ঝরিতেছে।

পদাঘাত ও কটুবাক্যে আহত, অভিমানী ব্রহ্মচারী শিষ্যটি, থাকিয়া থাকিয়া কেবল কাঁদিতেছেন। এইবার কিন্তু গুরুদেব ভোলাগিরি মহারাজের নরম হইবার পালা। বার বার আশ্রমিকদের শুনাইয়া তিনি ব্রহ্মচারীর কত প্রশংসা করিতে লাগিলেন—এমন বিদ্বান্ ধীর স্থির গুরুভক্ত ছেলে তিনি তাঁহার জীবনে কখনও দেখেন নাই—এ আশ্রমের সে তো এক রত্ন বিশেষ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তরুণ ব্রহ্মচারীর অভিমান তখনও যায় নাই। তিনি উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "বাবা, আপনি আমাকে যতই খোসামোদ করুন না কেন, আমি কিন্তু এরূপ দুর্বাক্য শোনার পর এখানে কিছুতেই আর থাকবো না। হৃষীকেশের ছত্রে সাধুদের দৈনিক আহার বেশ জুটে যায়। আমি নিশ্চয়ই আজ চলে যাবো, কোনো কথাতেই আর আমি ভুলছি নে।" স্বামীজী মহারাজও ঘুরিয়া ফিরিয়া এই একই তোষামোদের লীলা অভিনয় করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী একেবারে স্থির সংকল্প, লালতারাবাগ আশ্রম ত্যাগ করিয়া আজ নিশ্চয়ই কোথাও চলিয়া যাইবেন।

এইবার ভোলাগিরি মহারাজের অপার প্রেমৈশ্বর্য সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অপলক দৃষ্টিতে তিনি তখন প্রস্থানোদ্যত ব্রহ্মচারী শিষ্যের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, আর অনর্গল ধারায় দুই নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। পরম শান্ত মহাযোগী এবার করুণায় বিগলিত—উত্তুঙ্গ হিমবন্তের জমাট তুষার মৃত্তিকার মমতায় যেন গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। আশ্রমস্থ সাধু সন্ন্যাসীর দল স্বামীজী মহারাজের এ অপরূপ প্রেমঘন মূর্তি ও করুণালীলা দর্শনে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারীর হৃদয়ের সমস্ত অশান্তি ও বিক্ষোভ ততক্ষণে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া তিনি স্বামীজীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন।

ভোলানন্দ স্নেহার্দ্র স্বরে তাঁহাকে শুধু কহিলেন, "বেটা! স্নান শেষ ক'রে এবার

আহার ক'রে আয়। তোরা জানিস নে, তোদের প্রস্তুতি আর পরীক্ষার জন্য আমায় হৃদয়হীনের মতো কত দুর্বাক্য বলতে হয়।"

সেবক-শিষ্যগণ গিরিমহারাজের শয্যা রচনা করিতেন। এই কাজ নিয়া রোজই কিন্তু হাঙ্গামার অন্ত ছিল না। একটুখানি উঁচু নীচু থাকিলেই স্বামীজী উহা নিয়া রীতি-মতো হুলুস্থূলু বাধাইয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃত উদ্দেশ্য এই কার্য উপলক্ষ করিয়া শিষ্যদের হৃদয়ে গুরুসেবা এবং একনিষ্ঠাকে গ্রথিত করিয়া দেওয়া।

সেদিন ব্রহ্মচারী ললিত গুরুদেবের বিছানা প্রস্তুত করিয়াছেন। ভোলাগিরি মহারাজ ইহা দেখিয়াই উচ্চকণ্ঠে উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "কোনো কাজেই কারুর নিষ্ঠা নেই—দ্যাখ্ দেখি, বিছানার মধ্যে কতটা জায়গা উঁচু হয়ে আছে।" শিষ্যটি সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাইলেন। আর যায় কোথায়? মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন, "গাধা কোথাকার। দেখতে পাচ্ছিসনে কোথায় কাজের ত্রুটি হয়েছে? সামান্য একটু মনোযোগ দিয়েও গুরুসেবা করতে পারিস নে? কি ক'রেই বা করবি? বাবা মায়েরই সেবা জীবনে কখনো করিস নি, গুরুর সেবা তোর দ্বারা কি ক'রে হবে?"

কথা কয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজী ক্রোধভরে সেবক ব্রহ্মচারীটির হাতের অঙ্গুলি লোহার পালঙ্কে রগড়াইতে লাগিলেন। বেদনায় অধীর হয়ে শিষ্য এবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

মুহূর্তমধ্যে গিরিমহারাজের রোষাভিনয়ে এক পটপরিবর্তন ঘটিয়া গেল। তিনি তখন যেন একেবারে নূতন মানুষটি। শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে এ শিষ্যকে বুঝাইয়া কহিতে লাগিলেন, "ওরে, বেদনা কার শরীরে লাগে? তুই কি এই শরীর। রক্ত মাংস মেদ মজ্জায় গঠিত এই শরীর। এতে আঘাত লাগলে কি তোর লাগলো? ধ্যান জ্ঞান তোদের প্রকৃতপক্ষে কোন্ দিকে বলতো? শুধু মুখে আমি শরীর নই বলে ঘোষণা করলেই কি জ্ঞানী হওয়া যায়? এজন্য চাই—শরীরের নশ্বরতা উপলব্ধি ক'রে দেহবুদ্ধি একেবারে ত্যাগ করা। সর্বস্ব ছেড়ে তোরা সন্ন্যাসী হয়েছিস—দেহের কষ্টে চঞ্চল হবি কেন? আমি শরীর বা ইন্দ্রিয় নই, এসব থেকে এক পৃথক পরম বস্তু—আত্মা, এই ভাব সর্বদা ধরে রাখতে হবে। তবেই তো সাধনার সার্থকতা।"

স্বামীজীর শিষ্য মহেশানন্দ গিরিজী তখন অবধূতবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। শুধুমাত্র একটি কৌপীন সম্বল করিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। সেবার গুরুর কাছে তিনি লালতাবাবাগ আশ্রমে আসিয়াছেন। এ সময়ে একদিন প্রবল জ্বরের আক্রমণে তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন। আশ্রমের এক সন্ন্যাসী পীড়াপীড়ি করায় মহেশানন্দজী একটি কম্বল দেহে জড়াইয়া চাটাইর উপর শয়ন করিয়া রহিলেন।

স্বামীজী হঠাৎ এক সময়ে তাঁহার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত। রোগক্লিষ্ট শিষ্যের জ্বরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াই ঐ কম্বলটির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। আর যায় কোথায়? অমনি রোষে গর্জিয়া উঠিলেন, "অবধূতবৃত্তি নিয়ে আবার কম্বল ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ হয় কেন রে? রাস্তায় বা জঙ্গলে যখন জ্বর হবে তখন কি তোর মা অথবা মাসি পশমী কম্বল নিয়ে তোর জন্যে বসে থাকবে? কম্বল ব্যবহারের ইচ্ছে যদি থাকে, তবে অবধূতগিরির ভান না ক'রে তোর এসব সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মত তুই জামা পরে থাকিস নে কেন? আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। হয় অবধূতবৃত্তি ত্যাগ কর্, নয় কম্বল বর্জন কর।"

ভোলাগিরি মহারাজের তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি শিষ্যের অন্তরে তৎক্ষণে দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। গুরুদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তিনি কম্বলটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। স্বামীজী এই কক্ষ হইতে সেদিন নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই কিন্তু মহেশানন্দের রোগমুক্তি ঘটিয়াছিল।

আশ্রমের গিরিজী মহারাজের এক তরুণ পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী শিষ্য সেদিন একটি সাদা রংএর বহির্বাস পরিয়া অঙ্গনে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টি পড়িতেই অমনি গুরু মহারাজের রোষবহ্নি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "ওরে আবার যে তুই সাদা কাপড় প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? যা ত্যাগ করেছিলি তা আবার রাখতে চাস! কেন? বমি করে আবার তা খাচ্ছিস, তোর কি লজ্জা-সরম কিছুই নেই। যা এখনি এসব ছেড়ে ফেল। আরো একটা কথা। আমি লক্ষ্য করেছি, তুই মাঝে মাঝে বহির্বাস ছেড়ে শুধু কৌপীন প'রে এখানে পদচারণা করিস। আর যেন এটা কখনো না হয়। শুধু কৌপীন পরে থাকবার ইচ্ছে হলে এ আশ্রমে কিন্তু তা হবে না। এমন জায়গায় চলে যা, যেখানে মেয়েছেলের গতায়াত একেবারে নেই।" সন্ন্যাসী শিষ্যদের আচার আচরণ ও সাধনজীবনকে ভোলানন্দ মহারাজের সজাগ দৃষ্টি এমনি সতর্ক প্রহরায় সতত ঘিরিয়া রাখিত।

একবার এক শিষ্য সকাতরে স্বামীজীকে নিবেদন করিলেন, "বাবা, আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছি। কয়েক বৎসর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও রয়েছি। কিন্তু বাবা, আমার সাধনজীবনে কোনো সুস্পষ্ট উন্নতি আজো কিছুই দেখা গেল না। আমার সমস্ত জীবন একেবারে বৃথা হয়ে গেল।" কথা কয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যটি তীব্র ভাবাবেগে কাঁদিতে লাগিলেন।

সহসা সেখানে এক বিচিত্র করুণ দৃশ্যের অবতারণা হইল। গিরি মহারাজও শিষ্যের দুঃখে বিগলিত হইয়া কম কাঁদিলেন না। নয়ন হইতে অঝোরে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে আর একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা তিনি তাহা বার বার মুছিয়া ফেলিতেছেন।

অতঃপর কিছুটা শান্ত হইয়া শিষ্যটিকে তিনি বুঝাইলেন, "বেটা, তোর প্রাণের দুঃখ আজ আমার বুকে বেজেছে, আমায় কাঁদিয়েছে। কিন্তু কি করবো বল? সাধনরূপ পত্নী আমি তোকে এনে দিয়েছি তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জ্ঞানরূপ পুত্র তোকে লাভ করতে হবে। এ কর্তব্য যে তোরই। এর জন্য চাই তীব্র তপস্যার অনুষ্ঠান। আর এই তপস্যার ভিত্তি হচ্ছে বৈরাগ্য। শুধু জাগতিক বস্তুনিচয়ের প্রতি বৈরাগ্য থাকলেই হবে না, চাই এই দেহের প্রতি প্রকৃত আসক্তিহীনতা। আমিত্বভরা এ দেহের প্রতি আকর্ষণ যতদিন থাকবে, জাগতিক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা ততদিন আসবে না, এটা জানবি। দেহের প্রতি অনাসক্তি যখন ঠিক আসবে, তখনই বুঝবি প্রকৃত বৈরাগ্য এসেছে—তপস্যাও তখন ঠিক ঠিক হবে। তীব্র তপস্যা না হলে জ্ঞান প্রাপ্তি কখনো হয় না, বেটা। হতাশ না হয়ে তপস্যায় লেগে যা—অচিরে শান্তি মিলবে। ভয় কি রে? আমি তো রয়েছি। গুরুতে নিষ্ঠা রেখে সাধন ক'রে যা।"

আত্মারাম মহাজ্ঞানী ভোলানন্দের দৃষ্টিতে সংসারের শোক তাপ, জন্ম মৃত্যু, সমস্ত কিছুই একাকার হইয়া গিয়াছে। অথচ ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মানুষের দুঃখ দৈন্যকে তিনি কি অপার করুণাভরেই না গ্রহণ করিতেন। পরম কারুণিক ব্রহ্মজ্ঞ

পুরুষের প্রেম ও সমবেদনার মধ্য দিয়া সংসারক্লিষ্ট মানুষ খুঁজিয়া পাইত তাহার প্রার্থিত শান্তি ও আশ্রয়।

গিরি মহারাজ সেদিন শিষ্যগণসহ আশ্রমের বাগানে কর্মরত। বাগানের দ্বার দিয়া একটি লোক তখন ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই সখেদে নিম্নস্বরে তিনি কহিয়া উঠিলেন, "হায় বেটা। কি দুঃখই তুমি পেয়েছো!" ব্যাপার কি, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে কহিলেন, "যে লোকটি আমার কাছে আসছে, তার প্রিয় ভাইটির মৃত্যু হওয়ায় সে একেবারে ভেঙে পড়েছে।"

ভদ্রলোকটি স্বামীজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা, আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

গিরিজী দুঃখে একেবারে বিগলিত হইয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার নিজের দুই নয়ন হইতেও তখন অজস্র ধারায় শোকাশ্রু নির্গত হইতেছে। মহাপুরুষের এই সমবেদনার স্পর্শ ও নয়নজলের ধারা আগন্তুকের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে ধীরে ধীরে শান্ত করিয়া আনিল।

ইহার পর স্বামীজী প্রেমপূর্ণ ভাষায় লোকটিকে কিছু উপদেশ দিলেন। কহিলেন, "শোক করবেন না, আপনার ভাই অন্য লোকে গমন করেছেন। তাঁর প্রতি আপনার যে আকর্ষণ, সেরূপ আকর্ষণ কিন্তু আপনার প্রতি তাঁর আর নেই।" এই প্রসঙ্গে তিনি পুরাণ শাস্ত্রাদি হইতে সময়োপযোগী নানা কাহিনী ও পরলোকতত্ত্ব বিবৃত করিলেন। ভ্রাতৃ-বিয়োগবিধুর ব্যক্তিটির শোক বিদূরিত হইয়া গেল।

অখণ্ড বোধের পরমসত্তায় অবস্থিত গিরিজীর পক্ষে খণ্ড বুদ্ধির রাজ্যে এই গতায়াত ছিল নিতান্ত সহজ স্বাভাবিক।

বেদান্তোক্ত প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে ভোলানন্দজী নিজ জীবনের একটি কাহিনী বর্ণনা করিলেন। তাঁহার নিজস্ব আদর্শের স্বরূপ ইহার মধ্য দিয়া বুঝিতে পারা যায়। গিরি মহারাজ তখন নবীন সন্ন্যাসীরূপে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করিতেছেন। এই সময়ে একদিন প্রত্যূষে এক প্রবীণ আত্মজ্ঞানী সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুটি নদীতীরে তর্পণ শেষ করিয়া উচ্চস্বরে বার বার কেবলি আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন, "গর্দভোহহম, বিড়ালোহহম, কুক্কুটোহহম"—ইত্যাদি।

ভোলানন্দজী বিস্মিত হইয়া ঐ প্রাচীন তপস্বীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। চরণ বন্দনা করিয়া সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনার এরূপ বাক্য উচ্চারণের তাৎপর্য কি, তা আমায় কৃপা ক'রে বলুন। 'শিবোহহম' না বলে আপনি এসব আবার কি বলছেন?"

মহাত্মা কহিলেন, "বেটা। অদ্বৈতভাবে উপাসনা করতে গিয়ে তোমরা সদাই দ্বৈতভাবকেই টেনে আনো, শিবোহহম বলতে গিয়ে নিজেকে জীব থেকে পৃথক মনে করো। এতে ধারণা হয় প্রকৃতপক্ষে তুমি শুধু শিব,—কিন্তু তুমি কি জীবও নও? এভাবে অখণ্ড জ্ঞান কি ক'রে হবে? এ জ্ঞান তো সত্যকার জ্ঞান নয়, এও এক প্রকার অজ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞানী সর্বভূতেই নিজের আত্মাকে দেখতে পান, তিনি জানেন, 'সবই আমি—শিব, জীব পশু সব কিছু। স্মরণে রাখবে, সর্বভূতে সর্বলোকে এই আত্মা বিস্তারিত, সর্বস্থানেই ওতপ্রোতে আছে তোমার স্বরূপ, তোমার আত্মা। এই জ্ঞানই চরম অদ্বৈত জ্ঞান।" গিরিমহারাজের পরিব্রাজন কালের নানা কাহিনীর মধ্য দিয়া এইরূপে তাঁহার শিষ্যেরা সাধনা ও পরমতত্ত্বের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইতেন।

এই মহাজ্ঞানী ও মহাযোগীর জীবনসত্তায় প্রেমভক্তির একটি রসস্নিগ্ধ ধারাও সুন্দরভাবে মিলিত হইয়াছিল। দর্শনার্থী ভক্ত ও শিষ্য যে কেহ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তিনিই তাঁহার হৃদয়ে মাধুর্য রসে করিতেন অবগাহন।

আশ্রমের বিগ্রহপূজা ও লীলা-কীর্তনের পরিবেশে স্বামীজীর আনন্দঘন রূপটি ফুটিয়া উঠিত, প্রেমাবেশে তিনি মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। যোগসামর্থ্যের তুঙ্গ শীর্ষে অধিষ্ঠিত মহাযোগীর এই পুলকোজ্জ্বল রূপ দেখিয়া সকলের আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

একটি বাঙালী ভক্ত সেদিন গিরি মহারাজের চরণতলে বসিয়া তাঁহাকে রামপ্রসাদী সঙ্গীত শুনাইতেছে—

ডুব দেরে মন কালী বলে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে—

ভক্তিমধুর শ্যামাসঙ্গীতের আকর্ষণ যোগীহৃদয়ের মহা পারাবারকে এক মুহূর্তে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল। মহারাজের নয়নদ্বয় হইতে তখন অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে, আর বার বার তিনি তাহা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা মুছিয়া ফেলিতেছেন। এ অপরূপ প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন। স্তব্ধবিস্ময়ে তাঁহারা শুধু ভাবিতেছেন—অতুলনীয় যোগৈশ্বর্য, জ্ঞান ও ভক্তির এই অপূর্ব সমন্বয় মহাপুরুষের জীবনসত্তায় কোন্ ইন্দ্রজাল বলে সাধিত হইয়াছে।

আশ্রমে প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত শিবপূজা অনুষ্ঠিত হইত। আবার কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর আড়ম্বরও সেখানে কম হইত না। ভোলাগিরি মহারাজ ভক্তিসহকারে সেদিন ভাগবত শুনিতেছেন। কৃষ্ণবিগ্রহকে মোহন সাজে সাজাইয়া প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে গিরিজীকে বলিতে শুনা গেল, "মহারাজ, তোমার এ কি অপূর্ব লীলা। জীবের কল্যাণে তুমি স্বেচ্ছায় গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করছো। কৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ—হরি হে। সব তোমারি মায়া।" ভক্তির-আবেশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়াও তাঁহাকে এক একদিন সমাধিস্থ হইতে দেখা যাইত। একবার ঢাকায় থাকাকালে জাগ্রত শক্তি-বিগ্রহ ঢাকেশ্বরী দেবীর প্রসাদী ফুল পাইয়া গিরিজী ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন, অতঃপর গদ্গদকণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "মায়ের প্রসাদ আমি পেয়েছি, এ কৃপাপ্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি।"

সাধারণ ভক্ত বা যোগসাধনায় অসমর্থ সাধকের জন্য তাঁহার ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত সহজ ও সাধারণ। এ সম্পর্কে এক বাংলা ছড়া নিজে রচনা করিয়া পরমানন্দে সবাইকে উপদেশ দিতেন, "কর নাম ও দান—হবে কল্যাণ।" সর্বসাধারণের জন্য রচিত তাঁহার হিন্দী ছড়াতেও রহিয়াছে নামজপের নির্দেশ—

গৌরীশঙ্কর সীতারাম,
সদা বোলো চারো নাম।
সদ্‌গুরু দিয়া হরকা নাম,
খালি জিহ্বায় কৌন কাম ?

নাম-জপের এই প্রেরণা গিরিজী তাঁহার খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ভক্ত দর্শনার্থীদের দিতেও ছাড়িতেন না। প্রাণায়ামের পূরক রেচক শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে তিনি গড্ বা আল্লার নাম জপ করিতে উৎসাহ দিতেন।

সার্থক যোগী এবং অপরিমেয় যোগবিভূতির অধিকারীরূপে কীর্তিত হইয়াও গিরি

মহারাজ কিন্তু জপের গুরুত্ব কোনো দিন কম দেন নাই। প্রায়ই তাঁহাকে বলতে শুনা যাইত—"জপ সাধন করলে মানুষ অসামান্য অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী হতে পারে।" এ সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতার এক বৃত্তান্ত তিনি বর্ণনা করিতেন—

বহু পূর্বে ভোলাগিরি মহারাজের লালতারাবাগ আশ্রমে এক সরল গ্রাম্য মজুর কাজ-কর্ম করিত। কল্যাণপুরীজী নামে এক প্রাচীন সাধু এই লোকটির প্রতি সদয় হইয়া ভোলানন্দকে ধরিয়া বসেন, কৃপা করিয়া ইহাকে তিনি যেন দীক্ষা দেন। স্বামীজীকে শেষ অবধি রাজী হইতে হইল। মজুরটিকে তিনি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন। তারপর গলায় রুদ্রাক্ষের কণ্ঠি বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন, "দ্যাখো বাবা, আজ থেকে তুমি আমার শিষ্য হলে। পরিচয়ের দিক দিয়ে তুমি কিন্তু এবার সাধু—আর তুমি মুটে মজুর নও। ওসব কাজকর্ম ছেড়ে এবার শিবমন্দিরে গিয়ে জপ সাধনে লেগে যাও।"

এ লোকটি ছিল আপনভোলা, নিতান্ত সরল বিশ্বাসী। গিরি মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী সে নিকটস্থ গ্রামের এক শিবমন্দিরে গিয়া নাম জপে মগ্ন হইয়া গেল। এখন হইতে অযাচক বৃত্তি নিয়া দিনরাত সে বসিয়া থাকে, দর্শনার্থীদের কেহ যৎসামান্য কিছু আহার্য দিলে তাহা দিয়াই করে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি। প্রায় দুই বৎসর কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠানের পর এই সাধকের ইষ্ট দর্শন হয়। তাহার বাক্‌সিদ্ধি ও নানা অলৌকিক বিভূতির খ্যাতি প্রচারিত হয়।

ভোলাগিরি মহারাজ তাঁহার এই জপসাধনকারী শিষ্যের অসামান্য ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া সকলকে কহিতেন, "জপকে তোরা কিন্তু কখনো তুচ্ছ ব'লে অবহেলা করিস্‌নে। এর মতো উৎকৃষ্ট সাধন নেই।"[১]

লালতারাবাগ আশ্রমে বানর দলের উৎপাত লাগিয়াই থাকিত। বাগানের গাছ ও ফলপাকড়ের উপর ইহাদের দৌরাত্ম্যের অন্ত ছিল না। আশ্রমে আগত গৃহী ভক্তদের এই বানরেরা জ্বালাতন করিত, কিন্তু কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর উপর কখনো উপদ্রব করিতে আসিত না। এ রহস্য সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন :

আশ্রম তখন সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বানরদের উৎপাতে সকলে অস্থির। এই সময়ে ভোলানন্দজী একদিন গুরুগম্ভীর স্বরে কপিসমাজকে আহ্বান করিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, বানরেরা একে একে আসিয়া তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইল। অতঃপর গিরি মহারাজ তাহাদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, "দ্যাখো, এই বাগিচার যত কিছু ফলপাকড় সব তোমাদের জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু জেনে রেখো, তোমরা যেমন এ সব খাবার জন্য চেষ্টা করবে আমরাও তেমনি লাঠি নিয়ে তোমাদের তাড়াতে থাকবো—তোমাদের দিক দিয়ে অবশ্যই বিক্রম প্রকাশের কোনো বাধা নেই। কিন্তু আমার একটি হুকুম তোমাদের মানতে হবে। আমি এ আশ্রমে থাকা অবধি এখানকার কোনো সাধুর কমণ্ডলু, কৌপীন, বহির্বাস বা পরিচ্ছদ তোমরা কখনো স্পর্শ করবে না।"

সঙ্গে সঙ্গেই নেতৃস্থানীয় এক বৃদ্ধ বানর সেখানে মাথা নাড়িয়া সজোরে সম্মতিসূচক আওয়াজ করিল। সভা ভঙ্গ হইবার পর হইতে বানরকুল কোনো দিনই স্বামীজীর আদেশ অমান্য করে নাই।

১ স্বামী ভোলানন্দগিরির জীবনচরিত : কৈবল্যানন্দ

আশ্রমের কুকুর এবং কুকুরের ছানাগুলি নিয়া ভোলানন্দজীর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। ইহাদের খাওয়ানো-দাওয়ানো ও আদরযত্নের ঘটা দেখিয়া সকলে বড় বিস্মিত হইতেন। দুর্দান্ত কালু কুকুর ছিল গিরিমহারাজের পরমভক্ত—উহার ভোজনের জন্য আশ্রম হইতে রোজ এক সের দুধের বরাদ্দ ছিল।

সন্ন্যাসী শিষ্যদের বেলায় কিন্তু দেখা যাইত, স্বামীজী বড় অদ্ভুত আচরণ করিতেছেন। দূর দেশান্তর হইতে ভক্তেরা আশ্রমে প্রায়ই নানা উপাদেয় ফল ও খাবার প্রেরণ করিতেন। গিরি মহারাজ একলা আর কত খাইবেন? সামান্য কিছু গ্রহণের পর বাকি সবই পচিয়া উঠিত। এগুলি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইত, অথচ শিষ্যদের ভোজনের কোনো উপায় ছিল না। বৈরাগ্য কৃচ্ছ্রব্রতের ধৃতিকে দৃঢ় করিবার জন্য এমনি ছিল ভোলাগিরিজীর কঠোর ও সতর্ক নিয়ন্ত্রণ। আশ্রমিকেরা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া কালু কুকুরের দুগ্ধ বরাদ্দের কথা উল্লেখ করিতেন। পরিহাস সহকারে তাঁহাদের অনেককে বলিতে শুনা যাইত, "ভোলাগিরিজীর আশ্রমে কুকুর, বেড়াল ও গরু হয়ে থাকাও এক মহাতপস্যার ফল।"

গিরিজীর প্রিয় সারমেয় কালুর কাহিনী বড় অদ্ভুত। কালুর মৃত্যু দিবসের আচরণ আশ্রমিকদের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়।

প্রায় একমাস রোগভোগের পর এই সারমেয়ের জীবনদীপ নিভিয়া আসিতেছে। দেহরক্ষার লগ্নটিও আশ্রমপালিত পশুর অজানা নয়। ঠিক সময়ে রোগজীর্ণ শরীরটি নিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে গঙ্গাতীরে গিয়া উপস্থিত। কোনোক্রমে অবগাহন স্নান করিয়া তটে উঠিল। তারপর দেহের অর্ধাংশ পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর জলে ডুবাইয়া রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করিল। ভোলাগিরিজীর প্রিয় কুকুর কালুর এই গঙ্গাভক্তি দর্শন করিয়া সেদিন হরিদ্বারের অনেকেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়।

ভোলানন্দজীর সাধনগুহায় কতকগুলি বিষধর সর্প বাস করিত। ইহাদের সহিত যোগীবর ছিলেন এক অচ্ছেদ্য সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ। কখনও কখনও দেখা যাইত সাপগুলি অঙ্গনে বাহির হইয়া ফণা নাচাইয়া মনের আনন্দে খেলা করিতেছে। এ সময়ে কেহ ইহাদের লাঠি দিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইলে গিরি মহারাজ তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "খবরদার, এদের কখনো মারবিনে। এরাই হচ্ছে শিবজীর গলার ভূষণ। তোদের কোনো অনিষ্টই এরা করবে না। তাছাড়া এ সাপগুলো আমার কত দীর্ঘ দিনের বন্ধু। আমার সঙ্গে কত রাত্রে একই শয্যায় কোনো কোনোটা আবার আরামে শুয়েও থাকে। ওদের তাড়াস নে। নিজের মনে খেলা করতে দে।"

সেদিন শেষ রাত্রিতে স্নান করিয়া স্বামীজী ভজনকুটিরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রদীপ জ্বালাইতে হইবে, দিয়াশলাইর জন্য দেওয়ালের তাক হাতড়াইতেছেন। হঠাৎ তাঁহার হাতটি গর্তস্থিত এক বিষধর সর্পের ফণা স্পর্শ করিল। নাগপ্রবর একবার ফোঁস করিয়া উঠিয়াই কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এ যেন সঙ্গীর উপর অভিমানভরে গৃহত্যাগ।

ইষ্টদেব 'শিবাজীর ভূষণ' তাঁহার এই হস্তস্পর্শে ভুল বুঝিয়াছেন, তাঁহারই দোষে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য গিরিজীর খেদের অন্ত রহিল না। করজোড়ে এই সাপটিকে মিনতি করিতে লাগিলেন,—এমন অসতর্ক ব্যাপার আর কখনো ঘটিতে দিবেন না। ফিরাইয়া আনার জন্য বার বার সে কি ব্যাকুল অনুরোধ! কিন্তু কে তাহাতে কর্ণপাত

করে? সাপটি চিবতবে সে স্থান ত্যাগ কবিয়া চলিযা গেল। কক্ষেব গর্তস্থিত অপর সর্পদের যাহাতে এবূপ অসুবিধা আব না হয, এজন্য গিরিমহাবাজ ইহাব পব প্রায বাব বৎসব অবধি সেখানে দীপ জ্বালান নাই।

সর্বজ্ঞ মহাযোগীব দূবসন্ধানী দৃষ্টি অবলীলায শিষ্যদের অন্তবের নিভৃততম প্রদেশে গিযা পৌঁছিত আব, প্রযোজন মতো তাহাদের জটিলতম সমস্যার সমাধান তিনি মুহূর্তে কবিযা দিতেন।

চন্দ্রকুমাববাবু তাঁহাব এক বাঙালী শিষ্য। সেদিন বহু ভক্তজন পবিবৃত গুবুজীর সম্মুখে এই শিষ্যটি বসিয়া বহিয়াছেন। দর্শনার্থী ও ভক্তদেব সহিত স্বামীজী নানা তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। চন্দ্রবাবুব মনে কিছুদিন যাবৎ একটি জটিল প্রশ্ন বাব বার উঁকি মাবিতেছে—সাধকদের ইষ্ট এক, না পৃথক পৃথক। প্রশ্নটি কোনোবূপে উত্থাপন করিবাব সাহস কিন্তু তিনি পাইতেছেন না। হঠাৎ সম্মুখস্থ এক দর্শনার্থিনী মহিলা ইষ্টেব স্ববূপ সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিযা বসেন। চন্দ্রবাবু এ প্রশ্নটি শুনিযা তখনি উচ্চকিত হইযা উঠিলেন। গিরিমহাবাজ কথাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা জেনে বেখো, ইষ্ট এক—ইষ্ট একং পূর্ণং নিত্যং সর্বাধিষ্ঠানং।" এই কথা বলিতে বলিতেই ঘুরিযা শিষ্য চন্দ্রবাবুব দিকে মুখ ফিরইযা কহিযা উঠিলেন, "চন্দ্র, বুঝেছ? এই তোমাব ইষ্টেব স্ববূপ।" বুঝা গেল, অন্তর্যামী মহা কারুণিক গুবুব অন্তরে শিষ্যের সমস্যাক্ষুব্ধ মনেব স্পন্দনটি পূর্ব হইতেই পৌঁছিযা গিযাছিল।

দর্শনার্থী ও ভক্তদেব ইষ্টনিষ্ঠা দৃঢ় কবিবাব উদ্দেশ্যে গিরিজীকে অনেক সময তাঁহাব অলৌকিক শক্তি প্রযোগ কবিতে দেখা যাইত। কযেকটি কাহিনী এখানে বর্ণিত হইতেছে—

স্বামীজীর এক বিশিষ্ট শিষ্যেব ভ্রাতা শশীকান্ত গুপ্ত ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস তাঁহাব তেমন ছিল না, ইঁহাদের তেমন গ্রাহ্য তিনি করিতেন না। সে-বাব ভ্রাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি কলকাতায় গিরিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ভক্ত দর্শনার্থীরা উপদেশাদি শ্রবণেব পব ঘরেব বাহিরে প্রসাদ পাইতে গিয়াছেন, এ অবসবে স্বামীজী শশীবাবুকে নিকটে আহ্বান কবিলেন। দুই চাবিটি স্নেহপূর্ণ বচন ও তত্ত্বোপদেশেব পব কি জানি কেন, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া এই নবাগত দর্শনার্থীকে বাব বার আলিঙ্গন কবিতে থাকেন। দুই নযনে তখন তাঁহার প্রেমাশ্রুব ধারা ঝবিতেছে। বিস্মযাবিষ্ট শশীবাবু আরও দেখিলেন, স্বামীজীব দেহ হইতে এক দিব্য জ্যোতির প্রবাহনির্গত হইতেছে। ইহাব ফলে কক্ষটি মুহূর্তমধ্যে আলোকোদ্ভাসিত হইযা উঠিল।

নূতন ভক্তেব হৃদযে বিশ্বাসেব বীজ বপন কবিতেই গিরিজী সেদিন এই অলৌকিক লীলা প্রদর্শন কবেন। শশীবাবু তাঁহাব নিকট দীক্ষা নেন এবং এক পবমভক্তে বূপান্তবিত হন।

সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ সোমেশচন্দ্র বসুর স্ত্রী, অকালে লোকান্তরিতা হন। স্ত্রীব মৃত্যুব পব সোমেশবাবুর হৃদযে তীব্র বৈবাগ্যেব সঞ্চার হয়—অধ্যাত্মসাধন গ্রহণের জন্য তিনি মনস্থ কবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও কবেন—যে শক্তিধব যোগী তাঁহার মৃতা সহধর্মিণীর সহিত একত্রে তাঁহাকে দীক্ষা দিতে পারিবেন, শুধু তাঁহার

শিষ্যত্বই তিনি গ্রহণ করিবেন। বহু সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সোমেশ-বাবু ভোলাগিরিজীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইলে সোমেশবাবু তাঁহার মৃতা পত্নীর দীক্ষার প্রস্তাবও তুলিলেন। গিরিজী তৎক্ষণাৎ নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিলেন, 'বেশ তো বেটা, তাঁর দীক্ষাও এ সঙ্গে হতে পারবে। এজন্য তুমি ঘাবড়াবে না।"

নিভৃত দীক্ষাগৃহে পর পর তিনটি আসন স্থাপিত হইল, গিরিজী ও সোমেশ বসু উভয়ে দুইটিতে উপবেশন করিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে সোমেশচন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন, পার্শ্বে রক্ষিত তৃতীয় আসনটিতে তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রী সশরীরে উপবিষ্টা।

গিরিজীর নির্দেশ ছিল, দীক্ষাগৃহে আকর্ষিতা স্ত্রীর দেহটি কিন্তু সোমেশচন্দ্র স্পর্শ করিতে পারিবেন না। মর্তলোকের বিরহী স্বামী আজ তাই শুধু অপার আগ্রহে সূক্ষ্ম-লোকবাসিনী সহধর্মিণীর দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া রহিলেন। দীক্ষা অনুষ্ঠানের শেষেই পত্নীর মূর্তিটি অন্তর্হিত হইল।[১]

বিস্ময়াভিভূত গণিতবিদ্ তখন শুধু যোগীগুরুর যোগসামর্থ্যের কথাই নয়—পরম করুণার কথাও বার বার ভাবিতেছিলেন।

স্বামীজীর শিষ্য অমরনাথ রায় আসামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জে তিনি বাস করিতেন। তাঁহার বালক পুত্রটি এক সময়ে দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হয় এবং ডাক্তারেরা আশা ত্যাগ করেন।

সঙ্কটের কথা জানাইয়া হরিদ্বারে গিরি মহারাজকে 'তার' করা হইল। উত্তরে তিনি শুধু লিখিলেন, "যথাসম্ভব নামজপ কর এবং দান কর।" বিস্ময়ের বিষয়, সেই রাত্রিতেই মুমূর্ষু বালক সকলকে বলিতে থাকে, আমি ভালো হয়ে গিয়েছি—স্বামীজী যে আমার কাছে এসেছিলেন!" সকলের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে বালক জানায়—স্বামীজীকে সে দেখিয়াছে, খুব উজ্জ্বল মূর্তি, মাথায় পাগড়ী, পায়ে খড়ম, হাতে কমণ্ডলু ; পশ্চাতে একদল সন্ন্যাসী।

সে আরো জানায়, স্বামীজী তাঁহার কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব রোগ যন্ত্রণার অবসান ঘটে।

রোগীর পিতা সানন্দে অবিলম্বে হরিদ্বারস্থিত গিরিমহারাজকে জানাইলেন, তাঁহারই কৃপায় মরণাপন্ন পুত্র প্রাণ পাইয়াছে।

স্বামীজী সকলকে ডাকিয়া সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা তো বিশ্বাস কর না যে, চৈতন্য বা পরমাত্মা সর্বব্যাপী, কিন্তু এই দেখ, আমি তো আর সুনামগঞ্জে যাই নি? আমি তোমাদের কাছেই রয়েছি। পরমাত্মা সর্বত্রই বর্তমান, তিনি দূরে থেকেই এই কাজ করছেন। সাধনবলে তাঁকে জানাতে পারলে তোমরাও সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্ হতে পারবে।"

সহাস্যে আরো কহিতে লাগিলেন, "দ্যাখো, অমরকে লিখে দাও, ডাক্তারের পেছনে ত্রে কত খরচ সে করলো, অথচ তারা ব্যর্থ হয়েছে। আমিই যখন রোগীর আরোগ্য

---

১ এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথাটি গণিতাচার্য লেখকের কাছে স্বমুখে বিবৃত করিয়াছেন।

করলাম, তখন আমার ভিজিট বাবদ সাধু সেবার কিছু চা'ল এবার যেন সে বেশী ক'রে পাঠিয়ে দেয়।"

স্বামীজীর এক বাঙালী শিষ্য সেবার সুন্দরবন অঞ্চলে দলবলসহ বাঘ শিকার করিতে গিয়াছেন। গভীর অরণ্যে সকলে ঘুরিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এক হিংস্র বাঘ এ-শিষ্যের সম্মুখে লাফাইয়া পড়ে। সঙ্গীগণ হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন, তাই অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি বড় বিপদে পড়িয়া গেলেন। হাতের বন্দুক কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে—তিনি শুধু একটি সড়াকি মাত্র হাতে নিয়া একলা বাঘের সহিত যুঝিতেছেন। ক্রমে তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল।

এই সময়ে সহসা কোথা হইতে তাঁহার গুরুদেব ভোলাগিরিজী সেই বিজন অরণ্যে আবির্ভূত হইলেন। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে শিষ্যকে উৎসাহিত করিয়া কহিলেন, "ওরে, কোনো ভয় নেই। বাঘটার মুখগহ্বরে জোরে সড়কি মার্—ও এখনি মরবে।" কোন্ দৈব বলে লুপ্ত সাহস ও শক্তি তাঁহার ফিরিয়া আসে। গুরুদেবের এই নির্দেশ তড়িৎবেগে পালন করেন—দুই একটি তীব্র আঘাতের পর সড়কিটি তিনি বাঘের মুখের ভিতর চালাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গেই পশুটি পর্যুদস্ত হইয়া ধীরে ধীরে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। অতঃপর গুরুদেবকে দর্শনের জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইতে গিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার মূর্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

কিছুদিন পর হরিদ্বারে উপনীত হইয়া তিনি ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে গিরিজীকে কহিলেন. "বাবা, সেদিন সে অরণ্য মধ্যে আপনি উপস্থিত না হ'লে হিংস্র বাঘের আক্রমণ থেকে আমার জীবন রক্ষা হত না।"

গিরিজী প্রকৃত রহস্য এড়াইয়া গিয়া স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "দূর পাগল! কি যে বলিস্। আমি তো তখন হরিদ্বারে, এ সবই পরমাত্মার মায়া বলে জানবি।"

অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ও বহিরঙ্গ জীবনের লীলাভিনয় গিরিজীর জীবনে দুই-ই বর্তমান ছিল। পরম চৈতন্যের কেন্দ্রে মহাযোগী সদা অবস্থিত তাই তাঁহার জীবনের স্থূল ও সূক্ষ্মের আবরণ এবং ভেদ-বিভেদের বোধ অপসৃত হইয়াছিল।

নিত্যকার ধ্যান ও সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইবার পরই তিনি গোশালায় গিয়া চেঁচাইতে থাকিতেন, "দ্যাখো দ্যাখো, কারুর কোনো কর্তব্য বুদ্ধি নেই। গোমাতার খো'ল, ভুষিদানা এখনও মাখা হয় নি। কেউ এদিকে দৃষ্টি দেয় না—সব হয়েছে জামাই-ভাই, সব কনে বউ, সব 'বাঙালীকা হুজ্যা'!"

সুদূর আসামে মুমূর্ষু রোগীর পার্শ্বে বা সুন্দরবনে ব্যাঘ্র কবলিত শিষ্যের উদ্ধারকার্যে যিনি গভীর অরণ্যে আবির্ভূত—সেই শক্তিমান্ যোগীকেই কিন্তু আবার দেখা যাইত লালতারাবাগ আশ্রমে এক অদ্ভুত অভিনয়ের ছদ্মবেশে। সেখানে দেখা যাইত, বাগানের মধ্যে এক গুলিবাঁশ হস্তে তিনি উপদ্রবকারী বানর বিতাড়নে রত। কম্প্রহস্তের নিশানা ঠিক হইতেছে না, দুষ্ট বানরের দল তাঁহাকে দাঁত খিঁচাইয়া ভয় দেখাইতেছে—আর তিনি আশ্রমের সাধুদের উদ্দেশে অবিরত গালিবর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন, "সব বাবুর দল, কাজ না ক'রে কেবল বসে বসে এখানে রুটি খাবে। সব শিব্জীকা বাচ্চা—সিদ্ধপুরুষ হয়ে গিয়েছে। এ বুড়োই কাজ করবে, আর সবাই আরামে খাবে। আশ্রমের জন্য দরদ এতটুকু কারুর নেই।"

মহাসমর্থ যোগী আর লীলাপর অভিনয়কুশল মহাপুরুষের জীবনের এ এক সুমধুর দ্বৈতরূপ।

দীর্ঘ লীলাভিনয়ের পর ভোলাগিরিজীর বাহ্যজীবনের উপর যবনিকাটি নামিয়া আসিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে মহাযোগী তাঁহার নরজীবনের পালা সাঙ্গ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

উত্তরাখণ্ডের বিশিষ্ট সাধু, মোহান্ত, মণ্ডলীশ্বর ও অগণিত ভক্তজন হরিদ্বারের লাল-তারাবাগে সমবেত হইয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিলেন। ওঁ নমঃ পার্বতীপতয়ে হর, গঙ্গামাঈকী জয়, হর হর বম্ বম্ বম্—ধ্বনির মধ্যে মহাপুরুষের পুষ্পমাল্য শোভিত দেহখানি গঙ্গার কালিকুণ্ডে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত করা হইল।

প্রভু জগদ্বন্ধু

মুর্শিদাবাদে রাণী স্বর্ণময়ীর প্রাসাদে সেদিন এক নেপালী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। যোগ ও জ্যোতির্বিদ্যা দুইয়েতেই তাঁহার পারদর্শিতা। ভবিষ্যতের কথা জানার আগ্রহে অনেকেই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। আয়ুর্বেদ-শিরোমণি গঙ্গাধর কবিরাজ ও পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্ন, এই দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুও সেখানে উপস্থিত।

কৌটা হাতে এক টিপ নস্য নিয়া গঙ্গাধর সোৎসাহে ন্যায়রত্নকে বলিলেন, "কোথায় হে তোমার নবজাত পুত্রের ঠিকুজীখানা ?"

ঝুলি হইতে ঠিকুজী বাহির করা হইল। সন্ন্যাসী এটি গভীরভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা, আপনার এ শিশুটি কি জীবিত রয়েছে ? একবার কি একে আনায় দেখাতে পারেন ?"

ন্যায়রত্নকে তখনি নিজের গৃহের অভিমুখে ছুটিতে হইল। শিশুটিকে আনামাত্র সন্ন্যাসী সাগ্রহে তাহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। কিন্তু এ কি কাণ্ড! গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ঐ শিশুর রাঙা পা দু'খানি বার বার মাথায় ঠেকাইতেছেন, আর তাঁহার নয়ন বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

দীননাথ ন্যায়রত্ন ব্যাকুল কণ্ঠে এবার বলিয়া উঠিলেন, "সাধু বাবা, আপনি এসব কি কাণ্ড করছেন, বলুন তো ? এতে যে আমার পুত্রের অকল্যাণ হবে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "পণ্ডিতজী, আমার এ অঞ্চলে আসা আজ সার্থক হয়েছে। তোমার এ শিশু সর্বসুলক্ষণযুক্ত। জেনে রেখো, সে এক মহাপুরুষরূপে খ্যাত হবে। এ'কে দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে আমি ধন্য হলাম।" ইহার পরই নেপালী সাধু কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

আর এক দিনের কথা। ন্যায়রত্নমহাশয় ছেলেকে কোলে নিয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন। এক জটাজুটধারী সাধু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেবী কিরীটেশ্বরীর মন্দির হইতে ফিরিবার পথে এপথ দিয়া তিনি যাইতেছিলেন। হঠাৎ এই নয়নাভিরাম শিশুর দিকে তাঁহার চোখ পড়িল।

স্থির দৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সাধু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "এ শিশু কা'র ? উত্তরকালে এ যে রাজা হবে!"

ন্যায়রত্ন স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "সাধুজী, আমি গরীব ব্রাহ্মণ। আমার পুত্রের পক্ষে রাজা হওয়া কি ক'রে সম্ভব।"

সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল, "ভোগের রাজা নয়, যোগের রাজা!" সন্ন্যাসী আর সেখানে অপেক্ষা করেন নাই।

ন্যায়রত্নমহাশয়ের অন্তরের আলোড়ন থামিতে চায় না। শঙ্কিত হৃদয়ে পত্নীর সহিত এ শিশুর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দরিদ্রের বুকজোড়া নিধি বাঁচিলে হয়, তারপর ঘরে থাকিলে হয়। বাষ্পাকুল নয়ন মুছিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠেন,—"নারায়ণ, নারায়ণ!"

এই শিশুই উত্তরকালের প্রভু জগদ্বন্ধু। নামপ্রেমের মহাপ্লাবনরূপে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে তিনি হরিনামের প্রাণবন্যা বহাইয়া দেন, ভক্তিরসের বর্ষণে অগণিত মানুষকে করিয়া তুলেন রসাপ্লুত।

ব্রজরস সাধনে নিগূঢ় তত্ত্বটি জগদ্বন্ধুর দিব্য জীবনে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। তাঁহার অলৌকিক মহাজীবন সেদিন আত্মপ্রকাশ করে প্রেমধর্মের এক উৎসরূপে—দিকে দিকে বহাইয়া দেয় হরিনামামৃতের পবিত্র স্রোতধারা।

প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর আগের কথা। গোয়ালন্দের নিকটস্থ কোমরপুর গ্রামের তখন খুব প্রসিদ্ধি। পদ্মাতীরে এ গ্রামটিতে ছিল সুপণ্ডিত ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাসুদেব চক্রবর্তীর বাস। পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের কালে শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই বাসুদেব চক্রবর্তীর গৃহে অতিথি হন। কোমর জলে দাঁড়াইয়া মহাপ্রভু এখানে স্নান করেন, তাই এ স্থানের নাম হয় কোমরপুর। পরবর্তীকালে এ গ্রাম নদীগর্ভে নিশ্চিহ্ন হইলে চক্রবর্তীরা গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

এই বংশেরই এই শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দীননাথ ন্যায়রত্ন। মুর্শিদাবাদের ডাহা-পাড়া অঞ্চলে আসিয়া তিনি অধ্যাপক বৃত্তি গ্রহণ করেন। ন্যায়রত্নমহাশয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রতিপত্তি যেমন ছিল, সাধননিষ্ঠ পরম ভাগবতরূপেও তেমনি সে অঞ্চলে তিনি কম পরিচিত ছিলেন না। ভক্তিমতী পত্নী বামাদেবীর সহিত প্রাচীন কুলবিগ্রহ শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবাপূজায় পরম আনন্দে তাঁহার দিন কাটিত।

এই আদর্শ দম্পতির গৃহে, সীতানবমীর মাহেন্দ্রক্ষণে, তাঁহাদের তৃতীয় সন্তানটি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে ভূমিষ্ঠ হয়। পরম রূপলাবণ্যময় এই শিশুর নামকরণ হয় জগৎ। ইনিই উত্তরকালে পরিচিত হন বহু ভক্তের প্রাণপ্রিয় প্রভু—শ্রীজগদ্বন্ধুরূপে।

ন্যায়রত্নের গৃহের আনন্দময় পরিবেশে শীঘ্রই কিন্তু এক দুর্দৈব নামিয়া আসিল। মাতা বামাদেবী চৌদ্দ মাসের শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া একদিন স্বর্গারোহণ করিলেন। মাতৃহীন এই শিশুকে নিয়া পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্নের বিপদের সীমা নাই। কি করিয়া তাহার লালনপালন চলিবে তাহা ভাবিয়া পান না। নিরুপায় হইয়া শেষটায় জগৎকে নিয়া তিনি স্বগ্রাম গোবিন্দপুরে উপস্থিত হন। এখানে দীননাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা দিগম্বরীদেবী শিশুর সমস্ত দায়িত্বের ভার গ্রহণ করেন।

পদ্মাবিধৌত গোবিন্দপুরের শ্যামলবক্ষে কনককান্তি শিশু, জগৎ, ঘুরিয়া বেড়ায়। দিদি দিগম্বরীরই শুধু নয়নপুত্তলী সে নয়, প্রতিবেশীদের আনন্দধনরূপেও দিন দিন সে বর্ধিত হইতে থাকে। তাহার যখন চার বৎসর বয়স, পরিবারে তখন আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, দীননাথ ন্যায়রত্নমহাশয় একদিন আকস্মিকভাবে পরলোকে গমন করিলেন। দুর্জ্ঞেয় ঐশ বিধানে শিশুকালেই জগতের দুইটি বড় বন্ধন উন্মোচিত হইয়া গেল।

ন্যায়রত্নের লোকান্তর প্রাপ্তির কয়েকমাস মধ্যেই চক্রবর্তীদের গোবিন্দপুরের বাস্তুভিটা পদ্মায় নিমজ্জিত হইয়া যায়। ইহার পর ফরিদপুরের শহরতলি ব্রাহ্মণকান্দায় তাঁদের নূতন আবাস নির্মিত হয়। সকলে সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন।

জগৎ যখন ফরিদপুর জেলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে তখন তাহার বয়স তের বৎসর। এসময়ে তাহার উপনয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়, আর এখন হইতেই বালকের অন্তর্লোকে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। রাত্রির অন্ধকারে বনে জঙ্গলে কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়ায়

তাহা কে বলিবে ? আবার কখনো মৌনাবস্থায়, কখনো বা ধ্যানস্থ হইয়া সে ঘরে বসিয়া থাকে। বহুতর বালকের মধ্যে জগৎ নিজের বৈশিষ্ট্যকে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তোলে। গৌরকান্তি দীর্ঘায়ত দেহটি নিয়া সহজেই হইয়া উঠে সকলের আকর্ষণের বস্তু।

সর্বাঙ্গ সে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখে, এটা যেন তাহার এক জন্মগত অভ্যাস। ঈশ্বরভক্তি ও পবিত্রতার দিকে তাহার প্রবল ঝোঁক, তাই চরিত্রবলে চারিপাশের সঙ্গীদের সে টানিয়া আনে, আর তাহার হরিনামের অনুরাগ সকলেরই নয়নে মাখাইয়া দেয় প্রেমাঞ্জন।

অন্তরের প্রেম উন্মাদনা ও তন্ময় ভাবের জন্য জগৎকে এ বয়সেই কিন্তু কম মূল্য দিতে হয় নাই। সেদিন জেলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা চলিতেছে। প্রশ্নপত্রের কিছুটা উত্তর লিখিবার পর কি জানি কি এক ভাবাবেশে সে উন্মনা হইয়া বসিয়া আছে। উদাস দৃষ্টিটি সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ।

এমন সময় প্রধান শিক্ষক আসিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার ধারণা, জগৎ অন্যায়-ভাবে অপর পরীক্ষার্থীদের উত্তর জানিয়া নিতে চাহিতেছে। তেজস্বী বালক কিন্তু গ্রীবা উন্নত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শিক্ষকের ভুলের বিরুদ্ধে বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে সে বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শিক্ষকেরা জগতের খাতা পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, উত্তর তাহার নিজেরই—কোনো অসাধুতা সে করে নাই। তখনই তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অভিমানী বালককে কোথাও আর সেদিন খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ফরিদপুর বিদ্যালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ চিরতরে ঘুচিয়া যায়, আর এখানে পড়িতে সে রাজী হয় নাই। প্রধান শিক্ষকমহাশয় নিজের এই শোচনীয় ভুলের কথাটি সখেদে চিরদিন মনে রাখিয়াছিলেন।

জগৎ জেঠতুতো ভ্রাতা তারিণীবাবুর নিকট থাকিতে গিয়াছে। এখানে এক প্রতিবেশীর দুর্দান্ত একটি ঘোড়া আছে, কেহই এটিকে বাগ মানাইতে পারে না। যে কোনো সওয়ারকেই এই ঘোড়া অল্প সময়ের মধ্যে মাটিতে ফেলিয়া দেয়। জগৎ এ দৃশ্য চাহিয়া দেখে, আর মিটিমিটি হাসে। একদিন সে ঘোড়ার মালিকের নিকট প্রস্তাব করিয়া বসিল, এই একগুঁয়ে ঘোড়াকে সে অনায়াসে বশে আনিবে। তারিণীবাবু তো মহা আতঙ্কিত। কহিতে লাগিলেন, "ওরে, এমন দুঃসাহস দেখিয়ে কাজ নেই—তুই থাম্।"

বালক উত্তর দিল, "ঘোড়া তো ঘোড়া, কত সিংহ বাঘকে মূষিকের মতো ক'রে নিয়ে আমি খেলতে জানি।" পিঠের উপর উঠিয়া চাবুক মারা মাত্র সওয়ারসহ ঘোড়া মুহূর্তে কোথায় উধাও হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, এই দুর্দান্ত পশুটি একেবারে তাহার বশে আসিয়া গিয়াছে। সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল আর উহা আরোহীদের পিঠে নিয়া অশান্ত আচরণ করে না। জগতের স্পর্শে সে নিরীহ হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার পর জগৎ পাবনায় পড়িতে আসে। এবার জাগিয়া উঠে তাহার কিশোর জীবনে সাত্ত্বিক সংস্কার, নাম-প্রেমের উন্মাদনা শুরু হয়। তা ছাড়া, এ অদ্ভুত বালকের ব্যক্তিত্ব ও সহজাত শক্তিকে যেন এড়ানোর উপায় নাই। এখন হইতে তাহার চারিদিকে ভক্তিমান্ সহপাঠীরা ধীরে ধীরে জড়ো হইতে থাকে।

ছাত্রদের উপর তাহার এই প্রভাব দেখিয়া একদল লোক কিন্তু খুব চটিয়া যায়। এ

আবার কি কথা ? ব্রহ্মচর্য সাধন ও নামকীর্তনের মধ্যে ছাত্রদের টানিয়া আনা কেন ? জগৎ ছেলেদের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহাদের সংসার-ছাড়া করিবার ষড়যন্ত্র সে করিতেছে, এ অভিযোগ কেহ কেহ উঠাইলেন। এজন্য একদল লোক তাহার উপর এ সময়ে নানা উপদ্রব ও অত্যাচার শুরু করে। কিন্তু ক্ষমাসুন্দর কিশোরের প্রেমপূর্ণ আচরণে ইহাদের বিরোধিতা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসে।

জগতের চালচলন ও হাবভাব এবার আরও বদলাইতেছে। অলৌকিক মাধুর্যরসে জীবন হইয়া উঠিতেছে ভরপুর। প্রেম-ভক্তির ভাবাবেশে প্রায়ই তাহাকে উদ্বেল হইতে দেখা যায়।

সেদিন সে ইছামতীতে স্নান করিতে গিয়াছে। দূরে কে যেন প্রহ্লাদ পালা অভিনয়ের গান গাহিয়া উঠিল, 'আর কবে দেখা পাব, যুগলরূপ একাসনে।' এ গান শোনামাত্র জগৎ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলে, প্রেমাবেশে নদীর তটে একেবারে মূর্ছিত হইয়া পড়ে। এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব নিকটেই দাঁড়ানো ছিলেন, কিশোর জগতের এই সাত্ত্বিক বিকারের মর্ম বুঝিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। সাধুটির নির্দেশে সকলে নামকীর্তন শুনাইয়া অতি-কষ্টে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করে। অতঃপর ধরাধরি করিয়া তাহাকে গৃহে রাখিয়া আসা হয়।[১]

বাড়ির লোকের হইয়াছে বড় বিপদ। জগৎকে নামকীর্তন আসরে পাঠাইলে প্রেমোন্মত্ত হইয়া সে অনর্থ ঘটায়, আবার ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও নিস্তার নাই। একবার নামকীর্তন ও মৃদঙ্গের ধ্বনি শুনিলেই সে বিহ্বল হয়, মূর্ছিত হইয়া পড়ে। প্রেমাবিষ্ট দেহে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

এই তরুণ ভক্তকে দেখিতে আসিয়া সকলেরই বিস্ময়ের সীমা থাকে না। রূপ-লাবণ্যময় এ প্রেমোন্মত্ত কিশোরসাধকের ভিতরে লুকানো রহিয়াছে এ কোন্ মহাবৈষ্ণব ? দর্শন মাত্র সকলে চমকিয়া উঠে। জগতের কীর্তন শুনিতে যাহারা আসে, শুদ্ধাচারী কিশোর সাধককে শ্রদ্ধা জানাইয়া তাহারা ধন্য হয়।

জীবনবীণায় এসময়ে বাজিয়া উঠে প্রেমের ঠাকুরের বাণী। দূর-দূরান্ত হইতে আগত ভক্তদের প্রাণে এ বাণী দিব্যপ্রেমের ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়। কিশোর জগৎ এবার হইতে লোকগুরু জগদ্বন্ধুর আসনটি গ্রহণ করিতে থাকেন।

পাবনার উপকণ্ঠে, প্রাচীন বটের ছায়ায়, এক পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন। ইহারই এক দুর্গন্ধময় অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে শুদ্ধাচারী জগৎ প্রায়ই কাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকেন ?

এক অর্ধ-উলঙ্গ উন্মাদ সাধক তার বাহুলগ্ন। উন্মাদের কটিতে জড়ানো রয়েছে এক টুকরো নোংরা কাপড়। মাঝে মাঝে উল্লাসভরে সে চিৎকার করিয়া উঠিতেছে, কখনো সাশ্রুনয়নে জগৎকে করিতেছে কত সমাদর।

শহরের ছোট বড় সকলে এ সাধককে 'ক্ষ্যাপা' বলিয়া ডাকে। জগতের আদরের দেওয়া নাম—বুড়োশিব। এই বাসস্থানটিতে সাপের বড় উপদ্রব। নিভৃত জরাজীর্ণ আবাসে সহসা কেউ বড় একটা আসে না। কিন্তু ক্ষ্যাপা যখন বাজারে ভিক্ষা করিতে

---

১ শ্রীশ্রীবন্ধু লীলাতরঙ্গিণী : গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারী

যায় তখন সবাই তাঁহাকে সাগ্রহে ঘিরিয়া ধরে। রোগ, শোক, মামলা মোকদ্দমা হইতে শুরু করিয়া সকল কিছু বিপদে আর্ত ভক্তের দল তাঁহার শরণ নিতে ব্যস্ত হয়।

বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ এই ক্ষ্যাপা। তাঁহার করুণালীলার সহিত শহরের সবাই কম বেশী পরিচিত। ক্ষ্যাপার নানা অলৌকিক শক্তির কাহিনীও তাহাদের অজানা নাই। এই ক্ষ্যাপাই হঠাৎ সেদিন জগতের দিদি গোলকমণির নিকট বলিয়া ফেলিয়াছেন, "দ্যাখ্ দিদি, জগা মানুষ নয়, আমিও মানুষ নই। তবে জগা কিন্তু রাজা, আমরা সব প্রজা।" এ প্রহেলিকার মর্মোদ্ধার কে করিবে? দিদি শুধু নয়ন বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া থাকেন।

কিশোর জগতের সাধকজীবনের আবরণখানি এইবার উন্মোচিত হইতেছে। চিহ্নিত মহাজীবনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে তাঁহার আর বেশী দেরি নাই। আরো বিস্ময়ের কথা, তাড়াসের ভূম্যধিকারী বনমালী রায়, নিত্যানন্দ কুলোদ্ভব শ্যামলাল গোস্বামী, অদ্বৈত বংশের রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এখন হইতে এই শক্তিধর কিশোরকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করা শুরু করিয়াছেন। লোকগুরু জগদ্বন্ধুর এবার প্রকাশের পালা।

ঈশ্বরীয় কোনো প্রসঙ্গ, ভক্তিমূলক কোনো সঙ্গীত পদাবলী শুনিলেই জগদ্বন্ধুর অপূর্ব প্রেম-বিকার ও ভাবাবেশ উপস্থিত হয়। তাই তাঁহাকে নিয়া সঙ্গী সাথীদের বিপদের সীমা নাই। সেবার পাবনার শহরতলিতে ধ্রুবচরিত্র যাত্রাভিনয় হইতেছে। আসরের একপ্রান্তে জগৎ তাঁহার কিশোর সঙ্গীগণসহ সাগ্রহে বসিয়া আছেন। 'কোথায় পদ্মপলাশ লোচন হরি' বলিয়া ধ্রুব আকুল কণ্ঠে একটি গান ধরিল। আর যায় কোথায় ভক্ত জগদ্বন্ধুর অন্তরের ভাবসমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল, তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। চারিদিকের কৌতূহলী জনতা তাঁহার দিকে শুধু নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীর তখন তরুণ বয়স, সবেমাত্র ডাক্তারী পাস করিয়া বাহির হইয়াছেন। ডাঃ কালীও সেদিন ঐ কীর্তনের আসরে উপস্থিত। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। ভাবিলেন, এটা হয়তো জগদ্বন্ধুর কপট ভাবাবেগ। হিস্টিরিয়া রোগ হওয়াও অসম্ভব নয়।

ধরাধরি করিয়া জগৎকে তখনি পার্শ্বস্থ গৃহে নিয়া যাওয়া হইল। ডাঃ কালী সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানোর পর দেখিলেন, এই ভাবতন্ময়তার স্বরূপ চিকিৎসা-যন্ত্রাদিতে ধরা পড়িতেছে না। বুঝিলেন, এই প্রেমিক সাধককে এভাবে পরীক্ষার জন্য টানিয়া আনিয়া তিনি ভাল করেন নাই। ডাক্তার এক অব্যক্ত ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন, তাড়াতাড়ি তিনি জগৎকে আবার যাত্রার আসরে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। ডাঃ কালীর মনোলোকে সেদিন এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগিল। তিনি বুঝিলেন, বুদ্ধিগ্রাহ্য মানবীয় জ্ঞানের উপরেও এক পরমচৈতন্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহার সংবাদ তাঁহার মতো লোকেরা সত্যই জানেন না।

আর একদিনের কথা। কীর্তনানন্দের পর জগদ্বন্ধুর দেহে প্রেমাবেশ দেখা দিয়াছে। এক দুর্বুদ্ধি লোক ঐ সময়ে পরীক্ষা করার জন্য তাঁহার পায়ের আঙুলের উপর এক জ্বলন্ত টিকা রাখিয়া দেয়। আঙুলটি পুড়িয়া যাইতেছে অথচ জগদ্বন্ধুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। হঠাৎ তাঁহার সঙ্গীরা ঐ জ্বলন্ত টিকা দেখিতে পাইয়া তখনি তাহা দূরে নিক্ষেপ করে। অগ্নিদগ্ধ পায়ের এই ঘা শুকাইতে দীর্ঘদিন লাগিয়াছিল। উত্তরকালে ঐ দুষ্কৃতকারী লোকটি কিন্তু জগদ্বন্ধুর স্নেহাশ্রয় পাইয়া ধন্য হয়।

ভক্তপ্রবর বনমালী রায়ের আগ্রহে জগদ্বন্ধু একবার তাড়াসের রাজবাড়িতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সেবা ও আনন্দ বিধানের জন্য সকলের তৎপরতার অন্ত নাই। নামকীর্তন ও উদ্দণ্ড নর্তনে চারিদিক আনন্দ-চঞ্চল।

বনমালী শুনিয়াছেন, ইতিপূর্বে একদল দুষ্টলোক প্রভু জগদ্বন্ধুকে প্রহার করিয়াছিল। প্রভুকে তিনি চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার অঙ্গে কোন্ পাষণ্ডীরা আঘাত করিয়াছিল অবশ্যই তাহাদের নাম আজ বলিতে হইবে। সমুচিত দণ্ড না দিয়া তিনি ছাড়িবেন না।

বহু অনুরোধেও জগদ্বন্ধু কিন্তু কাহারো নাম প্রকাশ করিলেন না। ভাবতন্ময় হইয়া উদাস নেত্রে বেশ কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, "ওগো, আমি তো দণ্ড দিতে আসি নি, এসেছি উদ্ধারণ দিতে।"

তাড়াসের জমিদার ভবনে শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ স্থাপিত। ভক্তিমান্ সেবাইতগণ ইঁহাকে বলেন 'জামাই-বিনোদ'। কবে কোন্ সময়ে ঠাকুর রাধাবিনোদ নাকি জমিদার-বংশের এক ভক্তিমতী কুমারীকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করেন, তাঁহাকে তিনি আত্মসাৎ করিয়াও নেন। সেই হইতে জামাই বিনোদের বড় সম্মান ও প্রতাপ—তাঁহার আদরযত্নের পারিপাট্যও জামাতারই মতো। পরমবৈষ্ণব বংশের সন্তান বনমালীবাবু নিজে স্বভাবতই বড় ভক্তিমান্। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব এড়ানো সহজ নয়, তাই জামাই 'বিনোদ'এর সব সেবাকে তিনি সহজ বিশ্বাসে সব সময়ে গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রভু জগদ্বন্ধু বনমালী রায়কে একটু শিক্ষা দিতে চাহিলেন।

মন্দিরে রাধাবিনোদের স্নান, অর্চনা ও ভোগ-প্রসাদ নিবেদন হইয়া গেল। এবার তামুক সেবনের পালা। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী জামাই-আদরে বিগ্রহকে তামুক নিবেদন করা হইয়াছে।

জগদ্বন্ধু বনমালী রায়কে ডাকিয়া বলিলেন, "চলুন এবার জামাই বিনোদের গড়গড়া-সেবন দেখে আসি।"

বনমালীবাবু কোনোদিনই এ প্রথাটির গুরুত্ব তেমন দেন নাই। এবার প্রভুর কথায় সবাইকে নিয়া তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রুদ্ধশ্বাসে ধরিয়া সকলে দেখিতে লাগিলেন, ঠাকুরের নিকট নিবেদিত গড়গড়া হইতে ধূম্র উদ্গিরিত হইতেছে, অনবরত গড়গড় শব্দ শুনা যাইতেছে। অলক্ষ্যে বসিয়া কৌতুকী 'জামাই-বিনোদ' সত্য সত্যই সেদিন তামুক সেবনে রত হইয়াছেন।

এই লোকোত্তর লীলা দর্শনে ভক্ত বনমালীবাবুর গণ্ড বাহিয়া পুলকাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে থাকে। বিগ্রহ সেবার পরম তাৎপর্যটি এবার তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। আজ তিনি বুঝিতে পারেন মন্ত্রচৈতন্যের মতো সেবাচৈতন্যও প্রভুর কৃপাবলে স্ফুরিত হইয়া উঠে এবং বৈষ্ণবগৃহে রাধামাধবের পূজা ও সেবা নিষ্ঠার মধ্য দিয়াই এই সৌভাগ্য লাভ করা যায়। সেদিনকার অলৌকিক শক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়া জগদ্বন্ধু বনমালী রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনিয়া দেয়।

দুই বৎসর পরের কথা। নানা তীর্থস্থান পরিক্রমার পর প্রভু জগদ্বন্ধু বৃন্দাবনধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিয়া তাঁহার প্রাণের আর্তি হইয়া উঠিয়াছে দুর্নিবার। রাধারাণীর দর্শন ছাড়াও তাঁহার জীবন বৃথা। কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি এই রাধা—তাঁহারই শরণাগতি জগদ্বন্ধু নিয়াছেন, আর তাঁহারই ধ্যানে রহিয়াছেন সদা বিহ্বল। কখনো অস্ফুটস্বরে গাহিতেছেন, "এই ভব কুহক রে—রাই তুমি উদ্ধারণ।"

কখনো বা ভূতলে আছড়াইয়া পড়িয়া বৃষভানুনন্দিনীর করুণা ভিক্ষা চাহিতেছেন। রাধা-কুণ্ডের তীরে চলিয়াছে তাঁহার আকুতি, কান্না ও পরিক্রমা।

অপ্রাকৃত আনন্দ নির্ঝরের উৎস মুখ খুলিয়া গেল, পরম প্রার্থিত কৃপা-সম্পদ জগদ্বন্ধু এইবার প্রাপ্ত হইলেন। আরাধ্যা মহাভাবময়ী রাধারাণীর দর্শন মিলিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি হতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। সম্বিৎ পাইবার পর কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ধীরে ধীরে নিজ হস্তে লিখিলেন—

জয় রাধে ধর্ম, জয় রাধে জয়।
জয় রাধে কর্ম, জয় রাধে রয়॥

জগদ্বন্ধুর জীবনের সর্বস্তরে এবার দিব্য আনন্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে। অদ্বৈত বংশোদ্ভব ভক্ত রঘুনন্দন এইসময়ে তাঁহাকে একদিন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনার গুরু কে? কোথা হতে এ অপরূপ প্রেমসাধনার দীক্ষা আপনি পেলেন?"

প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে তিনি উত্তর দেন, "আমার গুরু? তোদের বৃষভানুকুমারীই যে আমাকে মন্ত্র দান করেছেন।"

এই মন্ত্রপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়াও বড় অদ্ভুত। ইহার পর হইতে প্রভু তাঁহার কণ্ঠে আর কখনো রাধা শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। শুধু নিজের মুখে উচ্চারণ নয়, অন্য কারুর মুখে ঐ নাম শুনিলেও তিনি দিশেহারা হইয়া পড়েন। নিজে কখনও 'রাধা কুণ্ড' বলিতে হইলে বলেন, 'অমুক কুণ্ড'। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরাধার কথা উল্লেখ করা হইলে বলেন, "তোদের কিশোরী"। পরবর্তীকালে দেখা যাইত, ভক্তপ্রবর রাধিকা গুপ্তকে (উত্তর-কালের রামদাস বাবাজী) তিনি রাধিকা বলিতে পারিতেন না, 'শারিকা' নামে অভিহিত করিয়া কাজ চালাইতেন।

রাধা নাম একবার শুনিতে পাইলেই রক্ষা নাই, প্রভুর দেহে তীব্র প্রেম-বিকারের সৃষ্টি হয়। আর সেই জন্যই সন্তর্পণে তিনি এই নাম এড়াইয়া চলেন। একবার প্রভু জগদ্বন্ধু শুনিলেন, তাঁহার দেখাদেখি প্রিয় ভক্ত রায় হরিদাসও রাধানাম উচ্চারণ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। ধীর গম্ভীরস্বরে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হরিদাস, ও নাম করবি নে, তো তরবি কিসে? হরিদাসের বুঝিতে দেরি হইল না—অনধিকারী হইয়া প্রভুর অন্ধ অনুকরণের দ্বারা তিনি সঙ্গত কাজ করেন নাই। প্রভু জগবন্ধুর সংক্ষিপ্ত ভর্ৎসনাটির মধ্য দিয়া এই নাম তাঁহার হৃদয়ে চিরতরে গাঁথা হইয়া রহিল।

বৃন্দাবনধামে রাধারাণীর আশীর্বাদ লাভ করার পর জগদ্বন্ধু ফরিদপুর ব্রাহ্মণকান্দায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বগ্রাম। তরুণ সাধককে কেন্দ্র করিয়া অল্পকাল মধ্যে কীর্তনানন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল। প্রথমে আসিয়া জুটিল তাঁহার বাল্যসঙ্গীগণ, তাহার পর গ্রামের জনসাধারণ। দূর-দূরান্তের গ্রাম হইতেও লোক জড় হইতেছে। প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন কীর্তনের বিরাম নাই, কোন্ অদৃশ্য হস্তস্পর্শে ইহার ব্যবস্থাপনা চলিতেছে, কে ইহার ভার বহন করিতেছে, তাহা কেহই জানে না। কীর্তনস্থলীতে আকর্ষিত হইয়া যাহারাই আসে, জগদ্বন্ধুর দিব্যশ্রীমণ্ডিত রূপ দেখিয়া তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়ে, ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়িয়া যায়।

ভাবাবেশে উদ্বেলিত প্রভু সঙ্গীতের পর সঙ্গীত রচনা করিয়া চলিয়াছেন, নিজেই তাহাতে সুর যোজনা করিতেছেন। আবার কীর্তন-অঙ্গনে দেখা যাইতেছে তাঁহার দিব্য

প্রেরণার মূর্ত প্রকাশ। পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরে প্রভু জগদ্বন্ধু এ সময়ে এক ঐশ নির্দিষ্ট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিতেছেন।

ফরিদপুর শহরের উপান্তে বুনো বাগ্‌দীদের বাস। সাঁওতাল পরগনা হইতে নীলকরগণ এককালে ইহাদের আমদানি করিয়াছিল। এখন রাস্তাঘাট ও ভিৎ বাঁধিয়া আর শূকর মারিয়া ইহারা জীবিকা নির্বাহ করে। হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত ও অস্পৃশ্য এই বুনোরা।

জগদ্বন্ধু শুনিলেন, এই বুনোদের খ্রীষ্টান করিয়া নিবার জন্য প্রবল চেষ্টা এ সময়ে চলিতেছে। এই সংবাদ চারিদিকেই রটিয়াছে, কিন্তু জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজের পক্ষে তাহা কোনো আলোড়নই সৃষ্টি করে নাই। করুণাময় প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রাণ সেদিন কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া তাই তিনি বুনো-বাগ্‌দীদের মোড়ল রজনী-সর্দারকে ডাকাইয়া আনিলেন।

রজনী নিজে তন্ত্রমন্ত্র জানে, সিদ্ধাই এবং ঝাড়-ফুঁকের জন্য তাহার সুনাম দুর্নাম দুই-ই আছে। বিশাল বক্ষপট, আরক্ত নয়ন ও ঝাঁকড়া চুল নিয়ে কৃষ্ণকায় রজনী-সর্দার স্থানীয় অঞ্চলে অনেকেরই ভীতি উৎপাদন করে। রজনী জগদ্বন্ধুকে দেখিয়াছে, কীর্তনকালে নগর পরিক্রমায় তাঁহার ভাবাবিষ্ট মূর্তি দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে। প্রভু তার সারা দেহ মন প্রাণ কাড়িয়া নিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সাহস করিয়া সে কাছে যায় নাই। আজ প্রেমময় প্রভুই ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। রজনী তাঁহার কাছে ছুটিয়া গেল।

"রজনী এসেছো, রজনী এসেছো"—বলিয়া প্রভু বুনো-সর্দারকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। রজনী সেদিন এ দিব্যদেহের আলিঙ্গনে এক মুহূর্তে আত্মসাৎ হইয়া গেল। প্রভু তাহাকে স্নেহভরে বলিলেন—"রজনী, স্মরণ রেখো, তোমরা বুনো জাতেরা হীন নও। তোমরা শ্রীহরির দাস, আমার অতি প্রিয়জন। সেই নিত্যকালের পরিচয়েই তোমরা আমার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠ। অচিরে সকল দুঃখ তোমাদের ঘুচবে। আজ হতে তুমি আর রজনী-সর্দার নও, তুমি হরিদাস। ভুবনমঙ্গল হরিনাম করো, সকলে ধন্য হও। আজ থেকে তোমরা আর বুনো নও, তোমরা 'মোহান্ত সম্প্রদায়'।"[১]

প্রভু আরও আদেশ দিলেন, "কাল তুমি সগোষ্ঠী এখানে এসে রাধাগোবিন্দের প্রসাদ পাবে। তোমাদের সম্প্রদায়ের যত লোক আছে, নরনারী বালক বৃদ্ধ সবাইকে নিয়ে আসবে।"

পতিতপাবন জগদ্বন্ধুর স্পর্শে রজনী-সর্দার সেদিন রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীঅঙ্গনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া সে দেখে—তাহার পায়ের তলায় নূতন পৃথিবী, মাথার উপরে নূতন আকাশ। সে নিজেও এক নূতন মানুষরূপে জন্মলাভ করিয়াছে।

রজনী-সর্দারের মধ্যে দিয়া প্রভু জগদ্বন্ধু স্থানীয় বুনো-বাগ্‌দীদের সেদিন প্রভাবিত করিলেন। আজিকার দিনের হরিজন আন্দোলনের পর্বের বহু পূর্বে প্রভু জগদ্বন্ধুর মোহান্ত সম্প্রদায় নাম-কীর্তনের মধ্য দিয়া সত্যকার হরিজনত্ব লাভ করিয়া ধন্য হয়। প্রভুর কৃপাবলে অল্পকাল মধ্যেই এই বুনো-বাগ্‌দীদের মধ্যে মৃদঙ্গবাদক ও কীর্তন গায়কের সৃষ্টি হয়—গোপী-চন্দন ও তিলক-কণ্ঠিভূষিত শত শত ভক্ত বৈষ্ণবজন আত্মপ্রকাশ করে।

স্পর্শমণি জগদ্বন্ধু স্পর্শে অন্ত্যজ বুনো-বাগ্‌দীদের দল এখন হরিনাম প্রচারকারী

---

১ বন্ধু কথা : সুরেশ চক্রবর্তী

মোহান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত, কীর্তনিয়া হিসাবেও তাহাদের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিছুদিন পরে এই কীর্তনিয়াদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাহারো কাহারো মনে কিছুটা অহংকার আসিয়া পড়ে। অন্তর্যামী জগদ্বন্ধুর সতর্ক দৃষ্টি তাহা এড়ায় নাই, অঙ্কুরেই তিনি ইহার মূল উৎপাদন করিলেন।

ফরিদপুরের কয়েক ক্রোশ দূরে সেদিন মোহান্ত সম্প্রদায়ের কীর্তন হইতেছে। হঠাৎ মূল কীর্তনিয়া হরিদাস ও মৃদঙ্গবাদক মহিমের মধ্যে এক ঝগড়া বাধিয়া গেল। উভয়ে পরস্পরের দোষ দেখাইয়া নিজ প্রতিষ্ঠা বাড়ানোর জন্য ব্যস্ত। বচসা তীব্র মনান্তরে পরিণত হওয়ায় কীর্তন অনুষ্ঠানটি ভাঙিয়া যায়, বিষন্ন মনে শ্রোতারা সকলে বাড়ি ফিরিয়া আসে। কীর্তনিয়াদের অহঙ্কারের মূলে জগদ্বন্ধু এবার এক নির্মম আঘাত হানিলেন।

পরদিন ভোরে প্রভু পাবনা হইতে ব্রাহ্মণকান্দায় আসিয়া উপস্থিত। পৌঁছামাত্র হরিদাস ও মহিমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আহ্বান শুনিয়া উভয়ের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। ব্যাপার কি? প্রভু কি তাহা হইলে গত রাত্রির অবাঞ্ছিত আচরণ ও ঝগড়ার কথা কিছু টের পাইয়াছেন? তাই কি তিনি আজ ডাকিয়াছেন? প্রভুর অন্তর্যামীত্বের কথা হরিদাসের জানা আছে। পথ চলিতে চলিতে মহিমকে সে তাহার এক কাহিনী শুনাইতে লাগিল।

—সেবার গৃহে বসিয়া হরিদাস প্রভাতী কীর্তন গাহিতেছিল। প্রতিবেশী বিহারী কি একটা কাজে তাহাদের সেদিকে আসিয়াছে। হরিদাস তাহার নিকট কিছু টাকা পাইবে—কীর্তন থামাইয়া সে বিহারীকে তখনি টাকার তাগাদা দেয়। তাছাড়া এসময়ে কিছু কঠিন কথা শুনাইতেও সে ছাড়ে নাই। অতঃপর যথারীতি তাহার কীর্তন সে সমাপন করে। ইহার পর প্রভুর সঙ্গে দেখা। তখনি তিনি হরিদাসকে ঐরূপে কীর্তন বন্ধ করার জন্য গালি দিতে লাগিলেন।

তিনি শান্ত হইলে হরিদাস সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, "প্রভু, আপনি এটা কি ক'রে জানলেন? আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

উত্তর হইল, "তোর ঘরের বেড়ার সঙ্গে যে ছবিটা টাঙানো আছে, তার মধ্যেই যে আমি ছিলাম রে।"

প্রভুর সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে হরিদাসের এইরূপ নানা ঘটনা জানা আছে। তাই শঙ্কিতচিত্তে সে চলিতেছে।

দণ্ডবৎ করিয়া উঠিবামাত্র জগদ্বন্ধু আর্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁরে হরিদাস! কাল রাতে তোরা আমায় এত বেদনা দিলি কেন? কীর্তন যে আমার জীবন। তোরা আমার সেই জীবনের উপর আঘাত করলি? সারারাত যে আমি যন্ত্রণায় ছটফট্ ক'রে মরেছি। ওঃ। সে কি কষ্ট রে!"

ভর্ৎসনা ও শাসনের পরিবর্তে একি আর্তি, একি মিনতি প্রভুর অশ্রুসজল, বেদন-সুন্দর মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হরিদাস ও মহিম কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুজলে সেদিন তাহাদের সমস্ত কলুষরাশি ধুইয়া মুছিয়া গেল।

কিছুদিন পরে তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু বলিলেন, "ওরে, আমি সব দেখছি। আমি যে তোদের সঙ্গেই ছিলাম।"

মহিম এই সময় আবদারের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, "প্রভু, যদি সঙ্গেই ছিলেন, তো কৃপা ক'রে কীর্তন যাতে ঠিকভাবে চলে সে শক্তি কেন দিলেন না?"

জগদ্বন্ধু এবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোদের হৃদয়ে অহঙ্কার হয়েছিল, তাই আমার থাকবার মতো জায়গা সেখানে যে হয়ে ওঠে নি।"

এইরূপে আশ্রিত ও স্নেহভাজন কীর্তনিয়াদের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া প্রভু সেদিন তাহাদের প্রতি কৃপাও কিছুটা করিয়াছিলেন। একখণ্ড প্রস্তর তিনি এই সময়ে মহিমকে দেন। মৃদঙ্গবাদনের পূর্বে এই প্রস্তর সে স্পর্শ করিয়া যাইত, ইহার ফলে কীর্তনের আসরে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সে থাকিত অধিষ্ঠিত। মহিমের উত্তরপুরুষও প্রভুপ্রদত্ত এই এই পাথরটি না ছুঁইয়া মৃদঙ্গে হাত দিত না।

ভক্তদের নিকট যুগল-ভজনের তত্ত্ব নির্দেশ করিয়া প্রভু জগদ্বন্ধু বলিতেন, "মানসে সদা যুগল সঙ্গ ক'রে নিজেকে 'অমুক' দাসী মনে করবে। কৃষ্ণকান্তি সদা নয়নে আর মানসে ভাসবে। কৃষ্ণই জীবনসর্বস্ব, কৃষ্ণ গতি ও কৃষ্ণ পতি—এই সার কথাই পরমধর্ম। কৃষ্ণই জীবন-ব্রত, তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু জানবে না। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই লিখবে, ভাববে আর কাঁদবে।"

বৃন্দাবনের স্বরূপতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধন বিচারপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, "বৃন্দাবন তিন প্রকার। নিত্য বৃন্দাবন, লীলা বৃন্দাবন ও ধাম বৃন্দাবন। নিত্য বৃন্দাবনে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপী একক কৃষ্ণ বর্তমান, সখাসখী সেখানে নেই। লীলা বৃন্দাবনে যুগল-কিশোরের নিত্য রাস হয়ে থাকে। আর ধাম বৃন্দাবন—কাম্যবন থেকে মান-সরোবর অবধি চৌরাশী ক্রোশব্যাপী, সেখানে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা সকলে যায়। লীলা বৃন্দাবনকে ভজনীয় বলে জানবে।"

ভক্ত প্রতাপ প্রভুর সম্মুখে উপবিষ্ট। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, সখাসখীহীন একক কৃষ্ণের স্বরূপ কি? প্রভু ইহাদ্বারা কোন বিশেষ তত্ত্বের ইঙ্গিত দিতেছেন? এই চিন্তা মনে আলোড়িত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু জগদ্বন্ধু সুমধুর কণ্ঠে ভক্ত প্রতাপচন্দ্রকে বলিলেন, "ওরে, ধারণার বাইরে যে পরমতত্ত্ব, তা পরিহার ক'রে চলতে হয়। নিত্য বৃন্দাবনের কথা ভাবনায় টেনে আনতে নেই। লীলাবৃন্দাবনের রসমাধুর্যে অবগাহন করতে আগে চেষ্টা কর্।"

যুগলভজনের প্রাথমিক প্রস্তুতিরূপে প্রভু একদিকে শুদ্ধাচার ও ব্রহ্মচর্য, অপরদিকে নামকীর্তন ও নিত্য টহলের আদর্শকে তাঁহার ভক্তদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। বাল্যাবধি তাঁহার নিজ জীবনেও এই আদর্শটি রূপায়িত দেখি। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য, অপাপবিদ্ধ জীবন ও শুদ্ধাচারিতা নিয়া তিনি তাঁহার সাধনজীবনে অগ্রসর হন। তারপর রাধারাণীর কৃপাবলে পরম মধুর ব্রজরসে তাঁহার জীবনপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

অতুল চম্পটি আরা শহরের ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কয়েকবার মাত্র জগদ্বন্ধুর সান্নিধ্যে তিনি আসিয়াছেন। মহাপুরুষের স্পর্শ, তাঁহার চাহনি এ স্বভাবগম্ভীর শিক্ষাব্রতীর জীবনে প্রেমরসের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। সংসার ত্যাগ করিয়া, অপূর্ব দৈন্য ও আর্তি নিয়া চম্পটি প্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেহ মন ও প্রাণে তখন তাঁহার যে বৈরাগ্যের ঢল্ নামিয়াছে, অঙ্গাবরণেও লাগিয়াছে তাহার ছাপ। গৈরিক বসন ধারণ করিয়া চম্পটিমহাশয় নামকীর্তনে মত্ত হইয়া পড়িলেন।

জগদ্বন্ধুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু বার বার চম্পটির পরিচ্ছদের উপরই পড়িতেছে, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতেছেন না। অবশেষে একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে

বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি গৈরিক পরেছেন কেন ? গৈরিকে তো আপনার অধিকার হয় নি।"

"প্রভু, আমি এ বেশ এমনিই পরেছি। অধিকার অনধিকারের কথা ভাবি নি।"

গম্ভীর স্বরে জগদ্বন্ধু আদেশ প্রদান করিলেন, "আপনি অবিলম্বে গৈরিক ত্যাগ করবেন।" প্রভুর অন্তর্ভেদী কল্যাণদৃষ্টি গেরুয়াধারী শিষ্যের মর্মকেন্দ্রে গিয়া প্রবিষ্ট হয়। তাঁহার সদা জাগ্রত দিব্যদৃষ্টি গৈরিক ধারণের সূক্ষ্ম অহমিকাবোধ হইতেই সেদিন চম্পটিকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল।

চম্পটিকে একখানি সাদা ধুতি ও উত্তরীয় প্রদান করিয়া জগদ্বন্ধু তাঁহাকে ভক্তিমার্গের প্রাথমিক সাধন নির্দেশাদি দেন, প্রেমিক ভক্তও পরম শ্রদ্ধায় তাহা শিরোধার্য করিয়া নেন। রোজ প্রত্যূষে জগন্নাথ ঘাটে একবার তিনি ডুব দেন, তারপর করতাল যোগে কলিকাতার রাস্তায় গাহিয়া চলেন—

'কৃষ্ণগোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
রাধা মাধব রাধিকা নাম ॥'

উচ্চস্বরে রোজ এ কীর্তন করিতে করিতে তাঁহাকে কালীঘাটে পৌঁছিতে হয়। আদি গঙ্গায় আবার নিমজ্জনের পর ঐ কীর্তন গাহিতে গাহিতে জগন্নাথ ঘাটে ফিরিয়া আসেন। এভাবে প্রভুর উপদিষ্ট টহলব্রত তাঁহাকে অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। কলিকাতার পথে ঘাটে জগদ্বন্ধু সেদিন প্রিয় ভক্ত চম্পটির মধ্য দিয়া এমনি করিয়া নামরসের ধারা ঢালিয়া দিতে থাকেন।

জগদ্বন্ধুর জীবনে পাবনার হারাণ ক্ষেপার প্রভাব নিতান্ত কম নয়, ইহার কিছুটা পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পাইয়াছি। ক্ষেপাকে প্রভু 'বুড়োশিব' বলিয়া ডাকিতেন, শক্তিমান্ মহাপুরুষ জ্ঞানে তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিতেন। তাঁহার সাধন-জীবনের প্রথম পর্যায়ে আমরা ক্ষেপার আবির্ভাব দেখিতে পাই। কিন্তু এই জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যান।

ভক্ত চম্পটি ঠাকুরকে প্রভু সেবার পাবনায় নিয়া যান। তারপর অধ্যাত্মপথের প্রবীণ সুহৃদ্, শক্তিধর হারাণ ক্ষেপার হাতেই তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য সমর্পণ করিয়া আসেন। ক্ষেপা ও জগদ্বন্ধু শিষ্য চম্পটির একত্রে বসবাসের কাহিনী বড় কৌতূহলোদ্দীপক।

রাত্রির শেষ যাম, প্রভাত হইতে অনেক দেরি। ক্ষেপা ত্রিশূলের খোঁচা মারিয়া ঘুমন্ত চম্পটি ঠাকুরকে ডাকেন, "ওরে, শিগ্‌গীর ওঠ্।" প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া উভয়ে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়েন। ক্ষেপার পরিধানে রহিয়াছে শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা, কাঁধে জীর্ণ কন্থা আর হাতে উদ্যত ত্রিশূল।

বাজারে কুমোরদের দোকানে প্রথমে তিনি উপস্থিত হইলেন। তারপর ত্রিশূলের আঘাতে গুটিকয়েক হাঁড়ি অবলীলায় ভাঙিয়া খুব হাঁকডাক শুরু করিয়া দিলেন। দোকানের মালিক ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, একেবারে আনন্দে আটখনা। ক্ষেপা কোনো দোকানের ক্ষতি করিলে ব্যবসায়ীরা মনে করে, সেদিন তাহাদের বড় সৌভাগ্য— প্রচুর লাভ নিশ্চয়ই হইবে। ক্বচিৎ কাহাকেও যদি তিনি কোনো আদেশ দেন— সে ব্যক্তি হাতে স্বর্গ পাইয়া বসে এই শক্তিমান্ সাধকের সেবার অধিকার পাইলা সে ধন্য হয়।

ক্ষেপা একদিন চম্পটিকে বড় অদ্ভুত আদেশ দিয়া বসিলেন। নদীর ওপারে বঙ্কু

মণ্ডলের বাড়ি, জাতিতে সে চণ্ডাল। এই বক্ষুব পাতের উচ্ছিষ্ট ভাত তাঁহাকে খাইয়া আসিতে হইবে। চম্পটি বুঝিলেন—ইহা তাঁহাব এক পবীক্ষা। প্রিয় সুহৃদ্ হাবাণ ক্ষেপার কাছে বাখিয়া প্রভু জগদ্বন্ধু ভক্তের অন্তস্তল হইতে একটি একটি কবিয়া অহঙ্কাবেব কাঁটা তুলিয়া ফেলিতেছেন।

বক্ষু মণ্ডল সেদিন সকালে তাহাব ঘবেব দাওয়ায় বসিযা ভাত খাইতেছে। চম্পটি জোব কবিযা তাহাব পাত হইতে উচ্ছিষ্ট নিলেন, ভোজনেব পব হবিধ্বনি দিতে দিতে ক্ষেপাব নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এত কিছু কবিযাও তাঁহাব নিষ্কৃতি নাই। ক্ষেপা চম্পটিকে বাজাবেব মধ্যে দাঁড কবাইয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, "তোমবা সকলে শোন শোন, এ ব্রাহ্মণেব ছেলে হয়ে চাঁড়ালেব ভাত খেযে বেড়ায়!"

চম্পটিমহাশয এত বড ধাক্কা প্রথমটায সহিতে পাবেন নাই, লজ্জা ও সঙ্কোচে মাথাটি নিচু কবিযা বসিয়া পড়িয়াছিলেন। ক্ষণকাল পবেই দৃঢ চিত্তে সোজা হইয় দাঁড়াইলেন। বুঝিলেন, প্রভুব ইচ্ছায ক্ষেপা আজ তাঁহাব অভিমানেব মূল উৎপাটন কবিযা দিতেছেন। সর্ব আববণ ত্যাগ কবিয়া দীনহীনেব বেশে চম্পটি গৃহেব বাহিবে আসিয়া দাঁড়াইযাছেন। শুধু হবিনামেব মর্যাদাই এখন হইযাছে তাঁহাব নিজেব মর্যাদা। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে প্রভু জগদ্বন্ধু এ হবিনাম বিলাইযা ফিবিতেছেন—তবে চম্পটি জাত্যভিমানকে চূর্ণ না করিয়া তিনি ছাড়িবেন কেন?

সেবাব জগদ্বন্ধু বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায আসিযাছেন। চম্পটিমহাশয প্রভুব থাকাব জন্য জমিদাব কালীকৃষ্ণ ঠাকুবেব বাগানবাডিতে বন্দোবস্ত কবিলেন। কালীকৃষ্ণ তখন অবধি প্রভুকে স্বচক্ষে দর্শন কবেন নাই। চম্পটি ও অন্যান্য ভক্তদেব মুখে তাঁহাব মহিমা শুনিযা তিনি মুগ্ধ হইযাছেন। বাগানবাড়িব অট্টালিকাব এক কোণে প্রভুব স্থান করিয়া দেওয়া হইল। তিনি কীর্তনপ্রিয়, তাই খোল কবতাল প্রভৃতি কেনাব জন্যও কালীকৃষ্ণ মোটা টাকা ব্যয় কবিলেন।

কিন্তু শীঘ্রই এক গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। জগদ্বন্ধু বড একটা জনসমক্ষে বাহিব হন না। প্রাযই আপাদমস্তক শুভ্র বস্ত্রে জড়িত বাখেন, অসূর্যম্পশ্য থাকিতে চাহেন। প্রত্যূষে গঙ্গায অবগাহন স্নানেব পব ঢুকিযা পড়েন শয্যাব টাঙানো মশাবিব মধ্যে, সাবাদিন আব তাঁব দর্শন পাওয়া যায না।

কযেকজন কর্মচাবী বাগানবাড়িতে বৈষ্ণবদেব থাকাটা বেশী পছন্দ কবে নাই। তাছাড়া, 'প্রভু নামক ব্যক্তিটিকেও বড বহস্যময ঠেকিতেছে। লোকচক্ষুব আড়ালেই বা তিনি থাকেন কেন?'

সেদিন স্নানকালে ইহাদেব একজন দূব হইতে প্রভুকে দেখার চেষ্টা কবিতে থাকে। লোকটিব ধাবণা জন্মে, এই ব্যক্তি আসলে জগদ্বন্ধু নন, ভক্তগণ কোথা হইতে এক রূপসী তরুণীকে আনিযা এ বাগানবাড়িতে লুকাইযা বাখিযাছেন। শুধু তাহাই নয,—জমিদাব কালীকৃষ্ণকে ঠকাইতেও তাহাবা ছাড়ে নাই। কীর্তনেব সাজসবঞ্জাম বাবদ বহু অর্থ ইতিমধ্যে আদায কবিযাছে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুবকে এ সব কথা বুঝানোব পব ক্রুদ্ধ হইযা হঠাৎ তিনি দাবোযান ববকন্দাজসহ বাগানে আসিয়া উপস্থিত।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুবেব ধাবণা, এই সব ভক্ত বৈষ্ণবেবা সবাই মিলিযা তাঁহাকে প্রতাবণা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁহাব বাগানবাড়িতে নাই। তৎপবিবর্তে আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া এক সুন্দরী নারীকেই এখানে গোপনে বাখা হইয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রভুর পুণ্যময় কাহিনী প্রকাশ করিয়া বসেন। ভাগবতধর্মের প্রচারক, স্বামী প্রেমানন্দ ভারতীও এসময়ে প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন, প্রচারও শুরু করিয়াছেন।

নবদ্বীপে বসিয়া জগদ্বন্ধু ইহা শুনিতে পান। একদিন শিষ্যদের বলেন, "ওরে, তোরা শিশির ও ভারতীকে নিষেধ করে দিস তারা যেন এভাবে আমায় বিপদে না ফেলে। একেই তো এতলোকে আমায় 'দেখা দাও, দেখা, দাও' বলে অস্থির ক'রে তুলেছে। তার ওপর যদি ওরাও এরকম করতে থাকে তবে আমার কোঠার ইট ক'খানাও লোকে রাখবে না। ওদের বলিস, বাতির আলোকে সূর্যকে কখনো দেখতে হয় না। সূর্য স্বপ্রকাশ, তিনি যখন প্রকাশিত হন জগতের সকলেই তাঁকে দেখতে পায়।"

পূর্বোক্ত অন্নদাবাবুই ভাবাবিষ্ট হইয়া ভারতী মহারাজকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একদিন তিনি জানান, কলিকাতার এক কোণে জটাজুটধারী একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছেন, ঐ সন্ন্যাসীকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিতে হইবে। খোঁজাখুঁজির পর সেদিন সাধুকে পাওয়া গেল—ইহার নাম প্রেমানন্দ ভারতী। অন্নদাবাবু এ সময়ে ভারতী মহারাজকে জানাইয়া দেন, তাঁহাকে জটাজুট মুণ্ডন করিতে হইবে, গেরুয়া ত্যাগ করিয়া ধারণ করিতে হইবে প্রেমিক বৈষ্ণবের বেশ—শুধু তাহাই নয়, ভারতে ও বহির্ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার তিনি শুরু করিবেন।

পূর্বাশ্রমে ভারতী মহারাজের নাম ছিল সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বারদীর ব্রহ্মচারী ও পাবনার হারাণ ক্ষেপার কৃপাস্পর্শ তিনি প্রথম জীবনে প্রাপ্ত হন। উত্তরকালে কাশীর ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট গ্রহণ করেন সন্ন্যাস-দীক্ষা। এক দুর্জ্ঞের ঐশ বিধানে এইবার প্রেমানন্দ ভারতীর জীবনে নামিয়া আসে প্রেমের ধারা। প্রভু জগদ্বন্ধুর দর্শন তখনও তিনি পান নাই, কিন্তু তাঁহার কীর্তন-লীলার কথা শুনিয়াই আকুল হইয়াছেন। প্রভুর দর্শনের পর ব্রজসখাভাবে এই সন্ন্যাসী বিভোর থাকিতেন। তাঁহার মুখে জগদ্বন্ধুর নাম-কীর্তন যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইত।

উত্তরকালে প্রভুর নির্দেশে ভারতী মহারাজ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য আমেরিকায় যান। নিউ ইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে বহু আমেরিকাবাসীকে তিনি দীক্ষা দেন। সেখানে সাধনকেন্দ্ররূপে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ হোম্' স্থাপন করেন।

আমেরিকায় দশ বৎসর প্রচার করিয়া ১৩১৫ সালে ভারতী মহারাজ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি আমেরিকান শিষ্যাশিষ্যাও এদেশে উপস্থিত হন। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়া প্রেমানন্দজী ইহাদের নব নামকরণ করিয়াছিলেন শ্যামদাস, গৌরীদাসী, হরিমতী, হরিদাসী ইত্যাদি। ভারতবর্ষ ও জগদ্বন্ধুকে দর্শনের জন্য ইঁহারা ব্যাকুল হইয়া এদেশে আসেন, কিন্তু প্রভুর দর্শন আর ভাগ্যে ঘটে নাই। তৎপূর্বেই শ্রী-অঙ্গনের অভ্যন্তর-গৃহে তিনি আত্ম-গোপন করিয়াছেন।

ফরিদপুরে বুনো বাগ্‌দীদের কৃপা করার পর কলিকাতার রামবাগানের ডোমসমাজের উপর জগদ্বন্ধুর দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। পূতিগন্ধময় পরিবেশে, সমাজের নিম্নতর স্তরে, এই অনাচারী মদ্যপ ডোমদের মধ্যে তিনি হরিনামের মন্ত্র প্রচার করিতে থাকেন, ডোম-পল্লীতে নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়া উঠে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই অন্ত্যজদের জীবনে আসে বিরাট পরিবর্তন।

বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা ও নামকীর্তনের ফলে প্রভুর ডোম ভক্তদের মধ্যে হিতহরিদাস, পীতাম্বর বাবাজী, দয়াল তিনকড়ি প্রভৃতি সাধককে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সময়ে ডোমপল্লীর পর্ণকুটিরবাসী প্রভু জগদ্বন্ধুকে দেখার জন্য ভিড় করিতেছেন। চম্পটি ঠাকুরের সাহায্যে প্রভু এই ডোমপল্লীতেই হরিনাম প্রচারের কেন্দ্র খুলিয়া বসেন। সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ ও অন্ত্যজদের মধ্য দিয়াই তাঁহার উদ্ধারণ ব্রত সেদিন পথ খুঁজিয়া নেয়।

বৃন্দাবনধামে প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁহার তরুণ বয়সে বহুতর ভাবলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শেঠের মন্দিরে সেদিন এক উৎসব উপলক্ষে পালাগান চলিতেছে। আসরে ঘন ঘন শুনা যাইতেছে 'জয় রাধে শ্যাম' ধ্বনি। হঠাৎ দেখা গেল, এক সুদর্শন যুবক ভাবাবেশে অকস্মাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই। পালাগান প্রায় ভাঙিয়া গেল, এই সংবিৎহারা যুবকের চিকিৎসার জন্য সকলে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ভক্ত বনমালী রায় এক কোণে উপবিষ্ট। দেখিয়াই জানিলেন—প্রভু জগদ্বন্ধু বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, আর পালাগানের প্রেমাবেগে তাঁহার সাত্ত্বিক মূর্ছা ঘটিয়াছে।

বনমালী রায় বলিলেন, "আপনারা বেশী ব্যস্ত হবেন না। ইনি প্রভু জগদ্বন্ধু, একজন প্রেমিক মহাপুরুষ, আর আমার অত্যন্ত পরিচিত। ঈশ্বরীয় উদ্দীপনা হলেই এঁর প্রেমবিকার উপস্থিত হয়। আমি যা হয় ব্যবস্থা করছি।"

জগদ্বন্ধুকে শিবিকায় তুলিয়া বনমালী রায়ের গৃহে শ্রীরাধাবিনোদজীর কুঞ্জে আনা হয়। তাঁহাকে সন্তর্পণে শয়ন করাইয়া দিয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করা হয়, যাতে বিশ্রামের বিঘ্ন না ঘটে। তারপর কয়েকজন এখানে প্রহরা দিতে থাকে।

বিস্ময়ের বিষয়, যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও ইহারা সকলেই, কি জানি কেন, ঘুমে একেবারে ঢলিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে প্রভু জগদ্বন্ধু সবার অলক্ষ্যে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান।

ইহার কিছুদিন পরেই স্বেচ্ছাময় প্রভু জগদ্বন্ধুর দর্শন আবার বৃন্দাবনধামে পাওয়া যায়।

ভক্তপ্রবর বনমালী রায় একসময়ে শ্রীকুণ্ড তীরে তাঁহার আরাধ্য বিগ্রহ বিনোদিয়ার কুঞ্জ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। নিকটেই বনখণ্ডী মহাদেবের মন্দির। এখানকার এক মাটির গোফায় জগদ্বন্ধুও আশ্রয় নেন। শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা করিতে আসিয়া বনমালী রায় রোজ এই গোফার দ্বারে অপেক্ষা করিতেন, তারপর প্রভুর অমৃতময় উপদেশ শুনিয়া কুঞ্জে ফিরিতেন।

একদিন প্রভু তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন আগামীকাল মধ্যাহ্নে একটি মহাপুরুষ দেহরক্ষা করবেন। এজন্য প্রাতঃকাল থেকে তাঁকে ঘিরে সংকীর্তনের ব্যবস্থা করুন।" সেই মহাপুরুষের পরিচয় ও ঠিকানা কি, জিজ্ঞাসা করা হইলে এক বিশাল তেঁতুল গাছ দেখাইয়া প্রভু কহিলেন, "ইনিই সেই মহাপুরুষ।"

প্রভুর বাক্য বনমালীবাবু অভ্রান্ত বলিয়া মানিতেন। তাছাড়া ভক্ত বৈষ্ণব হিসেবে তাঁহার নিজেরও বিশ্বাস ছিল, বৃন্দাবনধামের অপ্রাকৃত লীলা দর্শনের লোভে বহুতর মহাপুরুষ ব্রজভূমিতে গোপনভাবে অবস্থান করেন। প্রভুর কথামতো ঐ বৃক্ষকে

ঘিবিযা অষ্টপ্রহব সাডম্ববে নামকীর্তনেব ব্যবস্থা হয। পবদিন মধ্যাহ্নে কিন্তু সত্যই দেখা গেল, ঝড়বৃষ্টি কোথাও কিছু নাই, বৈষ্ণবদেব কীর্তন ও পবিক্রমাব মধ্যে বৃক্ষটি হঠাৎ মডমড শব্দে ভাঙিযা পডিল।

জগদ্বন্ধু মৌনী হইযা গোফায ও কুঞ্জে বাস কবেন, আব ব্রজধামেব মন্দিবে মন্দিবে স্বচ্ছন্দে ঘুবিযা বেডান। কাহাবো সহিত তাঁহাব বাক্যালাপ নাই। তাই বৃন্দাবনেব বৈষ্ণবদেব অনেকে এই সমযে তাঁহাকে বলিতেন 'মৌনী বাবা'।

বাধাবাণীব ভাবে ভাবিত প্রভু অধিকাংশ সময ঘোমটা দিযা থাকেন, তাই ব্রজমাঈগণ তাঁহাকে বঙ্গ কবিযা ডাকেন 'ঘুংঘটওযালী'।

'বৃক্ষ-মহাপুবুষেব' দেহত্যাগ সম্বন্ধে প্রভু যে ভবিষ্যদ্বাণী কবেন তাহাতে এ সমযে এ অঞ্চলে তিনি সুপবিচিত হইযা উঠেন।

সেবাব বৃন্দাবনেব কুসুম সবোববতীবে এক মৃত্তিকা কুটিবে তিনি অবস্থান কবিতেছেন। মথুবাব ডাক্তাব প্রমথনাথ সান্যাল কযেকজন দর্শনার্থীসহ 'জয বাধে' বলিযা উপস্থিত হইলেন।

দ্বাব খুলিতেই দেখা গেল, জগদ্বন্ধু দিব্য মহিমায দণ্ডাযমান, আব পশ্চাতে মাটিব দেওযালেব গর্ত হইতে এক বিষধব সর্প বাব বাব ফণা উত্তোলন কবিতেছে। ভীত আগন্তুকেবা ঐ সাপটিব দিকে প্রভুব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিলে তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ওখানে যে উনি আছেন, আমি তা আগে থেকেই জানি। আমি যে ওঁব অতিথি। আব উনি অতিথিব তো কোনো অনিষ্ট কববেন না।"

দর্শনার্থীদেব ভয কিন্তু কিছুতেই দূব হয না। অবশেষে প্রভু বলিলেন, "উনি কিন্তু সত্যিই এক পবম ভক্ত। তবে ওঁব সম্বন্ধে আপনাদের ভয় যদি না-ই যায, তবে আপনাদেব আব উদ্বেগ না দিযে নিজেই অন্যত্র সবে যাবেন।" সাপটিকে ইহাব পব আব সেই কুটিবে কখনো দেখা যায নাই।

এই সমযে প্রভু জগদ্বন্ধুব প্রেবণা ভক্ত বনমালী বাযেব জীবনে কল্যাণকব হইযা উঠে —বৈষ্ণবধর্মেব প্রচাব ও প্রসাবও বৃদ্ধি পায। বৃন্দাবনেব কুঞ্জমন্দিব সংস্কাব, বৈষ্ণব বিদ্যালয স্থাপন প্রভৃতিব সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেব দিকে দিকে নামকীর্তনেব আন্দোলন দেখা যায।

বৈষ্ণব গ্রন্থবাজী এই সমযে দুষ্প্রাপ্য ছিল। বটতলাব ছাপানো পুস্তকেব মর্যাদা শিক্ষিতদেব মধ্যে তখন নাই বলিলেই চলে। বনমালী বাযকে উৎসাহিত কবিযা প্রভু বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রকাশেব ব্যবস্থা কবিযাছেন। তিনি বলিতেন, গুবু-অভিপ্রেত কার্যকেই বলে গুবুদীক্ষা, আব এ দীক্ষাই বনমালী বাযকে তিনি দিযাছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশনাব মধ্য দিযা বৈষ্ণবসমাজেব মঙ্গল সাধিত হয।

নিতান্ত তবুণ বযসে জগদ্বন্ধু ব্রজেব প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজীদেব স্বীকৃতি প্রাপ্ত হন, এ স্বীকৃতি অবশ্যই তাঁহাব প্রেমশক্তিব এক বিস্মযকব নিদর্শন। মাধবদাস ও মনোহবদাস বাবাজী জগদ্বন্ধুব সহিত সদাই অন্তবঙ্গ সুহৃদেব মতন ব্যবহাব কবিতেন। সিদ্ধবাবা নিত্যানন্দদাস বাবাজীব স্নেহধন্য শিষ্য, সদা ভজনশীল জগদীশবাবাব বৃন্দাবনে তখন খুব সুখ্যাতি। প্রভু প্রাযই এই সাধককে দর্শন দিতেন। আব জগদীশবাবা তাঁহাকে দেখিলেই বলিতেন, "প্রভু! বড আশ্চর্যেব কথা, আপনি কাছে এলে আমাব নাম স্মবণ মনন থাকে না। আপনাব ভেতবে যেন কি এক অলৌকিক শক্তি বযেছে, যা আমাব ভজন-কীর্তন সব

ভুলিয়ে দেয়।” রহস্যাবৃত ‘ঘুংঘটওয়ালী’ এই ধরনের উক্তি শুনিয়া নীরব হাস্যে সরিয়া পড়িতেন।

শ্যামদাস বৃন্দাবনের এক তীব্র বৈরাগ্যবান্ বৈষ্ণব সাধক। জগদ্বন্ধুর সহিত তাঁহার স্বল্পমাত্র কিছুটা পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। প্রভু একসময়ে মৌনী কিন্তু কোথাও স্থির হইয়া থাকেন না—স্বেচ্ছামতো কখন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যান, কেহই জানিতে পারে না। একদিন প্রভাতে বৃন্দাবনের এক বনের ধারে শ্যামদাস মাধুকরী করিতে গিয়াছেন। দূর হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, একদল গাভী একত্র হইয়া পরম আনন্দে কি যেন লেহন করিতেছে। অগ্রসর হইয়া শ্যামদাসের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন, এক কনককান্তি দীর্ঘ পুরুষ ভূতলে শায়িত, আর গাভীরা নাক দিয়া তাঁহার দেহসৌরভ গ্রহণ করিতেছে—মধ্যে মধ্যে চালিতেছে সস্নেহ অবহেলন। “গোবিন্দ গোবিন্দ” উচ্চারণ করিয়া এসময়ে ঐ সাধক পুরুষটি পুলকাঞ্চিত কলেবরে তাহাদের স্নেহ ও আদর উপভোগ করিতেছেন।

নিকটে গিয়া শ্যামদাস চিনিলেন তিনি প্রভু জগদ্বন্ধু। শ্যামদাসের ভজনকুটিরে প্রভু কিছুদিন অবস্থান গ্রহণ করেন এবং নানা অলৌকিক বিভূতির পরিচয় দেন।

একদিন প্রভু গোফার মধ্যে নিভৃতে বসিয়া আছেন, নিকটে কেহ কোথাও নাই। শ্যামদাস দেখেন, কোথা হইতে যেন চন্দনচর্চিত তুলসীপত্রের গুচ্ছ বার বার টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া তাঁহার কুটিরের অঙ্গনে পতিত হইতেছে। বুঝিলেন, ইহা প্রভুরই এক খেলা।

আর একদিনের কথা। প্রভু কুসুম সরোবরে স্নান করিতেছেন। নিকটে দাঁড়াইয়া শ্যামদাস দেখিলেন সরোবরের জলে স্নানরত প্রভু অলৌকিকভাবে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন, আর তাঁহার স্থলে ছুটাছুটি করিতেছে এক লীলাচঞ্চল বালক। আবার গোফার নিকটে আসিতেই সে মূর্তি কোথায় অপসৃত হইয়া গেল। সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, শাল্মলী বৃক্ষের মত দীর্ঘ—জ্যোতির্ময় এক মূর্তি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

গোফায় প্রবেশ করার পর শ্যামদাস সোৎসাহে বলিলেন, “প্রভু, আজ আপনার স্বরূপ দর্শন করেছি।” তিনি উত্তর দিলেন, “ওকে কি স্বরূপ বলে রে? ও কিছুই না। ও দেহটাকে ইচ্ছেমতো বড় করা যায়, ছোটও করা যায়।”

প্রভু জগদ্বন্ধু ফরিদপুরে স্থায়িভাবে বাস করিতে চাহেন, ইহা শুনিয়া বৃন্দাবনের এক প্রধান বৈষ্ণব তাঁহাকে বলেন, “প্রভু, ফরিদপুর কি আপনার উপযুক্ত ভজনস্থান? এই ব্রজভূমিতে যমুনাতীরেই আমরা আপনাকে এক ভজনমন্দির নির্মাণ ক'রে দিচ্ছি। আপনি এখানেই বাস করুন।” শুনিয়া প্রভু সেদিন কি জানি কেন বলিয়া উঠিলেন, “ওরে জানিস! যদি কোনো দিন পৃথিবী প্রলয়ের জলে ডুবে যায়, সেদিনও ফরিদপুরে থাকবে হাঁটুজল। ফরিদপুরকে এবার যে আমি এই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানে পরিণত করবো।”

শিতিকণ্ঠ পণ্ডিত নবদ্বীপের এক বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ বংশের সন্তান। ভক্ত ও মনীষী ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তাঁহার পিতামহ, আর গৌরগতপ্রাণ পরমবৈষ্ণব দীননাথ পদরত্ন তাঁহার পিতা। ইঁহাদের গৃহেই নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ‘হরিসভা’ অনুষ্ঠিত হয়। নটবর গৌরাঙ্গ বিগ্রহ এখানে স্থাপিত রহিয়াছেন। শিতিকণ্ঠ একধারে প্রেমিক সাধক এবং ভক্ত বংশের উপযুক্ত ধারক ও বাহক। লীলাময় গোরাচাঁদের মধুময় মূর্তি দীর্ঘকাল তিনি ভজনা করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু তাহার অন্তরের পিপাসা ও খেদ তো কিছুতেই

মিটিতেছে না। প্রত্যক্ষ দর্শনাদি তাঁহার কোথায় ? লীলামাধুর্য ভুঞ্জনের সৌভাগ্যই বা হইতেছে কই ?

সেদিন নিভৃতে পদচারণা করিতে করিতে তিনি নবদ্বীপের এক প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্মশানভূমির কাছেই একটি ছোট জঙ্গল। ইহার আড়ালে পণ্ডিত এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সুধাস্নিগ্ধ এক জ্যোতির্মণ্ডল সেখানে বিরাজিত।

পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটিয়া গেলেন। নিকটে যাওয়ার পর তাঁহার বিস্ময় আরো বাড়িয়া গেল। দেখিলেন, অপরূপ লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত এক মহাপুরুষ দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহের অলৌকিক দ্যুতি, আর দিব্য সৌগন্ধ এই স্থানটির চারিদিকে বিস্তারিত।

পণ্ডিতের সর্ব মন প্রাণ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—ইনিই সেই মহাপুরুষ, যাঁহার জন্য দিনের পর দিন তিনি আকুল হইয়াছেন।

মহাপুরুষ যেন তাঁহার চির পরিচিত। মধুর কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, "শিতিকণ্ঠ" চির অনুগত ভক্তের মতো শিতিকণ্ঠ উত্তর দিলেন—"প্রভু।"

প্রভুর পরিচয় জানিয়া পণ্ডিতের আনন্দ আর ধরে না। ঘরে ফিরিয়া তখনই পিতার কাছে ছুটিয়া গেলেন। পিতা দীননাথ পদবন্ন বৃদ্ধ হইয়াছেন, একান্তে ভজনসাধন নিয়াই ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু 'জগদ্বন্ধু' নামটি শুনিয়াই বৃদ্ধের সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া গেল, পুলকাঞ্চিত দেহে সজল চক্ষে পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিয়া বসিলেন, প্রভু যে এ গৃহে আসিবেন তাহা তিনি পূর্বেই জানিতেন। রাগানুগা ভক্তির সিদ্ধ সাধক, তাঁহার গুরু নেহালদাস বাবাজী বহু দিন আগে বলিয়া যান—তাঁহাদের গৃহের এই নামকীর্তন ঝঙ্কৃত হরিসভায় এক মহাপ্রেমিক পুরুষ পদার্পণ করিবেন—ঘটিবে পরম সৌভাগ্যোদয়। শিতিকণ্ঠ উত্তরকালে প্রভুর সেদিনকার দিব্য মূর্তি দর্শন সম্বন্ধে বলিতেন, "এক দর্শনেই সব।"

জগদ্বন্ধুর আবির্ভাবের পর শিতিকণ্ঠের হরিসভার কীর্তনানন্দ ও হরিকথার স্রোত অবিরল ধারায় বহিয়া যাইতে থাকে। এই চিহ্নিত স্থানটিকে কেন্দ্র করিয়াই প্রভু নবদ্বীপধামের বহু ভক্ত ও বৈষ্ণবকে প্রেমসাধন প্রদান করেন। ইঁহাদের মধ্যে সাধন-সামর্থ্যের দিক দিয়া রাইমাতার নাম অগ্রগণ্য। রাই উন্মাদিনীভাবে এই প্রবীণা সাধিকা সদা বিভোর থাকিতেন। কীর্তন ও কৃষ্ণনাম শ্রবণে তাঁহার দেহে সাত্ত্বিক বিকার ফুটিয়া উঠিত, এ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া যাইতেন। ইঁহার সেবা ও ভজননিষ্ঠা ছিল অসামান্য। প্রভু জগদ্বন্ধু নবদ্বীপ হইতে বহুদূরে থাকিয়াও মাঝে মাঝে অপ্রাকৃত দর্শন দিয়া ইঁহাকে ধন্য করিতেন।

নবদ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গন ঘাটে প্রভু সেদিন সন্ধ্যাকালে স্নানে নামিয়েছেন। কি এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে রহিয়াছেন ভক্ত নবদ্বীপদাস। তাহাকে ডাকিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "নবদ্বীপ, তুই শিগ্‌গীর বড়াল-ঘাটে ছুটে যা। সেখানে এক পরমভক্ত বৈষ্ণব গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। তাঁর নাম বালকৃষ্ণ। তাঁকে ডেকে বলবি এভাবে জীবন নাশ করতে আমি নিষেধ করছি।"

নবদ্বীপদাস তখনি ছুটিতে ছুটিতে বড়াল-ঘাটে গিয়া উপস্থিত। চন্দ্রালোকে দূর হইতে দেখিলেন, এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে নামিয়া চলিয়াছেন। উচ্চস্বরে

হাঁক দিলেন, “বালকৃষ্ণ। বালকৃষ্ণ! ফিরে আসুন, প্রভু আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন।”

প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প বৈষ্ণব সবিস্ময়ে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তীরে ফিরিয়া আসিয়া নবদ্বীপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি ভাই? আমার নাম কি ক'রে জানলে? আমার আত্মহত্যার গোপন সংকল্পই বা কে তোমার কাছে প্রকাশ করলো?”

নবদ্বীপদাস সবিনয়ে জানাইলেন, এ সব ব্যাপারের তিনি কিছুই জানেন না। তাঁহার প্রভু জগদ্বন্ধু সর্বজ্ঞ—শুধু তাঁহার আদেশেই তিনি এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

বালকৃষ্ণ উন্নত স্তরের সাধক। প্রেমসাধনার মধ্য দিয়া আনন্দ ও বিষাদের তীব্র জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়া যায়—তাঁহারই এক ভাঁটার টানে ক্লিষ্ট হইয়া তিনি দেহ বিসর্জন দিতে যাইতেছিলেন। জগদ্বন্ধু আজ অলৌকিকভাবে তাঁহার প্রাণ বাঁচাইলেন।

বালকৃষ্ণ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। গোস্বামীজীর মুখে এবং হুগলীর অন্নদা দত্তের নিকট ইতিপূর্বে তিনি জগদ্বন্ধুর মহিমা শুনিয়াছেন। আজ হইতে প্রভুর পদে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিত এই বৈষ্ণবসাধক উত্তরকালে ‘ব্রজবালা’ নামে পরিচিত হইয়া উঠেন।

ফরিদপুরকে কেন্দ্র করিয়া জগদ্বন্ধু তাঁহার মহানাম ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন, পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে ধীরে ধীরে তাঁহার নামকীর্তনের মঙ্গল-বীজ প্রবিষ্ট হইতেছে। পরিকরগণসহ সেদিন তিনি কীর্তন-নর্তনে বহির্গত হন, চারিদিকে সেদিন পরম আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। একদিকে আশা-শোটা ও চামর-ব্যজনের সমারোহ, অপরদিকে অগণিত মাদল-করতাল ও কাঁসর-ঝাঁঝের আনন্দমুখরতা। সর্বত্র এক অপূর্ব উৎসবের পরিবেশ।

এমনই এক উৎসবের শুভদিনে বালক রাধিকা গুপ্ত প্রভুর দর্শন পান, প্রভুও তাঁহাকে তখনি আত্মসাৎ করিয়া নেন। রাধিকা নামটি জগদ্বন্ধুর মুখে উচ্চারিত হইতে চাহে না, তাই ‘শারিকা’ বলিয়াই তাঁহাকে তিনি ডাকেন। প্রভুর নিকটে থাকিয়া আচারনিষ্ঠা, কীর্তন ও নামজপের মধ্য দিয়া বালকের জীবন রূপান্তরিত হইতে থাকে। নতুন নামকরণ হয় রামদাস। ইনিই উত্তরকালের খ্যাতনামা বৈষ্ণব আচার্য, নামকীর্তনের মহাচারণ—রামদাস বাবাজী।

অতি অল্প বয়সে রামদাস সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর নির্দেশে তাঁহাকে বৃন্দাবনে রওনা হইতে হইল। রামদাসের বয়স এ সময়ে মাত্র পনের বৎসর। প্রভু বৃন্দাবনধামে গিয়া এবার প্রায় তিন মাস বাস করেন। এ সময়ে রামদাসের জীবনে ব্রজের ভজন তিনি ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিতে থাকেন। রামদাসের ধুতি বস্ত্রটি একদিন ছিঁড়িয়া প্রভু তাহা দিয়া কৌপীন ও বহির্বাস তৈয়ার করাইয়া দেন—তাঁহাকে বলেন, “ওরে ব্রজে থাকবি ভক্ত বৈষ্ণবের বেশ না হলে কি মানায়?”

জগদ্বন্ধু সেদিন গোবিন্দজীর দর্শনে চলিয়াছেন। কখন কি ভাবাবেশ আসিয়া পড়ে তাহার কোনো ঠিক নাই। তাই রামদাসকে নির্দেশ দিয়া রাখেন, “শারিরা, সর্বদা প্রখর দৃষ্টি রাখবি, দেখবি, আমার শরীরে যেন প্রকৃতি-স্পর্শ না লাগে।’ সেদিন ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ এক স্ত্রীলোকের ছোঁয়া প্রভুর দেহে লাগিয়া গেল। রামদাস উন্মনস্ক ছিলেন, তাই চকিতে উহা সংঘটিত হইয়াছে। এ স্পর্শ এক মহা অনর্থ সৃষ্টি করিয়া বসিল। জগদ্বন্ধু আর্তস্বরে—“জ্বলে গেল, জ্বলে গেল’ বলিয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন।

বামদাস তো এক অপবাধীব মতো দাঁডাইযা আছেন। দীর্ঘ সময পবে ব্রজেব বজে বাব বাব গডাগডি দিযা তবে সেদিন প্রভুব জ্বালা কমে, তিনি শান্ত হন। বৈবাগ্যবান্ পুরুষেব পক্ষে প্রকৃতি-স্পর্শ কত গ্লানিকব তাহাবই চিত্রটি কি বামদাসেব অন্তবে তিনি এভাবে আঁকিযা দিলেন ?

সেদিন প্রভু একটি অপূর্ব কীর্তন বচনা কবিযাছেন। বামদাসকে আদেশ কবিলেন, তখনই ভক্তপ্রবব বনমালীবাবুব কুঞ্জে গিযা শ্রীবিনোদ বিগ্রহকে ঐ কীর্তন গান শুনাইযা আসিতে হইবে। আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হইল।

ফিবিবাব সময বনমালীবাবুব স্ত্রী প্রভুব জন্য গোবিন্দজীব এক হাঁডি প্রসাদ দিযা দিলেন। অন্তঃপুরের এক পবিচাবিকা এই ভাণ্ডটি আনিযা শ্রদ্ধাভবে বামদাসেব হস্তে অর্পণ কবিল।

প্রসাদ নিযা তিনি সবেমাত্র কুঞ্জে ফিবিযা আসিযাছেন। প্রভু মহাক্রুদ্ধ হইযা কহিতে লাগিলেন, "সেকি বে! তুই এভাবে প্রকৃতি স্পর্শ কবলি ? আমাব শপথ, এবূপ কাজ আব কখন কবিস নে।"

দণ্ডবৎ কবিযা প্রসাদেব হাঁডিটি প্রভু যমুনায ভাসাইযা দিলেন। নাবী সংস্রব হইতে নূতন সাধকদেব এমনই সতর্ক নিষ্ঠায তিনি বক্ষা কবিযা চলিতেন।

বৃন্দাবনে থাকাকালে জগদ্বন্ধু তাঁহাব মহানাম কীর্তনেব অন্যতম ধাবক বাহকেব সন্ধান প্রাপ্ত হন। মৃদঙ্গ বাদনে এবং নামকীর্তনে এ ভক্তটিব প্রতিভাব স্ফুবণ হইবে, প্রভু তাহা একবাব দেখিযাই বুঝিয়াছিলেন। তাই বৈষ্ণবীয সাধনভজন দান কবিযা ইঁহাকে ধীবে ধীবে আত্মসাৎ কবিযা নেন। এ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি উত্তবকালেব অদ্বিতীয মৃদঙ্গবাদক নবদ্বীপদাস ব্রজবাসী। গবানহাটী সঙ্গীত পদ্ধতি আযত্ত কবিতেও এ ভক্তটি অপূর্ব প্রতিভাব পবিচয দেন। কলিকাতাব বৈষ্ণবসমাজে নবদ্বীপদাস ব্রজবাসীব কীর্তন-শিক্ষণ উত্তব-কালে সুফল আনযন কবে। এই প্রবীণ ভক্ত চিবকাল প্রভুব কৃপাব কথা পুলকাঞ্চিত দেহে স্বীকাব কবিতেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু এবাব বাংলায ফিবিবেন। বামদাসকে তিনি কিন্তু বৃন্দাবনধামে থাকিযা আবও কিছুকাল সাধনভজন কবিতে আদেশ দিলেন। বামদাস প্রভুব পাদপদ্মে জীবন সমর্পণ কবিযাছেন, ছাযাব মত দিন বাত তাঁহাকে অনুসবণ কবিযা আশ মিটে না, সেবাব লোভও ছাডিতে পাবেন না। তাই, বৃন্দাবনে থাকিতে তিনি বাজী নন।

প্রভু বুঝাইতে লাগিলেন, "ওবে, তুই এখানেই থাক্।—বৃন্দাবনে থাকা যে মহা-ভাগ্যেব কথা। তোব মঙ্গল হবে।" অবশেষে বামদাস একথা মানিযা নিলেন, বৃন্দাবনেই তিনি থাকিবেন।

প্রভু এবাব হাসিযা বলিলেন, "ছিঃ! চাঁদে কলঙ্ক হলো।"

অর্থাৎ বামদাসকে বুঝাইযা দিলেন, নির্বিচাবে প্রভু-বাক্য পালন কবাই যেখানে কর্তব্য, সেখানে নিজ মতকে প্রাধান্য দিবাব এ অপচেষ্টা কেন ? এ যে তাঁহাব পবিত্র চবিত্রে কলঙ্ক বিশেষ।

ব্রজধাম ছাডাব আগে বামদাসকে তিনি বলিযা গেলেন—'নিত্য লক্ষ নাম কববে ও মাধুকবী কববে। আমার হস্তাক্ষব ছাডা কিছু পডবে না। অন্যেব চিঠি গেলে, যমুনায ভাসিযে দেবে।"

বৃন্দাবনে বামদাসকে এ সময়ে তিনি লীলা-বিলাসেব কিছু কিছু পদবচনা কবিযা

পাঠান। শুধু যে ভাব ও ভাষাব লালিত্যে এই পদগুলি সমৃদ্ধ তাহাই নয়, প্রভু জগদ্বন্ধুব জীবনদর্শনেব ইঙ্গিতও এগুলিতে নিহিত বহিযাছে। একটি পদে আছে[১] :

এ কি নব বঙ্গ হেব সখীগণ,
শ্যাম অঙ্গে বাই বেখেছে চবণ,
মবি কিবা শোভা হয়েছে এখন,
হেমলতা যেন তমালে বেড়িল।
ধীবে কথা কও সকল সজনী,
যেন না জাগেন কমলিনী ধনী,
জাগিলে চবণ ঘুচাবে অমনি,
চল যাই নিশি অধিক হইল।
সহ সহচবা কবিল গমন,
নিজ নিজ কুঞ্জে কবিল শযন,
নিঃশব্দ নিবিড় নিকুঞ্জ কানন,
দ্বাবে জগদ্বন্ধু কোটাল বহিল।

বামদাসেব জীবনে এই অপূর্ব পদগুলি দিব্য অমৃতেব ধাবা উৎসাবিত কবিযা দেয়। বাগানুগা ভজনেব পথে ধীবে ধীবে তিনি অগ্রসব হইতে থাকেন।

ইহাব পর জগদ্বন্ধু বামদাসকে কলিকাতায ডাকাইযা আনেন। তবুণ ভক্তেব হৃদযে তখন যুগল কিশোবেব প্রেম-লীলাব ধাবা বহিতেছে। কুঞ্জভঙ্গেব গান গাহিতে গেলে তিনি কাঁদিযা অস্থিব হন, আসব ত্যাগ কবিযা যান। জগদ্বন্ধু তাঁহাব এই অবস্থা দেখিযা বলিতেন, “বামী পাগল হযেছে।”

একদিন কীর্তনের সময তীব্র ভাবাবেশে বামদাস অধীব হন, গানেব খাতাটি প্রভুব আসনেব উপব নিক্ষেপ কবিযা কাঁদিতে থাকেন। জগদ্বন্ধু সতর্ক দৃষ্টিতে সব কিছু দেখিলেন।

ভক্ত শান্ত হইলে তাঁহাকে ডাকিযা স্নিগ্ধ মধুব কণ্ঠে বলিলেন, “বামী, খাতাটি যে এভাবে ছুঁড়ে মাবলি, লাগলো কাব ? নামবূপে নামী এব ভেতব বিবাজ কবছেন না কি ?” বামদাস লজ্জিত অধোবদন হইযা চুপ কবিযা বহিলেন।

ভাবাবেগে উচ্ছল ভক্তদেব কোনো বকম অসংযম, কথায অথবা আচবণে জগদ্বন্ধুব সদা সজাগ দৃষ্টিকে এড়াইতে পাবিত না।

বামদাস একদিন সমাদব কবিযা প্রভুকে ‘গৌব-গবীবনী’ বলিযা সম্বোধন করিয়াছিলেন। শুনিযা তিনি চুপ কবিযা বহিলেন, পবে অপব এক ভক্তকে ডাকিযা দৃঢ় স্ববে কহিলেন, “দ্যাখ্, বামদাসকে নিষেধ ক’বে দিস্—ও যেন কখনো আমাকে প্রকৃতি জ্ঞানে সম্বোধনই না করে। আমিই একমাত্র পুবুষ এটা তোবা মনে বাখ্‌বি। পুবুষকে প্রকৃতি বলে সম্বোধন কবলে অপমান কবা হয়।”

বামদাস একবাব স্থাযিভাবে বৃন্দাবন বাসেব সঙ্কল্প কবিতেছিলেন, প্রভু তাঁহাকে নিরস্ত কবিলেন। কহিলেন, “কি বৃন্দাবন বৃন্দাবন কবিস্। কোনো জিনিস কেউ শুধু নিজে খেলে লোকে বলে স্বার্থপব। পাঁচজনকে খাইয়ে যে খায, সেই তো প্রকৃত মানুষ বে!

---

১ শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তবঙ্গিণী : গোপীবন্ধু ব্রহ্মচাবী

এযুগে হরিনামেই জগতের উপকার। জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সদা নিতাই গৌরাঙ্গের নাম প্রচার কর্‌বি—এই যে তোর কাজ।"

প্রভুর নির্দেশে উত্তরকালে রামদাস নবদ্বীপে বড়বাবাজী, রাধারমণ চরণদাসজীর আশ্রয় নিয়াছিলেন। কিন্তু আদিষ্ট নামপ্রচারের চারণব্রত কোনোদিনই ত্যাগ করেন নাই।

জয়-নিতাই জগদ্বন্ধুর এক বিশিষ্ট ভক্ত। "নিতাইর কি মহিমা, নিতাইর কি মহিমা" বলিয়া তিনি একদিন ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "সে কি গো। নিতাইর মহিমা বলতে নেই। মহিমার সাথে ঐশ্বর্যের কথাও যে এসে পড়ে। বলতে হয়—নিতাইর কি মাধুরী।" জয়-নিতাইর ধারণা ছিল, নিতাই-তত্ত্ব তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রভুর এ সংশোধন-বাক্যে তাঁহার সে গর্ব চূর্ণ হইয়া গেল। তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য এবং বাক্য-সংযমের দিকেই প্রভু সেদিন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিলেন।

সেবার এক ভক্তের মনে ব্রজরস-সাধন ও রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। গোপীভাবের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া তিনি জগদ্বন্ধুকে প্রশ্ন করেন। প্রভু সামান্য কয়েকটি কথায় তাঁহার হৃদয়ের সংশয় কিছুটা মিটাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, "ওরে, সে যে অপ্রাকৃত ভাবমাধুর্য। তুই এই তত্ত্ব সহজে বুঝতে পারবিনে, সময়ে বুঝবি। গোপীভাবের একটু আভাস না পেতেই বিদ্যাপতির ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে গিয়েছিল। এখন তোকে সে তত্ত্ব বললে তুই ধারণা করতে পারবি কেন ? ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে মারা যাবি। নাম ক'রে যা, সময়ে সব বুঝতে পারবি।"

এক ভক্ত মাঝে মাঝেই প্রেমাবেশে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিতেছেন, "হরি হে প্রাণ বল্লভ।" প্রভু তাঁহার ভাবময়তা দুই একবার লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, "প্রেমের কথা, প্রাণবল্লভের কথা তো প্রাণের গোপন কথা রে। প্রাণের ভেতরে তা আঁকড়ে ধরে রাখতে হয়, এসব চেঁচিয়ে বলতে নেই।" ভক্তটি বড়ই লজ্জিত হইলেন। প্রভুর সতর্ক দৃষ্টি এমনি করিয়া আশ্রিতদের ঘিরিয়া রাখিত।

কলিকাতায় রামবাগানে ডোমপল্লীতে জগদ্বন্ধু একদিন বসিয়া আছেন। চম্পটি ঠাকুর সবেমাত্র নিত্য টহল হইতে ফিরিলেন, সেদিন তিনি বড় উত্তেজিত। হরিনাম শুনিয়া লোকে উপহাস করে তাই খুব চটিয়া গিয়াছেন। জগদ্বন্ধুর সম্মুখে ঝোলা ও করতাল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "নাও। এই রইলো তোমার ঝোলা আর করতাল। আমার দ্বারা আর তোমার নাম প্রচারের কাজ হবে না। শেয়াল কুকুরের মতো মানুষগুলো কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। হরিনামে লোকের বিশ্বাস ভক্তি তো এতটুকু দেখতে পাই নে। তুমি এত বড় প্রভু, কিন্তু তুমি আজ অবধি করলে কি ? কেউ তোমায় চিনলো না।"

জগদ্বন্ধু নিঃশব্দে বসিয়া সব শুনিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে শান্ত আত্মপ্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ওরে অতুল। সময়—সময়—সময়। দেখছিস্ না, এমন যে দুর্জয় ইংরেজ রাজত্ব, তাও দিনে দিনে আজ কেমন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একটা গাছ যখন বাড়ে তখন কি তোরা বুঝতে পারিস, কতটুকু বাড়ছে। তবে দশ বিশ দিন পরে কতটা বেড়েছে

তা বোঝা যায়। আমার ধর্ম ও কর্ম ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য, তোরা কতটুকু বুঝবি ? অনন পাগলামি করতে নেই। শান্তভাবে হরিনাম করতে থাক্। এটা প্রলয় কাল—নাম-কীর্তনই সত্য। এ যুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। কেউ হরিনাম করুক, আর না করুক, তাতে তোর কিছু আসে যায় না। তুই নির্বিচারে হরিনাম করে বেড়াবি। সবাই ভেতরে ভেতরে হরিনামের ভিখারী সেজে বসে আছে—দেখবি শিগ্‌গির স্থান বিশেষে মহাশক্তির প্রকাশ হবে।”

দম্পতির অন্তরের সমস্ত দুঃখ ও তাপ এতক্ষণে খানিকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু! তবে বলুন, কোথায় এই বিশেষ প্রকাশটি হবে ?” জগদ্বন্ধু গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে উত্তর দিলেন, “তোদের এই কলকাতায়।”

শিশিরকুমার ঘোষ প্রায়ই জগদ্বন্ধুর চরণ দর্শনে আসিতেন। প্রভু তাঁহাকে বলিতেন, “ওগো, প্রলয়—নামের অভাব—কেবল হরিনাম কর, হরিনাম কর ইহাই যে ধর্ম।”

কখনো প্রেমাবেশে মত্ত থাকিয়া কখনো অর্ধবাহ্য অবস্থায় প্রভু এই পাপময় কলি-যুগের মহতী বিনষ্টি ও মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নানা উপদেশ, লেখা ও সঙ্গীতের পদে রহিয়াছে আসন্ন সৃষ্টির ধ্বংসের ভবিষ্যবাণী। মহানাম প্রচারের মধ্য দিয়া প্রলয়ের বুকে আবার নব সৃষ্টির উন্মেষ ঘটিবে, কলিযুগের অবসানে সত্য-যুগের অনুত্তর জীবন-জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে একথা তিনি নানাভাবে বার বার বলিয়া গিয়াছেন।

স্বরচিত সঙ্গীতে তিনি গাহিয়াছেন—

হরিনাম লও ভাই,
আর অন্য গতি নাই,
হের প্রলয় এল প্রায়।
(যদি সৃষ্টি রাখ ভাই
হরিনাম প্রচার কর)

সৃষ্টি রক্ষার নিগূঢ় মন্ত্রটি যে মহানামের মধ্যেই নিহিত এবং এই মহানাম অনিবার্যরূপে অবতরণ করিবে—এই কথাটি প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যাইত।

মানবপ্রেমিক প্রভু মানবের উদ্ধারের জন্য সেদিন সখেদে কহিয়া গিয়াছেন ‘আমি ঘরে ঘরে এত ক’রে সেধে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কেউ হরিনাম করলো না। দেখবে এমন একদিন আসবে, সেদিন কি ধনী কি নির্ধন, কি রাজা, কি সাধু কি অসাধু সকলেই একেবারে নামের জলে চোখের জলে এক হয়ে যাবে। তখন দায়ে পড়ে সকলেই হরিনাম করবে।”

আসন্ন মহাপ্রলয় সত্য যুগের আবির্ভাব প্রভৃতি উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ শক্তির অবতরণ সম্বন্ধেও কতকগুলি উক্তি তিনি করিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন—

‘যুগাবতার ছাড়াও শ্রীভগবান্ আসতে পারেন। যুগাবতারের ভগবান্ ও স্বয়ং ভগবানে কিছু পার্থক্য আছে। যুগাবতারে সম্পূর্ণ শক্তি প্রকাশ পায় না। এই শ্রীভগবান্ যুগাবতারে যে শক্তি নিয়ে আসেন, তা অপেক্ষা বেশী শক্তি নিয়ে এসে মহা-উদ্ধারণ কার্য করেন।... যুগাবতারের ভগবান্ আর স্বয়ং ভগবান্ একই জিনিস, তবে শক্তি প্রকাশে তারতম্য আছে। যখন স্বয়ং ভগবান্ আসেন তখন যুগাবতারের ভগবান্ তাঁতেই মিলিত হন। আর শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া ? তা শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে কি বুঝবে ?

এ যে তাঁর নিজের ইচ্ছা। যখন তাঁর আসবার প্রয়োজন হয় তখনই তিনি আসেন। লক্ষণে চিনবে। তিনি শক্তি প্রকাশ করলে ও জানালে, তবেই তো জগৎ জানতে পাবে।"

মহানাম অবতরণের কথা প্রভু বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানেই তিনি নিবৃত্ত হন নাই, দিকে দিকে ইহারই প্রস্তুতি সাধনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। প্রেমধর্ম ও নামকীর্তনের স্তিমিত ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে তিনি চেষ্টিত হন। শুধু তাঁহার দিব্য দেহের দর্শন স্পর্শন ও তাঁহার কীর্তন-লীলার অলৌকিক প্রভাবে অগণিত মানুষের হৃদয়ে ভক্তিরসের ঢল নামিতে থাকে।

ভক্ত ও মুমুক্ষুর দল তাঁহার আশ্রয় নিয়াছে বটে, কিন্তু প্রভু জগদ্বন্ধু কোনোদিন কাহাকেও দীক্ষা দান করেন নাই। ব্যবহারিকভাবে শিষ্য গ্রহণ করা তিনি পছন্দ করিতেন না। এবিষয়ে প্রশ্ন করিলে গম্ভীরভাবে উত্তর দিতেন 'মানুষ-গুরু মন্ত্র দেয় কানে জগৎগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।" আনুষ্ঠানিক মন্ত্রাদি দান না করিয়াও এই শক্তিধর প্রেমিক পুরুষ তাহার চরণতলে সমবেত বহু ভক্তের অধ্যাত্ম-জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

একবার প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে রওনা হইয়াছেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিয়া তিনি ভক্ত-প্রবর চম্পটি ঠাকুরকে টিকিট কাটিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। চম্পটি ঠাকুরের তো মহাবিপদ। তিনি অকিঞ্চন বৈষ্ণব, তাঁহার নিকট টাকা কোথায়? তাছাড়া সময় বেশী হাতে নাই। বিপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "প্রভু, এতরাত্রে টাকা কোথায় পাবো?"

জগদ্বন্ধু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ব্রজের পাথেয় যে গৌরভক্তই যোগাবে।" একথার উপর আর কিছু আলোকপাত করিলেন না, নিঃশব্দে স্টেশনে আপন মনে বসিয়া রহিলেন।

চম্পটি তো ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইতেছেন না। এখন কোথা হইতে কে তাঁহাকে টাকা দিবে? কে-ই বা সে গৌরভক্ত? প্রভু তো লোকটির ঠিকানা কিছুতেই বলিবেন না। তবে উপায়?

চম্পটি তাড়াতাড়ি স্টেশন হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। পরিচিত দুই একটি ভক্তের নিকট গিয়া কোনো ফল হইল না। ফিরিবার পথে বীডন স্কোয়ারের কাছে আসিয়া হঠাৎ তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে দেখিলেন, তিলক-কণ্ঠিধারী এক যুবক তাহার দোকান বন্ধ করিতে যাইতেছে।

চম্পটি ঠাকুর দ্রুতপদে এই ব্যবসায়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশ্ন করিলেন, "মশাই, আপনি কি গৌরভক্ত? সরলভাবে সত্বর একথার উত্তর দিন।" অপরিচিতের মুখে একি অদ্ভুত প্রশ্ন? দোকানের মালিক সবিনয়ে বলিলেন, "আজ্ঞে, এ অধম গৌরভক্তি না পেলেও গৌরভক্ত-রূপে পরিচিত বটে।" চম্পটি ঠাকুর তখন সব কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার প্রভু জগদ্বন্ধু আজ বৃন্দাবনে যাইবার জন্য স্টেশনে বসিয়া আছেন। টিকিট কেনার টাকা হাতে নাই। তাঁহাকে তিনি এই কথাটি শুধু বলিয়া দিয়াছেন,—কোনো গৌরভক্ত তাঁহার পাথেয় দিয়া দিবে। বৃন্দাবনের গাড়ি ছাড়িবার আর দেরি নাই। এখনই পঞ্চাশ টাকা আট আনা তাঁহাদের দরকার। কিন্তু এত টাকা দোকানের তহবিলে কোথায়? তরুণ ব্যবসায়ী মাথা নাড়িয়া তাই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।

চম্পটি বলিলেন, "মশাই, আপনি যদি প্রভু-কথিত ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয় আপনার দোকানে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রয়েছে। শিগ্‌গীর আপনি গুণে দেখুন।"

গণনার পরে দেখা গেল, সেদিনকার তহবিলে ঠিক ঐ টাকাই বাড়িয়াছে। দোকানী তো মহা বিস্মিত। প্রভু জগদ্বন্ধুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ভক্তিভরে তখনই সে টাকা দিয়া দিল। চম্পটি ঠাকুর ঊর্ধ্বশ্বাসে হাওড়া স্টেশনে ছুটিলেন। পাথেয় প্রদানকারী এই ব্যবসায়ীর নাম মুকুন্দ ঘোষ। এই ভক্তবৈষ্ণবটি কীর্তন ও মৃদঙ্গ বাদনে বেশ পারদর্শী ছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর অন্যতম পরিকররূপে ইনি পরবর্তীকালে নাম-প্রচারের সহায়ক হইয়া উঠেন।

ফরিদপুরের বুনো বাগ্‌দী ও কলিকাতার রামবাগানের ডোমদের রূপান্তরে জগদ্বন্ধুর করুণালীলার অপূর্ব পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কুখ্যাত রামবাগানের কয়েকটি পতিতার উদ্ধার সাধনের মধ্য দিয়াও তাঁহার পতিতপাবন রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সুরতকুমারীর নামে উল্লেখযোগ্য। এই ধনী পতিতা নারী তাহার একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া উঠে, অতঃপর তীর্থে তীর্থে শান্তির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

জগদ্বন্ধুকে সুরতকুমারী তখনও দর্শন করে নাই। শুধু তাঁহার লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়াই সে চরণতলে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছে। প্রভু প্রকৃতি সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিলেও কৃপাভরে এই পতিতা নারীর গৃহে উপস্থিত হন ও তাহার শিরে পদস্থাপন করেন, তাঁহার করুণাঘন মূর্তিটি সুরতকুমারীর অন্তরে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়। প্রভু এই পতিতার উদ্ধার সাধনের পর তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—সুরমাতা। এই আশ্রিতা ও রূপান্তরিতা ভক্তকে তিনি একবারের বেশী আর দর্শন দেন নাই।

সুরতকুমারীকে প্রভু যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার উপদিষ্ট সাধন-তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেন—

—শ্রীসুর, তোমার কারুণ্য-লিপি পাঠ করিলাম। সাক্ষাতাদি করা বৃষভানুনন্দিনীর নিষেধ। সাক্ষাৎ হইবে না। ত্রিস্নান করিও। নিত্য লক্ষ নাম করিও। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিও। প্রেম ভক্তি-চন্দ্রিকা মুখস্থ করিও। নিদ্রালস্য ত্যাগ করিও। পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যাদি ত্যাগ করিও। চক্ষু ও কর্ণের মনুষ্য বিষয় গ্রহণ করিও না। হবিষ্য করিও, লবণ সৈন্ধবাদি ত্যাগ করিও। হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও। স্বরূপ দামোদরে আত্মসমর্পণ করিও। গৌরগদাধর ধ্যান করিও। মিলনাদি স্মরণে আবিষ্ট হইও।—বন্ধু।

ইহার কিছুদিন পরে এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটিয়া যায় স্বেচ্ছাময় জগদ্বন্ধু ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন একাকী হুগলী শহরে উপস্থিত হন। তিনি সব সময়েই সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া চলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পুলিশের সন্দেহ হয়, তিনি হয়তো কোনো পলাতক আসামী। গ্রেপ্তার করার পর তদন্ত সাপেক্ষে তাঁহাকে আটক রাখা হয়।

কিন্তু এইখানেই মস্ত গোল বাধিল। আটক থাকিতে প্রভুর কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু কোনোমতেই থানায় ;বা কাহারো গৃহে থাকিতে তিনি রাজী নহেন। অবশ্য কোনো গোশালায় রাত্রিবাস করিতে তাঁহার আপত্তি নাই।

শহরের প্রান্তে হুগলীর নাজীরের এক ইষ্টক নির্মিত গোশালা আছে। নানা বিতর্কের পর বন্দীকে রাত্রির মতো সেখানেই তালাবন্ধ করিয়া রাখা হয়। এদিকে ধৃত হইবার পরই প্রভু এক ব্যক্তিকে দিয়া কলিকাতায় সুরমাতার নিকটে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দেন।

পরদিন কিন্তু তালা খুলিয়া দেখা গেল, বন্দী গোশালা হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। দরজার অর্গল ও তালা সবই ঠিকমতো রহিয়াছে, অথচ তিনি কি করিয়া বাহির হইয়া গেলেন ? এ বড় অদ্ভুত রহস্য।

এ ঘটনায় শহরে সেদিন চাঞ্চল্যের অবধি রহিল না। নাজীরের গোশালা হইতে বন্দী পালাইয়াছে, তাই তাঁহার আতঙ্কের অবধি নাই। অবশেষে চাকুরী নিয়া টানাটানি হইবে কিনা কে জানে ?

পরদিন সুরমাতা ও কয়েকজন ভক্ত হুগলীতে উপস্থিত হন। প্রভুর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে তাঁহারা সাক্ষ্য প্রমাণ দেন, নাজীরকেও বুঝান—ইনি এক শক্তিশালী মহাপুরুষ, সর্বদা স্বেচ্ছাময় হইয়া বিচরণ করেন, ইঁহার পলায়নের ফলে নাজীরমহাশয়ের কোনো ক্ষতি হইবে না। ঘটনাটি অতঃপর চাপা পড়িয়া যায়। পরবর্তীকালে হুগলীর এ ঘটনার উল্লেখ করা হইলে প্রভু ভক্তদের বলিয়াছেন, "ওরে, আমার এটা অপ্রাকৃত দেহ—এটা স্থান কালের অধীন নয়।"

ইতিমধ্যে ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে কীর্তন এবং নাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রভু এযাবৎ ভক্তদের আগ্রহে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, এবার তিনি ফরিদপুরে তাঁহার স্থায়ী অধিষ্ঠান-ভূমির সূচনা করিলেন।

সেদিন তিনি তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গসহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর একটি নির্দিষ্ট স্থানে চরণ স্থাপন করিয়া কহিলেন, "এইখানেই শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

জমির মালিক রামসুন্দর মুদীকে ডাকানো হইল। প্রভু তাহাকে কহিলেন, "আমি এখানে শ্রীঅঙ্গন করবো, এ জমিটা তুমি আমায় দাও।" প্রভুর এই প্রস্তাবে রামসুন্দর তখনি সম্মতি দিল।

জগদ্বন্ধুকে দর্শনের আশায় সহস্র সহস্র ভক্ত চারিদিক থেকে তখন সমবেত হইতেছে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গন ধীরে ধীরে প্রেমভক্তির কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। দলে দলে ছাত্রগণ এ সময়ে প্রভুর সান্নিধ্য লাভের আশায় ভিড় জমায়। তাঁহার দিব্য লাবণ্যময় রূপ, অপরূপ সুধাকণ্ঠ ও অঙ্গের অপার্থিব সৌগন্ধ এই তরুণদের প্রাণে এক অজানা আকর্ষণের সৃষ্টি করিতে থাকে। প্রভুর ভাবময় জীবনের অমৃত আস্বাদ পাইয়া, তাঁহার মহাজীবনের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহারা ধন্য হয়।

এই সব বালক ভক্ত কিন্তু জগদ্বন্ধুকে এক বিরাট মহাপুরুষ জ্ঞানে দূরে সরাইয়া রাখে নাই। প্রভুকে তাহারা বন্ধু বলিয়াই ডাকিত, কখনো বা 'হরিবোল' বলিয়াও অভিহিত করিত। তরুণ জীবনের নানা জটিল সমস্যা অকপটে এই বন্ধুর কাছে প্রকাশ করিতে তাহাদের কখনো দ্বিধা হইত না। তরুণ বন্ধুদের কল্যাণের জন্য প্রভুরও ব্যাকুলতার অন্ত নাই। তাহাদের ডাকাইয়া আনিয়া পরম আত্মীয়ের মতো তিনি নির্দেশাদি প্রদান করিতেন। কখনও বা তিনি অনুনয় করিয়া বলিতেন,—"হেলায়, শ্রদ্ধায় যে কোনো প্রকারে তোরা নাম কর। হরিনামের শক্তিতে অসাধ্য সাধন হয়। তোরা জানবি এটা ঘোর প্রলয়কাল। এ যুগে হরিনাম কীর্তন ছাড়া সৃষ্টি রক্ষার আর কোনো উপায় নেই। এবার মানুষ তো মানুষ, দেখবি, রাস্তার ইট পাটকেল পর্যন্ত হরিনামে মত্ত হয়ে যাবে। হরিনামে, হরিপ্রেমে ধরা টলমল ক'রে উঠবে।"

প্রভু জগদ্বন্ধু ঢাকা শহবে দুইবাব পদার্পণ কবেন। এখানকাব পাড়ায় পাড়ায় বাধা-কৃষ্ণেব যুগল বিগ্রহ সেবা অনুষ্ঠিত হয়, পূজা-উৎসবেব দিনে বৈষ্ণব নবশাখ সম্প্রদায়েব ভজন কীর্তনে নগব মুখবিত থাকে। ঢাকাব গৌবব বাড়াইয়া প্রভু এ শহবকে কহিতেন, হবিনামের ক্যাপিটাল বা বাজধানী। এখানে এক সময়ে তাঁহাব নানা অলৌকিক লীলা অনুষ্ঠিত হয়।

ডাঃ ঊষাবঞ্জন মজুমদাব একজন ব্রাহ্ম, ইনি মিটফোর্ড হাসপাতালেব অন্যতম চিকিৎসক। প্রভুর বৈষ্ণবীয় আচবণ সম্বন্ধে নানা কটাক্ষ ও বিদ্রূপ কবা ছিল তাঁহাব অভ্যাস। প্রভু তখন বাম সাহাব বাগানে এক নব নির্মিত মন্দিবে বাস কবিতেছেন। একদিন দেখা গেল—তিনি সর্বাঙ্গ অনাবৃত কবিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাব নাকি ভয়ঙ্কব অসুখ। ভক্ত সুধন্ববাবুকে বাব বাব ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ওবে শিগ্‌গীব কোনো ভাল ডাক্তাব নিয়ে আয়।"

সুধন্ববাবু ছুটিয়া গিয়া তাহাব বন্ধু অধ্যাপক ডাঃ ঊষাবঞ্জনকে ডাকিয়া আনেন। ডাক্তাব আসিয়া দেখেন বোগী একেবাবে উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছে। পবীক্ষা কবিয়া তিনি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া গেলেন। সুধন্ববাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমবা আমায় এ কা'কে দেখাতে এনেছো? এব তো হৃদ্‌স্পন্দন নেই, নাড়ীব খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ কথাবার্তা তো বেশ সুস্থ মানুষেব মতোই বলছেন।"

জগদ্বন্ধু তখন ব্যাধিগ্রস্তেব ভান কবিয়া বাব বাব অসহায়ভাবে বলিতেছেন, "ডাক্তাব-বাবু, এখুনি আমায় ওষুধ দিয়ে ভাল ক'বে দিন। আমাব দেহে ছত্রিশ কোটি ব্যাধি হয়েছে।"

ভক্ত সুধন্বেব ইঙ্গিতে চিকিৎসক তাড়াতাড়ি একটা পুষ্টিকব ঔষধেব কথা লিখিয়া দিয়া হাঁপ ছাড়িলেন। ডাক্তাবেব বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে সেদিন এক প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিল। বুঝিলেন, বাস্তব জীবনেব পবিধিব বাহিবেও একটা লোকোত্তব ক্ষেত্র বহিয়াছে, আব প্রভুব মতো মহাপুরুষেবাই তাহাব প্রকৃত সংবাদ বাখেন। ডাঃ ঊষাবঞ্জন ক্রমে প্রভুব অন্যতম ভক্তবূপে পবিগণিত হয়। বলাবাহুল্য, ইহাকে আত্মসাৎ কবাব জন্যই প্রভুকে সেদিন ঐ অলৌকিক লীলা প্রকাশ কবিতে হয়।

নামকীর্তন ও কৃষ্ণকথা ছাড়া প্রায় সময়ই প্রভু গৃহেব ভিতবে নিভৃতে ও একান্তে থাকিতেন। একবাব এক বালক ভক্ত আশানুবূপ তাঁহাব দর্শন না পাইয়া সখেদে বলিতে থাকে, বন্ধু, ওবকম ঘবে বন্ধ না থেকে তুমি এবাব বাব হও। তোমায় দেখে সবাই আনন্দ-লাভ কবুক।" জগদ্বন্ধু গৃহাভ্যন্তব হইতে তাহাকে উত্তব দিলেন, 'ওবে, আমি কাব কাছে বাব হবো? আমায় চায় কে? কেউ তো আমাব জন্য কষ্ট স্বীকাব ক'বে হবিনাম কবতে চায় না।"

তবুণ ভক্তদেব শুনাইয়া এক একদিন তিনি বলিতেন, "সময়ে এমন সব লোক আসবে তোবা দেখে অবাক হয়ে যাবি। তাদেব হবিনামে বিশ্বাস-ভক্তি অটল থাকবে। তাবা ভুবন মঙ্গল হবিনামেব জন্য জীবন উৎসর্গ কববে, দিনবাত হবিনামে মেতে থাকবে। আব তোবা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'বে তাদেব দিকে চেয়ে থাকবি। তোবা আব তাবা—সমুদ্রেব এপাব আব ওপাব তফাত, বুঝলি?"

বাস পূর্ণিমা, দোল, ঝুলন, বথযাত্রা—এক একটি পর্ব উপস্থিত হয় আর প্রভু শ্রী-অঙ্গনে নামকীর্তনেব বসধাবা উৎসাবিত কবিয়া দেন। বথেব উৎসব আসিয়া পড়িলে

তিনি যেন আপনাকে একেবারে হারাইয়া ফেলেন। দলে দলে কীর্তনিয়া বাদক ও ভক্তগণ আনন্দে উচ্ছল হইয়া প্রভুর রচিত পদ গাহিয়া চলে—

নব ঘনশ্যাম,
সু ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠাম,
নব নটবরবপু
জিনি কোটি কাম,
চারু চাঁচর চিকুরে চূড়া—
অধরে বেণু রসাল।

উদ্দণ্ড কীর্তনের সঙ্গে প্রভু তাঁহার কীর্তনমণ্ডলীতে ঘুরিয়া বেড়ান, অপার্থিব প্রেম-রসের স্রোত তাঁহার চতুর্দিকে বিস্তারিত হয়। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে বার বার রথযাত্রায় গিয়া তিনি কত আনন্দ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, একবারও তিনি এই পুণ্য উৎসবে পুরীধামে উপস্থিত হন নাই। সেবার তাঁহার কোনো অন্তরঙ্গ ভক্ত এ প্রশ্ন তাঁহার কাছে উত্থাপন করে, প্রভু বলেন, "ওরে, ও যে মহাধাম। ওখানে গেলে কি এ দেহ আর থাকবে? ওখানে গেলে এ দেহ একেবারে গ'লে জল হয়ে যাবে।"

প্রভু জগদ্বন্ধুর অধ্যাত্মসত্তায় এবার মহাভাবের লক্ষণনিচয় স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। ধীরে ধীরে অতীন্দ্রিয় লোকের গভীর স্তরে তিনি নিমজ্জিত হইতেছেন। এবার মহাপুরুষের লীলাময় জীবনে মৌন অধ্যায়ের আরম্ভ। ১৩০৯ সাল হইতে ইহার কিছুটা লক্ষণ দেখা যায়। এই সময়ে তিনি বলিয়াছেন—'তোরা শিগ্‌গীর আর আমার কথা পাবি নে। · এবার আমি ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছি। তার ডুরি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। যখন ডুরি ধরে টান দেব, তখন সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে। আমি ক্রমাগত এই ত্রিশ বছর ধরে ঘরে ঘরে এত কেঁদে বেড়ালাম। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনলো না, হরিনাম করলো না। তোরা আমার কোনো কথা রাখলি নে। দেখবি সময়ে এমনি দিন আসবে যে পৃথিবীর লোক নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যাবে।"

মৌনী হইবার কিছু পূর্ব হইতে প্রভুর বালক স্বভাবটি যেন বেশী ফুটিয়া উঠিতেছে। নিভৃতে গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া তিনি মৃদঙ্গ বাজাইতে থাকেন, আর বালক ভক্তেরা হরিনাম কীর্তনে দশ দিক মুখরিত করে, অঙ্গনে নাচিয়া বেড়ায়। প্রভুর হরিলুট দেওয়া এক অপূর্ব দৃশ্য। বিশেষ করিয়া অঙ্গনে বালকদের সম্মেলন হইলেই তাঁহার আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠে। তাহাদের সঙ্গীত ও নৃত্যের তালে প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে সরল শিশুর হাসি হাসেন, কখনও বা স্বেচ্ছামতো মৃদঙ্গ বাজান, করতালি দিতে থাকেন।

অঙ্গনে দাঁড়াইয়া নামগানরত ভক্ত বালকেরা গ্রাম্য ভাষায় বলে 'পিরভু— ও পিরভু, এখন নুট দাও'। জগদ্বন্ধু প্রথমে বাতাসার হাঁড়ি তো উজাড় করিবেনই, তাহার পরে ঘরের জিনিসপত্র,—ভক্তিগ্রন্থ, খোল, করতাল ইত্যাদিও বালকদের বিতরণ করিবেন।

কখনো কখনো দেখা যায়, তিনি লুটদানের নেশায় উলঙ্গ হইয়া পরিধের বস্ত্রখানিই বাহিরে ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। তারপরই হয়তো কোনো ভক্তকে কাগজের চিরকুট পাঠাইলেন, "বস্ত্র একেবারে নাই, এখুনি একটুকরো বস্ত্র পাঠাও।"

এসময়ে প্রভু যেন পাঁচ বছরের শিশুটি হইয়া গিয়াছেন। অন্তরে জাগিয়াছে ব্রজ-রসের পরিপূর্ণতা, আর ধীরে ধীরে বাহির দুয়ারে কপাট লাগাইয়াছেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের

ডাকিয়া প্রায়ই করুণ কণ্ঠে বলেন, 'তোমরা আমার কথা রাখ, হরিনাম করো। আমি তা শুনতে শুনতে সমস্ত পৃথিবীর ধুলোয়, আকাশে মিশে যাই। আমার শপথ তোমরা সবাই হরিনাম করো। হরিনামের মঙ্গল হোক, তোমাদের মঙ্গল হোক, আর তা হলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। তোমরা হরিনাম ক'রে আমায় তোমাদের সাথে মিশিয়ে নাও। আমি হরিনামের—এ ভিন্ন আর কারুর নই। তোমরা মানুষ না হলে, হরিনাম না করলে আমি আর ঘর থেকে যে কখনো বার হব না। ঘরের ভেতর আবদ্ধ থেকে থেকে একেবারে পাষাণ হয়ে যাবো।"

প্রভু জগদ্বন্ধু এক এক সময়ে বলিয়া উঠিতেন "ওরে আমি যে ঝাড়ুদার। কলির জঞ্জাল আর ময়লা নিষ্কাশনের জন্য আমার আগমন।" আবার কখনো তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত,—"আমার দেহে এখন নানা বিকৃ লক্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে। আর আমি বাইরে থাকতে পারছিনে। ঘরে থেকে থেকে ব্যাধির দ্বারা এগুলো বিলুপ্ত ক'রে তবে তোদের মধ্যে ফিরবো। সতেরো বৎসরের জন্য তিনি তাঁহার নির্জন বাস এ সময়ে বরণ করিয়া নেন।

নিজের আসন্ন অন্তর্মুখীন অবস্থার বর্ণনা দিয়া কয়েকটি বালক ভক্তকে বলিতেন, "দ্যাখ, এমন সময় আসবে যখন আমি জড়ের মতো হবো। কোনো জ্ঞান থাকবে না, পাঁচ বৎসরের শিশুর মতো হবো।" আবার অসহায় শিশুর ভাবে ভাবিত হইয়া বালক সুহৃদদের নিকট প্রভু মিনতিও জানাইতেন—"সে সময়ে কিন্তু তোরাই আমার অভিভাবক। দেখিস দুষ্ট লোকে যেন আমায় বিরক্ত না করে।"

১৩০৯ সাল হইতে প্রভুর মৌনাবলম্বন ও নিভৃত বাস শুরু হয়। অঙ্গনের প্রান্তে তাঁহার গম্ভীরা প্রকোষ্ঠ। আলো হাওয়া প্রবেশ করার মত ছিদ্র বা জানালা তাহাতে নাই। চারিদিকে পুরু আবরণ ও ঘন খুঁটির বেড়া,—অভ্যন্তরভাগ সদা অন্ধকারময়। নির্দিষ্ট সেবক যখন প্রভুর আহার্য রাখিয়া আসে, তখনই সে শুধু একটি আলো জ্বালাইয়া দিয়া যায়। সত্বর আবার তাহা নিভাইয়া দিয়া প্রভু ভাবতন্ময় অবস্থায় থাকেন।

প্রভু নিজে যেমন ভক্তদের বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তেমনই ক্রমে ক্রমে বালকবৎ ও জড়বৎ হইয়া যাইতেছেন। নিজে ইচ্ছা করিয়া স্নান ভোজন করেন না, আবার সেবকদের কেহ চাপ দিয়া করাইয়া দিলেও আপত্তির কারণ নাই। নিস্পৃহ, নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা।

দ্বাদশ বর্ষ পরে, ১৩২০ সনে, প্রভু নিভৃত প্রকোষ্ঠটি ত্যাগ করিয়া বাহির অঙ্গনে মাঝে মাঝে পদার্পণ করিতেন, আর দূর-দূরান্ত হইতে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক তাঁহার দর্শনের জন্য ভিড় করিত। আনন্দময় কনককান্তি দীর্ঘায়ত পুরুষ বালকের মতো উলঙ্গ হইয়া নির্বিকারে বসিয়া থাকিতেন। অঙ্গের দ্যুতি ও সৌরভে গৃহ অঙ্গন একেবারে ভরপুর। ভক্তরা শুধু চোখের দেখা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেন। মুসলমান ধর্মাবলম্বীরাও দর্শনার্থীরূপে আসিতেন। তাঁহারা কেন দর্শনে আসিতেছেন, এ প্রশ্ন করা হইলে উত্তর হইত, "বাধা কি ? এ তো হিন্দুর দেবমন্দিরে আসিনি ? ইনি জগদ্বন্ধু। আমাদেরও তো উনি বন্ধু। আমরা জগতের বন্ধুটিকে দেখতে এসেছি।" ১৩২৩ সালের বৈশাখের পর হইতে তিনি আবার তাঁহার গম্ভীরা প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করিলেন।

চম্পটি ঠাকুর ও তাঁহার সহধর্মিণী গোড়ার দিকে তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর ভক্তপ্রবর মহেন্দ্রজী তাঁহার পরিচর্যার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই ভক্ত সাধক বৃন্দাবনধামে প্রভু জগদ্বন্ধুর অলৌকিক দর্শন প্রাপ্ত হন—স্থূলদেহে তখনও

তিনি প্রভুকে দেখিতে পান নাই। বৃন্দাবন হইতে তিনি যখন ফরিদপুরে পৌঁছিলেন তখন জগদ্বন্ধুর মৌনাবস্থা ও নিভৃত বাসের নবমবর্ষ পূর্তি হইয়াছে। সে সময় হইতেই তিনি তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রভুর অধ্যাত্মজীবনের ঐশ নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে মহেন্দ্রজীর বিশ্বাস ছিল অগাধ। তাঁহারই উদ্যোগে সংগঠিত মহানাম কীর্তন সম্প্রদায় দীর্ঘদিন জগদ্বন্ধুর আদর্শ প্রচার করিয়াছে।

প্রভুর সেবার কথা ভাবিয়া একদিন মহেন্দ্রজীর মন বড় চিন্তাকুল হয়। সখেদে ভাবেন, যদি তাঁহার দশখানি হাত হইত তবে এই সেবা তো তিনি একাই করিতে সমর্থ হইতেন।

এই চিন্তায় যে সূক্ষ্ম অহং বোধটি জড়িত, তাহা সেদিন প্রভু জগদ্বন্ধুর দৃষ্টি এড়ায় নাই। এ সময়ে কোনো কাজে প্রভুর প্রকোষ্ঠে গিয়াই ভক্ত মহেন্দ্রজী হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, জগদ্বন্ধু তাঁহার সম্মুখে এক দিব্য রূপে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "মূর্খ, ওদের সবার হাতকে নিজের হাত বলে মনে করলেই তো পারিস্। ওরা সেবা করলেই তুই তা নিজে করছিস, এটা ভাবলেই তো হয়।" এই কথায় মহেন্দ্রজীর জ্ঞান হইল। ইহার পর হইতে তিনি অপর ভক্তদের সেবার সুযোগ দিতে সদাই উন্মুখ থাকিতেন।

১৩২৮ সনের ১লা আশ্বিন। প্রভু জগদ্বন্ধু এই দিনে অমৃতময় নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হন। অগণিত ভক্তের ক্রন্দনরোলে শ্রীঅঙ্গনের আকাশ বাতাস আকুল হইয়া উঠে।

নিত্য অনিত্যের তত্ত্ব ও ব্রজরস সাধনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু বলিয়া গিয়াছেন, "জানবি—ব্রজ, ব্রজরাখাল, ব্রজসখা অর্থাৎ ব্রজে যা কিছু সম্ভব, তা ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। সমস্তই প্রলয়কালে লয় হয়ে যাবে। দেবতারাও অনিত্য। তাঁদেরও প্রলয়কালে আর সমস্তের মতোই লয় হতে হবে। অতএব নিত্য যে ব্রজ সম্বন্ধীয় বস্তু তাতেই স্নেহ, মমতা আসক্তি, আশা ও ভরসা করতে হয়।"

ইহাই প্রভু জগদ্বন্ধুর চরম ও পরম কথা। তাঁহার অধ্যাত্মসাধনার এই কথাই রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

জীবের মঙ্গল ও তাহার মুক্তি কামনা প্রভুর সমগ্র জীবনে আমরা ওতপ্রোত দেখিতে পাই। ভক্ত মানবের নিকট তাঁহার বাণী পরম আশ্বাসের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন,—"ব্রজলীলায় অষ্টসখী আর গৌরাঙ্গ লীলায় সাড়ে তিনজন মাত্র রস-মাধুর্য আস্বাদন করেছেন, কিন্তু তাতে সমগ্র জীবের বিশেষ কিছু হয় নি। এবার—সময় এলেই অণু-পরমাণুগুলোকে পর্যন্ত স্বরূপরস আস্বাদন করাবো, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।"

মানবাত্মার মুক্তির জন্য জগদ্বন্ধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীঅঙ্গনের মাটি সিক্ত করিয়া গিয়াছেন। কহিয়াছেন, "তারক ব্রহ্ম হরিনামই মহা উদ্ধারণ মন্ত্র—গুপ্ত নয়, ইহা সর্বদা প্রকাশ্য। তোমরা দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করো। হরিনামে সৃষ্টি রক্ষা পাবে। তোমাদের বন্ধুর এই ভিক্ষা এই মিনতি। নিষ্ঠা আর ভক্তি ছড়াও। আমায় মুক্ত করো।" প্রেম সাধক জগদ্বন্ধুর অধ্যাত্মজীবন এই ভুবনমঙ্গল মহানাম ব্রতেরই এক অবতরণিকা।

সন্তদাস মহারাজ

১৩০০ সনের মাঘ মাস। প্রয়াগ সঙ্গমে কুম্ভমেলা শুরু হইয়াছে। চারিদিকে সহস্র সহস্র সাধু-সন্ন্যাসীর জমায়েত ও ছাউনি। ইঁহাদের ঘিরিয়া লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও দর্শনার্থীর ভিড়। তারাকিশোর চৌধুরীমহাশয়ও সেদিন এই পুণ্যময় মেলাক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরূপে তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা। দানবীর, ধর্মনিষ্ঠ ও মনস্বী সমাজনেতা হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি কম নয়। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের কোনো সম্পদের মূল্যই তাঁহার কাছে আজ নাই। ঈশ্বর দর্শনের জন্য তারাকিশোরের সর্বসত্তা ব্যাকুল ও উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।

এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সদ্গুরুর কৃপা। কিন্তু আজিও কোনো ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় প্রাপ্তির সৌভাগ্য তাঁহার জীবনে হয় নাই। বৃথাই এতকাল এই সন্ধানে ফিরিয়াছেন। কুম্ভমেলার পুণ্যক্ষেত্রে পৌঁছিয়াই মুমুক্ষু তারাকিশোর কেবলি ভাবিতেছেন, দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষদের অধ্যুষিত এই মহামেলায় কি তাঁহার প্রার্থিত গুরু মিলিবে না? ভগবান্ কি বিমুখ হইয়াই থাকিবেন?

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে তারাকিশোর বহুকাল যাবৎ জানেন, উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিও যথেষ্ট। সম্মুখেই গোস্বামীজীর তাঁবু। বহুতর শিষ্য ও ভক্তজনসহ সেদিন তিনি সেখানে সমাসীন, তারাকিশোর তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। আশীর্বাদ করিবার পর গোস্বামীজী কহিলেন, "তারাকিশোরবাবু এখানে এসে খুব ভালো করেছেন। অনেক মহাত্মা ও মহাপুরুষের অধিষ্ঠান এই পুণ্যভূমিতে। কারুর শুভদৃষ্টি একবার পড়লেই উদ্ধার হয়ে যাবেন, সন্দেহ নেই।" গোঁসাইজীর মিষ্টমধুর কথা কয়টি তারাকিশোরের অন্তরে সেদিন শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দিল।

তাঁহার সঙ্গে আছেন এক বন্ধু, যাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অভয়নারায়ণ কাঠিয়াবাবাজীর শিষ্য। গোঁসাইজীর তাঁবুতেই তিনি এ সময়ে ছিলেন। অভয়বাবু সোৎসাহে তারাকিশোরকে তাঁহার গুরুদেব কাঠিয়াবাবার দর্শনের জন্য নিয়া গেলেন। বৃদ্ধ সাধুর শিরে শুভ্র জটার ভার, দেহটি দিব্য লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত, আননে স্মিত হাসির আভা। প্রণাম করিয়া উঠিতেই অঙ্গুলি সঙ্কেতে তারাকিশোরকে দেখাইয়া বাবাজী মহারাজ কহিলেন, "ইস্‌কো তো হম বৃন্দাবনমে দর্শন দিয়া।"

কয়েক মাস পূর্বে তারাকিশোর বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ঠিকই। কিন্তু এ মহাত্মার সহিত তাঁহার সেখানে দেখা হইয়াছে বলিয়া তো মনে পড়ে না! তিনি কিছুটা বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাঁহার এ বিস্ময় একেবারে সীমা ছাড়াইয়া গেল। কাঠিয়াবাবা মহারাজের পদপ্রান্তে বহু ভক্ত বসিয়া আছেন। মহাপুরুষ হঠাৎ তারাকিশোরকে লক্ষ্য করিয়া কি জানি কেন একটি নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্যের কথা! এই বিশেষ প্রশ্নটি যে কলিকাতায় থাকিতে মাঝে মাঝে তাঁহার মনে আলোড়িত হইতেছিল। তাছাড়া, ইহা তারাকিশোরকে কয়েকমাস পূর্বে এক নিশীথে খুব ব্যতিব্যস্ত করিয়াও তুলে। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া প্রশ্নের উত্তর তিনি তখন পান নাই। তাঁহার সাধনজীবনের সেদিনকার গোপন সমস্যাটির কথা কাঠিয়াবাবা কি করিয়া জানিলেন?

তবে কি ইনি সর্বজ্ঞ? ভগবান্ কি কৃপা করিয়া সত্য সত্যই তাঁহাকে এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের আশ্রয় জুটাইয়া দিলেন?

পরদিনই এক সংবাদ শুনিয়া তারাকিশোরের উৎসাহ স্তিমিত হইয়া গেল। তিনি শুনিলেন, কাঠিয়াবাবা মহারাজ মোট চারজন শিষ্য করিবেন বলিয়া ঠিক ছিল, সে সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আর নূতন কোনো শিষ্য গ্রহণ করিবেন না। তারাকিশোর বড় ভাবিত হইলেন। কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার। পরদিন বাবাজীর ছাউনিতে যাইবা-মাত্র মহাপুরুষ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে কহিয়া উঠিলেন, "হামারা তো পাঁচ হে চেলা হুঁয়ে। সুপাত্র মিল্‌নেসে অব্‌ভী চেলা করতা হুঁ।"—উপযুক্ত অধিকারী পাইলে বাবাজী মহারাজ আরও চেলা করিতে ইচ্ছুক। তারাকিশোর আশ্বস্ত হইয়া ভাবিতে থাকেন, তবে এখনও কিছুটা ক্ষীণ আশা রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় বাবাজী মহারাজকে তিনি নিজ মুখে কোনো প্রশ্নই করেন নাই, কিন্তু উত্তর সঠিকভাবেই মিলিয়াছে।

কুম্ভমেলা হইতে ফিরিবার দিন তারাকিশোর বাবাজীকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। বাবাজী হঠাৎ এ সময় তাঁহাকে বলিয়া বসিলেন, তারাকিশোর যেন চৈত্রমাসে বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন। কিন্তু চৈত্রমাসে হাইকোর্টের ছুটি কোথায়? এ অসুবিধার কথাটি জানানো মাত্র মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন, "ঘাবড়াও মত। তুমকো মহাবীরজী জরুর লে যায়েঙ্গে।"

চৈত্রমাসে কিন্তু সত্য সত্যই একটা সুযোগ আসিয়া যায়। তারাকিশোরও বৃন্দাবন-ধামে বাবাজী মহারাজের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে পৌঁছিবার পর তিনি এক প্রকাণ্ড ধাঁধায় পড়িলেন। ভাবিয়াছিলেন, আশ্রমের পরিবেশে নিজ সাধনস্থলীতে বাবাজীকে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপেই দর্শন করিতে পাইবেন। শান্ত সমাহিত শিবকল্প তাপসের লোকোত্তর মহিমা তাঁহার কাছে এবার উদ্‌ঘাটিত হইবে। কিন্তু এখানে পৌঁছিয়া বাবাজীর যে মূর্তি দেখিলেন, তাহাতে কিছুটা হতাশ হইতে হইল।

বাহ্যিক স্বভাব ও আচরণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে কাঠিয়াবাবাজীকে মনে হয় এক পাকা বিষয়ী ব্যক্তি। শুধু তাহাই নয়—এ সঙ্গে গ্রাম্য দোষও নিতান্ত কম নাই। বাবাজী নিজেই আশ্রমের হাটবাজার করেন, শাকসব্জী ফলমূল বহিয়া আনেন। কাহারো উপর ভার দিয়া তাঁহার স্বস্তি নাই, বিশ্বাসও কাহাকেও করেন না। দুইটি পয়সার হিসাবে গরমিল হইলে সকলের চৌদ্দপুরুষের বাপান্ত করিয়া তবে ছাড়েন। বৃন্দাবনের তীর্থ-যাত্রীদের কেহ তাঁহাকে আধপয়সা বা পাই পয়সা দিলে সোৎসাহে তিনি গ্রহণ করেন, পুরা একটি পয়সা পাইলে তো প্রসন্নতার সীমা থাকে না।

বাবাজীর প্রধান আড্ডাটি আশ্রমের সন্নিকটে, রাস্তার ধারে। তাঁহার এই ভাঙ-চরসের সভায় চোর ডাকাত ও উচ্ছৃঙ্খল সদস্যের অভাব নাই। সুযোগ পাইলেই বাবাজীর মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহার এই সঙ্গীরা পথচারীদের নিকট হইতে দুই চার পয়সা আদায় করে, আর তিনিও সম্মুখে বসিয়া তৃপ্তির হাসি হাসিতে থাকেন। সামান্য যাহা কিছু পয়সা-কড়ি থাকে, তাহার নিরাপত্তা নিয়া উদ্বেগের অবধি নাই। কে কখন এ সব অপহরণ করিবে, এ দুশ্চিন্তায় তিনি সদা অস্থির।

আশ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণত যে সব কথাবার্তা বাবাজী মহারাজ বলেন, তাহাতে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ খুব কমই থাকে। বাজারে জিনিসপত্রের মূল্য বাড়িতেছে—ইহা নিয়া

প্রায়ই তাঁহার আতঙ্কের সীমা নাই। ব্রজধামে কোন্ মহারাজা আসিতেছে, কে কত টাকার ভেট দিবে, কত মূর্তির খোরাক তাঁহার আশ্রমে পাঠাইবে, এই আলোচনায় তিনি মহা উৎসাহী। আর যে সব দর্শনার্থী টাকাকড়ি প্রণামী দেয় না তাহাদের নিন্দায় বাবাজী একেবারে পঞ্চমুখ।

বাবাজী মহারাজের এই আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ বড় রহস্যপূর্ণ। তারাকিশোর রোজ ইহা দেখেন, আর মনে মনে ব্যথিত হইয়া উঠেন। আবার মনে নানা প্রশ্নও উদিত হয়—যদি সত্য সত্যই ইনি এমন বিষয়ী হইবেন তবে কুম্ভমেলার প্রাচীন সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহার এমন অসামান্য প্রতিষ্ঠা দেখা যায় কেন? তিনি শুনিয়াছেন, ভারতীয় সাধক-সমাজ কাঠিয়াবাবাজীর প্রতি শ্রদ্ধায় নতশির। এটাই বা কি করিয়া সম্ভব হয়?

একদিন বাবাজীর সহিত কোনো শাস্ত্র প্রসঙ্গের আলোচনার কালে তারাকিশোর হঠাৎ সাতিশয় দৃঢ়তার সহিত উচ্চ কণ্ঠে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাপুরুষ অমনি এক সরল গ্রাম্য লোকের মতো হাত দুইটি যুক্ত করিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, "বেটা, হম বুড্ঢা আদমি, মুরখ্ হ্যায়। শাস্ত্রকী বাত নহি জানতা, তুম হম্‌কো সমঝায় দো।" বিস্ময়ভরা নয়নে তারাকিশোর তাহার দিকে শুধু চাহিয়া রহিলেন।

বাবাজীর প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ভক্ত তারাকিশোর একেবারেই বিফল হইলেন। কখনো ভাবেন, এসব নিতান্ত বাহ্যিক ব্যবহার—এক চতুর লীলাভিনয় মাত্র। এই দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছেন সত্যকার এক বিরাট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। আবার সন্দেহ হয়, এই বহিরঙ্গ রূপেই কি ইহার প্রকৃত পরিচয় নিহিত? অবশেষে ঠিক করিলেন, এ রহস্য নিয়া মোটেই তিনি মাথা ঘামাইবেন না। সত্যই তো এই বিরাট সাধক পুরুষকে বুঝিবার মতো দিব্য দৃষ্টি তাঁহার কোথায়? প্রকৃতপক্ষে ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণই যদি অদৃষ্টে লেখা থাকে তবে নিজেই কৃপা করিয়া ইনি কি প্রকৃত পরিচয় জানাইয়া দিবেন না?

বাবাজী মহারাজের স্পষ্ট অভিমত ইতিমধ্যে একদিন জানা গেল। তারাকিশোরকে কহিলেন, এবার তাঁহাকে তিনি দীক্ষা দিবেন না। স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া শ্রাবণ মাসে তাঁহাকে আবার বৃন্দাবনে আসিতে হইবে, দুজনকেই একসঙ্গে দীক্ষা দেওয়া হইবে। তারাকিশোর ভাবিলেন, তবুও ইহা মন্দের ভাল। বাবাজী মহারাজের উপর প্রকৃত বিশ্বাস তাঁহার এখনও জন্মে নাই, তাই দীক্ষার সময় কয়েক মাস পিছাইয়া যাওয়াতে ভালই হইল। ইতিমধ্যে তিনি নিজের মনকে প্রস্তুত করিতে ও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে কিছুটা অবসর পাইবেন।

তারাকিশোর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা ও জ্বালার বিরাম নাই। কোথায় কোন্ পরম শুভক্ষণে তাঁর জীবনে ঐশ নির্দিষ্ট সদ্‌গুরু আবির্ভূত হইবেন কে তাহা বলিয়া দিবে?

আষাঢ় মাস। গভীর নিশীথে সাধনভজনের পর তারাকিশোর ছাদে শয়ন করিয়া আছেন। হঠাৎ নিদ্রা ভাঙিয়া গেল, শয্যায় তিনি উঠিয়া বসিলেন। এবার সম্মুখ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলেন আকাশমার্গ হইতে কাঠিয়াবাবাজীর জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল মূর্তিখানি ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই দিব্যমূর্তি ছাদের উপর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যাকুলচিত্ত তারাকিশোরকে বাবাজী স্নেহভরে তাঁহার আশ্বাসবাণী শুনাইতে

লাগিলেন। তারপর তাঁহার কানে এক মন্ত্র প্রদান করিয়া মহাপুরুষ আকাশপথে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

যেমন অলৌকিক এ আবির্ভাব, তেমনি বিচিত্র এ দীক্ষার ধরন। উত্তরকালে তারাকিশোর গুরুদেবের সেদিনকার এই অলৌকিক আবির্ভাবের বর্ণনা নিজেই দিয়াছেন—"শ্রীযুক্তবাবাজী মহারাজ অন্তর্হিত হইলে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যেন আমার অন্তরের প্রত্যেক স্তরে তাঁহার প্রদত্ত দীক্ষা বীজ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সব সংশয় আমার ছিল তৎসমস্ত এখন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি বোধ করিতে লাগিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে আমার জীবন ধন্য হইল এবং অভিলষিত সদ্‌গুরু লাভ করিলাম!"

শ্রাবণ মাসে বৃন্দাবনে গিয়া তিনি কাঠিয়াবাবার নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বাবাজী মহারাজ অলৌকিকভাবে কলিকাতায় আবির্ভূত হইয়া যে মন্ত্রটি তাঁহাকে সেদিন দিয়া আসেন এবার কিন্তু তাহাই আবার আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, এ মন্ত্র তাঁহাকে নিরন্তর জপ করিতে হইবে না, আপনা হইতেই এটি তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়া উঠিবে।

সর্বজ্ঞ, মহাশক্তিধর গুরুর রোপিত এই বীজ শুধু অঙ্কুরিতই হয় নাই, বিরাট বনস্পতি-রূপে অতঃপর পরিণতি লাভ করে। সাধক তারাকিশোর বৈষ্ণবাচার্য সন্তদাস মহারাজ-রূপে কীর্তিত হইয়া উঠেন, বহু ভক্ত ও মুমুক্ষু তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রজমণ্ডলের মোহান্তরূপে, কাঠিয়াবাবাজীর সাধনার উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহার অভ্যুদয় ঘটে।

শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের অন্তর্গত বামৈ গ্রাম। এই গ্রামেরই বনেদী জমিদার চৌধুরীদের বংশে সন্তদাস বাবাজী জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া চৌধুরীদের খ্যাতি যথেষ্ট। কথিত আছে, ইহাদের এক পূর্বপুরুষ হিমালয়ে গিয়া দীর্ঘ তপস্যার পর শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। হরকিশোর চৌধুরী ছিলেন এই বংশের একমাত্র বৈষ্ণব। শুদ্ধাচারী ও তেজস্বী পুরুষ বলিয়া তাঁর সুনাম কম ছিল না। চৌধুরীমহাশয়ের পত্নী গিরিজাসুন্দরীও ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। ইহাদের পুত্ররূপে সন্তদাসজী ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন শুক্রবার ভূমিষ্ঠ হন। শিশুর নামকরণ হয়, তারাকিশোর। ধনী গৃহের আদরযত্নে—ধর্মপ্রবণ, আচারনিষ্ঠ পরিবেশে তারাকিশোর বর্ধিত হইতে থাকেন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন।

তারাকিশোর যে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন সেই বৎসরই তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়। পত্নী শ্রীমতী অন্নদা দেবী ছিলেন বিখ্যাত বিশারদ বংশীয় হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা। পিতৃকুলের বহুতর সদ্‌গুণ এই নিষ্ঠাবতী মহিলার মধ্যে বর্তমান ছিল। উত্তরকালের সাধক তারাকিশোর চৌধুরীর উপযুক্ত সহধর্মিণীরূপেই নিজেকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তরুণ তারাকিশোর কলিকাতার পড়িতে আসিলেন। শ্রীহট্টের সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পালের তখন ছাত্রাবস্থা, একই মেসে থাকিয়া সকলে পড়াশুনা করেন। বাংলার সমাজজীবনে রাজনীতিতে তখন নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। মনস্বী, উন্নতচেতা, তারাকিশোরও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। জনকল্যাণ সাধন, কুসংস্কারবিরোধী সংগ্রাম, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন, সমস্ত কিছুতেই

এই তরুণ ছিলেন তৎকালীন অগ্রণীদের অন্যতম। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস তারাকিশোরের এই সময়কার জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"কী রাজনৈতিক রাজ্যে, কী ধর্মনৈতিক রাজ্যে, তিনি সর্বত্রই চাহিতেন গণতান্ত্রিকতা। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তখন একমাত্র কেশবচন্দ্রের শাসনাধীন মনে করিতেন, তারাকিশোর কোচবিহার বিবাহ প্রতিবাদ সভায় ঐ সমাজের বিরুদ্ধে অ্যালবার্ট হলে প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তরুণদের মধ্যে তিনিই প্রথমে বোধহয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য নির্বাহক সভার সভ্য হন।"

ব্রাহ্মসমাজে তারাকিশোরের যোগদান রক্ষণশীল হরকিশোরকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। পুত্রের বিরুদ্ধে তিনি একেবারে ক্ষেপিয়া যান। একবার তো কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতেই উদ্যত হন। তারাকিশোর সেদিন দৃঢ়, প্রশান্ত কণ্ঠে ক্রুদ্ধ পিতাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, "আমার শরীর আপনা থেকে উৎপন্ন সত্য, কিন্তু আমার আত্মা আপনা থেকে উৎপন্ন হয় নি। শরীরকে আপনি অনায়াসে বিনষ্ট করুন, কিন্তু যে পথে আত্মার কল্যাণ আমি দেখতে পাচ্ছি, সে পথ তো আমি ত্যাগ করতে পারিনে ?" পিতা ও পুত্রের এই আদর্শগত কলহ বেশ কিছুদিন চলিয়াছিল। এজন্য অশান্তিও কম দেখা দেয় নাই।

ইতিমধ্যে জীবনের নানা সংগ্রাম ও কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়া তারাকিশোর এম. এ. পাস করেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য তিনি অতঃপর প্রস্তুত হইতে থাকেন। এজন্য যে মেধা ও শ্রমনিষ্ঠা প্রয়োজন তাহা তাঁহার যথেষ্টই ছিল, কিন্তু নানা অবস্থা বিপর্যয়ের ফলে এ পরীক্ষা তাঁহাকে বাদ দিতে হয়। শিক্ষকতা ও বহুবিধ জনহিতকর কাজে এবার হইতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

তারাকিশোরকে এ সময়ে একবার কাশী যাইতে হয়। পিতা হরকিশোর সেখানে খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তারযোগে পুত্রকে সেখানে ডাকিয়া পাঠান। অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই হরকিশোর আরোগ্যলাভ করিলেন। ইহার পর তিনি ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই পুণ্যতীর্থে কি করিয়া পুত্রের মতিগতির পরিবর্তন করা যায়।

পিতার সঙ্গী এবং বন্ধুদের সঙ্গে তারাকিশোরকে এ সময়ে নানা দেবালয়ে যাইতে হইত, সমর্থ সাধু ও সন্ন্যাসীদের দর্শন করিয়াও তিনি বেড়াইতেন। মহাযোগী ত্রৈলঙ্গ-স্বামী এবং ভাস্করানন্দজীর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য এই সময়ে তাঁহার হয়। তরুণ ব্রাহ্ম তারাকিশোরের হৃদয়ে যোগীদ্বয়ের দর্শন বড় রকমের আলোড়ন তুলিয়া দেয়। বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতে থাকেন, কোন্ সাধনার বলে এই মহাপুরুষেরা এমন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন, কি করিয়াই বা তাঁহারা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তা মানব-লোকে অবলীলায় বহন করিয়া আনেন ?

অন্তরের এই অন্দোলন ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রসঙ্গে তারাকিশোর বলিয়াছেন, "যতই আন্দোলন করতে লাগলাম, ততই হিন্দুধর্মের ব্যবহার-বিষয়ক শাস্ত্রের প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় হতে লাগল। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হয়ে আমি যে সে সমস্ত পরিত্যাগ করেছি তা আমার সঙ্গত হয় নি—এই ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হতে লাগলো।"

তারাকিশোরের এক ব্রাহ্মবন্ধু এ সময়ে গোপনে এক যোগী সম্প্রদায়ে থাকিয়া সাধন করিতেন। ইঁহাদের শিক্ষাদাতার নাম—জগৎচন্দ্র সেন। তারাকিশোর তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি শুরু করিয়া দিলেন। সাধনজনিত কিছু কিছু অনুভূতি লাভ যে তখন তাঁহার নাই, তাহাও নয়। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই

ভাবিলেন, এই সম্প্রদায ও ইহাব সাধনপদ্ধতি তাঁহাকে বেশী দূরে নিযা যাইতে পাবিবে না। যে ব্রহ্মদর্শনের জন্য তাঁহাব অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইযা উঠিযাছে, সেদিক দিয়া এখানকার কেহই তাঁহাকে সাহায্য কবিতে পাবিবে না—ইহাও বুঝিতে তাঁহার দেরি রহিল না। আসন প্রাণাযাম ও ধ্যান ধাবণা তিনি ঠিকমতোই চালাইযা যাইতেছেন বটে, কিন্তু অন্তরেব পিপাসাব নিবৃত্তি হওযা দূবে থাকুক ক্রমে তাহা বাড়িযাই চলিল।

এবার তাঁহাব জীবনে এক মহাসঙ্কট উপস্থিত। হিন্দুসমাজ হইতে পূর্বেই বাহির হইযা আসিযাছেন, সেখানে ফিবিবাব পথ নাই। ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণও আজ বিলুপ্ত হইয়াছে। কে এমন ব্রহ্মবিদ্ সেখানে আছেন যিনি তাঁহাকে পথ প্রদর্শন কবিবেন? তাছাড়া, আস্থাই যখন নাই তখন ব্রাহ্মসমাজেব সহিত সামাজিক সম্বন্ধ বাখিবাব ভান কবা কেন? সিটি কলেজে তাবাকিশোব তখন অধ্যাপনা কবিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজেব ভাব ও আদর্শ প্রচাবেব জন্যই প্রধানত এই শিক্ষাকেন্দ্রেব স্থাপনা—অন্তবেব যোগসূত্র যখন ছিন্ন হইযা গিযাছে তখন এ কলেজেব শিক্ষকতা কবাও তো তাঁহাব আব সাজে না। তাবা-কিশোব তাই এই কাজ ছাড়িয়া দিলেন। এই পদত্যাগে তাঁহাব মতো সঙ্গীতহীন যুবকেব সেদিন বিপদেব অন্ত বহিল না। কিন্তু চরম অর্থকষ্টেব মধ্যেও তিনি বহিলেন অবিচলিত।

ইহাব পব তাঁহাব আইন ব্যবসার আবম্ভেব পর্ব। অধ্যাপনাব সময হইতেই তাবা-কিশোব আইন পড়িতে থাকেন। এবাব তাহা শেষ হইল এবং পিতাব আগ্রহাতিশয্যে শ্রীহট্টে গিযা উকিল হইযা বসিলেন। প্রতিষ্ঠা ও পসাব হইতে খুব বেশি দেবি হয নাই এবং অল্পকাল মধ্যেই তিনি সুখ্যাত ও সর্বজনপ্রিয হইযা উঠিলেন। আর্তেব সেবায, হবিসভাব অধ্যাত্ম-আলোচনায বা নগবকীর্তনে কোথাও তাবাকিশোব ছাড়া আব চলিবাব উপায নাই। আইন ব্যবসায, সামাজিক ও ধর্মমূলক নানা কর্মের মধ্যেও তিনি কিন্তু নিজস্ব সাধনভজন নিযমিতভাবে চালাইযা যাইতেন। এই সময়ে তাঁহাব প্রভাবশালী পিতাব চেষ্টাব ফলে হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি পুনরায গৃহীত হন।

১৮৮৮ সালে তাবাকিশোব চৌধুবী কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান কবিলেন। নিজেব কর্মনিষ্ঠা ও প্রতিভাবলে ধীবে ধীবে এখানকার আইনজীবীদেব মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করিতেও দেবি, হইল না।

অধ্যাত্মজীবনেব ফল্গুধারাটি কিন্তু তাবাকিশোবের জীবনে অব্যাহত ভাবেই বহিযা চলিয়াছে। বহিরঙ্গ জীবনেব সব কিছু কর্ম, সব কিছু কর্তব্যেব অন্তবালে জীবনেব মূল খুঁটিটিকে ক্রমে তিনি আবও জোবে আঁকড়াইযা ধবিলেন।

যোগসাধনাব যে পদ্ধতিকে তিনি অনুসবণ কবিযা চলিযাছেন, তাহা এযাবৎ তাঁহাকে সত্যকাব শান্তি ও তৃপ্তি দিতে পাবে নাই। এসময়কাব মনোভাব সম্বন্ধে সাধক তাবা-কিশোর বলিযাছেন, "আমাব অবলম্বিত এই সাধনে শক্তি প্রকাশিত হয, এটা আমি নিজে প্রত্যক্ষ কবেছি। তাছাড়া, এর দ্বারা একপ্রকার ভাবাবেশ হযে থাকে তা বড়ই মধুব—এটাও আমি বহুবাব দেখেছি। আমাব এই অর্জিত শক্তি দিযে আমি শুধুমাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে কোনো কোনো বোগীকে বোগমুক্ত কবেছি। আমাব দর্শন মাত্র হিস্টিবিযা রোগীর মূর্ছা বোগ দূব হযেছে, এমনও কখন কখন ঘটেছে। আমাকে স্পর্শ ক'রে অনেকে ভাবাবিষ্ট হযেছে, মূর্ছিত পর্যন্ত হযে পড়েছে, এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ কবেছি। কিন্তু এ সকল শক্তি আমাব আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্ম দর্শনের দ্বাব উদ্‌ঘাটিত কবে নি। অতএব এই সাধন

অবলম্বনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না, এটা আমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করলাম। এজন্য আমাকে অন্য উপযুক্ত গুরু গ্রহণ করতে হবে—তা নিশ্চিতরূপে বুঝলাম। সুতরাং যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন এবং যাঁর কৃপায় আমি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারি এমন সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাওয়া আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এই সদ্‌গুরু লাভের চিন্তায় বড় আকুল হলাম।"

তারাকিশোরের গুরুলাভের ব্যাকুলতা ক্রমে ক্রমে খুব তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। তিনি শুনিয়াছেন, আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ের গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে। তাই উদ্বিগ্ন চিত্তে কেবলই ভাবিতে থাকেন অভিলষিত পরম ধন আজ তিনি কোথায় পাইবেন? কাহার নিকট আশ্রয় নিবেন? সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজন ও তীর্থ দর্শনে বাহির হইয়া পড়িতেও এসময়ে একবার তিনি কৃতসংকল্প হন। নানা কারণে তাহাতেও বাধা আসিয়া পড়ে।

তারাকিশোর প্রায় প্রত্যহই গঙ্গাস্নান করিতেন। গঙ্গাতীরে বসিয়া ধ্যান, জপ ও প্রার্থনা নিবেদনে তাঁহার বহু সময় অতিবাহিত হইত। ১৮৯১ সালের গ্রীষ্মকাল। সেদিন অতিশয় সন্তাপিত চিত্তে তিনি ঘাটে বসিয়া আছেন, হঠাৎ ভিতর হইতে উত্থিত প্রবল আর্ত ক্রন্দনে তাঁহার সারা অন্তর মথিত হইয়া উঠিল।

গঙ্গাদেবীকে সম্বোধন করিয়া সখেদে বার বার কহিতে লাগিলেন,—"মাগো, ত্রিতাপনাশিনী কলুষহারিণী বলে তোমার প্রসিদ্ধি। কিন্তু মা আমার পাপ কি এতই বেশী যে তোমার ত্রিলোকপাবনী ধারা তা শুদ্ধ করতে পারলে না।"

খেদোক্তি থামিতে না থামিতেই কিন্তু তারাকিশোরের দৃষ্টিতে এক অলৌকিক দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে নিজে বলিয়াছেন, "দেখলাম আমার চোখের সামনে—হিমালয়ের যে স্থান থেকে গঙ্গা উদ্ভূত হয়েছেন, সেই মূল গঙ্গোত্রী গোমুখী স্থান হঠাৎ প্রকাশিত হল এবং সেই স্থানে বিরাজমান উমা-মহেশ্বরদেবও আমার দৃষ্টিগোচর হলেন। আমি তখন বিস্মিত হয়ে ঐ স্থান ও তাঁদের দেখতে লাগলাম। এরপর মহেশ্বরদেব একটি একাক্ষরী বীজমন্ত্র আমাকে উপদেশ করলেন এবং আরো বলে দিলেন যে এই মন্ত্র জপের দ্বারা আমি যথার্থ সদ্‌গুরু লাভ করবো।"

অপ্রাকৃতিক দৃশ্যটি কিন্তু ক্ষণপরেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। সাধক তারাকিশোরের হৃদয় তখন অনির্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর হইয়া গিয়াছে। পথপ্রদর্শক ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যে এবার তাঁহার জীবনে সত্য সত্যই মিলিবে এবিষয়ে তাঁহার আর কোনো সন্দেহ রহিল না। ইহার তিন বৎসরের মধ্যেই সদ্‌গুরু তাঁহার জীবনে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ কাঠিয়াবাবা মহারাজের নিকট দীক্ষা নিয়া তিনি কৃতার্থ হন।

দীক্ষাদানের পরও গুরুদেব দীর্ঘকাল তারাকিশোরকে সংসারধর্ম পালন করান, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম আইনজীবীরূপে তখন তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইতে থাকে। কিন্তু দেখা যায় অহঙ্কার বা অর্থের মোহ কখনও তাঁহাকে কলুষিত করিতে পারে নাই। গার্হস্থ্য-জীবনের পরিবেশও তাঁহার রূপটি ফুটিয়া উঠে এক অনাসক্ত সাধক ও মানবসেবকরূপে।

সাংসারিক লোভ ও দ্বেষদ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু নিয়াই আইনজীবীর কাজ। অথচ তারাকিশোর এই স্পর্শ হইতে নিজেকে বিস্ময়করভাবে দূরে রাখিতে পারিতেন। মামলার 'ব্রীফ্' পাইয়াই তাঁহার প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল, ইহাতে তাঁহার মক্কেলের দিক দিয়া কোনো

মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা আছে কিনা ? সে রকম কোনো কিছু থাকিলে কাগজপত্র তখনই তিনি ফেরত দিতেন। সাধারণত, মামলার নথিপত্র পড়ার জন্য তিনি ভাল পারিশ্রমিকই নিতেন এবং ইহা তন্ন তন্ন করিয়া পড়িবার পর নিজের দিক দিয়া স্থির করিতেন, ঐ মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন কিনা। একবার তাহা গ্রহণ করিলে ঐ মামলার তথ্য ও আইনের কূট প্রশ্নাদি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া নিতেন। সমস্ত মামলাটি যেমন তাঁহার নখাগ্রে আসিয়া যাইত, তেমনি ত্রুটিহীনভাবে তিনি তাঁহার বক্তব্যও প্রকাশ করিতে পারিতেন।

একাগ্রতা, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও গভীর মননশীলতার বলে তারাকিশোর অতি সহজে তাঁহার প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিতেন। আইনের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির জন্যও প্রবীণ আইনজীবীদের মধ্যে তাঁহার মর্যাদা ছিল অসামান্য। স্যার রাসবিহারী ঘোষ সে সময়ে আইনজীবীদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোনো কোনো মামলা সম্পর্কে নিজ মক্কেলকে তিনি বলিতেন, "এ মোকদ্দমায় আমরা প্রস্তুত ঠিকই হয়েছি—হারবার কোনো কারণ দেখছিনে। শুধু এক ভয় অপর পক্ষে তারাকিশোর রয়েছে।" গুরুত্বপূর্ণ কোনো আইন ঘটিত অভিমতের ব্যাপারে নিজ মক্কেলদেরও অনেক সময় তিনি তারাকিশোরের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলিতেন।

উকিল হিসাবে সহকর্মী শুধু আইনজীবীদেরই নয়, প্রবীণ বিচারকদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণে তারাকিশোর সমর্থ হন। হাইকোর্টে যোগদানের সময় হইতেই তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণধী, আইনজীবীরূপে তিনি মর্যাদালাভ করেন। একবার বিচারপতি নরিস সাহেবের এজলাসে তাঁহার একটি মামলার শুনানী হইতেছে। এই এজলাসে তারাকিশোর প্রথম সওয়াল করিবেন। তিনি বক্তব্য বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিচারপতি মিঃ নরিস এক দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। আইনজীবীরা অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ সওয়াল করিয়া কিভাবে হাকিমের সময় নষ্ট করেন, নিজেদের ও মক্কেলদের ক্ষতি করেন—ইহাই তাঁহার বক্তৃতার নির্গলিতার্থ। উৎসাহ সহকারে তরুণ উকিলকে এ অবসরে তিনি কয়েকটি সদুপদেশও দিলেন।

তারাকিশোর মিঃ নরিসের সব কথাই ধৈর্য ধরিয়া শুনিলেন। তারপর ইহার উত্তরে শুধু সংক্ষিপ্তভাবে তিনি কহিলেন, "মি-লর্ড আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি এ অবধি আমার বক্তব্যের একটি কথাও তো শোনেন নি।" একজন নূতন উকিলের নিকট এই তীক্ষ্ণ, সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনিয়া বিচারকের চোখ মুখ লাল হইয়া গেল। চকিতে বুঝিয়া নিলেন তাহার বক্তৃতাটি একেবারে মাঠে মারা গিয়াছে। অপর বিচারপতি এবং এজলাসে উপস্থিত প্রবীণ উকিলগণ তখন মুখে রুমাল দিয়া চাপা হাসি হাসিতেছেন। অতঃপর তারাকিশোর তাঁহার সওয়াল আরম্ভ করিলেন। আইন ও তথ্যের বিশ্লেষণ, যুক্তিনিষ্ঠা ও বক্তব্য বলার সংক্ষিপ্ত গুছানো ভঙ্গী দেখিয়া বিচারক বিস্তু খুশি হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে এই বিচারক তারাকিশোরের আইন-ব্যুৎপত্তি ও চরিত্রের মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়েন।

তারাকিশোর স্বভাবত উদাসীন ও সাধনভজনপরায়ণ। কি করিয়া এমন শ্রমনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়া তিনি মক্কেলের মামলা পরিচালনা করিতেন, তাহা ভাবিয়া অনেকেই বিস্মিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার দিক দিয়া এই ব্যাপারে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। মক্কেলের কাজকে ভাগবৎ সেবার অঙ্গরূপেই তিনি মনে করিতেন।

তাই মোকদ্দমার পরিচালনায় বিন্দুমাত্র ফাঁক বা ফাঁকি তাঁহার মক্কেলরা কখনো দেখে নাই। যে জুনিয়র উকিলেরা তাঁহার সহিত কাজ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও তিনি সেবাবুদ্ধি, শুদ্ধতা ও সততার আদর্শ সঞ্চারিত করিয়া দিতেন। প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্রজলাল শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন, "তারাকিশোর স্বীয় আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার বলে হাই-কোর্টের উকিলদের মধ্যে যেন এক নূতন সমাজের সূচনা করেন। তাঁহার পূত জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক আইনজীবীই উপকৃত হন।"

বিপিনচন্দ্র পালমহাশয় তাঁহার আত্মজীবনীতে তারাকিশোরের জীবনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম এই—"সমসাময়িক আইনজীবীদের কাহারো কাহারো মতে তত বেশী উপার্জন তাঁহার না থাকিলেও, শ্রেষ্ঠ আইনজীবীদের অন্যতম বলিয়া তিনি গণ্য হইতেন। তাঁহার সহকর্মীদের অনেকের মতে, উকিল হিসাবে স্যার রাসবিহারী ঘোষের পরেই ছিল তাঁহার স্থান। কিন্তু উপার্জন বিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য আইনজীবীদের অনেকের মতো সাফল্যলাভে সক্ষম হন নাই। তাহার কারণ, ওকালতি কার্যের জন্য তিনি কখনই নিজের নিয়মিত সাধনভজনের ব্যাঘাত হইতে দিতেন না।" আইনজীবী তারাকিশোরের সত্যকার পরিচয় এ কথায় পাওয়া যায়।

সাধনার আলোক তারাকিশোরের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন স্তরগুলিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। আইনজীবীর বৃত্তিকে যেমন ভগবৎসেবার ক্ষেত্ররূপে তিনি দেখিতেন, দৈনন্দিন গার্হস্থ্য-জীবনকেও গণ্য করিতেন ভগবানের সংসাররূপে। নিজেকে মনে করিতেন এক দীন সেবক মাত্র।

সংসারজীবনে নিত্যকার ঝামেলা তাঁহার বড় কম ছিল না। একদিকে বিগ্রহের নিত্য সেবা সাধু-সজ্জনের অভ্যর্থনা ও অতিথিভোজন আর অপরদিকে বহুসংখ্যক দরিদ্র আত্মীয় ও ছাত্রের অন্নসংস্থান। এত কিছু দায়িত্বের ভার যাঁহার উপর সেই গৃহস্বামীর সঞ্চয়ের ঝোঁক কিন্তু কিছুই ছিল না। নিজের সংসারকে তিনি বলিতেন, 'ঠাকুরের সংসার'। যত্র আয় তত্র ব্যয়—ইহাই ছিল তাঁহার ঠাকুরের সংসারের চিরন্তন রীতি। ইহার কোনো ব্যতিক্রম হইলে তাহা মনে হইত নিতান্ত অস্বাভাবিক।

তারাকিশোরের গৃহিণী অন্নদা দেবী ছিলেন সত্যকার সহধর্মিণী। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সেবানিষ্ঠা নিয়া দীর্ঘকাল স্বামীর পাশে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন। বিগ্রহ সেবা ও গৃহের পোষ্যদের দায়িত্বের কথা ভাবিয়া একবার তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখেন। ফল হইল বিপরীত। গৃহস্থালির অর্থকষ্ট এ সময়ে কেবলই বাড়িয়া চলিল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী তারাকিশোর চৌধুরীর হাতে তখন কি জানি কেন একটি পয়সাও আসিতেছে না।

বিগ্রহসেবা ও পরিজনদের পোষণে এ বিঘ্ন তো ঘটিবার কথা নয়। তারাকিশোর কিছুটা বিস্মিতই হইলেন। তারপর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, গৃহিণী অন্নদা দেবী পুঁটলীতে একশত টাকা জমাইয়া রাখিয়াছেন। যদি কখনো ঠাকুরসেবার অর্থ না জোটে এ জন্যই এটাকাটা পৃথক করিয়া রাখা।

গৃহিণীকে তিরস্কার করিয়া তারাকিশোর কহিলেন, "এই জন্যেই তো ঠাকুর আর আমায় টাকাকড়ি দিচ্ছেন না। মনে রেখো—ফকিরীতেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় ফিকিরীতে নয়।"

তারাকিশোরের শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কিত এক ভদ্রলোক সেবার কিছুদিন কলিকাতায়

তাঁহার বাসায় রহিয়াছেন। বহু দরিদ্র আত্মীয় ও ছাত্রের দল সেখানে বসবাস খাওয়া-দাওয়া করে। ইহাদের কেউ কেউ স্বেচ্ছামতোই চলাফেরা করে, বাড়ির কাউকে গ্রাহ্য করার তেমন প্রয়োজন বোধ করে না। এ সব দেখিয়া ঐ আত্মীয়টি ক্রুদ্ধ হন এবং একদিন তারাকিশোরকে নানা অভিযোগ শুনাইতে থাকেন।

মনোযোগ দিয়া সমস্ত কিছু শোনার পর তিনি কহিলেন, "দেখুন আপনার সব কথাই সত্য। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে—আসলে দোষ কার? ওদের, না আমার? আমি তো নিমিত্তমাত্র হয়ে আছি। এই সংসারটি হচ্ছে ঠাকুরের, তিনিই এদের খাওয়া পরার সব কিছু যোগাচ্ছেন, আমি যোগাচ্ছি না। কাজেই এরা একান্তভাবে আমার বশ্যতা স্বীকার করে থাকবে, তাই বা কেন?" শুভানুধ্যায়ী লোকটির আর বাকস্ফূর্তি হইল না।

বাড়ির চাকর-বাকরদের অধিকারও তারাকিশোরের দৃষ্টিতে অপর কাহারো অপেক্ষা কম ছিল না। ভৃত্য রামলগন সেদিন রান্নাঘরে খাইতে গিয়াছে। তাহার জন্য ঘোল নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু তাহা পরিবেশন করা হয় নাই। রাঁধুনে বামুনের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ভৃত্য সবটা ভাত আঙিনা ও সিঁড়িময় ছড়াইয়া দিল। গৃহকর্ত্রী অন্নদা দেবী এ ঔদ্ধত্য দেখিয়া বড় রুষ্ট হইলেন।

তারাকিশোর তখন উপস্থিত ছিলেন না। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া তিনি বড় বিস্মিত হইলেন। গৃহিণী কহিলেন, "চেয়ে দ্যাখো, তোমার প্রিয় চাকরের কাণ্ড। ঘোল আজ ছিল না এজন্য চটে গিয়ে সে এ কাজ করেছে।"

ভৃত্যের দিকে তাকাতেই সে সকাতরে কহিল, "আজ্ঞে, ঘোল ছাড়া এতগুলো ভাত আমি কি ক'রে খাবো?"

তারাকিশোর স্বভাবতই রাশভারী লোক। তাছাড়া অন্যায় কিছু দেখিলে একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিতেন। বাড়ির সকলে তখন ভাবিতেছে, এবার এ ভৃত্যের আর রক্ষা নাই, এখনই কি জানি এক সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটিয়া বসিবে। তারাকিশোর কিন্তু তখনই স্মিতহাস্যে দোতলায় চলিয়া গেলেন। তারপর পত্নীকে ডাকিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন "ওগো, ছেলের আব্দার মাকে যে মাঝে মাঝে শুনতে হয়। আজ আমার জন্য বরাদ্দ-করা দুধ খানিকটা ওকে এনে দাও।"

কি দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে, কি হাইকোর্টের সংগ্রামময় ক্ষেত্রে তারাকিশোর আপনাকে সহজেই পৃথক করিয়া নিতে পারিতেন, এক অন্তঃসলিলা আনন্দস্রোতে সদাই থাকিতেন নিমজ্জিত।

একদিন রাত্রে শয্যায় শুইয়া শুইয়া গড়গড়া টানিতেছেন হঠাৎ নলটি তাহার বাঁ চোখের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। ইহার ফলে ক্ষত ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হইল। নিজের চোখ দিয়া তখন কিছু পড়িবার উপায় নাই, তাই তারাকিশোর প্রত্যহ এ সময়ে মহাভারত পাঠ শুনিতেন। এই সময়ে শোনা ঘটনাবলীর চিত্রগুলি অলৌকিকভাবে তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত, আঘাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া অপার্থিব আনন্দসাগরে তিনি ডুবিয়া যাইতেন।

উপরোক্ত দুর্ঘটনার ফলে তারাকিশোরের এ চক্ষুটি দৃষ্টিহীন হইয়া যায়। এ সময়কার চোখের পীড়ার কথা উল্লেখ করিয়া উত্তরকালে তিনি কহিতেন, ভগবান্ কোন পথ দিয়ে কল্যাণ করেন তা কি বলা যায়? চোখে সেদিন তিনি আঘাত ও যন্ত্রণা দিলেন বটে কিন্তু এরই ভেতর দিয়ে নানা আধ্যাত্মিক অনুভূতি দান ক'রে আমার জীবনের পরিবর্তন সাধন কি করেন নি?"

তারাকিশোরের সাধনজীবনের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার দীর্ঘকালের আর্তি, ত্যাগ ও একনিষ্ঠা তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে গুরু-কৃপার অনুকূল বাতাস বহিতে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কাঠিয়াবাবা মহারাজের আশীর্বাদে ক্রমে ক্রমে এক সার্থকনামা সাধকরূপে ঘটে তাঁহার রূপান্তর। কলিকাতায় বাস করিবার সময়ও এই বৃন্দাবনবাসী গুরুমহারাজের কৃপার ধারা অপরূপ মহিমায় তাঁহার উপর প্রায়ই ঝরিয়া পড়িত, মাঝে মাঝে নিতান্ত অলৌকিকভাবে ইহার প্রকাশ ঘটিত।

বিচিত্র তাঁহার এই সদ্গুরুর কৃপা, আবার আরো বিচিত্র তাঁহার পরিবেশন ভঙ্গী। কাঠিয়াবাবার নির্দেশ ছিল, শেষ রাত্রে জাগিয়া তারাকিশোরকে সাধনভজন করিতে হইবে। শিষ্যের ঘুম গোড়ার দিকে নির্দিষ্ট সময়ে ভাঙিতে চাহিত না। এজন্য গুরুদেবকে সে-বার এক রাত্রে সূক্ষ্মদেহে শিষ্যের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে হয়। এই সময়ে একটি ঢিল মারিয়া তিনি তারাকিশোরের ঘুম ভাঙাইয়া দেন। তারপর রাত্রির শেষ যামের বিশেষ সাধনক্রিয়ার কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া বাবাজী মহারাজ চকিতে অন্তর্হিত হন। এমনই ছিল শিষ্যের সাধন সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সতর্ক ও অতন্দ্র দৃষ্টি।

তারাকিশোরের গৃহে গুরু কাঠিয়াবাবাজীর একটি আলোকচিত্র শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইত। তারাকিশোর ও তাঁহার সহধর্মিণী বলিতেন, 'এ চিত্র বড়ই জাগ্রত, গুরুমহারাজ এর ভেতর দিয়ে আবির্ভূত হন, কত মধুর লীলা আমাদের দেখান।' এই ভক্তদম্পতি ছাড়াও আরো অনেকের এ লীলা দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

তারাকিশোর ও তাঁহার স্ত্রী গৃহমধ্যে গুরু-মহারাজের চিত্রটি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পূজার বিশদ অনুষ্ঠানগুলির সহিত কেহই তেমন পরিচিত নহেন। তাছাড়া কোনো কোনো কাজের গুরুত্বও তাহারা তেমন বুঝিতে সক্ষম নহেন। গুরুদেবই তাই এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইল, যোগবিভূতির কিছুটা প্রকাশদ্বারা তিনি স্বকার্য সাধন করিলেন।

ভুলারাম নামে তারাকিশোরের এক ভৃত্য ছিল। লোকটি বড় সরল এবং ভক্তিমান্। কাঠিয়াবাবা মহারাজের চিত্রপটের সম্মুখে প্রদীপ জ্বালানো ও ধূপধুনা দেওয়া ছিল তাহার দৈনন্দিন কাজ। একদিন সন্ধ্যায় ভুলারাম ধূপদীপের ব্যবস্থা করিতে পূজার ঘরে গিয়াছে। হঠাৎ সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তারাকিশোরবাবুর স্ত্রীর নিকট আসিয়া উপস্থিত। কিছুটা সামলাইয়া নিয়া সে বলিল, গুরু মহারাজের আলোকচিত্রের মতো আকৃতিবিশিষ্ট, জটাজুটমণ্ডিত এক সাধু তড়িৎ গতিতে আসিয়া তাহার হাত হইতে ধুনুচিটি কাড়িয়া নিয়াছে। এই মূর্তি অন্তর্হিত হইবার সময় তিরস্কারের সুরে বলিয়া গেল "আরে দ্যাখ্ তোর সন্ধ্যা সময় আমার কটোর সামনে ধোঁয়া ঠিক করিস্ নে কেন?"

বহু চেষ্টাতেও এই সাধুর কোনো সন্ধান বা চিহ্ন আর পাওয়া যায় নাই। তবে গভীর রাত্রে দেখা গেল, ভৃত্যের হাত হইতে কাড়িয়া নেওয়া ধুনুচিটি জলের চৌবাচ্চার কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার পর হইতে গৃহে প্রতিষ্ঠিত কাঠিয়াবাবাজীর চিত্রের সম্মুখে নিয়মিত-ভাবে প্রতি সন্ধ্যায় আরতি ও স্তবগান হইতে থাকে।

কাঠিয়াবাবাজীর অলৌকিক কৃপাবলে একবার তারাকিশোরের প্রাণরক্ষা হয়। উত্তরকালে প্রায়ই তিনি এই কাহিনীটি বিবৃত করিতেন। সেবার শ্রীহট্টাঞ্চলে ভ্রমণকালে হাতিতে চড়িয়া তিনি তাঁহার শ্বশুরবাড়ি দিকে যাইতেছেন। একটি কাঁচা রাস্তার উপর দিয়া হাতি দ্রুতবেগে চলিয়াছে, হঠাৎ সে তাহার গতিবেগ আরো বাড়াইয়া দিল। মুহূর্তমধ্যে তারাকিশোর একটি বৃক্ষের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। তিনি সভয়ে দেখিলেন

বড় একটি ডাল এমনভাবে নীচু হইয়া আছে যে হাতিটি আর একটু অগ্রসর হইলেই ঐ বৃক্ষশাখার আঘাতে তাঁহার দেহটি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

ক্ষণপরেই কিন্তু ইন্দ্রজাল ঘটিয়া যায়। হাতিটি আরোহীসমেত ঐ বিপজ্জনক স্থান অতিক্রম করিয়া গেল অথচ দেখা গেল, বৃক্ষশাখাটি পশ্চাতে পূর্ববৎ নীচু হইয়াই রহিয়াছে। কি করিয়া যে তিনি উহাকে এড়াইয়া আসিলেন, কোনো বিচার বিশ্লেষণ দ্বারাই সে রহস্য ভেদ করা গেল না।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরে তারাকিশোর বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। সেদিন গুরুদেবের পদপ্রান্তে তিনি উপবিষ্ট—মনে কোনো প্রশ্ন নাই, মুখেও কোনো কথা কহিতেছেন না। কাঠিয়াবাবা মহারাজ হঠাৎ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "বেটা, গাছের ডাল কি ক'রে তোমার প্রাণনাশ করবে? ভগবান্ যে সদাই তোমার সঙ্গে ছায়ার মতো রয়েছেন, তোমায় রক্ষা ক'রে যাচ্ছেন।"

বৃন্দাবনের আশ্রমে কাঠিয়াবাবাজী একটি অন্ধকার সর্প-সঙ্কুল প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। ইহা দেখিয়া তারাকিশোর বড় ব্যথিত হন, সত্বর গুরুদেবের জন্য একটি ভাল আশ্রমভবন তৈরির জন্য খুব উদ্যোগী হইয়া পড়েন। কলিকাতা হইতে তিনি টাকা পাঠাইতেন আর বাবাজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে এটি নির্মিত হইত।

১৮৯৭ সালে এ নূতন আশ্রম সম্পূর্ণ হইবার পর যুগল শ্রীবিগ্রহ সাড়ম্বরে সেখানে স্থাপিত হইল। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন সারা ভারতে ভূমিকম্প হয়, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বৃন্দাবনে ইহা মোটেই অনুভূত হয় নাই। এমন কি, নিকট অঞ্চল মথুরায় ভূমিকম্প হইলেও বৃন্দাবনে সেদিন কোনো কম্পন ধরা গেল না।

দুই একদিন পরের কথা। তারাকিশোর গুরুজীর পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন। বিগ্রহের দিকে দেখাইয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে কহিলেন, "বাবুজী, তোমার যে ঠাকুরজী এখানে আসন নিয়েছেন, ইনি কিন্তু বড় জাগ্রত, বড় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। ঠাকুরজী কৃপালু হয়েছেন, তোমায় আজ তিনি বর দেবেন। তোমার মনে যা প্রার্থনা থাকে, তা জানিয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে বর মেগে নাও।"

তারাকিশোর উত্তর দিলেন, "বাবা আপনার সন্তোষই আমার প্রার্থনীয়। আপনি প্রসন্ন থাকলে কোন্ বস্তুর অভাব আমার থাকতে পারে? আমি আর কি বর চাইবো?"

কাঠিয়াবাবা মহারাজের নয়ন আনন্দে ঝলসিয়া উঠিল। সস্নেহে প্রিয় শিষ্যকে আবার কহিলেন, "বেটা, তোমার কথা খুবই ঠিক। কিন্তু কিছু পরীক্ষা ক'রে নেওয়াও তো চাই। আমি বলি কি, তুমি সামনে গিয়ে তোমার মনে যা কিছু অভিলাষ আছে তা দয়াল ঠাকুরজীকে নিবেদন করো—তাঁর কাছ থেকে সব কিছু চেয়ে নাও!"

এই সুস্পষ্ট নির্দেশ না মানিবার উপায় নাই। তারাকিশোর এবার মন্দিরস্থিত শ্রীবিগ্রহের কাছে উপস্থিত হইলেন। দণ্ডবৎ করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, "দয়াময়, গীতায় তুমি শ্রীমুখে বলেছ ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মার কথা—যাঁর শোক নেই আকাঙ্ক্ষা নেই, সর্বভূতে যিনি সমদর্শী, তোমার পরাভক্তি লাভ ক'রে তিনি তোমার পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হন—(মাতেই প্রবিষ্ট হন। তোমার শ্রীমুখ বর্ণিত শ্লোকে যে পরম অবস্থার কথা বর্ণনা করেছ, তাই যেন আমি প্রাপ্ত হই—এই কৃপাই তুমি আজ আমায় করো।"

তারাকিশোর মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিলে কাঠিয়াবাবা মহারাজ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসন্ন উদার দৃষ্টি শিষ্যের দিকে নিবদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন,

"বেটা, তুম্‌হারা অভীষ্ট সিদ্ধ হোগা, তুমসে ঋদ্ধিসিদ্ধিকা কভী টুটা নহীঁ পড়েগা—হাঁ, মহান্তীভী মিলেগী"।—বাবা তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হবে—ঋদ্ধি, সিদ্ধি তোমার কখনও ক্ষুণ্ণ হবে না, তাছাড়া, মোহান্তও তুমি হবে।

বাবাজী মহারাজ আবার আশ্বাস দিলেন, "ভগবৎ দর্শন তুম্‌কো জরুর মিলেগা। যদি মেরি ইয়ে বাতে সচ্চী নহীঁ হো তো হমভী সাচ্চা সাধু নহীঁ হ্যাঁয়া—অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন তোমার হবেই, যদি আমার একথা মিথ্যা হয় তবে আমি সাচ্চা সাধু নই, একথা জেনো।

তারাকিশোর আনন্দে গুরুজীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

গুরুকৃপার অমৃতের ধারা এবার তাঁহার জীবনপাত্রকে ভরিয়া তুলিতেছে। এদিকে যেমন চলিয়াছে কঠোর সাধনা, অপর দিকে তেমনিই অধ্যাত্ম-অনুভূতির দুয়ার তাঁহার একটির পর একটি খুলিয়া যাইতেছে। প্রায়ই তারাকিশোর ভাবেন, সংসারের কর্মে জড়িত থাকা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এবার তিনি সর্বত্যাগী হইয়া গুরু মহারাজ কাঠিয়াবাবাজীর চরণতলে পড়িয়া থাকিবেন, তাঁহার সেবাই জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টি কাটাইয়া দিবেন।

সে-বার তিনি গৃহত্যাগের জন্য স্থিরসঙ্কল্প। পত্নী অন্নদা দেবী কোনোদিনই স্বামীর ধর্মাচরণের অন্তরায় হন নাই—তিনিও তাঁহার সম্মতি দান করিলেন। চূড়ান্ত ব্যবস্থাদির পর তারাকিশোর নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু রাত্রে শয়নঘরে ঢুকিতে গিয়াই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলেন, দিব্য জ্যোতির্মণ্ডিত মূর্তিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দণ্ডায়মান। পরমপ্রভু মধুর হাসি হাসিতেছেন আর সারা ঘরটি স্বর্গীয় আলোক-ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিনকার এই অতীন্দ্রিয় দর্শন সম্বন্ধে তারাকিশোর নিজে লিখিয়াছেন, "তখন আমার হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল, সমস্ত জগৎকে আনন্দময় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। অবশভাবে অশ্রুপূর্ণনেত্রে শ্রীভগবান্‌কে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, তিনি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। আমার অন্তরে আনন্দস্রোত তখনও বহিতে লাগিল, কয়েকদিন সেই স্রোত চলিয়াছিল। সংসার দুঃখময়, অতএব পরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ হওয়াতে আমার যে তীব্র বৈরাগ্য আসিয়াছিল, সমস্ত সংসারকে আনন্দময়-রূপে দর্শন করিয়া আমার সেই ভাব আর রহিল না। বরঞ্চ আমার শয়নকক্ষেই যে তিনি দর্শন দিয়াছেন ইহাতে আপাতত আমার সংসারে অবস্থানই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইবার ইচ্ছাও ইহার ফলে তিরোহিত হইয়া গেল এবং পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।"

কয়েকমাস অতিক্রান্ত হইবার পর তারাকিশোর বৃন্দাবনে গিয়া কাঠিয়াবাবা মহারাজের চরণ বন্দনা করিলেন। কলিকাতায় থাকিতে শয়নগৃহের মধ্যে যে অপ্রাকৃত দর্শন ঘটিয়াছিল তাহাও গুরুজীকে জানাইতে দেরি হইল না। কাঠিয়াবাবাজী আনুপূর্বিক তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া খুশী হইলেন। তারপর শিষ্যকে সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, —"ইয়ে দর্শন বহুৎ ভাগ্‌সে মিলতা হ্যায়। লেকিন ইয়ে দর্শন ছায়া দর্শন হ্যায়। ইস্‌কে পিছে ঔরভী দর্শন হ্যায়"—অর্থাৎ, এ প্রকার দর্শন সাধকের পরম সৌভাগ্যের ফলেই সম্ভব হয়, কিন্তু এটা ছায়াদর্শন মাত্র—এর পরেও বহুতর দর্শন রয়েছে।

কাঠিয়াবাবা মহারাজের সহিত ব্রজপরিক্রমায় বাহির হইতে তারাকিশোরের বড় উৎসাহ ছিল। গুরুদেবের সেবার সর্ব ব্যবস্থা, অনুগামী সাধুদের খাওয়া-দাওয়া এবং ভ্রমণের ব্যয়

বহন ও তত্ত্বাবধান তিনি সানন্দে করিয়া যাইতেন। সেবার পরিব্রাজনকালে তারাকিশোর নন্দগ্রামে পৌঁছিয়াছেন। গ্রামের রাস্তা দিয়া তিনি কুণ্ডের দিকে যাইবেন, এমন সময় কতকগুলি গ্রাম্য বালক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল, বাবুজী আজ সবাইকে জিলেপী খাওয়াইবেন, তবে তাঁহাকে ছাড়া হইবে।

তারাকিশোরের আদেশে দোকানী ভিয়ান চড়াইয়া দিল। মিষ্টি প্রস্তুত হইবামাত্র হঠাৎ কোথা হইতে এই বালকদের মধ্যে দুইটি অপূর্বদর্শন বালক আসিয়া উপস্থিত। যেমন তাহাদের নয়নাভিরাম রূপ, তেমনই মোহন কণ্ঠস্বর। তারাকিশোরের দিকে চাহিয়া বঙ্কিম হাসি হাসিয়া বালক দুইটি কহিল, "বাবা, ইয়ে সব বড়া উপদ্রবী, তুম্ হম দোনোকো জিলাবী দে দো, হম্ সবকো বাট দেঙ্গে।"

চারিদিকে দুষ্ট বালকদের হৈ-চৈ। তারাকিশোর তাহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কেবলই নির্নিমেষে ঐ দিব্যদর্শন বালকদ্বয়ের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। কি অপরূপ—এ যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলরাম! জিলেপী তৈরি হইলে তাহাদেরই হস্তে উহার সবটা তুলিয়া দেওয়া হইল। চঞ্চল বালকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া তাহারা নিজেরাও কিছুটা ভোজন করিল। উপস্থিত সকলে যেন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই এই দুই বালকের নেতৃত্ব মানিয়া নিয়াছে।

ইহার কিছুকাল পরেই দেখা গেল, দিব্যদর্শন বালক দুইটি আর সে ভিড়ের মধ্যে নাই। কোন্ সময় কি করিয়া যে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা কেহ বলিতে পারে না। সাধক তারাকিশোরের মর্মকোষে কোন্ মায়াবী আজ তাহার মোহন স্পর্শটি বুলাইয়া দিল? তাঁহার সারা দেহটি তখন পুলকাঞ্চিত, আর দুই চক্ষু বাহিয়া প্রেমাশ্রুর ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। লীলাপর কৃষ্ণ বলরাম কৃপা করিয়া ছদ্মবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়া গেলেন, ইহাই হইল তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি। তাঁহার আনন্দের আর অবধি রহিল না।

আর একবারের কথা। ব্রজপরিক্রমার সময় তারাকিশোর সকলকে নিয়া পথ চলিতেছেন। পূর্বদিন একাদশী গিয়াছে, পরদিনও গুরুজী ও সাধুদের ভোজনাদি করাইতে সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল।

তারাকিশোরের ভাগ্যে সেদিন আর আহার জুটিল না। নিজের মনকে বুঝাইলেন, আজ বোধহয় শ্রীঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে তাঁহার জন্য আহার সংগৃহীত হোক্।

কাজকর্ম এবং সাধনভজন সারিয়া তারাকিশোর মধ্য রাত্রে সবেমাত্র তাঁহার শয্যায় একটু গা এলাইয়া দিয়াছেন। হঠাৎ তাঁবুর বাহিরে অন্ধকারে এক অপরিচিত বালকের হাঁক-ডাক শুনা যাইতে লাগিল। "বাবুজী কাঁহা হ্যায়," বলিয়া বারংবার বালকটি তারস্বরে চিৎকার করিতেছে।

কাঠিয়াবাবা মহারাজ তখনো নিদ্রা যান নাই, স্বস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আগন্তুক বালকের স্বর তাঁহার কানে প্রবেশ করিল। অমনি রহস্যময় হাসি হাসিয়া তাঁহার সেবকশিষ্য বালকদাসকে বলিলেন, "ওরে, শুনছিস্ না? তারাকিশোরকে কে যেন ডাকাডাকি করছে? একবার শিগ্‌গীর বাইরে যা।"

বালকদাস অনুসন্ধিৎসু হইয়া বাহিরে যাইবামাত্র একটি বালক এক লোটা দুধ দিয়া অন্তরঙ্গভাবে জানাইল, ইহা বাবুজীর জন্য—তাহাকেই যেন পান করিতে দেওয়া হয়। ভাণ্ডটি তারাকিশোরের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইল। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই

আহার্যের ব্যবস্থা দেখিয়া তারাকিশোর তো অবাক্! ছুটিয়া গিয়া আগন্তুক বালককে তখনই ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চকিতে সে কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে।

গুরুদেবের সম্মুখে গিয়া তারাকিশোর দেখিলেন, প্রসন্ন হাসিতে তাঁহার মুখখানা ভরিয়া উঠিয়াছে। কাঠিয়াবাবাজী প্রিয় শিষ্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বেটা, পহেলে ইয়ে দুধ তো পী লো, তুম্হারে লিয়েই সব দুধ আ গয়া।" পেস্তা বাদাম মিছরি মিশ্রিত এই দুধের স্বাদ বড় অপূর্ব। তারাকিশোর পরম তৃপ্তিসহকারে সমস্ত দুধই পান করিয়া ফেলিলেন। দুগ্ধবাহী এই রহস্যময় বালকের সন্ধান কিন্তু পরের দিনও কোনোমতেই মিলিল না।

কাঠিয়াবাবাজী শিষ্যকে নানাভাবে পরীক্ষা কম করেন নাই। একবার কিছু সময়ের জন্য তারাকিশোরের ওকালতির আয় খুব কমিয়া গেল। অথচ সংসারের বিপুল খরচ কিছুমাত্র হ্রাস করার উপায় নাই। গরীব ছাত্রদল ও আত্মীয়-স্বজনকেই বা হঠাৎ তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতে বলিবেন? গুরুদেবকে প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাইতে হয়, তাহাও চালাইয়া যাইতে হইবে। ফলে বেশ কিছু ঋণ হইতে লাগিল। তদুপরি বৃন্দাবনে যাওয়ার সময়ে তিনি অনেক টাকা ধার করিলেন।

সেখানে পৌঁছানোর পর কাঠিয়াবাবা মহারাজ তারাকিশোরকে নিয়া এক বিচিত্র খেলা খেলিতে লাগিলেন। প্রায়ই তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া আশ্রমের এক একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন। কোনোদিন গরুর ভুষি বা ঘাস, কোনোদিন বা আশ্রমের অধিবাসীদের জন্য গম, ছোলা ও চাল আনাইয়া নেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিয়া নিজেই ইহার কতক অংশ নষ্ট করেন, তারাকিশোরের উপর আবার এ সব জিনিসই নূতন করিয়া আনিবার চাপ পড়ে। তিনি কিন্তু চরম অর্থকষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে থাকিয়াও গুরুজীর প্রতিটি বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিয়াছেন। ইহার উপর এবারের ব্রজ পরিক্রমার ব্যয় বহনের জন্যও ঋণের বোঝা তাঁহার আরো বাড়িয়া গেল।

তারাকিশোরের স্ত্রীকেও কাঠিয়াবাবা মহারাজ এ সময়ে সহজে নিষ্কৃতি দেন নাই। পরীক্ষার জন্য, ব্রজপরিক্রমার সময়, এ শিষ্যাকে তিনি এক একদিন চূড়ান্ত পথকষ্টে কাতর করিয়া তবে ছাড়িতেন।

একদিন তারাকিশোরের গৃহিণী কি এক কাজে আশ্রমের বাহিরে গিয়াছেন। আকাশের চারিদিক কালো করিয়া প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি সাজিয়া আসিতেছে। বাবাজী মহারাজ তাঁহার সেবক শিষ্যটিকে আদেশ দিলেন, "ওরে আশ্রমের কপাট এখনি বন্ধ ক'রে দে।" অন্নদা দেবী ঠিক সে সময়ে আশ্রম ভবনের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। দরজায় বহুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পর তিনি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, সিঁড়িতে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিজিতে লাগিলেন ঝড়বৃষ্টিতে।

এভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, সিক্ত দেহ যখন প্রায় অসাড় হইয়া গিয়াছে, আশ্রমে উপবিষ্ট বাবাজী মহারাজ তখন হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিলেন। সেবকদের ডাকিয়া ব্যস্তভাবে চেঁচামেচি করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওরে, তোরা দ্যাখ্, নিশ্চয় আশ্রমের কোনো চাকর বাইরে গিয়ে এই ঘোর বর্ষায় আটকে পড়েছে, তোরা খোঁজ নে।'

দুয়ার খুলিয়া দেখা গেল, তারাকিশোর-গৃহিণী মৃতকল্প অবস্থায় মাটিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন।

সকলে মিলিয়া দীর্ঘ সময় অগ্নির উত্তাপ দিলে তবে তিনি সুস্থ এবং স্বাভাবিক

হইয়া উঠেন। তারাকিশোর এবার স্ত্রীকে কহিলেন, 'দ্যাখো, তুমি কিন্তু এতে একটুও মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। গুরুমহারাজ অন্তর্যামী, কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে ঘটছে না. এটা জেনো। আমাদের কল্যাণের জন্যই এ সব যত কিছু দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা।"

ইহার পর অন্নদা দেবী কাঠিয়াবাবাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, "মাঈ, এবার বৃন্দাবনে আসার পর হতেই তোমাদের দু'জনকে নানারূপে আমি পরীক্ষা করেছি। তোমরা তাতে উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি প্রসন্ন হয়ে বলছি, তোমাদের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

স্বামী স্ত্রীর চোখে তখন পুলকাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে তারাকিশোর একটি বড় মোকদ্দমায় নিযুক্ত হন। ইহাতে তাঁহার অজস্র অর্থাগম হইতে থাকে এবং তাঁহার সমস্ত ঋণ শোধ হইতেও বেশী দেরি লাগে নাই। পরবর্তী জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল হিসাবে তাঁহার একটানা উন্নতির ধারা বহিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরূপেও তিনি কীর্তিত হইয়াছেন।

বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রচার—সংসারজীবনে তারাকিশোরের এক মহৎ কার্য। তাঁহার রচিত 'ব্রহ্মবাদীঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা', 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা' কল্যাণকর অধ্যাত্ম-সাহিত্যরূপে এদেশে দীর্ঘকাল পরিচিত থাকিবে। সাধক তারাকিশোরের তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির নিদর্শন এ গ্রন্থ দুটিতে পাওয়া যায়।

এ ধরনের শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারাকিশোর নিজে অপূর্ব সারল্যের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমার পাণ্ডিত্যের অভাব এতই অধিক যে সাধারণ ব্যাকরণ শাস্ত্রেও আমার ব্যুৎপত্তি অতি অল্প। তবে আমার ভাগ্য অতি সাধারণ কারণ, আমি মহৎ কৃপা লাভ করিয়াছি। সেই কৃপাবলে, অতি দুর্বোধ্য দর্শনশাস্ত্র সকলও স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তাঁদের গোপনে রক্ষিত জ্ঞানামৃত আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমিই স্থানে স্থানে বিস্মিত হইয়াছি।"

"হিন্দু পাণ্ডিতসমাজে অবশ্য ইহা সর্ববাদীসম্মত যে, শ্রীভগবান্ দেবব্যাস, মহর্ষি কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম প্রভৃতি সিদ্ধর্ষিগণ ভ্রম-প্রমাদশূন্য 'আপ্ত' পুরুষ ছিলেন. সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত মতবিরোধ থাকা অসম্ভব। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে আপাতত যে সকল বিরোধ তাঁহাদের উপদিষ্ট গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহার অবশ্য কোনো না কোনো মীমাংসা আছে। আমার হৃদয়ে শ্রীগুরুকৃপায় দর্শনশাস্ত্র সকলের সামঞ্জস্য স্থাপনে সমর্থ একপ্রকার মীমাংসা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাণ্ডিতসমাজে প্রকাশ করা হইলে. তাহাদ্বারা মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

কি শাস্ত্রের রহস্যভেদে কি ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভে, গুরু কৃপাই মানুষের প্রধানত অবলম্বন—ইহাই ছিল তারাকিশোরের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি দীর্ঘ সাধনজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

সে-বার বৃন্দাবনে থাকিতে গুরুমহারাজকে তারাকিশোর সখেদে বলিতেছিলেন, "বাবা, নামজপের সময় আমার চিত্ত ঠিকমতো স্থির থাকছে না, ভজন-পূজনের সময়ও তেমনভাবে আমি কিন্তু পাচ্ছিনে। আমার প্রতি আপনার পূর্ণ কৃপা করে হবে?"

বাবাজী প্রিয় শিষ্যকে উত্তর দিলেন, "দ্যাখো, আমার এসব কোনো কিছুই অজানা

নেই। কিন্তু প্রকৃত ভজন এক মহাবস্তু, তা তুমি এখনি কি ক'রে জানবে? সে ভজন করার মতো সামর্থ্য তোমার নেই। ভজন তো আমিই ক'রে যাচ্ছি।”

গুরুসেবা ও আশ্রমের পরিচর্যার মধ্য দিয়া চিত্ত নির্মল হয়, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা গড়িয়া উঠে আর ইহার ফলেই প্রকৃত ভজনের অধিকার জন্মে। এই তত্ত্বটি কাঠিয়াবাবাজীর নিকট তারাকিশোর বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে একবার তাঁহার উপর আশ্রমের হাটবাজার করার ভার অর্পিত হয়। প্রভাতে উঠিয়াই দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্রাদি তাঁহার ক্রয় করিবার কথা। কিন্তু তারাকিশোরের সেদিকে কোনো হুঁশই নাই, মনের আনন্দে এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া তিনি একাগ্রচিত্তে নামজপ করিয়া চলিয়াছেন। সাধনভজনে রত থাকিলে কি হয়, সেবাকার্যের এই শৈথিল্যের জন্য সেদিন কাঠিয়াবাবার নিকট তাহাকে কম তিরস্কার সহ্য করিতে হয় নাই।

জন্মান্তরের অধিকার ও শুভসংস্কার নিয়া তারাকিশোর গুরুর আশ্রয়-ছায়ায় আসিয়া পড়িয়াছেন। গুরুমহারাজের যোগসিদ্ধি যেমন অপরিমেয়, তেমনি কৃপারও তাঁহার অন্ত নাই। শিষ্যের অধ্যাত্মজীবনের প্রতিটি তরঙ্গভঙ্গীর উপর তাঁহার দিব্যদৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, অবলীলাক্রমে তিনি উহা নিয়ন্ত্রণ করেন। গুরু ও শিষ্যের একটি ব্যক্তিগত সংলাপের মধ্যে ইহার চমৎকার নিদর্শন মিলে—

বৃন্দাবনে থাকিতে তারাকিশোর একদিন তাঁহার দেহে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করিতেছেন। তাই কাঠিয়াবাবাজীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, আমার বুকের ভেতর একটা শক্তির ঊর্ধ্বগতি কেবল বেধে যাচ্ছে। বড় কষ্ট পাচ্ছি।”

“হাঁ-হাঁ, তা তো হবারই কথা। ভেতরকার কমল যে ওকে বাধা দিচ্ছে।”

“মহারাজ, আমার কৃপা করুন, সে বাধাটি আপনি অপসারিত ক'রে দিন।”

দৃঢ় স্বরে কাঠিয়াবাবাজী কহিয়া উঠিলেন, “কভি নহী’!”

তারাকিশোর নির্বাক্‌ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গুরুজী সস্নেহ দৃষ্টি তাঁহার উপর বুলাইয়া নিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “এখনি যদি তোমার গ্রন্থি আমি খুলে দিই, তবে তোমাকে দিয়ে আর কোনো কাজই যে হবে না। সংসারে থেকে আরও কিছু কর্তব্য, কল্যাণকর কাজ, তোমায় করতে হবে। চিন্তা নেই ঠিক সময়মতোই আমি গ্রন্থি খুলে দেব।”

পরমক্ষণটি আসিতে দেরি হয় নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধক তারাকিশোরের কর্তব্যের এই বিধি নির্দিষ্ট নিগড় উন্মোচিত হইয়া যায়, চিরতরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। মুক্ত বিহঙ্গ সানন্দে ঝাঁপাইয়া পড়ে উদার আকাশের বুকে।

১৯১৫ সাল, আগস্টমাসের অপরাহ্ন। হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে সেদিন মস্ত আলোড়ন। প্রবীণ ও নবীন সকল উকীল, ব্যারিস্টার সেখানে ভিড় করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী তারাকিশোর ওকালতি ছাড়িয়া চিরতরে বৃন্দাবনে যাইবেন। যে শেষ মোকদ্দমাটির পরিচালনভার হাতে ছিল তাহার কাজ এইমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে। তারাকিশোর সহকর্মীদের নিকট বিদায় নিবার জন্য স্মিতহাস্যে বসিয়া আছেন। ক্রমে অভিবাদন ও আলিঙ্গনের পালা শুরু হইল। সমবেত সকলেরই হৃদয় ভাবাক্রান্ত, কেহ কেহ অতিকষ্টে উদ্‌গত অশ্রু গোপন করিতেছেন।

ভিড় ঠেলিয়া স্যর রাসবিহারী ঘোষ তারাকিশোরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। নীচু

হইয়া তিনি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে যাইবেন, এমন সময় তারাকিশোর ব্যস্তসমস্ত হইয়া হাতটি ধরিয়া ফেলিলেন। ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, "ছি, ছি, একি কচ্ছেন বলুন তো? আপনি সর্বজনমান্য, তাছাড়া, বয়োজ্যেষ্ঠ। প্রণাম করে আমায় দোষের ভাগী করবেন না।"

স্যার রাসবিহারী উত্তর দিলেন, "না, না তারাকিশোর, তুমি আমায় বাধা দিয়ো না। আমি বয়োবৃদ্ধ ঠিকই, কিন্তু তুমি যে জ্ঞানবৃদ্ধ। চুল পাকিয়ে ফেললাম, বস্তু অবস্তু, সত্য ও মিথ্যা এ জ্ঞান তো আজো হয় নি। তোমার তা হয়েছে। তাই সাংসারিক জীবনের এত কিছু সম্ভাবনা অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে তুমি বৃন্দাবনের পথে পা বাড়াচ্ছো—বাধা দিয়ো না, আজ তোমার পদধূলি আমায় গ্রহণ করতে দাও।" ভাবাবেগে, কম্পিত দেহে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ও প্রবীণ নেতা স্যার রাসবিহারী তারাকিশোরকে প্রণাম করিয়া তবে সেদিন নিবৃত্ত হন।

স্যার রাসবিহারী পূর্ব হইতে জানিতেন, তারাকিশোরের প্রাণে মুক্তির আহ্বান আসিয়া গিয়াছে, সোনার শিকল তিনি অচিরেই কাটিয়া বাহির হইবেন। তবুও মাঝে মাঝে প্রিয় সহযোগীকে তিনি বলিতেন, "তারাকিশোর, আমার শরীর অপটু হয়েছে। শিগ্‌গীর প্র্যাক্‌টিস ছাড়বো। অল্প কিছুকাল তুমি অপেক্ষা করো, কয়েক লাখ টাকা নিয়ে বৃন্দাবনে যেতে পারবে। তোমার গুরু মহারাজের আশ্রমের তাতে কাজ হবে।" উত্তরে তারাকিশোর শুধু মৃদু মধুর হাসিতেন।

অর্থের উপার্জন ও সঞ্চয়কে তিনি মুখ্য বলিয়া কখনই ধরেন নাই। সাধনভজনেই তাঁহার বেশী সময় ব্যয় হইত, সন্ধ্যার পর মোকদ্দমার নথিপত্র নিয়া মোটেই বসিতেন না, কাজেই বহু মামলার 'ব্রীফ' তাঁহাকে ফেরত দিতে হইত। শুধু মিথ্যা মামলাই যে নিতেন না তাহাই নয়, আপীলের হার হইবে এমন সম্ভাবনা দেখিলে মক্কেলকে প্রায়ই প্রতিনিবৃত্ত করিতেন। নিজের প্রাপ্য অর্থের আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া শরণাগত মক্কেলের অর্থের অপচয় নিবারণেই তিনি ব্যস্ত হইতেন বেশী। প্রতিভাবান্ আইনজীবী হিসাবে যশ ও প্রতিষ্ঠা যতই হোক, এমন অর্থ-বিমুখ বৈরাগীর কাছে অর্থ কি করিয়া ভিড় করিবে?

কাঠিয়াবাবাজীর জন্য একটি নূতন বৃহদায়তন আশ্রমভবন ইতিমধ্যে তারাকিশোর শুরু করিয়া দেন, কিন্তু ইহা সমাপ্ত হওয়ার আগেই গুরুমহারাজ দেহত্যাগ করেন।

অগৌণে মন্দিরটি শেষ না করিলে নয়, এজন্য বিরাট ঋণের বোঝা তাঁহার মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে। হাইকোর্ট ও সংসারজীবন তারাকিশোর আরো আগেই ত্যাগ করিতেন, কিন্তু ঋণভার মোচনের অপেক্ষায়ই এতদিন এসব নিয়া রহিয়াছেন।

বৃন্দাবনে মন্দির নির্মাণ অতঃপর শেষ হইয়া গেল। বহু ব্যয়ে তারাকিশোর তাঁহার বড় সাধের নিম্বার্ক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু দুর্ভোগ এজন্য কম ভুগিতে হয় নাই—ঠিকাদার ও বন্ধুবান্ধবদের ঋণের বোঝা প্রায় দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। তবে স্বস্তি শীঘ্রই মিলিল, ভগবৎ কৃপায় কয়েকটি নূতন বড় মামলার উপার্জন হইতে এ দায় মিটিয়া গেল। তাহার পরই হাইকোর্ট হইতে সেদিনকার এই বিদায় গ্রহণ।

আরও প্রায় দুইমাস বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সংসারে থাকিতে হয়। বহু দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে নিয়মিতভাবে তিনি সাহায্য করেন, হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিলে

এই লোকগুলি নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। তারাকিশোর ভাবিলেন, সাহায্য বন্ধ হইলে আর তো ইহারা তাঁহার সংসার-ত্যাগ ও সাধনজীবনকে সুচক্ষে দেখিবে না। তাছাড়া এই দুঃস্থদের শুভেচ্ছা হইতে বঞ্চিত হওয়া তাঁহার দিক দিয়া কল্যাণকর নয়। ইহাদের একটা ব্যবস্থা না করিয়া বৈরাগ্য আশ্রমের পথে অগ্রসর হইতে তাঁহার মন চাহিতেছে না।

মফঃস্বলের এক মামলার কিছু টাকা পাওনা ছিল, তাহার কয়েক হাজার টাকা এ সময়ে হাতে আসিয়া পৌঁছে। দামী আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়াও কিছু পাওয়া গেল। মাসিক সাহায্য তিনি যাহাদের প্রদান করিতেন, এ টাকা হইতে এককালীন কিছু কিছু দিয়া তাহাদের কতকটা সন্তুষ্ট করিলেন।

এবার সস্ত্রীক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের আশ্রমে চলিয়াছেন। গৃহ হইতে এই শেষ বিদায়ের দৃশ্যটি বড়ই মর্মস্পর্শী। বাড়ির অধিকাংশ মূল্যবান জিনিসপত্র পূর্বেই বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, শেষের দিনটিতে তাহাও বিলাইয়া দিলেন। অতঃপর বৃন্দাবনে যাওয়ার তৃতীয় শ্রেণীর রেল ভাড়ার সংস্থানও তাঁহার কাছে রহিল না।

মুক্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণের জন্য হৃদয় আজ আগ্রহব্যাকুল। মাঝে মাঝে এক অপার্থিব আনন্দস্রোত তারাকিশোরকে ভাবতন্ময় করিয়া ফেলিতেছে। প্রকৃত অবস্থাটি বুঝিয়া নিয়া এক অন্তরঙ্গ বন্ধু কোনো এক সুযোগে উত্তরীয়ের কোণে পাথেয় স্বরূপ কিছু টাকা বাঁধিয়া দিলেন। আপনভোলা সাধকের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নাই। কাঙাল বৈষ্ণব হইয়া তিনি গুরুধামে থাকিবেন, শ্রীরাধা বিহারীর ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন—এই আনন্দেই তিনি মাতোয়ারা।

তারাকিশোর সাধের বৃন্দাবনের আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। গুরুমহারাজ প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ নরদেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, গুরুধাম আজ তাঁহার বিহনে খাঁ-খাঁ করিতেছে। কিন্তু তারাকিশোর নিজে জানেন, তাঁহার ব্রহ্মবিদ্ গুরুর করুণালীলার আজিও কোনো ছেদ পড়ে নাই, ভাগ্যবান্ ভক্ত শিষ্যদের এখনও তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দেন, প্রয়োজনমতো সাধন-নির্দেশও তাঁহারা প্রাপ্ত হন। তারাকিশোরের নিজ জীবনেও এ অলৌকিক অভিজ্ঞতা কয়েকবার ঘটিয়াছে।

কৃপাময় কাঠিয়াবাবাজীর আশীর্বাণী আজিও তাঁহার অন্তরে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্যে স্তরের পর স্তর তাঁহাকে অতিক্রম করাইয়া দেয়। বৃন্দাবনের গুরুধামে বসিয়া তারাকিশোর এবার তাঁহার শেষ তপস্যায় ব্রতী হইলেন।

সমস্ত দিন একনিষ্ঠ হইয়া তিনি সাধনভজন করেন, আর এই সঙ্গে চলে রাধাবিহারী-জীর নিয়মিত সেবা। রান্না, বাসনমাজা হইতে শুরু করিয়া শ্রীবিগ্রহের পূজা, শৃঙ্গারবেশ পর্যন্ত সব কিছুই তিনি নিজ হাতে করেন। আশ্রমের নানা কর্মে লিপ্ত থাকার ফলে ক্ষোভ ও ক্রোধের উদ্রেক হয়তো হইতে পারে, এজন্য তিনি মৌন অবলম্বন করিলেন। যোগাভ্যাসের ফলে গৃহাশ্রমে থাকিতেই তাঁহার নিদ্রা কম ছিল, এবার তাহা আরও কমিয়া গেল। সারাদিনের সাধনভজনের পর কখন যে তিনি শয্যায় শয়ন করিতেন, আশ্রমিকদের অনেকে তাহা জানিতে পারিত না। মধ্য রাত্রে সামান্য একটু নিদ্রার পরই আবার শেষ যাম হইতে চলিত তাঁহার ধ্যানজপ।

সেদিন প্রত্যূষে দেখা গেল, মন্দিরের ভিতরকার প্রকোষ্ঠ হইতে শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার-গুলি প্রায় সবই চুরি হইয়া গিয়াছে।

তারাকিশোরের মর্মবেদনার আর অন্ত রহিল না। বিষণ্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি ভজনসাধন ছেড়ে নিয়মিতভাবে শয্যা গ্রহণ করি, তা বোধহয় গুরু মহারাজের ইচ্ছে নয়। তাছাড়া, বায়ুর ঊর্ধ্বগতির জন্য ঘুম তো প্রায় হয় না। তবে কেন আর আলস্য ক'রে এই মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করা?' ইহার পর হইতে কঠোরব্রতী তাপসের জীবনে নিদ্রা একেবারেই পরিত্যক্ত হইল। প্রায় সমস্ত রাত্রিটাই ভজন ও ধ্যানজপে তিনি কাটাইয়া দিতেন। শেষ রাত্রিতে রাধাবিহারীজীর মঙ্গলারাত্রির সময়। সে সময়ে ঘুমন্ত মন্দির পূজারীকে জাগাইয়া দিয়া সামান্য একটু বিশ্রাম নিতেন মাত্র।

আশ্রমে এই তপস্যার কালে তারাকিশোর তাঁহার সমগ্র অতীত জীবনের উপর এক বিস্মৃতির যবনিকা টানিয়া দিয়েছিলেন। সংসার-আশ্রমের বিরাট প্রতিষ্ঠা, বিত্ত মানসম্ভ্রমের স্মৃতি নিষ্করুণভাবে এসময়ে মুছিয়া ফেলিলেন। অন্তর্জীবনের এই নতুন অধ্যায় তাঁহার চেহারাতেও এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। আগের দিনের মানুষটিকে আর চিনিবার উপায় নাই।

এই সময়ে একবার তাঁহার পরিচিত কোনো ভদ্রলোক বৃন্দাবনে নিম্বার্ক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। সম্মুখে দণ্ডায়মান, দীনবেশ তারাকিশোরকেই তিনি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করেন, "সংসার ত্যাগ ক'রে এসে তারাকিশোর চৌধুরী এখানে বাস কচ্ছেন, তিনি কোথায়?"

পরম ঔদাসীন্যের সহিত তারাকিশোর সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন। "মশাই, তিনি তো মারা গিয়েছেন।"

একথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি সখেদে চলিয়া গেলেন। পূর্বাশ্রমের পরিচয় তারাকিশোর এমনিভাবে অবলুপ্ত করিতে চাহিতেন।

তাঁহার দীর্ঘ সাধনা ও কঠোর তপস্যার কথা কেহ কখনো উল্লেখ করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি বলিয়া উঠিতেন, তপস্যা ক'রে কিভাবে ভগবানকে লাভ করতে হয় তা বুঝতে হলে আমার বাবাকে দেখ।" গুরুমহারাজের নাম উল্লেখ করা মাত্রই প্রবীণ সাধকের দুই চোখে প্রেমাশ্রু ছলছল্ করিয়া উঠিত। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিতেন, "আমার সাধনভজন তো কিছুই ছিল না। গুরুমহারাজের কৃপাতেই আমার সব কিছু হয়েছে।" সদ্‌গুরুর অমোঘ আশীর্বাদ এই সর্বনিবেদিত প্রাণ সাধকের জীবনে সফল হইয়া উঠে, অচিরে হন তিনি পূর্ণমনস্কাম।

বাহ্যতঃ দেখা যাইত, তারাকিশোর গুরুধাম বৃন্দাবনে বসিয়া নিতান্ত সাধারণ এক ভক্ত ও আশ্রমিকের জীবনই যাপন করিয়া চলিয়াছেন। অথচ তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের অন্তরালে যে জ্ঞানময় রূপটি উদ্ভাসিত, তাহার সহিত পরিচয়লাভের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই ছিল। প্রকৃত সাধকের সন্ধানী দৃষ্টি ছাড়া সহসা এই মহাপুরুষের স্বরূপটি ধরা সম্ভব হইত না।

বৃন্দাবনের ব্রজবিদেহী মোহান্তের পদমর্যাদা অসামান্য। ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবদের ইনি একচ্ছত্র নেতা, ইহার নির্দেশাদি আখড়ার সাধুসন্ত ও ভক্তদের মানিয়া চলিতে হয়। মঠ, আশ্রম, বিত্তবৈভব কিছু থাক বা না থাক সম্প্রদায়-গুরুরূপে ইঁহার পদাধিকার ও মাহাত্ম্য সর্বত্র স্বীকৃত হইয়া থাকে।

মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বভারও বড় কম নয়। ব্রজপরিক্রমার সময়ে নানা স্থান হইতে আগত বৈষ্ণব সাধু জমায়েতের পরিচালনা, তাঁহাদের দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের মীমাংসা, অনেক কিছুর ভার মোহান্তজীর উপর ন্যস্ত থাকে।

কাঠিয়াবাবা মহারাজের ঘরেই গুরু পরম্পরাক্রমে দীর্ঘকাল যাবৎ এ মোহান্তাই বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বাবাজী মহারাজের দেহত্যাগের পর হইতে ইহা নিয়া নানা সমস্যার উদ্ভব হইতে থাকে। বর্তমান মোহান্ত বিষ্ণুদাসজী বয়সে তরুণ, বড় সাধকও নন, তাই তাঁহার নেতৃত্ব ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। তাছাড়া এই কর্তব্যের গুরুভার বহন করিতেও তিনি আর সম্মত নহেন। তাই কাঠিয়াবাবাজীর পরম স্নেহভাজন শিষ্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধক তারাকিশোরকে তিনি ধরিয়া পড়িলেন—তাঁহাকেই এই মোহান্তপদ গ্রহণ করিতে হইবে।

তারাকিশোর ইহা এড়াইতে চান। তিনি ভাবিলেন, বৃন্দাবনের সকল মোহান্তদের দিয়া বিষ্ণুদাসজীকে বলাইবেন—তিনি যেন অন্তত আরও এক বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, ইতিমধ্যে সম্প্রদায়ের নতুন গুরু নির্বাচন করিয়া নেওয়া যাইবে। এ উদ্দেশ্যে ঝুলন পূর্ণিমার পরের দিন তিনি বৃন্দাবনের সকল মোহান্তকে কাঠিয়াবাবা মহারাজের নূতন আস্তানা নিম্বার্ক আশ্রমে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, ঐদিনকার সাধু পঙ্গতের দ্বারা বিষ্ণুদাসজীকে মোহান্তাই চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন।

আগের দিনই কিন্তু নিম্বার্ক আশ্রমে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পূর্ণিমার রাত। সারা আশ্রম মন্দির ও প্রাঙ্গণ শুভ্র জ্যোৎস্নায় ছাইয়া গিয়াছে। সাধক তারাকিশোর ধ্যানের গভীরে নিমজ্জিত। হঠাৎ তাঁহার আসনের সম্মুখে বিদেহী কাঠিয়াবাবার জ্যোতির্ময় মূর্তিটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গুরুমহারাজের আননে অপরূপ প্রসন্নতার দীপ্তি। সস্নেহ ভঙ্গিতে তিনি কহিলেন, "বেটা, যা কিছু কর্তব্যকর্ম তুমি করবে, তবে নিজে করছো—তা কখনো ভেবো না। তোমার সকল কর্মের ভার আমার উপর, এ কথাটাই সার জেনো।" তারাকিশোরের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিটি কিছুক্ষণ নিবদ্ধ রাখিবার পর বাবাজী মহারাজের মূর্তি ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়া গেল।

পরদিনই আশ্রমভবনে বৈষ্ণব মোহান্তদের পঙ্গত হইবার কথা, সেখানে বিষ্ণুদাসজীর মোহান্তাইর প্রশ্নটি সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। ঠিক ইহার পূর্ব রাত্রে বিদেহী গুরুমহারাজ কোন্ কল্যাণময় ইঙ্গিত নিয়া আবির্ভূত হইলেন? তারাকিশোর এই কথাই শুধু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন।

পরদিন মোহান্তদের নিকট যাওয়ামাত্র সকলে তারাকিশোরকে সোৎসাহে সংবর্ধনা জানাইলেন। তাঁহার দিব্য লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত মূর্তিটি দেখিয়া এক প্রাচীন সাধু সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "ইয়ে তো বহুৎ আচ্ছা দর্শনী মূর্তি হ্যায়, ইয়ে সব তরেসে মোহান্ত হোনে কি লায়েক হ্যায়।" অর্থাৎ এঁর রূপ তো বড় চিত্তাকর্ষক, ইনিই দেখছি মোহান্ত পদ লাভের যোগ্যতম ব্যক্তি।

বিশিষ্ট বৈষ্ণব মোহান্তদের অনেকেই সেদিন সেখানে উপস্থিত। সর্বসম্মতিক্রমে সকলে তারাকিশোরকেই মোহান্তপদে নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আগের রাত্রিতে গুরুজীর অলৌকিক আবির্ভাবের কথা তারাকিশোরের মনে ভাসিয়া উঠিল। যে কর্তব্য সম্মুখে উপস্থিত হইবে, গুরুদেবেরই নিজ কার্য বলিয়া তাহাকে গণ্য করিতে

তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। মোহান্তপদ নেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় সেদিনকার ঐ আবির্ভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাই সাধুদের কথা অমান্য করার আর উপায় রহিল না।

কৌপীন ধারণ করিয়া তারাকিশোর যথাবিধি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন নাই, এখনও তিনি গৃহস্থাশ্রমের নামেই পরিচিত। কিন্তু উপস্থিত সাধু মোহান্তগণ ইহাতে দমিবার পাত্র নহেন, তাঁহাকে বৈষ্ণব প্রথানুযায়ী সন্ন্যাস দিবার জন্য সবাই উদ্যোগী হইয়া পড়িলেন। অনুষ্ঠানটি অগোণে উদ্‌যাপিত হইল এবং মোহান্তাই-এর মালা ও চাদর পরাইয়া তাঁহারা তারাকিশোরকে অভিনন্দিত করিলেন।

সকল মোহান্ত একত্র হইয়া তাঁহাকে এই বৈরাগ্য-আশ্রম প্রদান করিলেন, তাই নামকরণ হইল সন্তদাস। ১৩২৫ সালের এই শুভ দিবসটি ভক্ত তারাকিশোরের জীবনে এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত করিয়া দিল।

এই সন্ন্যাস গ্রহণের কালে ভাবতন্ময় তারাকিশোরের স্মৃতিতে গুরুদেবের পূর্বেকার আশীর্বাণীটি জাগরূক হইয়া উঠে। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, 'মোহান্তাই ভী মিল্ জায়গী।' এই আকস্মিক সংঘটনটি অবশ্যই বাবাজী মহারাজের এক কৃপালীলা, নতুবা নিম্বার্ক আশ্রমে এতলোক থাকিতে মোহান্তের দল তাঁহাকেই বা এই মর্যাদাপূর্ণ পদে বসাইতে এমন ব্যগ্র হইবেন কেন? সুদূর বাংলার এক অজ্ঞাত অখ্যাত সাধক তিনি। তাছাড়া, এখনও সন্ন্যাসী নহেন—গৃহস্থাশ্রমী। শুধু তাহাই নয়, পত্নী তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনের আশ্রমেই অবস্থান করিতেছেন। এ অবস্থায় ব্রজভূমির প্রাচীন সাধুরা কাঠিয়াবাবার গদি ও ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবদের নেতৃত্বের পদে তাঁহাকে বসাইবেন, এ তাঁহার কল্পনার অতীত।

বিদেহী গুরুজীর অভিপ্রায় বুঝিয়া নিয়া দায়িত্বভারটি তাঁহাকে নিতে হইল। বৈরাগ্য আশ্রমে প্রবেশ করার পর পত্নীর সহিত এক আশ্রমে বসবাস করা সাধুদের প্রথাবিরুদ্ধ। তাই এই সময়ে পত্নী অন্নদাদেবীকে তিনি বৃন্দাবনধাম ত্যাগ করান, স্থায়িভাবে তাঁহাকে কাশীতে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

মোহান্তপদ প্রাপ্তির পর সন্তদাসের জীবনে নূতনতর কর্মের ভার চাপিয়া বসিল। আশ্রমে আগত সাধু ও অতিথিসেবা, ব্রজ পরিক্রমা ও কুম্ভমেলায় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতৃত্ব প্রভৃতি অনেক কিছু দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিলেন।

১৩২৭ সালে সন্তদাসজী নাসিক কুম্ভমেলায় যোগদান করেন। সর্ব ভারতের বৈষ্ণবমণ্ডলীতে এই সময়ে তাঁহার নেতৃত্ব স্থাপিত হয়। নিম্বার্ক, শ্রী, বিষ্ণু-স্বামী ও মাধ্ব—চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ মোহান্ত রহিয়াছেন। ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া একজনকে তাঁহাদের এই চারি সম্প্রদায়ের প্রধানের পদে বরণ করেন। এই পরম সম্মানের পদটি সাধারণত বৃন্দাবনধামের ব্রজবিদেহী মোহান্তেরই অধিকারে থাকে। সন্তদাসজী এবার ব্রজবিদেহী মোহান্তরূপেই নাসিকের কুম্ভমেলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বৈষ্ণবসমাজের সকল মোহান্ত মিলিয়া এসময়ে তাঁহাকে বিরাট সংবর্ধনা ও মর্যাদা দান করিলেন, সম্প্রদায়ের প্রধান মোহান্তরূপে এখানে তাঁহাকে বরণ করা হইল।

মেলার এই নেতৃত্ব গ্রহণের পর চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বিভিন্ন সাধুমণ্ডলীতে ভাণ্ডারা দিতে হয়, মোহান্তদের আপ্যায়ন ও ভেট প্রদানের ঝঞ্ঝাট কম পোহাতে হয় না।

এখানকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও কর্মাদি সেদিন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় এবং সমগ্র মেলা ক্ষেত্রে সন্তদাস মহারাজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এসময়ে ছড়াইয়া পড়ে। অর্থসঙ্গতিহীন নূতন মোহান্ত তাঁহার ভাণ্ডারা ও ব্যয়বহুল কার্যাদি কি করিয়া সম্পন্ন করিলেন, অনেকেই সবিস্ময়ে তাহা ভাবিতে থাকেন।

সন্তদাসজীর পরিচালিত বৃন্দাবনের নিম্বার্ক আশ্রমের মর্যাদাও এ সময়ে ক্রমে ক্রমে খুব বাড়িয়া উঠে। অতিথি সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড় এখানে সর্বদা লাগিয়াই আছে। আর সন্তদাস মহারাজও অকৃপণ করে, একান্ত নিষ্ঠায় ইঁহাদের ভোজন ও আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিতে থাকেন।

এক এক সময় কাজের এমন চাপ পড়ে যে, মোহান্ত মহারাজ সন্তদাসজীকেই স্বহস্তে আশ্রমের বহুতর দৈনন্দিন কাজ করিতে হয়। শ্রীবিগ্রহের পূজা ও আরতি হইতে শুরু করিয়া জল তোলা, ভোগ রাঁধা বাসন মাজা প্রভৃতি কোনো কিছুই বাদ যায় না।

আশ্রমে কোনো সঞ্চিত অর্থ বা নিয়মিত অর্থাগমের ব্যবস্থা নাই। অথচ প্রতিদিন বহুসংখ্যক বৈষ্ণব ও অভ্যাগতদের প্রসাদ বিতরণ করিতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, এক-দিনের তরেও অভাব অনটনের জন্য ভোগান্ন নিবেদন বা অতিথি সেবায় কোনো বাধা পড়ে নাই।

আশ্রম-বিগ্রহের কৃপার কথা উল্লেখ করিয়া সন্তদাসজী প্রায়ই কহিতেন, "বানপ্রস্থ আশ্রম নেবার পর থেকে বৃন্দাবনে এসে বাস করবো। আর ভিক্ষান্নের দ্বারা উদর পূর্তি করবো—এই মনে ক'রে সংসারাশ্রম ত্যাগ করি, বৃন্দাবনে বাস করতে থাকি। কিন্তু ঠাকুরজীর এমনই কৃপা যে আমাকে একদিনও ভিক্ষার জন্য বের হতে দিলেন না। আমি বৃন্দাবনে এসে বাস করতে থাকলে কেউ পাঁচ টাকা, কেউ দশ টাকা এইভাবে অর্থ পাঠাতে লাগলেন, তাতে সাধুসেবার ব্যয় কোনোমতে চলে যেতে লাগলো। তারপর সাধু সমাগম যেমন ক্রমশ বাড়তে লাগলো, আশ্রমের অর্থাগমও তেমনি বেশী হতে লাগলো।"

আশ্রমে নিয়মিতভাবে সাধুসেবার অনুষ্ঠানে সন্তদাসজীর বড় উৎসাহ ছিল। বলা বাহুল্য, এজন্য অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা সেখানে নিতান্ত কম হইত না। এক সময়ে সেবাকার্যের কঠোর পরিশ্রমে ও দৈনন্দিন দায়িত্বের ভারে আশ্রম-শিষ্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের কেহ কেহ ইহাও ভাবিতে থাকেন, সংসার ও আত্মপরিজন ছাড়িয়া তাঁহারা সাধনভজন করিতে আসিয়াছেন, অথচ রোজ সাধু সন্ত ও অতিথিদের সেবাতেই অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। এ অবস্থায় অধ্যাত্মসাধনার অবসর কোথায়?

তাই সকলে মিলিয়া একদিন সন্তদাস বাবাজীকে তাঁহাদের এই অভিযোগ নিবেদন করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমরা নিশ্চয় জানবে যে, বহু ভাগ্যে সাধু সেবার এ সুযোগ পেয়েছো। ভগবৎ সেবা ও সাধু সেবার মধ্যে দিয়ে চিত্ত নির্মল হতে থাকে, তারপর ভজনসাধনে অধিকার আপনা হতেই জন্মে। সেবানিষ্ঠা ছেড়ে কেবল ভজনে বসলেই এখন তোমরা চিত্ত স্থির করতে পারবে না। কাজকর্ম শেষ হবার পর সামান্য যেটুকু অবসর পাও, উপদেশ মতো ভজনসাধন ক'রে যাও। প্রসন্ন চিত্তে ঠাকুরজী ও সাধুমহাত্মাদের সেবা করতে থাকো, তাতেই তোমাদের যথার্থ কল্যাণ হবে। শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ করেছো, বিচারবুদ্ধি ও সাধনাভিমান ত্যাগ ক'রে আদেশ প্রতিপালন ক'রে যাওয়াই কি তোমাদের কর্তব্য নয়?"

বাবাজীর কথা সেবকদের সংশয় দূর করিয়া দিল।

হরিদ্বার কুম্ভমেলার দুইমাস পূর্বে বৃন্দাবনে এক অর্ধ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে সহস্র সহস্র বৈষ্ণব সাধু পবিত্র যমুনাপুলিনে জড়ো হন। যমুনার পুণ্য সলিলে তাঁহাদের অবগাহন স্নান চলে, বিস্তৃত তটভূমিতে আনন্দ উৎসবের এক বিরাট মেলাক্ষেত্র গড়িয়া উঠে। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এস্থানে সমবেত চার সম্প্রদায়ের সাধুগণ ব্রজবিদেহী মোহান্তের অতিথি। ইঁহাদের প্রতিদিনকার ভোজনের দায়িত্বভার তাঁহার উপর।

১৩২৩ সালের বৃন্দাবনের মেলা। সাধু জমায়েৎগুলির সেবায় সন্তদাসজী এখানে পরমনিষ্ঠা সহকারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। যমুনার চড়ায় বিশিষ্ট মোহান্তগণ নিজেদের অনুবর্তী সাধু-খালসা নিয়া উপস্থিত। সর্বত্যাগী মোহান্ত সন্তদাস বাবাজী কি করিয়া এ ব্যয়বহুল সেবার দায়িত্ব পালন করিবেন, ইহা নিয়া আশ্রমিকদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিদিনকার এই সাধুসেবায় কোনো অন্তরায়ই উপস্থিত হয় নাই। সহস্র সহস্র বৈষ্ণবের ভোজনোপকরণ যেন কোন্ অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে আশ্রম ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত হইতে থাকে। রোজকার সাধুভোজনের বিরাট পর্ব অনায়াসে সম্পন্ন হইতে কোনোই বাধা হইল না।

পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার দিনে সন্তদাস মহারাজ কিন্তু বড় বিপদে পড়িলেন। বৈষ্ণব মোহান্তেরা আসিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন—তিনি তাঁহাদের নেতা, সাড়ম্বরে তাঁহাকে হাতীতে আরোহণ করাইয়া, পুরোভাগে রাখিয়া, সকলে এই পরিক্রমা উৎসব উদ্‌যাপন করিতে চান। সকলেরই জানা আছে, কাঠিয়াবাবা মহারাজের মানসপুত্র এই মহাপুরুষের মোহান্তসুলভ মনোবৃত্তি এবং আয়োজন উপকরণ মোটেই কিছু নাই। অথচ সম্প্রদায়ের অনেক মোহান্তেরই এসব ঠাট পোশাক রহিয়াছে। সোৎসাহে সকলে মিছিলের সুদৃশ্য হস্তী, মনোরম কিংখাবমণ্ডিত হাওদা, ছত্র ইত্যাদি নিয়া হাজির। রাজোচিত মর্যাদাসহ ব্রজ-বিদেহী মোহান্ত-মহারাজ সাধুদের মিছিলে নেতৃত্ব করিবেন ইহাই তাঁহাদের অভিলাষ।

সন্তদাস বাবাজী কিন্তু এ প্রস্তাবে একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। ইষ্টদেব রাধাবিহারীজী ও গুরুমহারাজ উভয়েই যে এই পবিত্র ধামে সাক্ষাৎভাবে বিরাজমান। তাই কোনোমতেই তিনি এই স্থানে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে রাজী নহেন। তাঁহার এই দৃঢ়তার জন্য অগত্যা পদব্রজেই সেদিনকার পরিক্রমা শুরু হইল। উত্তর ভারতের সাধুসমাজের দৃষ্টিতে তৎকালে তিনি শুধু মহাত্মা কাঠিয়াবাবাজীর উত্তরাধিকারী ব্রজবিদেহী মোহান্তরূপেই সম্মানার্হ নহেন, একজন শক্তিধর মহাপুরুষরূপেও তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নাই। অন্যান্য বৈষ্ণব মোহান্তেরা তাই বাধ্য হইয়া সেদিন হস্তীপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পুরাতন আড়ম্বরপূর্ণ রাজসিক পরিক্রমার পরিবর্তে এবার দেখা যায় এক ভক্তিবিনম্র শোভাযাত্রা। এ দৃশ্যটি ব্রজমণ্ডলের জনগণের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে।

হরিদ্বারে সে-বার কুম্ভমেলার অনুষ্ঠান চলিতেছে। সৌম্যদর্শন, তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্তদাস মহারাজ শিষ্য ও ভক্তদলসহ কন্‌খলের গঙ্গাতটে তাঁহার আসন স্থাপন করিয়াছেন। এই মেলায় অবস্থান কালে শুধু ভারতীয় বৈষ্ণব সাধুদের মধ্যেই নয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা অসামান্যরূপে বৃদ্ধি পায়।

এই সময়ে ভোলাগিরির মহারাজের আশ্রমের সাধু-সন্ন্যাসীদের এক সম্মেলন হয়।

গিরি মহারাজের সহিত বরাবরই সন্তদাসজীর বড় প্রীতির সম্বন্ধ, তাই সন্তদাস মহারাজকে তিনি এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। ভোলানন্দজীর কয়েকজন শিষ্য আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া গেলেন। সম্মেলনের নিকটে পৌঁছিয়া দেখা গেল, ভোলানন্দজী পুষ্পমাল্য হস্তে সন্তদাস মহারাজের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন। সাক্ষাৎমাত্র গিরিজী সানন্দে তাঁহার গলায় মালা দিয়া সংবর্ধনা জানাইলেন।

সভার মধ্যস্থলে মূল্যবান বস্ত্রমণ্ডিত একটি তক্তপোশ, উহাতে পাশাপাশি দুইটি আসন পাতা রহিয়াছে। ভোলাগিরিমহারাজ এবং সন্তদাসজী উহাতে উপবেশন করেন, তারপর উপস্থিত সাধু ও সন্ন্যাসীদের সম্মতিক্রমে সন্তদাস মহারাজকে এ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন মণ্ডলী ও সম্প্রদায়ের কাছে ভারতীয় অধ্যাত্ম-জীবনের বহুমুখী ধারার প্রশস্তি জানান। সন্তদাসজী তাঁহার ভাষণে আশা ও আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনে।

সন্তদাস মহারাজ সাধুদের উদ্দেশে বলেন, "আমরা দেখি, শীতের অবসানে বসন্তের উন্মেষের আগে আম্র মুকুল উদ্‌গত হয়। চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যেকার লক্ষণ জানিয়ে দেয়, ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবের আর দেরি নেই। তেমনি, বর্তমানে যে নানা ধর্ম সম্প্রদায় তাঁদের নানা আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে জনকল্যাণে ব্রতী হয়েছেন, তা থেকেও প্রতীয়মান হয়—ভারতের শুভদিন নিকটে। আপনারা স্ব স্ব সাধন ও আদর্শ প্রচারে অবিচলিত থাকুন, লোকমঙ্গলের জন্য চেষ্টিত থাকুন, কিন্তু যা-ই করুন না কেন, ভগবৎ উপাসনাই যেন মুখ্য কর্মরূপে সম্মুখে বর্তমান থাকে। মানুষের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠিত কর্মের প্রকৃত সিদ্ধি ভাগবত জীবনের উপরই নির্ভরশীল, একথা যেন আমরা কখনো বিস্মৃত না হই।"

ব্রজবিদেহী মোহান্ত সন্তদাসজীকে ভোলানন্দ গিরিমহারাজ চিরদিনই অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। একবারকার কুম্ভমেলা হইতে ফিরিবার সময় সন্তদাস বাবাজী গিরিমহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে যান। বাবাজী মহারাজের শিষ্য এবং জীবনীকার ধনঞ্জয়দাসজী ইহার এক মনোজ্ঞ চিত্র আঁকিয়াছেন—"সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তিনি আসিয়াছেন সংবাদ পাইবার মাত্র গিরিজী তাঁহার গুম্ফাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। দুজনেই সেই তপস্যাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। অতঃপর সেখানে যে কি হইল, তাহা আমরা কি বলিব? অল্পক্ষণ পরে যখন তাঁহারা বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহাদের উভয়েরই পরস্পরের প্রতি প্রিয় বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার দেখিলাম। প্রস্থানের সময় নূতন তসরের কাপড় ও চাদর উপঢৌকন দিয়া ভোলাগিরি মহারাজ স্বয়ং দ্বার পর্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া গেলেন।"

সমকালীন বহু প্রতিষ্ঠাবান্ সাধু সন্তদাসজীকে উচ্চকোটির সিদ্ধপুরুষ বলিয়া স্বীকৃতি দিতেন এবং শ্রদ্ধা জানাইতেন। ত্রিহুতের রামানন্দী প্রাচীন সাধু স্বামী রামদাস ইঁহাদের অন্যতম। ভগবৎ-প্রেমে তন্ময় এই সাধুটি প্রায় প্রত্যহ সন্তদাস মহারাজের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। আবার কখনো কখনো দেখা যাইত, প্রেমাবিষ্ট নয়নে সন্তদাসজীর দিকে চাহিয়া তিনি করুণ মিনতিভরা কণ্ঠে কি যেন প্রার্থনা করিতেছেন, অস্ফুট স্বরে গান গাহিতেছেন।

কৃষ্ণদাসজী নামে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এক প্রাচীন মহাত্মা জয়পুরে বাস করিতেন। জনসমাজে তিনি সিদ্ধবাবা নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন। সন্তদাস বাবাজীর প্রতি ইঁহার অনুরাগ ছিল অসাধারণ। শুধু তাঁহাকে দেখিতেই সিদ্ধবাবা ব্যাকুলভাবে মাঝে মাঝে জয়পুর হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। দূর হইতে সন্তদাসজীকে দর্শন করামাত্র এ বৃদ্ধ সাধু "জয় হো মহারাজ, জয় হো মহারাজ" বলিয়া ছুটিয়া আসিতেন এবং দণ্ডবৎ করিতেন। উভয়ের প্রেম-মিলনের এ দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদের আনন্দের অবধি থাকিত না।

সমগ্র ভারতের বৈষ্ণব মোহান্তগণ সন্তদাস বাবাজীকে যে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার তুলনা বিরল। বাবাজী মহারাজ অসুস্থতার জন্য ১৩৪০ সালের কুম্ভমেলায় যোগ দিতে অসমর্থ হন, কিন্তু নিজের কয়েকটি বিশিষ্ট শিষ্যকে এই সময়ে উজ্জয়িনীর মেলাক্ষেত্রে তিনি পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের উপর নির্দেশ থাকে মেলায় মোহান্তদের কাছে তাঁহারা যেন সন্তদাসজীর দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করেন। একথা শুনিয়াই মোহান্তগণ সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন—"সে কি কথা। সন্তদাস মহারাজ আমাদের গুরুতুল্য, তিনি কেন আমাদের দণ্ডবৎ জানাবেন ? আপনারা আশ্রমে ফিরে গিয়ে বরং আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম তাঁকে নিবেদন করবেন।"

গুরুভাইদের মধ্যে সন্তদাস বাবাজীর প্রভাব যে কত বেশী ছিল একটি সামান্য ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। সে-বার কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা অভয়নারায়ণ রায়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। কথাবার্তা শেষ হইয়াছে, সন্তদাস মহারাজ এবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, এমন সময় অভয়বাবু ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফেলিলেন। ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়াও সন্তদাসজী কোনোমতে ঠেকাইতে পারিলেন না। অভয়বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমি ঠিকই করেছি। আপনি কনিষ্ঠ হলেও আমা অপেক্ষা বড়—আমি সারা অন্তর দিয়ে সত্যই অনুভব করি যে, আপনি শ্রীগুরুদেব কাঠিয়াবাবার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনার বাইরেকার চেহারাটিও বাবার চেহারার মতোই হয়ে গিয়েছে।"

গুরুর সহিত সন্তদাসজীর একাত্মতা তাঁহার একান্ত আত্মনিবেদনেরই ফল। এক শিষ্যের নিকট এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "বাবা, তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমার নিজের কোনো শক্তি নাই। তবে সদ্‌গুরু আমাকে গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছেন। তিনি আমার এই ঘটে থাকিয়া তোমাদের গুরু হইয়াছেন এবং তিনিই তোমাদের কল্যাণ বিধান করিবেন। এ বিষয়ে তুমি কোনো সংশয় রাখিও না।"

গুরুশক্তি শিষ্যের জীবনে কি করিয়া কোন্ পথে সঞ্চারিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার মতামত ছিল দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন। তাঁহার মতে, শিষ্য যত বেশী আজ্ঞাবহ ও আত্মনিবেদিত হইবে, ততই বেশী তাঁহার মধ্যে গুরুপ্রদত্ত অধ্যাত্মশক্তি খুলিতে থাকিবে। অহং-এর প্রাচীরটিকে উঁচু করিয়া রাখিলেই যত বিপদ।

পরম্পরাগত গুরুশক্তির মূল্য ও মর্যাদা সন্তদাস মহারাজের দৃষ্টিতে ছিল অত্যন্ত বেশী। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "এই জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্ গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেছেন। ঐ উপদেশ উপযুক্ত শিষ্যদের মধ্যে স্ফুরিত করার শক্তিটি তিনিই গুরুর ভেতর সঞ্চারিত করেছেন। এ শক্তি পরম্পরাক্রমে

এসেছে। পরম্পরাযুগে আগত এই শক্তি যিনি লাভ না করেছেন, তিনি যত শক্তিশালী যত জ্ঞানীই হোন না কেন, শিষ্যকে মোক্ষ লাভ করাতে পারেন না।"

দীক্ষা দানে ও দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদের সাধন-জীবন গঠনে সন্তদাস মহারাজের কৃপার অন্ত ছিল না, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সহস্র সহস্র নরনারী এ মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হয়।

বাবাজী মহারাজ কিন্তু অনেক সময় এমন সব ব্যক্তিকেও দীক্ষা দিয়াছেন, সাধারণ বুদ্ধির দিক দিয়া যাহাদের কোনোমতেই অবাঞ্ছনীয় মনে না করিয়া পারা যায় না। এ বিষয়ে সমালোচনার ভার নিয়া কেহ কিছু বলিলে তিনি উত্তর দিতেন, "দেখ বাবা, কারুর হাতে যদি অন্নের ভাণ্ড থাকে ক্ষুধিতের অধিকার যে তার ওপরই সব চাইতে বেশী হয়। পাপী যখন ব্যাকুল হয়ে শুদ্ধতর, মহত্তর, জীবনের আশায় আশ্রয় খুঁজে ফিরে, তখন কি তারে কৃপা করা হবে না? তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে না?"

এ সম্পর্কে কাঠিয়াবাবাজীর করুণার কথা, অযোগ্য পাপী-তাপীকে উদ্ধারের কথা বলিতে বলিতে সন্তদাস মহারাজের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত। গুরুদেবের কথা উল্লেখ করিয়া কহিতেন, "আমার বাবা তো অযোগ্যবোধে আমায় কোনোদিন প্রত্যাখ্যান করেন নি।—একথা যখন মনে করি, তখন আর আমি এদের ফেরাতে পারি কই?"

সে-বার এক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ব্যাকুলভাবে বার বার মিনতি করায় সন্তদাসজী সদয় হন, তাহাকে দীক্ষা দেন। ইহার পরও লোকটির চরিত্রের স্খলন-পতন দেখা যাইতে থাকে। নব দীক্ষিত শিষ্যটি সখেদে গুরুকে একদিন সব কথা নিবেদন করেন।

করুণাময় সন্তদাস উত্তরে কহিলেন, "বাবা এসব ঘটেছে তোমার প্রায়শ্চিত্তের জন্য। ভয় কি? আমিই তো রয়েছি—তোমার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা জেনেই তো আমি তোমায় দীক্ষা দিয়েছি।"

আত্ম-সংশোধনের জন্য শিষ্যটি তখন ব্যাকুল। একদিন তাই সজল নয়নে সর্বসমক্ষে গুরুদেবের কাছে নিজের অপকার্যের বর্ণনা দিতে লাগিলেন। সব শুনিয়াও গুরুজীর কিন্তু কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় নেই, নাম কর নাম কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।" এই ভ্রষ্টচরিত্র লোকটি উত্তর কালে তাঁহার কৃপায় এক ভক্ত সাধকে পরিণত হয়।

নামের শক্তি অমোঘ—একথাটি প্রায়ই সন্তদাস বাবাজীর মুখে শুনা যাইত। অযোগ্য শিষ্যদের কেন তিনি আশ্রয় দেন, এ প্রশ্ন করা হইলে তখনি বলিতেন, "দ্যাখো, এ কালে তার নাম অতি অল্প লোকেই করে। এ লোকটি কোন্ সূত্রে যেন—'ভগবানের নাম করবো' ব'লে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে আর আমিও তার ভেতরে দুই একটি শিষ্য লক্ষণ দেখেছি—তাহাকে শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করেছি। এখন তাঁর বস্তু, তিনিই শুদ্ধ ক'রে নেবেন।"

সন্তদাসজী মহারাজের স্বাস্থ্য এক সময়ে খুব ভাঙিয়া পড়ে। বৃদ্ধ অপটু শরীরে কোনো পরিশ্রমই সহ্য হয় না, অথচ এ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়াই মুমুক্ষুদের দীক্ষাদানে তাঁহার বিরাম নাই। এক একদিন শরীরের অবসন্ন দেখিয়া শিষ্যদের ভয় হয়। দীক্ষাদান স্থগিত রাখার জন্য কোনো কোনো ভক্ত এ সময়ে তাঁহাকে অনুরোধ জানায়। একথা শোনামাত্র ফুটিয়া উঠে মহাপুরুষের এক করুণাঘন রূপ। স্নেহ-সজল চক্ষে তিনি

শিষ্যদের দিকে চাহিয়া বলেন, "বাবা, তা হলে এ শরীরটা আছে কি জন্য, সেকথা কি তোমরা আমায় বলতে পারো।"

শিষ্যদের আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না।

কিন্তু যেখানে সন্ন্যাসী শিষ্যদের চরিত্র গঠন ও সাধনভজনের মৌল প্রশ্নটি জড়িত, সেখানে কিন্তু গুরুজী সন্তদাস মহারাজের দৃষ্টি থাকিত সদা সজাগ ও সতর্ক। তাঁহার বজ্র-কঠোর শাসনও মুহূর্তমধ্যে নামিয়া আসিত নিষ্করুণভাবে।

বৃন্দাবন-আশ্রমে গভীর রাত্রিতে সেদিন সন্তদাসজী শয়ন করিয়া আছেন। একটি সেবক-শিষ্য নীরবে তাঁহার পদ সম্বাহনে রত। রাত্রিতে আশ্রমে কয়েকটি সাধু অতিথি হঠাৎ উপস্থিত হয়, প্রসাদান্ন বিতরণে তাই যথেষ্ট দেরি হইয়াছে। ক্লান্ত শিষ্যগণ ভোজন শেষ করিয়া সবেমাত্র বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। সব কাজই শেষ হইয়াছে, শুধু রান্নাঘরটি পরিষ্কার করা হয় নাই,—এ কথাটি কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ বাবাজী মহারাজ তাঁহার শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

কহিলেন, "বাবা, তোরা সবাই ক্লান্ত হয়েছিস্। আজ তোদের এ কাজটা আমিই বরং ক'রে দিচ্ছি। ঠাকুরজীর ভোগের ঘরের কাজ—এতে কখনো অনিয়ম করতে নেই।" শিষ্যদের লজ্জার সীমা রহিল না, সকলে মিলিয়া কাজটি তখনি শেষ করিয়া ফেলিলেন।

বিগ্রহসেবার ভারপ্রাপ্ত শিষ্যটির একদিন ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙে নাই, যমুনা-স্নান করিয়া ঠাকুরের সেবায় পূজায় বসিতে কিছুটা দেরি হইয়াছে। কিন্তু মন্দিরে ঢুকিয়াই তিনি দেখেন, অপটু শরীর নিয়া সন্তদাস মহারাজ ইতিমধ্যেই তাড়াতাড়ি সেবাকার্যে লাগিয়া গিয়াছেন। শিষ্যটি বার বার এ ত্রুটির জন্য মার্জনা চাহিতে থাকেন।

সন্তদাসজী আসন ছাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ান, তারপর তাঁহার গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বসেন, তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহেন, "এত বেলায় ঠাকুরজীকে ওঠানো হয় নি। তোমার পূজা করবার ইচ্ছা না থাকে, আমায় বললেই পারতে। ঠাকুরজী আজো আমায় এমন অসমর্থ করেন নি যে, তাঁর সেবা আমি করতে পারবো না।" সেদিনকার এ কঠোর শাসনে আশ্রমিকেরা অনেক বেশী সতর্ক হইয়া উঠেন।

প্রবল শীতের মধ্যেও শিষ্যদের এক জোড়া কাপড়ের জুতা পরিতে সন্তদাসজী সম্মতি দিতেন না। কেহ কখনো তাহাদের জন্য সহানুভূতি দেখাইলে উত্তর দিতেন, "না বাবা, এটা তো ঠিক কথা নয়। আমার শরীর আজ বৃদ্ধ ও অচল হয়েছে, তাই আমি এখন কাপড়ের জুতো পায়ে দিই, নইলে সাধু হবার পর থেকে এযাবৎ কোনো জুতোই তো আমি ব্যবহার করি নি। নূতন সাধুদের পক্ষে জুতো ব্যবহার করা সঙ্গত নয়।"

সাধু-শিষ্যদের নিয়ন্ত্রণে তাঁহার কঠোরতার অন্ত ছিল না, ত্রুটি দেখিলেই তিনি পাখা, চেলাকাঠ অথবা লাঠিদ্বারা প্রহার চালাইতেন। শাসন ও তিরস্কারের পর আবার হঠাৎ শান্ত হইয়া যাইতেন, শিষ্যদের ভোলানোর জন্য করিতেন কত আদর আপ্যায়ন। স্নেহভরা কণ্ঠে তাহাদের বুঝাইতেন, "যাতে তোমাদের অভিমান দূর হয়, আর কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারো, সেই জন্যেই তো এত তিরস্কার করি। যখনই গুরুর কাছে ফট্‌কার খাবে, তখন তার বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে ভেবে প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করবে। ফলে চিত্ত নির্মল হবে, লাভ করবে ভগবৎ দর্শনের অধিকার। স্মরণ রেখো, যিনি আশ্রিতজনের অভিমান বাড়াতে দেন, তিনি কখনো সত্যকার গুরু হতে পারেন না।"

একটি কিশোর বয়স্ক ব্রজবাসী সন্তদাসজীর শিষ্যত্ব লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে।

শিষ্যটির সহিত তিনি কিন্তু অহেতুকভাবে বড় বেশী প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতেন, সে যেন তাঁহার একজন বয়স্য বা সখা। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে সন্তদাসজী অপর শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "দ্যাখো বাবা, কার কিসে কল্যাণ হয় আর কি তার প্রয়োজন, তা তোমরা কি বুঝবে? এ ছেলেটি পিতা মাতার বড় আদরের সন্তান ছিল। নিতান্ত বালক বয়সে ঘর ছেড়ে সে এখানে এসেছে। একটু আদর বা মিষ্টি কথা না পেলে এ বয়সে আশ্রমের কঠোর জীবনযাত্রার মধ্যে টিকে থাকতে পারবে কেন? এজন্যই ওর প্রতি এরূপ ব্যবহার আমায় করতে হয়। জেনে রেখো, যোগী কারুরই বশ নয়।"

আশ্রমের মেথরটিকে রোজ প্রসাদান্ন বিতরণ করা হইত। একদিন পঙ্গতের সময় হঠাৎ বহু সাধু অতিথির আগমন ঘটে, ফলে ভোজন দ্রব্য কম পড়িয়া যায় এবং ভাঙ্গীকে সেদিন আর খাবার দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

ব্যাপারটি কিন্তু বাবাজী মহারাজের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বসিলে শিষ্যরা জানান, অসময়ে বহু অভ্যাগত আসায় মেথরকে আজ আর প্রসাদ বাঁটিয়া দেওয়া যায় নাই।

সন্তদাসজী ক্রোধে একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাদের কোনো কথাই আমি শুনতে চাইনে। আজ থেকে মেথরের জন্য প্রসাদান্ন আলাদা ক'রে রাখবে, তারপর অপরকে বিতরণ করবে। খবরদার। এরূপ যেন আর কখনো না ঘটে।" মেথরকে তখনই প্রচুর সিধা দিয়া বিদায় করা হইল।

ইহার পর শান্ত, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বাবাজী মহারাজ কহিলেন, "দ্যাখো, মা যেমন ঘৃণা না ক'রে আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন, এরাও কি তাই করে না? এদের কি রোজ দুটি প্রসাদ দেওয়া উচিত নয়?"

নিজের আচার আচরণের মধ্য দিয়া বাবাজী মহারাজ অনেক সময় শিষ্যদের সম্মুখে প্রকৃত আদর্শ তুলিয়া ধরিতেন। আশ্রমের সমস্ত কিছু কাজ যে রাধাবিহারীজীর, শিষ্যদের ধৃতিতে এটি আনিয়া দিতে তাঁহার কখনো ভুল হইত না। একবার সন্তদাস মহারাজ কোনো একটি কার্য উপলক্ষে মথুরায় গিয়াছেন—সন্ধ্যার সময় তাঁহার ফিরিবার কথা কিন্তু রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, তবুও তাঁহার দেখা নাই। সকলে বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ দেখা গেল, বৃদ্ধ মহারাজ একটি বৃহৎ চালকুমড়া কাঁধে করিয়া মন্থর গতিতে আসিতেছেন।

চিন্তিত শিষ্যেরা এই বিলম্বের জন্য তাঁহাকে অনুযোগ দিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা, সন্ধ্যার সময় মথুরায় একটি একার জন্য দরদস্তুর করলাম। রাত্রি হয়েছে বলে ওরা বেশী ভাড়া হাঁকলো—প্রায় এক টাকা। ঠাকুরজীর পয়সা এভাবে ব্যয় করতে ইচ্ছা হলো না, তাই হেঁটেই এসেছি, আর এতে তেমন কষ্টও কিছু হয় নি। মনে রেখো, ঠাকুরজীর পয়সা অপব্যয় করতে নেই।"

সন্তদাসজী সেবার শ্রীহট্ট অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন। কয়েকটি শিষ্য ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের একটি তরুণ সাধুও সে সময়ে তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। একদিন দেখা গেল, বাবাজী মহারাজের প্রণামীর টাকার কিছুটা ঐ ছেলেটি চুরি করিয়াছে। সংবাদটি সন্তদাসজীর কানে যাওয়া মাত্র ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তরুণ সাধুটি ভীত হইয়া বার বার তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছে কিন্তু সন্তদাসজীকে কোনোমতেই নিবৃত্ত করা যাইতেছে না। তিনি তখন মহা উত্তেজিত।

সাধুটিকে দিয়া তখনই তিনি এক স্বীকৃতিপত্র লিখাইয়া নিলেন। তারপর সবোবে তাহাকে বলিয়া দিলেন—এরূপ দোষ আর কখনো করিলে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। সঙ্গে সঙ্গেই এক শিষ্যকে আদেশ দিলেন ঐ কাগজখানি যেন সতর্কভাবে তাঁহার ঝুলিতে এখনই রাখিয়া দেওয়া হয়। ভাবটা এই—এটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, কোনোমতেই হাতছাড়া করা চলিবে না।

রাত্রিতে বাবাজী মহারাজ শয্যায় বিশ্রাম করিতেছেন। সঙ্গীয় সেবক শিষ্যটি তাঁহাকে এ সুযোগে কহিলেন, "বাবা, আপনি এ দুষ্ট সাধুটিকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিন, নইলে ওকে নিয়ে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে, দুর্নামেরও অন্ত থাকবে না।"

মুহূর্তমধ্যে সন্তদাসজী করুণার্দ্র হইয়া উঠিলেন। আবেগজড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "বাবা তাহলে তো ওর আর কোনো আশাই থাকবে না। বরং তোদের সংসঙ্গে থেকে যদি ওর সংশোধন হয়, তাই কি ভাল নয় ?"

স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া এই মহাপুরুষ বাহ্যজীবনের প্রতিটি কাজ এক সুদক্ষ অভিনেতার মতোই দিনের পর দিন সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। আশ্রমের ঘাস চুরি করিতে গিয়া কেহ হয়তো ধরা পড়িয়াছে, বাবাজী ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিতেছেন। আবার ঠিক পরক্ষণেই দেখা যায়, শিষ্যদের সম্মুখে পরম প্রশান্তি নিয়া ভগবৎ-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি রত। আশ্রম-সম্পত্তি নিয়া বৈষয়িক লোকদের সঙ্গে চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করার পরই ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে শাস্ত্রব্যাখ্যায় তিনি মত্ত হইতেন।

দ্বৈতসত্তার এই বৈচিত্র্যে বাহিরের লোকের দৃষ্টিতে হয়তো তেমন ধরা পড়িত না, কিন্তু অন্তরঙ্গ শিষ্যদের ইহা অজানা ছিল না। গুরুজীর এ আদর্শ তাহাদের উজ্জীবিত করিয়া তুলিত।

সদ্‌গুরু সন্তদাসজীর নানা বিস্ময়কর লীলা, নানা যোগবিভূতি শিষ্যদের জীবনে প্রকটিত হইতে দেখা গিয়াছে। আশ্রিত শিষ্যদের সামান্যতম আচরণ ও কর্ম কোনোদিনই এ শক্তিধর মহাপুরুষের সদা সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

সন্তদাস মহারাজ সে সময়ে ভুবনেশ্বরে রহিয়াছেন। শিষ্য নির্মল মিত্রমহাশয় আরও কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। পথিমধ্যে ভুবনেশ্বর-মন্দিরের সম্মুখে তাঁহারা দেখিলেন, কয়েকটি সাধু একত্রে উপবেশন করিয়া আছেন। নির্মলবাবু প্রভৃতি হাত উঁচু করিয়া জোড়হাতে ইঁহাদের নমস্কার করিলেন, তারপর গন্তব্য স্থানের দিকে চলিয়া গেলেন।

সন্তদাসজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র সকলকে তিরস্কার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কিগো। তোমাদের একি অদ্ভুত ব্যবহার, বলতো ? সাধু সন্ন্যাসী দেখ্‌লে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হয়, তা করো নি কেন ?" সকলে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, গুরুমহারাজের দিব্যদৃষ্টি কি এভাবে সর্বত্রই তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে ?

উজ্জয়িনীর কুম্ভে সেবার সন্তদাসজী উপস্থিত হইতে পারেন নাই, শিষ্য অনন্তদাস তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সেখানে গিয়াছেন। বাবাজী মহারাজের ছত্রের নিচে তাঁহার আসনটি রক্ষিত থাকে, আর অনন্তদাস উহার নিকটে উপবেশন করেন। মেলাক্ষেত্রে আগত অন্যান্য লোকের সঙ্গে ভক্ত সুরেন্দ্র বসুমহাশয়ও সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত। হঠাৎ

এক সময়ে দেখা গেল, সুবেন্দ্রবাবুব স্ত্রী সন্তদাসজীব ছত্রেব নিচে বসিযা আকুলভাবে ক্রন্দন কবিতেছেন। ব্যস্ত হইযা সকলে তাঁহাকে ঘিবিযা দাঁড়াইলেন। মহিলাটি কিছুটা শান্ত হওযাব পব সকলকে বলিলেন, বাবাজী মহাবাজেব আসন শূন্য দেখিযা তাঁহার মন বড় ক্ষুব্ধ হইযা উঠে, তিনি ভাবিতে থাকেন, 'বাবা এসময়ে উপস্থিত থাকলে কত আনন্দই না হতো। আমাব মাথায হাত দিয়ে সস্নেহে কত আশীর্বাদই না কবতেন।' ইহাব পব তাঁহাব অন্তবেব ক্ষোভ ও ব্যাকুলতা ক্রন্দনে ফাটিযা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখিতে পান, সন্তদাসজী ঐ নির্দিষ্ট আসনটিতেই সশবীবে উপবিষ্ট বহিয়াছেন এবং এই মহিলা ভক্তেব শিবে হাত বুলাইযা আশীর্বাদ জানাইতেছেন! এ দৃশ্য দেখিযাই তাঁহাব এ কান্না।

আব একটি শিষ্যাব অলৌকিক দর্শনও কম বিস্ময়কব নয। ইঁনি সন্তদাসজীব শিষ্য ধীবেন্দ্র দাশগুপ্তেব স্ত্রী। ইহাদেব কন্যাটি এক সময়ে মবণাপন্ন কাতব হয। মহিলাটি তখন একান্তভাবে গুবুদেবেব কথা স্মবণ কবিযা প্রার্থনা নিবেদন কবিতে থাকেন। অকস্মাৎ তিনি দেখেন সন্তদাসজীর জ্যোতির্ময মূর্তি তাঁহাব সম্মুখে দণ্ডাযমান।

তিনি লিখিযাছেন, "কতক্ষণ আমি বাবাকে দেখিলাম তাহা আন্দাজ কবিতে পাবিব না। কিছুকাল পব তিনি আমাব কন্যাব মাথাব কাছে দাঁড়াইযা অমৃত মাখানো অভয দৃষ্টিতে আমাব দিকে তাকাইয়া ক্রমেই যেন ঘবেব দেওয়ালেব সাথে মিলাইযা যাইতে আবম্ভ কবিলেন। সেই দৃষ্টি, সেই বূপ, আমাব অন্তবে গাঁথা হইযা আছে। মনে কবিলেই আমাব সমস্ত শবীর আনন্দে শিহবিযা উঠে। আমাব কন্যাটি ক্রমে বোগমুক্ত হয।"

ইহাব পব এই মহিলা ভক্তটি সন্তদাসজীব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে যান। ভক্তিভবে তাঁহাকে প্রণাম কবিযা উঠামাত্র বাবাজী মৃদু, সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, "বাইবেব দিকে বেশী তাকাবি না, অন্তবেব দিকে তাকালেই সব পাবি। আমি যে সব সমযই তোদেব কাছে আছি।"

বাবাজী মহাবাজেব জীবনলীলাব শেষ অধ্যাযটি এবাব আসিযা পড়িতেছে। ক্রমে ক্রমে তিনি আবও অন্তর্মুখীন হইযা উঠিলেন। এই সময়ে একবাব শিষ্য ও ভক্তবৃন্দেব অনুবোধে তিনি গৌহাটিতে উপনীত হন। স্থানীয হবিসভায তাঁহাকে নিযা খুব আনন্দ উৎসব হইতেছে—এ সময়ে একদল লোক তাঁহাকে অনুবোধ জানাইলেন, "আপনি ভাবতেব সর্বদ্রষ্টা ঋষিদেব মহিমা আজ কিছু কীর্তন করুন। আপনাব মতো মহাপুবুষেব মুখে আমবা তা শুনতে চাই।"

বাবাজী মহাবাজ সম্মত হইলেন। ভাবতন্ময অবস্থায তাঁহাব দুই চক্ষু নিমীলিত হইল। সভায বহু ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও আধুনিক শিক্ষায শিক্ষিত ব্যক্তিব সমাবেশ হইযাছে। সকলেবই দৃষ্টি এই জটাজুটমণ্ডিত তেজঃপুঞ্জকলেবব মহাসাধকেব দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু আগ্রহ ব্যাকুল শ্রোতাদেব বিস্মিত করিযা বাবাজী মহারাজ এ সময়ে এক কাণ্ড কবিযা বসিলেন। কোনো কিছু বলিবাব সব চেষ্টাই তাঁহাব বাব বাব ব্যর্থ হইযা গেল। ঋষিদেব স্মবণে মুহ্যমান মহাপুবুষ অবোধ বালকেব মতো কেবলই ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন। সমবেত জনতা বিস্ময বিমুগ্ধ। অনেকের নযনে পুলকাশ্রু উদ্‌গত হইতেছে। সকলে এবাব, সমস্ববে বলিযা উঠিলেন, "আব আপনাব কিছু বলতে হবে না, আমাদেব

প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। আমরা এটা এতো সুন্দররূপে বুঝেছি যে, অনেক কথার ঠিক এমনটি বোঝা যেত না।"

বাবাজী মহারাজের মধ্যে বালক স্বভাবটি এসময়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্বভাব গাম্ভীর্যের স্থলে উদ্গত হয় এক আনন্দঘন রসায়িত ভঙ্গী। অন্তরে বাহিরে তখন অবিরলধারে দিব্য আনন্দের স্রোত বহিতেছে, মাঝে মাঝে তাই মনের আনন্দে তিনি গান ধরেন—

তোরা কে যাবিরে আয়রে ভাই,
সবাই মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেম-মুখ—
এসো, দেখে প্রাণ জুড়াই।

কলিকাতা শহরে সে-বার শেষবারের মতো তাঁহার আগমন। সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী, সন্তদাসজীর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে কহিলেন, "আমি যেদিন সংসার ছেড়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করি সেদিন যেমন তোমরা আমার সহায় হয়ে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছিলে, এবারও সেইরূপ সহায় হয়ে শ্রীবৃন্দাবনের গাড়িতে তুলে দাও। আমার শরীর আর থাকবে না। শ্রীগুরু-দেবের আশ্রমের প্রতি বড় আকর্ষণ বোধ করছি, শরীরটা যাতে সেখানে পৌঁছে তার ব্যবস্থা করো। আবার সেদিনের মতো প্রকৃত বন্ধুর কাজ করো।"

কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না, বাবাজী মহারাজ শীঘ্রই লীলা সংবরণ করিবেন। ১৩৪২ সালের ২২শে কার্তিক তারিখে কয়েকটি শিষ্য সেবকসহ সন্তদাস বাবাজী বৃন্দাবনধামে রওনা হইলেন। মহাপ্রয়াণের লগ্নটি এবার আসিয়া গেল, নরজীবনের লীলায় ছেদ টানিয়া দিয়া মহাপুরুষ প্রবিষ্ট হইলেন নিত্যলীলায়। দেহটি বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পর আশ্রম লোকে-লোকারণ্য হইয়া উঠে, মহাসমারোহে যমুনার যুগলঘাটে অগ্নিসংস্কার সম্পন্ন হয়।

মথুরার বনওয়ারীলাল ভাটনগর সন্তদাসজীর এক অনুগৃহীত শিষ্য। বাবাজী মহারাজের শেষ কৃত্য সমাপ্ত হইবার পর তিনি এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করেন। ভক্ত বনওয়ারীলালের সারা অন্তর মথিত করিয়া খেদোক্তি ধ্বনিত হইতে থাকে,—বাবাজী মহারাজের শেষ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। মথুরায় নিজ গৃহে বসিয়া সেদিন তিনি সারাদিন অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন।

সন্ধ্যার পর এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত বনওয়ারীলালের বাক্স্ফূর্তি হইল না। তিনি দেখিলেন বাবাজী মহারাজ করুণাঘন মূর্তিতে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত। সস্নেহ কণ্ঠে তিনি বলিতেছেন, "বেটা, শুধু লৌকিক দৃষ্টিতেই তো আমার এ দেহ পরিত্যক্ত হয়েছে। তুমি শান্ত হও। তোমরা সর্বদাই আমার দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছো, এটা জানবে। তুমি শ্রীবৃন্দাবনের আশ্রমে মাঝে মাঝে যেও, আমার দর্শন ক'রে এসো।"

একলা শুধু বনওয়ারীলাল ভাটনগরই নয়, আরও বহুতর শিষ্য তিরোভাবের পর সন্তদাসজীর অলৌকিক দর্শনে বঞ্চিত হন নাই।

শুনিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ নরেনের কথা—"নরেনের মত কিন্তু একটি ছেলেও দেখতে পেলাম না। যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে ক'ইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাতভোর ধ্যান করে। ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। আমার নরেনের ভেতর এতটুকুও মেকি নেই, বাজিয়ে দ্যাখো, একেবারে টং টং করছে। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিদর্শন হয়। সাধে নরেনকে এত ভালোবাসি।"

ঠাকুরের স্নেহধন্য এই ভক্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া নিতে শরৎ দেরি করিলেন না। এ ঘনিষ্ঠতার ফলও অচিরে ফলিল। শক্তিমান্ নরেন্দ্রের প্রভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি নূতনতর দৃষ্টিতে দেখা শুরু করিলেন।

আর একদিন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার দেখা। ঠাকুরের কথা উঠিতেই নরেন্দ্রনাথ উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। এই শক্তিধর মহাপুরুষের কৃপা তাঁহার জীবনে আনিয়া দিতেছে নানান নূতন অনুভূতি। ঠাকুরের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া প্রেম-গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি গান ধরিলেন, "প্রেমধন বিলায় গোরা রায়।"

সঙ্গীত শেষ হইল। নরেন আপন মনে কহিতে লাগিলেন, "সত্য সত্যই তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন—প্রেম ব'ল, জ্ঞান ব'ল, মুক্তি ব'ল গোরা রায় যাকে যা ইচ্ছে তা-ই বিলাচ্ছেন। কি অদ্ভুত শক্তি। রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, সহসা আকর্ষণ করে দক্ষিণেশ্বরে হাজির করালেন—শরীরের ভেতর যেটা আছে সেটাকে। তারপর কত কথা উপদেশের পর আবার ফিরতে দিলেন। সব করতে পারেন দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায়—সব করতে পারেন।

শরৎ মন্ত্রমুগ্ধের মতো চাহিয়া আছেন ঠাকুরের এই মহা প্রতিভাধর যুবক ভক্তের ভাবো-দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে। বার বার ভাবিতেছেন ঠাকুরের কৃপালীলার কথা, আর ঠাকুরের ভক্তদের পরম সম্ভাবনার কথা। কি বিস্ময়কর দক্ষিণেশ্বরের এই মানববিগ্রহ। আর কি যেন এক অপ্রতিরোধ্য চৌম্বক শক্তি নিরন্তর তাঁহাকে বিগ্রহের চরণ তলে আকর্ষণ করিয়া নিতেছে।

ঠাকুরের দর্শনের জন্য সপ্তাহে একদিন করিয়া শরৎ দক্ষিণেশ্বরে যান। কলেজ বন্ধ থাকিলে এক একদিন রাত্রিবাসও করিয়া আসেন। ঠাকুরের সেবাযত্নের ছোটখাটো দুই একটি সুযোগ পাইলে উৎসাহের তাঁহার অন্ত থাকে না, নিজেকে মনে করেন কৃতকৃতার্থ।

তরুণ ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের ব্যবহার কিন্তু বড় সহজ, বড় আন্তরিক। স্বাভাবিক স্নেহ ও প্রেমের স্পর্শ দিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের মনপ্রাণ তিনি কাড়িয়া নেন, গড়িয়া উঠে এক অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতা।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎ যেদিন তাঁহার দিদি কাদম্বিনীর রান্নার সুখ্যাতি করিয়াছেন। আর যায় কোথায়? ঠাকুর অমনি ধরিয়া বসিলেন, "ওরে মুখে তো খুব বলছিস। তোর দিদির রান্না আমায় খাওয়াতে পারবি? আনবি তো একটা তরকারি।"

শরৎ তো মহা উল্লসিত। পরবর্তী সাক্ষাতের দিনই দিদির রান্না করা তরকারির এক বাটি হাতে নিয়া হাজির।

শিশুসুলভ সরলতা নিয়া ঠাকুর ইহার সবটা খাইলেন। তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে তুই তো ঠিক্‌ই বলেছিস্ চমৎকার হাত তোর দিদির।"

শরৎদের বাড়ি সিমলায়। সেখান হইতে মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরের এই প্রিয় তরকারি বহন করিয়া আনিতেন। ঠাকুরের আনন্দের প্রতিফলন ঝলমল করিয়া

উঠিত তাঁহার নিজের চোখে মুখে। এমনি করিয়া এই নবাগত ভক্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে আপন করিয়া নিতে থাকেন।

শরৎ বিত্তবান্ ঘরের ছেলে, অর্থ কষ্টে কোনদিন পড়েন নাই, ভিক্ষাবৃত্তি তো তাঁহার স্বপ্নাতীত। ঠাকুর কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহাকে এই ভিক্ষা গ্রহণের শিক্ষাই দিতেন। ভিক্ষা পাত্রটি হাতে দিয়া কহিতেন, "জানিস্ ? ভিক্ষার অন্ন বড় পবিত্র ?"

মাঝে মাঝে শরতের রান্না-করা ভিক্ষান্ন কিছুটা নিজে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর তাঁহার উৎসাহ বাড়াইয়া দিতেন।

বড় মধুর, বড় হৃদয়-গলানো ঠাকুরের সান্নিধ্য। ছোট খাটটিতে বসিয়া এক একদিন নিজ জীবনের পুরাতন কাহিনী তিনি বর্ণনা করেন, চরণতলে বসিয়া নিবিষ্ট মনে শরৎ তাঁহার বাক্যসুধা পান করেন। নির্নিমেষে এই মহাপুরুষের মুখের পানে তাকাইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যান। ঠাকুরের অধ্যাত্ম-সাধনার কথা অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা শুনিয়া তাঁহার যেন আর আশ মিটে না।

কথায় কথায় শরৎকে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়া দিলেন, "দ্যাখ, তোর সাধনা হচ্ছে শক্তির সাধনা—তোর ইষ্ট হচ্ছেন শিব। আর তোর সাধনভজন, শক্তিসামর্থ্য সব কিছু রয়েছে এইখানে।—ইহা বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন নিজেকে।

তাঁহার সাধন-জীবনের শক্তি-উৎস যে দক্ষিণেশ্বরের এই মহা পুরুষেরই মধ্যে, এ কথাটি ভক্ত শরতের হৃদয়ে সেদিন চিরতরে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল।

শরৎ সেবার এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পিতা ঔষধের ফার্মাসীর মালিক, স্বভাবতই তাঁহার ইচ্ছা, শরৎ মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করিয়া ডাক্তার হোন।

শরৎ ভর্তিও হইলেন, কিন্তু বিপদ বাধিল শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়া। গম্ভীরভাবে তিনি বলিয়া বসিলেন, "দ্যাখ, তুই ডাক্তার হ'লে কিন্তু তোর হাতে খেতে পারব না।"

ডাক্তার আর উকিলের হাতে ঠাকুর জলগ্রহণ করিতে পারেন না, একথা প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত। শরৎ এবার তাই এক মহাসঙ্কটে পড়িলেন ঠাকুর কত আনন্দ করিয়া তাহার আনীত খাবার খান, এখন হইতে তো আর তাহা সম্ভব হইবে না। বালকপ্রতিম ঠাকুরের সেই প্রসন্নোজ্জ্বল মুখখানি বার বার হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠে। সিদ্ধান্ত ঠিক করিতে শরতের আর দেরি হয় না। স্থির করেন ডাক্তারী পড়া ছাড়িয়াই দিবেন।

কার্যত তাহাই হইল। কলেজ হইতে অচিরে নিজেকে তিনি অপসৃত করিয়া নিলেন, বি-এ পড়ার জন্য ভিন্ন কলেজে ভর্তি হইলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন সংবাদ আসিল, তাঁহার কণ্ঠতালু হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে। শ্যামপুকুর স্ট্রীটের এক ভাড়াটে বাড়িতে আনিয়া তাঁহার চিকিৎসা শুরু হইল।

যে কয়টি যুবক ভক্ত প্রাণপণে এ সময়ে ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করেন, শরৎ তাঁহাদের অন্যতম।

ঠাকুরের ব্যাধি ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। শরৎ আগে বাড়ি হইতে যাতায়াত করিতেন সুযোগমতো কলেজেও হাজিরা দিতেন। এবার বাড়ি ছাড়িয়া ঠাকুরের কাছেই রহিয়া গেলেন, কলেজের পড়াশুনায়ও ছেদ পড়িয়া গেল। একান্ত নিষ্ঠায় ঠাকুরের সেবা-কর্মে তিনি আপনাকে ঢালিয়া দিলেন।

ভক্ত ও সেবকদের মধ্যে প্রকৃত উদ্দীপনা জাগাইয়া রাখিতে নরেনের জুড়ি ছিল না। ঠাকুরের রোগ দুরারোগ্য, সংক্রামক। পাছে সেবক-ভক্তদের মনে এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ বা ঘৃণা আসে, এজন্য তিনি সেদিন এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। রোগীর রক্তপূঁজ মিশ্রিত থুথু-ফেলার পাত্রটি হইতে খানিকটা থুথু অবলীলায় তিনি পান করিয়া ফেলিলেন। শরৎ ও শশীও তাঁহার দেখাদেখি সেদিন উহার বাকীটা গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সেবায় ও সাধন-ভজনে শরৎ আনন্দে দিনযাপন করিতেছেন। বার বার চেষ্টা করিয়াও পিতা গিরিশ চক্রবর্তীমহাশয় পুত্রের মনকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে একদিন তিনি শেষ চেষ্টায় নামিলেন। গিরিশবাবুর গুরুদেব জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সিদ্ধ তান্ত্রিক বলিয়া খ্যাত। সেদিন তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া তিনি উপস্থিত।

পিতা ভাবিয়া নিয়াছেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেই শ্রীরামকৃষ্ণকে নিরুত্তর হইতে হইবে। পুত্র শরৎ তখন বুঝিবেন, সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করেন নাই। কার্যকালে কিন্তু বিপরীত ঘটিল।

পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার সহিত সামান্য কিছু কথাবার্তা বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় বড় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তারপর একান্তে গিরিশকে কহিলেন, "না গো, শরৎ যে মহৎ আশ্রয় পেয়েছে তা সত্যি দুর্লভ। এ আশ্রয় আমি তাকে ছাড়তে বলবো কি ক'রে ?"

দুঃখিত চিত্তে পিতাকে সেদিন ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু তিনি একেবারে হাল ছাড়িলেন না। আর একদিন নিজেই আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিলেন। কহিলেন, "আপনি বললে শরৎ বিয়ে করতে রাজী হবে। কৃপা ক'রে একবারটি বলুন না।"

পুত্র নিকটেই দণ্ডায়মান। পিতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, উনি বললেই আমি তা শুনছি কিনা। জীবনে যা একেবারে আদর্শ বলে, বরণীয় ব'লে ধরে নিয়েছি, তা উনি বললেও কোনোমতে ছাড়ছিনে।"

চতুর শ্রীরামকৃষ্ণ তরুণ ভক্তের এ কথার সুযোগ নিতে ছাড়িলেন না। সহাস্যে কহিলেন, "ওগো, শুনছো তো, ও কি বলছে। তাহ'লে আমি আর কি করতে পারি, ব'ল ?"

অনন্যোপায় হইয়া পিতাকে এবার ক্ষান্ত হইতে হইল। শরতের জননী ও ভ্রাতারা উত্তরকালে ঠাকুরের অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুরের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় নানা অলৌকিক ভাব, দিব্য আনন্দের অপূর্ব প্রকাশ। ব্যাধিগ্রস্ত দেহের সেবায় তরুণ ভক্তেরা তাঁহার ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে আসুক, সেবাশুশ্রূষার মধ্য দিয়া আত্মনিবেদন তাহাদের পূর্ণতর হোক—ইহাই ঠাকুর চান। আরও চান নরদেহের শেষের দিনগুলিতে যে দিব্যশক্তি তাঁহার মধ্যে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। ভক্তেরা উহা হইতে চিরজীবনের পাথেয় সঞ্চয় করিয়া নিক।

এর একদিন শেষ শয্যায় শায়িত ঠাকুরের ভাবাবেশ ও ঐশী উদ্দীপনা দেখিয়া শরৎ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তদের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। সেদিন ছিল শ্যামাপূজা অনুষ্ঠানের দিন। ঠাকুর পূর্বদিন ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "ওরে, কালকে কালীপূজা, তোরা পুজোর উপকরণ সংক্ষেপে যোগাড় ক'রে রাখিস।"

আয়োজন করিয়া রাখা হইল। কিন্তু পূজার দিন ভক্তেরা বড় বিপদে পড়িলেন।

ঠাকুর শয্যায় উপবিষ্ট, চারিদিকে সকলে তাঁহার নির্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূজা সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই করিতেছেন না। একেবারে নির্বিকার।

রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে, অথচ ভক্তেরা কি করবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এ সময়ে গিরিশচন্দ্র এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন,—ঠাকুরের দেহেই শ্যামা মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হোক, এই ভাব নিয়া সংগৃহীত পুষ্পচন্দন তিনি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিলেন। বীর ভক্তের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জয় মা জগদম্বে।"

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন, চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল দিব্যোজ্জ্বল হাসির ছটা, দুই হাতে রূপায়িত হইল বরাভয় মুদ্রা। ভক্তেরা উল্লাসে মাতিয়া একে একে শ্রীরামকৃষ্ণের অর্চনা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের সেদিনকার দিব্যভাব ও বরাভয় মুদ্রার অপরূপ দৃশ্যটি শরৎ-এর হৃদয়পটে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যায়। উত্তরকালে সাধনজীবনে এই স্মৃতিচিত্র বার বার তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছে, নবতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের গলরোগের জোর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা চলিতেছে। ডাক্তারদের সুস্পষ্ট নির্দেশ, রোগীর কোনোরকম উত্তেজনা বা উদ্দীপনার কারণ যেন না ঘটানো হয়। এ সময়ে ভাবসমাধি হইলে বায়ুর চাপে তাঁহার গলার ব্যথা অসহ্য হইয়া উঠিত।

সেদিন ঠাকুর নিজেই উৎসাহ করিয়া শরৎকে কয়েকটি আসন ও মুদ্রা দেখাইতেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে শরৎকে কহিলেন, "ওরে, আর বেশি তোকে দেখানো হলো না। আসন ক'রে বসলেই উদ্দীপনা হয়ে মন সমাধিতে ডুবে যায়, আর বায়ু উপরে উঠে যাওয়ায় গলার ঘায়ে আঘাত লাগে। তাই তো যাতে সমাধি না হয় সেজন্য ডাক্তার বার বার সাবধান করে দিয়েছে।"

ঠাকুরের এই বেদনা বৃদ্ধির কারণ হওয়ায় শরৎ নিজেকে অপরাধী ভাবিতে লাগিলেন। সকাতরে কহিলেন, "তবে কেন আপনি এসব আমায় দেখাতে গেলেন? আমি তো দেখতে চাইনি।"

সস্নেহে ঠাকুর উত্তর দিলেন, "তা তো বটেই। তবে কি জানিস, তোদের এক আধটুকু না দেখিয়ে নিজে থাকতে পারি কই।"

ভক্ত কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ মহামানবের প্রেমোজ্জ্বল আননের দিকে চাহিয়া তরুণ ভক্ত শরতের নয়ন দুইটি সেদিন অশ্রুসজল না হইয়া পারে নাই।

তরুণ ত্যাগব্রতী ভক্তগণ প্রাণপণে শেষ শয্যায় শায়িত ঠাকুরের সেবা করিয়া চলিয়াছেন। আর এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়া ঠাকুরের আশিস্ প্রসাদ অনেকেই লাভ করিতেছেন। ঠাকুর একদিন প্রসন্নমধুর কণ্ঠে শরৎকে কহিলেন, "সবাই পর পর মনের কথা বলছে, দর্শন আর উপলব্ধি চাইছে। কিন্তু কিরে, তুই তো কিছু চাইলিনে?"

ঠাকুর তাহাকে নিজে হইতে কাছে টানিয়া নিয়াছেন, অহেতুকভাবে এত কৃপা বর্ষণ করিতেছেন তবে আর তাঁহাকে এটা ওটা বলিয়া অনর্থক বিরক্ত করা কেন? এইজন্যই শরৎ এতদিন কোনো প্রার্থনাদি তাঁহাকে জানানো প্রয়োজন মনে করেন নাই। এবার ঠাকুর নিজেই আগাইয়া আসিয়া বর দিতে চাহিতেছেন।

চোখ দুইটি তাঁহার মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্বল্পবাক্ তরুণ সাধক উত্তর দিলেন "কি আর চাইবো, আমার যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন হয়—এই আশীর্বাদ করুন।"

"ওরে শেষ কালের কথা রে।"

"তা আমি জানিনে মশায়!"

প্রেমাপ্লুত স্বরে ঠাকুর কহিলেন, "তা তোর হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবনের পূত স্পর্শে শরতের উপলব্ধির দ্বার ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতে থাকে। লীলা সংবরণের পূর্বে যে এগারোটি চিহ্নিত ভক্ত ঠাকুরের হস্ত হইতে গৈরিক বস্ত্র নিয়া সন্ন্যাসী হন, শরৎ ছিলেন সেই ভাগ্যবানদের অন্যতম।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর অন্যান্য যুবক ভক্তদের মত শরৎও মহা সমস্যায় পড়িলেন। যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সাধনজীবন শুরু হইয়াছে হঠাৎ তিনি নিজেকে অপসারিত করিয়া নিলেন। দিগ্‌দিশারী পরমকারুণিক ঠাকুরের নির্দেশ না পাইলে কি করিয়া বাঁচিবেন? কোথায় সাধনভজন করিবেন, অভীষ্ট লাভের পথে কি করিয়া অগ্রসর হইবেন?

আশ্রয়চ্যুত শরৎ কিছুদিনের জন্য স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে মন টিকিতে চাহে না, যে অধ্যাত্ম পরিমণ্ডলে এতদিন বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাহার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, গুরু ভ্রাতাদের সঙ্গে বাস করিবার জন্য সর্বসত্তা উন্মুখ হইয়া উঠে।

ভক্তদের এই দিগ্‌ভ্রান্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় নরেনের নেতৃত্বশক্তি আনিয়া দিল নবতর প্রেরণা, নবতর সঞ্জীবনের পরিকল্পনা। ঠাকুরের তিরোধানের দুই মাস পরে বরানগরের এক পুরাতন পরিত্যক্ত বাড়িতে ত্যাগী যুবক ভক্তেরা এক আস্তানা গড়িয়া তুলিল।

শরৎ পিতৃগৃহে বাস করেন কিন্তু প্রায়ই বরানগরের মঠে যাতায়াত করেন। সেখানে ধ্যান ধারণা ও ভজনকীর্তনে সময় অতিবাহিত করে। মাঝে মাঝে সেখানে রাত্রি যাপনও করেন।

ঠাকুরের তিরোধানের পর শরৎ-এর পিতা গিরিশচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, পুত্রের বৈরাগ্য-প্রবণতা এবার কমিবে, ধীরে ধীরে আবার হয়তো তাঁহাকে গৃহজীবনে ফিরাইয়া আনা যাইবে। কিন্তু বরানগরের মঠের উপর তাঁহার টান দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। যুক্তিতর্ক, তিরস্কার, অনুনয় সব কিছুই ব্যর্থ হইল, শরৎ তাঁহার সাধনা ও বৈরাগ্যজীবন ত্যাগ করিতে রাজী নহেন। অবশেষে ক্রুদ্ধ পিতা একদিন তাঁহাকে সারাদিন ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে শরৎ সেদিন ঐ বদ্ধ ঘর হইতে উদ্ধার পান। তারপর এক বস্ত্রে উপনীত হন বরানগরের মঠে। ভ্রাতাদের মধ্যে বিপুল আনন্দ কলরব পড়িয়া যায়।

শরৎ-এর পিতা বুঝিলেন, পুত্রকে গার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরাইয়া আনা আর সম্ভব নয়। অচিরে একদিন বরানগরে আসিয়া পুত্রকে তিনি মুক্তি দিয়া গেলেন। কহিলেন, "তুমি আমার বড় ছেলে, কত কিছু আশাভরসা আমরা করেছিলুম তোমার ওপর। তুমি আমাদের সুখ-দুঃখের দিকে ফিরেও চাইলে না। তোমায় সেদিন তালা বন্ধ ক'রেও ধরে রাখতে পারিনি, তাই মনে হচ্ছে—হয়তো তোমার এই বৈরাগ্যের ব্রত ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। আর আমি তোমার টানাটানি করবো না, তোমার সাধনপথে বাধা দিতেও চাইনে।

শ্রীভগবানের হাতেই তোমায় সঁপে দিলুম। আশীর্বাদ করি তুমি তোমার অভীষ্ট লাভ করো।

শরৎ এবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

১৮৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে একদিন মঠের ত্যাগী ভক্তদল শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকার সম্মুখে বসিয়া হোম অনুষ্ঠান করিলেন।

হোম ও সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের পর শরৎ-এর নাম হইল সারদানন্দ। অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপস্যার মধ্য দিয়া শুরু হইল তরুণ সাধকদের জীবনে নূতনতর অভিযাত্রা।

অতঃপর কিছুকালের জন্য শুরু হয় সারদানন্দজীর পর্যটন ও তপস্যা।

পরিব্রাজন কালের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপার কাহিনী উত্তরকালে তাঁহার কাছে মাঝে মাঝে শুনা যাইত।

সে বার হরি মহারাজ ও সান্ন্যালমহাশয়ের সঙ্গে সারদানন্দজী কেদারের পথে চলিয়াছেন। পথ নিতান্ত দুর্গম, সঙ্গে উপযুক্ত শীতবস্ত্র নাই। খাবারের সংস্থান তো নাই-ই। ঠাকুরের কৃপায় মাঝে মাঝে কিছুটা খাদ্য জুটিতেছে, আবার কখনো চলিতেছে অনাহার।

সেদিন তাঁহারা বুড়া কেদারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ কয় দিন অর্ধাহারে ও অনাহারে কাটিয়াছে। ক্ষুধার্ত, পথশ্রান্ত শরৎ মহারাজ এবার মনে মনে ভাবিলেন, তবে কি এই পরিব্রাজনের পথে ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে নাই! দিনের পর দিন এমন দুঃসহ দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে। অথচ, কই ঠাকুরের অলৌকিক কৃপা-রশ্মি তো দেখা গেল না।

জীবন-মরণের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে মন গলিয়া গেল। মনে মনে আবদারের সুরে শরৎ মহারাজ কহিলেন, "বেশ তো, আজ এখানেই পরীক্ষা করবো। এই বুড়া কেদারে যদি গরম গরম লুচি খেতে পাই, তা হ'লে মানবো ঠাকুর আমাদের সাথে সাথেই রয়েছেন।"

পরবর্তী ঘটনার বর্ণনায় সারদানন্দ বলিয়াছেন, "বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় পেছন থেকে—'এ মহাত্মা! এ মহাত্মা! শব্দ শুনে ফিরে চাইতে দেখি এক দোকানী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি যেতেই বললে—'খা লেও!' অর্থাৎ খেয়ে নাও।

"আমি বললাম—আমার সঙ্গে দুজন সাধু আছেন, যা দেবে দাও, তিনজনে ভাগ করে খাবো।

"দোকানী বললে—দুজন সঙ্গে আছে, তাতে আর কি হয়েছে! তুমি বসে খাও, তারপর সে দুজনার জন্য যা দেবার দেবো'খন।

"দোকানীর আগ্রহ দেখে খেতে বসে পড়লেম। বেশ ক'রে গরম-গরম লুচি খাওয়ালে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর যখন বললাম—কই তাদের জন্য যা দেবে দাও। দোকানী বললে—তুমি তো খেয়েছ, আবার কি? যাও, আর কিছু হচ্ছে না!

"আমি দোকানীর ব্যবস্থা দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল রাত্রের সেই কথা। তখন সকল কথা সান্ন্যাল ও হরি ভাইকে বলবার জন্য সটান ফিরে এলাম। তারপর একে একে সকল কথা বললাম। তখন হরি ভাই ও সান্ন্যালের যা হাসি। দোকানী যে আমায় বোকা বানিয়ে খাইয়ে বিদায় করেছে, সেই কথাই ওরা আমায় শোনাতে লাগলো।"

পাহাড় হইতে নামিয়া উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে শরৎ মহারাজ ভ্রমণ করেন। তারপর তাঁহাকে বরানগর মঠে ফিরিয়া আসিতে হয়।

এ সময়ে প্রায় দুই বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিবার পর শরৎ মহারাজের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। ১৮৯৪ সালে সারদাদেবী ভক্তদলসহ শাহাবাদ জেলার কৈলওয়ারে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। সারদানন্দও তাঁহার সঙ্গী হন। এখানে কিছুদিন থাকার ফলে স্বীয় হৃত স্বাস্থ্য তিনি ফিরিয়া পান।

মুক্তি-তপস্যার আগুন সারদানন্দের অন্তরে নিরন্তর জ্বলিতেছে। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এবার তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে শুরু হইল তাঁহার কঠোর তপশ্চর্যা। এ সময়কার জীবন সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, গ্রাম থেকে ভিক্ষে ক'রে সিধে আনতুম। একটা মাটির মালসায় তাই কোনোরকমে দিনান্তে ফুটিয়ে নিয়ে খেতুম। আর সারারাত চলতো ধ্যানজপ। রান্না হয়ে গেলে সেই মালসাতেই ঠাকুরকে অন্ন নিবেদন ক'রে তাতেই প্রসাদ পেতুম। পাত্রটিকে ধুয়ে গাছে টাঙিয়ে রাখতুম, পর দিন আবার তাতেই রান্না হতো। এভাবে অনেক দিন ঐ একই পাত্রে চালিয়েছিলুম।"

ইহার পর আবার কিছুদিনের জন্য তিনি দেশ পর্যটনে বাহির হইয়া পড়েন। পুষ্কর, দ্বারকা, প্রভাস প্রভৃতি দর্শন করিয়া আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের দুয়ারে এক নূতন আশার, নূতন উদ্দীপনার বাণী বহন করিয়া আনিল। চিকাগোতে সারা বিশ্বের ধর্মনেতা ও দার্শনিকদের সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের ধ্বজা উড্ডীন করিলেন, আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিল।

অত পর স্বামীজীর কাজকর্ম বৃটেনেও শুরু হইয়া যায়। কর্মপরিধি তো প্রসারিত হইল, কিন্তু দুই মহাদেশে এক সঙ্গে ইহার দায়িত্বভার স্বামীজী কি করিয়া বহন করিবেন? নিজের সহকারীরূপে তিনি মনোনীত করিলেন সারদানন্দকে। প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা এবং ধর্মনিষ্ঠার সহিত এই রামকৃষ্ণ-শিষ্যের মধ্যে মিলিত হইয়াছে অপূর্ব কর্মকুশলতা। তাই সারদানন্দকেই তাঁহার সহকারীরূপে বিদেশে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে সারদানন্দ লণ্ডনে পৌঁছিলেন। ইয়োরোপ আমেরিকায় প্রধান কাজ প্রচার—বেদান্ত সম্বন্ধে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা সম্বন্ধে যে আগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিতে জাগ্রত হইয়াছে তাহাকে স্থায়িত্ব দেওয়াই এখনকার বড় কাজ। আর এই কাজ করিতে হইবে প্রধানত যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে। বক্তৃতা করিতে হইবে এদেশের তীক্ষ্ণধী, সুপণ্ডিত শ্রোতাদের মধ্যে। সারদানন্দজী কর্মী পুরুষ, বক্তৃতার ধার বড় একটা ধারেন না। তাই একাজ তাঁহার তেমন মনঃপূত নয়, প্রথমটায় এখানে আসিতেও তিনি চান নাই। বার বার স্বামীজীর তাগিদ ও স্নেহপূর্ণ চিঠি পাইয়াই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

লণ্ডনে পৌঁছিয়াই সারদানন্দ স্বামীজীকে কহিলেন, "বক্তৃতা কিন্তু আমি দিতে পারবো না, আগেই তা বলে রাখছি।"

স্বামীজী ধমকাইয়া কহিলেন, "বক্তৃতা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন? ঠাকুরের কাজ করতে এসেছিস্। তুই উপলক্ষ মাত্র, সভায় গিয়ে দাঁড়াবি, তাঁর যা খুশী বলিয়ে নেবেন। ভালমন্দ তাঁর—তোর কি? দেহাভিমান নিয়ে ঠাকুরের কাজ। ওঁকে

ছুঁড়ে ফেলতে না পারলে এসেছিলি কেন? যা ফিরে যা, দেহাভিমান থাকতে ঠাকুরের কাজ হয় না।"

কথাগুলি সারদানন্দের মর্মমূলে প্রবিষ্ট হইল, বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

এবার স্বামীজী আশ্বাস দিলেন, "ক্ষেপেছিস্ নাকি? 'পারবো পারবো, বললেই সব পারবি। তোকে দিয়ে যে ঠাকুরের অনেক কাজ হবে, সেকথা আমি জানতে পেরেছি। তুই শুধু সভায় গিয়ে দাঁড়াবি, দেখবি, ঠাকুরের কাজ তিনিই করাবেন।"

সেই দিনই সন্ধ্যাকালে স্বামীজীকে এক সভায় ভাষণ দিতে হইবে। সভাস্থলে পৌঁছিয়া তিনি বলিয়া বসিলেন, সেদিন তিনি আর বক্তৃতা করিবেন না, বক্তৃতা দিবেন তাঁহার গুরু ভ্রাতা, ভারত হইতে সদ্য আগত স্বামী সারদানন্দ।

সারদানন্দ তাঁহার সেদিনকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমি তো ভয়ে কেঁপেই অস্থির। মনে মনে স্বামীজীর ওপর রাগ হতে লাগলো। কিন্তু তখনও উঠছি না দেখে স্বামীজী এক ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'যা বল্‌গে—ভয় নেই।' সেই স্পর্শে, সেই কণ্ঠস্বরে আমি যেন যন্ত্রচালিতবৎ হয়ে বক্তৃতা করতে দাঁড়ালাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। বক্তৃতা শেষে স্বামীজী বলেছিলেন, বক্তৃতাটি আশানুরূপ হয়েছে। গুডউইন হাসতে হাসতে আমায় জানালো বক্তৃতাটি নাকি খুবই ভাল হয়েছে। যাক, বাঁচলাম। বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল, বড় ভয় হচ্ছিল, স্বামীজীর গালমন্দ বুঝি আবার খেতে হয়।"

গুরুভ্রাতা স্বামীজীর সে সময়কার স্মৃতি মনে পড়িলে উত্তরকালে সারদানন্দের দুই চোখ অশ্রু সজল হইয়া উঠিত। যে ভাবে স্বামীজী তাঁহাকে লণ্ডনে বক্তৃতা দানের জন্য গড়িয়া নিতেছিলেন তাহার বর্ণনায় বলিতেন, "স্বামীজী হাতে একটি ছড়ি নিয়ে বসতেন, আর আমায় বক্তৃতা দিতে আদেশ করতেন। হাত পা নড়লেই স্বামীজীর বেত এসে হাতের ওপর পড়তো, সজাগ ক'রে দিতো। তিনি এমনি ক'রেই হাতে-কলমে আমায় শিখিয়েছেন।"

প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ্, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন সারদানন্দজীর অবদান তাহাতে কম ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভারতপ্রেমিক অধ্যাপককে উদ্দীপিত করেন, কিন্তু তাঁহার লেখার তথ্য ও তত্ত্ব যোগান সারদানন্দজী। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "ঠাকুরের সম্বন্ধে ম্যাক্স-মুলার যা প্রকাশ করেছেন তা আমি লিখে দিয়েছিলুম। স্বামীজীর ইচ্ছে হয়েছিল, ঠাকুরকে জনসমাজে প্রচার করেন। স্বামীজী নিজে না লিখে আমায় লিখতে বললেন। আমি আপত্তি করলে বলেছিলেন, 'আমি লিখলে বুড়োর মাথায় আমার ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।' আমি যা জানি সব লিখে দিলুম। ভেবেছিলুম, স্বামীজী কাটছাঁট ক'রে দেবেন, কিন্তু তিনি দু'একটি কথার বদল ক'রে, আর দু'এক জায়গায় ভাষার অত্যুক্তি তুলে দিয়ে গোটা লেখাটাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্মরণ হয়, ম্যাক্সমুলারও কিছুমাত্র পরিবর্তন না ক'রেই তা ছেপেছিলেন।"

প্রধানত আমেরিকার বেদান্ত প্রচার কর্মের জন্যই শরৎ মহারাজকে আনানো হইয়াছে। এবার তাই স্বামীজী তাঁহাকে সেইখানেই পাঠাইয়া দিলেন।

যাত্রার পূর্বে শরৎ মহারাজ আবার তাঁহার পুরাতন আপত্তি তুলিলেন, "আমেরিকায় গিয়ে কোনোমতেই আমি কিন্তু বক্তৃতা দিতে পারবো না।"

কিন্তু একথায় কর্ণপাত করে কে? স্বামীজী বলিয়া দিলেন, "আরে বক্তৃতা যা দেবার তা আমিই দিয়ে এসেছি। তুই আর সেখানে কি বলবি? একটু গীতা বেদান্ত পড়াবি, দুই একটি প্রশ্নের জবাব দিবি—এই আর কি।"

আমেরিকার কর্মব্রত সারদানন্দ সুচারুরূপেই উদ্‌যাপন করেন। তাঁহার বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষণ, অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও সংগঠন-প্রতিভা শিক্ষিত আমেরিকানদের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হয়। দুই বৎসরের প্রচারজীবনে বেদান্তধর্মের প্রচারের জন্য যে নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য তিনি দেখান তাহা মননশীল মার্কিন সমাজে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, বিদেশীর চোখে ভারত ও ভারতবাসীর সম্ভ্রম বাড়াইয়া তোলে। তাঁহার প্রচার ও সংগঠনকর্ম স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্মের পরিপূরক হইয়া উঠে।

বিদুষী ভক্ত, মিসেস ওলিবুল্‌কে অনেক সময় বলিতে শোনা যাইত, "স্বামীজীর প্রভা সূর্যের মত, আর সারদানন্দ হচ্ছেন চাঁদের মত স্নিগ্ধ।"

শুধু বেদান্তের বাণী প্রচারেই নয়, বহু মুমুক্ষু আমেরিকানকে বেদান্তের তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করিয়া শরৎ মহারাজ স্বল্প সময়ের মধ্যে এক বিরাট কর্মব্রত সমাপ্ত করেন। তাঁহার কাজের ধারা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "শরৎ যা কিছু করে মূল ধরে করে। শরতের কাজ গভীর।"

স্বামীজী অতঃপর শরৎ মহারাজকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান জানাইলেন। এবার ভারতের সংগঠন কর্মে তাঁহার মত কর্মকুশল ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীর প্রয়োজন।

আহ্বান পাইয়া ১৮৯৮ সালে সারদানন্দ দেশে পৌঁছিলেন। মিশনের সেবাকার্যে ও মঠের নবীন সন্ন্যাসীদের অধ্যাত্মজীবন গঠনে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। একান্ত নিষ্ঠা, অসামান্য সহনশীলতা ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়া এই কর্মযোগীর জীবন আগাইয়া চলে এক মহান্ পরিণতির দিকে।

কলিকাতার প্লেগ মহামারীই হোক, কিংবা রাজপুতানার দুর্ভিক্ষই হোক, জনহিতকর ও আর্তত্রাণের যে-কোনো কর্মে মিশনের নবীন কর্মীরা শরৎ মহারাজের নেতৃত্বে উদ্দীপিত হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। অকুতোভয়, ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী সারদানন্দের ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁহাদের প্রেরণার উৎস-স্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয় সারা বিশ্বে তখন আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের দিকে দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে নবজীবনের প্রাণস্পন্দন। রামকৃষ্ণ-মিশনের উপর সকলেরই দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ, নানা অঞ্চল হইতে মঠের নিকট অনুরোধ আসিতেছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য।

এ সময়ে পূর্ববাংলার ভক্তদের আমন্ত্রণে সারদানন্দজী ঢাকা ও বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন।

তরুণ ভক্তদের আগ্রহে সবেমাত্র তিনি বরিশালে পৌঁছিয়াছেন। চারিদিকে সহস্র সহস্র মানুষের ভিড়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের প্রিয় সহকর্মী এই সাধককে দর্শনের জন্য লোকের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। এমন সময়ে সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তমহাশয় সেখানে ছুটিয়া আসিলেন, পরম সমাদরে শরৎ মহারাজকে নিজ ভবনে নিয়া উপস্থিত করিলেন।

কিন্তু তরুণ ভক্তেরা অতিথিকে সেখানে রাখিতে রাজী নয়, তাহারা তখনই গোলমাল শুরু করিয়া দিল। সারদানন্দজীকে তাহারা নিজেদের কাছে রাখিবে, তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্য-লাভে ধন্য হইবে ইহাই তাহাদের ইচ্ছা।

একটি আগ্রহব্যাকুল তরুণ ভক্ত শরৎ মহারাজের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "স্বামীজী, স্বামীজী, এখানে আর দেরি না ক'রে তাড়াতাড়ি আমাদের ওখানে চলুন।"

অশ্বিনীকুমার ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "কেরে ছোকরা! জানিস আমার ঘরের এই চেয়ারে বসে স্বামী ত্রিগুণাতীত তিন মাস কাটিয়ে গেছেন, নিত্যানন্দ স্বামীও মাসের পর মাস থেকেছেন। শরৎ মহারাজ আমার কে হয় তা জানিস্? ইনি আমার ভাই হন। আমার বাড়িতে না থেকে কোথায় থাকবেন? এখানেই ওঁকে থাকতে হবে।"

সারদানন্দজী মহা বিপদে পড়িলেন। এক দিকে কোমলপ্রাণ কিশোর ভক্তের আব্‌দার, আর এক দিকে সর্বজনমান্য অশ্বিনীকুমার। দুই জনেই তাঁহার দুইটি হাত ধরিয়া প্রবলভাবে টানিতেছেন।

হঠাৎ অশ্বিনীকুমার হাত ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "নাঃ, ভক্তের টান বড় টান। এ টানে যে ভগবান্‌ও বাঁধা। আচ্ছা নিয়ে যা। শরৎ মহারাজ তোদের ওখানেই থাকবেন। তুই ছাত্র-শিষ্য। তোর কাছে পরাজিত হওয়া—এতো আমারই গৌরব।

তরুণ ভক্তটিও ততক্ষণে নরম হইয়া আসিয়াছে। এবার রফা হইল, সারদানন্দজী ছেলেদের অতিথি হইলেও যে কয়দিন এ শহরে থাকিবেন বেশীর ভাগ সময়ই তিনি অশ্বিনীকুমারের গৃহে অবস্থান করিবেন।

সারদানন্দজীর ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিবর্ষী ভাষণ এ সময়ে এ অঞ্চলে এক অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার এখানকার এক বিরাট সভায় সারদানন্দজীর যে পরিচয় দেন তাহার রেশ সারা বাংলার যুবকসমাজের কানে না পৌঁছিয়া পারে নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বামী সারদানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এক চিহ্নিত শিষ্য। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। পরমহংসদেবের কৃপায় শুধু বিশ্বআলোড়নকারী একজন বিবেকানন্দই যে সৃষ্ট হইয়াছেন তাই নয়, তাঁর কৃপায় এঁ'রা প্রত্যেকেই এক একটি বিবেকানন্দ। এক একজন যেন এক আগ্নেয়গিরি। এ'দের প্রতিটি বাক্য, হাবভাব ও ভঙ্গীতে এ'দের জীবনযাত্রার বাঁকে বাঁকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। এ'দের সত্তাটি যেন কেবলই জ্বলছে, যেখানে এ'রা অবস্থান করেন, যে পথ দিয়ে চলে যান, সেখান থেকে অমঙ্গল ভস্মীভূত হয়। যারা এ'দের কাছে এসে পড়বে তারা জীবনে এ'দের একটা উত্তাপ অনুভব না ক'রে পারবে না। এ'দের প্রভাবে বাঘে ও মোষে এক ঘাটে জল খায়—আমি আলমোড়ায় দেখেছি,ভারতবাসীর সাথে এক সঙ্গে ইংরেজ বিবেকানন্দের পদসেবা করছে, জুতো খুলছে। এ'রা বিশেষ কাজের জন্য শরীর ধারণ করেছেন। যদি স্বামী বিবেকানন্দকে আপনারা দেখতেন তবেই বুঝতে পারতেন—সারদানন্দজী তাঁরই এক অবিকল প্রতিচ্ছবি। এ'রা আজন্ম সন্ন্যাসী, ঠাকুরের উপদেশ-বর্ণিত হোমা পাখি, ভূমিষ্ঠ না হতেই ঊর্ধ্বমুখে এদের গতি। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দিষ্ট কাজ করবার জন্য বিবেকানন্দের মতই অল্প বয়সে ইংলণ্ড, আমেরিকায় গিয়েছেন—অদ্ভুত তপঃশক্তি ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে সেখানকার পণ্ডিতসমাজকে বিস্মিত করেছেন।'

বিদায়ের দিন তরুণ ভক্তেরা স্বামী সারদানন্দকে চাপিয়া ধরিল, "আপনার মুখ থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যকথা শোনবার লোভ হয়েছে—আমাদের কিছু বলুন।"

গুরুগতপ্রাণ সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "দ্যাখো, আমিত্বের আ থাকা অবধি ঠাকুরকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। যতই বয়স বাড়ছে, ততই দেখছি ঠাকুরকে কিছুই বুঝতে পারিনি, তাঁকে কিছু বুঝেছেন স্বামীজী আর নাগমশাই। আমরা সেবকমাত্র, তাঁর আদেশ শুধু পালন করতে চেষ্টা করছি। তিনি কৃপা ক'রে যেদিন বোঝাবেন সেই দিনই শুধু বুঝবো।"

এই একৈকনিষ্ঠা ও সেবকভাবই সারদানন্দজীর সারা জীবনে অনুসৃত দেখিতে পাই।

সারদানন্দজীর বংশ ছিল তান্ত্রিক বংশ। তাঁহার নিজ জীবনের শক্তি-সাধনার প্রবণতা কম ছিল না। একবার তন্ত্রের সাধনতত্ত্ব জানার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ জন্মে। পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীমহাশয় ছিলেন এক বিখ্যাত কৌল সাধক। অনুসন্ধিৎসু সারদানন্দের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অভিষিক্ত না হইলে তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তত্ত্বানুসন্ধানী সারদানন্দ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলেন। অবিলম্বে মা-সারদামণির অনুমতি নিয়া তন্ত্রমতে তিনি পূর্ণাভিষিক্ত হন, নূতনতর উপলব্ধির পথে পা বাড়ান।

জগতের সব কিছুর মধ্যে, বিশেষ করিয়া নারীকুলের মধ্যে সারদানন্দ দেখিতেন জগন্মাতারই অপরূপ দিব্য প্রকাশ। এই ধারণা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মিক চেতনা এক পরমাগতির দিকে দিনের পর দিন প্রভাবিত হইয়াছিল।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সাধক সারদানন্দের জীবনে মা সারদা এক সুবৃহৎ স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণনিষ্ঠ এই ভক্তবীর রামকৃষ্ণশক্তি সারদাদেবীর মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন তাঁহার পরমাশ্রয়, উপলব্ধি করিয়াছিলেন দিব্য বরাভয়।

জননী সারদাদেবীর অনেক কিছু দায়িত্ব, অনেক কিছু সেবার ভার তিনি পরমানন্দে নিজ স্কন্ধে তুলিয়া নেন। মাও ক্রমে এই সন্ন্যাসী পুত্রের উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন। সারদানন্দের প্রসঙ্গে একবার এক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "শরৎ হচ্ছে আমার ভারী, সে আমার বোঝা বইতে পারে। রাখাল, শরৎ-টরৎ এরা সব আপন শরীর থেকে বেরিয়েছে।"

মায়ের সেবা ছিল সারদানন্দের কাছে এক পবিত্র পুণ্য কর্ম, তাঁহার আত্মিক সাধনার অঙ্গ। সর্ব অভিমান ত্যাগ করিয়া অপার নিষ্ঠায় তিনি তাঁহার এ কর্মব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

সারদামণি সে সময়ে উদ্বোধন ভবনে অবস্থান করিতেছেন। অসুখ সারিতেছে না, তাই কলিকাতায় আনিয়া তাঁহার চিকিৎসা করানো হইতেছে। এ সময়ে এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। সম্মুখেই সারদানন্দজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ।

আগন্তুক দুই একটি কথাবার্তার পর প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কে ?"

উত্তর হইল, "মায়ের দারোয়ান।"

দর্শনার্থীটি অতঃপর গৃহের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। দর্শন ও কথাবার্তা শেষ করিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় কৌতূহলী হইয়া তিনি জানিতে চাহিলেন, ঐ বিশালবপু র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকটির পরিচয় কি ?

সকলে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "সেকি! ও'কে চেনেন না? উনিই যে বহু-খ্যাত সারদানন্দ মহারাজ!"

রামকৃষ্ণমণ্ডলীর অন্যতম স্তম্ভ, বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহকর্মী এই বীর সন্ন্যাসীর নিরভিমান উক্তি ও সেবকবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আগন্তুকের সারা অন্তর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

আগাইয়া আসিয়া সহাস্যে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনার পরিচয়টা কিন্তু আমায় ঠিক দেননি।"

সারদানন্দ আন্তরিকতার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ঠিকই বলেছি। ঐ পরিচয়ই যে আমার যথার্থ পরিচয়। মায়ের দ্বারে থেকে তাঁর সেবাকেই যে পরম ধর্ম বলে মেনে নিয়েছি।"

এই 'মায়ের দারোয়ান'-এর আর এক রূপ ফুটিয়া উঠিতে দেখি সারদানন্দ সম্বন্ধে মায়েরই নিজস্ব মূল্যায়নের মধ্য দিয়া।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মা-সারদাদেবীর অন্যতম শিষ্য। মজুমদারমহাশয় একদিন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আনিয়া মায়ের কাছে উপস্থিত করেন। তাঁহাকে দীক্ষা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি চলিতে থাকে। কিন্তু মার তখন শরীর বড়ই অসুস্থ। কহিলেন, "বাবা, এখন তো পারছিনে, তুমি বরং কিছুদিন পরেই ওকে নিয়ে এসো।" কিন্তু অত্যুৎসাহী ভক্ত বার বার আবদার করিয়াই চলিয়াছেন, কোনো আপত্তিতেই তিনি কর্ণপাত করিতে রাজী নন।

মা অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা শরতের কাছে যাও, সে যা বলবে তাই হবে।"

মজুমদারমহাশয় উত্তরে কহিলেন, "মা, আমরা আর কাউকে জানিনে একমাত্র আপনাকেই জানি।"

সারদাদেবী দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কি বলছো গো তোমরা। শরৎ যে আমার মাথার মণি। সে যা ব্যবস্থা করবে, তাই হবে।"

এবার বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সারদানন্দের কাছে যাইতে হইল। সারদানন্দজীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীর কিছুদিন পরে দীক্ষার একটি দিন ধার্য করা হইয়াছিল।

অতুলনীয় সেবা ও ভক্তির বলে সারদাদেবীর স্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয়ের অনেকখানি স্থান সারদানন্দ অধিকার করিতে সক্ষম হন। এই অধিকারটি মায়ের শেষের দিন অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল।

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মা সারদামণি তখন ছোট বালিকাটির মতন হইয়া গিয়াছেন। সেবাকারিণীরা তাঁহাকে নিয়া হিমসিম খাইতেছে। সেদিন তিনি বড় বায়না ধরিয়াছেন কিছুতেই পথ্য খাইবেন না। রাত গভীর হইয়াছে, কিছু খাওয়া অবশ্য দরকার কিন্তু মা কাহারো কথা শুনিতেছেন না। সেবিকারা অনন্যোপায় হইয়া সারদানন্দজীর শরণ নিলেন। শ্রীসারদানন্দ প্রসঙ্গ-এ মায়ের এক সেবিকার প্রদত্ত বিবরণে অপত্য স্নেহের এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

"তাঁহাকে দেখিয়াই মা বলিলেন, 'বাবা, আমার কাছে ব'স।' তিনি বসিয়া মার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। মা বলিলেন, 'দেখ না বাবা. এরা আমায় খাবার জন্য জ্বালাতন করছেন,—আমি কিছুতেই খাবো না।'

"মহারাজ কহিলেন, 'হ্যাঁ মা, ওরা বড় বিরক্ত করে আপনাকে।' এইরূপে নানা কথা মার সঙ্গে কহিতে লাগিলেন, যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন বা ভুলাইতেছেন।

"সাতপাঁচ কথার পর যখন মার কাতরতা কিছু কমিয়াছে, তখনই মহারাজ বলিলেন, 'মা, এবারে একটু খাবেন ?'

"মা বলিলেন, 'হ্যাঁ খাবো, দাও।' "

"দাও সরলা, মার খাবার—বলিয়া মহারাজ আমাকে আদেশ করিতেই মা বলিয়া উঠিলেন, 'না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, তবে আমি খাবো—আমি তোমার হাতে খাবো।'

"ফিডিং কাপে দুধ ঢালিয়া মহারাজের হাতে দিলাম। কিন্তু মহারাজ তখন এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, খাওয়াইতে গিয়া হাত কাঁপিতেছে। দুই এক ঢোক খাওয়াইয়াই তিনি বলিলেন, 'মা, একটু জিরিয়ে নিন।'

"মা বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা। দেখতো কি সুন্দর কথা—মা একটু জিরিয়ে খান। এই কথাটা এরা আর কেউ বলতে জানে না। এদের কেবল ঐ এক কথা—মা খাও, আর কাঠি (থার্মোমিটার) লাগাও।'

"খাওয়ানো শেষ হইলে—'বাছার কত কষ্ট হ'ল, যাও বাবা শোও গিয়ে'—এই বলিয়া মা তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন।"

তিরোধানের দিন জননী সারদাদেবী প্রিয় পুত্র সারদানন্দকে কাছে ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, "শরৎ, এরা সব রইলো।"

মায়ের অদর্শন-কাতর ভক্ত ও সেবিকারা যাহাতে অসহায় বোধ না করে—আশ্রয় পায়, ইহারই ইঙ্গিত শেষের দিনে তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেবক, পুত্রপ্রতিম সারদানন্দকে দিয়া গেলেন।

সারদানন্দের মমত্ব কর্তব্যবোধ ও অপূর্ব কর্মকুশলতা মায়ের ভাল করিয়াই জানা ছিল, তাই কতবারই এই কৃতী ও কর্মবীর সন্তানের সম্পর্কে তিনি বলিতেন, "শরৎ আমার সৃষ্টিধর।" কখনো বা তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত—"শরৎ সহস্র ফণা বিস্তার করে সংঘকে ধরে রেখেছেন।"

সারদাদেবীর লীলা সংবরণের কিছুদিন পরের কথা। সেদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উদ্বোধন অফিসে বেড়াইতে আসিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতার চরণে প্রণাম করিয়া সারদানন্দ কহিলেন, "মহারাজ, অসুখের সময় মা একদিন মুড়ি আর ছোলা ভাজা খেতে চেয়েছিলেন। মাকে এ কুপথ্য করতে দিতে মন আমার সায় দেয়নি—তাঁর কাছ থেকে এগুলো আমি ভিক্ষে চেয়ে নিয়েছিলাম, ঐ মুড়ি আর ছোলা ভাজা খেতে দিইনি। আজ তোমাকে খাইয়ে, মাকে মুড়ি আর ছোলা ভাজা খাওয়াতে আমার ইচ্ছে হয়েছে।"

বালকস্বভাব, সদানন্দময় ব্রহ্মানন্দ তখনি রাজী হইলেন, সোৎসাহে কহিলেন, "বেশ তো, নিয়ে এসো এখনি মুড়ি আর ছোলা ভাজা, আমি খাবো।"

স্বামী ভূমানন্দজীর লেখায় এ সময়কার দৃশ্যটি প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে—"মহারাজ (ব্রহ্মানন্দজী) আনন্দ করিয়া মুড়ি ও ছোলা ভাজা খাইতেছেন। শরৎ মহারাজ বুকের উপর উভয় হস্ত রাখিয়া সজল নয়নে খাওয়া দেখিতেছেন। যখন মহারাজের মুড়ি খাওয়া শেষ হইল, শরৎ মহারাজের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শরৎ মহারাজ—মহারাজের প্রসঙ্গে আমাদের বহুবার বলিয়াছে, 'মহারাজের মধ্যে ঠাকুর, মা রয়েছেন।

মহারাজের সেবা, ঠাকুর ও মার সেবা বলে বিশ্বাস করবে।' আমরা এই কথা সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিলেও মহারাজকে মুড়ি ও ছোলা ভাজা খাওয়াইয়া শরৎ মহারাজকে যে তৃপ্তি লাভ করিতে দেখিয়াছিলাম সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না।"

কর্মব্রত ছিল স্বামী সারদানন্দের সাধনার অঙ্গ। প্রতিদিন প্রত্যূষ হইতে মধ্য রাত্রি অবধি কত বহুমুখী কর্মই যে তাঁহাকে করিতে হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। মঠ ও মিশনের পরিচালনা, সন্ন্যাসীদের সংগঠন, আর্ত সেবা ও জনহিতকর কর্ম, পত্রিকা পরিচালনা, লীলাপ্রসঙ্গের মতো গ্রন্থাদি রচনা, দর্শনার্থী ও জিজ্ঞাসুদের সমস্যা মিটানো, একাদিক্রমে কত কিছুর দায়িত্বই না তাঁহাকে বহন করিতে হইত। আর এই সব দুঃসাধ্য ও দুর্বহ দায়িত্বই তিনি বহন করিতেন নিঃশব্দে—অতি স্বাভাবিকভাবে।

অধ্যাত্মসাধনার ধারাটি ছিল এই কর্মযোগী সন্ন্যাসীর সমস্ত কিছু আচার আচরণে ওতপ্রোত। তাঁহার কর্মমুখর বহির্জীবনের অন্তরালে সদা সংগোপিত থাকিত এক আত্মস্থ সাধকের ধ্যানমূর্তি, এবং ব্যবহারিক জীবনের কোনো বিক্ষোভ বা কোনো আঘাতেই সে মূর্তিকে টলাইতে পারিত না।

কর্মকোলাহল ও ভিড়ের মধ্যেও নবীন সন্ন্যাসীরা যাহাতে জপধ্যানের প্রেরণা ও ধৃতি বজায় রাখিয়া চলে এজন্য তাঁহার ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। প্রায়ই তাঁহাদের বলিতেন, "জপধ্যান হচ্ছে আত্মানুসন্ধানের সোপান। তাই সকল কর্মের মধ্যে তা ধরে রাখতে হবে। এই জপধ্যান হচ্ছে সল্ট অব ওয়ার্ক—এর অভাব যাদের মধ্যে ঘটে সেখানে সব কিছুই যেন আলুনি হয়ে যায়—কি করবে তা তারা স্থির করতে পারে না।"

মানবতাবোধ ও জীবপ্রেমই যে সেবাকর্মের প্রকৃত প্রেরণা যোগায়, সারদানন্দ ইহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। যুবক সন্ন্যাসীরা কঠোর বাধ্যবাধকতার মধ্যে না থাকিয়া সহজ প্রেমের টানে স্বাধীনচিত্ততার সহিত মিশনের কর্মব্রত উদ্‌যাপন করুন ইহাই ছিল তাঁহার পরম কাম্য। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও একথা প্রকাশ্যে বলিতে তাঁহার বাধিত না।

তাঁহার এক চিঠিতে মিশনের সেবাকর্মীর সম্পর্কে কোনো অধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, "সকলের আত্মা চিরস্বাধীন বলিয়া তাহারও মনে সকল বিষয়ে সর্বদা স্বাধীনতালাভের ইচ্ছার উদয় হয়। যথার্থ নেতা কখনো তাহার ঐ স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় বাধা দেন না। কেবল ঐ স্বাধীনতালাভ করিলে যাহাতে সে উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে তাহার চেষ্টাই করিয়া থাকেন। যে সকল সেবক তোমার নিকটে মঠে আছেন, তাহা-দিগকে ঐভাবে চালনা করিতে হইবে। নতুবা তাহাদিগের মনে যদি এই ধারণা একবার দৃঢ় হইয়া যায় যে, মঠে থাকিয়া তাহাদিগের স্বাধীনভাবে কোনো কার্য করা অসম্ভব, তাহা হইলে তাহারা পলায়ন করিবার চেষ্টাই করিবে। একমাত্র ভালবাসার বন্ধনেই তাহারা মঠে রহিয়াছে এবং সকল কার্য নিজের ইচ্ছাতেই করিতেছে, কাহারো দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে—এই ভাবটি যাহাতে তাহাদের মনে থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।"

কর্মব্রতের কথায় প্রায়ই তরুণ সন্ন্যাসীদের সম্মুখে সারদানন্দ তুলিয়া ধরিতেন ঐকেক নিষ্ঠার আদর্শ। কহিতেন, "কাজ করবে ঠাকুরের মুখ চেয়ে, কাজ করবে স্বামীজীর মুখ চেয়ে। আমেরিকায় বক্তৃতা দেবার সময়ে আমার ভাব ছিল—আমি ঠাকুরকে শোনাচ্ছি। মিশনের কাজ ঠাকুরের মুখ চেয়ে, স্বামীজীর মুখ চেয়েই ক'রে

যাচ্ছি। লোকে কি বললে, না বললে, তা শুনে কাজ করিনি। তা হলে সব গুলিয়ে যেত।"

নিজের আচার আচরণ ও প্রতিটি কার্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার না করিয়া তিনি ছাড়িতেন না, অকপটে নিজের ভ্রম বা দোষত্রুটি স্বীকারও করিয়া নিতেন। স্বামী ভূমানন্দ ইহার একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন—"একদিন দেখি শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হাত জোড় করিয়া শরৎ মহারাজ বলিতেছেন,—মহারাজ, এবার আমায় অব্যাহতি দাও।' সে কথায় আমাদের মন কাঁপিয়া উঠিল। ইতিপূর্বে এমন করুণ সুরে কথা বলিতে তাঁহাকে আর কখন শুনি নাই। মহারাজও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হয়েছে শরৎ?' শরৎ মহারাজ বলিলেন, সেদিন উমানন্দকে গালমন্দ করেছিলাম—কেন সে আমায় না বলে বৃন্দাবন ছেড়ে চলে এলো? উমানন্দ কিন্তু বলেছিল, 'চিঠি দিয়েছি।' আমি সে কথা মানতে পারিনি। আজ দেখলুম, কেমন ক'রে সেই চিঠিখানা পুরানো চিঠির মধ্যে মিশে গেছে। সে সত্যি কথাই বলেছিল—আমিই অযথা তাকে গালমন্দ করেছি। উমানন্দকে একদিন আনিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।"

ত্যাগ ও সেবার মূলে সদাই কাজ করে সেই জীবপ্রেম যাহা সকল মানুষের অন্তস্থলেই গোপনে বাসা বাঁধিয়া থাকে। কর্মবীর সারদানন্দের দৃষ্টিতে এই প্রেমের মূল্য ছিল অপরিসীম।

প্রথম যুগের বেলুড়মঠের কথা। পৌর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তখন মঠ কর্তৃপক্ষের এক মামলা চলিতেছে। বিপদ দেখা দিল পায়খানার ময়লা পরিষ্কার করার ব্যাপারে। মেথর কাজে আসিতেছে না, দুর্গন্ধে সবার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম। এ সময়ে দুই জন সাধু গোপনে হঠাৎ একদিন ময়লা সাফ করিতে লাগিয়া গেলেন। কথাটি কিন্তু ফাঁস হইয়া যায়, মঠের পাচক তাঁহাদের একাজ করিতে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিয়া দেয়।

বাবুরাম মহারাজ নিষ্ঠাবান্ সাধু, তিনি এ কথা শুনিয়া মহা খাপ্পা। সাধু দুইটিকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে যা-যা, তোরা এখনি গঙ্গায় ডুব দিয়ে আয়। তোরা কিন্তু আর কখনো ঠাকুরঘরের কাজ করতে পারবিনে। যত সব নোংরা কাণ্ড।"

শরৎ মহারাজ ঘটনাটি শুনিলেন। সারা মন তাঁহার আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, "দ্যাখো আজ রাতে লুচি আর হালুয়া করো সবাইর জন্যে, যা খরচ লাগে আমি দেব। এদের দুজনের, 'অনার'-এ এই ভোজ!"

মঠের সন্ন্যাসী বা ভৃত্যদের রোগশয্যায় সারদানন্দের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। অপূর্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত একাজ তিনি সম্পন্ন করিতেন। একবার মঠের এক ভৃত্য প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। সারা অঙ্গে তাহার জ্বালা ও বেদনা। বেচারা কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করিতেছে।

রাত্রির অন্ধকারে গোপনে সারদানন্দ ঐ ভৃত্যের কুঠরীতে প্রবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য সে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারে নাই। দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাহার সর্বাঙ্গ টিপিয়া দিবার পর বেদনা কমিয়া আসিল, সারদানন্দও এই সুযোগে সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পরদিন ঘটনাটি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ভাবাবেগে অভিভূত ভৃত্যটির দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকে।

আর এক দিনের কথা। কলিকাতা প্রবাসী একটি সিন্ধী ভক্ত যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছে। সারদানন্দ ব্যগ্র হইয়া সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। প্রত্যক্ষদর্শী এক সেবক-ভক্ত ইহার বিবরণ দিয়াছেন—

"শরৎ মহারাজ রোগীর খাটের উপর বসিলেন। লোকটির নাম খোকানী। রোগী কাসিতেছে আর খবৃখবৃ করিয়া পিকদানিতে কফ ফেলিয়া রুমালে মুখ মুছিতেছে। সে কফ আর থুথু তাহার হাতেও লাগিতেছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে খোকানী স্বয়ং হাত না ধুইয়া ফল ছাড়াইয়া থালাতে সাজাইয়া আনিয়া মহারাজের সম্মুখে রাখিল। এমন সময় খাইবার অভ্যাস না থাকায় প্রথমে তিনি অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যু যাহার আসন্ন এমন লোক যখন মিনতি জানাইল, তখন তিনি সকল রকম ফল হইতে কিছু কিছু খাইতে লাগিলেন। সম্মুখে পিকদানি কফে পূর্ণ, রোগী থাকিয়া থাকিয়া ভীষণ কাসিতেছে, আর তাহারই মাঝে বসিয়া নির্বিকার চিত্তে তিনি খাইতেছিলেন।

সঙ্গীর সেবক ভক্তটি এই দৃশ্য দেখিয়া সারদানন্দজীর জন্য বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ফিরিবার সময় অনুযোগের সুরে কহিলেন, 'আপনি ওর হাতের ছোঁয়া ঐ ফলগুলো কেন খেতে গেলেন ?"

সারদানন্দ স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "খোকানী যাতে মনে কষ্ট না পায় সে জন্যেই খেয়েছি। নইলে, এ সময়ে আমার খাওয়ার অভ্যেস নেই তা তো জানো ?"

কিন্তু এ কথায় যে ভক্তটি সন্তুষ্ট হয় নাই তা স্পষ্টই বুঝা গেল। সারদানন্দ সান্ত্বনার সুরে এবার কহিলেন, "জান তো ঠাকুর বলতেন, ভালবেসে কেউ কিছু খেতে দিলে, তা খেলে কোনো অনিষ্ট হয় না।"

এই মুমূর্ষু রোগীর হৃদয়বেদনাকে নিজের বেদনায় রূপান্তরিত করিতে সারদানন্দের এক মুহূর্তও দেরি হয় নাই—অথচ এই আসল কথাটি ঢাকিবার জন্য আত্মগোপনপ্রয়াসী সাধক দোহাই দিলেন ঠাকুরের।

মানবপ্রেম ও আশ্রিতের রক্ষক ছিল সারদানন্দজীর চরিত্রের এক স্বাভাবিক প্রবণতা। আর এইজন্যই মঠে ও মঠের বাহিরে সদাই তিনি ছিলেন নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আর্তের পরিত্রাতা।

ভালবাসা ও আশ্বাসনের মধ্য দিয়া বহু কর্মীর জীবনে তিনি শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়া বহু নবীন আশ্রয়প্রার্থীকে সেবা কর্ম ও আত্মিক সাধনার যোগ্য সাধকরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

এক সময়ে কিছু সংখ্যক প্রাক্তন বিপ্লবী রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দিতে আসেন। মঠে যোগদান তখনকার দিনে খুব সহজ ছিল না, বিশেষত রাজনৈতিক সন্দেহভাজন এইসব ব্যক্তিদের দায়িত্ব নিতেও তখন মঠ কর্তৃপক্ষ উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু দূরদর্শী সারদানন্দের বুঝিতে ভুল হয় নাই, এইসব বিপ্লবীদের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে মহামুক্তির আগুন, জাগিয়া উঠিয়াছে প্রকৃত মুমুক্ষা। শক্তিমান্ সাধক সারদানন্দ তাই এসময়ে তাঁহার 'উদার, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট' নিয়া আগাইয়া আসেন, ইঁহাদের মঠ প্রবেশ সহজতর করিয়া তুলেন।

বলা বাহুল্য, বিদেশী শাসকের শ্যেনদৃষ্টি অবিলম্বে এদিকে নিবদ্ধ না হইয়া পারে নাই। মঠে গোয়েন্দা পুলিসের আনাগোনা শুরু হইয়া যায়। গভর্নর-জেনারেল লর্ড

কাবমাইকেলও এ সময়ে তাঁহাব এক ভাষণে ইঙ্গিত কবেন যে বিপ্লবীবা বামকৃষ্ণ মিশনেব মতো প্রতিষ্ঠানেব আশ্রয়ে থাকিয়া নিজেদেব কার্যসিদ্ধিব জন্য চেষ্টিত বহিয়াছে। বাষ্ট্র-প্রধানেব এই উক্তিব বিরুদ্ধে সাবদানন্দ মহাবাজ প্রতিবাদ-পত্র প্রেবণ কবেন। পবিশেষে লর্ড কাবমাইকেলকে তাঁহাব নিকট পত্র লিখিয়া পূর্বোক্ত অবাঞ্ছিত মন্তব্য পবিহাব কবিতে হয়। ইহাব ফলে মঠে যোগদানেচ্ছু প্রাক্তন বাজনৈতিক কর্মীদেব হযবান অনেকাংশে কমিয়া যায়।

বাংলা ও বাংলাব বাহিবে বামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনেব মর্যাদা ক্রমে দিনেব পব দিন বর্ধিত হইতে থাকে। শিবজ্ঞানে জীব সেবাব যে সুমহান বৈদান্তিক আদর্শ বিবেকানন্দ এই সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠানেব মধ্য দিয়া স্থাপন কবিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা প্রধানত রূপায়িত হইতে থাকে সাবদানন্দ ও তাঁহাব সর্বত্যাগী সহকর্মীদেব দ্বাবা। ইঁহাদেব প্রেবণা ও কর্মশক্তিব বলে বামকৃষ্ণ মিশন উত্তবকালে এমন এক আধ্যাত্মভিত্তিক সেবা-প্রতিষ্ঠানে পবিণত হয় যাহাব তুলনা সাবা ভাবতে—শুধু ভাবতে কেন—সাবা বিশ্বে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

সাবদানন্দ ও তাঁহাব গুরুভ্রাতাদেব যে জীবনাদর্শ ও কর্মনিষ্ঠা এদেশে আর্তত্রাণ ও জীবসেবাব নূতনতব প্রবাহ বহাইয়া দেয় তাঁহাব মূলে ছিল প্রেম ও আত্মত্যাগেব প্রেবণা।

সে-বাব এক সেবাকেন্দ্রেব জন্য সাবদানন্দজী কর্মী পাঠাইতেছেন। যাত্রাব পূর্বে ইহাদেব একজনকে তিনি প্রশ্ন কবিলেন, "ওবে সেব'ব কাজে তো যাচ্ছিস, লোকেব কাছ থেকে সংগ্রহ কবা টাকা লোককে দিবি, কিন্তু তোবা নিজেব কোন্ বস্তু দিবি বল্‌তো? হ্যাঁ, মনে বাখিস তুই দিবি তোব হৃদয, তোব ভালবাসা, আব তোব প্রাণ।"

তরুণ কর্মীটি প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, "মহারাজ, সেবাকেন্দ্রেব দবজা কি আমবা বাত্রেও খুলে বাখবো?"

উত্তব হইল, "হ্যাঁ, নিশ্চয খুলে বাখবি।"

আর্তত্রাণেব পবিত্র কর্মে যাহাবা ঝাঁপ দিতে যাবে, এই মহা প্রেমিক সন্ন্যাসী তাহাদেব জন্য সর্বস্বত্যাগেব ব্যবস্থাই দিতেন।

শুধু মুখেব দুই একটি মিষ্ট কথা, আন্তরিকতাব একটু স্পর্শ দিয়া স্বামী সাবদানন্দ কত লোকেব জীবনে যে রূপান্তব আনিযাছেন তাহাব ইযত্তা নাই।

সেবাব তিনি জযবামবাটী হইতে ফিবিবাব পথে কোযালপাডা মঠে আসিযাছেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামেব এক বিশিষ্ট মুসলমান, ফজলু খাঁ তাঁহাকে ধবিয়া বসিলেন, "স্বামীজী, শেষেব দিন তো প্রায এসে গেল। কিন্তু গতি হবাব কোনো উপায দেখ্‌ছিনে। আমায একটু কৃপা করুন।"

সাবদানন্দ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভগবানেব নামজপ ক'বে যাও, ভয় কিসেব?"

"নামজপ তো অনেক দিন থেকে ক'বে আসছি, কিন্তু কই কিছুই তো হচ্ছে না।"

"নোঙ্গব ফেলে দাঁড টানলে কি নৌকো এগোয, ফজলু? সংসাবে যে তোমাব আসক্তি রয়েছে। তাই তেমন হচ্ছে না।"

ফজ্‌লু খাঁ সকাতবে নিবেদন কবিল, "সাধু মহাত্মাবা ইচ্ছে কবলে এ আসক্তি তো কেটে দিতে পাবেন। আমি অনেক মুসলমান ফকিবেব সঙ্গ কবেছি। কিন্তু অদৃষ্টে আজো শান্তি মেলেনি। আমার বিশ্বাস, আপনি আমাব কিছু ক'রে দিতে পাবেন। আমায় দয়া করুন।"

এই ব্যাকুলতা ও কাতবোক্তি সাবদানন্দেব হৃদয গলাইযা দিল। নিস্পলক নেত্রে এই মুসলমান ভক্তটিব দিকে তিনি বেশ কিছুক্ষণ চাহিযা বহিলেন। তাবপব অন্তবঙ্গতাব সহিত তাঁহাকে ডাকিযা নিলেন নিজেব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, ঠাকুবঘবেব বাবান্দায। মূল্যবান সাধন উপদেশ লাভে তৃপ্ত ও উপকৃত হইযা ফজলু খাঁ ঘবে ফিবিযা গেল।

সেবা-কর্মে, সংগঠন, মিশন পবিচালনা প্রভৃতি ছাড়া আবও একটি কাজ সাবদানন্দ মহাবাজ কবিযা গিযাছেন, যে জন্য দেশবিদেশে তাঁহাব নাম চিবস্মবণীয হইযা থাকিবে। এই কাজ—তাঁহাব জীবন-দেবতা, ঠাকুব বামকৃষ্ণেব লীলাভাষ্য প্রণযন। শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ গ্রন্থেব ছত্রে ছত্রে তাঁহাব গুবুভক্তি, অধ্যাত্ম অনুভূতি ও মনীষাব ছাপ বহিযা গিযাছে, বাংলা ভাষায বচিত এই মহাগ্রন্থ এবং ইহাব অনুবাদেব মাধ্যমে বিশ্বেব অধ্যাত্ম-পিপাসু নবনাবী শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণেব পুণ্যচবিত কথা জানিযা তৃপ্ত হইযাছে। তাঁহাব আমেবিকাব বক্তৃতাবলী এবং 'ভাবতে শক্তিপূজা' নামক গ্রন্থও কম সমাদৃত হয নাই।

১৯২২ সালেব কথা ব্রহ্মানন্দ মহাবাজেব তখন তিবোধান ঘটিযাছে। সিদ্ধান্ত স্থিব হইল মঠবাসীদেব মত নিযা নূতন অধ্যক্ষ নির্বাচন কবা হইবে।

শ্রীবামকৃষ্ণেব বিশিষ্ট শিষ্য স্বামী তুবীযানন্দকে এ সময বলিতে শোনা গিযাছিল, "আমি কেবল আমাব নিজেব কথাই বলিতে পাবি। ভোট দিতে যদি হয, আমি শবৎকে দেব। স্বামীজীব পবে শবতেব মত এত পবিশ্রম—সাবাটি জীবন মুখ বুজে এমন হৃদক্ষবী পবিশ্রম আব কেউ কবেনি, এত হাঙ্গামা কেউ পোযাযনি।"

নির্বাচন সভায দেখা গেল, অধিকাংশ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচাবীই শবৎ মহাবাজকে অধ্যক্ষবূপে চাহেন। স্বামী শিবানন্দ এসমযে সভায দাঁড়াইযা কহিলেন, "প্রায সকলেই যখন শবৎকে চায, তখন তাঁকেই অধ্যক্ষবূপে ববণ কবা উচিত।"

কিন্তু সাবদানন্দ কিছুতেই এ প্রস্তাবে বাজী নহেন। তিনি নিজেই অগ্রজপ্রতিম শিবানন্দজীকে অধ্যক্ষ পদেব জন্য ভোট দিযাছেন। একবাব চতুবতাব আশ্রয নিযা সর্বসমক্ষে কহিলেন, "যে যাই বলুক, স্বামীজী, বিবেকানন্দ আমাব এ মঠেব সম্পাদক ক'বে গেছেন সে পদ আমি কোনোমতেই ছাড়ছিনে।"

সভাস্থলে নিজেই তিনি সোৎসাহে দাঁড়াইযা শিবানন্দজীকে নির্বাচন কবাব প্রস্তাব আনিলেন।

শিবানন্দজী অন্তর্মুখীন সাধু, প্রায সমযই জপতপ ও ধ্যানধাবণা নিযা কাটান। তিনি আপত্তি তুলিলেন, এই বৃদ্ধ বযসে অত কাজেব হাঙ্গামা তিনি সহ্য কবিতে পাবিবেন না।

সাবদানন্দ অমনি উত্তব দিলেন, "কাজেব ঝঞ্ঝাট পোহাবার জন্য তো এই দাসই প্রস্তুত বযেছে।"

তাঁহাব চাপে পড়িযা শিবানন্দ মহাবাজকে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল।

নিজেব আনুগত্য প্রকাশেব জন্য তখনই সাবদানন্দ সভাস্থ সকলেব সমক্ষে বযোজ্যেষ্ঠ ও শ্রদ্ধাভাজন গুবুভ্রাতাকেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন কবিলেন।

আমেবিকায থাকাকালেই সাবদানন্দেব আচার্য জীবন শুবু হয। কিন্তু সে সময়ে এবং তাহাব পববর্তীকালে যে সব দীক্ষাপ্রার্থীকে তিনি কৃপা করিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা বড় কম। সাবদাদেবীব তিবোধানেব পর কিন্তু তাঁহাব মধ্যে এক পরিবর্তন দেখা গেল। এবার হইতে অকৃপণ করে মুমুক্ষুদেব উপর তিনি কৃপাবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দীক্ষা দানেব সময দেখা যাইত তাঁহাব এক নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব। মা-সাবদামণিব চবণে শিষ্যেব গুবুভাবটি সর্বদা ন্যস্ত কবিতেন। মাযেব ভক্ত ও সেবিকা শ্রীমতী সবলা সাবদানন্দেব আচার্য জীবন সম্বন্ধে লিখিযাছেন—"কোনদিন দুই তিন জনকে দীক্ষা দিতে হইলে সেদিন মহাবাজেব আব ঠিক সময়ে খাওয়া হইত না। একদিন জিজ্ঞাসা কবিলাম, 'আপনাব দীক্ষা দিতে অত দেবি হয় কেন? মাব তো দেখেছি অত দেবি হত না।'

"খানিক চুপ থাকিযা উত্তব দিলেন, 'দেখ, মা কাকেও ছুঁযে দিলেই তাব সব হয়ে যেত। কিন্তু আমি তা পাবব না। আমাকে অনেক আহ্বান কবতে হয়। তিনি গ্রহণ করলেন বা ভাব নিলেন যতক্ষণ না দেখতে পাই ততক্ষণ আমাব ছুটি নাই।"

"একদিন বিকালবেলা গিযা দেখি মহাবাজ চুপচাপ বসিযা আছেন, অথচ জপ-ধ্যানও কবিতেছেন না। জিজ্ঞাসা কবিলাম, 'আপনি অমন করে বসে আছেন কেন? শবীব খাবাপ হযেছে নাকি?"

"উত্তব দিলেন, হ্যাঁ, ঐ বকম আব কি। আজ একজনকে দীক্ষা দেবার পব থেকেই দেখি শবীবটা অসোযাস্তি বোধ কবছে। একটা জ্বালা পোড়াব মত বোধ হচ্ছে। মা যে বলতেন এক একজনকে দীক্ষা দিলে শবীবটা জ্বলে যায, সেটা আজ বেশ অনুভব করছি!"

আত্মগোপন প্রযাসী সাবদানন্দেব সাধন-শক্তির পবিচয এক একদিন হঠাৎ কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে বাহিব হইযা পড়িত। শিষ্য শ্রীকেশবলাল চক্রবর্তী সেবাব তাঁহাকে বলিতেছেন, "মহাবাজ, শুনেছি গুবুকে নাকি জীবনেব সব কথা খুলে বলতে হয়। আমাকেও তো তা'হলে বলতে হয। ব'লবো?"

তিনি অবলীলায উত্তর দিলেন, "হযেছে, তোব নিজেব কথা তুই কি জানিস্? আমি তোব সব কথা জানি, কেন এসেছিস, কী হবে—তাও জানি। তোব কথা তুই আব কি বলবি?"

মা সাবদামণিব ভক্ত ও শিষ্যাদেব জন্য সারদানন্দের ছিল অগাধ স্নেহ ও অপরিমেয় কৃপা। মাতৃ অদর্শনকাতব এইসব ভক্তদেব সন্তপ্ত হৃদয় তাঁহাব দর্শনে জুড়াইযা যাইত।

স্ত্রী-ভক্তেবা তাঁহাব মধ্যে দেখিতেন মাযেবই সঞ্জীবনী-মূর্তি। সারদানন্দেব পাশ্চাত্য দেশীয শিষ্যা মিসেস ই. বি. কুক্ এ সম্পর্কে যাহা লিখিযাছেন তাহাব মর্মার্থ এই—"আমি সর্বদাই গুবু মহাবাজকে মা ব'লে সম্বোধন কবি। এটাই যেন আমাব প্রাণেব স্বাভাবিক ডাক। তাই এই 'মা' ব'লেই আমি তাঁকে সাধারণতঃ ডেকে থাকি। তিনি নিজে চিঠিপত্রে এই 'মা' স্বাক্ষরই আমার কাছে পাঠিযেছেন।"

একবাব একটি স্ত্রী-ভক্ত তাঁহাকে বলেন, "আচ্ছা মহাবাজ, আপনি যে এতো মেয়েদেব ভালবাসেন, লোকে কি বলবে?"

জগতেব সকল নাবীমূর্তিব মধ্যেই তিনি আবাধ্য জগদম্বাব প্রকাশ দেখিতে অভ্যস্ত, লৌকিক স্তব হইতে হঠাৎ এ বকম কথাটি শুনিযা তিনি চমকিযা উঠিলেন, কিন্তু তখনকাব মত তাঁহাকে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতেই দেখা গেল।

পবে ঐ ভক্ত মেযেটিব সহিত সাক্ষাৎ হওযামাত্র কহিলেন, "দ্যাখো গো, সেদিন মঠে গিয়েছিলুম, ঠাকুরঘবে ঠাকুবকে প্রণাম ক'রে বলছি—ঠাকুর, তবে কি মেয়েদের ভাল-বাসায়, মোহে, আমি বদ্ধ হলুম নাকি? পরে দেখি, ঠাকুর দেখা দিযে নিজেকে

দেখিয়ে বলচেন,—না, তুই আমাকেই ভালবাসিস। তখন আশ্বস্ত হলুম। দ্যাখো বাপু, ঠাকুর তো আমায় এ রকমই বললেন।"

শশিভূষণ রায় নামক এক ভক্ত সে-বার সারদানন্দজীর নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হন। দীক্ষা-মন্ত্রের শক্তির উপর তাঁহার তেমন আস্থা নাই এবং কিছুদিন পূর্বে গুরুর সম্বন্ধে একথা প্রকাশ করিতেও তাঁহার বাধে নাই। ধৈর্য ও করুণার প্রতিমূর্তি সারদানন্দ শিষ্যের এই প্রগল্‌ভতা অবলীলায় সেদিন মার্জনা করিয়া নেন। দীক্ষা গ্রহণের দিন কিন্তু রায় মহাশয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। গুরুমুখ হইতে মন্ত্রের ধ্বনি শোনামাত্র এক দিব্য অনুভূতিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, দেহের অভ্যন্তরে চলিতে লাগিল স্বয়ংক্রিয় মন্ত্রের জপমালা।

সারদানন্দজীর এক খামখেয়ালী ধরনের শিষ্য ছিল। সেদিন তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "ওরে তোর মা কেমন আছেন? তাঁর খবর বল্ তো।"

শিষ্য সংক্ষেপে উত্তর দিল, "ও কথা নিয়ে মাথা ঘামাইনে, ও সব অবিদ্যা।"

জগজ্জননীর অংশসম্ভূতা জননীকে অবিদ্যা বলা। ক্রুদ্ধ সারদানন্দ মুহূর্ত মধ্যে তাহার গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিয়া বসেন। ঘর হইতে তখনি তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া তবে তিনি স্থির হন।

শিষ্যটি বিভ্রান্তের মত সারাদিন শহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে থাকে। অনাহারে দেহ ক্লিষ্ট, পথশ্রান্ত পদদ্বয় আর চলিতে চাহিতেছে না। পাশেই এক-হোটেল। কাজকর্মের শেষে এখানকার পরিচারিকাটি ভাতের থালা নিয়া সবে-মাত্র বাহিরে যাইতেছে। এমন সময় আধপাগলা মলিন মুখ ছেলেটির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। আগাইয়া আসিয়া সস্নেহে কহিল, "কি বাবা, এত রাত্রে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কেন? মুখখানা তো শুকিয়ে উঠেছে। আহা, সারা দিন রাত্রে কিছু খাওয়া হয়নি বুঝি।"

পরিচারিকাটি তখনি তাহাকে নিজের থালার ভাত খাইতে দেয়। শুধু তাহাই নয়, ছেলেটি নিরাশ্রয়। রাত্রে কোথাও তাহার মাথা গুঁজিবার স্থান নাই জানিয়া নিজের ঘরটি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র সে রাত্রি যাপন করিল।

পরের দিন ভোরে এই শিষ্যটি নত মস্তকে সারদানন্দের কাছে গিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়াই তিনি সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "কিরে, কাল সারাদিন কোথায় ছিলি বলতো? কে খেতে দিলে? শোবার জায়গা আর আশ্রয়ই বা তোকে কে দিয়েছে?"

বলা বাহুল্য, সারদানন্দজীর দিব্য-দৃষ্টিতে শিষ্যের গত রাত্রির অভিজ্ঞতা ধরা না পড়িয়া পারে নাই।

শচীন শরৎ মহারাজের অন্যতম শিষ্য। তাহার স্ত্রী শতদলও তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইয়াছে। সে'বার শচীনের স্ত্রী গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত। অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটের দিকে চলিয়াছে, আর রোগিনী বার বার গুরুকে দেখিতে চাহিতেছে।' শচীনের কাতরোক্তিতে সারদানন্দ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মা সারদামণির নির্মাল্য হাতে নিয়া পীড়িতা শিষ্যকে তিনি সেদিন দেখিয়া আসিলেন।

এ প্রসঙ্গে মায়ের ভক্ত শ্রীমতী সরলা লিখিয়াছেন—

"পরদিন মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'দেখ, শতদল এবার ভাল হয়ে যাবে।'

"জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ক'রে বুঝলেন যে ভাল হবে যাবে?

"তিনি কহিলেন—আমি দেখলুম মা মহাভাবিত হয়ে শতদলের মাথাটা কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছেন ; সেই জন্যই বলছি যে, সে ভাল হবে, মা যখন কোলে নিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে।

"এ দিকে শতদলের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। শেষে ডাঃ নীলরতন সরকার জবাব দিয়া গেলেন। সেদিন মহারাজ ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া স্নানঘরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় শচীন আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মহারাজ, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল, এখন উপায় কি ?

"মহারাজ চিন্তিতভাবে কহিলেন, 'তাই তো, আমি যে দেখলুম মা কোলে নিয়ে বসে আছেন।'

"শচীন বলিল, 'মহারাজ, আপনাকে একবার যেতে হবে।'

"আমি আর গিয়ে কি করব বাপু, তুমি ঠাকুরের চরণামৃত নিয়ে যাও, আর শ্যামদাস কবিরাজ মশাইকে দেখাও।' এই বলিয়া মহারাজ স্নানাদি সারিয়া নিত্য যেমন জপধ্যানে বসেন তেমনই বসিলেন, বসিবার পূর্বে কহিলেন, আমি যতক্ষণ না উঠি ততক্ষণ কেউ যেন আমাকে ডাকিস্ নি।'

"কিছুক্ষণ পরেই খবর পাওয়া গেল, অবস্থা একটু ভালর দিকে। তিন চারি ঘণ্টা বাদে ধ্যান হইতে উঠিলে তাঁহাকে সেই খবর জানানো হইল। অল্পদিনের মধ্যে শতদল আরোগ্য লাভ করিল।

"মহারাজ কহিলেন, 'আমাদের এমন অবিশ্বাসী মন যে, আমি স্পষ্ট দেখলুম মা শতদলকে কোলে নিয়ে রয়েছেন, তবুও মনে হল—আমি কি ভুল দেখলুম ? শচীন যখন এসে কেঁদে পড়লো তখন মনে হল আমি ভুল দেখলুম কি ?"

একটি বালক ভক্ত স্বামী সারদানন্দের বড় স্নেহভাজন ছিল। বরানগর ঘাট হইতে স্টীমারে সে আসা-যাওয়া করিত। সেদিন বিদায় গ্রহণের সময় মমতাভরা কণ্ঠে মহারাজ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিয়া উঠিলেন, দুর্গা দুর্গা, সাবধানে যাস। সময় পেলেই আবার আসবি।"

বেশী রাত্রে প্রায়ই শেষ ফেরি স্টীমারে ছেলেটি ঘরে ফিরিয়া যায়। কিন্তু মহারাজ কোনো দিনই তো এমন ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন না। তরুণ ভক্ত সবিস্ময়ে বার বার ভাবিতে থাকে, মহারাজ আজ এমনটা করিলেন কেন ?

স্টীমার সবেমাত্র বরানগরের কুটিঘাটে আসিয়া ভিড়িতেছে। সম্মুখের ডেকে অজস্র লোকের ভিড়। ছেলেটি তাই পিছন দিক দিয়ে নামতে গেল। কিন্তু স্টীমারের পশ্চাদ্‌ভাগ তখনো জেটিতে লাগে নাই, রাত্রির অন্ধকারে সে ইহা দেখিতেও পায় নাই। পা বাড়ানো মাত্র স্টীমার ও জেটির ফাঁক স্থান দিয়া সে গঙ্গাগর্ভে পড়িতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে ঘটিল এক অলৌকিক কাণ্ড। কে যেন তাহাকে পিছন হইতে শূন্যে তুলিয়া জেটিতে নিক্ষেপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, জেটির খালাসীরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া নিতেছে। মুহূর্ত মধ্যে কি করিয়া যে এসব ঘটিয়া গেল ছেলেটি তাহা ভাবিবার অবকাশ পায় নাই। এ সময়ে বার বারই কিন্তু তাহার কানে বাজিতেছিল শরৎ মহারাজের বিদায় বাণী—দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না, মহারাজের এই কল্যাণমন্ত্রই সেদিন তাহার রক্ষাকবচরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শিষ্যেরা নিকটে বা দূরে যেখানেই থাক, তাহাদের ঐহিক ও আত্মিক কল্যাণের

দিকে সারদানন্দের দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ থাকিত। আপন প্রাণের স্পর্শ দিয়া তাহাদের তিনি সঞ্জীবিত রাখিতেন, আশিস্ ও আশ্বাসের মধ্য দিয়া উদ্দীপনা যোগাইতেন।

সাধন গ্রহণেচ্ছু ভক্তদের কাছে সারদানন্দকে প্রায়ই একটি মূল তত্ত্ব বলিতে শোনা যাইত—"জমি প্রস্তুত হলেই বীজ বপন করলে সুফল ফলে। এটা প্রকৃতির এক রহস্য যে, জমি প্রস্তুত হলেই বীজ আপনি এসে উপস্থিত হয়। অভাববোধ হলেই তার পূরণ হয়। মনে রেখো, প্রকৃত অভাববোধ হলেই বস্তু লাভের উপায় হয়—সাধু এবং শাস্ত্র একথাই জোর করে বলে। এ সত্য আমাদের নিজ জীবনে অ'প বিস্তর অনুভব করেছি।

ধীরে ধীরে স্বামী সারদানন্দ তাঁহার দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট কর্মযন্ত্র আজকাল সুসংগঠিত, প্রায় স্বয়ংক্রিয়। মহারাজ তাই এই সুযোগে হইয়া উঠিয়াছেন আরো অন্তর্মুখীন। জপধ্যানের মাত্রা আজকাল বাড়িয়া চলিয়াছে, আর আপন গভীরে দিনের পর দিন কেবলই তিনি ডুবিতেছেন। এক এক দিন দেখা যাইত, স্নানাহারের বেলা গড়াইয়া গিয়াছে, হস্তস্থিত জপের মালাটি নিশ্চল, দেহ স্থাণুবৎ—ঘরের মধ্যে এক দিব্য, প্রশান্ত গম্ভীর আবহাওয়া। সেবক ও ভক্তেরা তাঁহার এ সময়কার এ অবস্থা দেখিয়া বড় বিচলিত হইতেন। বিশেষ করিয়া বাত ও ডায়েবেটিস রোগের আক্রমণে বিশাল দেহটি ভগ্নপ্রায় হওয়ায় বেশী চিন্তার কারণ ঘটাইতেছিল।

এ সময়ে একদিন কথায় কথায় বলিলেন, "স্বামীজী যে কাজের ভার আমাকে দিয়েছিলেন, মনে করেছিলুম বছর পাঁচেক করবো। সেই কাজ তিনি ত্রিশ বছর ঘাড়ে ধরে করিয়ে নিলেন। এখন আমার কাজ শেষ হয়। ঠাকুর এক এক ক'রে আমার কাজ শেষ করিয়ে দিলেন।"

১৯২৬ সালের ১৮ই আগস্ট এই কর্মময় মহাজীবনের শেষ দিন। রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় গুরুভ্রাতাদের এবং অগণিত ভক্ত শিষ্য ও অনুরাগীদের শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া কর্মযোগী সারদানন্দ অমরলোকে প্রস্থান করিলেন।

স্বরূপ দামোদর

নীলাচলের মহাধামে প্রতিদিন চলিতেছে স্বগণসহ শ্রীচৈতন্যের নৃত্য কীর্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী। প্রভু প্রায়ই থাকেন ভাবোন্মত্ত, একেবারে আপনা-বিস্মৃত—এ অবস্থায় তাঁহাকে রক্ষা করার ভার গ্রহণ করেন ভক্ত সন্ন্যাসী স্বরূপ দামোদর। দিনে রাতে সর্বক্ষণে প্রভুকে তিনি আগলাইয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরে, রাজপথে, সাগরসৈকতে যেমন প্রভুকে করেন অনুসরণ তেমনি গম্ভীরাগৃহেও করেন তাঁহাকে সঙ্গদান। কখনো সখারূপে প্রভুকে রসাস্বাদন করান কখনো মাতার ন্যায় করেন তাঁহাকে লালন, কখনো বা কীর্তনে ও ভাবোন্মাদ অবস্থায় ভৃত্যরূপে থাকেন আগুলিয়া।

এই গুরু দায়িত্বের ভার বহন করিবার জন্য প্রভু তাঁহাকে আগে হইতেই প্রস্তুত করিয়া নিয়াছেন। তাই তো স্বরূপ দামোদর শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবান্ পুরুষ হইয়াও প্রভুর দীনাতিদীন সেবক, শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত হইয়াও কান্তা ভজন ও ব্রজরসের অদ্বিতীয় রসজ্ঞ ও মর্মবেত্তা।

শ্রীচৈতন্যের নীলাচল লীলার দুই শক্তিমান্ বাহুর কথা চৈতন্য ভাগবত উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের একজন ধ্যানপরায়ণ সন্ন্যাসী অপরজন সদা কীর্তনরত মহাবৈষ্ণব—

পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্তন।
ন্যাসিরূপে ন্যাসি দেহে বাহু দুইজন॥

কিন্তু ভক্ত কবি বৃন্দাবনদাসকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, সর্ব গুণের সর্ব কার্যের সমন্বয়ের বিচারে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসী পার্ষদদের মধ্যে স্বরূপ দামোদর অদ্বিতীয়—

ন্যাসি পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়
দামোদর স্বরূপে সমান কেহ নয়।

রাধাভাবে বিভাবিত প্রভুর প্রেমবিরহের লীলাস্বরূপ নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করেন। আর রসের পরিপুষ্টির নানা যোগান দেন। সঙ্গীতে তিনি গন্ধর্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি, আবার দুরবগাহ চৈতন্যহৃদয়ের প্রধান মর্মবেত্তা। শুধু তাঁহার মত সাধকের পক্ষেই বুঝি এই দুরূহ কর্ম উদ্‌যাপন করা সম্ভবপর। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের সঙ্গীতধারায় দিনের পর দিন তিনি প্রভুর বিরহতাপিত হৃদয়কে শীতল করেন, রসস্নিগ্ধ করিয়া তোলেন। শুধু প্রভুর চিত্তের উল্লাস ও রসবৈচিত্রী সম্পাদনই তাঁহার কাজ নয়। মহাভাবে উদ্দীপিত প্রভু বিরুদ্ধভাবের ও রসের বিকৃতি মোটেই সহ্য করিতে পারেন না, স্বরূপ এদিকে সর্বদা সজাগ থাকেন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

অনেকেই প্রভুকে স্বরচিত শ্লোক ও গীত শুনাইতে আসে, স্বরূপের নিকট প্রথমে তাহাদের পরীক্ষা দিতে হয় রাগানুগাভক্তির। কোনো রচনা ও সঙ্গীত স্বরূপের বিচারে ভক্তিসিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়া নির্ণীত হইলে প্রভু তাহা কিছুতেই শ্রবণ করেন না।

গৌড় হইতে বাঙালী বৈষ্ণবগণ প্রায়ই শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে আসেন। নৃত্যকীর্তন ও মাধুর্যরসের যে বন্যা প্রভু নিত্য বহাইতেছেন তাহাতে স্নান করিয়া এই ভক্তেরা ধন্য হন। প্রভুর দর্শন ও উপদেশামৃত গ্রহণের পর সবাই ভিড় করেন প্রেমসিদ্ধ সাধক স্বরূপ দামোদরের কাছে। সবাই জানেন, তিনি প্রভুর অদ্বিতীয় মর্মজ্ঞ। তাই প্রভুর লীলার মর্মব্যাখ্যা তাঁহার মুখে শুনিয়া হন কৃতকৃতার্থ।

নীলাচলে প্রভুর লীলা মাধুরীর রসস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এই রস পান করার জন্য সেবার একদল ভক্তসঙ্গে পরম বৈষ্ণব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বিদ্যানিধি স্বরূপ দামোদরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্বরূপের সঙ্গে থাকিয়া দারুব্রহ্ম তিনি দর্শন করেন, প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করেন প্রভুর আনন্দলীলা। আর অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয় প্রিয় সুহৃদ্ স্বরূপের সঙ্গে কৃষ্ণকথা ও আনন্দরঙ্গে।

একদিন বিদ্যানিধি লক্ষ্য করিলেন, জগন্নাথ মন্দিরের দেববিগ্রহের অঙ্গসজ্জায় মাড়যুক্ত নূতন কাপড় ব্যবহার করা হইতেছে। বিদ্যানিধি মহা নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, ভক্ত-প্রেমও তাঁহার অপরিমেয়। বস্তুত ভক্তিনিষ্ঠা এত বেশী যে পবিত্র সলিলে পাদস্পর্শ হওয়ার ভয়ে এই মহা বৈষ্ণব গঙ্গায় কখনো অবগাহন স্নান করেন না। কোনোক্রমে তাহা শিরে ঢালিয়াই চিরজীবন করিয়াছেন অপতিত স্নান। বিগ্রহের অঙ্গে মাড়যুক্ত অপবিত্র বসন দেখিয়া তাঁহার চিরাচরিত সংস্কারে আঘাত লাগিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া কহেন, "আচ্ছা দামোদর, তোমাদের নীলাচলে একি নিষ্ঠাহীন পূজার রীতি বলতো? ধৌত বসনের বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে মাড় কাপড়। এদেশে কি বেদ-বেদান্ত শ্রুতি-স্মৃতির প্রভাব কিছুই নেই?"

স্বরূপ দামোদরের আননে ফুটিয়া উঠে স্মিত হাস্য। উত্তর দেন "দ্যাখো, তোমার এই আন্তরিক নিয়মনিষ্ঠা এখানে চালাতে এসো না। নীলাচল হচ্ছে দারুব্রহ্মের লীলাস্থল। তাঁর নিজস্ব মহাধাম। এখানকার পূজা-উপচার রীতি-নীতি সবই ব্রহ্মবিগ্রহের নিজস্ব ধারা অনুসরণ করিয়া চলে। এখানকার সব বস্তুই যে শুদ্ধসত্ত্ব। শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে বসে তোমার ঐ আচার বিচারের ব্যাকরণ চালাতে যেও না।"

কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মনই বা এ কথায় এত সহজে টলিবে কেন? তাঁহার মনের খুঁতখুঁতি যায় না, ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতে থাকে।

সেইদিন নিশীথ রাত্রে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এক স্বপ্ন দেখেন এবং এই স্বপ্নের মধ্য দিয়া লাভ করেন এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

নিদ্রিত অবস্থায় তিনি দেখেন, স্বয়ং শ্রীক্ষেত্রপতি জগন্নাথ তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিতেছেন, "তুই আমার মহাধামের আচার বিচার কি বুঝিস? তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার কর্তৃত্বই বা তোকে কে দিয়েছে? এখানকার সব কিছুই যে স্বতন্ত্র তা তুই কি ক'রে বুঝবি? তোর স্পর্ধাই বা কেন?"

স্বপ্নে আবির্ভূত প্রভু শুধু ক্রুদ্ধ স্বরে গালাগালি করিয়াই নিরস্ত হন নাই। বিদ্যানিধিকে যথেচ্ছভাবে প্রহারও এ সময়ে করেন। বিদ্যানিধির সারা মুখমণ্ডল হয় ক্ষতবিক্ষত, তারপরই প্রভু অন্তর্হিত হইয়া যান।

পরের দিন স্বরূপ দামোদর বন্ধুর খোঁজখবর নিতে উপস্থিত হইলেন। যথেষ্ট বেলা হইয়াছে কিন্তু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই। শুনিয়া স্বরূপ বড় বিস্মিত হইলেন, এমনটি তো কখনো হয় না। শয্যা ত্যাগ করিয়া বিদ্যানিধি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে স্বরূপের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল।

উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "একি! তোমার মুখে এত প্রহারের দাগ কেন? চামড়া কেটে রক্ত ঝরছে, সারা মুখ উঠেছে ফুলে, ব্যাপার কি বলতো?"

বিদ্যানিধি গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা স্বরূপ দামোদরকে খুলিয়া বলিলেন। শ্রীজগন্নাথ

মহাজাগ্রত বিগ্রহ। স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার অঙ্গে এইসব শাসন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে স্বরূপকে কহিলেন, "ভাই, বলতো, কি ক'রে এই ক্ষত বিক্ষত মুখ দেখাবো? দিনের আলোয় রাস্তায় বা বেরোব কি ক'রে?"

কৌতুকী স্বরূপ দামোদর উত্তর দিলেন, "ভাই বিদ্যানিধি, রসিক শেখরের এই কৌতুকময় লাঞ্ছনা যে-সে ভক্তের ভাগ্যেই কি ঘটে? শ্রীভগবান্ যে তোমাকে পরমাত্মীয়-জ্ঞানেই এমন ক'রে শাসন ক'রে গেলেন। রসরাজ কৃপা ক'রেই তার দণ্ডচিহ্ন নিতান্ত স্থূলভাবে তোমার দেহে রেখে গিয়েছেন। তোমার এই লাঞ্ছনার গৌরবকে বিশ্বের সমস্ত বৈষ্ণবই যে ঈর্ষা করবে ভাই।"

পরমপ্রেমিক দুই মহাসাধকের কপোল নেত্রনীরে সেদিন প্লাবিত হইতে থাকে।

রঘুনাথ ছিলেন সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্ধন দাসের তনয়। চল্লিশ বৎসর বয়সে বিপুল বিষয়বৈভব এবং স্নেহশীল পরিবারের মায়া ত্যাগ করিয়া নীলাচলে তিনি চৈতন্য-চরণ আশ্রয় করিলেন। মুমুক্ষু রঘুনাথের জীবন-অঙ্কুরে সেদিন প্রভু দেখিলেন এক বিরাট্ বনস্পতির সম্ভাবনা। কিন্তু এই নূতন সাধকের প্রস্তুতির দায়িত্ব কাহার উপর অর্পণ করা যায়? লোকোত্তর দৃষ্টিবলে তিনি দেখিলেন রঘুনাথের সাধনসত্তায় যেমনি রহিয়াছে তীব্র বৈরাগ্য ও ত্যাগতিতিক্ষা তেমনি আছে কান্তা ভজনের পরম আকুতি। এই দুইটি বস্তুর সমাহার এবং পরিপক্কতার বীজ রহিয়াছে স্বরূপ দামোদরেরই সাধন জীবনে। রঘুনাথের দায়িত্বভার প্রভু তাই স্বরূপের হস্তেই ছাড়িয়া দিলেন।

উত্তরকালে বৃন্দাবনে গোস্বামীদের কাছে রঘুনাথ উপস্থিত হন। গম্ভীরালীলার পরম গুহ্য রসবার্তা নিয়া। জীবনের শেষ অঙ্কে প্রভু মহা ভাবময়ী শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত হইয়া থাকিতেন, নিজ দেহে ও সত্তায় মূর্ত করিয়া তুলিতেন মাধুর্য সাধনার পরমতত্ত্ব। এই তত্ত্বের আসল চাবিকাঠিটি ছিল স্বরূপের হস্তে। তাই তাঁহার আশ্রয় রঘুনাথের জীবনে আসিল এক দিব্য আশীর্বাদরূপে।

বলা বাহুল্য, এই আশ্রয় প্রভুরই পরিকল্পিত ও নির্দেশিত—

> এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
> পুত্র ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
> তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
> স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে॥
> এত বলি রঘুনাথের হস্ত ধরিল।
> স্বরূপের হস্তে তারে সমর্পণ কৈল॥

রঘুনাথ কিছুদিন যাবৎ নীলাচলে বাস করিতেছেন, প্রভু তাঁহাকে স্বরূপের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছেন। তবুও অন্তরে বার বার জাগে আকাঙ্ক্ষা প্রভু কি একবার নিজ মুখে কিছু তত্ত্ব উপদেশ তাঁকে দিবেন না? ধন্য হইবে না তাঁহার জীবন তাঁহার কৃপার অবদানে? ভাবিয়া চিন্তিয়া রঘুনাথ একদিন তাঁহার প্রাণের অভিলাষ নিবেদন করিলেন। প্রাণ ভোলানো হাসির দীপ্তি ছড়াইয়া প্রভু যাহা কহিলেন, তাহাতে রঘুনাথ বিস্মিত হইয়া গেলেন—

> হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
> তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥

সাধ্য সাধনতত্ত্ব শিক্ষ ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইহ তত জানে ॥

ভক্তের মান বাড়াইতে দক্ষ প্রভু স্বরূপ সম্বন্ধে একটু বেশী প্রশংসাই হয়তো সেদিন করিলেন, কিন্তু তাঁহার এই উক্তিটি যে স্বরূপের সাধনোৎকর্ষ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত আলোকপাত করে তাহাতে সন্দেহ কি? উত্তরকালে মহা বৈরাগ্যবান্ রঘুনাথ গোস্বামীর জীবনে প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ তাঁহার অন্তরঙ্গ সাধনের রসভৃঙ্গারখানি যেন উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আদিলীলার প্রামাণ্য কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চাতে। কিন্তু স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা হইতেই বৈষ্ণব সাধকগণ পাইয়াছেন প্রভুর পরিণত ও মাধুর্যরসান্বিত মহা জীবনের অপরূপ আলেখ্য।

দীর্ঘ একুশ বৎসরকাল নীলাচলের অন্তরঙ্গলীলার স্বরূপ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী ও পরিকর। তাই তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাদি যেমন ঐতিহাসিক এবং প্রামাণিক, তেমনই অন্তরঙ্গতা ও রসভাবের দিক দিয়া তাহা হইয়াছে মহিমময় ও রসোজ্জ্বল। রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীমুখ হইতে স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা শ্রবণ করিয়াই কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্য চরিতামৃতের নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই কড়চার প্রামাণ্য কোনো পুঁথি আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানত রঘুনাথ গোস্বামীর স্মৃতি-ধৃত কাহিনী ও তথ্যাদি হইতেই বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ এই কড়চার রসাস্বাদনে সক্ষম হন।

শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার বর্ণনা স্বরূপ দামোদর ও রঘুনাথের কড়চা এই দুইয়েতেই ছিল। এ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥
সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা কর্তা রহে দূর দেশে ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভাবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন ॥
স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তাঁর বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার।

গম্ভীরার গর্ভে শ্রীচৈতন্য দ্বাদশ বর্ষ বাস করেন আর এই সময়ে বিরহের অন্তর্লীলার মধ্য দিয়া নিঙড়াইয়া বাহির করিয়াছেন নিগূঢ়তম প্রেমরস। মহাভাবের পরাকাষ্ঠাকে এই মাটির পৃথিবীতে করিয়া তুলিয়াছেন প্রমূর্ত ও জীবন্ত। নিভৃতে নিশীথে রামানন্দ ও স্বরূপের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভু এই সুধারস পরিবেশন করিতেন। স্বরূপ তাঁহার কড়চার আর অমৃতময়ী কণ্ঠে এ রস ধারণ না করিলে গম্ভীরালীলার কাহিনী কে জানিতে পারিত? সহস্র সহস্র ভাবোদ্দীপক মহাজন পদাবলীর সৃষ্টিই বা উত্তরকালে কি করিয়া সম্ভব হইত?

গোদাবরী তীরে শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের প্রথম মিলনের কালে যে কথোপকথন হয়, শ্রীচৈতন্যের মধুর ভজনতত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে চিরচিহ্নিত হইয়া আছে। প্রভু এবং রামানন্দ এই দুইজনের মুখ হইতেই স্বরূপ দামোদর এ তত্ত্ব

শুনিয়া নিয়াছেন, লিখিয়া রাখিয়াছেন নিজের কড়চায়। তাঁহার ঐ কড়চাই হইয়া উঠে উত্তরকালে কবি কর্ণপুর ও কবিরাজ গোস্বামীর প্রধান উপজীব্য। কবিরাজ গোস্বামী নিজেই একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলনের লীলা করিল প্রচারে॥

স্বরূপ গোস্বামীর সাধনজীবনের পরিণতি দেখা যায় প্রভুর গম্ভীরালীলায়। গোপী ভজনের মহত্তম বিকাশ শ্রীচৈতন্য এই পর্যায়ে দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার বিরহবেদনা আর মিলনের রসাবেশে প্রভু তখন নিরন্তর ভাবিত—

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইয়া সীমা॥

এই অপূর্ব রসবৈচিত্র্যের নিরন্তর দর্শক ছিলেন স্বরূপ দামোদর আর রায় রামানন্দ। প্রতিদিন রামানন্দ যখন গভীর নিশীথে প্রভুকে শোয়াইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া যান, স্বরূপ দামোদর তখনও থাকেন প্রভুর পাশে, বিনিদ্র রজনী যাপন করেন তাঁহার মর্মবিদারী বিরহবিলাপ শ্রবণ করিয়া।

প্রভুর সহিত রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণে ক্ষণে মিলন বিরহের পালাও চলিয়াছে। বিরহের দহনে রসের গাঢ়তা বাড়িতেছে। প্রভুও চকিত হরিণীর মতো এক একবার চঞ্চল-হইয়া উঠিতেছেন। রোদনের বন্যায় গম্ভীরার মৃত্তিকা ভাসাইতেছেন আর ক্ষণে ক্ষণে ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন—

কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ,
কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ।

এই বিরহবিধুর ও উদ্বেল হিয়াতরঙ্গের পরিমাপ করিতেছেন দামোদর। সময়োপযোগী রসের ভিয়ান চড়াইতেছেন বার বার, আর গম্ভীরাগর্ভে মহাভাবের রসধারা হইতেছে উৎসারিত। দেখা যাইতেছে—প্রভুর উত্তাল প্রেমরস সাধনের শ্রেষ্ঠ পরিপোষক হইতেছেন স্বরূপ, শ্রেষ্ঠ ভোক্তাও তিনিই। তাই ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস গাহিয়া গিয়াছেন—

দামোদর স্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদর স্বরূপ সে তাহার উপমা॥

সত্যই তো, স্বরূপ দামোদরের মতো শুদ্ধসত্ত্ব অথচ মহাপ্রেমিক পার্ষদ প্রভুর আর কই? প্রভুর নিজের শ্রীমুখের বচন অনুসারে—

দামোদর স্বরূপ ইহ শুদ্ধ ব্রজবাসী
ঐশ্বর্য্য না জানে রহে শুদ্ধপ্রেমে ভাসি।
দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্তিমান
যার সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুরসজ্ঞান॥

তাই তো দিবারাত্র স্বরূপ দামোদর প্রভুর প্রিয়তম সঙ্গী, সেবক ও মহাভাব-লীলার শ্রেষ্ঠ পরিকর। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাতেও দেখি—

অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
বিহরেন দামোদর স্বরূপের সঙ্গে॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোন ক্ষণে॥

সমস্ত দিবস ও রাত্রি ব্যাপিয়া রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভুর দিব্যোন্মাদ ও মহাভাবের লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করেন আর করেন তাঁহার পরিপোষকতা।

রামানন্দ রাধাকৃষ্ণ রসলীলার শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেন—আর স্বরূপ দামোদর প্রভুর দিব্যভাবের উপযোগী সঙ্গীতে আখর দেন। স্বরূপ সঙ্গীতে গান্ধর্বের মত পারদর্শী আর শাস্ত্রজ্ঞানে যেন বৃহস্পতি। কিন্তু সমস্ত কিছু গুণ ছাপাইয়া উঠে তাঁহার মরমী রসজ্ঞতা ব্রজলীলার ব্যাখ্যান ও রসমন্থনের অপূর্ব শক্তি। এই শক্তি দিয়াই তিনি মহাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যকে ধারণ করিয়া রাখেন—

পূর্বে যৈছে রাধার সঙ্গে ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ॥

সদা ভাবচঞ্চল প্রভুর দেহ-মন প্রাণের দায়িত্ব স্বরূপ দামোদরের উপর। সর্বতোভাবে প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ হইয়াই তিনি তাঁহার পাশে দণ্ডায়মান। প্রভুর রসময় মহাজীবনের যেমন তিনি নিত্যসঙ্গী, তাঁহার জৈবজীবনের মলিন ও সুখসুবিধার উপর তীক্ষ্ণ নজরও রাখিতে হয় তাঁহাকেই। প্রভুর পরম ভক্ত ও ভৃত্য গোবিন্দের সহায়তায় স্বরূপ সদা করেন তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ।

কৃচ্ছ্র, তিতিক্ষা ও অর্ধাসনে একসময়ে প্রভুর শরীর বড়ো শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। শয্যার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আজকাল আর তিনি গ্রহণ করিতে রাজী নন, কলার খোলের সূক্ষ্ম শরলা বিছাইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যান। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ব্যথা লাগিতেছে। দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় সবাই তাই ম্রিয়মাণ। ইতিমধ্যে প্রভুর উগ্রভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত এক নূতন শয্যা প্রস্তুত করাইলেন প্রভুর জন্য। গেরুয়া বস্ত্রে আবৃত শিমুল তুলায় তৈরি এক নরম তোশক আনয়ন করা হইল প্রভুর কক্ষে।

প্রভু তো ইহা দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ। দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সন্ন্যাসী মানুষ। কোথায় আমি ভূমিতে শয়ন করবো, না তোমরা আমায় বিষয়ভোগ করাতে চাও।"

সবাই ভয়ে চুপ করিয়া আছে। এমন সময়ে স্বরূপ মধ্যে পড়িয়া এক কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা করিলেন। কদলীর শুষ্কপত্র জড়ো করিয়া প্রভুর গেরুয়ারঞ্জিত বহির্বাসে তাহা পুরিলেন। বহু অনুনয় বিনয় করিয়া এ ব্যবস্থাটি প্রভুকে দিয়া মঞ্জুর করানো গেল। অতঃপর অন্তত এই আরামটুকু প্রভুকে দিতে পারিয়া স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন।

কৃষ্ণবিরহ ও মহাভাবের উদয় হইলেই প্রভুকে নিয়া যত বিপদ ঘটে। রামানন্দ ও স্বরূপের গলা ধরিয়া তিনি সখেদে বিলাপ করিতে থাকেন, আর সারারাত্রি প্রহরের পর প্রহর তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণলীলার বর্ণনা ও নামকীর্তনের মধ্য দিয়া সান্ত্বনা দিতে হয়।

একদিন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত প্রভুর প্রেমবিহ্বলতা ও উন্মাদনার পালা চলিয়াছে। এক সময়ে কিছুটা শান্ত হইলে তাহাকে ভিতর প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইয়া রামরায় নিজ আবাসে চলিয়া গেলেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ শয়ন করিয়া রহিলেন বহির্দ্বারে।

এদিকে গৃহমধ্যে অর্গলবদ্ধ প্রভু অবিরত কৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়া চলিয়াছেন। রাত্রি আরও গভীর হইলে দেখা গেল আর তাঁহার কোনো সাড়া নেই। ব্যাপার কি? সন্দেহাকুল স্বরূপ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ঢুকিয়া দেখেন—পর পর তিনটি দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। অথচ মহাপ্রভু তাহার মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন কোথায়?

প্রভুর সন্ধানের জন্য তখনই মহা হৈচৈ পড়িয়া যায়। অবশেষে খুঁজিতে খুঁজিতে

স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ দেখেন, জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরদিকে তিনি পড়িয়া আছেন, কিন্তু এ কি অদ্ভুত দৃশ্য। প্রেমোন্মত্ত প্রভুর দেহখানি পাঁচ ছয় হাত দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। এক একটি হস্তপদের দৈর্ঘ্যই প্রায় তিন হাত। নাসিকার শ্বাস বহিতেছে না। মুখে নির্গত হইতেছে লালা ফেনা। ভাবোন্মত্ত প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ যেমনই দুঃখে ম্রিয়মাণ তেমনই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রয়োজন বুঝিয়া প্রভুর মর্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদর সবাইকে নিয়া কৃষ্ণকীর্তন আরম্ভ করিলেন, তাঁহার কর্ণে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন নামসুধা। বহুক্ষণ পরে প্রভু নেত্র উন্মীলন করেন এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক আকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করিতে থাকেন।

স্বরূপ গোস্বামীর কীর্তনে প্রভুর মহাভাবের উদয় হইত আর তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ভক্তদের মধ্যে সৃষ্টি করিত ভাবরসের অপূর্ব তরঙ্গ। আবার তাঁহারই লীলাকীর্তনে প্রভু স্বাভাবিক অবস্থার ফিরিয়া আসিতেন, ব্যাকুল ভক্তজন দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইত।

ইহার পর নীলাচলে মহাপ্রভুর জীবনলীলা আগাইয়া চলে শেষ পর্যায়ের দিকে। অদ্বৈত গৌড় হইতে এক রহস্যময় তরজা শ্রীচৈতন্যকে প্রেরণ করেন আর তাহার পর হইতেই প্রভুর প্রেম-উত্তালতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

তরজার অর্থ শ্রীচৈতন্য কাহাকেও না বলিলেও তাঁহার অন্তরঙ্গতম ভক্ত স্বরূপ দামোদরের বুঝিতে দেরি হইল না। আপন অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তিনি দেখিলেন, প্রভু তাঁহার লীলাময় জীবনে এবার ছেদ টানিয়া দিতেছেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, স্বরূপ দামোদর ইহার পর বিমনা হইয়া গেলেন। প্রভুর লীলা সংবরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পার্ষদ স্বরূপ দামোদরের ঘটিল অন্তর্ধান।

যামুনাচার্য

দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদ। দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যরাজের সভায় এ সময়ে আচার্য বিদ্বজ্জন-কোলাহলের প্রবল প্রতাপ। রাজা এই পণ্ডিত শিরোমণিকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন, মান্য করেন গুরুর মতো। দেশের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌দের প্রায়ই আহ্বান করিয়া আনা হয়, রাজসভায় আচার্য কোলাহলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তাঁহাদের তর্কদ্বন্দ্ব। এইসব তর্কসভার পরিচালনায় পাণ্ড্যরাজের উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি নাই। রাজ্যের জ্ঞানীগুণীরা সেখানে আমন্ত্রিত হইয়া আসেন, আর তাঁহাদের সমক্ষে, তুমুল উত্তেজনার মধ্যে তর্কশূরেরা একে অন্যকে আক্রমণ করিতে থাকেন।

প্রতি ক্ষেত্রেই জয়ী হইতে দেখা যায় শক্তিমান্ ক্ষুরধারবুদ্ধি আচার্য কোলাহলকেই। সভার শেষে রাজা পরম সমাদরে তাঁহার সভা-পণ্ডিতের গলায় অর্পণ করেন পুষ্পমাল্য, রাজকোষ হইতে দান করেন প্রচুর অর্থ। শুধু তাহাই নয়, রাজার বিধান অনুসারে তর্কে পরাজিত পণ্ডিতেরা পরিণত হন আচার্য কোলাহলের সামন্ত পণ্ডিত রূপে এবং এই পণ্ডিত সম্রাট্‌কে প্রতি বৎসর তাঁহারা প্রেরণ করেন সম্মান-দক্ষিণা।

সেদিন নিজের ভবনে বসিয়া আচার্য কোলাহল, তাঁহার হিসাবের খাতাটি দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বড় গম্ভীর হইয়া পড়েন, তখনি ভারপ্রাপ্ত শিষ্য বন্‌জিকে সেখানে ডাকাইয়া আনেন।

রুষ্টস্বরে আচার্য বলেন, "বন্‌জি, তুমি যে এতটা অকর্মণ্য তা আমার জানা ছিল না। আজ তিন বৎসর যাবৎ পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য আমার বাৎসরিক সামন্ত-কর দেয় নি, তা তুমি জানো ?"

হিসাবের খাতাটির দিকে একবার তাকাইয়া শিষ্য বন্‌জি নিরুপায়ভাবে তখন মাথা চুলকাইতেছেন। আচার্য এবার ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠেন, "শোন, কালই তুমি ভাষ্যাচার্যের গৃহে যাও। বকেয়া পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নিয়ে এসো। নতুবা আমার এখানে তোমার স্থান নেই।"

"আজ্ঞে, কয়েক বৎসর ক্ষেতে শস্য হয় নি বলে ভাষ্যাচার্য আপনার পাওনা টাকা বাকী ফেলেছেন। বার বার তাগাদা দিয়েছি আমি কিন্তু, কোনো ফল হয় নি।"

"একটা ফল অবশ্যই হয়েছে। দেখে এসো গিয়ে, ঐ তল্লাটের লোকেরা ইতিমধ্যেই বলাবলি শুরু ক'রে দিয়েছে, 'ভাষ্যাচার্য আর আজকাল সামন্ত-কর দিচ্ছেন না, হয়তো রাজপণ্ডিত দিগ্‌বিজয়ী কোলাহলের বশ্যতা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন।' আর তারা এটা বলতে পারছে, বন্‌জি. তোমারই মূর্খামির জন্যে।"

পরের দিনই গুরুর প্রতিনিধি হিসাবে বন্‌জি ভাষ্যাচার্যের চতুষ্পাঠীতে গিয়া উপস্থিত। আচার্য গ্রামান্তরে এক শিষ্যের বাড়িতে গিয়াছেন, কাল ফিরিবেন। প্রবীণ পড়ুয়ারা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। চতুষ্পাঠীতে আচার্যের আসনের কাছে বসিয়া শাস্ত্র পাঠে রত শুধু দ্বাদশ বৎসরের পড়ুয়া বালক, যামুন।

বন্‌জি ঘরে ঢুকিয়াই রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করে, "ওরে ছোক্‌রা, তোদের আচার্য কোথায় পালিয়েছেন, বল্‌তো।"

"কে আপনি ? এত বাজে বকছেন কেন ? আচার্য পালাতে যাবেন কেন ? কার ভয়ে ?" ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর দেয় যামুন।

"আমি পণ্ডিত বন্‌জি, রাজপণ্ডিত বিদ্বজ্জন-কোলাহলের শিষ্য। তোর গুরুর সামন্ত-কর তিন বৎসরের বাকী পড়েছে, তিনি তা খেয়ে বসে আছেন। জানিস তো, এ টাকা আদায় না দিলে রাজার আদেশে তোদের চতুষ্পাঠী উঠে যাবে।"

ক্রোধে উত্তেজনায় বালক পড়ুয়া যামুনের শরীর তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দৃঢ়স্বরে সে উত্তর দেয়, "দ্যাখো বন্‌জি, আমার বুঝতে বাকী নেই, তোমার আচার্য দিগ্‌-বিজয়ী পণ্ডিত হতে পারেন, বিদ্বজ্জন-কোলাহল উপাধি তাঁর থাকতে পারে, বিদ্যা বস্তুটি তাঁর ভেতরে আদৌ নেই। আর তাঁর ছাত্র তুমি যে একটি গণ্ডমূর্খ, তা তোমার বচন ও বাচনভঙ্গীতেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

"এতবড় স্পর্ধা তোর, ছোকরা। সামনে দাঁড়িয়ে যা-তা বলে যাচ্ছিস। আচার্য কোলাহল যে কে, কি তাঁর প্রতাপ, তা তুই জানিসনে। জানে তোর গুরু। যাক্‌, এই আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি, এ চতুষ্পাঠী আমি মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বো।"

"তা তোমার যা সাধ্য তা করতে পারো। কিন্তু এটা জেনে রেখো, তোমার গুরু যে বিদ্যাহীন, আমার একথাটি পরম সত্য।"

"তার মানে ?" মারমুখী হয়ে রুখে দাঁড়ায় বন্‌জি।

"বিদ্যা অখণ্ড বোধ এনে দেয়, সমদর্শিতা দেয়, বিনয় দেয়। সর্বভূতকে বেঁধে নেয় স্নেহ প্রেমের ডোরে। সে বিদ্যা তোমার আচার্যের নেই। আরো শুনে নাও মূর্খ! বিদ্‌ হচ্ছে আত্মজ্ঞানের আলো, ঐশ্বরীয় আলো, এ আলো যিনি পেয়েছেন তিনিই হচ্ছেন বিদ্বান্‌। তোমার আচার্য দুর্ভাগা, কূট তার্কিকতার ভাগাড়ে পড়ে তাই কেবলই খাবি খাচ্ছেন।"

বন্‌জি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়, চতুষ্পাঠী হইতে বাহির হইয়া আসে। চীৎকার করিয়া গালমন্দ করিতে থাকে জঘন্য ভাষায়।

বালক পড়ুয়া যামুন এবার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়, দৃঢ় সংযত কণ্ঠে বলিয়া ওঠে, "শোন বন্‌জি। তোমার গুরুর এই অন্ধ অহমিকা এবং ঔদ্ধত্য আমি ভেঙে দেবো, সংকল্প করেছি। প্রতিপক্ষ হিসাবে আমি তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করছি। রাজসভায় এই তর্ক অনুষ্ঠিত হবে একথাটি তাঁকে এবং পাণ্ড্যরাজকে তুমি জানিয়ে দেবে।"

বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয় বন্‌জির। এ বালক কি পাগল ? বারো বৎসরের একটা নবীন পড়ুয়া, অর্বাচীন ছোকরা, তর্কবিচারে আহ্বান করছে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ-পণ্ডিতকে ? তবে কি বন্‌জি এতক্ষণ একটা পাগলের সঙ্গে ঝগড়া ও চেঁচামেচি করিতেছে ?

সংযত ও প্রশান্ত কণ্ঠে বালক যামুন আবার জানায়, "বন্‌জি, আমার কথাকে বালকের কথা বলে উড়িয়ে দিয়ো না যেন। আচার্য নাথমুনি আমার পিতামহ, আর ঈশ্বরমুনি আমার পিতা। আমাদের বংশের ওপর প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের কৃপা ও বর রয়েছে। আরো শুনে রাখো, বন্‌জি, আমার গুরুর কৃপায় বহুতর শাস্ত্র আমি ইতিমধ্যে আয়ত্ত করেছি। আচার্য কোলাহলকে তর্কে আহ্বান করার শক্তি আমি ধারণ করি। শাস্ত্রতত্ত্ব বা কূটপ্রশ্ন যে কোনো দিক দিয়ে আমি তাঁকে ধরাশায়ী করতে পারবো, এ বিশ্বাসও আমার আছে।"

পণ্ডিত বন্‌জি রাগে গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে তখন স্থান ত্যাগ করে, ত্বরায় উপনীত

হয রাজধানীতে। সবাসরি রাজসভায গিযা নিবেদন করে ভাষ্যাচার্যেব ছাত্রেব সব কথা।

সকল কিছু শোনাব পব আচার্য কোলাহল ক্রোধে ফাটিযা পডেন, এ ঔদ্ধত্যের সমুচিত দণ্ড দিবাব জন্য বাজাকে বলিতে থাকেন। সভাসদেরাও বালকের ধৃষ্টতায কম বিস্মিত হন নাই।

পাণ্ড্যবাজ গম্ভীব স্ববে বলেন, "আমাব মনে হয, শুধু একটি বালক পড়ুযার কথা নিযে এত উত্তেজিত হযে ওঠা আমাদেব পক্ষে ঠিক নয। চতুষ্পাঠীব যিনি পবিচালক সেই ভাষ্যাচার্যেব কাছে আমি দূত পাঠাচ্ছি। সে জেনে আসুক, ভাষ্যাচার্য নিজে এ-বিষয়ে কি বলতে চান। হয তিনি তাঁব ছাত্রেব হযে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নযতো পবিষ্কাব ক'বে জানিযে দিন তর্কবিচার সম্পর্কে তাঁব মতামত।" বিশেষ পত্রী দিয়া তখনি এক দূতকে প্রেবণ কবা হইল।

এদিকে শিষ্যালয হইতে ফিবিযা আসাব পর ভাষ্যাচার্য যামুনেব মুখ হইতে সকল কথা শুনিলেন। ভযে তাঁহাব মুখ শুকাইযা গেল। কহিলেন, "বৎস যামুন, এ তুমি অত্যন্ত অসমীচীন কাজ কবেছো। আচার্য কোলাহল দিগ্‌বিজযী পণ্ডিত, তাছাড়া অত্যন্ত আত্মম্ভবীও বটে। অচিবে সে প্রতিহিংসা গ্রহণ করবে। এবার আমার এবং আমাব এ চতুষ্পাঠীব দুর্দশাব সীমা থাকবে না।"

প্রবীণ ও নবীন ছাত্রেবা একে একে সেখানে আসিযা জড়ো হইযাছে। সবাবই চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া, চতুষ্পাঠীর উপরে রাজরোষ ঘনাইযা আসিতেছে, এবার আর কাহারো নিস্তাব নাই।

যুক্তকবে নিবেদন কবে যামুন, "প্রভু, আমায আপনি ক্ষমা করুন। যে সব কথা আমি বন্দিকে বলেছি, তা বলেছি তার ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেবার জন্যে, আর আপনাব সম্মান রক্ষাব জন্যে।"

যামুন, তুমি সংসার বিষযে অনভিজ্ঞ। আচার্য কোলাহলকে রাজা শ্রদ্ধা কবেন গুরুব মতো, বাজসভায তাঁব বিপুল প্রতিপত্তি, তাঁর শিষ্যকে কঠোবভাবে বলা ও চটিযে দেওযা তোমাব উচিত হয নি। অনেক জটিলতা ও বিপদেব সৃষ্টি কবলে তুমি।"

"প্রভু, আপনার মান সম্ভ্রমেব মুখ চেযেই তো আমি এ বিপদের ঝুঁকি নিযেছি। তাছাড়া, আমাব অন্তবাত্মা থেকে কে যেন বাব বাবই বলছে, 'কোনো ভয় নেই। তোমার মেধা ও প্রতিভা দিযে গুরুব সম্মান রক্ষা কবো, আত্মম্ভবী আচার্য কোলাহলেব সম্মুখীন হও। জয তোমাব সুনিশ্চিত।"

আচার্য কিছুকাল চুপ কবিযা বহিলেন, কহিলেন, "বৎস প্রভু শ্রীবঙ্গনাথের প্রিয ভক্ত, সিদ্ধ মহাত্মা, নাথমুনিব পৌত্র তুমি। তাছাড়া, আমি তো জানি, ঈশ্বরপ্রদত্ত কি অমানুষী প্রতিভা, নিযে তুমি জন্মেছো, মাত্র বাবো বৎসব বযসে কি বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান তুমি আযত্ত কবেছো। হযতো ঈশ্ববের কোনো অভিপ্রায বযেছে এই ব্যাপাবে। তোমাব মাধ্যমেই হযতো আচার্য কোলাহলেব দম্ভ চূর্ণ হবে, অত্যাচার দূব হবে, এদেশের সারস্বত জীবন হযে উঠবে শুদ্ধতর, পবিত্রতর।"

"আমায আশীর্বাদ করুন, প্রভু। আপনার প্রসাদে যেন জয়যুক্ত হই আমি"—গুরুর চরণ বন্দনা কবিযা প্রার্থনা জানায় যামুন।

গুরু আশীর্বাদ করিলেন বটে, কিন্তু মন হইতে আতঙ্ক দূর হইল না। দৈবী কৃপা ছাড়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার আর কোনো উপায় নাই।

পরের দিন ভোর হইতে না হইতেই পাণ্ড্যরাজের দূত আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য পত্নীর উত্তরে পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিলেন,—তাঁহার ছাত্র বালক হইলেও অমানুষী প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার অধিকারী। যথাসময়ে প্রস্তাবিত তর্ক-বিচারের সভায় সে উপস্থিত থাকিবে।

সারা পাণ্ড্যরাজ্যে এ সংবাদ দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িল। আচার্য কোলাহল বহুলশ্রুত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত, সেই মহারথীকে বিচারদ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছে এক বারো বৎসরের বালক। এর চাইতে আশ্চর্যকর কথা আর কি হইতে পারে।

আচার্য কোলাহল ছিলেন অতিমাত্রায় বিদ্যাদর্পী, ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করিতেন। কাজেই পাণ্ড্য রাজসভায় এবং রাজধানীর বুধসমাজে তাঁহার শত্রুর অভাব নাই। অনেকে ভাবেন, দৈবের বিধানে যদি কোলাহলের পতন ঘটে, তবে কি চমৎকার না হয়।

সর্বত্র জটলা শুরু হইয়া যায়, কে জানে এই বালক প্রতিদ্বন্দ্বী ঐশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিমান্ কিনা। নতুবা এত স্পর্ধা তার। সারা দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে পরাজিত করার সাহস তাহার কি করিয়া হইল?

বালক তর্কযোদ্ধা যামুন যে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী, রাজা ইতিমধ্যে একথা জানিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া সে দুর্ধর্ষ তর্কশূর কোলাহলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবে, সে কথাটিই তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না।

রাজা ও রানী সেদিন বাগানে বেড়াইতেছেন, উভয়ের মধ্যে বিতর্ক উঠিল, তর্কসভায় কে হইবে জয়ী?

রাজার ধারণা রাজসভায় দিগ্‌বিজয়ীর সম্মুখে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বালক ভয়ে মূর্ছা যাইবে। রানী কিন্তু ভাবেন ভিন্নরূপ। বলেন, "মহারাজ, আমার কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে, এ বালক ঐশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিমান্। যে ভাবে সাহস ক'রে সে তর্কযুদ্ধে নামতে আসছে তাতে আমার মনে হয়, প্রতিপক্ষকে অবশ্য সে হারিয়ে দেবে, মহারাজ।"

"এটা তার সাহস, না দুঃসাহস, না হাস্যকর প্রয়াস, তা কে বলবে?" সহাস্যে মন্তব্য করেন রাজা।

"মহারাজ, দুদিন থেকে বার বারই আমার মনে চিন্তার ঝলক খেলে যাচ্ছে। বারো বৎসর বয়সেই তো বালক অষ্টাবক্র রাজা জনকের সভাপণ্ডিত আচার্য বন্দীকে হারিয়েছিলেন শাস্ত্রীয় তর্কে। আর আচার্য শঙ্কর? ষোল বৎসর বয়সেই হলেন তিনি ভারতজয়ী পণ্ডিত। আমার দৃঢ় ধারণা, মহারাজ এ বালক ঐ ধরনের ঐশ্বরীয় শক্তির অধিকারী। সে জিতবেই জিতবে।"

"যদি সে না জেতে, তবে?"

"তবে আমি আপনার দাসীদের দাসী হয়ে থাকবো মহারাজ,"—বাজী ধরে বসেন রানী।

কথায় কথায় পাণ্ড্যরাজেরও জেদ চড়িয়া যায়। উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, "তা হলে রানী, তুমিও শুনে নাও আমার শপথ। যদি বালক যামুন জয়ী হয়, আমি তৎক্ষণাৎ দান করবো তাকে আমার রাজ্যের অর্ধেক অংশ। দেখা যাক, কে জয়ী হয় এই বিচারে।"

রাজা ও রানীর এই বাজী ধরার কথা অচিরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, জনসাধারণের কৌতূহলের সীমা থাকে না।

রাজার প্রেরিত স্বর্ণখচিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া যামুন রাজধানী মাদুরায় উপনীত হইলেন। শুধু রাজধানীই নয়, রাজ্যের দূর দূরান্তের কৌতূহলী মানুষেরাও ভিড় করিয়াছে রাজসভায়। শাস্ত্রবিদ্ আচার্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বহু নাগরিকই সেদিন সভায় মিলিত হইয়াছে সেদিনকার অসম ও অদ্ভুত তর্কযুদ্ধ দেখার জন্য। উত্তেজনা ও উন্মাদনার অবধি নাই।

বালক যামুন ধীর গম্ভীরভাবে সভাকক্ষে উপস্থিত হয়, নতশিরে রাজা ও রানীকে জ্ঞাপন করে তাহার শ্রদ্ধা। এই ক্ষুদ্র বালকের দিকে এতক্ষণ কৌতূহল ভরে তাকাইয়া ছিলেন আচার্য কোলাহল। এবার রানীর দিকে মুখ ফিরাইয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করেন, "আলওয়ান্দারা ?" অর্থাৎ, এই বালকই কি করবে আমায় পরাজিত ?

বালক পণ্ডিতের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া রানী দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠেন, "আলওয়ান্দার," অর্থাৎ, হাঁ, এই বালকই তো করবে পরাজিত।[১]

রাজসভায় তিল ধারণের স্থান নাই, উৎসাহ উদ্দীপনায় সবাই চঞ্চল, প্রতীক্ষায় রহিয়াছে তর্কযুদ্ধের।

পাণ্ড্যরাজ নির্দেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য কোলাহল শুরু করেন তাঁহার প্রশ্ন। পাণিনি ও অমরকোষ হইতে কয়েকটি প্রশ্ন প্রথমে তিনি উত্থাপন করেন। ঋজু, দীপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অবলীলায় যামুন তাহার উত্তর দেন। মীমাংসার দক্ষতায় এবং বাচন-ভঙ্গীর চমৎকারিত্বে দর্শকেরা প্রীত হইয়া উঠেন। ঘন ঘন করতালিতে সভাগৃহ মুখর হইয়া উঠে।

এবার যামুনের প্রশ্ন করার পালা। যামুন কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, দিগ্-বিজয়ী আচার্য কোলাহল তাঁহাকে আদৌ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের সম্মান দেন নাই। গণ্য করিয়াছেন এক নগণ্য বালক পড়ুয়ারূপে, তাই এবার নিজের প্রশ্নবাণ নিক্ষেপের আগে কোলাহলকে তিনি চটাইয়া দিলেন। কহিলেন, "আচার্য, আপনার প্রশ্নগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। আপনি বোধহয় আমাকে ক্ষুদ্রাকায় বালক ভেবে অবজ্ঞা করেছেন। আরো ভেবেছেন, আপনার মতো বিরাটকায় হলে এবং বিরাট উদর থাকলেই পাণ্ডিত্য হয় অগাধ। তবে কি আমরা ধরে নেবো, একটা বিশালকায় হাতি আপনার চাইতে বড় পণ্ডিত ?"

সভায় হাসির হররা বহিয়া যায়, আর সেই সঙ্গে গণ্ডগোলও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যামুন আবার কহিলেন, "আচার্যবর, আপনার বোধহয় জানা আছে, অষ্টাবক্র মুনি যখন জনকের সভাপণ্ডিত বন্দীকে পরাভূত করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল বারো বৎসর। কাজেই বয়সের কথা ভেবে আমার সঙ্গে যেন প্রশ্নোত্তর করবেন না।"

পাণ্ড্যরাজ হাসিয়া কহিলেন, "ও সব কথা থাক। এবার রাজপণ্ডিতকে প্রশ্ন করা হোক। সত্যকার তর্কবিচার চলুক।"

রাজার নির্দেশ মানিয়া নিয়া যামুন এবার উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন, "আচার্য কোলাহল, আপনাকে আমি তিনটি অতি সাধারণ প্রশ্ন করবো। আপনি সাধ্যমতো উত্তর দিন

---

১ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস (১ম ভাগ) প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী শঙ্করমঠ, বরিশাল।

সভার সমক্ষে। আমার প্রথম বক্তব্য : আপনার মাতা বন্ধ্যা নন। এ-বাক্যটি আপনি খণ্ডন করুন।"

আচার্য কোলাহল তো হতবাক্। একি অদ্ভুত হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য। নিজের মাতার পুত্ররূপে জলজ্যান্ত তিনি রাজসভায় বসিয়া আছেন কি করিবা তিনি বলিবেন যে তাঁহার মাতা বন্ধ্যা? নাঃ, এ কোনো প্রশ্নই নয়? উত্তর ইহার কিছু দেওয়া যায় না।

শ্লেষাত্মক হাসি হাসিয়া যামুন বলেন, "এবার আমার আর দুটি বাক্য শুনুন আচার্যবর। আমি বলছি, পাণ্ড্যরাজ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ। আপনি এটি খণ্ডন করুন। আমার শেষ বাক্য—আমাদের রানীমাতা, যিনি এখানে সিংহাসনে উপবিষ্টা রয়েছেন তিনি সাবিত্রীর মতো সাধ্বী। আপনি আমার এ বাক্যটিও খণ্ডন করুন।"

আচার্য কোলাহল বিভ্রান্ত ও বিব্রত হইয়া পড়েন। অভিযোগের সুরে রাজাকে বলিয়া উঠেন, "মহারাজ, এ দুটি বাক্য খণ্ডন করতে হলে আমায় প্রমাণ করতে হবে, আপনি পাপী এবং আমাদের রানীমা সতী সাধ্বী নন। না—না, এ বড় ধূর্ত প্রশ্ন, বড় কূট এবং হেঁয়ালিপূর্ণ প্রশ্ন। আমি এর উত্তর দেব না।"

পণ্ডিত কোলাহলের পক্ষীয় পণ্ডিত এবং ছাত্রেরা সভামধ্যে চেঁচামেচি শুরু করিয়া দেয়, —এ সব প্রশ্ন অশালীন, অসমীচীন। কোলাহলের বিরোধীরাও মহাউত্তেজিত। তাহারা বার বার জেদ করিতে থাকে, প্রশ্ন যখন করা হইয়াছে—তাহার খণ্ডন অবশ্যই করিতে হইবে। দুই পক্ষের এই বাদানুবাদে রাজসভা মুখর হইয়া উঠে।

সবাইকে শান্ত হইতে আদেশ দিয়া রাজা কহিলেন, "বেশ তো, আচার্য কোলাহল যখন উত্তর দিতে অসমর্থ হয়েছেন, এবার প্রতিপক্ষ যামুনই তাঁর নিজের প্রশ্ন খণ্ডন করবেন।"

যামুন উঠিয়া দাঁড়ান, রাজা বুধমণ্ডলীকে অভিবাদন জানাইয়া বলেন, "এবার তাহলে আমার প্রস্তাব একটি একটি ক'রে আমিই খণ্ডন করছি। আচার্য কোলাহল তাঁর মাতার একমাত্র পুত্র, তবুও আমি বলবো, তাঁর মাতা বন্ধ্যা। শ্রেষ্ঠ ধর্ম শাস্ত্রকার মনু বিধান দিয়েছেন, একমাত্র পুত্রের পিতা একাধিক পুত্র লাভের জন্য পুনরায় বিবাহ করতে পারে। শাস্ত্রকার চেয়েছেন, পুত্রদের মধ্যে একটি যেন বেঁচে থাকে এবং গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিতে সক্ষম হয়। মেধাতিথির ভাষ্যেও আমরা দেখি—একঃ পুত্রোঽপুত্রো বা। সুতরাং আচার্য কোলাহলের মাতাকে বন্ধ্যা বলা যেতে পারে।"

সভাকক্ষে গুঞ্জন উঠে। অনেকেই বলিতে থাকেন, "যেমন কূট প্রশ্ন, তেমনি কৌশল-পূর্ণ খণ্ডন। বেশ বেশ।"

যামুন অতঃপর বলা শুরু করেন, "এবার রাজার নিষ্পাপত্বর কথায় আসছি। সংহিতার একটি শ্লোকে মনু বলেছেন, প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে রাজা প্রজার কাছ থেকে কর গ্রহণ করেন। প্রজার উৎপন্ন বস্তুর ষষ্ঠাংশ তাঁর প্রাপ্য ; এই উৎপন্ন বস্তু বলতে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুই-ই বুঝায়। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে রাজা তাঁর প্রজাদের পাপপুণ্যেরও এক ষষ্ঠাংশ গ্রহণ ক'রে থাকেন। আপনারা বলুন, রাজ্যের প্রজারা কি নিষ্পাপ? তারা যদি নিষ্পাপ না হয়ে থাকে, তবে রাজাও তো নিষ্পাপ নন।"

"এবার মহারানীর সাধ্বীত্বের কথা। মনু বলেছেন, অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় রাজার দেহে বিরাজ করতে থাকেন সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি অষ্টদিক্‌পাল। তদনুযায়ী

রাজ্ঞী রাজার এবং তাঁর অভ্যন্তরস্থিত অষ্টদিকপাল, উভয়েরই মহিষী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কি ক'রে বলবো, তিনি সাবিত্রী সমা সাধ্বী[১]?"

বালক পণ্ডিতের প্রতিভা ও শাণিত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে সবাই চমৎকৃত। সবাই উপলব্ধি করিলেন, শাস্ত্রপারঙ্গম তো তিনি বটেই, ব্যাখ্যান কৌশল, কূটবুদ্ধি ও চাতুর্যেও তিনি অপরাজেয়।

প্রতিপক্ষ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কোলাহল নীরবে নত মস্তকে বসিয়া আছেন আর সভাকক্ষের সবাই যামুনকে জানাইতেছেন তাঁহাদের সোল্লাস অভিনন্দন।

অতঃপর রাজার আদেশে শুরু হয় বেদ, উপনিষদ ও ধর্মশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্ব ও দার্শনিকতার বিচার দ্বন্দ্ব। আচার্য কোলাহলের সে উৎসাহ, ও আত্মবিশ্বাস, সে দম্ভ আর নাই। সারস্বত জীবনের দীপশিখাটি কে যেন এক ফুৎকারে নিভাইয়া দিয়াছেন। কোনোক্রমে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তিনি শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছেন, আর প্রতিভাধর বালক প্রতিদ্বন্দ্বীর এক একটি তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে হইতেছেন বিপর্যস্ত। বিচারের শেষের দিকে তর্কশূর কোলাহল একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। এবার সমবেত বুধমণ্ডলীর সমর্থন লাভের পর পাণ্ড্যরাজ ঘোষণা করিলেন, এ বিচারে যামুন জয়লাভ করিয়াছেন।

তখন চারিদিকে ধ্বনিত হয় বালক পণ্ডিত যামুনের সাধুবাদ ও জয়ধ্বনি, জয়মাল্য অর্পিত হয় তাঁহার কণ্ঠে।

রাজ্ঞীর আনন্দের অবধি নাই। পার্শ্বে উপবিষ্ট হৃতমান, নতশির, আচার্য কোলাহলের দিকে তাকাইয়া শ্লেষের সুরে বলিয়া উঠেন, 'আলওয়ান্দার, আলওয়ান্দার।" অর্থাৎ, আচার্য তা'হলে এই বালকই শেষটায় পরাজিত করল আপনার মতো দিক্পাল আচার্যকে।

তর্কবিচার সভা ভঙ্গ হইল। অতঃপর পাণ্ড্যরাজ রানীর নিকট যে শপথ করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিলেন, যামুনকে প্রদান করিলেন রাজ্যের অর্ধাংশ।

পাণ্ড্যরাজের বিচারসভায় সেদিনকার এই বিজয়ী বালক পণ্ডিতই উত্তরকালের দেশবরেণ্য মহাসাধক যামুনাচার্য। ভক্তিবাদের ভাস্বর আলোকস্তম্ভরূপে দশম শতকের দাক্ষিণাত্যে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মহান্ উদ্গাতা ও ধারক বাহকরূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। আচার্য রামানুজের প্রেরণাদাতা ও আরাধ্য পূর্বসূরীরূপে সারা ভারতে অর্জন করেন অতুলনীয় কীর্তি।

দক্ষিণ ভারতে মাদুরাইর এক বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে যামুনাচার্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ঈশ্বরমুনি। পিতামহ নাথমুনি ছিলেন এক দিকপাল পণ্ডিত, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াও চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

শঙ্করমঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী এই মনীষী ও সাধক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দশম শতাব্দী হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া ভবিষ্যতে মহাপ্লাবনের সূচনা করিতে লাগিল। মহাপুরুষ শ্রীনাথমুনি এই দার্শনিক যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। অন্যূন ৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্লাবন সূচিত হয়। যামুনাচার্যের সময় নাথমুনির সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ হয় এবং রামানুজের সাধনায় সেই ফল

১ যামুনাচার্য : জীবনকৃষ্ণ দে, উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৭৭

পরিপূর্তি লাভ করে। নাথমুনির হৃদয়ে যে প্লাবনের সূচনা হয়, সে প্লাবনই পরবর্তীকালে সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে[১]।"

দক্ষিণী ভক্তসমাজে নাথমুনি শ্রীবৈষ্ণব সমাজের প্রথম আচার্যরূপে সম্মানিত। তাঁহার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য বেঙ্কটনাথ লিখিয়াছেন,—'সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশক আমাদের এই দর্শন নাথমুনির দ্বারা সূচিত, যামুনের বহু প্রয়াসের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, আর রামানুজের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বিস্তারিত[২]।'

নাথমুনি 'ন্যায়তত্ত্ব' নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া বেঙ্কটনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কিছু কিছু উদ্ধৃতির অনুবাদও তিনি দিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নাই। অধ্যাপক শ্রীনিবাসচারীর মতে, ঐটি হইতেছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতের প্রথম আধুনিক গ্রন্থ[৩]।

উত্তরজীবনে নাথমুনি শ্রীরঙ্গনাথের এক অন্তরঙ্গ সিদ্ধভক্ত ও শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য রামানুজ তাঁহার স্তোত্ররত্ন ও অন্যান্য রচনায় পূর্বসূরী নাথমুনির কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রশস্তি গাহিয়াছেন অকুণ্ঠভাবে।

নাথমুনির একমাত্র পুত্র ঈশ্বরমুনি। এই পুত্রটিকে পরম স্নেহে ও আদরে তিনি লালন করেন, বড় হইয়া উঠিলে সযত্নে নিজের কাছে রাখিয়া নানা শাস্ত্রে তাঁহাকে পারঙ্গম করিয়া তুলেন। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পুত্র ঈশ্বরের জীবনে দেখা দেয় প্রবল বিষ্ণুভক্তি, ইষ্টদেব বিষ্ণুর অর্চনা ও সাধনায় তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। পুত্রের বিদ্যাবত্তা ও সাধননিষ্ঠা দর্শনে নাথমুনির অন্তর তৃপ্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠে।

অতঃপর তরুণ কৃতী পুত্রকে বিবাহ দেওয়াইয়া নাথমুনি তাহাকে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট করেন এবং কয়েক বৎসর পরে, ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হয় এক সুদর্শন, সুলক্ষণযুক্ত পৌত্র। ক্ষুদ্র স্বল্পবিত্ত সংসারে এ যেন দিব্যলোকের এক ঝলক আলোক-রশ্মি। সারা-গৃহ আনন্দে উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

এই পৌত্রের নাম রাখা হয় যামুন, বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পায় তাহার অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা। একবারটি যাহা কিছু শ্রবণ করে, আর কখনো সে তাহা বিস্মৃত হয় না। শুধু তাহাই নয়, এক এক সময়ে অতীত বিষয় সম্পর্কে নূতন নূতন প্রশ্ন তুলিয়া শিক্ষকদের সে অবাক করিয়া দেয়।

ঈশ্বরমুনি শাস্ত্রবিদ্‌ ব্রাহ্মণ বংশের যোগ্য প্রতিনিধি হইয়া উঠিয়াছেন। পরম আদরের পৌত্র যামুনও গাড়িয়া উঠিতেছেন সহজাত শুভ সংস্কার নিয়া। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে যে এক কৃতী পড়ুয়া হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এসময়ে নাথমুনির সংসারজীবনে নিপতিত হয় দৈবের এক নির্মম আঘাত। আকস্মিক এক কঠিন রোগে ভুগিয়া প্রিয় পুত্র ঈশ্বরমুনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

একমাত্র পুত্রের বিয়োগ ব্যথায় নাথমুনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন, হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীব্র বৈরাগ্যের আগুন। সংকল্প স্থির করিয়া ফেলেন, এবার চিরতরে সংসার ত্যাগ

---

১ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শঙ্করমঠ, বরিশাল।

২ সঙ্কল্পসূর্যোদয় : বেঙ্কটনাথ

৩ দ্য ফিলসফি অব বিশিষ্টাদ্বৈত : জি. এন. শ্রীনিবাসচারী, আদেয়ার।

করিবেন, সন্ন্যাস নিয়া শুরু করিবেন কঠোর তপস্যা, প্রভু রঙ্গনাথজীর পবিত্র পীঠে অবস্থান করিয়াই কাটাইবা দিবেন জীবনের বাকী দিনগুলি।

গৃহের লোকদের ভরণপোষণের মোটামুটি ব্যবস্থা করার পর বালক পৌত্র যামুনকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন গুরুগৃহে। কুলপ্রথা অনুযায়ী এ বয়সে সবাই তাঁহারা শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন গুরুর সন্নিধানে বাস করিয়া। যামুনের জন্যও সে ব্যবস্থাই করা হইল। পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য একজন খ্যাতিমান্ শাস্ত্রবিদ্, সদাচারী ও বিষ্ণুভক্ত বলিয়াও তাঁহার সুনাম রহিয়াছে। যামুনকে তাঁহার আশ্রয়ে রাখিয়া নাথমুনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর একদিন শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া গ্রহণ করিলেন বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস।

বিষ্ণু আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় যোগ সাধনায়ও ব্রতী হন নাথমুনি। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীরঙ্গম অঞ্চলে সাধক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই সাধক মহলে তাঁহার সম্ভ্রমের সীমা ছিল না, সবাই তাঁহাকে অভিহিত করিত নাথমুনি নামে।

এদিকে অল্পকাল মধ্যে বালক যামুন পরিচিত হইয়া উঠেন ভাষ্যাচার্যের চতুষ্পাঠীর অন্যতম অগ্রণী ও প্রতিভাধর ছাত্ররূপে। এই নবীন পড়ুয়ার প্রতি পণ্ডিত ভাষ্যাচার্যের স্নেহ মমতার সীমা ছিল না। ঈশ্বরমুনির ঘরের ছেলে যামুন, স্বভাবতই পিতা ও পিতামহের সাত্ত্বিকী সংস্কার ও সহজাত মেধা নিয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তদুপরি দিনের পর দিন প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার মননশক্তি ও প্রতিভার চমৎকারিত্ব। গোড়া হইতেই আচার্য বুঝিয়া নিয়াছেন, তাঁহার এই বালক পড়ুয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, কালে অবশ্যই সে গণ্য হইবে দিক্‌পাল পণ্ডিতরূপে। তাই স্বভাবতই ভাষ্যাচার্য যামুনকে প্রাণ ঢালিয়া এতদিন পড়াইয়াছেন। গড়িয়া তুলিয়াছেন এক সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতরূপে।

ছাত্র যামুনকে কেন্দ্র করিয়া আচার্য অনেক কিছু আশা করিয়াছেন, ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কিন্তু সে যে সেদিন হঠাৎ এমন করিয়া দুর্ধর্ষ পণ্ডিত কোলাহলের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়া বসিবে এবং সে সংঘর্ষে জয়ী হইবে, এ কথা তাঁহার মনে কোনোদিন স্থান পায় নাই।

এবার ভাষ্যাচার্যের আনন্দ আর ধরে না। দর্পী অত্যাচারী আচার্য কোলাহল পাণ্ড্য-রাজ্য ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। বালক শিষ্যের বিজয়ে ভাষ্যাচার্যের নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি জাঁক বাড়িয়াছে তাঁহার চতুষ্পাঠীর।

বিজয়ী নবীন পণ্ডিত যামুনের জীবনের ধারা এবার বহিয়া চলে এক নূতনতর খাতে। নিজে তিনি বালক, রাষ্ট্রীয় কর্মের কোনো অভিজ্ঞতা নাই। তাই পাণ্ড্যরাজের অভিভাবকত্ব ও সহায়তায় পরিচালনা করিতে থাকেন তাঁহার নবলব্ধ রাজ্যের সমস্ত কিছু দায়িত্ব। এই সঙ্গে বহিয়া চলে তাঁহার সারস্বত জীবনের ধারা। দেশ দেশান্তর হইতে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা আসিয়া জড়ো হন তাঁহার রাজধানীতে এই পণ্ডিতদের সাহচর্যে যামুন গড়িয়া তোলেন এক শাস্ত্রপারঙ্গম বুধমণ্ডলী।

ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন রাজা যামুন। শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার মূর্তবিগ্রহ তিনি। পার্শ্ববর্তী রাজন্যদের উপর স্বভাবতই তাহার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

রাজ্যের আয়তন অচিরে বৃদ্ধি পায়, রাজকীয় বিত্ত বিভব হয় পুঞ্জীভূত এবং ভোগবিলাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাঁহার চারিদিকে। দশ বারো বৎসরের মধ্যে যামুন পরিণত হন এক ধনজন পরিপূর্ণ রাজ্যের অধীশ্বররূপে।

স্বাধ্যায়ী, তপস্বী এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার জন্ম। কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্তনে রাজশক্তি ও রাজবৈভবের দিকেই তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

আরো কয়েক বৎসর অতীত হইলে স্বভাবতই যামুন বিস্মৃত হন তাঁহার প্রথম জীবনের সাত্ত্বিকী, সদাচারী, তপোনিষ্ঠ চিত্তবৃত্তির কথা। রাজ্যের প্রসার ও প্রভাবের জন্য, ধনমান ও বিলাস বৈচিত্র্যের জন্য দিন দিন তিনি উৎসাহী হইয়া উঠেন। প্রথম জীবনের পরম সম্ভাবনার উপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসে বিস্মৃতির যবনিকা।

এভাবে প্রায় তেইশ বৎসর কাল পরমানন্দে তিনি রাজদণ্ড পরিচালনা করেন এবং সর্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন এক কৌশলী রাজনীতিবিদ্ ও দক্ষ শাসকরূপে। রাজ্যের পরিধি তাঁহার দিনের পর দিন আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস নিবার পরও নাথমুনি কিন্তু পৌত্র যামুনের কথা বিস্মৃত হন নাই। বরং তাঁহার কল্যাণময় দৃষ্টি সতত নিবদ্ধ রহিয়াছে তাঁহারই দিকে। সিদ্ধপুরুষের উপলব্ধিতে আসিয়া গিয়াছে যামুনের আত্মিক জীবনের পরম সম্ভাবনার কথা। ধ্যান বলে তিনি জানিয়াছেন, ভক্তিধর্মের এক মহান্ নেতারূপে ভবিষ্যতে ঘটিবে তাঁহার অভ্যুদয়, সহস্র সহস্র সাধক লাভ করিবে তাঁহার পরমাশ্রয়। তাছাড়া, ইহাও তিনি জানিয়াছেন, যামুনের তপস্যা, তাঁহার সিদ্ধি, তাঁহার দার্শনিকতা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক দৃঢ় ভিত্তিভূমি গড়িয়া তুলিবে, সারা ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির আন্দোলনে ঘটাইবে এক কল্যাণময় পদক্ষেপ।

যামুন রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ নিয়া সদা ব্যস্ত। কিন্তু দিব্য দৃষ্টি সহায় নাথমুনি যে দেখিয়াছেন, তাঁহার সহজাত সাত্ত্বিকী সংস্কার, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রময় তপস্যার সংস্কার, জীবনের গভীরতর খাতে বহিয়া চলিয়াছে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো। সে প্রচ্ছন্ন ধারার আত্মপ্রকাশের আর বেশী দেরি নাই। লগ্নটি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে।

এদিকে নাথমুনির নিজের মহাপ্রয়াণের দিনটিও নিকটবর্তী হয়। বিদায়ের দিন অন্তরঙ্গ শিষ্য, উচ্চকোটির ভক্তিসিদ্ধ সাধক, মানাক্কাল নম্বিকে নিভৃতে নিজের শয্যার পাশে ডাকাইয়া আনিলেন। কহিলেন, "নম্বি, তোমার ওপর বহু কর্তব্যের ভারই বহুবার চাপিয়েছি। এবার চাপিয়ে দেবো একটি ঐশ্বরীয় কাজের দায়িত্ব।"

"আজ্ঞা করুন প্রভু, এ দাস যে কোনো কঠিন কাজে পিছপাও হবে না।" জোড়হস্তে নিবেদন করে নম্বি।

"তা জানি বৎস। এবার মন দিয়ে শোনো আমার কথা। আমার সময় পূর্ণ হয়েছে, আজই আমি এই দেহের খোলস ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে দক্ষিণদেশের সহস্র সহস্র ভক্তের, বিশেষ ক'রে শ্রীসম্প্রদায়ের অনুগামীদের একটা আশ্রয় গড়ে তোলার কথা আমি ভাবছি। নম্বি, তুমি আমার পৌত্র, রাজা যামুনকে তো জানো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর ওখানে আমি কয়েকবার গিয়েছি। সদাচারী এবং ধার্মিক রাজা তা স্বীকার করতে হবে।"

"শোনো নম্বি, যতই ভালো হোক, রাজত্ব নিয়েই সে মজে আছে। তা থেকে তাঁকে টেনে বার করতে হবে।"

"সে কি কথা প্রভু, এ আপনি কি বলছেন ?"

"হ্যাঁ নম্বি, তাই করতে হবে এবং তোমাকে তা করতে হবে। প্রভু রঙ্গনাথ আমায় তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন। একটা শক্তিধর মহাবৈরাগী প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে রাজা যামুনের ভেতরে। সে জানে না যে সে ঈশ্বর প্রেরিত মহাসাধক। বহু জনের উদ্ধারকারী সে। কিন্তু আপন স্বরূপ সে বিস্মৃত হয়েছে ডুবে আছে বিষয়ের পঙ্কে। তাকে সেই পঙ্ক থেকে টেনে তুলতে হবে, জানিয়ে দিতে হবে তাঁর প্রকৃত পরিচয়, বুঝিয়ে দিতে হবে ঐশ্বরীয় কার্যের গুরুদায়িত্বের কথা।"

"কিন্তু, প্রভু, আমায় দিয়ে কি করে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন হবে, তা আমি বুঝে উঠতে পারছিনে।"

"তুমিই তা করবে, বৎস রাজা যামুন সব সময়ে রাজকার্যের জটিল জালে আবদ্ধ। তাঁকে কৌশলে তোমায় নিয়ে আনতে হবে শ্রীরঙ্গনাথের চরণতলে। তাঁর ভেতরকার সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। রঙ্গনাথের কৃপায় তুমি ভক্তিসিদ্ধ হয়েছো। তোমার পবিত্র সঙ্গ দেবে যামুনকে কিছুদিনের জন্য। দেখবে মুক্তি আস্বাদনের লোভে উন্মত্তের মতো বেরিয়ে আসবে সে তার সোনার পিঞ্জর থেকে। যে-কোনো উপায়ে তাকে টেনে বার ক'রে এনো, নম্বি, গুরু হিসেবে এই আমার শেষ নির্দেশ তোমার প্রতি।"

"আপনার আজ্ঞা এ দাস শিরোধার্য করছে, প্রভু।"

বৃদ্ধ নাথমুনির অন্তর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে দিব্য আলোকের আভা, হৃদ্‌পদ্মে প্রভু রঙ্গনাথজীর ধ্যান করিতে করিতে প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলার মহাধামে।

যথাকাল নম্বি আচিরে উপনীত হন যামুনের রাজধানীতে। নাথমুনির প্রিয়তম শিষ্য তিনি, তাছাড়া শ্রীরঙ্গমের এক খ্যাতনামা সাধক তিনি। যামুনের সহিত পূর্ব হইতেই তিনি সুপরিচিত। সভাগৃহে নম্বির দর্শন পাওয়া মাত্র সসম্ভ্রমে যামুন জ্ঞাপন করেন অভ্যর্থনা, পিতামহের অন্তিম সময়ের কথা শ্রবণ করেন তাঁহার কাছে। তারপর রাজ-অতিথি ভবনে নম্বির যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়েন জরুরী কাজে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজা যামুনের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলার সুযোগই নম্বি পাইতেছেন না। মন্ত্রীর কাছে দরবার করিয়াও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব হইতেছে না।

লোকের কানাঘুষায় শুনলেন, প্রতিবেশী একটি দুষ্ট রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে, যামুন তাই অতিমাত্রায় ব্যস্ত। এজন্যই ভক্ত নম্বিকে কোনো সময় দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।

নম্বি এবার তাঁহার কার্যক্রম স্থির করিলেন। গুরু নাথমুনি বলিয়া গিয়াছেন, প্রয়োজন বোধে ছলাকলার আশ্রয় নিবে, সেই অনুসারে এক কৌশলপূর্ণ উপায়ও তিনি গ্রহণ করিলেন।

বহু চেষ্টার সেদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। যামুন সৌজন্য ও বিনয় দেখাইয়া কহিলেন, "ভক্তপ্রবর, আমি একটা আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মহাব্যস্ত, ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনার মতো বৈষ্ণব সাধকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারছিনে।"

নম্বি একথার সুযোগ নিতে ছাড়িলেন না। সবিনয়ে কহিলেন, "মহারাজ, যুদ্ধের প্রস্তুতি সব চাইতে বড় কথা—অর্থ, সমরোপকরণ ও সেনা বাহিনী। আপনার তো কিছুরই অভাব নেই।"

"ভক্তবর, বড় রকমের উদ্যোগ আয়োজনে কোনো কোনো দিকে অভাব তো কিছুটা থাকবেই। প্রতিপক্ষ অতি খল এবং শক্তিশালী। তাকে চকিতে আক্রমণ ক'রে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করতে চাই আমি। নতুবা বিষদাঁত বার বার গজাবে, আর অযথা আমাদের কামড়াতে আসবে।"

"অভিজ্ঞ রাজনীতিকের মতোই কথা বলছেন আপনি।" প্রশংসার সুরে বলেন নম্বি।

"যত সম্ভব হয়, একটি বৃহৎ অশ্বারোহী বাহিনী আমি গড়ে তুলতে চাই, এই বাহিনী নিয়ে তড়িৎবেগে আক্রমণ করা যায়, আকস্মিক ও তীব্র আক্রমণে শত্রুসেনা হয় ছিন্ন-ভিন্ন। কিন্তু এই বাহিনীকে বড় ক'রে তুলতে হলে বিদেশ থেকে আনা দরকার অজস্র বলবান্ ও বেগবান্ অশ্ব। এর জন্য প্রচুর অর্থ চাই। রাজকোষে টান পড়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি নিয়ে একটু ব্যতিব্যস্ত রয়েছি আমি। একটু অপেক্ষা করুন, অবসর ক'রে নিয়ে আপনার সঙ্গে আবার আলাপ করবো।"

"মহারাজ, প্রচুর অর্থ হলেই তো আপনার সব সমস্যা মিটে যায়।"

"তা যায় বৈ কি। কিন্তু হঠাৎ তা চাইলেই তো আর এ বস্তু পাওয়া যায় না।"

নম্বি এবার ছাড়েন তাঁহার অমোঘ বাণ। কহেন, "মহারাজ, অর্থের জন্য ভাবনা নেই। প্রচুর অর্থ আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে, হ্যাঁ, বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন রয়েছে, এবং আপনিই হচ্ছেন তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। এ ধনসম্পদ আপনার হাতে ন্যস্ত ক'রে আমি দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে চাই, মহারাজ।"

মুহূর্তে যামুনের আয়ত নয়ন দুটি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠে, উৎসাহে উদ্দীপনায় খপ্ করিয়া নম্বির হাত দুটি তিনি ধরিয়া ফেলেন। বলেন, "বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন, কার অর্থ? কে-ই বা দান করেছেন আমাকে?"

"মহারাজা, আপনার পিতামহ নাথমুনি সাংসারিক আশ্রমে দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু সন্ন্যাস নেবার পর বিপুল অর্থের মালিক হন তিনি। শ্রীরঙ্গমের পুণ্যভূমিতে নিভৃতে তপস্যা করবার কালে দৈব কৃপায় বিপুল ধনরত্ন তিনি প্রাপ্ত হন। সে সব গচ্ছিত রয়েছে আপনারই জন্য। নাথমুনির ঐশ্বর্য তাঁর একমাত্র পৌত্র ছাড়া আর কে পাবে বলুন তো?"

"কোথায় আছে সে ধন, মহাত্মন্, কে জানে তার সন্ধান? বলুন, বলুন, সব আমায় অকপটে খুলে বলুন।" রাজা যামুনের এবার ধৈর্য ধারণ করা দায়।

প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন নম্বি, "মহারাজ, একমাত্র আমিই জানি। সে গুপ্তধনের সন্ধান। যদি পেতে চান, আর দেরি না ক'রে আমার সঙ্গে চলুন।"

উৎসাহে যামুন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বলেন, "এখুনি আমি আমার দেহরক্ষীদের তৈরি হতে নির্দেশ দিই, যানবাহনের ব্যবস্থাদিও করতে বলি।"

উত্তরে নম্বি কহিলেন, "মহারাজা. গুপ্তধনের স্থানটি হচ্ছে দূরে, শ্রীরঙ্গম অঞ্চলে। আর সেখানে আপনাকে যেতে হবে একলাটি আমার সঙ্গে এবং গোপনে ছদ্মবেশে। বেশী জানাজানি হলে কিন্তু সব বেহাত হয়ে যাবে। ওখান থেকে ফেরবার সময় লোকলস্কর ও যানবাহনের ব্যবস্থার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।"

যামুন তাঁহার রাজকার্যের ভার কিছুদিনের জন্য মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত রাখিলেন। প্রচার করিয়া দিলেন, শরীর পীড়াগ্রস্ত, তাই কিছুদিন তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিশ্রাম নিবেন, কেহ যেন এ কয়টি দিন তাঁহাকে বিরক্ত না করে।

সেইদিনই গভীর রাত্রে নম্বিকে সঙ্গে নিয়া যামুন গোপনে ত্যাগ করেন রাজপ্রাসাদ। সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে উভয়ে রওনা হন পুণ্যভূমি শ্রীরঙ্গমের দিকে।

পথে চলিতে চলিতে নম্বি কহিলে, "মহারাজ, সারাটা পথ পদব্রজে অতিক্রম করতে হবে। আমি স্থির করেছি, প্রতিদিন তিন ক্রোশের বেশী আমরা অগ্রসর হবো না। কারণ, আপনার পক্ষে বেশী শ্রম সহ্য করা কঠিন।"

যামুন রাজপ্রাসাদের বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত, পদব্রজে চলার অভ্যাস মোটেই নাই, নম্বির কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন।

তিন ক্রোশ অন্তর এক একটি গ্রামে পৌঁছিয়া উভয়ে বিশ্রাম করিতেন। তারপর ভক্ত নম্বি শুরু করিতেন তাঁহার ইষ্টসেবার কাজ। স্নান বন্দনাদি শেষ করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ রন্ধন করিতেন তারপর পূজা ও ভোগ নিবেদনের পর রত হইতেন গীতাপাঠে। ভাবাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চ স্বরে প্রতিদিন তিন অধ্যায় তিনি পাঠ করিতেন, আর পাশে বসিয়া যামুন তাহা শ্রবণ করিতেন।

নম্বি ভক্তিসিদ্ধ পুরুষ। গীতা পাঠ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ তাঁর পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে। চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে দিব্য জ্যোতির আভা, অপার্থিব আনন্দে তিনি ভরপুর হইয়া উঠেন।

যামুন সবিস্ময়ে পরম ভক্তের এই আনন্দঘন মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকেন। অন্তরে বার বার লাগে দোলা, ভাবিতে থাকেন, অপার আনন্দের অধিকরী এই নম্বি, স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ লাভ ক'রে জীবন তাঁর হয়েছে ধন্য, কৃতার্থ। গীতাপাঠ, বহুতর শাস্ত্রপাঠ যামুন আগে বহু করেছেন। কিন্তু স্বাধ্যায়কে এমন ক'রে ইষ্ট চিন্তনের সঙ্গে মিশিয়ে মধুর ক'রে তো কখনো তুলতে পারেন নি। তাছাড়া, রাজকার্যে লিপ্ত হবার পর থেকে একের পর এক মায়া বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন যামুন। দিব্যলোকের আনন্দ ও প্রসাদ থেকে রয়েছেন বঞ্চিত।'

মহাপুরুষ নম্বির পাঠ যেন চৈতন্যময়। উচ্চারিত এক একটি শ্লোক যেন উন্মোচিত করে ঈশ্বর চেতনার এক একটি দিব্য স্তর। পরমপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহাবাণী বারবার অনুরণিত হয় যামুনের অন্তরে—ভক্তি নিয়ে এসো, শরণাগতি নিয়ে এসো আমার কাছে, আমি তোমায় দেবো পরাশান্তি, দেবো পরামুক্তি। এ বাণী মন-ভোলানো প্রাণ গলানো। এ বাণী যে অমোঘ।

সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে আসে তীব্র অনুশোচনা। যে বিষয় বিভব ক্ষণস্থায়ী, যে দেহ ভঙ্গুর ও মরণশীল তাহা নিয়াই নির্বোধের মতো সময় কর্তন করিয়াছেন এতদিন। আর নয়, এবার ছিন্ন করিতে হইবে এই বন্ধন-ডোর, শুরু করিতে হইবে অমৃতময় জীবনের পথসন্ধান।

ছয় দিনের পথে অষ্টাধ্যায়ী গীতা নম্বি পাঠ করিলেন, এই পাঠ যামুনের অন্তরে জাগাইয়া তুলিল দিব্যলোকের স্পর্শ, কাজ করিল মন্ত্রচৈতন্যের মতো। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ঘটিল রাজা যামুনের বিষয় বিমোহিত জীবনে।

সপ্তম দিনের প্রত্যূষে উভয়ে পৌঁছিয়া গেলেন শ্রীরঙ্গমে। কাবেরীতে স্নান সমাপনের পর রাম যামুনকে উপস্থিত করিলেন শ্রীবিগ্রহ রঙ্গনাথজীর সম্মুখে। প্রেমাপ্লুত স্বরে কহিলেন, মহারাজ, এই দেখুন আপনার পিতামহ নাথমুনির গুপ্ত ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের সন্ধান আপনাকে দেবো বলে আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম আমার গুরুর কাছে, আজ তা পালিত হল।"

বিগ্রহ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যামুন প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া গেলেন। দরদর ধারে বহিতে লাগিল পুলকাশ্রু। রঙ্গনাথজীর জ্যোতির্ময়, আনন্দঘন মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তাঁহার হৃদয়াকাশে। বাহ্যচৈতন্য হারাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন মন্দিরতলে।

সেইদিন হইতে যামুন পরিণত হন এক নূতন মানুষে। রাজা যামুনের এবার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেস্থলে জাগিয়া উঠিয়াছে ভক্তিপ্রেম পথের এক ভিখারী সাধক।

রাজসিংহাসন ও রাজবৈভব যামুন চিরতরে ত্যাগ করিলেন, পিতামহ নাথমুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রহণ করিলেন সন্ন্যাস। প্রেম, ভক্তি ও প্রপত্তির পথে, ইষ্টপ্রাপ্তির পথে, শুরু হইল তাঁহার অভিযাত্রা।

রাজধানী হইতে স্বজনেরা, পাত্রমিত্রেরা, যামুনকে ফিরাইয়া নিতে আসিলেন। কিন্তু অনুনয় ও অশ্রুজল ত্যাগী ভক্তের সংকল্প টলাইতে পারিল না। স্মিতহাস্যে তিনি উত্তর দিলেন, "যে রাজ্য, যে বিষয়বৈভব নিয়ে এতদিন দিন কাটিয়েছি তা ক্ষণস্থায়ী, মূল্যহীন। এবার এক নূতন রাজার অধীনে কাজ নেবো। সে রাজার দ্বিতীয় নেই, আর রাজ্য তাঁর সারা সৃষ্টি জুড়ে,—অখণ্ড, অনন্ত, শাশ্বত সেরাজ্য। সে রাজ্যের রাজাই শুধু দিতে পারেন অমৃতত্ব আর একখণ্ড দিব্য আনন্দ। পরমপ্রভু শ্রীবিষ্ণুই সেই রাজা,—আর তাঁর জাগ্রত বিগ্রহ এই শ্রীরঙ্গনাথ। এখন থেকে আজীবন আমি থাকবো তাঁরই সেবক হয়ে।"

আত্মপরিজন ও শুভানুধ্যায়ীরা বুঝিলেন বৈরাগ্যবান্ সাধককে সংসারজীবনে আর ফিরাইয়া নিবার উপায় নাই, হতাশ হইয়া তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীরঙ্গমের ভক্ত-সমাজে, বিশেষত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মধ্যে, আনন্দের জোয়ার বহিয়া যায়। সকলেরই মনে আশা জাগিয়া উঠে, ভক্তি প্রেমের যে পথটি নাথমুনি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, প্রতিভাধর যামুনের সাধনা ও সিদ্ধিতে সে পথটি এবার আরো প্রশস্ততর হইবে, হইবে আরো আলোকোজ্জ্বল।

শ্রীরঙ্গনাথের সেবা পূজায় যামুন এবার প্রাণমন ঢালিয়া দেন। সেই সঙ্গে চলে ভক্তিযোগীর সাধনতত্ত্ব ও দর্শনের গবেষণা ও গ্রন্থরচনা। কয়েক বৎসরের মধ্যে এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। শ্রীরঙ্গমের ভক্তগোষ্ঠীর নেতারূপে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে সারা দাক্ষিণাত্যে বিস্তারিত হয় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি।

অসামান্য প্রতিভা নিয়া আচার্য যামুন জন্মিয়াছেন, বহুপূর্ব হইতেই সর্বশাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম। এবার তাঁহার সেই পাণ্ডিত্য ও নেতৃত্বের দক্ষতা ঐশ্বরীয় কার্যে নিয়োজিত হইল।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক বিস্তৃততর দার্শনিক ব্যাখ্যা আচার্য যামুন উপস্থাপিত করিলেন। পিতামহ নাথমুনি যে দার্শনিকতার প্রবর্তন করেন, তাহার ভিত্তিকেই তিনি করিলেন দৃঢ়তর। যামুনাচার্যের পরবর্তীকালে তাঁহার নাতিশিষ্য রামানুজের অবদানের

ফলে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরিগ্রহ করে এক পূর্ণতর অবয়ব, আত্মপ্রকাশ করে আচার্য শঙ্করের প্রতিপক্ষীয় সুসম্বদ্ধ দার্শনিক মতবাদরূপে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ধারা, এদেশে সুপ্রাচীন কাল হইতে বহমান। ব্রহ্মসূত্রে আচার্য আশ্মরথ্যকে উল্লেখ করা হইয়াছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদরূপে। মহাভারতে পাঞ্চরাত্রমতের কথা বর্ণিত আছে, ঐ মতবাদে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ছায়াটিকে স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

ব্রহ্মসূত্রের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যার সূচনা দশম শতকে। নাথমুনি ও যামুনাচার্যের পরে একাদশ শতকে রামানুজের আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁহার বিষ্ণুসাধনা ও দার্শনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের ভক্তিবাদ।

কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, নাথমুনি যামুন রামানুজের ভক্তিবাদের উৎস আড়বার সাধকদের জীবসাধনা। তামিলদেশে ভক্ত আড়বারগণ আবির্ভূত হন ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্বে। শ্রীবৈষ্ণবেরা বলেন, প্রাচীন আড়বার আচার্যের অভ্যুদয় ঘটে দ্বাপর যুগের শেষের দিকে। এই অভ্যুদয়ের ধারা এবং গুরুপরম্পরা কলিযুগ অবধি বহিয়া চলে।

ভক্তিসিদ্ধ প্রাচীন আড়বারদের মধ্যে রহিয়াছেন : কাঞ্চীর পোঁইহে, মল্লাপুরীর পূদত্ত, ময়লাপুরের পে, মহীসারের তিরুমিড়িশি। পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য হইতেছেন— শঠকোপ, মধুর কবি কুলশেখর, পেরিয়া, অণ্ডাল প্রভৃতি। ইঁহাদের প্রেমভক্তিময় জীবনের কাহিনী ও রচিত স্তবগাথা হাজার হাজার বৎসর যাবৎ দাক্ষিণাত্যকে ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়াছে। অগণিত নরনারীর জীবনে আনিয়াছে ভক্তি, প্রেম ও শরণাগতির প্রেরণা।

আড়বারদের এই ভক্তিবাদ এবার নবতর রূপ পরিগ্রহ করিল যামুনাচার্যের সাধনা, সিদ্ধি ও দার্শনিক তত্ত্বের মধ্য দিয়া।

প্রাচীন আড়বার ও তাঁহাদের উত্তরসূরী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সাধক ও দার্শনিকদের প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন :

—প্রাচীন আলোয়ারগণ যে ভক্তির স্নিগ্ধ শান্ত ভাবপ্রবাহে অবগাহন করিয়া পূত-পবিত্র হইয়াছেন, সেই পূতপ্রবাহের সহিত দার্শনিকতার সম্মিলনে পুণ্যতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যামুনাচার্যের সময় হইতেই ইহাদের মধ্যে দার্শনিক প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে। একদিকে যেমন আলোয়ারগণ ভক্তিবাদের প্রসার করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি দ্রমিড়াচার্য গুহদেব, টঙ্ক, শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি আচার্যগণ দর্শনের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন। যামুনাচার্যের পূর্বে বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য আপনার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্র, টঙ্ক প্রভৃতি আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সিদ্ধিত্রয়' নামক গ্রন্থে যামুনাচার্য প্রাচীন আচার্যগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য, টীকাকার টঙ্ক ও শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি আচার্যগণ শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত। আচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ভর্তৃহরি, ব্রহ্মদত্ত শঙ্কর প্রভৃতি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী। আচার্য ভাস্কর ভেদাভেদ-বাদী। যখন নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের ও ভেদাভেদবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখন স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জনাই যামুনাচার্যের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ। দশম শতাব্দী দার্শনিক প্রতিভার যুগ সকলক্ষেত্রেই নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও তখন আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

—অনেকে মনে করেন, শঙ্করের জ্ঞানবাদে ব্যভিচারের সূত্রপাত হইলে, আচার্য

রামানুজ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়; কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, যামুনাচার্যের অবতরণ কালেই বাচস্পতির আবির্ভাব কাল। বাচস্পতির মহিমা যখন সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, তখনই রামানুজের আবির্ভাব। একাদশ শতাব্দীতে বাচস্পতির প্রতিভা সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতের আচার্যগণ সকলেই অবতার। ধর্মের গ্লানি না হইলে অবতার অবতীর্ণ হন না। জীবন চরিতকারগণ অবতারের ফলে ধর্মের গ্লানি অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। আচার্য রামানুজ ও মধ্ব প্রভৃতি আবির্ভাবের কারণ শাঙ্করমতের গ্লানি। কিন্তু রামানুজ ও মধ্বের যুগে শাঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রতিভার আরও অধিকতর স্ফূর্তি হইয়াছে। যে মতের গ্লানি হয়, তাহার স্ফূর্তি অসম্ভব। যদি শাঙ্কর মতের গ্লানি হইত, তাহা হইলে দার্শনিক মনীষার প্রস্ফুরণ হইতে পারিত না। আমাদের বিবেচনায় যখন শাঙ্কর মতের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ সকল স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য শাঙ্কর মত আক্রমণ করিয়াছেন।

……—প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্যই সমধিক প্রচেষ্টার আবশ্যকতা, যদি শাঙ্করমতের গ্লানিই আরম্ভ হইয়াছিল তাহা হইলে যামুনাচার্য, রামানুজাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ বদ্ধপরিকর হইয়া শাঙ্করমত খণ্ডন করিতেন না। বিশেষত যামুনাচার্য নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী আচার্যগণের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের মত নিরসনের জন্যই প্রকরণ প্রক্রমে'র আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রবল যোদ্ধাকে পরাজিত করিবার জন্যই এরূপ চেষ্টা স্বাভাবিক।

—শাঙ্করমতের প্রবলতার ও ভাস্করমতের অভ্যুদয়ে বিষ্ণুভক্তিবাদ স্থাপনের জন্যই যামুনাচার্যের প্রয়াস। যখন শঙ্করের জ্ঞানবাদে সমস্ত দেশ প্লাবিত, তখনই যামুনাচার্যের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ। দক্ষিণ ভারতে তৎকালে সকল সম্প্রদায়ই আপন আপন মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত। যামুনাচার্যও বৈষ্ণবমতের প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

যামুনাচার্যের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রধান—সিদ্ধিত্রয়ম। বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত হইতে সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার অপর রচনাবলীর নাম—স্তোত্ররত্নম্, আগম-প্রামাণ্যম্ এবং গীতার্থ সংগ্রহ।

আচার্য যামুন তাঁহার দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রধানত শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মবাদকে আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে চেতন ও অচেতন সকল বস্তুই হইতেছে ব্রহ্মের শরীর, আর ব্রহ্ম সেই শরীরের আত্মা এবং অধিষ্ঠাতা। শরীর ও শরীরীরে এক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, কাজেই ব্রহ্ম স্বরূপত এক এবং অদ্বিতীয়। তরঙ্গ, ফেনা ও বুদ্বুদ প্রভৃতি অংশ থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রকে এক ও অখণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয়, তেমনি জীব, জগৎ ও ঈশ্বর প্রভৃতির অনেকত্ব থাকিলেও সমষ্টিভূত সত্তা পুরুষোত্তম নারায়ণ এক এবং অখণ্ড।

আচার্য যামুন আরও বলেন, ঈশ্বর পুরুষোত্তম, সৃষ্ট জীব হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অণু অংশ। ঈশ্বর ও জীব নিত্য পৃথক। তাঁহার মতে, মুক্ত জীব ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে, কিন্তু ঈশ্বরভাব লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

ব্রহ্ম ও জীবের ভেদের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—'এই দুইয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই। কিন্তু স্বগত ভেদ রহিয়াছে। তাঁহার মতে, মৌলিক পদার্থ তিনটি—চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। চিৎ—জীব, অচিৎ—জগৎ আর পুরুষোত্তম—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সবিশেষ—সগুণ, অশেষ কল্যাণ গুণের নিলয়, সর্বনিয়ন্তা। জীব তাঁহার চির দাস।'

সাধক যামুনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, তিনি থাকিবেন পরম প্রভুর ঐকান্তিক নিত্য-কিঙ্কর হইয়া। দাস্য ও পরাভক্তিতে তিনি অভিলাষী, কাজেই সবিশেষ ব্রহ্ম এবং তাঁহার ব্রহ্মরূপই তাঁহার ধ্যেয়।

তাঁহার এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রধানত ব্রহ্মপুরাণ হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ পুরাণে মহামুনি পরাশর চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন। আচার্য শ্রদ্ধাভরে তাহার গুণকীর্তন করিয়াছেন।[১]

যামুনাচার্যের স্তোত্ররত্নে পরাভক্তি ও শরণাগতির তত্ত্বটি বড় মনোরম ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাণের আকুতি উদ্ঘাটিয়া ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিতেছেন

মথনাথ যদস্তি যোঽস্ম্যহং
সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব
নিয়তং স্বমিতি প্রবুদ্ধধীরথ বা
কিন্নু সমর্পয়ামি তে॥

—হে নাথ, হে মাধব, যা কিছু আমি, যা কিছু আমার সকলই যে তোমার প্রভু? যদি কখনো আমার এরূপ জ্ঞান হয় যে,—সকলই সর্বসময়ে একান্তভাবে তোমার—তবে আমার কোন্ বস্তু কি ক'রে করবো তোমায় সমর্পণ?

"এই শরণাপত্তির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাদৃশ্য আছে।—কি দিব আমি, যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি। আচার্য যামুন সর্বস্ব তাঁহাতে বিকাইয়া দিয়াছেন, আর বৈষ্ণব কবি যাহা কিছু সকলই নারায়ণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যামুনাচার্যের ভাব—তবৈবাহং। বৈষ্ণব কবির ভাব অনেকটা পরিমাণে—মমৈব ত্বং।

"ঈশ্বরের সহিত জীবের পিতা, মাতা, তনয়, সুহৃদ্ সকল সম্বন্ধই সম্ভব, কিন্তু দাস্য ভাবই যামুনাচার্যের মতে শ্রেষ্ঠ। এক স্তোত্রে তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, "হে প্রভু, তোমার প্রতি দাস্য ভাবই সকল ভাবের শিরোমণি। একমাত্র দাস্যসুখে আসক্ত ব্যক্তির গৃহে কীটজন্মও সার্থক, তবুও অন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইয়া জন্মানোও কাম্য নয়।[২]

প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের সেবা, দাস্য ও বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রচার, এইসব নিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। এবার যামুনাচার্য পৌঁছিয়াছেন বার্ধক্যের কোঠায়। মনে কেবলই দুশ্চিন্তা, ভক্তিবাদের যে ভিত্তি তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার উপর সৌধ গড়িয়া তুলিবে কে? দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দরকার সে কাজের উপযোগী ভক্তি ও প্রতিভাই-বা সমকালীন কোন সাধকের আছে?

এসব নানা চিন্তায় আচার্যের অন্তর আলোড়িত হয়। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রঙ্গনাথজীর চরণে দিনের পর দিন নিবেদন করেন, "প্রভু, ভক্ত নিয়েই তোমার সংসার, দেখো ভক্তিধৃত শ্রীসম্প্রদায় যেন তোমার কৃপা হতে বঞ্চিত হয় না। ভক্তি, প্রপত্তি ও দাস্যভাবের মাহাত্ম্য প্রকটিত হোক, এই যে আমার অন্তরের একমাত্র আকুতি।"

কিছুদিনের মধ্যেই প্রভু বরদরাজের অন্তরঙ্গ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের সহিত শ্রীরঙ্গম মন্দিরে

১ ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ২য় খণ্ড স্বামী বিদ্যারণ্য, (প্রাচ্যবাণী মন্দির)

২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ১ম ভাগ।

যামুনাচার্যের দেখা। কথাপ্রসঙ্গে কাঞ্চীপূর্ণ কহিলেন, "আচার্যবর শাঙ্কর বেদান্তী যাদবপ্রকাশের কৃতী ছাত্র লক্ষ্মণের কথা আমি আপনাকে বলতে চাই। অদ্বৈত সিদ্ধান্তে সে পারঙ্গম, কিন্তু কি বিস্ময়কর ভক্তি ও সংস্কার নিয়ে সে জন্মেছে। তেমনি রয়েছে অমানুষী প্রতিভা। বেদান্তের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে দিনরাত রয়েছে সে মগ্ন হয়ে। লক্ষ্মণকে আমি তার বাল্যকাল থেকে জানি, যৌবনেও তাকে দেখছি অন্তরঙ্গভাবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই আচার্য, বরদরাজের সে কৃপাপ্রাপ্ত, ভক্তি আন্দোলনের সে এক চিহ্নিত নায়ক।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলেন যামুনাচার্য, "কাঞ্চীপূর্ণ, প্রভু রঙ্গনাথজীর চরণে বার বার মিনতি জানিয়েছি আমি শ্রীসম্প্রদায়ের একটি উপযুক্ত ভাবী নেতার জন্য। আশা হচ্ছে, প্রভুর কৃপাপ্রসাদ আমরা পেয়ে গিয়েছি। তোমার আজকের সুসংবাদে আমি পরম আনন্দিত।"

কাঞ্চীপূর্ণ আরো জানান, "আচার্য, অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের সঙ্গে লক্ষ্মণের বার বার মতদ্বৈধ ঘটেছে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে। আমার মনে হয়, উভয়ের ছাড়াছাড়ি হবার আর বেশী দেরি নেই।"

যামুন বলিলেন, "অতি উত্তম কথা। কাঞ্চীপূর্ণ, কিছুদিন যাবৎ আমি ভাবছি, কাঞ্চীতে গিয়ে প্রভু বরদরাজকে একবার দর্শন ক'রে আসবো।"

"আচার্য। সেই সুযোগে আমরা কাঞ্চীর ভক্তেরা, আপনাকে নিয়ে আনন্দ করতে পারবো।" সোৎসাহে বলে উঠেন কাঞ্চীপূর্ণ।

যামুনাচার্য সেদিন বরদরাজ বিগ্রহ দর্শনে আসিয়াছেন। স্নান তর্পণ ও পূজাদি সমাপ্ত হইয়াছে। অন্তর তাঁহার দিব্য আবেশে ভরপুর। এবার কাঞ্চীপূর্ণ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নিয়া ফিরিয়া চলেন নিজের আবাসে।

ভাবমত্ত অবস্থায় ধীরে ধীরে পথ চলিতেছেন, হঠাৎ কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে বলিয়া উঠেন, "আচার্য, দেখুন দেখুন, বেদান্তকেশরী যাদবপ্রকাশ এদিকে এগিয়ে আসছেন, সঙ্গে রয়েছে তাঁর কৃতী শিষ্যদল। আমাদের প্রিয়ভাজন ভক্তপ্রবর লক্ষ্মণও রয়েছেন তাঁর সঙ্গে।

যামুনাচার্য রাস্তার একপাশে সরিয়া দাঁড়ান। অদূরে অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ তাঁহার ছাত্রদল নিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন, আর তাঁহার হাতটি ন্যস্ত রহিয়াছে লক্ষ্মণের স্কন্ধদেশে।

মহাপুরুষ যামুনাচার্য একদৃষ্টে ভাবময় নেত্রে চাহিয়া আছেন লক্ষ্মণের দিকে। আচার্যের চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে প্রসন্ন মধুর হাসির আভা।

কাঞ্চীপূর্ণ হর্ষভরে বলেন, "আচার্য, আপনি অনুমতি দিলে লক্ষ্মণকে আমি ডেকে নিয়ে আসি, আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে সে ধন্য হোক।"

"না কাঞ্চীপূর্ণ, তার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মণকে আমি আশীর্বাদ ইতিমধ্যেই করেছি। তাঁর ভেতরে পরাভক্তির উন্মেষের জন্য আমার দৃষ্টি দিয়েই করেছি শক্তিপাত। এই লক্ষ্মণই যে শ্রীসম্প্রদায়ের ভাবী নায়ক, একথা আজ আমি জেনেছি অভ্রান্তভাবে। অযথা তার সঙ্গে এসময়ে বাক্যালাপ করলে অদ্বৈত বেদান্তী যাদবপ্রকাশের সঙ্গে নূতন ক'রে এখানে তর্কযুদ্ধ হবে, আমার অন্তরের প্রসন্নমধুর ভাবটি নষ্ট হবে। শ্রীবরদরাজের দর্শন অভীষ্ট ফল আমি হাতে হাতে এখানে পেয়ে গেছি।"

উত্তরকালে যাদবপ্রকাশের ঐ প্রতিভাদীপ্ত প্রধান ছাত্রেরই অভ্যুদয় ঘটে আচার্য

রামানুজরূপে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রখ্যাত প্রবক্তারূপে। ভারতের দার্শনিকসমাজে গ্রহণ করেন তিনি কালজয়ী আসন।

শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়াছেন যামুনাচার্য। কিন্তু হৃদয়ে তাঁহার জাগিয়া রহিয়াছে ভক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মণের লাবণ্যময় রূপ। পবিত্রতা, তেজস্বিতা আর বিষ্ণুভক্তির যে দিব্য আভা আচার্য তাঁহার আননে দেখিয়া আসিয়াছেন, আর তাহা ভুলিতে পারেন কই?

লক্ষ্মণের সাধনপ্রস্তুতি যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে, অচিরে যাহাতে সে শ্রীসম্প্রদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে—এই প্রার্থনাটি যামুন আকুল অন্তরে নিবেদন করেন পরমপ্রভুর চরণে। লক্ষ্মণকে একান্তভাবে নিজজন রূপে প্রাপ্ত হইবেন, এই উদ্দেশ্যে এ সময়ে এক স্তোত্রও তিনি রচনা করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যে এই স্তোত্রটি আজো স্মরণীয় হইয়া আছে।

অল্পদিনের ব্যবধানে শ্রীরঙ্গমে বসিয়া আর এক শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হন যামুনাচার্য। সম্প্রতি লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার গুরু যাদবপ্রকাশের তীব্র মতভেদ দেখা দিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে ঘটিয়াছে বিচ্ছেদ।

পরম ভক্ত প্রবীণ আড়ম্বর সাধক কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি লক্ষ্মণ চিরদিনই অতিশয় শ্রদ্ধাবান্। এবার তিনি এই সিদ্ধ মহাত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারই নির্দেশ-মতো করিতেছেন সাধন-ভজন, শ্রীবরদরাজের সেবা-অর্চনা ও শাস্ত্রপাঠ।

লক্ষ্মণের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধ মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। মহাত্মা বার বার কেবলই তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতেছেন।

যতবারই কাঞ্চীপূর্ণকে লক্ষ্মণ চাপিয়া ধরেন, তিনি বলেন, "বৎস, আমি প্রভু বরদরাজের কাঙাল ভক্ত। তাছাড়া, আমি যে জাতে শূদ্র, তোমার মতো পবিত্রদেহ ব্রাহ্মণকে আমি দীক্ষা দেব কি ক'রে? সর্বোপরি কথা প্রভুর কাছ থেকে আমি জেনেছি, তোমার গুরুকরণ হবে অন্যত্র। এবং তার দেরী দেরি নেই।"

তবুও লক্ষ্মণ কিন্তু মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকেই জ্ঞান করেন গুরুরূপে, ত্রাতারূপে। তাঁহারই নির্দেশমতো নিত্যকার সাধনভজন করেন. পবিত্র শালকূপ হইতে জল বহিয়া আনিয়া স্নান করান বরদরাজ শ্রীবিগ্রহকে। এই বিগ্রহের অর্চনা ও ধ্যান জপে তন্ময় হইয়া থাকেন।

এদিকে বৃদ্ধ যামুনাচার্য শ্রীরঙ্গমের মঠে গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। নিজে স্পষ্টতই বুঝিয়া নিয়াছেন, শেষের দিনের আর বেশী দেরি নাই। এবার প্রধান ও অন্তরঙ্গ ভক্ত মহাপূর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার বিদায়ের লগ্ন প্রায় সমাগত। এ সময়ে শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তিবাদের, ভবিষ্যৎ ভেবে ব্যাকুল হ'য়েছি। বাচস্পতি মিশ্রের অভ্যুদয় ঘটেছে, শাঙ্কর মত তিনি নিপুণভাবে প্রপঞ্চিত করেছেন। এর বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আর কতদিন যুঝতে পারবে, টিকে থাকতে পারবে?"

"আপনার নির্দেশের দিকেই তো আমরা চেয়ে আছি মহাত্মন্"—উত্তরে বলেন মহাপূর্ণ।

"ভাবছি কেবল ভক্তশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের কথা। শুনেছো বোধহয়, যাদবপ্রকাশের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ সে ছিন্ন করেছে, আশ্রয় নিয়েছে কাঞ্চীপূর্ণের কাছে। শ্রীবরদরাজের সেবায়

করছে সে দিন যাপন। তুমি শিগ্‌গীর কাঞ্চীতে চলে যাও। তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো শ্রীরঙ্গমে। দেহান্ত হবার আগে আমার মনের সংকল্প ক'টি তার কাছে বলে যেতে চাই।"

আশ্বাস দিয়া মহাপূর্ণ বলেন, "আচার্যবর আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি কাঞ্চীতে। কালবিলম্ব না ক'রে লক্ষ্মণকে আপনার কাছে উপস্থিত করছি।"

কাঞ্চীতে পৌঁছিয়াই প্রভু বরদরাজের মন্দিরে প্রণাম নিবেদন করিতে গেলেন মহাপূর্ণ। সেখানে ভক্তদের কাছে শুনিলেন, শ্রীবরদরাজের স্নান অভিষেক সম্পন্ন করানো লক্ষ্মণের নিত্যকার প্রধান সেবাকর্ম—আর দেরি নাই, এখনি তিনি সেখানে আসিয়া পড়িবেন।

মহাপূর্ণ আর ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। পথের দিকে একটু অগ্রসর হইতে দেখিলেন, লক্ষ্মণ ধীরপদে মন্দিরের দিকে আসিতেছেন, মুখে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছেন বিষ্ণুর স্তবস্তুতি আর মাথায় বহিয়া আনিতেছেন পবিত্র জলের বৃহৎ ভাণ্ড।

নিকটে গিয়া প্রসন্নমধুর কণ্ঠে মহাপূর্ণ গাইয়া উঠিলেন যামুনাচার্যের রচিত এক অপূর্ব স্তোত্র। এ স্তোত্রের ভাব ভাষা ও মধুর ঝঙ্কার লক্ষ্মণের অন্তরে জাগাইয়া তোলে দিব্য উন্মাদনা। সাশ্রুনয়নে প্রশ্ন করেন, "মহাত্মন্, এ অমিয়মাখা স্তোত্র কোথায় পেলেন আপনি, শ্রীবিষ্ণুর কৃপাধন্য কোন মহাপুরুষের রচনা এটি, দয়া ক'রে আমায় বলুন।"

"এ যে আমার প্রভু যামুনাচার্যের রচনা। শ্রীসম্প্রদায়ের সেই মধ্যমণি ছাড়া আর কার হৃদয়ে হবে এমনতর দিব্য জ্যোতির বিচ্ছুরণ? আর কে পরিবেশন করবে এমন অমৃত?"

"রঙ্গনাথজীর প্রিয়তম সেবক, মহাত্মা যামুনাচার্যের চরণ দর্শনের অভিলাষ আমার অনেক দিন থেকে। ভাগ্যহীন আমি, তাই বঞ্চিত রয়েছি এতদিন। আপনি তাঁর নিজজন, কৃপা ক'রে আমায় নিয়ে যাবেন তাঁর আশ্রয়ে?"

"বৎস, আমি যে আচার্য প্রভু যামুনের কাছ থেকেই এসেছি তোমার কাছে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি ব্যাকুল, তোমার পথ চেয়েই যে রয়েছেন। তাছাড়া, তিনি এখন অন্তিম শয়নে শায়িত। বৎস, তাঁর দর্শন যদি পেতে চাও, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব ক'রো না।"

ক্রমাগত চারদিন পথ চলার পর দেখা গেল প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির। কাবেরীর অপর তীরে পৌঁছিয়াই উভয়ে হইলেন বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত। দাক্ষিণী বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠপুরুষ যামুনাচার্য আর ইহজগতে নাই। সহস্র সহস্র শোকার্ত নরনারী তাঁহার নরদেহটি বেষ্টন করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, আর মঠের ভক্ত শিষ্যেরা রত রহিয়াছে তাঁহার শেষকৃত্যের কাজে।

আচার্যের চন্দনলিপ্ত, পুষ্প শোভিত দেহের সম্মুখে লক্ষ্মণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইতেই লক্ষ্য পড়িল তাঁহার হস্তের দিকে। দেখিলেন, তিনটা অঙ্গুলি তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সেবকদের দিকে তাকাইতেই তাঁহারা কহিলেন, "তিনটি সংকল্প সিদ্ধির বিষয়ে আচার্য প্রভু অন্তিম শয্যায় বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তারই চিহ্ন রয়ে গিয়েছে ঐ বদ্ধ অঙ্গুলি তিনটিতে।"

একথার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ভক্তপ্রবর লক্ষ্মণ এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ আবেশের মধ্যেই, অর্ধবাহ্য অবস্থায় তিনি উচ্চারণ করিলেন ক্রমান্বয়ে তিনটি সংকল্প বাণী। কহিলেন, 'বিষ্ণুভক্তিময় দ্রাবিড় বেদের প্রচার করবো আমি, জ্ঞানহীন জনগণের মধ্যে বিতরণ করবো সেই ভক্তির সুধা। লোকরক্ষার ব্রত নিয়ে আমি রচনা করবো তত্ত্বজ্ঞানময় শ্রীভাষ্য। আর পুরাণরত্ন বিষ্ণু পুরাণের রচয়িতা পরাশর মুনির নামে চিহ্নিত ক'রে আমি গড়ে তুলবো ভক্তিবাদের এক শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতাকে।"

অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যেরা লক্ষ্য করিলেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। ঐ সংকল্প বাণীর একটি উচ্চারিত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোন্ এক অদৃশ্য পুরুষের অলৌকিক শক্তির ইঙ্গিতে একে একে খুলিয়া যাইতেছে প্রাণহীন যামুনাচার্যের তিনটি বদ্ধ অঙ্গুলি।

সকলেই উপলব্ধি করিলেন, ভক্তপ্রবর লক্ষ্মণই যামুনাচার্যের সেই ভাবী উত্তরাধিকারী, ঈশ্বরের চিহ্নিত সেই মহানায়ক যিনি এবার গ্রহণ করিবেন শ্রীসম্প্রদায়ের নেতৃত্বভার।

দেখা গেল দেহান্তের পরও আচার্য যামুন নিজের সংকল্পে রহিয়াছেন অবিচল, আর ঐশ বিধানের অমোঘতার তত্ত্বটিও তিনি এই সময় ইঙ্গিতে ভক্তদের সবাইকে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন।

শেষকৃত্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাবেরীর বিশাল তটভূমি মুখর হইয়া উঠে সহস্র কণ্ঠের স্তবগানে। তারপর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ভাঙিয়া পড়েন শোকার্ত কান্নায়।

জাগ্রত বিগ্রহ শ্রীরঙ্গনাথের শ্রেষ্ঠ কিঙ্কররূপে এতদিন শ্রীরঙ্গমে বিরাজিত ছিলেন যামুনাচার্য। দক্ষিণী ভক্তিবাদের ছিলেন এক চিরভাস্বর আলোকস্তম্ভ, আজ সেই স্তম্ভটির ঘটিল শোকাবহ তিরোধান।

গোস্বামী লোকনাথ

প্রেমভক্তিধর্মের এক শক্তিধর নায়করূপে শ্রীগৌরাঙ্গ সবেমাত্র নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈষ্ণবসাধক ও ভক্ত নরনারী দলে দলে শরণ নিতেছেন তাঁর চরণতলে। বর্ষীয়ান্ সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবনেতা অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, অবধূত নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে একে একে তিনি করিয়াছেন আত্মসাৎ।

শ্রীবাসের কীর্তনের অঙ্গন প্রভু এবং তাঁহার রসজ্ঞ পরিকরদের মিলন স্বর্গ। এই স্বর্গে নিত্য নূতন উদ্‌ঘাটিত হইতেছে লীলানাট্য, আর রসবিলাসের বৈচিত্র্য। প্রকাশিত হইতেছে তাঁহার চমকপ্রদ ভগবত্তা-ভাব।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ কীর্তিত ছিল ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-কেন্দ্ররূপে। উচ্চতর টোল ও চতুষ্পাঠীগুলিতে বিরাজ করিতেন দিক্‌পাল পণ্ডিত, তার্কিক ও দার্শনিকেরা। শতশত প্রতিভাধর ছাত্র ইঁহাদের সান্নিধ্যে থাকিয়া গ্রহণ করিত নব্যন্যায়, স্মৃতি ও বেদ-বেদান্তের পাঠ। প্রাচ্যের এই অক্সফোর্ডে আসিয়া জড়ো হইত সমকালীন ভারতের পণ্ডিত পড়ুয়ারা। তাই তখনকার দিনে নবদ্বীপের সারস্বত জীবনের যে কোনো তরঙ্গ, যে কোনো তর্ক বিচার, যে কোনো ধর্ম সংস্কৃতির আন্দোলন, অচিরে ছড়াইয়া পড়িত দেশের সর্বত্র এবং সমাজজীবনের সর্বস্তরে।

শ্রীগৌরাঙ্গের নূতন প্রেমধর্মের জোয়ার তখন ঢেউ তুলিয়াছিল দেশের দিগ্‌বিদিকে। সুদূর উত্তর বাংলার তালখড়ি গ্রামেও এ ঢেউ সেদিন পৌঁছিয়া গিয়াছিল।

তালখড়ি চতুষ্পাঠীর তরুণ পণ্ডিত লোকনাথ চক্রবর্তী লোকমুখে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব কাহিনী শুনিলেন, শুনিয়া হৃদয় তাঁহার অপার আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এই গৌরাঙ্গ যে তাঁহারই প্রিয় বন্ধু বিশ্বম্ভর মিশ্র, উভয়েই তাঁহারা প্রায় সমবয়সী। লোকনাথ যখন আচার্য অদ্বৈতের কাছে ভাগবত অধ্যয়নে রত, বিশ্বম্ভর তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পাঠ করেন, উভয়ের মধ্যে কত ঘনিষ্ঠতা, কত হৃদ্যতাই না ছিল। সেই বিশ্বম্ভর আজ আবির্ভূত হইয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মহানায়করূপে, শ্রেষ্ঠ সাধকেরা তাঁহাকে জ্ঞান করিতেছেন ভগবানরূপে। এই জন্যই তো লোকনাথের আনন্দের অবধি নাই।

বিষয়-বিরক্ত, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবসাধক, লোকনাথ পণ্ডিত নিজের সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। সংসার হইতে চিরবিদায় নিয়া উপনীত হইলেন নবদ্বীপে।

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ ভবনের অলিন্দে বসিয়া আছেন। গঙ্গাধর, মুরারি, শ্রীবাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সম্মুখে উপবিষ্ট। প্রভু ভাবাবেশে মত্ত হইয়া কখনো কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, কখনো বা কৃষ্ণবিরহের আর্তিতে হইতেছেন মুহ্যমান। এক এক সময়ে তাঁহাকে দেখা যাইতেছে অতিশয় চিন্তাকুল, গম্ভীরবদন।

সন্ন্যাস নিবার সংকল্প প্রভু ইতিমধ্যে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। অন্তরঙ্গ কয়েকজন ভক্তকে বুঝাইয়াছেন, কৃষ্ণের বিরহে উন্মত্ত হইয়া তিনি নিজে ঘরসংসার ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণের জন্য লোকে ব্যাকুল হইবে কেন? সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী না হইলে বিষয়ী লোকে তাঁহার কথা শুনিতে চাহিবে কেন? তাই মাঝে মাঝে প্রভুকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া

ভক্তদের প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে। বিষণ্ণ অন্তরে ভাবিতেছেন, হয়তো আসন্ন বিচ্ছেদের আর দেরি নাই।

এমনি সময়ে দীর্ঘ পথ পরিব্রাজনের পর শ্রান্ত ক্লান্তদেহে ভক্তপ্রবর লোকনাথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ছিন্ন তরুর মতো, বিরহখিন্ন লোকনাথ লুটাইয়া পড়েন প্রভুর পদতলে।

বাহু প্রসারিয়া প্রভু তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দিলেন। প্রাণ তাঁহার পরম আনন্দে উচ্ছলিত। কৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্ত লোকনাথের হৃদয়ে জাগিয়াছে কৃষ্ণপ্রেমের আর্তি, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাই সে ছুটিয়া আসিয়াছে তাঁহার কাছে।

বার বার শ্রীগৌরাঙ্গ গদ্‌গদ স্বরে বলিতে থাকেন, "লোকনাথ, আমার প্রাণের লোকনাথ, তুমি এসে গিয়েছো ! আহা, কৃষ্ণের কি কৃপা। হারানো বন্ধুকে আজ আবার আমি ফিরে পেলাম।"

নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া প্রভু এবার শুরু করেন তাঁহার নর্তন কীর্তন। প্রভুর দিব্য-লাবণ্যময় রূপ, ভাবের প্রমত্ততা, আর ঘন ঘন সাত্ত্বিক প্রেমবিকার দর্শনে লোকনাথ আনন্দে একেবারে আত্মহারা। বহুদিনের সুখস্বপ্ন আজ তাঁহার সফল। কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের মধুময় সান্নিধ্যে এবার তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দিব্যপ্রেমে হইয়াছেন ভরপুর। লোকনাথের নয়ন মন প্রাণ আজ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

গভীর রাত্রে কীর্তন, কৃষ্ণকথা এবং ইষ্টগোষ্ঠী শেষ হইল। প্রভু কহিলেন, "লোকনাথ বহুদূর থেকে পদব্রজে তুমি এসেছো, পথশ্রান্ত তুমি। আজ গৃহে গিয়ে বিশ্রাম নাও। কাল প্রভাতে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। অন্তরঙ্গ কথা, প্রাণের গোপন কথা, তোমায় তখন বলবো। লোকনাথ, কৃষ্ণের কি অপার মহিমা, তোমার মত বন্ধুর সঙ্গে আবার আমার মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণের কাজে তোমায় দিয়ে আমার বড় প্রয়োজন। কাল তোমায় সব খুলে বলবো।"

প্রভুর এই স্নেহপূর্ণ বাণী শোনার পর ঘরে গিয়ে লোকনাথ সারা রাত আর ঘুমাইতে পারেন নাই। অনির্বচনীয় আনন্দে চিত্ত তাঁহার উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। প্রভুর স্নেহপূর্ণ কথা কয়টির অনুরণন চলিতেছে তাঁহার অন্তরে।

রাত্রি প্রভাত হইতেই লোকনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে গিয়া উপস্থিত হন। চরণ বন্দনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়ান, প্রভু তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন সস্নেহ আলিঙ্গনে। প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, লোকনাথ তুমি মহাভাগ্যবান্। কৃষ্ণের কর্মে অবিলম্বে তোমায় নিযুক্ত হতে হবে। নবদ্বীপে আর তোমার থাকার আবশ্যক নেই, তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও। কৃষ্ণের প্রেম-মাধুর্যে মণ্ডিত লীলাস্থলীগুলো আজো লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছে। বহু বৎসরের ব্যবধানে সেইসব পুণ্যস্থল হয়েছে অরণ্যে পরিণত। তুমি এগুলো উদ্ধারের ভার নাও। এখন থেকে তপস্যা আর কৃষ্ণলীলা-তীর্থের উদ্ধার এই দুটি হোক তোমার নিত্যকার পবিত্র কর্ম।"

লোকনাথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। এ কি নিষ্ঠুর কথা কহিতেছেন গৌরসুন্দর। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, বড় আশা ক'রে, ঘরসংসার ছেড়ে দিয়ে নবদ্বীপে এসেছি, তোমার ভুবনমোহন লীলা দর্শন করবো, আর ভিখিরির মতো পড়ে থাকবো একধারে। আর তুমি আমার সে আশায় এমন ক'রে বাজ হানছো ? তোমার দর্শনলাভের পরই

এমন ক'রে কেন আমায় দূরে ঠেলে দিচ্ছো ? আমার কোন্ দোষে এমন নির্মম হলে তুমি।"

"আমি নির্মম কোথায় লোকনাথ ? তোমায় যে কৃষ্ণের কর্মের ভার দিয়েছি, এছাড়া বৈষ্ণবের আর কি ঈপ্সিত বস্তু থাকতে পারে, বলতো ?"

"না প্রভু, তুমি যাই বলো, আমি বুঝতে পারছি, তোমার বিশাল হৃদয়ে নগণ্য লোকনাথের জন্য এতটুকু স্থানও নেই। তাই তাকে এমনভাবে করছো অপসারিত।"

প্রভু উত্তরে বলেন, "লোকনাথ, বৃন্দাবনই যে আমার হৃদয়। সেই বৃন্দাবনেই তো আমি তোমায় স্থাপন করছি স্থায়িভাবে। কৃষ্ণ বলেছেন, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। সেই বৃন্দাবনে চিরদিন কৃষ্ণসঙ্গী হয়ে কৃষ্ণধ্যানে বিভোর হয়ে, তুমি থাকবে। একি কম সৌভাগ্যের কথা ? লোকনাথ যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর বৃন্দাবন-লীলা তোমার উপজীব্য, সেই বৃন্দাবনেই তোমায় পাঠাচ্ছি।"

"প্রভু, এত কঠিন হয়ো না তুমি। আমায় এ সময় দূর ক'রে দিয়ো না।" ক্রন্দন করিয়া বলে লোকনাথ।

প্রভু আবার প্রবোধ দিয়া বলেন, "আমার কথা মন দিয়ে শোনো লোকনাথ। নিত্য-বৃন্দাবন সিদ্ধ বৈষ্ণবের আস্বাদ্য, সবার জন্যে তো নয়। কিন্তু ভৌম বৃন্দাবন আস্বাদ্য সকল ভক্ত নরনারীর। আমি চাই ভৌম বৃন্দাবনকে তোমার সাধনা ও কর্ম দিয়ে জাগিয়ে তোল, তার দুয়ার উন্মোচন ক'রে দাও ভক্ত ও পাষণ্ডী সবারই জন্য। ভেবো না লোকনাথ, বৃন্দাবনে আমি যাবো, আর যাবে আমার প্রাণপ্রিয় ভক্তেরা। সবাই মিলে প্রকটিত করবো কৃষ্ণলীলার পবিত্র পীঠস্থানগুলি। লীলা মাহাত্ম্যের প্রচার ক'রে জীবন করবো সফল।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রভু বৃন্দাবন বাসের নির্দিষ্ট স্থান এবং দিনচর্চার ইঙ্গিতও দিয়া দিলেন। এসম্পর্কে ভক্ত নিত্যানন্দ দাস তাঁহার রচিত প্রেমবিলাস-এ লিখিয়াছেন ঃ

চীরঘাট রাসস্থলী কদম্বের সারি।
তার পূর্ব পাশে কুঞ্জ পরম মাধুরি॥
তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে।
বাস করে সেই স্থানে সুখ পাবে মনে॥
রাসস্থলী বংশীবট নিধুবন স্থান।
ধীর সমীরণ মধ্যে করিবে বিশ্রাম॥
যমুনাতে স্নান কর অযাচক ভিক্ষা।
ভজন স্মরণ কর জীবে দেহ দীক্ষা॥

প্রভুর দর্শন ও কৃপালাভের পরই এই বিচ্ছেদ বিরহের চিন্তা অসহনীয়। অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া প্রাণপ্রিয় প্রভু নবদ্বীপে আনন্দের মেলা বসাইয়া দিয়াছেন, উৎসারিত করিতেছেন প্রেমভক্তিরসের দুর্লভ প্রবাহ। এসব ছাড়িয়া নির্জন অরণ্যসঙ্কুল বৃন্দাবনে কি করিয়া দিন অতিবাহিত করিবেন, লোকনাথ ভাবিয়া পান না। এই সঙ্গে প্রভুর আজ্ঞার কথা এবং কৃষ্ণলীলাস্থল উদ্ধারের ঐশ্বরীয় ব্রত উদ্‌যাপনের গুরুত্বও বিস্মৃত হওয়া যায় না। বৃন্দাবনে বাস করিতে অবশ্যই তিনি যাইবেন। কিন্তু প্রভুর পুণ্যময় দর্শন ও সঙ্গ যে তাহার আরো কিছুদিন চাই।

সজল নয়নে প্রভুর নিকট ভিক্ষা করিলেন আর কয়েকটি দিনের মধুময় সান্নিধ্য।

প্রভু সম্মত হইলেন। পাঁচদিন নবদ্বীপের প্রেমলীলা প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলেন লোকনাথ, তারপর রওনা হইলেন বৃন্দাবনধামে। এ জীবনে প্রভুর সঙ্গে আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রভুর আদিষ্ট ঐশ কর্মের উদ্‌যাপন এবং প্রভুর নির্দেশিত পন্থায় কৃষ্ণ ভজন হইয়াছিল তাঁহার দীর্ঘ জীবনের উপজীব্য।

লোকনাথের বৃন্দাবন যাত্রার কথাবার্তা যখন চলিতেছে, গদাধর পণ্ডিতের নবীন শিষ্য ভূগর্ভ তখন কাছেই ছিলেন দণ্ডায়মান। বৃন্দাবনে গিয়া সাধনভজন করিবেন, এই ইচ্ছাটি তাঁহার মনে বহুদিন যাবৎ প্রচ্ছন্ন ছিল। ভূগর্ভ দেখিলেন, তাহার পক্ষে এ এক পরম সুযোগ। কহিলেন, "প্রভু, আপনার আজ্ঞা যদি মিলে, তবে আমিও পণ্ডিত লোকনাথের সঙ্গী হয়ে বৃন্দাবনে যেতে পারি। তাঁর পার্শ্বচর হয়ে আপনার মনোমতো কার্য এ অধম কিছুটা সম্পন্ন করতে পারবে। সে হবে আমার পরম সৌভাগ্য।"

সহায়সম্পদহীন অবস্থায় বৃন্দাবনে গমনের পর লোকনাথের একটি সঙ্গী থাকিবে এতো অতি উত্তম কথা। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ তাই মহাআনন্দিত। সোৎসাহে ভূগর্ভকে লোকনাথের সহযাত্রী হইবার অনুমতি দিলেন, প্রভুর অনুমতির পর গদাধর পণ্ডিতেরও কোনো আপত্তি রহিল না। ত্বরায় উভয়কে প্রভু রওনা করিয়া দিলেন তাঁহার আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপনের জন্য।

ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনরঙ্গে গৌরাঙ্গপ্রভু প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন, সাত্ত্বিক প্রেম-বিকারের ফলে হারাইয়া ফেলিতেন বাহ্যজ্ঞান। আবার দিব্যভাবেও প্রায়ই থাকিতেন আবিষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রেরিত পুরুষরূপে ঐশ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে তিনি আসিয়াছেন, যে কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন, শত ভাবাবেশ বা প্রমত্ততার মধ্যেও সে লক্ষ্য ও সে দায়িত্ব তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহা হইতে এতটুকুও বিচ্যুত হন নাই।

আচার্য অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতির সহায়তায় প্রভু নবদ্বীপে তুলিয়াছেন বৈষ্ণব আন্দোলনের বিপুল ভাবতরঙ্গ।

অবধূত নিত্যানন্দকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে গৃহী করিয়াছেন এবং ব্রতী করিয়াছেন বাংলার বৈষ্ণবীয় সংগঠনের কাজে।

আর বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ, রায় রামানন্দ এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের মাধ্যমে দৃঢ়মূল করিয়া তুলিয়াছেন উড়িষ্যার ভক্তি আন্দোলন।

সর্বশেষে তিনি লোকনাথ, রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরূপে বসাইয়া দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন নবযুগের বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের ভক্তিসাম্রাজ্যের পত্তন ও প্রসার হইয়াছে ঐ গোস্বামীদের তপস্যা ও কর্মে। ইহার ফলে ভৌম বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাস্থলের উদ্ধার যেমন সম্ভব হইয়াছে, তেমনি বৃন্দাবনের পবিত্রতা ও মাধুর্য প্রতিফলিত হইয়াছে সারা ভারতের জনমানসে।

ঐশ্বরীয় কর্ম প্রভু অপূর্ব দূরদর্শিতার সহিত নিষ্পন্ন করিতেন, এবং ঐ কর্মসূচীর প্রতিটি ধাপের প্রতি সতত নিবদ্ধ থাকিত তাঁহার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি।

প্রিয় সুহৃদ্ ও প্রিয় ভক্ত লোকনাথকে সুদূর বৃন্দাবনে পাঠানোর সিদ্ধান্তের পিছনেও ছিল সেই দূরদর্শিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি।

বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাস্থলীর পুনরুদ্ধার কর্মে গোস্বামী লোকনাথ ছিলেন প্রথম পথিকৃৎ। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় দুর্গম অরণ্যে শুরু হইয়াছিল সহস্র ভক্তের সমাগম।

উত্তরকালে রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি প্রতিভাধর গোস্বামীরা প্রেমধর্মের প্রাণকেন্দ্র বৃন্দাবনে গৌড়ীয় ধর্ম সংস্কৃতির যে বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন, লোকনাথই প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিভূমি।

কঠোর বৈরাগ্য, কৃষ্ণময় তপস্যা এবং বিগ্রহসেবার অনন্য নিষ্ঠা নিয়া কাঙাল বৈষ্ণব সাধকের যে জ্বলন্ত মূর্তি নিজ জীবনে তিনি দেখাইয়া যান, দীর্ঘদিন তাহা গৌড়ীয় গোস্বামী ও সাধককুলের কাছে ছিল স্মরণীয়।

আরও একটি বিশিষ্ট অবদান ছিল লোকনাথ গোস্বামীর। উত্তরকালের গৌড়ীয় ধর্মের অন্যতম প্রাণপুরুষ নরোত্তমের তিনি ছিলেন দীক্ষাগুরু। সদা আত্মগোপনশীল মহাবৈরাগী লোকনাথকে তিতিক্ষাপরায়ণ সাধক নরোত্তম যেভাবে তাঁহার দীক্ষাগুরুরূপে লোকলোচনের সম্মুখে আনয়ন করেন, আজো গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে তাহার স্মৃতি অম্লান রহিয়াছে।

গোস্বামী লোকনাথের জন্ম হয় আনুমানিক ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে। পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্তী, মাতা সীতাদেবী।

পদ্মনাভ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। যৌবনে নবদ্বীপে থাকিয়া তিনি বিদ্যা অর্জন করেন এবং বৈষ্ণব আচার্য শ্রীঅদ্বৈতের নিকট বৈষ্ণবীয় ধর্মে দীক্ষালাভ করেন। গৃহে ফিরিয়া পদ্মনাভ এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন, দেশের সে অঞ্চলে সুপণ্ডিত আচার্য এবং ভক্তিমান্ সাধক বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। লোকনাথ গোস্বামী তাঁহার তৃতীয় সন্তান।

বালক বয়সে লোকনাথ পিতার চতুষ্পাঠীতেই শিক্ষা লাভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাঁহার সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন নবদ্বীপে। এস্থানে আসিয়া লোকনাথ শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন এবং পিতার আদেশে তাঁহার গুরু অদ্বৈত আচার্যের কাছে শুরু করেন ভাগবত পাঠ। অদ্বৈতের পাঠচক্র ও কীর্তনসভায় তাঁহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন গদাধর। অদ্বৈতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও বৈষ্ণবসাধনার প্রভাবে পড়িয়া লোকনাথ কৃষ্ণভজনে ও কৃষ্ণতত্ত্ব অধ্যয়নে উৎসাহী হইয়া উঠেন।

অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে লোকনাথ ভাগবতের তত্ত্বে অধিকার লাভ করেন। কৃষ্ণ আরাধনা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগিয়া উঠে দুর্নিবারভাবে। এসময়ে আচার্য অদ্বৈত এই স্নেহভাজন তরুণকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই দীক্ষার পর হইতেই লোকনাথের অন্তর্জীবনে আসে দূরপ্রসারী পরিবর্তন। প্রেমভক্তির রস উপজিত হয় তাঁহার সাধনসত্তায়, তত্ত্বানুসন্ধান ও সাধনভজনে তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন।

নবদ্বীপের ছাত্রজীবনেই লোকনাথ তরুণ বিশ্বম্ভরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। উভয়েই ছিলেন প্রায় সমবয়সী এবং শুদ্ধসত্ত্ব, তাই অচিরে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে অচ্ছেদ্য সখ্যতার বন্ধন।

নবদ্বীপের পাঠ সাঙ্গ হইলে লোকনাথ যশোহরে স্বগ্রাম তালখড়িতে ফিরিয়া যান, চতুষ্পাঠী খুলিয়া শুরু করেন অধ্যাপক বৃত্তি। সুপণ্ডিত অধ্যাপক এবং কৃষ্ণভক্ত আচার্যরূপে ধীরে ধীরে সে অঞ্চলে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে।

জনশ্রুতি আছে, এসময়ে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর, উত্তরকালের শ্রীচৈতন্য-প্রভু, একবার

তালখড়িতে আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত হিসাবে বিশ্বম্ভর তখন পূর্ববাংলার কয়েকটি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

নবদ্বীপ হইতে বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের আগমনের কথা শুনিয়া লোকনাথের পিতা পদ্মনাভ গ্রামের উপান্তে গিয়া উপস্থিত হন, নবীন পণ্ডিতকে আতিথ্য গ্রহণ করান তাঁহার গৃহে। প্রাক্তন সুহৃদ্ এবং নবদ্বীপের প্রতিভাধর নবীন পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের আগমনে লোকনাথের আনন্দ আর ধরে না। ছাত্রজীবনের কথা নবদ্বীপের পুরাতন কথা প্রভৃতি আলোচনায় উভয়ে মত্ত হইয়া পড়েন।

এই সাক্ষাতের কয়েক বৎসর পরেই বিশ্বম্ভরের জীবনে ঘটে বিরাট রূপান্তর। তীক্ষ্ণধী, বিদ্যাদর্পী, নবীন পণ্ডিত পরিণত হন এক নূতন মানুষে। নূতন প্রেমভক্তি আন্দোলনের মহানায়করূপে নবদ্বীপের সাধক ও পণ্ডিতসমাজে সৃষ্টি করেন তিনি বিরাট চাঞ্চল্যের। অচিরে অগণিত বৈষ্ণব ভক্তের দিগ্‌দিশারী ও আশ্রয়-দাতারূপে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন।

এই সময়েই লোকনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনের জন্য। জননী সীতাদেবী বহুপূর্ব হইতেই বুঝিয়া নিয়াছেন, পুত্র তাঁহার সত্যকার বৈরাগ্যবান্ সাধক, তাঁহার কৃষ্ণরতি ও কৃষ্ণ আরাধনার জের এখানেই থামিবে না। কৃষ্ণের বাঁশী অতি সত্বরই একদিন তাঁহাকে টানিয়া নিবে ঘর-সংসারের বাহিরে।

জননী সীতাদেবী ও জনক বৃদ্ধ পণ্ডিত পদ্মনাভের ভাগ্য ভালো তবুণ লোকনাথের গৃহত্যাগের শোক তাঁহাদের সহ্য করিতে হয় নাই। পুত্র বিরাগী হওয়ার পূর্বেই, অল্প-দিনের ব্যবধানে তাঁহারা লোকান্তরে চলিয়া যান।

লোকনাথের জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা ইতিমধ্যে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন, লোকনাথ তখনও অবিবাহিত। এসময়ে তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। এই তরুণ বয়সেই অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে তীব্র নির্বেদ, মন তাঁহার একান্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে নবদ্বীপে। সেখানে প্রেমধর্মের নব উদ্‌গাতা, তাঁহার প্রাক্তন সুহৃদ্ গৌরচন্দ্রের উদয় ঘটিয়াছে, ভক্তিপ্রেমের আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে বাংলার তমসাবৃত অধ্যাত্মগগন। সে আলোকের হাতছানি লোকনাথকে আজ পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

অগ্রহায়ণ মাসের এক নিশীথ রাত্রে সমাগত হয় তাঁহার জীবনের পরম লগ্ন। ইষ্টদেবের অমোঘ হাতছানিটি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান লোকনাথ। পদব্রজে ছুটিয়া চলেন অন্ধকারময় পথ প্রান্তর দিয়া। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় দিবসে উপস্থিত হন নবদ্বীপে, প্রভুর দর্শন লাভে হন কৃতকৃতার্থ। তারপর মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানে প্রভুর আন্তরিক ইচ্ছায় ও নির্দেশে চিরদিনের জন্য চলিয়া যান বৃন্দাবনধামে।

বৃন্দাবনের যাত্রাপথে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে প্রায় তিনমাস অতিবাহিত করিতে হয়। তখনকার দিনে পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না, কাজেই লোকনাথ ও ভূগর্ভকে বিপদসঙ্কুল নানা অঞ্চল এড়াইয়া বহুপথ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইতে হয়।

এই তিন মাসে লোকনাথ ও ভূগর্ভ উভয়ে উভয়কে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিয়াছিলেন, আবদ্ধ হইয়াছেন অচ্ছেদ্য একাত্মকতার বন্ধনে। বৃন্দাবনে বাস করার সময়েও উভয়ের এই প্রীতির বন্ধন অক্ষুণ্ণ ছিল। শাস্ত্রবিদ্ প্রেমিক বৈষ্ণব লোকনাথ ছিলেন প্রভুর

লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের প্রধান ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, আর ভূগর্ভ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার সদা সহচর ও বিশ্বস্ত সহকারী।

উভয়ে মিলিয়া মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে পরিভ্রমণ শুরু করেন এবং এই সঙ্গে চলে লীলাস্থলীসমূহের অনুসন্ধান। পুরাণ শাস্ত্র ও জনশ্রুতির ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া বহুতর স্থানে তাঁহারা ঘোরাফেরা করিতে থাকেন। কিন্তু মথুরা, বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলের বিস্তৃত অঞ্চল তখন অরণ্যে আবৃত, পথঘাট দুর্গম, তস্কর ও দস্যুদের দ্বারা উপদ্রুত। নিঃসহায় বৈরাগীদ্বয় কি করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিবেন ভাবিয়া পান না।

স্থানীয় সাধুদের কাছে পুরাণবর্ণিত কৃষ্ণলীলাস্থলসমূহের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায় বটে, তাহার প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

এই অঞ্চল অরণ্যে পরিণত হওয়ার পর কিছু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর লোক ও জাতি এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন পুরাবৃত্ত বা ঐতিহ্যের খবর ইহারা রাখে না। বংশ পরম্পরায় কোনো জনশ্রুতিও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও লোকনাথ ও ভূগর্ভ বিপুল নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়া প্রভুর আদিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করিতে থাকেন।

বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও দর্শনের জন্য আচার্য অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভু কম পরিশ্রম করেন নাই। কিন্তু ব্রজমণ্ডলে তাঁহারা বাস করিয়াছেন অল্প দিনের জন্য। তাই সত্যকার কোনো অনুসন্ধান চালানো তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। লোকনাথ ও ভূগর্ভ এখানে আসিয়াছেন স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে, আর শিরোধার্য করিয়া নিয়াছেন লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের মহাব্রত। যত শ্রমসাধ্য, যত কষ্টপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুলই হোক, আপ্রাণ চেষ্টায় এ ব্রত যে তাঁহাদের উদ্‌যাপন করিতে হইবে।

অনাহারে অনিদ্রায় দেহ ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। জনমানবহীন দুর্গম গভীর বনে কত দিন ও রাত্রি কাটাইতে হইতেছে, কিন্তু কোনো কিছুতেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। যখন যেখানে যে জনশ্রুতি ও শাস্ত্রীয় ইঙ্গিতের সন্ধান মিলিতেছে অপার নিষ্ঠায় সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন, আর তীর্থচারী সাধু মহাত্মাদের সাহায্য নিয়া চলিতেছে সেগুলির তথ্য নিরূপণ ও সনাক্তকরণ।

মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের পৌরাণিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। রামায়ণেই আমরা মথুরার উল্লেখ প্রথম পাই। তখনকার দিনে এটি প্রচলিত ছিল মধুপুরী নামে। মহর্ষি বাল্মীকি বলিতেছেন,—ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেব নির্মিতা।[১] এই মধুপুরী পরে মধুরাই হইয়াছে এবং তাহারই অপভ্রংশ,—মথুরা। পরবর্তীকালে এই নাম অনুসরণ করিয়াই দাক্ষিণাত্যে গড়িয়া উঠিয়াছে মধুরাই বা মাদুরা নগরী।

পুরাণশাস্ত্র মতে, মধু দৈত্য স্থাপন করেন মধুরাই। তখনকার দিনে এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব প্রসারিত হয় নাই। মধু দৈত্যের অনুজ শত্রুঘ্ন মধুপুরী বা মধুরা অধিকার করেন। তখন হইতে এই অঞ্চল আর্যদের অধিকারে আসে এবং আর্যসভ্যতার এক বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠে। পরবর্তীকালে শূরসেন বংশীয় আর্যেরা এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং শক্তিমান্ রাজবংশরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৮৩

শূবসেন-ক্ষত্রিযবংশে কালক্রমে আবির্ভাব ঘটে প্রসিদ্ধ নৃপতি যযাতিব। ইঁহাব পুত্র যদুব অধস্তন বংশীয যাদবেবা মথুবায পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। এই যাদবদেবই বৃষ্ণি শাখায আবির্ভূত হন অবতাব পুবুষ—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।

যাদবদের অন্যতম শাখা ভোজবংশেব প্রধান, বাজা কংস, মথুবাব বাজসিংহাসন অধিকাব কবেন। বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত কংসেব সংঘর্ষ ঘটে এবং তিনি নিহত হন।

এই সময হইতেই ভাবতেব বাষ্ট্রীয ও সমাজজীবনে মথুবা এবং ব্রজমণ্ডলেব খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচাবিত হইতে থাকে।

ভাবত যুদ্ধেব পব সম্রাট্ যুধিষ্ঠিব অর্জুনেব পৌত্র পরীক্ষিৎকে স্বীয বাজ্যভাব প্রদান কবিযা মহাপ্রস্থানেব পথে চলিযা যান। যাত্রাব পূর্বে মথুবামণ্ডলেব বাজাবূপে অভিষিক্ত কবেন শ্রীকৃষ্ণেব প্রপৌত্র বজ্রনাভকে। ভক্তিমতী মাতাব প্রেবণায বজ্রনাভ প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূজাব ব্যবস্থায তৎপব হইয়া উঠেন।[১] তাঁহাব উদ্দীপনা ও প্রযাসেব ফলে সৃষ্টি হয শ্রীকৃষ্ণেব কযেকটি পবিত্র বিগ্রহ। ইহাদেব নাম যথাক্রমে—শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদন-গোপাল এবং শ্রীগোপীনাথ। বাজা বজ্রনাভেব উৎসাহ ও প্রযত্নে এবং ভক্তিমান্ আচার্যদেব সহাযতায এই বিগ্রহদেব অর্চনা ও ভোগবাগেব পদ্ধতি প্রবর্তিত হয। বজ্রমণ্ডল ও মথুবাব সাধকগণ দীর্ঘদিন এই বিগ্রহদেব সেবা পূজা কবিতে থাকেন এবং জাগ্রত বিগ্রহবূপে জনগণেব কাছে ইঁহাবা পবিচিত হইয়া উঠেন। এই সমযে ভক্তিমান্ সাধু মহাত্মাদেব প্রচেষ্টায প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বহুতব লীলাস্থল নূতন কবিয়া আবিষ্কৃত হয এবং গণ্য হয পবিত্র তীর্থবূপে।

পববর্তীকালে কলিব প্রভাবে এই সব বিগ্রহ ও তীর্থ লুপ্ত হইয়া যায। বিশেষ কবিয়া জৈন ও বৌদ্ধধর্মেব প্রভাবে এবং হিন্দু বৌদ্ধেব সংঘর্ষেব ফলে ব্রজমণ্ডল ও মথুবার ধর্ম সংস্কৃতিব উপব নিপতিত হয প্রচণ্ড আঘাত। এ সমযের জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত হয, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয অজস্র তীর্থ, মঠ মন্দিব ও সাধনপীঠ। ইতিহাসেব পাঠকমাত্রেই জানেন, চীনা পবিব্রাজকদেব লেখনীতে হিন্দুতীর্থ মথুবা গণ্য হইয়াছে একটি বৌদ্ধ-নগবীরূপে।[২]

কালক্রমে মথুবা ও ব্রজমণ্ডলের জনবসতি কমিযা যায। সাবা অঞ্চল দুর্গম অবণ্যে পবিবৃত হইয়া পড়ে।

মথুবাব বাজকীয বৈভব ও প্রভাব যাহাই থাকুক, বৃন্দাবন কিন্তু পৌবাণিক যুগে প্রধানত একটি বনবূপেই বিবাজ কবিত। বহু সাধু মহাত্মা এবং ভক্তিমান্ গৃহীদেব আশ্রম ও আবাস ছড়ানো ছিল এই জনপদেব আশেপাশে এবং সর্বত্র।

স্কন্দ পুবাণেব মথুবাখণ্ডে সংক্ষেপে বৃন্দাবনেব একটি মনোবম বর্ণনা আমবা পাই।

বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দসমন্বিতম্ ॥

বৃন্দাবনেব বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্ লেখক শ্রীসতীশ-চন্দ্র মিত্র লিখিযাছেন ঃ

---

১ শ্রীশ্রীবৃন্দাবন বহস্য ঃ বামযাদব বাগচী
২ মথুরা ঃ গ্রাউস

—৮৪ ক্রোশ পরিমিত স্থান লইয়া এই বিশাল বন অবস্থিত। এখনও ইহার দ্বাদশটি বন ও চতুর্বিংশ তপোবন তীর্থস্থানে পরিণত। পূর্বকালে এইসব বনভাগে মুনির আশ্রম ছিল। সাধকেরা নির্জনে সাধনভজন করিতেন, আর জঙ্গলের মধ্যে আভীর প্রভৃতি অনুন্নত এবং অন্য বন্যজাতির বাসভূমি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। শেষে পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়া যখন মুসলমান বাহিনী ধন লুণ্ঠনের প্রত্যাশায় দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল মথুরা নগরীর উপকণ্ঠে বলিয়া সে সব আক্রমণের ফল বৃন্দাবনের উপর ফলিতেছিল।

—গজনীপতি মাহ্‌মুদ যখন বহুদিন ধরিয়া মথুরা লুণ্ঠন করেন, দেব-বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া দুর্ভেদ্য অভ্রভেদী মন্দিরসমূহ ভূমিসাৎ করেন তখন বৃন্দাবনও ফলভোগে বঞ্চিত হয় নাই। বৃন্দাবন পরিক্রমার অন্তর্গত একটি বনের নাম মহাবন। উহার রাজা মাহ্‌মুদের নিকট পরাজিত ও পদানত হইয়াও রক্ষা পান নাই, তিনি যখন প্রজাবর্গের দারুণ হত্যাকাণ্ড সম্মুখে দেখিলেন, তখন তিনি নিজ স্ত্রী-পুত্রের হত্যাসাধন করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা দ্বারা নিজের উদ্ধারসাধন করেন। সে দৃশ্য দেখিয়া বৃন্দাবন হইতে বহুলোক পলায়ন করে।

—ক্রমে পাঠানেরা দিল্লী গৌড় প্রভৃতি নানাস্থানে রাজত্ব পাতিয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনের জঙ্গল আরও শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া রহিল। তীর্থানুসন্ধিৎসু নির্ভীক সাধুরা ব্যতীত সে বনে আর কেহ ভ্রমণ করিতে আসিতেন না। সে জঙ্গলে শুধু বনোরাই বাস করিত।

—দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের সভা কবি জয়দেব যখন বৃন্দাবন দর্শনে আসেন তখন বৃন্দাবন শুধু অরণ্যই ছিল। তাঁহার কোমলকান্ত পদাবলীতে বৃন্দাবনের যে বনশ্রী ললিতকান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা কেবল প্রেমবাসিরের কল্পনারই সামগ্রী। এখন যেমন শ্রীবৃন্দাবন নির্বিঘ্ন ভক্ত সাধকের সেবাশ্রমরূপে জন কোলাহলের মধ্যেও শান্তিনিকেতনে পরিণত হইয়াছে, পাঠান রাজত্বকালে উহার সে দশা ছিল না। বাঙালীর একটা গৌরবের কথা এই, তাহারাই বৃন্দাবনের বনজঙ্গলে আবাদ করিয়া ভক্তির পত্তন করিয়াছিলেন।

—বাঙালী যখন এই নববৃন্দাবনের সৃষ্টি করেন, তখন বাংলাদেশের এক সুবর্ণযুগ। পাঠান বিজয়ের উদ্দাম আক্রোশ প্রশমিত হইয়াছে আর পরাক্রান্ত পাঠান নৃপতিগণ স্বাধীনভাবে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। তখন বিখ্যাত হুসেন শাহ্‌ গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত, অন্নপণ্য সর্বত্র সুলভ, শিল্পকলার সমধিক উন্নতিতে বঙ্গদেশ খ্যাত। হুসেনের রাজদরবার প্রতিভাসম্পন্ন হিন্দু অমাত্য এবং কৃতী ও পণ্ডিত দ্বারা সমালঙ্কৃত। নবদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি বহুস্থানে শিক্ষাসদনে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীর জ্ঞান-পিপাসা মিটিতেছিল। বাঙালী কোন বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ছিল না। একমাত্র ধর্মক্ষেত্রে নানাবিধ ব্যভিচার ও অবনতি দেখা যাইতেছিল।

—এমন সময় নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হইল। অপরিণত বয়সে তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সকল সমস্যা ও সকল বিকারের অভিনব সমাধান হইয়াছিল। ইহাই, শুধু বঙ্গীয় কেন, ভারতীয় ইতিহাসের একটি নবযুগ। সে যুগে ইতিহাসের যে নূতন ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল. তাহার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্থায়িভাবে বৃন্দাবনে বাস না করিলেও তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহারই ব্যবস্থায় তাঁহার প্রেরিত

ভক্ত-সম্প্রদায়ের একাগ্র চেষ্টায় শ্রীবৃন্দাবনে বাঙালীর নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ঔপনিবেশিকদিগের একমাত্র সাধনা—ভক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ভক্তিবাদের ভিত্তিপত্তন এবং লীলা-ধর্মের প্রবর্তন।

—সেই ঔপনিবেশিকদের অগ্রদূত হইয়াছিলেন—শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, ছায়ার মতো তাঁহার সহচর ছিলেন, অন্য এক বাঙালী ব্রাহ্মণ—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী।[১]

বৃন্দাবনে পৌঁছানোর প্রায় দুই মাস পরে লোকনাথ সংবাদ পাইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তজনদের কাঁদাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন নাম নিয়াছেন শ্রীচৈতন্য। পুরীতে কিছুদিন অবস্থান করার পর প্রভু বহির্গত হইয়াছেন দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে। তীর্থদর্শন আর নবতর প্রেমভক্তি ধর্মের প্রচার দুই-ই চলিতেছে সমভাবে।

প্রভুর ত্যাগবৈরাগ্যময় সন্ন্যাসমূর্তি দর্শনের জন্য লোকনাথ ও ভূগর্ভ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বৃন্দাবনের কাজ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া উভয়ে রওনা হইলেন দক্ষিণ ভারতের দিকে।

কিন্তু প্রভু শ্রীচৈতন্য সদাই রহিয়াছেন ভ্রাম্যমাণ। তন্ন তন্ন করিয়া দক্ষিণের বহু তীর্থ ও সাধনপীঠে লোকনাথ ও ভূগর্ভ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু দর্শন মিলিল না।

এদিকে শ্রীচৈতন্য পুরীধামে আসিয়া প্রেমভক্তি আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গড়িয়া তুলিতে তৎপর হইয়াছেন। শক্তিমান্ বৈষ্ণব সাধকেরা কেন্দ্রীভূত হইতেছেন তাঁহার চারিদিকে। অতঃপর প্রভু গৌড়ে গিয়া রূপ, সনাতনকে আত্মসাৎ করিলেন, বৃন্দাবনে তাঁহার আসার কথা ছিল কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না।

পরবর্তী বৎসরে প্রভু বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু লোকনাথ ভূগর্ভ তখন সেখানে নাই। উভয়ে দক্ষিণদেশের তীর্থে তীর্থে তখনো প্রভুর দর্শনের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিছুদিন পরে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াই শুনিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রওনা হইয়াছেন প্রয়াগের দিকে।

উন্মত্তের মতো লোকনাথ ও ভূগর্ভ ছুটিয়া চলিলেন প্রভুকে ধরিবার আশায়। পথে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে উভয়ে আশ্রয় নিলেন এক বৃক্ষতলে।

গভীর রাত্রে লোকনাথ দর্শন করিলেন এক চাঞ্চল্যকর স্বপ্ন। জ্যোতির্ময় মূর্তিতে প্রভু আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার সম্মুখে, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া প্রসন্নমধুর কণ্ঠে কহিতেছেন—

> তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি।
> বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যাইহ তুমি॥
> প্রয়াগ হইতে আমি যাব নীলাচল।
> শুনিতে পাইবে মোর বৃত্তান্ত সকল॥ (নরোত্তম বিলাস)

এই স্বপ্ন দর্শনের মধ্য দিয়া ভক্ত লোকনাথের বিরহখিন্ন হৃদয়ে কৃপাময় প্রভু বুলাইয়া দিলেন শান্তির প্রলেপ। লোকনাথের গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রু। প্রভুর

১ সপ্তগোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

বাণী শিরোধার্য করিয়া সংকল্প গ্রহণ করিলেন, এ-জীবনে আর কখনো বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবেন না, প্রভুর আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপন ও প্রভুর ধ্যান মননেই করিবেন দিনযাপন।

শ্রীবিগ্রহ সেবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বেশ কিছুদিন যাবৎ জাগ্রত হইয়াছে লোকনাথের অন্তরে। কিন্তু কোথায় কোন্ শ্রীবিগ্রহ প্রকট হইবেন সেবা পূজার জন্য, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সেদিন প্রয়াগের পথ হইতে ফিরিবার কালে ব্রজমণ্ডলের কিশোরী কুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পবিত্র কুণ্ডে স্নান করার সময় লোকনাথ তাঁহার ইষ্টদেবের কৃপায় লাভ করিলেন এক পরম সুন্দর বিগ্রহ—শ্রীরাধাবিনোদ। এখন হইতে এই বিগ্রহের সেবা ও ধ্যান জপ হইয়া উঠে তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনজীবনের প্রধান উপজীব্য।

শ্রীবিগ্রহ কৃপাভরে দর্শন দিয়া সেবা প্রকট করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার ভক্তের কাঙালত্ব তো মোচন করেন নাই। প্রভুর সেবায় আসন, শয্যা, সাজপোশাক ভোগরাগ অনেক কিছু উপকরণ দরকার। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব লোকনাথের পক্ষে এসব জোটানো কঠিন, কোন অর্থ সম্বলই যে তাঁহার নাই। অরণ্যচারী সাধু তিনি, দিন রাত বনে বনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান, একখানা পর্ণকুটিরও তাঁহার নাই।

বনের অধিবাসীরা সাধুবাবাকে ভালোবাসে, তাহারা প্রস্তাব দেয়, "বাবাজী, নিজে তুমি যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও, থাকা খাওয়ার কোনো ঠিক নেই। কিন্তু ঠাকুর যখন কৃপা ক'রে এসেছেন তোমার কাছে, তাঁকে তো ভালোভাবে রাখতে হবে। আমরা তোমায় একটা কুঁড়েঘর বেঁধে দিচ্ছি, সেখানে ঠাকুরের সেবা পূজা তুমি করতে থাকো।"

লোকনাথ উত্তর দেন, "বাবা, আমি যেমন বনচারী আমার ঠাকুরও যে তাই। যতদিন আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াবো, তিনিও থাকবেন সঙ্গে সঙ্গে। আমি থাকবো বৃক্ষতলে আর আমার ঠাকুর থাকবেন বৃক্ষের কোটরে।"

সেই ব্যবস্থাই আপাতত চলিতে থাকে। রোজ প্রত্যূষে উঠিয়া লোকনাথ ভক্তিভরে বনতুলসী ও বনফুল তুলিয়া আনেন, নিবিষ্ট হইয়া সম্পন্ন করেন শ্রীবিগ্রহের পূজা। বেলা হইলে অরণ্যের শাকপাতা ফল কুড়াইয়া আনিয়া প্রস্তুত করেন ভোগরাগ। ইষ্টবিগ্রহকে শয়ান দেন পুষ্পশয্যায়, ঘুম পাড়ান তাঁহাকে বৃক্ষপল্লবের বাতাস দিয়া। নিত্যকার সেবা পূজা ও জপ ধ্যানের শেষে সহচর ভূগর্ভকে নিয়া সারা দিনের মতো বাহির হইয়া পড়েন লুপ্ত, অবজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্ন লীলাস্থলীর সন্ধানে।

কিন্তু এক একদিন এই অ সন্ধান কর্মে দূরদূরান্তে চলিয়া যাইতে হয়, বিগ্রহ সেবায় উপস্থিত হয় নানা অন্তরায়। অবশেষে তিনি গ্রহণ করেন এক নূতনতর ব্যবস্থা। শণের গোছা পাকাইয়া এক ঝোলা তৈরী করেন, তাহারই মধ্যে স্থাপিত করেন শ্রীবিগ্রহকে। তারপর সেটি কণ্ঠে ঝুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়ান নিত্যকার কর্মে।

লোকনাথের পবিত্র চরিত্র, সেবা, নিষ্ঠা, বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া বনবাসীরা ক্রমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ধীরে ধীরে দূর জনপদ হইতে দুই একটি করিয়া ভক্ত তাঁহার নিকট আসিতে থাকে।

বিগ্রহের সেবা পূজার জন্য তাহাদের কেহ কেহ অনেক সময়ে ফল মূল ইত্যাদি কিনিয়া আনিত। লোকনাথ সানন্দে প্রভুর ভোগ লাগাইতেন, তারপর-ঐসব বিতরণ

করিয়া দিতেন ভক্ত ও বনবাসী দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে। সেবা পূজায় কোনো উপচার বা ভেট তিনি একদিনের তরেও সঞ্চয় করিতেন না। প্রাপ্তিমাত্রেই তাহা বিতরিত হইয়া যাইত।

বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত বিগ্রহ লোকনাথের আদর্শ জীবন সম্পর্কে ভক্তিরত্নাকর লিখিয়াছেন :

যে বৈরাগ্য তাঁর তা' কহিতে অন্ত নাই।
শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাঁই ॥
ফলমূল শাক অন্ন যবে যে মিলয়।
যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয় ॥
বর্ষা শীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস।
সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্বাস ॥
আপনি হইতা সিক্ত অতি বৃষ্টি নীরে।
ঠাকুরে রাখিতা এই বৃক্ষের কোটরে ॥
অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া।
রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লাসিত হিয়া ॥ (৫ম তরঙ্গ)

এই বৈরাগ্যময় তপস্যা ও কর্মনিষ্ঠার ফল ক্রমে ফলিতে আরম্ভ করে। একের পর এক কতকগুলি লুপ্ত ও বিস্মৃত তীর্থের উদ্ধার সাধন করেন লোকনাথ। সারা ব্রজমণ্ডলে এবার সাড়া পড়িয়া যায়। গৌড়ীয় সাধক লোকনাথ গোস্বামীর প্রতি পতিত হয় ভক্ত-সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। তাঁহার নিজের ব্যাপক অনুসন্ধানের সঙ্গে মিলিত হয় প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিগ্‌দর্শন। ব্রজমণ্ডলে আসিয়া প্রভু ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় কয়েকটি লীলাস্থল ও শ্রীকুণ্ডের আবিষ্কার করেন, স্থানীয় সাধু-সন্ন্যাসী ও জনসাধারণ এগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া সজাগ হন ও শ্রদ্ধান্বিত হন।

লোকনাথের এই একনিষ্ঠ প্রয়াসের সঙ্গে শুধু প্রভু শ্রীচৈতন্যের আবিষ্কারই যুক্ত হয় নাই, পরবর্তীকালে আগত রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর কর্মতৎপরতা ও অশেষ-ভাবে তাঁহার কার্যের সহায়ক হইয়া উঠে।

পুরীধাম হইতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য রূপ ও সনাতনকে ব্রজমণ্ডলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই দুই গোস্বামী অশেষ শাস্ত্রবিদ্, পরিচালন-দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাও তাঁহাদের যথেষ্ট। ইহাদের আগমনের পর লোকনাথ গোস্বামীর কর্মভার অনেকটা কমিয়া গেল, আগেকার মতো বন বনান্তরে ছুটাছুটি করার প্রয়োজনীয়তা আর তেমন রহিল না।

রূপ ও সনাতনকে ডাকিয়া লোকনাথ তাঁহার নিজের উদ্ধার-করা লুপ্ত তীর্থগুলি বুঝাইয়া দিলেন, শাস্ত্র ও পুরাণের তথ্যের সহিত মিলাইয়া এবং এই দুই মনীষীকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া নূতন তীর্থগুলির মাহাত্ম্য প্রকটিত করিলেন। কতকগুলি নূতন নূতন নামকরণও এ সময়ে করা হইল। পরবর্তীকালে রঘুনাথ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের উদ্ধারসাধন সম্পূর্ণ হয় এবং সারা ব্রজমণ্ডল তীর্থ, বিগ্রহ এবং কুণ্ডের মাহাত্ম্যে পূর্ণ হইয়া উঠে।

ব্রজমণ্ডল সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু, শ্রীমৎ নারায়ণ ভট্ট নামক এক সাধক 'শ্রীব্রজভাব

বিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপন করিতে গিয়া লোকনাথ গোস্বামী তিনশত তেত্রিশটি বন ও তীর্থ আবিষ্কারে সমর্থ হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নারায়ণ ভট্টের এই গ্রন্থ রচিত হয় রূপ গোস্বামীর ও সনাতন গোস্বামীর জীবিতকালে। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যের এই দুই প্রধান পরিকরের অনুমোদন ছাড়া ব্রজ সম্পর্কিত গ্রন্থাদির প্রকাশ সম্ভব ছিল না। কাজেই লোকনাথের আবিষ্কৃত লীলাস্থলের এ সংখ্যাটিকে মোটামুটিভাবে ঠিক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর গৌড়ীয় ভক্তসমাজের উপর পতিত হইল মহা দুর্দৈবের আঘাত, প্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচলে লীলা সংবরণ করিলেন।

এসময়ে ভক্তপ্রবর রঘুনাথদাস বিষাদখিন্ন হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলেন বৃন্দাবনে। লোকনাথ, রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি বৃন্দাবনে আগে হইতেই অবস্থান করিতেছেন, ভক্তিপ্রেম সাধনার আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছেন। প্রভু চৈতন্যের এই প্রতিভাধর পরিকরদের ঐকান্তিক সাধনা ও কর্মের ফলে ভৌম বৃন্দাবন পত্তন হইল এক নবতর ভক্তিসাম্রাজ্যের। এই ভৌম বৃন্দাবনের প্রথম ও বরেণ্য পথিকৃৎ লোকনাথ গোস্বামী।

"এখন যেখানে বৃন্দাবনের গোকুলানন্দ আশ্রম সেইস্থানে বনের মধ্যে লোকনাথের কুঞ্জ ছিল। তাহা পথ হইতে দূরে, বৃক্ষবল্লরীর আড়ালে নিভৃত নিলয়ে অবস্থিত। সহজে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যাইত না। লোকনাথও বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কুঞ্জ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না, যাঁহার সন্ধানে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহারই ধ্যান-ধারণায় পূজার্চনায় তাঁহার দিব্য বিভাবরী অতিবাহিত হইত। তখন রূপ গোস্বামীই সমগ্র ব্রজমণ্ডলের কর্তা, বিপন্ন ভক্তের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন। পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে সেখানে যে একপ্রকার বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, শ্রীরূপ তাহার কর্ণধার। কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবমতের মূল ধ্বংস করিবার জন্য গোস্বামীগণের বিদ্যা পরীক্ষা করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিচার বা জয়পরাজয় রূপের ব্যবস্থায় হইত, কোনো কিছু নূতন বিধি নিষেধ প্রবর্তিত করিতে হইলে, তাহা রূপই সকলের পরামর্শ লইয়া করিতেন। এ সব ব্যাপারে লোকনাথের হস্তক্ষেপ করিতে হইত না। তিনি নিজের সাধনভজন ও দেবসেবা লইয়াই থাকিতেন।"[১]

বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলের গোস্বামীরা এক একজন ছিলেন প্রদীপ্ত ভাস্করের মতো। প্রতিভা, শাস্ত্রবিদ্যা, কৃচ্ছ্রসাধন ও ভজননিষ্ঠা নিয়া ভক্তি আন্দোলনের যে মহান কেন্দ্র তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার যশঃপ্রভায় চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেমভক্তি ধর্মের মূলে ছিল ভাগবতে বর্ণিত পরমপুরুষ রসময় কৃষ্ণের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদাস প্রভৃতি প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মনীষা ও তপস্যার মধ্য দিয়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ও দার্শনিকতার বৈশিষ্ট্য সে সময়ে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জীবনকেই উদ্দীপিত ও প্রভাবিত

---

১ সপ্তগোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

করে নাই, সারা ভারতের সমক্ষেও তুলিয়া ধরিয়াছে প্রেমভক্তি সাধনার এক নূতনতর আলোকবর্তিকা।

কিন্তু বৃন্দাবনের এই দূরপ্রসারী প্রভাব ও ঔজ্জ্বল্য খুব বেশী দিন বর্তমান থাকে নাই। প্রভু শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরে প্রবীণ নেতৃদ্বয় নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত লীলা সংবরণ করিয়াছেন। অতঃপর বৃন্দাবনে—একে একে নিভিল দেউটি। প্রথমে সনাতন, তার পরে রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট করিলেন মহাপ্রয়াণ। রঘুনাথদাস গোস্বামী অন্যতম শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ লীলাপরিকর, প্রেমভক্তি সাধনার এক মূর্ত বিগ্রহ। কিন্তু তিনি তখন নিজেকে একান্ত ভাবে গুটাইয়া নিয়াছেন। রাধাকুণ্ডের নিকটে বসিয়া রত রহিয়াছেন কঠোর তপস্যায়, বৃন্দাবনের সাধক ও ভক্তেরা তাহার পুণ্যময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত। এসময়ে বৃন্দাবনের সাধনপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন প্রধানত তিন গোস্বামী—লোকনাথ, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব। শ্রীজীব বিপুল মনীষা ও শাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী, সংগঠন শক্তিও তাঁহার অসাধারণ। রূপ গোস্বামীর তিরোধানের পর হইতে তিনিই বৃন্দাবনের ভক্তিসাম্রাজ্যের প্রধান পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। গোপাল ভট্ট গোস্বামী পূর্বাশ্রমে ছিলেন শাস্ত্রবিদ্ শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্মের সংহিতা রচনা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও প্রভু শ্রীচৈতন্যের মনোনয়ন তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে গুরুস্থানীয় মহাপুরুষরূপে। এই গোস্বামীদের মধ্যে লোকনাথ ছিলেন সকলের চাইতে বয়োবৃদ্ধ, ত্যাগ তিতিক্ষা, ভজননিষ্ঠা ও ভজনসিদ্ধির দিক দিয়া বরেণ্য।

ইতিমধ্যে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা প্রায় অর্ধশতক ব্যাপিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ে এসবের প্রচার তেমন হয় নাই। গৌড় প্রভু শ্রীচৈতন্যের দেশ। যে দেশে সর্বপ্রথম তিনি রচনা করেন নিগূঢ় প্রেমধর্মের মধুচক্র, সেখানে কি তাঁহার পরিকরদের ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তি-সাহিত্যের প্রচার ঘটিবে না, নব উজ্জীবন সাধিত হইবে না? লোকনাথ, শ্রীজীব প্রভৃতি বড় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন, মনে দুঃখও পাইতেছিলেন।

এই প্রচার ও উজ্জীবনের কর্ম বড় দুরূহ, বড় দায়িত্বপূর্ণ। এই কর্মভার গ্রহণের জন্য চাই এমন সব সাধক যাঁহারা কর্মকুশল তত্ত্ববিদ্ এবং আপন আপন সাধনা ও সিদ্ধির আলোকে প্রেমধর্মের উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে চালিত করিতে পারেন অধ্যাত্মজীবনের পথে।

কিছুদিনের মধ্যে আশার রশ্মি দেখা গেল। ত্যাগ বৈরাগ্য ও মুমুক্ষার আর্তি নিয়া বৃন্দাবনে একে একে উপস্থিত হইলেন তিনটি চিহ্নিত সাধক—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। প্রাণের আবেগে নিজ নিজ প্রদেশ হইতে বৃন্দাবনে তাঁহারা ছুটিয়া আসিলেন, নিপতিত হইলেন গোস্বামী প্রভুদের পদপ্রান্তে।

উত্তরকালে এই তিন নবীন সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনে সংযোজন করেন নূতনতর অধ্যায়। শ্রীনিবাস রাঢ়বঙ্গে সহস্র সহস্র ভক্তকে আশ্রয় প্রদান করেন। শ্যামানন্দের প্রভাবে উড়িষ্যার শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নবধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে, আর নরোত্তম উত্তরবঙ্গ এবং আসামে বহাইয়া দেন ভক্তিপ্রেমের জোয়ার।

শ্রীনিবাস গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হন, আর শ্যামানন্দ দীক্ষালাভ করেন শ্রীজীবের কাছে। নরোত্তমের গুরুকরণ তখনো সম্ভব হয় নাই। গোস্বামী লোকনাথের তপস্যাপূত সিদ্ধোজ্জ্বল মূর্তি নরোত্তমের অন্তরপটে চিরতরে অঙ্কিত

হইয়া গিয়াছে। বার বার নরোত্তম তাঁহার চরণে লুটাইয়াছেন, অশ্রুজলে তাহার কুটিরের মৃত্তিকা সিক্ত করিয়াছেন দীক্ষা প্রাপ্তির জন্য কিন্তু লোকনাথ কৃপার দুয়ার উন্মোচন করেন নাই। তাঁহার সংকল্প ছিল—কখনো কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, এখনো সেই সংকল্পে আছেন অবিচল। নরোত্তমের তাই মনঃকষ্টের অবধি নাই।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিন প্রতিভাধর নবীন বৈষ্ণবকে শাস্ত্রশিক্ষার ভার নিয়াছেন শ্রীজীব। রূপ, সনাতনের স্নেহধন্য উত্তরসাধক শ্রীজীব, প্রভু শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের প্রধান প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাতা তিনি। তাছাড়া ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর নায়ক ও প্রধান পরিচালকরূপেও তিনি চিহ্নিত। নবাগত প্রতিভাধর শিষ্যত্রয় অপরিসীম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়া তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করিতেছেন ভক্তিপ্রেম ধর্মের শাস্ত্রতত্ত্ব।

শিক্ষাগুরু শ্রীজীবের প্রবল ইচ্ছা, তাঁহার এই তিনটি ত্যাগী ও প্রতিভাধর শিষ্যকে নিয়োজিত করিবেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ধর্মের প্রচার ও প্রসারকল্পে। কিন্তু নরোত্তমকে নিয়া গোল বাধিয়াছে। দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া বৃন্দাবন হইতে তিনি এক পা-ও নড়িবেন না। মনে মনে গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন গোস্বামী লোকনাথকে, কিন্তু তাঁহার কৃপা লাভের কোনো চিহ্নই দেখা যাইতেছে না।

শ্রীজীব এবং বৃন্দাবনের বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধুরা ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝেন। নরোত্তমের মতো প্রতিভাধর নবীন সাধকের প্রচেষ্টা ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন ও শাস্ত্রতত্ত্বের প্রচার সফল হইবে না। সবাই মিলিয়া লোকনাথ গোস্বামীকে চাপিয়া ধরিলেন, অনুনয় করিলেন—তিনি কৃপা না করিলে তো নরোত্তমকে নব পরিকল্পিত কর্মভার দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। তাঁহার কাছে দীক্ষা পাইলে তবেই সে বৃন্দাবন ত্যাগ করিবে।

একান্তে তপস্যারত নিগূঢ় ভজনানন্দে মত্ত, গোস্বামীর সেই একই কথা—শিষ্য গ্রহণের দায়িত্ব এ জীবনে তিনি আর গ্রহণ করিবেন না, আর যে প্রতিজ্ঞা ইতিপূর্বে করিয়াছেন, কোনো মতেই তাহা তিনি ভাঙিতে পারিবেন না।

নরোত্তমের বাড়ি রাজসাহী জেলার পদ্মাতীরস্থ খেতরী গ্রামে। পিতা কৃষ্ণানন্দ মজুমদার ছিলেন প্রভাবশালী জমিদার। রাজা উপাধি ছিল তাঁর, আর ছিল বহু লক্ষ টাকার বিরব বৈভব।

নরোত্তমের মাতা নারায়ণী দেবী অতিশয় ধর্মপ্রাণা। দীর্ঘদিন সন্তান লাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি বহুতর ব্রত পূজার অনুষ্ঠান করেন এবং দেবতার কৃপায় লাভ করেন পুত্র নরোত্তমকে। শুভ সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাই বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনে দেখা যায় ত্যাগ বৈরাগ্য ও ধর্মপরায়ণতা। বিশেষ করিয়া প্রভু চৈতন্যের জীবন ও আদর্শ তাঁহাকে উদ্দীপিত করিতে থাকে। অতঃপর তরুণ বয়সে পিতার প্রাসাদের রাজতুল্য ধন, ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসময় জীবন ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়েন মুক্তির সন্ধানে।

বৃন্দাবনে আসার পর শ্রীজীবের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভে নরোত্তম ধন্য হন, তাঁহার প্রসাদে বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রতত্ত্বে পারঙ্গম হইয়া উঠেন। শ্রীজীব জানেন, নরোত্তম উত্তরবঙ্গের রাজতুল্য জমিদারের সন্তান, প্রচুর বিত্ত বিভবের উত্তরাধিকারী। সেইজন্যই যে তিনি

তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন তাহা নয়। নরোত্তম জন্ম বৈরাগী, রাজতুল্য বিষয় বৈভব ত্যাগ করার শক্তি তিনি রাখেন, নরোত্তম প্রতিভাধর নবীন শাস্ত্রবিদ্, নরোত্তম কৃচ্ছ্রব্রতী ভজননিষ্ঠ সাধক। তাই শ্রীজীবের এত প্রিয় তিনি। এই প্রিয় নবীন সাধকের উপর তাঁহার অনেক আশা, অনেক ভরসা। ঐশ্বরীয় কর্মের অনেক ভার তাঁহার উপর তিনি চাপাইতে চান। তাই শ্রীজীব তাঁহাকে গড়িয়া পিটিয়া তুলিতেছেন, পরিচিত করাইয়া দিতেছেন শ্রেষ্ঠ সাধুদের সঙ্গে।

শ্রীজীবের কৃপা ও স্নেহ মিলিয়াছে। এবার নরোত্তমের চাই গোস্বামী লোকনাথের কৃপাদীক্ষা। এই দীক্ষা লাভ করিতে পারিলে তবেই জীবন তাঁহার কৃতার্থ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নরোত্তম বহু চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু এ যাবৎ কোনো ফলোদয় হয় নাই। লোকনাথ-প্রভু তাঁহার প্রতিজ্ঞায় অটল, এদিকে ভক্ত নরোত্তমও পণ করিয়া বসিয়াছেন, শিষ্যত্ব নিতে হলে নিবেন একমাত্র তাঁহারই কাছে।

নরোত্তম স্থির করিলেন, দীক্ষা সম্পর্কে এবার শেষ চেষ্টায় ব্রতী হইবেন। লোকনাথের কুঞ্জ ছিল বৃন্দাবনের এক প্রান্তে, এক নিভৃত অরণ্যে। এই কুঞ্জের অনতিদূরে লোকনাথ কঠোর ভজনসাধনের জন্য এক ঝুপড়ি বাঁধিলেন। দিন রাতের অধিকাংশ সময় জপ ধ্যানে অতিবাহিত হইত, কিছুটা সময় ব্যয় করিতেন শ্রীজীবের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নে, অবশিষ্ট সময়ে নিবিষ্ট মনে থাকিতেন বহু আকাঙ্ক্ষিত গুরুমূর্তির ধ্যানে।

স্বল্পভাষী, তপস্যারত লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে তিনি কখনো আসিতেন না, কথাবার্তাও বলিতেন না। মৃদুস্বরে ইষ্টনাম গাহিয়া গাহিয়া টহল দিতেন তাঁহার কুঞ্জের চারিদিকে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন সদা ভজনশীল লোকনাথকে কেহ যেন বিরক্ত না করে। তাঁহার নির্দিষ্ট দিনচর্যার ব্যাঘাত না জন্মায়।

কিছুদিন এভাবে চলিল। অতঃপর নরোত্তম উদ্ভাবন করিলেন গুরুসেবার এক বিচিত্র উপায়। লোকনাথ প্রত্যূষে উঠিয়া নিকটস্থ বনের এক নির্দিষ্ট স্থানে শৌচে যাইতেন। নরোত্তম স্থির করিলেন, এখন হইতে গুরুর মেথরের কাজটি তিনি গ্রহণ করিবেন, ইহাতে একদিকে বৃদ্ধ গুরুর পরিচর্যা যেমন করা হইবে, তেমনি তাঁহার নিজেরও হইবে অহমিকার বিনাশ। উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারীর পুত্র তিনি, এতকাল দেশে রাজতুল্য সম্মানে থাকিয়া আসিয়াছেন, অকল্পনীয় ভোগবিলাসের মধ্যে বর্ধিত হইয়াছেন। লোকের কাছে রাজসম্মান প্রাপ্তির ফলে অন্তরে যে অহংবোধ দানা বাঁধিয়াছে, এই ত্যাগ বৈরাগ্যের জীবনেও হয়তো তাহা একেবারে যায় নাই, সূক্ষ্মভাবে রহিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনে আসার পরেও লক্ষ্য করিয়াছেন, মন্দিরের পূজারী ও সাধু সন্ন্যাসী, যাহারা তাঁহার পূর্বাশ্রমের সংবাদ জানেন, বেশ কিছুটা সমীহ করেন তাঁহাকে, সম্ভ্রমও দেখাইয়া থাকেন। ইহার সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া কি কিছু তাঁহার জীবনে সৃষ্ট হইতেছে না? নাঃ—এবার গুরুর মেথরের কাজের মধ্য দিয়া সেটিকে নিশ্চিহ্ন করিবেন।

সংকল্প অনুযায়ী কাজ শুরু করিয়া দিলেন। প্রত্যহ চারদণ্ড রাত্রি থাকিতে নির্দিষ্ট বনের প্রান্তে উপস্থিত হইতেন, স্থানটিকে কণ্টকশূন্য করিয়া ঝাঁটা দিয়া ভালোভাবেই মার্জন করিতেন। নিকটেই রাখিয়া দিতেন সদ্য তোলা এক ভাণ্ড জল। তারপর ঝাঁটা গাছটি এককোণে পুঁতিয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িতেন সেখান হইতে। আবার বেশ খানিকটা বাদে ফিরিয়া আসিয়া কোদালির সাহায্যে স্থানটি ময়লা-মুক্ত করিয়া

ফেলিতেন। এমনভাবে অন্তরালে আত্মগোপন করিবা নবোত্তম দিনেব পব দিন চালাইয়া যান তাঁর গুবুসেবা।

প্রথম দিনেই লোকনাথ গোস্বামী বুঝিলেন, কেহ অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহাব সেবা কবিতে চাহিতেছে। ভাবিলেন, স্থানীয বুনো লোকদের অনেকে তাঁহাকে সাধু বাবাজী বলিযা জানে। হযতো কাহাবো খেবাল হইযাছে বৃদ্ধ সাধুব একটু সহায়তা কবা, তাই এসব কবিতেছে।

এভাবে মাসেব পব মাস অতিবাহিত হয, শেষে বৎসব গডাইযা যায়। কৃষ্ণভাবে সদা বিভাবিত, আপনভোলা লোকনাথ গোস্বামীব মনে হঠাৎ একদিন একটা ধাক্কা লাগে। ভাবেন, 'কাজটি তো আমাব পক্ষে বড় গর্হিত হচ্ছে। কোনো ভক্ত হয়তো সাধু সেবার জন্য এই মেথবেব কাজ অবলীলায ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু আমি নিজে সর্বস্ব ছেড়ে বৈবাগ্য অবলম্বন কবেছি, কৃষ্ণ ভজনে মত্ত বযেছি, সেই আমি কেন তাব এই সেবা নেবো, কেনইবা নিজেকে এভাবে পাপে জড়াবো। না—না, এ তো হতে পাবে না। আজই নিশ্চয এব প্রতিবিধান কবতে হবে।'

বাত্রি শেষ হইবাব পাঁচ ছয দণ্ড বাকী, সেই সমযে লোকনাথ বনেব ঐ নির্দিষ্ট স্থানটিব কাছে গিযা এক বৃক্ষেব আড়ালে গোপনে দাঁড়াইযা বহিলেন। কিছুক্ষণ পবেই অদূরে দেখা গেল এক মনুষ্য মূর্তি। সারা বন তখনো অন্ধকাবাচ্ছন্ন, লোকটি কে তাহা বুঝিতে পাবা যাইতেছে না।

লোকনাথ গোস্বামী হাঁক দিযা কহিলেন, "কে তুমি, ওখানে কি কবছো, বল। ভয নেই, এসো আমাব কাছে।"

লোকটিব দিক হইতে কোনোই সাড়া শব্দ নাই। নীববে ধীব পদে সে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হব, তাবপব অকস্মাৎ লুটাইবা পড়ে লোকনাথেব চবণতলে।

অন্ধকাবের ঘোর তখনো কাটে নাই, তাই ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তিটি উঠিবা দাঁড়ানোর পবও লোকনাথ তাঁহাকে চিনিতে পাবেন নাই। আবাব সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন কবিলেন, "কে তুমি বাবা।"

নতশিবে লোকটি উত্তব দেয়, "আমি নরোত্তম।"

"তুমি। তা হলে রোজ তুমিই একাজ কবছো," সবিস্মযে বলিয়া উঠেন গোস্বামী লোকনাথ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভু, আপনাব কোনো বিঘ্ন না জন্মিয়ে যদি কিছু সেবা কবতে পারি, এজন্য এ কাজটুকু কবছি।"

"রাজতুল্য জমিদাবেব পুত্র হযে এই মেথবেব কাজ তুমি কবছো, বাবা। না, না, নবোত্তম, এতো ঠিক নয। এতো আমি চলতে দিতে পাবিনে" ব্যাকুল স্ববে বলেন লোকনাথ।

"প্রভু, আমি কাঙাল আশ্রযহীন, অতি অভাজন। আপনাব চবণে আত্মসমর্পণ ক'বে আছি। আপনি ছাড়া আমাব আব গতি নেই। অন্তত এটুকু সেবা আমায কবতে দিন।" কাকুতি জানান নবোত্তম।

"হুঁ"। বলিযা গোস্বামী লোকনাথ গম্ভীর হইলেন, নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন করুণাপ্রার্থী তরুণ ভক্তের দিকে।

নরোত্তম এবাব হৃদযে কিছুটা বল পাইযাছেন। জোড়হস্তে কহিতে লাগিলেন,

"প্রভু, রাজসংসারে আমি জন্মেছি, কিন্তু সে সংসার-সুখ কোনো দিনই আমায় তৃপ্তি দিতে পারে নি। কৃষ্ণকৃপার লোভ, মহাপ্রভুর কৃপার লোভ আমায় হাতছানি দিয়ে বাইরে টেনে এনেছে। কিন্তু বৃন্দাবনধামে এসেও ভজনের প্রকৃত পথ খুঁজে পাচ্ছিনে, পাষাণে বার বার মাথা কুটে মরছি। গুরু কৃপা না হলে তো মহাপ্রভুর কৃপা, ইষ্টের কৃপা মিলবে না। আপনার চরণেই নিজেকে উৎসর্গ ক'রে আমি অপেক্ষা ক'রে আছি। আপনি যদি নির্দয় হন, এ ছার দেহ তবে বৃন্দাবনের রজেই দেবো বিসর্জন।"

গোস্বামী লোকনাথের অন্তর বিগলিত হইয়াছে, নয়ন হইয়াছে করুণার্দ্র। মৃদুস্বরে আপন মনে কহিলেন, "নরোত্তম, আমি বুঝেছি, তুমি মহাপ্রভুর আপন জন, তাঁর কৃপার অধিকারী। তাঁর পবিত্র কর্মের চিহ্নিত পুরুষ তুমি। কিন্তু বৎস, নিজের প্রতিজ্ঞা আমি নিজে কি ক'রে ভাঙি। একি কঠিন পরীক্ষায় কৃষ্ণ আমায় ফেলেছেন।"

লোকনাথের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন নরোত্তম। তারপর একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নতশিরে ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পরের দিনই কিন্তু দেখা গেল, নরোত্তমের অমানুষী আর্তির ফল ফলিয়াছে। নিত্যকার কুঞ্জ পরিক্রমা সমাপণ করিয়া তিনি নিজের ভজন-কুটিরে ফিরিতেছেন এমন সময়ে লোকনাথ তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। গোস্বামী প্রভুর চোখে মুখে প্রসন্নতার আভা। নরোত্তম নূতন আশায় বুক বাঁধিলেন, অনুভব করিলেন, হিমালয়ের হিমবাহ ধীরে ধীরে গলিতে শুরু করিয়াছে, শতধারে এবার উহা ঝরিয়া পড়িবে প্রাণ-দায়িনী ঝর্ণারূপে।

অতঃপর লোকনাথ নরোত্তমকে একদিন তাঁহার ভজনকুঞ্জে ডাকাইয়া আনেন। বলেন, "বৎস, কয়েকটা শপথ তোমায় নিতে হবে আমার কাছে। আজ হতে ভোগ-বিলাসের কোন সম্পর্ক রাখবে না, এমনকি চিন্তায়ও তার স্থান দেবে না। আর আজীবন থাকতে হবে তোমায় ব্রহ্মচারী হয়ে।"

বৈরাগ্য সাধনার সকল কঠোর পথই যে নরোত্তম একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এ শপথ উচ্চারণে তাই এক মুহূর্ত বিলম্ব করিলেন না।

লোকনাথ করুণাভরা কণ্ঠে কহিলেন, "নরোত্তম, বৎস, তুমি নরোত্তমই বটে। তোমার মত যোগ্য শিষ্যকে উপলক্ষ ক'রেই কৃষ্ণ আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালেন। আমি তোমায় দীক্ষা দেব। আগামী শ্রাবণী পূর্ণিমার তিথিতে তুমি পাবে তোমার ইষ্টমন্ত্র।"

নরোত্তম আনন্দে আত্মহারা, সাশ্রুনয়নে তৎক্ষণাৎ লুটাইয়া পড়েন লোকনাথের চরণে। তারপর এই সুসংবাদ জানানোর জন্য বাহির হইয়া পড়েন শ্রীজীব ও অন্যান্য বৈষ্ণব সাধকদের ভজনকুটিরের দিকে।

বহু আকাঙ্ক্ষিত দীক্ষা লাভ করিলেন নরোত্তম। এবার সোৎসাহে রত হইলেন সদ্‌গুরুর সর্বাত্মক সেবায়। এই সঙ্গে গুরুর উপদেশ নিয়া নিগূঢ় অন্তরঙ্গ প্রেমসাধনার ক্রমগুলি তিনি অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

নরোত্তম বিশ্বাস করিতেন গুরুর অর্জিত সাধনা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারী হইতে হইলে চাই সেবা পরিচর্যার মাধ্যমে গুরুর সহিত একাত্মতা গড়িয়া তোলা। আত্মিক সাধনার এই ল সূত্রটি ধরিয়া, আপ্রাণ চেষ্টায় এখন হইতে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

নরোত্তমের এই গুরু সেবা ও গুরু পরিচর্যার কাহিনী সারা ব্রজমণ্ডলের গল্পকাহিনীর বস্তু হইয়া উঠে।

শিষ্য নরোত্তম এক বিরাট শুদ্ধসত্ত্ব আধার, আর গুরু লোকনাথ গোস্বামীও ব্রজরসের সিদ্ধ মহাত্মা, তদুপরি দিব্য করুণাধারার বিরাট উৎস তিনি। গুরুর কৃপা তাই একবার ঝরিয়া পড়িল অঝোরধারে। যে নিগূঢ় ব্রজরস সাধনার পদ্ধতি নিজে অনুসরণ করিয়া লোকনাথ সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সযত্নে যথাযথভাবে তাহাই শিখাইয়া দিলেন তাঁহার একমাত্র শিষ্যকে।

নরোত্তম আর নর রহিলেন না, তপস্যার বলে আর গুরুর কৃপা বলে হইয়া উঠিলেন দেব-মানব। বৃন্দাবনের পথেঘাটে দেব-দেউলে তাঁহার তপঃসিদ্ধ, আনন্দঘন মূর্তিটি যে একবার দর্শন করিত সেই শির নত করিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সহকারে।

শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমকে পূর্ব হইতেই অশেষভাবে স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। লোকনাথের নিকট হইতে কৃপাদীক্ষা প্রাপ্তির পর নরোত্তম যে নিগূঢ় ব্রজরস সাধনায় পারঙ্গম হইয়াছে, ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। গোস্বামী এবং সিদ্ধ মহাত্মাদের মহলে শ্রীজীব প্রস্তাব তুলিলেন, সিদ্ধ সাধক নরোত্তমকে দান করা হোক 'ঠাকুর' উপাধি। অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে যাহাতে তিনি গুরু স্থানীয় সাধক পুরুষরূপে সম্মান প্রাপ্ত হন, এই জন্যই তাঁহার এই প্রস্তাব। সানন্দে সকলেই ইহাতে সম্মতি দিলেন এবং এখন হইতে সাধু নরোত্তম হইলেন—নরোত্তম ঠাকুর। বৃন্দাবনে এসময়ে ঠাকুর বলিতে লোকে বুঝিত বরেণ্য বৈষ্ণব সাধক নরোত্তমকে। নরোত্তমের এই স্বীকৃতি ও মর্যাদার ভিতর দিয়া সাধক-সমাজে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিল সিদ্ধ মহাত্মা লোকনাথ গোস্বামীর অবদানের প্রকৃত মাহাত্ম্য।

"লোকনাথ ক্রমে জরাগ্রস্ত এবং স্থবির হইয়া পড়িতেছিলেন; পূজার্চনার সকল রীতি রক্ষা করিতে পারেন না। জপ সংখ্যাও প্রত্যহ পূর্ণ হয় না। তবুও তিনি স্বাবলম্বনের পূর্ণ মূর্তি, কাহারও অপেক্ষা করিতে চাহিতেন না। নরোত্তম যে এত সেবা করিতেন, তবুও তিনি পরবশ হইলেন না। নরোত্তমের যখন গৃহে ফিরিবার ব্যবস্থা হইল তিনি তাহাকে অম্লান বদনে অনুমতি দিলেন, অথচ দ্বিতীয় শিষ্য গ্রহণ করিলেন না। নরোত্তমই তাঁহার একমাত্র শিষ্য।

লোকনাথের আর একটি বিশেষত্ব ছিল। তিনি আপনার কথা কাহাকেও কিছু বলিতেন না। কোনো প্রকারে কেহ তাঁহার কোনো গুণগাথা গায় তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি নিজে কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ লিখেন নাই, অথচ রূপ, সনাতন ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামিগণের সাধনতত্ত্বের অনেক সারাংশ তাঁহার নিকট হইতেই গৃহীত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন বৃন্দাবনের সকল ভক্তগণের উপদেশ ও আনুকূল্যে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিতেছিলেন, তখন লোকনাথও তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নিজের কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে তিনি বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। এজন্য সেই বিরাট গ্রন্থে সে যুগের বহু কথা, বহু ঘটনা চোখের জলের কালিতে লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে লোকনাথের কোনো কথা নাই। সে-যুগে এমন আত্মগোপন গোপাল ভট্ট ব্যতীত গোস্বামিপাদদিগের মধ্যেও আর কেহ করেন নাই। লোকনাথ গোস্বামীর জীবদ্দশায় কোনো লেখক তাঁহার কোনো কথা

কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। এই জন্যই লোকনাথ চরিত্রের অনেক তথ্য মনুষ্য নেত্রের পরবর্তী হইবার অবসর পাইতেছে না। লোকনাথের মতো নিস্পৃহ, সর্বত্যাগী মহাপুরুষ অতি বিরল[১]।"

বৃন্দাবনে গোস্বামীদের প্রতিভা, উৎসাহ ও কর্মনিষ্ঠার ফলে বহুতর বৈষ্ণবশাস্ত্র রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী ও অন্যান্য উচ্চকোটির সাধুরা স্থির করিয়াছেন এই অমূল্য শাস্ত্রসম্পদ গৌড়ে পাঠানো হইবে। ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, শ্রীজীবের তিন প্রতিভাধর ছাত্র। ইহাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইবে উপযুক্ত যানবাহন ও রক্ষীদল।

লোকনাথ গোস্বামীর বয়স তখন প্রায় একশত বৎসর। বৃন্দাবনের প্রাচীনতম সিদ্ধ-পুরুষ তিনি। তাঁহার কুঞ্জে আসিয়া শ্রীজীব তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। কহিলেন, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে নরোত্তমকে আমরা গৌড়ে পাঠাতে চাই। এদের মতো কঠোরতপা ভক্ত সাধকই বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে সমর্থ। মহাপ্রভুর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার জন্য এদের গৌড়ে যাওয়া প্রয়োজন।"

গোস্বামী লোকনাথ সোৎসাহে সমর্থন করিলেন এই প্রস্তাব। কহিলেন, "শ্রীজীব তোমাদের এই ব্যবস্থাপনায় মহাপ্রভুর কর্ম সিদ্ধ হবে, জীবের কল্যাণ সাধিত হবে। এতো অতি আনন্দের সংবাদ। নরোত্তমকে গৌড়ে যাবার অনুমতি অবশ্যই আমি দেবো।"

বিদায়কালে প্রাণাধিক শিষ্যকে লোকনাথ গোস্বামী কহিলেন, "বৎস নরোত্তম, আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করি, তোমার এই নূতন ব্রত সুসম্পন্ন হোক। তুমি আমার একমাত্র শিষ্য, সার্থকনামা শিষ্য। যখন যেখানে থাকো, বিষয়সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে, তা থেকে দূরে থাকবে। ভজনানন্দে অষ্টপ্রহরীর লীলা অনুধ্যানে করবে দিন যাপন।"

আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া নরোত্তম শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, কপোল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া লোকনাথ আবার কহিলেন, "বৎস, তোমায় আমি শিষ্য করেছি, নিজের দীর্ঘ দিনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে তোমার ভক্তি ও পুণ্যের বলে। আজ আমি তোমার কৃতবিদ্যতা ও সাধনোজ্জ্বলা বুদ্ধি দেখে পরম সন্তুষ্ট। যে কয়দিন বেঁচে আছি, আর কাউকে আমি শিষ্য করবো না। আমার শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনের প্রদীপকে একলাটি তুমিই রাখবে জ্বালিয়ে।"

জোড়হস্তে কাতরকণ্ঠে নরোত্তম বলেন, "প্রভু, আশীর্বাদ করুন, গৌড়ের কর্মব্রতের ফাঁকে ফাঁকে এ অধম যেন আপনার চরণ দর্শন ক'রে যেতে পারে।"

"না বৎস", সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন লোকনাথ গোস্বামী, "তোমার আর বৃন্দাবনধামে আসবার প্রয়োজন নেই। তোমার আমার এই শেষ দেখা।"

গুরুগতপ্রাণ ভক্ত নরোত্তমের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া তিনি ভূমিতলে পতিত হন।

কিছুকাল পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া ভিক্ষা

---

১ লোকনাথ গোস্বামী ঃ সতীশচন্দ্র মিত্র

মাগেন তাঁহার পাদুকা দুইটি। এই পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হন বৃন্দাবন হইতে।

অতঃপর তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকনাথ গোস্বামী আর বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই। আনুমানিক ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ধারিত চিরবিদায়ের ক্ষণটি আসিয়া যায়। ইষ্টদেব শ্রীরাধাবিনোদের বিজয়মূর্তি'র দিকে সজল নয়ন দুটি নিবদ্ধ করিয়া নবলীলায় ছেদ টানিয়া দেন চিরতরে। বৃন্দাবনের নব উজ্জীবনের জন্য যে প্রথম আলোকবর্তি'কাটি প্রভু শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, সেদিন তাহা নির্বাপিত হইয়া যায়।

রূপ গোস্বামী

শ্রাবণ মাসের বর্ষণ-জর্জর নিশীথ রাত্রি। ঝুপ্‌ঝুপ্ করিয়া অঝোরধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, সেই সঙ্গে বহিয়াছে উদ্দাম ঝড়ের হাওয়া। এই দুর্যোগের রাত্রে রামকেলি হইতে একটি তাঞ্জাম চলিয়াছে গৌড় শহরের দিকে। পথঘাট পিচ্ছিল, বাহকেরা খুব সতর্কপদে চলিতেছে।

তাঞ্জামের ভিতরে চিন্তিত মনে বসিয়া আছেন সন্তোষ দেব, সুলতান হুসেন শাহের রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা। সুলতানের জরুরী তলব আসিয়াছে তাড়াতাড়ি হাজির হওয়ার জন্য। তাই ভরা বর্ষার এই মধ্যরাত্রেই এভাবে তাহাকে ছুটিতে হইয়াছে।

হঠাৎ অসময়ে কেন এই তলব? দপ্তরের কোনো গোলযোগ? বড় ধরনের কোনো তহবিল তছরূপ? না সুলতান গোপনে কোনো সামরিক অভিযানে যাইতেছেন, এজন্য কোষাগার খোলার জন্য অধিকর্তাকে এমন তাড়াতাড়ি ডাকিয়া নেওয়া? জরির কিংখাবে মোড়া তাঞ্জামের ভিতরে, তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন সন্তোষ দেব। গড়গড়ার নলটি মুখে বসানো। চিন্তিত মনে মাঝে মাঝে সেটি টানিয়া চলিয়াছেন, বাদশাহী অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ও সুবাস ছড়াইতেছে চারিদিকে।

ঘন অন্ধকারময় রাজপথ হঠাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে বজ্র বিদ্যুতের আলোকে। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঝড়ে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আড়াআড়িভাবে পতিত হওয়ায় রাস্তাটি প্রায় বন্ধ। পথ চলিবার উপায় নাই। রাজপথের একপাশে সারি সারি পর্ণকুটির, রজকেরা এগুলিতে বাস করে। রাজপুরীর কাজকর্ম করিয়া সংসার চালায়।

রাজপথ বন্ধ, তাই বাহকেরা তাঞ্জামটি নিয়া একটি পর্ণকুটিরের ছাঁচতলা ঘেঁষিয়া ধীরপদে চলিতেছে, বর্ষণের ফলে সেখানে তখন জমিয়া গিয়াছে হাঁটুজল, জল ঠেলিয়াই ধীরে ধীরে বাহকদের চলতে হইতেছে।

তাঞ্জামে উপবিষ্ট অবস্থায় সন্তোষদেবের কানে পৌঁছিল পর্ণকুটিরের ভেতরকার আওয়াজ। গভীর রাত্রে এমন ঘোর বর্ষায় কে পথ চলিয়াছে তাহা নিয়া চলিয়াছে ধোপা ও ধোপানীর কথাবার্তা।

পুরুষ কণ্ঠের প্রশ্ন, "অন্ধকারে সপ্‌সপ্ শব্দে হাঁটুজল ঠেলে কে যাচ্ছে, কে জানে?"

নারীকণ্ঠের মন্তব্য শোনা যায়, "কে আর হবে? হয় কুকুর, বা চোর। নয়তো রাজার কোনো গোলাম। এ ঘোর দুর্যোগে আর কেউ তো বেরুবে না।"

"না গো, কুকুর নয়, চোরও নয়। কয়েকটা মানুষের পায়ের জলঠেলা শব্দ পাচ্ছি। হয়তো কোনো হতভাগা রাজকর্মচারী রক্ষীদল নিয়ে পথ চলেছে জরুরী তলব পেয়ে।

তাঞ্জামের ভিতর অর্ধশায়িত ছিলেন সন্তোষদেব, ক্ষিপ্রভাবে তিনি উঠিয়া বসেন। দম্পতির কথাগুলি যেন তাঁহাকে দংশন করে বৃশ্চিকের মতো। কুকুর বা তস্কর বা রাজার গোলাম। একই পর্যায়ভুক্ত এসব। দরিদ্র নিরক্ষর দম্পতির কথা বটে, স্থূল ধরনের মন্তব্য বটে, কিন্তু কথাগুলি তো মোটামুটিভাবে অসত্য নয়। রাজার গোলামী হলেও, এ গোলামী ঘৃণ্য, অসহ্য। সোনার খাঁচা বা লোহার খাঁচা বন্দী পাখির জীবনে একই দুর্ভাগ্য বহন করিয়া আনে।

ক্ষুণ্ণ মনে নিজের সমগ্র জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন সন্তোষদেব। বিষয়-বৈভব যথেষ্ট অর্জন করিয়াছেন. রাজসরকারে প্রচুর সম্মান। সুলতানের অনুগৃহীত বলিয়া দেশের সবাই সমীহ করে, সম্ভ্রম দেখায়। কিন্তু এই মান-ঐশ্বর্যময় জীবন এখনও তো দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘদিন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন। কিন্তু আজো তাহা করায়ত্ত হয় নাই। এই ব্যর্থ জীবন, বন্ধ্যা জীবন, আজ সত্যই তাঁহার পক্ষে বড দুর্বহ। নাঃ আর নয়, এবার রাজ প্রশাসনের উচ্চপদ ছাড়িয়া, বিত্তবিষয় সবকিছু বিলাইয়া দিয়া, বাহির হইবেন মুমুক্ষার পথে। ইষ্টদর্শনের জন্য, কৃষ্ণলাভের জন্য করিবেন মরণপণ।

সেদিনকার এই উদ্দীপনা ও আর্তি সন্তোষদেবের জীবনে ঘটায় রূপান্তর। রাজানুগ্রহ ও রাজসেবা চিরতরে তিনি ত্যাগ করেন, কৃষ্ণসেবায় সমগ্র জীবন করেন নিয়োজিত। সারা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব নেতারূপে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদরূপে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন, পরিগ্রহ করেন প্রভুর প্রদত্ত রূপ গোস্বামী নাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম অধিনায়করূপে বৃন্দাবনে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন আজো তাহা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রূপ গোস্বামীর পূর্বপুরুষ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এক সময় কর্ণাটকের কোনো অঞ্চলে ইঁহারা রাজত্ব করিতেন। পরবর্তীকালে ইঁহাদের একটি অধস্তন পুরুষ গৌড়ে আসিয়া রাজসরকারে কর্ম গ্রহণ করেন এবং স্থায়িভাবে গৌড়েই বসবাস করিতে থাকেন।

এই বংশের মুকুন্দদেব ছিলেন গৌড়ের বাদশাহের এক সুদক্ষ ও আস্থাভাজন উচ্চ কর্মচারী। ইঁহার পুত্রের নাম কুমারদেব। শাস্ত্রবিদ্ বৈষ্ণব বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কুমারদেব তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতামহ মুকুন্দদেবকে গ্রহণ করিতে হয় তিন পৌত্র, অমর, সন্তোষ ও বল্লভকে মানুষ করার দায়িত্বের ভার।

অমর, সন্তোষ ও বল্লভ উত্তরকালে প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও আশ্রয় লাভ করেন এবং প্রভু তাঁহাদের নূতন নামকরণ করেন, যথাক্রমে—সনাতন, রূপ ও অনুপম। অনুপম তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীজীবকে রাখিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। আর উত্তরকালে সনাতন ও রূপের অভ্যুদয় ঘটে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে, বৃন্দাবনের ভক্তিসাম্রাজ্যের নিয়ন্তারূপে।

পিতামহ মুকুন্দদেব সনাতন ও রূপের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে কোনো ত্রুটি করেন নাই। রামকেলিতে রামভদ্র বাণীবিলাসের নিকট তাঁহারা ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করেন। তারপর তাঁহাদের নবদ্বীপে পাঠানো হয়, সেখানে রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি এবং বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন করেন উচ্চতর শাস্ত্র।

মুকুন্দদেব বিচক্ষণ ব্যক্তি। বুঝিলেন, শুধু শাস্ত্রবিদ্যায় রাজসরকারে উচ্চপদ মিলিবে না, এজন্য চাই ফার্সী ও আরবী ভাষার শিক্ষা। সপ্তগ্রামের শাসক সৈয়দ ফকরুদ্দীন মুকুন্দদেবের বন্ধু, ফার্সী ও আরবীতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উভয় ভ্রাতা ঐ ভাষা দুইটি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াও উঠিলেন।

দরবারে পিতামহের প্রতিপত্তি ছিল, তাই অল্পবয়সে সনাতন রাজকার্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। প্রখর বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মকুশলতার গুণে অধিকার করিলেন মুখ্য সচিবের পদ। ছোটভাই রূপকে তিনি ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন রাজস্ব বিভাগে, বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিচালন দক্ষতার অল্পসময়ে তিনি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, উন্নীত হইলেন রাজস্ব অধিকর্তার উচ্চপদে।

গৌড়ের সন্নিহিত গ্রাম রামকেলিতে উভয় ভ্রাতা বাস করিতেন। পদমর্যাদা, বিত্ত এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়া তাঁহারা অগ্রণী। ধর্ম এবং সমাজের নেতৃত্বও ছিল তাঁহাদেরই করায়ত্ত। রামকেলিতে তাঁহাদের ভবনে প্রায়ই আগমন ঘটিত শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণদের, ধর্মীয় আলোচনা ও বিচার অনুষ্ঠিত হইত সোৎসাহে। রূপ ও সনাতনের বিদ্যা ও বৈদগ্ধ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ব্রাহ্মণ এবং সাধুসজ্জনের ভিড় লাগিয়াই থাকিত তাঁহাদের গৃহে, আদর আপ্যায়ন ও সন্ধানে রূপ ও সনাতন সকলের সন্তোষ বিধান করিতেন।

রামকেলির এই পরিবেশ হইতে বাহির হইলেই দেখা যাইত রূপ সনাতনের আর এক রূপ। সেখানে তাঁহারা গৌড়ের বাদশাহের আস্থাভাজন ও অতি অন্তরঙ্গ উচ্চ কর্মচারী। দরবারের মুসলিম পরিবেশের রূপান্তরিত মানুষ তাঁহারা। চোগা চাপকান সমন্বিত পোশাক, আরবী ফার্সী বুলির চমৎকারিতা, এবং মুসলমানী আদব-কায়দা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তাঁহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক।

বৈষ্ণবীয় সংস্কার পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল রূপ ও সনাতনের বংশে। এবার উভয় ভ্রাতার মধ্যে এই সংস্কার ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠে। প্রেমভক্তির রসধারায় অন্তর অভিসিঞ্চিত হয়, কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রাণমন হয় অধীর চঞ্চল। মুক্তির আকুতি আর বিষয় বৈরাগ্য ক্রমে দুর্বার হইয়া উঠে।

সারা গৌড়দেশে তখন নবদ্বীপের চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের কথা, প্রেমভক্তি ধর্মের নবতন আন্দোলনের কথা, অন্যান্য স্থানের মতো রামকেলিতেও আলোচিত হইতেছে। ভক্ত মানুষ, মুক্তিকামী মানুষ নূতনতর আবেগ আর নূতনতর আশার অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

সনাতন ও রূপ এসময়ে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় চাহিয়া পত্র দিলেন। প্রভু জানাইলেন, এখন নয়, আরো কিছুদিন তোমরা অপেক্ষা করো।

অতঃপর সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু নিজেই একদিন বৃন্দাবন গমনের ছলে রামকেলিতে আসিয়া উপস্থিত। রূপ ও সনাতন ছুটিয়া গেলেন তাঁহার পদপ্রান্তে, সংসার ত্যাগের জন্য উভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। এবারও প্রভু বাধা দিলেন, কহিলেন আরো কিছুকাল ধৈর্য ধারণ করো।

প্রভুর সেদিনকার দিব্য দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের পর হইতেই বিষয় বিতৃষ্ণায় দুই ভ্রাতার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। অতঃপর কি করিয়া নিগড় কাটিয়া ফেলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিবেন, এই চিন্তাই কেবল করিতেছেন।

মনের এই নির্বিঘ্ন অবস্থায় সেদিনকার দুর্যোগময় রাত্রে রূপের সর্বসত্তায় এক প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গেল। সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন,—চিরতরে করিবেন গৃহত্যাগ। প্রভু শ্রীচৈতন্যের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া হইবেন কন্থা করঙ্গধারী বৈষ্ণব, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন কৃষ্ণভজনে।

রূপ এবং সনাতন দুই ভ্রাতা নিতান্ত আকস্মিকভাবে রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হন নাই এবং মন্ত্রবলে প্রেমভক্তি রসের রহস্য জ্ঞাত হন নাই। এজন্য সংসার জীবনে, উচ্চ রাজপদে থাকার কালে দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়া তাঁহাদের চলিতে হইয়াছে। এ প্রস্তুতির মূল নিরূপণ না করিলে তাঁহাদের ত্যাগপূত জীবনের মূল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভক্তিরত্নাকর বলিতেছেন।

সদা সর্বশাস্ত্র চর্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন ॥
ন্যায়সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয় ॥

গবেষক ও ইতিহাসকার সতীশচন্দ্র মিত্র সনাতন ও রূপের শাস্ত্রচর্চার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ঃ

শুধু নিজেরা দুইজনে তর্ক করিয়া কোনো মত খণ্ডন বা নূতন মত স্থাপন করিতেন, তাহা নহে, অন্য পণ্ডিতেরাও কেহ ন্যায়শাস্ত্রের কোনো নূতন ব্যাখ্যা করিলে তাহা উভয় ভ্রাতাকে জানাইয়া এবং অনুমোদিত করিয়া না লইলে কাহারও চিত্ত স্থির হইত না। এইভাবে উচ্চ রাজকার্য হইতে যেটুকু অবসর মিলিত, ভ্রাতৃদ্বয় তাহা শাস্ত্রচর্চায় অতিবাহিত করিতেন। সনাতনের গুরুদেব বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় সাধারণত নবদ্বীপ-সংলগ্ন বিদ্যানগরে বাস করিতেন। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুরীতে এবং পিতা কাশীতে যান, তখন তিনি সময় সময় দীর্ঘকাল গৌড়ে আশ্রয় লইতেন। দূর দেশ হইতে যে সব শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত সুব্রাহ্মণ আসিতেন, রাজাজ্ঞাতেই আসুন বা সনাতনের আহ্বানেই আসুন, দুই ভ্রাতা পরম যত্নে রামকেলির বাড়িতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন এবং সশ্রদ্ধ আপ্যায়নে সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন। এজন্য তাঁহারা অজস্র অর্থব্যয়ে কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না। রামকেলিতে চতুষ্পাঠী বসিয়াছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠনপাঠন হইত। তাঁহারা সে সকল অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইরূপ নানাভাবে রামকেলিতে বহু ব্রাহ্মণ আসিতেন, সুদূর কর্ণাট দেশ হইতেও তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আসিতেন। সুগন্ধ কুসুম ফুটিলে তাহার সৌরভামোদে চারিদিক হইতে ভৃঙ্গকুল আসিয়া থাকে, তেমনি তাঁহাদেরও যশ সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকেরই জন্য তাঁহারা বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

"কর্ণাট দেশাদি হইতে আইলা বিপ্রগণ ॥
সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে ॥
ভট্টগোষ্ঠী বাসে 'ভট্টবাটী' নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, সর্বমতে অনুপম ॥"

কলিকাতার নিকটবর্তী আধুনিক ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ার মতো রামকেলির পার্শ্বে ভাগীরথী তীরেও আর একটি ভট্টবাটী গ্রাম হইয়াছিল, এখন তাহার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

তাঁহারা যে অবসরকালে কেবল শাস্ত্রচর্চা লইয়া থাকিতেন, তাহা নহে, ধর্ম সাধনায়ও তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। একদিনেই মানুষ নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে না। সকল প্রতিভারই উন্মেষ পূর্ব জীবনে হইয়া থাকে। যদি কেহ ভাবিয়া থাকেন, মুসলমান নৃপতির কর্মচারী রূপ সনাতন বৃন্দাবনে গিয়া একদিনেই মহাপণ্ডিত পণ্ডিত ও ভক্তচূড়ামণি

হইয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা কথা। উভয় ভ্রাতা অসাধারণ পণ্ডিত পূর্ব হইতেই ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ভক্তির উন্মেষ কর্মজীবনেই হইয়াছিল, নতুবা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে ছুটিয়া রামকেলিতে আসিতেন না। উভয় ভ্রাতা অতি ভক্তিনিষ্ঠার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন এবং বৃন্দাবনলীলার অনুষ্ঠানও প্রায়শ করিতেন। বৃন্দাবনলীলার বহু বিগ্রহ রামকেলি গ্রামের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এজন্য ঐ গ্রামের অন্য নাম, কৃষ্ণকেলি। রামকেলিতে তাঁহাদের আবাসবাটীর চারিধারে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড—এই নামে কতকগুলি সরোবর রহিয়াছে। তাহাদের সাধনভজন সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে আছে—

বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্বকানন রাধাশ্যাম কুণ্ড তা'তে ॥
বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥

এখানেও তাঁহারা বিগ্রহ সেবা করিতেন, এখানেও তাঁহারা সাধুসঙ্গ সাধুসেবা করিতেন। সময়ে সময়ে তাহা করিতে না পারিয়া বিরক্ত ও বিষণ্ণ হইতেন। বিষয়ী রাজার সেবা এবং রাজকার্য পরিচালনা করিতে গিয়া যখন পদে পদে তাঁহাদের অনুকূল পথের অন্তরায় উপস্থিত হইত তখন তাঁহারা অবিরত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেন, ইহাতেই তাঁহাদের বৈরাগ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

রূপ এবং সনাতন দুই ভাইয়েরই প্রতিভার বিকাশ দেখা দিয়াছিল তাঁহাদের যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে। এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল সংস্কৃত শাস্ত্র এবং আরবী ফার্সী-সাহিত্যের পারদর্শি'তা। তারপর উভয়ে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিলেন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়া। "দর্শনশাস্ত্রে সনাতনের এবং কাব্য ব্যাকরণাদিতে রূপের কিছু বিশেষ অধিকার ছিল। যৌবনেই লোকের কবিত্বের উন্মেষ হয়, রূপেরও তাহা হইয়াছিল। তিনি গৌড়ে থাকিতেই তাঁহার দুইখানি কাব্য হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশ রচনা করেন। অগ্রজ অপেক্ষা রূপ বোধহয় পারসীক ভাষায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার কাব্যানুরক্তির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহার ভাষার মধ্যে যে কোমল কাব্য-কলার মধুর নিক্কণ অনুভূত হয়, তাহাতে পারস্য সাহিত্যের ঋণ অস্বীকার করা যায় না। তরুণ বয়সে সপ্তগ্রামে থাকিয়া উভয় ভ্রাতায় তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শাসনকর্তা, সৈয়দ ফকরউদ্দীনের নিকট থাকিয়া পারসীক ভাষা শিক্ষা করেন।

"সনাতনের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্যদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া সুলতান হুসেন শাহ্ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপকে রাজস্ব বিভাগে উচ্চ পদ প্রদান করেন। ঐ বিভাগের কার্যে যেরূপ সূক্ষ্ম সন্ধান, কার্যকুশলতা এবং লোকপরিচালনের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন রূপের তাহা ছিল। তিনি স্থূলকায় ছিলেন, তাঁহার মুখাবয়বে এমন একপ্রকার কঠোর তেজস্বিতা প্রচ্ছন্ন ছিল যে তাঁহাকে দেখিলেই লোক মস্তক অবনত করিত। সুকুমার দেহ সনাতনের প্রশান্ত মূর্তি ও ভাবগাম্ভীর্য দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ভক্তি করিত, রূপের মুখপ্রতিভা দেখিয়া সকলে তাহাকে ভয় করিত। রূপের মতো ব্যক্তি লোকপাল হইবাই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনে গিয়া তিনিই তথাকার সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার মতো

রাজভাবী লোকদিগের অন্তঃকরণে কোনো নীচতা বা সংকীর্ণতা আসিতে পারে না, তাঁহারা সর্বত্রই সর্বকার্যে বিশ্বাসী ও প্রতিপত্তিশালী হন।

"রাজকার্যে রূপের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততার জন্য সুলতান হুসেন শাহ্ তাঁহাকে সাকর বা সাকের (বিশ্বস্ত) মল্লিক" এই সম্মানসূচক নাম এবং উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি সকল কার্যই বলদর্পের সহিত করিতেন। তাঁহার সংকল্প স্থির হইতে বিলম্ব হইত না, সংকল্প হওয়া মাত্র উহা তিনি কার্যে পরিণত করিতে দৃঢ় চেষ্টা করিতেন। রাজস্ব সচিবরূপে রূপ যে রাজা প্রজা সকলের নিকট হইতে প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি এমন সুন্দরভাবে পারসীক লিখিতে, পড়িতে ও অনর্গল বলিতে পারিতেন এবং সকল মুসলমান কর্মচারীর সহিত মিশিয়া কার্য নির্বাহ করিতেন যে সাকর মল্লিক মুসলমান বা হিন্দু ছিলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। নানাভাবে বিধর্মীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে গিয়া তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা সকলেই কতকটা ম্লেচ্ছাচারী হইয়া গিয়াছিলেন। রাজকার্যে তাঁহাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত এবং মুসলমানী হাবভাব তাঁহাদিগকে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইতে হইলেও তাঁহারা নিজগৃহে কখনও শাস্ত্রচর্চা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা পণ্ডিতগণকে পাইলে দর্শনাদি শাস্ত্র লইয়া ঘোর তর্কবিতর্ক করিতেন।"[১]

সেদিন সুলতানের সহিত সাক্ষাতের পরই রূপ রামকেলিতে ফিরিয়া আসিলেন আর কালবিলম্ব না করিয়া সরাসরি উপস্থিত হইলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের কক্ষে। তারপর নিবেদন করিলেন নিজ সংকল্পের কথা।

সব কিছু শোনার পর সনাতন গম্ভীর হইয়া উঠেন। প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন, "তোমার বক্তব্য সবই আমি শুনলাম। কিন্তু আমি তো এতে সম্মতি দিতে পারিনে, ভাই। আমি জ্যেষ্ঠ, আমি স্থির ক'রে রেখেছি, প্রথমে আমিই করবো সংসার ত্যাগ। আগে আমায় যেতে দাও। পরে সুযোগমত তুমি একদিন চলে আসবে।"

নিজ সিদ্ধান্তে রূপ অটল। যুক্তকরে বলেন, "জীবনের সকল কিছু ব্যাপারে আপনি আমার শিক্ষাদাতা, প্রেরণাদাতা। আপনাকে আমি শুধু বড় ভাই রূপেই দেখি না, গুরুস্থানীয় বলে মনে করি। সব কাজ করি আপনার উপদেশ ও নির্দেশ মতো। কিন্তু এবারটি আমার নিজের প্রাণের আবেগ অনুযায়ী চলতে দিন।"

সনাতন ধীর স্থির বিচক্ষণ। উত্তর দেন, "আবেগের কথা তুমি বলছো বটে, কিন্তু যুক্তি বা শালীনতার কথাও তো জড়িত রয়েছে এতে। তুমি যদি আগে সংসার ছাড়ো, লোকে আমার কি বলবে বলতো? আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বয়েসও আমার যথেষ্ট হয়েছে। এই বয়সে রাজকার্য থেকে অবসর নেওয়াই তো আমার উচিত। তাছাড়া, মহাপ্রভুর উপদেশ মতোই এতকাল আমি সংসারে রয়ে গিয়েছি, আর তো আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনে। আমাকে বৈরাগ্য গ্রহণ করতেই হবে।"

এবার নিজ যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করেন রূপ। দৃঢ়স্বরে নিবেদন করেন, "রাজসরকারে আপনি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে রয়েছেন। শান্তির সময়ে, প্রশাসনের ব্যাপারে, যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদাই বাদশাহ্ আপনার মতামতকে মূল্যবান মনে করেন। আপনার পরামর্শ নেন। তাই নয় কি?"

---

১ রূপ গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

"হ্যাঁ, একথা যথার্থ।"

"বিশেষ ক'রে এ সময়ে উড়িষ্যারাজের সঙ্গে বাদশাহের ঘোর মতান্তর চলছে, যে কোনো সময়ে একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"তাই তো এ সময়ে আপনি কাজকর্ম ত্যাগ করলে বাদশাহ্ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। তারপর আবার আমি যখন চলে যাবো তিনি ভাববেন, আমরা ষড়যন্ত্র করেছি, একযোগে কাজে ইস্তফা দিয়ে বাদশাহ্‌কে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছি। তার ফলে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের উপর ঘোর অত্যাচার চলতে থাকবে। কাজেই আমার প্রস্তাবটি আপনি মেনে নিন।"

সনাতন এবার কিছুটা নরম হইয়াছেন। এই সুযোগে রূপ আবার কহিলেন, "সংসারের এবং আত্মীয়-কুটুম্বদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা সব আমি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলছি। এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি চলে যাবার পর আপনি যাতে সহজে এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেন সে ব্যবস্থাও আমি ক'রে যাবো।"

রূপের প্রার্থনা এবার মঞ্জুর হইল। সনাতন প্রাজ্ঞ এবং বিচক্ষণ বটে, কিন্তু সংসারের ব্যবস্থাপনা নিয়া তিনি কোনো মাথা ঘামাইতেন না, প্রধানত রূপই এসব কাজ করিতেন। এবার উভয়ে মিলিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে বেশ কিছুক্ষণ পরামর্শ চলিল এবং কার্যক্রম সম্বন্ধে একমত হইলেন।

সকলের সঙ্গে দেনা পাওনার হিসাব রূপ তাড়াতাড়ি মিটাইয়া ফেলিলেন। রামকেলি রাজধানী গৌড়ের অতি নিকটে, সেখানে আত্মপরিজনদের আর থাকা তেমন নিরাপদ নয়। তাহাদের কিছু সংখ্যককে পাঠানো হইল চন্দ্রদ্বীপের প্রাসাদে বাকলায়। ফতেহাবাদের প্রেমভাগে আর একটি ভবন তাঁহাদের ছিল, সেখানেও সরাইয়া দিলেন অনেককে। ধন সম্পত্তি সমস্ত কিছু গুছাইয়া নেওয়া হইল। বিগ্রহ সেবা, কুলগুরু, ব্রাহ্মণ ও প্রাপকদের অসুবিধা না হয় এজন্য দরাজ হাতে করিলেন এককালীন দান। চৈতন্য চরিতামৃতে এই বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে :

শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহু ধন, লঞা ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে ॥
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥

তাছাড়া, সংকট সময়ে সনাতনের প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া এক মুদির কাছে রূপ দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিলেন।

ইতিমধ্যে রূপ শ্রীচৈতন্যের সন্ধান নিবার জন্য নীলাচলে লোক পাঠাইয়াছিলেন। শুনিলেন, প্রভু ঝাড়িখণ্ডের পথে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পথে মিলিত হইবেন, এবং একত্রে বৃন্দাবনে পৌঁছিবেন এজন্য রূপ আগ্রহী। তাই তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া নিয়া পদব্রজে ধাবিত হইলেন ঝাড়িখণ্ডের অরণ্য পথে। সঙ্গে চলিলেন মুমুক্ষু কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর শুনিলেন, হুসেন শাহ্‌ সনাতনের বৈরাগ্য প্রবণতায় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং তিনি মুখ্য সচিবের কাজ ত্যাগ করিবেন একথা বলায় তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছেন কারাগারে। তৎক্ষণাৎ পথ হইতে রূপ একটি লোক মারফত পত্রী পাঠাইলেন। লিখিলেন, সনাতন যেন এ সংকটে প্রয়োজন বোধে, মুদির নিকট গচ্ছিত রাখা টাকাটা কাজে লাগান এবং উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসেন।

মুক্তিলাভের ঐ পন্থাটি গ্রহণ করা ছাড়া সনাতনের আর উপায় ছিল না। অতঃপর কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর কাশী পৌঁছিয়া লাভ করেন তাঁহার দর্শন। এই দর্শনের সময়েই সনাতনকে করেন প্রভু আত্মসাৎ।

রূপ এবং বল্লভ প্রয়াগে পৌঁছিয়া শুনিলেন, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রভুর বহু আকাঙ্ক্ষিত দর্শন এবার সম্ভব হইবে, আশ্রয় মিলিবে তাঁহার চরণতলে। রূপের আনন্দ আর ধরে না।

শ্রীচৈতন্য বিন্দুমাধব মন্দিরে আসিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট অপরূপ আনন্দঘন মূর্তি, মুখে মধুর কণ্ঠের কৃষ্ণনাম। সহস্র সহস্র ভক্ত এই দেবমানবকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। আনন্দে অধীর হইয়া, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থীরা নাচিতেছে গাহিতেছে। এক বিরাট জনসংঘট্ট সেখানে।

দূর হইতে প্রভুর দিব্য ভাবাবেশ দেখিয়া রূপের সারা দেহ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে, নয়নে বহিতে থাকে অশ্রুধারা। কিন্তু সেই বিপুল জনসমুদ্রে প্রভুর সম্মুখীন হইবেন কি করিয়া? এক দাক্ষিণী ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে সেদিন শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষার নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে রূপ ও বল্লভ দুই ভ্রাতা গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভু তো মহাউল্লসিত। বার বার কহিতে থাকেন, "কৃষ্ণের কি অপার করুণা তোমাদের ওপর। বিষয়কূপ থেকে এবার দু'জনকে উদ্ধার করিলেন। আহা কি ভাগ্যবান্ তোমরা দু'ভাই।"

প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ভক্তগৃহে বাস করিতেছেন। রূপ এবং বল্লভও নিকটস্থ এক কুটিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বৈদিক যজ্ঞে পারঙ্গম, শাস্ত্রবিদ্ বল্লভ ভট্ট সে সময়ে ত্রিবেণীর অদূরে এক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার গৌড়দেশাগত দুই নবাগত ভক্তকে ভট্টজী সেদিন তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

রূপের দিব্যকান্তি ও ভাবাবেশ দেখিয়া বল্লভ ভট্ট মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, রূপ অমনি চকিতে দূরে সরিয়া গেলেন, "না—না, ভট্টজী, আমায় কেন আপনি স্পর্শ করছেন? আমি অস্পৃশ্য পামর। এতকাল কাটিয়ে এসেছি পাপ কর্মে। আমি তো আপনার স্পর্শযোগ্য নয়!"

বিলাস ও ঐশ্বর্যে চিরলালিত ক্ষমতার চূড়ায় বসিবা থাকিতে সদা অভ্যস্ত, রূপের এই দৈন্য বৈরাগ্যভাব দেখিয়া শ্রীচৈতন্য মহাসন্তুষ্ট। অদূরে বসিয়া মিটিমিটি হাসিতেছেন তৃপ্তির হাসি।

দশদিন প্রয়াগে প্রভুর পুণ্যময় সান্নিধ্যে অবস্থান করেন রূপ। এই দশদিনেই প্রভু

তাঁহার সাত্ত্বিক আধারে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেন বৈষ্ণবীয় সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব। ব্রজ-রসের পরমতত্ত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন তাঁহার নিজ মুখে।[১]

শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃষ্ণসেবার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন প্রভু। তারপর ভক্তি সাধনার ক্রম, কৃষ্ণভক্তিরসের বৈচিত্র্য, এবং সর্বোপরি কান্তাভাবসম্পন্ন মধুর রসের দিগ্‌দর্শন করেন। শুধু তাহাই নয়, কৃপাভরে নবীন সাধক রূপের আধারে করেন শক্তি সঞ্চারিত।

কৃষ্ণভক্তি ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইলা প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি তাহার সব সঞ্চারি ॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা ॥

(চৈ-চরিতামৃত)

রূপের হৃদয় মন স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে প্রভুর কৃপায় জীবন হয় কৃতকৃতার্থ। এবার প্রভু বারাণসীর দিকে যাইবেন, প্রেমালিঙ্গন ও আশীর্বাদ দিয়া কহিলেন, "রূপ, তুমি বৃন্দাবনে যাও। যে তত্ত্ব লাভ করলে বৃন্দাবনের পবিত্র ধামে এবার তা স্ফুরিত হয়ে উঠুক, এই আমি চাই।"

অতঃপর রূপ ও অনুপম বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। এখানে পৌঁছিয়াই ভক্তপ্রবর সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিল।

সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের এক প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী। বাদশাহ হুসেন শাহ্ তাঁহার প্রথম জীবনে, যখন সহায় সম্পদহীন ভাগ্যান্বেষী যুবক মাত্র, তখন তিনি সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে এক নগণ্য চাকুরি গ্রহণ করেন। কোনো অপরাধে লিপ্ত থাকায় সুবুদ্ধি রায় তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হয় এবং চাবুক মারিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেন। ঐ চাবুকের ক্ষতের দাগ দীর্ঘদিন পরেও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। উত্তরকালে এই হুসেনের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়, তিনি গৌড়ের বাদশাহ্ হইয়া বসেন।

হুসেন শাহের বেগম একদিন স্বামীর পৃষ্ঠে ক্ষতের দাগ দেখিয়া বিস্মিত হন এবং উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পুরাতন দিনের ঘটনাদি বাদশাহ বিবৃত করেন এবং উল্লেখ করেন প্রাক্তন মনিব সুবুদ্ধি রায়ের বেত্রাঘাতের কথা। বেগম তো একথা শুনিয়া মহা উত্তেজিত। জেদ ধরিয়া বসেন, সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। হুসেন শাহ্ কিন্তু এ দণ্ড দিতে সম্মত হন নাই। বলেন প্রাক্তন অন্নদাতার প্রাণনাশ করা তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইবে না। অতঃপর বেগম ও ওমরাহরা সবাই মিলিয়া স্থির করেন, প্রাণনাশের বদলে সুবুদ্ধি রায়ের ধর্মনাশ করা হোক। এই প্রস্তাব অনুযায়ী অপরাধীর মুখে কুখাদ্য পুরিয়া দেওয়া হইল।

জাতিভ্রষ্ট মর্মাহত সুবুদ্ধি রায় তখন বিত্ত বিষয় ছাড়িয়া কাশীতে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের কাছে উপস্থিত হন, জানিতে চাহেন জাতিনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান। পণ্ডিতেরা বলেন, এজন্য তপ্তঘৃত পান করিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে।

---

১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় : কবি কর্ণপুর

প্রভু শ্রীচৈতন্য তখন কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া ভক্তসমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে প্রবল উদ্দীপনা। সুবুদ্ধি রায় শ্রীচৈতন্যের চরণে নিপতিত হইলেন, কাঁদিয়া কহিলেন, "প্রভু, আপনি স্বয়ং ঈশ্বর। আমায় বলুন, জাতিনাশের পাপ স্খালনের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে হবে।"

প্রভু কহিলেন, "একবার কৃষ্ণনাম যত পাপ হরে, জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে? তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানকার পবিত্র রজে প্রত্যহ গড়াগড়ি দাও, আর কৃষ্ণনামের জপধ্যানে জীবন সার্থক ক'রে তোল। এই হল তোমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান।"

সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণে এবার নূতন আশা সঞ্চারিত হয়। বৃন্দাবনে আসিয়া শুরু করেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় বৈষ্ণব-জীবন।

গৌড় বাদশাহের অন্যতম প্রধান কর্মচারী রূপকে সুবুদ্ধি রায় ভালো করিয়াই চিনিতেন। বৈরাগী হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের শরণ নিয়াছেন এবং বৃন্দাবনে আসিয়াছেন জানিয়া তাঁহার আনন্দের আর অবধি নাই।

ছুটিয়া আসিয়া রূপ ও অনুপমকে প্রেমভরে জড়াইয়া ধরিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করাইলেন পবিত্র দ্বাদশ বন।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্যের কথা আলোচনা করিয়া কিছুদিন আনন্দে কাটিয়া গেল।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ তখন ব্রজমণ্ডলের অভ্যন্তর ভাগে অরণ্যে ঘোরাঘুরি করিতেছেন. ইঁহাদের সঙ্গে রূপ ও অনুপমের এসময়ে সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রায় একমাস বৃন্দাবনে বাস করার পর রূপের মন উচাটন হইয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন চিরদিন তাঁহার পথ-প্রদর্শক ও পরিচালক। গুরুর মতো রূপ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। সেই সনাতন এখনো বাদশাহের কারাগারে রহিয়াছেন না মুক্ত হইয়াছেন, সে সংবাদ তাঁহার জানা নাই। মনের দুশ্চিন্তা কোনোমতেই দূর হয় না। অবশেষে অনেক কিছু ভাবিয়া-চিন্তিয়া দুই ভ্রাতা কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন, বাহির হইয়া পড়িলেন সনাতনের সন্ধানে। পদব্রজে চলিলেন কাশীর দিকে।

সনাতন ইতিমধ্যে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কাশীতে গিয়া লাভ করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের কৃপা। সেখান হইতে ভিন্ন পথে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, রূপের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল না। কাশীতে পৌঁছিয়া সনাতনের সংবাদ পাইয়া রূপ প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রভু চৈতন্যের কৃপা তিনি লাভ করিয়াছেন, একথা জানিয়া আনন্দে মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিল।

অনুজ অনুপম ছিলেন ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। বৃন্দাবনে থাকা সম্পর্কে তিনি তখনো মন স্থির করিতে পারেন নাই। রূপকে কহিলেন, গৌড়ের দিকে তাঁহার মন চলিতেছে, এসময়ে সনাতনও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, রূপ যদি আর একবার কিছুদিনের জন্য গৌড়ে যান, বিষয় সম্পর্কিত শেষ বিলিব্যবস্থা করিয়া আসেন তবে বড় সুবিধা হয়।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে রূপকে রাজী হইতে হইল, উভয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন গৌড়দেশে। সেখানে পৌঁছানোর পর ঘটিল এক মহাদুর্দৈব, অল্প কিছু দিনের মধ্যে এক মারাত্মক রোগে ভুগিয়া অনুপম দেহত্যাগ করিলেন।

প্রিয় অনুজের এই শোকাবহ মৃত্যু রূপকে ফেলিয়া দিল নানা সাংসারিক দায়িত্ব ও সমস্যার মধ্যে। এদিকে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শনের জন্য, তাঁহার পুণ্যময় সান্নিধ্যের জন্য, মন তাঁহার অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এখানকার সমস্যা মিটাইয়া ফেলিয়া পদব্রজে ছুটিয়া চলিলেন নীলাচলে।

আগে হইতেই রূপ মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছেন, ভক্ত হরিদাসের কুটিরে তিনি আশ্রয় নিবেন, তারপর সুযোগমতো করিবেন প্রভুর চরণ দর্শন। দীর্ঘদিন গৌড় দরবারে থাকায় ম্লেচ্ছ স্পর্শদোষ তাঁহার ঘটিয়াছে, তাই প্রভু শ্রীচৈতন্যের নিষ্ঠাবান্ উচ্চবর্ণের ভক্তদের গৃহে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে ঠিক নয়।

প্রবীণ ভক্ত হরিদাসের কুটিরে পৌঁছিতেই বাহু প্রসারিয়া রূপকে তিনি জ্ঞাপন করেন আন্তরিক সংবর্ধনা। স্নেহভরে কহেন, "রূপ, তুমি আসবে, তা আমরা সবাই জানি। মহাভাগ্যবান্ তুমি, প্রভু সাগ্রহে তোমার প্রতীক্ষা করছেন, বার বার বলছেন তোমারই কথা।"

প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিনচর্যা ছিল প্রত্যহ সকালবেলায় অন্তবালবাসী পরম ভক্ত হরিদাসকে দর্শন দেওয়া। জগন্নাথদেবের উপল ভোগের সময় প্রভু সেখানে স্বগণসহ উপস্থিত থাকিতেন। তারপরই চলিয়া আসিতেন হরিদাসের নিভৃত কুটিরে। এখানে অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তদের নিয়া চলিত ইষ্টগোষ্ঠী এবং প্রেমরস তত্ত্বের আলোচনা।

হরিদাসের কুটিরে প্রভু পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে রূপ ছুটিয়া আসিলেন, নিবেদন করিলেন দণ্ডবৎ প্রণাম। আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্নাদির পর পরমানন্দে সবাই প্রভুকে ঘিরিয়া বসিলেন, ভাগবত ও কৃষ্ণকথার জোয়ার বহিতে লাগিল।

পুরীধামের রথযাত্রা তখন আসন্ন। গৌড়ীয় ভক্তদল প্রভুর দর্শন ও সান্নিধ্যের লোভে পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। প্রভুর সহিত মিলনের পর মাতিয়া উঠিয়াছেন আনন্দরঙ্গে। এই ভক্তদের মধ্যে রহিয়াছেন প্রবীণ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি।

সেদিন কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে নিয়া প্রভু হরিদাসের কুটিরে আসিয়াছেন। রূপকে আলিঙ্গন দানের পর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে কহিলেন, "কৃষ্ণের আহ্বানে রূপ বিষয়কূপ ছেড়ে চলে এসেছে। আপনারা দু'জন তাঁকে আশীর্বাদ দিন, কৃষ্ণের ভজনে সে যেন সিদ্ধ হয়, আর কৃষ্ণভক্তি রসের গ্রন্থ লিখে যেন সাধন করতে পারে জীবের মঙ্গল।"

গৌড়ীয় নেতারা, রামানন্দ রায়, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি এই প্রতিভাধর নূতন ভক্তকে জ্ঞাপন করেন তাঁহাদের প্রাণভরা আশীর্বাদ। রূপের চেহারার একটা বিশেষ মাধুর্য ও কমনীয়তা ছিল, আর তাই স্বভাবে ছিল বিনয় ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠা। অচিরে প্রভুর গৌড়ীয় ও ওড়িশী ভক্তদের তিনি পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

প্রভু তাঁহার ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে যেখানে যেখানে উপস্থিত হন, দিব্য আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়। ভক্তিপ্রেমের দিব্য ভাবাবেশে সবাই মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। কখনো শ্রীমন্দির চত্বরের কীর্তনে, কখনো সমুদ্র স্নানে, কখনো বা গুণ্ডিচা মার্জনে, দিনের পর দিন চলে উৎসব আর আনন্দ-হুল্লোড়।

ভক্ত হরিদাসের মতো রূপও নিজেকে দৈন্যভরে মনে করেন ম্লেচ্ছাধম তাই শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের ভিতরে কখনো যান না। দূর হইতেই দর্শন ও প্রণাম করেন। প্রভুর নর্তন

কীর্তন ও পুণ্যময় নানা অনুষ্ঠানে প্রবল জনসংঘট্ট হয়, সেসব স্থানও রূপ সযত্নে পরিহার করিয়া চলেন। দূর হইতে প্রভু ও ভক্তগোষ্ঠীর আনন্দলীলা মুগ্ধনেত্রে দর্শন করেন, প্রণাম জানান বার বার।

কিন্তু রাতের অধিকাংশ সময়ই কাটে হরিদাসের নিরালা ভজন কুটিরে। এখানে নানা নামমূর্তি হরিদাস প্রায় সময়ে নিবিষ্ট থাকেন তাঁহার সংকল্পিত নামজপের সাধনায়। আর এককোণে একান্তে বসিয়া রূপ ব্যাপৃত থাকেন রসশাস্ত্রের অবগাহনে আর গ্রন্থ-রচনায়।

প্রত্যহ জগন্নাথদেবের ভোগরাগ সম্পন্ন হইবার পর একান্তবাসী ভক্তদ্বয় হরিদাস আর রূপের জন্য প্রসাদ পাঠানো হয়। ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উভয়ে নিরত হন নিজ নিজ নির্দিষ্ট সাধনায় ও কর্মে।

"রূপ গোস্বামী আজন্ম সুকবি। একধারে এমন কবিত্ব পাণ্ডিত্য ও ভক্তি অতি কম দেখা যায়। গৌড়ে থাকিতে তিনি হংসদূত ও উদ্ধব সন্দেশ নামক কাব্য রচনা করেন, উহা পরে বৃন্দাবনে শেষ হইয়া প্রচারিত হয়। গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক লিখিতে থাকেন। উহাতে তিনি কৃষ্ণের ব্রজলীলা ও অন্যান্য লীলা একত্র লিখিবেন বলিয়া স্থির করেন। পরে নীলাচলে আসিবার সময় স্বপ্নাদেশে ও মহাপ্রভুর আজ্ঞায় পৃথক পৃথক দুইখানি নাটক রচনার পরিকল্পনা স্থির হয়। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক নাটকের নাম দিয়াছেন 'বিদগ্ধ মাধব' এবং তাঁহার পুরলীলা-বিষয়ক নাটকের নামকরণ হয় 'ললিত মাধব'। নীলাচলেআসিবার পর হইতে তিনি অধিকতর একাগ্রতার সহিত এই দুইখানি নাটক একই সময়ে লিখিতেছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের শান্তরসাস্পদ কুটিরে এবং সপার্ষদ মহাপ্রভুর সদগুণে ও আশীর্বাদের ফলে রূপের স্বাভাবিক কবিত্বপ্রতিভা বিশেষভাবে স্ফুরিত হইয়া ছিল। গ্রন্থদ্বয়ের অধিকাংশ নীলাচলে বসিয়া লিখিত হয়, পরে বৃন্দাবনধামে গিয়া প্রথমে বিদগ্ধ মাধব ও তৎপরে ললিত মাধব সমাপ্ত হয়।"[১]

নীলাচলের বৃহত্তর ও মহত্তর অনুষ্ঠান রথযাত্রা আসিয়া যায়। লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে এই সময়ে মহাধামে আগত হয়, শ্রীজগন্নাথের বিজয়যাত্রা দেখিয়া প্রাণমন সার্থক করে। এই রথযাত্রার আর এক বড় আকর্ষণ—দেবমানব প্রভু শ্রীচৈতন্যের উপস্থিতি ও নৃত্য কীর্তন।

রথ টানা শুরু হইলে ভক্ত ও পার্ষদদের নিয়া প্রভু রথাগ্রে কীর্তন করিতে থাকেন। সাত্ত্বিক প্রেমবিকারের ঐশ্বর্য প্রকটিত হয় তাঁহার গৌরকান্তি দিব্যশ্রীমণ্ডিত দেহে। এ অপার্থিব মূর্তি ও ভাবমত্ততা দেখিয়া অগণিত দর্শনার্থী আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।

রথাগ্রে প্রভুর দেবদুর্লভ নৃত্য ও উদ্দণ্ড কীর্তন রূপ প্রাণ ভরিয়া দূর হইতে দর্শন করেন, দিব্য ভাবের আবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। জীবন মন সার্থক জ্ঞান করিয়া প্রত্যা-বর্তন করেন ভজনকুটিরে।

প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে নীলাচলে তিনি বাস করেন প্রায় দশমাস। তাঁহার জীবনে এই দশটি মাসের মূল্য অপরিসীম। প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় সান্নিধ্যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ

১ সপ্ত গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

পার্ষদদের স্নেহময় পরিবেশে, অবিরাম অন্তরে তাঁহার বহিয়া চলে দিব্যরসের প্রবাহ। শুধু তাহাই নয়, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম লীলাবিষয়ক যে সব গ্রন্থ লেখানোর জন্য প্রভু ইচ্ছুক তাহারও প্রস্তুতি এসময়ে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। কৃষ্ণতত্ত্ব ও ব্রজরসতত্ত্বের উৎস সন্ধানটি প্রভুর কৃপায় এসময়ে রূপ প্রাপ্ত হন। প্রয়াগে থাকিতে যে অমৃতময় তত্ত্বোপদেশ প্রভু দিয়াছিলেন, তাহাই এবার নূতনতর উদ্দীপনা নিয়া উদ্‌গত হইতে থাকে তাঁহার অন্তস্তল হইতে।

সুকবি, প্রতিভাধর ও সুপণ্ডিত রূপ প্রভুর নির্দেশে কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণরসের নাটক লিখিতেছেন। কিন্তু কাব্যপ্রতিভা থাকিলেই কৃষ্ণরসের, ব্রজরসের, পরমতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা যায় না, কৃষ্ণলীলার প্রকৃত মাহাত্ম্যও ফুটাইয়া তোলা যায় না। এজন্য একদিকে চাই ব্রজরসের সম্যক্ উপলব্ধি আর চাই রসনাট্যের আঙ্গিক ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে নির্ভুল প্রয়োগ-নৈপুণ্য।

শ্রীচৈতন্য ইতিপূর্বেই রূপের সাধন-আধারে তাঁহার শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। এবার সেই শক্তির স্রোতকে উৎসারিত ও বিস্তারিত করিতে চান জনকল্যাণে।

প্রভুর ব্রজরসতত্ত্বের দুই পরম রসজ্ঞ পার্ষদ—রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর। প্রভু স্থির করিলেন, এই দুই বিদগ্ধ ও প্রবীণ পার্ষদকে তিনি নিয়োজিত করিবেন—রূপের নব রচিত কাব্যের রস আস্বাদনে ও মূল্য নিরূপণে।

রামানন্দ রায় রসতত্ত্বের শাস্ত্রে বাহ্যত শ্রীচৈতন্যেরও উপদেষ্টা। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কালে প্রভু এই মরমী সাধককে আত্মসাৎ করেন, তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশিত করেন মধুর রস এবং নিগূঢ় ভজনের মর্মকথা।

রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে বলিতেন, "প্রভু ব্রজরসতত্ত্ব, কান্তাভাব ও রাধাতত্ত্বের মহিমা আমি কি জানি? আমি তোমার কাষ্ঠপুত্তলী, আমায় তুমি যে ভাবে নাচাও, যেভাবে বলাও, তাই আমি করি আর তাই বলি।"

প্রভু দৈন্যভরে উত্তর দিতেন, "রায়, আমি শুষ্ক সন্ন্যাসী। মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার রসতত্ত্ব আমি কি জানি? আহা, সে তত্ত্ব যে তুমিই আমায় শেখালে।"

উভয়ের এই মতদ্বৈধ আর আনন্দ-কলহ প্রায়ই চলিত, আর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তেরা মিটিমিটি হাসিতেন।

রামানন্দ রায় উড়িষ্যার এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, কৃষ্ণরস তত্ত্বে পারঙ্গম এবং যশস্বী নাট্যকার। প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভের পূর্বে তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। প্রেমভক্তির সাধনায় আগে হইতেই তিনি অনেক দূর অগ্রসর ছিলেন, এবার শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় নিয়া সেই সাধনায় হইয়াছেন সিদ্ধকাম।

প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ স্বরূপ দামোদরও কৃষ্ণতত্ত্ব ও ব্রজরসের এক শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ সাধক এবং ধারক বাহক। শুধু তাহাই নয়, স্বরূপের আরও গুণ আছে, তিনি—'সংগীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি'।

তাঁহার মধুর রসের সংগীতে শ্রীচৈতন্য ভাবোন্মত্ত হইলেন, আবার তাঁহারই প্রবোধবাক্যে ও সংগীতে হইতেন আশ্বাসিত, লাভ করিতেন বাহ্যজ্ঞান।

স্বরূপের আরো বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি একদিকে যেমন রসজ্ঞ এবং নিগূঢ় মধুর রসের সাধক, তেমনি বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং কঠোর, সূক্ষ্ম সমালোচনার জন্য প্রখ্যাত।

মহাভাবের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্য, তাই প্রেমভক্তি-ধর্মের কোনো বাক্য বা

রচনার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত বা রসাভাষ কখনো সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই সদা পার্শ্বচর ও মরমী ভক্ত স্বরূপকে তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের নিরূপণে এবং পরীক্ষাকর্মে—

গ্রন্থশ্লোক গীত কেহো প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে।

এমন দুই উচ্চকোটির সাধক ও ব্রজরসের তত্ত্বজ্ঞ এবার রূপের রচনা শ্রবণ করিবেন, সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিবেন।

প্রভু একদিন রথাগ্রে নৃত্য কীর্তন করিতেছেন। হঠাৎ ভাবপ্রমত্ত হইয়া 'কাব্য প্রকাশের' যঃ কৌমারহরঃ ইত্যাদি বাক্যসূচক শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নিভৃত মধুময় পরিবেশ আর একান্তচিত্ত কান্তা আর নিভৃত মধুর মিলনের রস এই শ্লোকটিতে উৎসারিত।

প্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিয়া স্বরূপ দামোদর তখনই এই রসের অনুসারী এক মধুর সংগীত রচনা করিলেন, তখনি প্রভুকে গাহিয়া শুনাইলেন, প্রভু অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলেন।

পরের দিন শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়া হরিদাস ও রূপকে দেখিতে আসিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়ে হরিদাসের কুটিরের চালে গুঁজিয়া-রাখা একটি তালপত্র।

প্রভু অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠেন, বলেন, "নিয়ে এসো দেখি, কি রয়েছে ওতে।"

রূপ বড় লাজুক, এবং বিনয়ী, কহিলেন, "না প্রভু, ওটা তোমার দেখবার যোগ্য কিছু নয়।"

"তা হোক, নিয়ে এসো আমার কাছে।"

তালপত্রটি তাড়াতাড়ি খুলিয়া আনা হইল এবং দেখা গেল এটিতে লিখিত রহিয়াছে রূপের সদ্য রচিত কয়েকটি প্রেমরসে উচ্ছল মনোরম শ্লোক।

গতকাল প্রভু কান্তা ও কান্তের নিভৃত মিলন সম্পর্কে যে শ্লোকটি বলিয়া উঠেন এবং স্বরূপ যাহা গীতচ্ছন্দে রূপায়িত করিয়া শোনান, এটি সেই ভাবেরই দ্যোতক। "কালিন্দী পুলিনে নিভৃতে কৃষ্ণ ও রাধার মিলনানন্দের কথা লিখিয়াছেন রূপ তাঁহার অতুলনীয় ভাব, ভাষায় এবং ছন্দে।

এই তালপত্রের রচনাটি প্রভু সবাইকে নিয়া সোৎসাহে শুনিলেন, আর বার বার মুক্ত-কণ্ঠে করিতে লাগিলেন গুণগান। 'আহা, আহা, এমন রসবস্তু তো সচরাচর পাওয়া যায় না। রূপ, তুমি আমাদের আজ সত্যই বড় আনন্দ দিলে।"

প্রভুর এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার রূপের কাব্য প্রতিভার প্রতি স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতির দৃষ্টি সেদিন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল।

আর একদিন প্রভাতে প্রভু হরিদাসের কুটিরে আসিয়াছেন। সঙ্গে আছেন স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ।

প্রভু জানেন, রূপের কাব্য রচনা কিছুটা বেশ অগ্রসর হইয়াছে। এ কাব্য যে মধুর রসের এক উৎসরূপে গণ্য হইবে অন্তর্যামী প্রভুর তাহা অজানা নাই।

আজ ভক্তপ্রবর রূপের মহিমা তিনি বাড়াইতে চান এবং বিশেষ করিয়া স্বরূপ ও

রামানন্দের মতো রস বিচারকদের স্বীকৃতি দিয়া তাঁহাকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে চান।

সোৎসাহে প্রভু নিজেই একদিন রূপের খাতাপত্র টানিয়া বাহির করিলেন, কিছু কিছু অংশ তিনি পাঠ করিলেন। ভাষার লালিত্যে, রসের পারিপাট্যে ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে এ রচনা সত্যিই অপরূপ।

প্রভু বিশেষ করিয়া বিদগ্ধ মাধবের পাণ্ডুলিপি হইতে একটি রমণীয় শ্লোক সবাইকে শুনাতে লাগিলেন। এ শ্লোকটির মর্ম .

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ:—
আহা, কি অমৃত দিয়েই না হয়েছে সৃষ্ট।
রসনায় যখন এ নামের হয় উচ্চারণ—
হৃদয়ে উদ্‌গত হয় শত রসনা লাভের বাসনা।
কর্ণে শ্রবণ করলে স্পৃহা ওঠে জেগে—
কোটি কোটি কর্ণের জন্য।
আর চেতনায় যখন এ নামের হয় স্ফুরণ।
জীবের সর্ব ইন্দ্রিয় হয় যে পরাভূত।

ভক্তেরা আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন, আর একবাক্যে সবাই প্রশস্তি গাহিতে থাকেন, নাম মাহাত্ম্যের এমন মধুর শ্লোক তো সহসা শুনা যায় না।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের চোখ মুখ তৃপ্তির আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে, প্রসন্ন অন্তরে বার বার রূপকে জানাইতেছেন আশীর্বাদ।

স্বরূপ এ সময়ে রামানন্দ রায়কে সার কথাটি বুঝাইয়া দিলেন। প্রভুর অন্তরের ইচ্ছা জানিয়া রূপ এক মহান্ কর্মে ব্রতী হইয়াছেন, শুরু করিয়াছেন কৃষ্ণলীলার নূতন নাটক রচনা।

প্রভু নির্দেশ দিলেন, "রূপ, সবাই তোমার রচনা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তোমার নূতন নাটক থেকে কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাও।"

রূপ সংকোচে আড়ষ্ট হইয়া আছেন, জোড়হস্তে নিবেদন করেন, "প্রভু ম্লেচ্ছাধম আমি, কৃষ্ণলীলা নাট্য আমি কি লিখবো? শুধু লিখছি, তোমার ইচ্ছেটি জেনে।"

"না—না রূপ। তোমার রচনার কিছু কিছু অংশ রামানন্দ আর স্বরূপকে আজ পড়ে শোনাও।"

নাটক পাঠ শুরু হইল। স্বরূপ ও রামানন্দ তো মহাবিস্মিত। ভাষা, রস ও সিদ্ধান্ত সব দিক দিয়াই এ কাব্য অতি চমৎকার। প্রভু উপযুক্ত লোকের উপরই দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। উপস্থিত সবাই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর দৃষ্টি বিশেষভাবে রামানন্দের দিকে নিবদ্ধ। রামানন্দের সারা অন্তর আনন্দে বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিয়াছে। রূপকে লক্ষ করিয়া গদ্‌গদ স্বরে তিনি উচ্চারণ করিলেন প্রশস্তিবাণী :

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার।
প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন। (চৈ-চরিতামৃত, অন্ত্য)

রামানন্দ মরমী ও শাস্ত্রবেত্তা, নিজের নাটক 'জগন্নাথ বল্লভ'-এ সতর্কভাবে নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম রসতত্ত্বের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন। রূপের নাটকাংশ শুনিয়া তিনি সত্যই বিস্মিত। বুঝিলেন, এ কাজের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেরণা ও ঐশ ইঙ্গিত। নতুবা এমন বস্তু নবাগত ভক্ত রূপের লেখনীতে পরিবেশিত হওয়া তো সম্ভব নয়। প্রভুর দিকে তাকাইয়া এবার সহাস্যে কহিলেন :

ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুত্তলী তুমি পার নাচাইতে ॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইঁহার লিখনে ॥
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সে করিবে, জগৎ তোমার বশ ॥

(চৈ-চরিতামৃত, অন্ত্য)

প্রভুর দিব্য প্রেরণা, কৃপা ও রসজ্ঞ বৈষ্ণবদের স্বীকৃতি রূপ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সকলের আস্থা জাগিয়া উঠিয়াছে। এবার প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিতে মনস্থ করিলেন।

সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া রূপ সেদিন বৃন্দাবনে রওনা হইতেছেন. এ সময়ে প্রভু কহিলেন :

ব্রজে যাই রস শাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ ॥
কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করহ প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার ॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রের লিখন ও প্রচার, তীর্থ উদ্ধার ও বিগ্রহসেবা এবং কৃষ্ণভক্তির পথে ভক্ত জনসমাজকে চালিত করা, এই তিনটি ঐশকর্মের সূচনা ও প্রসার শ্রীচৈতন্য তাঁহার বৃন্দাবন সংগঠনের মধ্য দিয়া করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই কথাটি তাঁহার চিহ্নিত সেবক, প্রতিভাধর রসতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা, রূপের মনে সেদিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

রূপ ও সনাতনের যুক্ত প্রতিভা এবং কর্মনিষ্ঠার ফল কয়েক বৎসরের মধ্যে ফলিতে দেখা যায়।—"উভয়ে কঠোর সাধনায় ও শাস্ত্র আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া পরিমূর্ত প্রেমিকের আদর্শস্বরূপ শীঘ্রই সর্বজাতীয় ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। একদিকে যেমন দৈন্যমূর্তির অন্তরালে পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনিই রাগানুগা ভক্তির দিব্যোন্মাদ তাঁহাদিগকে সকলের স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিল। একভাবে যেমন কাহারও মনে কোনো আধ্যাত্মিক সমস্যা উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সমাধানের প্রত্যাশায় উঁহাদের দীর্ঘ কুটিরের দ্বারস্থ হইতেন, অন্যভাবে তেমনই কেহ মানব-রূপী দেবতা দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের দর্শন লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। তাঁহাদের ভজনকুঞ্জ মানবকুলের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল।

"কত ভক্ত ও শিষ্য আসিলেন। তাহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া বৃন্দাবনে আসিল। উঁহাদের সাহায্যে সনাতনের বিচার-শক্তি ও রূপের কবিত্ব প্রতিভা নূতন নূতন শাস্ত্রপথ পাইয়া গিরিনদীর মতো ক্ষিপ্রগতিতে

ছুটিয়া চলিল। তাঁহাদের লিখিত, সংকলিত ও ব্যাখ্যাত ভক্তিগ্রন্থসমূহ বিশ্বমানবের সার সম্পত্তি হইতে লাগিল।...

"মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনধামে পাঠাইবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি যেন শ্রীধামে তাঁহার দীন ভক্তবৃন্দের আশ্রয়স্থল হন। কিন্তু সে কার্য তাঁহার একনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারাই বিশেষভাবে সাধিত হইয়াছিল। সনাতন কিছু আত্মহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সাধারণ কর্মপটুতা রূপেরও অধিক ছিল। উপযুক্ততার অনুপাতে মানুষের কর্মভার আপনিই জুটিয়া থাকে। চৈতন্যদেবের প্রবর্তনায় বা প্রচারিত উপদেশের ফলে যেমন দলে দলে ভক্তগণ নানাদিক হইতে বৃন্দাবনে আসিতেছিলেন, রূপ অগ্রণী ও উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদের সকলের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যিনি যেমন প্রকৃতির লোক, তাহাকে সেইভাবে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতে দিয়া, সকলের অভাব অভিযোগের সুমীমাংসা করিয়া রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের ভক্তমণ্ডলীর কর্তা হইয়া বসিলেন। এই কর্তৃত্বই গোস্বামী নামের সার্থকতা রাখিল। কাজের লোক চিনিয়া লইতে কাহারও বিলম্ব হয় না। নূতন ভক্ত কেহ আসিলে তিনি সর্বাগ্রে রূপকেই খুঁজিয়া বাহির করিতেন। প্রবাসী ভক্তেরা অঙ্গুলি দিয়া তাঁহাকেই দেখাইয়া দিতেন, কোনো পর্ব উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব হইলে রূপই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। এই প্রকার নানারূপে রূপ শ্রীকৃষ্ণরঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের রাজা, রূপ হইলেন তাঁহার রাজ প্রতিনিধি। রূপের নাম শীঘ্রই দেশে প্রচারিত হইল, শত শত ভক্ত তাঁহার অনুবর্তন করিয়া ব্রজমণ্ডলে এক সঙ্ঘ গড়িলেন। লোকে রূপের কথায় উঠিত বসিত এবং তাঁহার উপদেশের ফলে জ্ঞান ও সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া ধন্য হইত। কে বড়, কে ছোট তাহা সকলে জানিত না, রূপ-সনাতন এই জোড়া নামে সকলে রূপেরই প্রাধান্য স্বীকার করিত। সমাজের প্রতি এমন অবাধ প্রতিপত্তি কম শক্তির পরিচায়ক নহে[১]।"

প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীবিগ্রহ সেবার যে নির্দেশ দিয়াছিলেন রূপ ও সনাতন তাহা একদিনের তরেও বিস্মৃত হন নাই। লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁহারা লুপ্ত শ্রীবিগ্রহের পুনরাবির্ভাবের কথাও একান্তমনে ব্যাকুলভাবে ভাবিতেছিলেন।

বৃন্দাবনে কাজ শুরু করার পর দীর্ঘ বৎসর গত হইয়াছে। রূপ ও সনাতনের পরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত ও সাধক-গণ। শ্রীচৈতন্যের লীলা সংবরণের পরে রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তেরাও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌড়ীয় গোস্বামীদের তপস্যা, পাণ্ডিত্য ও সংগঠনের গুণে বৃন্দাবন পরিণত হইল ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কেন্দ্ররূপে।

ইতিমধ্যে ব্রজমণ্ডলের প্রাচীন এবং হারাইয়া যাওয়া পবিত্র বিগ্রহগুলির অনুসন্ধান প্রবলভাবে চলিতেছিল, এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল সনাতন রূপ প্রভৃতির আর্তি ও ব্যাকুল প্রার্থনা। এ প্রার্থনার ফল অচিরে ফলিল। সনাতন গোস্বামী মথুরার চৌবেজীর গরীব বিধবার নিকট হইতে মদনগোপাল বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। শ্রীবিগ্রহ কৃপাভরে চৌবে ঘরনীকে স্বপ্ন দেখাইয়া নিজেই নিজেকে সঁপিয়া দিলেন কাঙাল ভক্ত সনাতনের করে।

মদনগোপাল বিগ্রহের পর গোস্বামীদের করায়ত্ত হয় গোবিন্দদেব বিগ্রহ। ব্রজমণ্ডলের

---

১ রূপ গোস্বামী. সতীশচন্দ্র মিত্র

প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রাচীন অষ্টমূর্তির মধ্যে এইটি সর্বপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ব্রজনাভের আমলের পরে এই বিগ্রহ আত্মগোপন করেন। রূপ গোস্বামীর অলৌকিকী প্রয়াসই এই পবিত্র ঐতিহ্যময় বিগ্রহকে লোকলোচনের সম্মুখে প্রকটিত করে এবং তিনিই পরম আনন্দে গ্রহণ করেন ইঁহার সেবা পূজার দায়িত্ব।

এই গোবিন্দদেবের উদ্ধার সাধনের কাহিনী আজো ব্রজমণ্ডলের জনমানসে জাগরূক রহিয়াছে, আজো পরম জাগ্রত বিগ্রহরূপে ইনি বিরাজিত রহিয়াছেন ভারতের প্রেমিক সাধকদের অন্তরপটে।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ঢুঁড়িয়া রূপ গোস্বামী জানিয়াছিলেন বৃন্দাবনের যোগপীঠে, রাজা বজ্রনাভের এই শ্রীবিগ্রহটি বিরাজ করিতেন। কন্থা-করঙ্গধারী সনাতন ও রূপ যখন বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রান্তরে তীর্থ উদ্ধারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন হইতেই গোবিন্দদেব রূপের হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসেন। কিন্তু কোথায় প্রাচীনকালের সেই যোগপীঠে, কোথায় কোন্ নদীগর্ভে বা দুর্গমে বনে সেই বিগ্রহ আত্মগোপন করিয়া আছেন, তাহা কে বলিবে?

যখন যেখানে থাকিতেন কাঙাল বৈষ্ণব রূপ জপধ্যান শেষে রোজ জানাইতেন আকুল প্রার্থনা, "হে প্রভু, হে প্রাণনাথ কোথায় তুমি লুকিয়ে আছো, আমায় তার সন্ধান দাও, এই ভক্তাধমের প্রাণ রক্ষা করো।"

এই প্রার্থনা একদিন ইষ্টদেব শুনিলেন, তাঁহার কৃপার উদ্রেক হইল। সেদিন যমুনা তীরে বসিয়া সজল নয়নে শ্রীগোবিন্দের স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে আবির্ভূত হয় দিব্য লাবণ্যময় শ্যামকান্তি এক্ চঞ্চল ব্রজবালক।

"হেই বাবাজী, বসে বসে নিদ্ যাচ্ছো, না তোমার গোবিন্দের ধেয়ান করছো? গোবিন্দ তো হোথায়। ঐ গোমাটিলার ভেতরে।"

ধ্যানাবেশ কাটিয়া যায় রূপ গোস্বামীর, চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়ান। ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন, "ভাই, গোমাটিলার কোথায় লুকিয়ে আছেন তিনি, কে আমায় তা বলে দেবে?"

"কেন, বাবাজী আমি বাতিয়ে দেবো তোমায়। জানতো ঐ গোমাটিলার এক জায়গায় রোজ দুপুরবেলায় একটা গাই চরতে আসে, আর ঠিক ঐ জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দুধ ঢেলে দিয়ে যায়। ওরই নিচেই তো রয়েছেন তোমার গোবিন্দজী।"

অপার্থিব আনন্দে প্রাণ-মন অধীর হইয়া উঠে, অর্ধবাহ্য অবস্থায় গোস্বামী ভাবিতে থাকেন, একি সত্যি সত্যিই কোনো ব্রজবালক, না দিব্যলোকের কোনো অধিবাসী? না স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই ছদ্মবেশে হইয়াছেন আবির্ভূত? তীব্র-রসাবেশে জাগিয়া উঠে রূপ গোস্বামীর সারা দেহ মনে, তখনি তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখেন, সেই সুদর্শন বালক আর নাই, কোথায় সে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ব্যগ্রভাবে রূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যান সন্নিহিত গ্রামে। সবাইকে প্রশ্ন করেন গোমাটিলার রহস্যের কথা, গাভীর নিত্যকার দুগ্ধ ক্ষরণের কথা।

ব্রজবাসীরা সোৎসাহে বলিতে থাকে, "হ্যাঁ, বাবাজী, তুমি তো ঠিক কথাই বলেছো। অনেক বৎসর ধরে আমরা যে দেখে আসছি, গাই-এর দুধ ঠিক একটা জায়গাতে নিয়মিতভাবে ঝরে পড়ে। ওখানে কোনো দেবতা আছেন নিশ্চয়।"

আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে রূপ গোস্বামীর নয়নে। সারা দেহ ভাবাবেশে বার বার কণ্টকিত হইতে থাকে। আকুল প্রার্থনা জানান গ্রামের লোকদের কাছে, ভাই সব, তোমরা চল। সবাই মিলে আমায় সাহায্য দাও। ঐ স্থান থেকে বার হয়ে আসবেন আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর, শ্রীগোবিন্দদেব।"

বাবাজীর এই উৎসাহ ও প্রেরণায় সবাই উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে, সমবেত চেষ্টায় শুরু হয় খননের কাজ। সেই দিনই আবিষ্কৃত হন শ্রীগোবিন্দের পবিত্র বিগ্রহ।

ঐ গোমাটিলাই যে দ্বাপর যুগের যোগীপীঠ এবং ঐ বিগ্রহই যে বজ্রনাভ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত গোবিন্দদেব শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া রূপ গোস্বামী গ্রামবাসীদের কাছে, সাধু সন্ত ও ভক্তজনের কাছে একথা প্রমাণিত করিলেন।

গোস্বামীর তপস্যার ফলে গোবিন্দদেব নিজে কৃপা করিয়া প্রকটিত হইয়াছেন, একথা অচিরে সারা ব্রজমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে। দলে দলে ভক্ত ও সাধু সজ্জনেরা সেখানে সমবেত হইতে থাকেন, সবাই মিলিয়া অনুষ্ঠান করেন এক বিরাট ভাণ্ডারার।

উত্তরকালে রূপ সনাতনের সহকর্মী রঘুনাথ ভট্টের এক ধনবান শিষ্য গোবিন্দদেবের একটি সুন্দর মন্দির ও জগমোহন নির্মাণ করিয়া দেন।[১]

বৃন্দাবনের গৌড়ীয় গোস্বামীদের শাস্ত্র প্রণয়ন, সংকলন এবং প্রকাশনার বিস্তার ও গভীরতা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। সহায় সম্পদহীন এই কাঙাল ভক্তেরা দীর্ঘদিনের সাধনা ও কর্মনিষ্ঠায় যে শাস্ত্র-সম্পদ গড়িয়া তোলেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

বৈষ্ণব ইতিহাসের গবেষক ও ব্যাখ্যাতা সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন: ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে ইঁহারা যে ধর্ম গড়িয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ কয় শতাব্দী পরে হইতে পারিত, তাহা কে জানে? কারণ বঙ্গের যাঁহারা শক্তিশালী বা সমৃদ্ধিশালী লোক, সমাজে যাঁহারা কুলীন বলিয়া চিহ্নিত, বঙ্গীয় সমাজের উচ্চস্তরের সেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির অধিকাংশই তখন শাক্ত মতাবলম্বী—তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের ঘোর শত্রু ছিলেন। পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বংশ পরম্পরায় যে ব্রাহ্মণগণ সর্বত্র খ্যাতিসম্পন্ন, ধর্মসাধনা অপেক্ষাও আচার-নিষ্ঠায় যাহাদের অধিক আগ্রহ, তাঁহারা সকলেই নবমতকে অশাস্ত্রীয় এবং অনাচরণীয় বলিয়া উপেক্ষা করিতে-ছিলেন। সুতরাং প্রবর্তক প্রভুদিগের অন্তর্ধানের পর এক তাঁহাদের ধর্মকে বাঁচাইয়া রাখা গুরুতর সমস্যার বিষয় ছিল। এদেশে শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত না হইলে কোনো ধর্মই টিঁকিবে না, এই পণ্ডিতের দেশে যেখানে সেখানে তর্ক-যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া নিজমত স্থাপন করিতে না পারিলে, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে—এ রহস্য চৈতন্য বুঝিতেন। ভাবের বন্যায় জলোচ্ছ্বাস আসিতে পারে, কিন্তু কালে শুষ্ক বালুকায় তাহা

---

১ উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র, পুরুষোত্তম জানা, রূপ গোস্বামীর তিরোধানের কিছু পূর্বে এই মন্দির বিগ্রহের পাশে একটি রাধিকা-মূর্তি স্থাপন করেন। মন্দিরটি পরবর্তীকালে জীর্ণ হইয়া পড়িলে অম্বরের রাজা মানসিংহ ইহার স্থলে লাল পাথরের কারুকার্যময় এক সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। অতঃপর ঔরঙ্গজেব এটির প্রধান অংশ ভগ্ন করিয়া দিলে মন্দিরের সৌন্দর্য ও বৈভব নষ্ট হয়।

শুকাইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তাহাকে দৃঢ় মৃত্তিকার খাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিলে, ইহা সুপেয় সলিলপূর্ণ গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়া চিরপিপাসুর তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ হইবে না।

—এ জন্যই শ্রীচৈতন্য নিজ ভক্তের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাদের দ্বারা বৈষ্ণবমতেই শাস্ত্রগঠন ও সংকল্প করাইয়াছিলেন। জগতের সকল জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনিই উপযুক্ত লোক নির্বাচনে সুপটু এবং গুণগ্রাহী ও সূক্ষ্মদর্শী তিনি জগতে জয়লাভ করিয়াছেন। চৈতন্যমতের সাফল্যের ইহাই প্রধান কারণ।

—তিনি যাহাদিগকে মোহিনী মূর্তিতে আত্মসাৎ করিয়া শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাছা বাছা ভক্তেরা নিখিল হিন্দুশাস্ত্রের আকর স্থান হইতে রত্নোদ্ধার করিয়া নব প্রবর্তিত গৌড়ীয় মতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট লোকে সর্বপ্রথমে পাণ্ডিত্যে পরাজিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, তবে তো নবমতের বিজয়ে পতাকা উড়িয়াছিল। নতুবা আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্মের কি পরিণতি হইত কে বলিবে? যে সব সংসারত্যাগী অসাধারণ শাস্ত্রদর্শী দৈন্যবেশী সন্ন্যাসী ভক্তেরা বৃন্দাবনকে কেন্দ্রস্থল করিয়া, তথায় বসিয়া অসংখ্য দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিমূল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম ছিলেন তিনজন—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী এবং উঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন তাঁহার ধর্মকে ও ভক্তিবাদের সিদ্ধান্তকে সনাতন-ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। রূপ সে ধর্মের সাধন-প্রণালীর রূপ নির্ণয় করিয়াছেন, আর শ্রীজীব তাঁহার বিবিধ সন্দর্ভে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়া সে ধর্মকে চিরজীবী করিয়া গিয়াছেন।

এই গোস্বামীদের মধ্যে ত্যাগে, তপস্যায়, সংগঠন শক্তিতে, শাস্ত্র ও কাব্য রচনায় রূপ গোস্বামী ছিলেন অনন্যসাধারণ। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠতম অবদান তাঁহার কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণ রসের সারিত কাব্য ও নাটক।

"রূপ গোস্বামী আজন্ম কবি এবং অল্পবয়সেই পরম পণ্ডিত। তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন মুক্তাপঙ্‌ক্তির মতো সুন্দর তাঁহার ভাষাও তেমনি মার্জিত, অলংকৃত এবং নিরুপম কবিত্বপূর্ণ। তাঁহার রচনা সর্বত্রই গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়, নব নব ভাব ও সুন্দর শব্দ-বিন্যাসে তাহার শ্লোকগুলি বিষয়ানুরূপ গাম্ভীর্যে বিমণ্ডিত হইয়া কাব্য রসকলায় ভরপুর থাকে। সেই গুরুগম্ভীর শব্দ সম্ভারে ভাবাক্রান্ত শ্লোকগুলি পড়িবামাত্র রূপ গোস্বামীর লেখনীপ্রসূত বলিয়া ধরিতে পারা যায় এবং অর্থের উপলব্ধি হইবামাত্র উঁহাদের কবিত্ব-কৌশলে মুগ্ধ হইতে হয়। এমন ভাবুক, এমন লেখক যৌবনাবধি কেন যে মুসলমান শাসকের রাজস্বসচিব হইয়া তৃপ্ত ছিলেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষে প্রকৃত কবিকেও প্রচণ্ড বৈষয়িক করিতে পারে, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। সংসারকে যে ভালো করিয়া ধরিতে জানে, কর্মবাসনার সমাপ্তি হইলে সেই আবার সংসারকে ভালো করিয়া ছাড়িতে পারে। মরিচা কাটিয়া গেলে সকল ধাতুরই ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, বিষয় মরীচিকার হাতে নিস্তার পাইয়া রূপ যে নবজীবন পাইয়াছিলেন, তাহার ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে।

"রাজকর্মচারী থাকিবার কালেও তিনি কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শাস্ত্রচর্চায় বিরত হন নাই, তাঁহার কবিপ্রতিভা কখনও সম্পূর্ণ লুক্কায়িত থাকে নাই। সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে

আসিবাব পব যখন তিনি রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা লইয়া তদ্‌গতচিত্ত থাকিতেন, তখন তাহাব চিন্তাব ধারা স্বভাবত উছলিয়া পডিত, ভাবা আসিয়া দাসীর মতো উহা বহন কবিযা লোকশিক্ষাব জন্য গ্রন্থিত করিযা রাখিত। কত কাব্য নাটক, কত স্তোত্র বা মন্ত্র কবিতা, কত সাবার্থ ব্যাখ্যা বা শাস্ত্র সংগ্রহ যে তাঁহার লেখনী মুখে প্রকাশিত হইত, তাহা বলিবাব নহে। রূপ গোস্বামী বহু প্রকাবের বহু গ্রন্থ প্রণযন কবেন। শ্রীজীব গোস্বামী স্বপ্রণীত 'লঘুতোষণী' গ্রন্থে নিজ বংশেব পরিচয় কালে ঐ সকল গ্রন্থেব পবিচয দিয়া গিযাছেন।[১]

কাব্য, নাটক, রসগ্রন্থ, স্তোত্র, ভাণিকা এবং শাস্ত্রসংগ্রহ পুস্তক সব মিলাইয়া রূপ গোস্বামী যোলখানা গ্রন্থ প্রণযন ও সংকলন কবেন। বিদগ্ধমাধব এবং ললিতমাধব এই নাটক দুইটিতে নাযক শ্রীকৃষ্ণেব বিদগ্ধ এবং ললিত এই দুইটি মাধুর্যময রূপে এবং বাধা ও প্রধানা সখীদের সহিত তাঁহাব মিলনলীলা বর্ণনা তিনি করিযাছেন। মধুব রস যে সাধকদের উপজীব্য, এই নাটক দুইটিতে তাঁহাদেব জন্য পবিবেশিত হইযাছে কৃষ্ণের অনুপম ভাবমূর্তি ও নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব। কিন্তু রূপ গোস্বামীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান হরিভক্ত বসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল নীলমণি। বসগ্রন্থ নামে এই দুইটি প্রসিদ্ধ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনায সনাতন এবং রূপ এই দুই ভ্রাতারই অবদান রহিযাছে। সনাতনই সেখানে শাস্ত্রবহস্যেব বিচারকর্তা এবং রূপ তাঁহার নির্দেশ এবং সম্মতি নিযা তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত স্থির করিযাছেন, দীর্ঘ বৎসরেব পরিশ্রমে এই মহাগ্রন্থ লিখিযাছেন। এজন্য তিনিই ইহাব বচযিতারূপে পবিচিত। এই গ্রন্থে ভক্তিবসেব বিভিন্ন ধারাব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি দিযাছেন এবং ভক্তিব স্বরূপ ও প্রকারভেদ নির্ণয প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করিযাছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ গোস্বামী শান্ত দাস্য প্রভৃতি সব বসের বর্ণনা দিযাছেন, কিন্তু মধুর রস অত্যন্ত গূঢ় বলিয়া তাহার আলোচনা করিযাছেন সংক্ষেপে। এই গূঢ় রসেব বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায তাঁহাব উজ্জ্বল নীলমণিতে। ভক্তি সমুদ্র হইতে নীলমণিতুল্য মধুর অথবা উজ্জ্বলরস আহরণ করিযাছেন বিদগ্ধ লেখক, তাই ইহার নামকরণ করিযাছেন —উজ্জ্বলনীলমণি। মধু রসেব বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এ গ্রন্থ ভরপুর।

শাস্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে রূপ গোস্বামীব লঘুভাগবতামৃত বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এটি আসলে সনাতন গোস্বামীব মহান্ গ্রন্থ বৃহৎ ভাগবতামৃতের সংক্ষেপণ। বিদগ্ধ রূপেব মতে ভাগবতামৃত দুই প্রকারের,—কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত। গ্রন্থটি তাই বিভক্ত করা হইযাছে দুই ভাগে। শ্রীকৃষ্ণেব স্বরূপ নির্ণয, অবতাব তত্ত্বের আলোচনা এবং কৃষ্ণ অবতাবেব শ্রেষ্ঠত্ব এই গ্রন্থে তিনি প্রতিপাদিত করিযাছেন। মথুরামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ এখনো নিত্যলীলা করিযা চলিযাছেন, এবং দেবতারা সদাই তাহা দর্শন কবেন,—এই তত্ত্বটি তিনি উপস্থাপিত কবিযাছেন শাস্ত্র পুবাণেব বহুতব উদ্ধৃতি দিযা।

বৈষ্ণবীয সাধনা ও সিদ্ধির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন রূপ গোস্বামী। কোমলতা ও কঠোবতা, বৈরাগ্য ও অনুবাগ, বৈধী এবং বাগানুগা সাধনার ধৃতি, একসঙ্গে অপরূপ বৈশিষ্ট্য নিযা ফুটিযা উঠিযাছিল তাঁহার মহাজীবনে। ভক্তি ও জ্ঞানেব ঘটিযাছিল বিবাট সমন্বয।

নিজস্ব সাধনজীবনে তিনি ছিলেন ডোবকৌপীনধাবী দীনাতিদীন বৈষ্ণব। তৃণেব

---

১ রূপ গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

অপেক্ষা নীচু এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু মহাপ্রভুর এই বৈষ্ণবীয় আদর্শ রূপায়িত হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে। কিন্তু এই সঙ্গে ছিল তাঁহার ধর্মীয় আদর্শ রক্ষার নিষ্ঠা ও অনমনীয়তা। শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা স্খলন পতন ঘটিলে মুহূর্তমধ্যে প্রকটিত হইত তেজস্বী সিদ্ধপুরুষের অগ্নিগর্ভ মূর্তি, রুদ্ররোষে তিনি ফাটিয়া পড়িতেন। বৃন্দাবনের ভক্তসমাজে তাই রূপ গোস্বামী গণ্য হইতেন এক অনন্যসাধারণ বৈষ্ণব নায়করূপে।

দিক্‌পাল পণ্ডিত এবং অতুলনীয় কৃষ্ণরসবেত্তা ছিলেন রূপ গোস্বামী। বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও বিনয় ছিল তাঁহার চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য, আর প্রতিষ্ঠা তাঁহার দৃষ্টিতে ছিল—শূকরী বিষ্ঠা। ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে কত ধর্মনেতা, কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বৃন্দাবনে আসিতেন, রূপ গোস্বামীর কাছে উপস্থিত হইতেন তর্ক-বিচারের জন্য। তিনি কখনো এজাতীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইতেন না, সানন্দে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিতেন জয়পত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী বুক ফুলাইয়া স্থানত্যাগ করিলে রূপ রত হইতেন তাঁহার শাস্ত্ররচনায়, অথবা ভজন-সাধনে।

একবার আচার্য বল্লভ ভট্ট রূপ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ভট্টজী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা এবং ভক্তি-পুরাণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। রূপ গোস্বামী তখন নিজের কুটিরে ভক্তিরসামৃতের পুঁথি রচনায় নিবিষ্ট আছেন, আর শ্রীজীব তাঁহার পাশে বসিয়া একটি পাখা হাতে নিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। রূপ ভট্টজীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানান, একপাশে আসন বিছাইয়া বসিতে দেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভট্টজী রূপ গোস্বামীর সদ্য লিখিত পুঁথির দুই চারিটি শ্লোক শুনিতে চাহিলেন। রূপ মঙ্গলাচরণের দুই একটি শ্লোক পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে বল্লভ ভট্ট শাস্ত্রীয় বিতর্ক তুলিলেন, কহিলেন, "গোস্বামীজী, এ শ্লোকে ত্রুটি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, একটু সংশোধন ক'রে নেওয়া সঙ্গত।"

"অতি উত্তম কথা," তখনি সানন্দে বলিয়া উঠেন রূপ গোস্বামী। "আপনি দয়া ক'রে নিজে সংশোধন ক'রে দিলে বড়ই উপকৃত বোধ করবো। আপনি কাজটা এখানে বসে শেষ করুন। এদিকে আমার আবার ঠাকুরসেবার কাজ আছে, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যমুনার স্নান সমাপন ক'রে আসছি।

পুঁথিটি তেমনিভাবে খুলিয়া রাখিয়া প্রশান্ত মনে, অবলীলায়, রূপ গোস্বামী চলিয়া গেলেন।

শ্রীজীব কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ একপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। ভট্টজী লেখনীটি হাতে নিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধনে উদ্যত হইতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কঠোর স্বরে কহিলেন, "আচার্য, একটু অপেক্ষা করুন। আগে স্থির হোক সংশ্লিষ্ট এ শ্লোকটিতে কোনো ত্রুটি আছে কিনা। আমাদের গোস্বামী প্রভু দৈন্যের অবতার। আপনি সম্পূর্ণ-রূপে ভ্রান্ত, একথা জেনেও আপনার অহংবোধকে উনি এভাবে কিছুটা প্রশ্রয় দিচ্ছেন।"

"কে হে তুমি অর্বাচীন। তোমার স্পর্ধা তো দেখ্‌ছি কম নয়। তুমি জানো আমি, কে?"

"আজ্ঞে, আপনার পরিচয় শুনেছি।"

"তবে? এমন সাহস পেলে কোথায়।"

"আচার্যবর, এ সাহস এসেছে গুরুকৃপায়। আপনি যাঁর লেখা সংশোধন করতে যাচ্ছেন, তাঁর কাছেই হয়েছে আমার দীক্ষা আর শাস্ত্রশিক্ষা। সে শিক্ষার এক কণাও

আয়ত্ত করতে পারি নি। তবুও তাঁর প্রসাদে আমার মতো অর্বাচীনই বৃন্দাবনে আগত দুই চারিটি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেছে।”

“হুম!” ভিতরকার ক্রোধ ও উত্তেজনা অতিকষ্টে সংযত করিয়া বল্লভ ভট্ট কহিলেন, “বেশ, গোস্বামীর এই শ্লোকটি যে সঙ্গত তার কারণ দর্শাও।”

“আপনি আদেশ করলে দেখাতে পারি বৈ কি।” একথা বলিয়া প্রতিভাধর তরুণ পণ্ডিত শ্রীজীব প্রাচীন শাস্ত্র হইতে ঐ শ্লোকের যথার্থতা সপ্রমাণ করিলেন?

আচার্য বল্লভ ভট্ট কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তারপর পাণ্ডুলিপিটি সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া বিদায় নিলেন।

পথিমধ্যে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে ভট্টজীর দেখা। আচার্য এসময়ে বড় গম্ভীর বদন। কহিলেন, “গোস্বামী মহারাজ, আপনার কুটিরে উপবিষ্ট ঐ তরুণ বৈষ্ণবটি কে?”

“কেন বলুন তো? ঐটি আমার শিষ্য শ্রীজীব। সন্দিগ্ধ স্বরে উত্তর দেন রূপ। বল্লভ ভট্ট এবার বিষন্ন স্বরে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন শ্রীজীব সম্পর্কিত ঘটনার কথা। তারপর ধীরপদে সেখান হইতে প্রস্থান করেন।

কুটিরের আঙিনায় পা দিয়াই রূপ গোস্বামী কঠোর স্বরে শ্রীজীবকে নিকটে ডাকিলেন। প্রেমবিলাস এই বিস্ফোরণশীল পরিস্থিতির বর্ণনায় বলিতেছেন:

শ্রীজীব ডাকিয়া কহে শ্রীজীবের প্রতি।
অকালে বৈরাগ্য বেশ ধরিতে মূঢ়মতি॥
ক্রোধের উপরে ক্রোধ না হইলে তোমার।
তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর॥

শ্রীজীব নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। মুহূর্ত মধ্যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন নিজের অপরাধের গুরুত্বের কথা। সত্যিই তো ক্রোধ ত্যাগ না করিলে সর্বত্যাগী বৈরাগী হওয়া, শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত প্রাণ ভক্ত হওয়া তো সম্ভব নয়।

রূপ গোস্বামী এবার কহিলেন, “তুমি কি ভেবেছো, বল্লভ ভট্ট যে ভ্রান্ত, একথা আমি বুঝি নি। সব বুঝেই আমি তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছি, তাঁর কাছে নতি স্বীকার করেছি। অনেক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকেই বৃন্দাবনে আমি বিনা-তর্কে জয়পত্র দিয়ে দিয়েছি। তোমার তো এসব অজানা নেই। মহাপ্রভুর পবিত্র ধর্ম যে প্রচার করবে, তার তো তোমার মতো আচরণ থাকা উচিত নয়। শুধু ক্রোধ নয়, সূক্ষ্ম অহংবোধও তোমার এ মনোভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এগুলো পরিহার যদি করতে পারো তবেই আসবে আমার কাছে, নতুবা নয়।

প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নিজের হাতে গড়া দিক্‌পাল শিষ্য শ্রীজীব বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের তিনি ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষ। সেই শ্রীজীবকে এক মুহূর্তে বিতাড়িত করিতে রূপ গোস্বামীর সেদিন এতটুকুও বাধে নাই। বৈষ্ণবীয় নীতি ও নিষ্ঠা বিষয়ে এমনি বজ্রকঠোর ছিলেন তিনি।

গুরুকে প্রণাম করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে জীব গোস্বামী প্রবেশ করেন বৃন্দাবনের এক জনমানবহীন দুর্গম জঙ্গলে। সেখানে লতাপাতা দিয়া এক পর্ণকুটির বাঁধিয়া শুরু করেন নূতনতর কৃচ্ছ্র ও তপস্যা। সংকল্প করেন, যে শোধন ও রূপান্তর গুরু দাবি করিয়াছেন তাহা সাধিত না হইলে লোকালয়ে আর কখনো ফিরিয়া আসিবেন না, জীবনপাত করিবেন এই অরণ্যে।

কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। অত্যধিক কঠোরতার মধ্য দিয়া শ্রীজীব দিনাতিপাত করিতেছেন। দূর গ্রাম হইতে কেহ কখনো আসিয়া যদি কিছু খাদ্য দেয়, তাহা দিয়াই জীবনধারণ করেন। এক একদিন কোনো রাখাল বা ভক্ত বনমালী একমুষ্টি গম নিয়া হয়তো উপস্থিত হয়। তাহাই চূর্ণ করিয়া জলসহ তিনি পান করেন। আবার নিমগ্ন হন দীর্ঘ সময়ের জপ ধ্যানে।

হঠাৎ একদিন এই বনের প্রান্তস্থিত গ্রামে সনাতন গোস্বামীর আগমন ঘটে। গ্রামের সবাই প্রাচীন মহাত্মা সনাতনের ভক্ত ও অনুরাগী। নানা কুশল প্রশ্নাদির পর নবীন বৈরাগীর কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কৌতূহলী সনাতন তখনি বহির্গত হন তাঁহার খোঁজে।

দর্শন পাওয়া মাত্র, শ্রীজীব লুটাইয়া পড়েন পিতৃব্যের চরণতলে, নিবেদন করেন, তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা। স্নেহে করুণায় সনাতনের হৃদয় বিগলিত হইল, সান্ত্বনা দিলেন নানা ভাবে কিন্তু রূপের মনোভাব কি, সঠিকভাবে তাহা জানেন না। তাই তাঁহার সম্মতি না নিয়া শ্রীজীবকে নিজের সঙ্গে নিতে সাহসী হইলেন না।

বৃন্দাবনে আসার পর রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই সনাতন প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর রচনা কতটা এগিয়েছে? সমাপ্ত হতে আর বিলম্ব কত?"

রূপ গোস্বামী উত্তর দিলেন, "কাজ তো অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। এতদিন সমাপ্ত হয়ে যেতো যদি শ্রীজীব কাছে থাকতো, আর তার সাহায্য পেতাম। তাকে তো সেদিন হঠাৎ এ স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে।"

"আমি সব শুনেছি। বনে ভ্রমণ করার সময় শ্রীজীবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎও ঘটেছে। আহা! অনাহারে, অনিদ্রায় ও কঠোর তপস্যায় তার যা হাল হয়েছে, তার দিকে আর তাকানো যায় না। অতি শীর্ণ, অতি দুর্বল তার দেহ। দেখলাম কোনো মতে প্রাণটুকু মাত্র রয়েছে।

সনাতনের অন্তরের কথা এবং তাঁর ইঙ্গিতের মর্ম রূপ বুঝিলেন। সনাতন শুধু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই নয়, তাঁহার গুরু স্থানীয়—তাঁহার হৃদয়ের দেবতা। তাই স্থির করিলেন, আর নয়, এবার শ্রীজীবকে ক্ষমা করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত তাহার ইতিমধ্যে অনেকটা হইয়াছে।

সেই দিনই পত্রী পাঠাইয়া, শ্রীজীবকে ডাকাইয়া আনিলেন, সেদিনকার অপরাধটি তখন মার্জনা করা হইল। গুরুর করুণা লাভ করিয়া শ্রীজীব যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন।

এই ঘটনার মধ্য দিয়া সারা বৃন্দাবনের ভক্তসমাজে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল এবার তাহা দূর হইল। সবাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বৃন্দাবনে প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপনে রূপ সনাতন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কাঙাল কন্থা করঙ্গিয়া এই দুই বৈরাগী পত্তন করিয়াছেন এক বিরাট ভক্তিসাম্রাজ্যের। বিশেষ করিয়া তাঁহারা চিহ্নিত হইয়াছেন প্রভু প্রচারিত ভক্তি-প্রেমধর্মের চিহ্নিত অধিনায়করূপে। তৎকালীন ভক্তসমাজের অন্যতম মুখপাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দুই গোস্বামীর মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন:

> সনাতন কৃপায় পাই ভক্তির সিদ্ধান্ত।
> শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু রসভাব প্রান্ত॥

প্রায় অর্ধশত বৎসরের বিপুল উদ্যম ও প্রযাসের ফলে ভক্তিধর্ম ও রসতত্ত্বের বিরাট শাস্ত্রভাণ্ডার রচিত হইয়াছে, গঠিত হইয়াছে নিগূঢ় সাধনার সিদ্ধিতে সমুজ্জ্বল সাধক-গোষ্ঠী। সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা, এই শাস্ত্রভাণ্ডার এবং এই সাধকগোষ্ঠীর কুশলী ও প্রতিভাধর নেতারূপে ধীরে অভ্যুদয় ঘটিতেছে শ্রীজীবের। রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী উভয়ে প্রাচীন হইয়াছেন, দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্র ও পরিশ্রমে স্বাস্থ্যও তাঁহাদের ভাঙিয়া পড়িতেছে। এবার তাই উন্মুখ হইয়া আছেন শেষের দিনটির জন্য।

অল্পকালের মধ্যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বৃদ্ধ সনাতন গোস্বামী সবাইকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করিলেন। দেবপ্রতিম জ্যেষ্ঠভ্রাতা, শিক্ষাগুরু এবং রূপের জীবনের সর্বকর্মের উদ্যোক্তা ও নায়ক ছিলেন সনাতন গোস্বামী। তাই এই বিচ্ছেদ রূপের পক্ষে বড় মর্মান্তিক। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সনাতনের শেষকৃত্য সমাপন করিলেন, সাড়ম্বরে ভাণ্ডারা অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হইয়া গেল। তারপর রূপ গোস্বামী প্রবেশ করিলেন তাঁহার নিভৃত ভজনকুটিরে।

জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি মাস এই কুটির হইতে তাঁহাকে বাহির হইতে দেখা যায় নাই, ইষ্টধ্যানে ও ইষ্টনাম জপে নিরন্তর থাকিতেন তিনি অভিনিবিষ্ট।

১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের চিহ্নিত ক্ষণে মহাসাধকের চির বিদায়ের লগ্নটি আসিয়া যায়, প্রাণপ্রভু গোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলায়। ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে প্রেমভক্তি সাধনার এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র।

ভট্টাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে ধর্ম-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও রাষ্ট্রচিন্তায় এক নব জাগৃতির সূচনা হয়। এই জাগৃতির প্রধান উৎসটি সেদিন বিরাজিত ছিল বাংলাদেশে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধ্যান ধারণায় তখন নব্যপন্থী বাঙালীর জীবন প্রভাবিত। শিক্ষিত মহলে আধুনিক বিচার বুদ্ধি, যুক্তিনিষ্ঠা ও বস্তুতান্ত্রিকতা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিতে শুরু হইয়াছে নূতন মূল্যায়ন। ইহাতে একদিকে সুফল যেমন ফলিয়াছে, কুফলও কম দেখা দেয় নাই। নব্যপন্থীদের বেশীর ভাগই উন্নাসিক ও উগ্রমতবাদী। ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির অনেক কিছুই তাঁহাদের মতে হেয় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই অনেক কিছুই নস্যাৎ করিয়া দিতে তাঁহারা উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন।

মানস সংকটের এই দুর্দিনে আবির্ভাব ঘটে সনাতন ধর্মের ধারক বাহক একদল শক্তিধর আচার্য ও সাধকের। শাশ্বত ভারতের প্রাণস্পন্দন তাঁহারা উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছেন, দু'চোখ ভরিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদের ধ্যানের ভারতকে, আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিয়াছেন প্রাচীন শাস্ত্র, সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের সুধা। তারপর অবতীর্ণ হইয়াছেন ভারত-ধর্মের উজ্জীবন ও বিস্তার সাধনে। এই শক্তিধর আচার্য ও সাধকদের অন্যতম শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

শক্তি সাধনায় শিবচন্দ্র সিদ্ধ হন, তারপর তন্ত্রের পরম তত্ত্বের প্রচারে ব্রতী হইয়া তন্ত্রকুশল একদল সাধককে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। শিবচন্দ্র ও তাঁহার পূর্ণাভিষিক্ত শিষ্য স্যার জন উড্রফ, শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রসাধনার যে বিজয় কেতন উড়াইয়া গিয়াছেন, এদেশের ধর্ম সংস্কৃতির ইতিহাস কোনোদিন তাহা বিস্মৃত হইবে না।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার কুমারখালিতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভূমিষ্ঠ হন। গৌরী নদী বিধৌত এই গ্রামটিতে তখন ছিল বহু সম্পন্ন গৃহস্থ ও সাধু সজ্জনের বাস। নিকটবর্তী গ্রামের ভাঁড়ারায় থাকিয়া সাধনভজন করিতেন মরমিয়া সাধক লালন ফকির। দ্বিজটী সন্ন্যাসী সনাতন গোস্বামী মহাত্মা সোনাবঁধু, পাগল হরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ সাধকদের অধ্যুষিত ছিল এই অঞ্চল।

কুমারখালির ভট্টাচার্য বংশ চিরদিনই সাধনা ও শাস্ত্রচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। এই বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন, ভট্টাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। পিতার নাম চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ। মাতা
এবার তাহা দৃ
। পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য ছিলেন একজন বিশিষ্ট তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্,
বৃন্দাবনে দু
অনুষ্ঠানেও তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ।
চন্দ্রময়ী দেবী
আছেন
র আদিনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কুমারনদের তীরে মহিশালা
তান্ত্রিক ক্রিয়া
গ্রামাঞ্চে
অঁহিত অ
লে নদীয়ার কুমারখালিতে তাঁহারা বসবাস করিতে থাকেন। এ
এই ভট্টাচার্যদের দুই গোষ্ঠী
মধ্যে কামদেব, জয়দেব ও নিত্যানন্দ ভট্টাচার্যের তন্ত্রসাধনার খ্যাতি
পরবর্তী

হয় সাধক-সাহিত্যিক কাঙাল হরিনাথের কাছে। উত্তরকালে
চর্চার উপর কাঙালের প্রভাব বিস্তারিত হয়।

পাঁচ বৎসর বয়সে বালককে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এখানে জলধর সেন ছিলেন তাঁহার অন্যতম সহপাঠী।

কুমারখালি স্কুলে শিবচন্দ্র পড়াশুনা করিতেছেন, মেধাবী ছাত্র বলিয়া শিক্ষকদের প্রিয় হইয়াও উঠিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আজন্ম সুহৃদ জলধর সেন ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

শিবচন্দ্রের পিতা, আমাদের চন্দ্রকাকা, অত্যন্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবচন্দ্র তখন চরিতাবলী পড়েন।

সেই সময় চন্দ্রকাকা একদিন শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ও কি পড়িস্ রে শিব ?'

শিবচন্দ্র বলিলেন—'ডুবালের গল্প।'

'ডুবালের গল্প ? দেখি', এই বলে বইখানা হাতে নিয়ে চার পাঁচ লাইন পড়ে সেটি দূরে নিক্ষেপ ক'রে বললেন—'এইসব বুঝি পড়া হয় ? দেশে আর মানুষ নেই, মহাপুরুষ নেই—পড়িস কিনা ডুবালের গল্প। যাঃ কাল থেকে আর তোকে স্কুলে যেতে হবে না। এই ডুবালেই দেখছি দেশটা ডুবালে।'

তেজস্বী ব্রাহ্মণের যে কথা সেই কাজ। পরদিন থেকে শিবচন্দ্র আর স্কুলে গেলেন না।

ইংরেজী স্কুলে পড়াশুনা করা এবং তাহার প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনা শেষ হইয়া গেল। অতঃপর পিতা শিবচন্দ্রকে নবদ্বীপের এক চতুষ্পাঠীতে পাঠাইয়া দেন এবং সেখানেই গড়িয়া উঠে শিবচন্দ্রের শাস্ত্র-সাধনার ভিত্তি।

ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার অল্পকালের মধ্যেই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। বিশেষ করিয়া এই কিশোর ছাত্রের সহজাত কবিত্বের খ্যাতি স্থানীয় পণ্ডিত মহলে ছড়াইয়া পড়ে।

নবদ্বীপের সারস্বত জীবন তখন ছিল চাঞ্চল্যময় এবং প্রাণবন্ত। দেশবিদেশ হইতে প্রতিভাধর ছাত্রেরা এখানকার টোলে শাস্ত্রপাঠ করিতে আসিতেন। এসময়কার স্মৃতি-চারণ করিতে গিয়া শিবচন্দ্র উত্তরকালে তাঁহার বাল্যকালের সহজাত কবিত্ব শক্তির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন।

নবদ্বীপের হর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ তত্রত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে একটা বিশেষ বার্ষিক ব্যাপার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই ব্যাপার শীতকালে অনুষ্ঠিত হইত। পৌষ কি মাঘমাসে তাহা আমার মনে নাই, উক্ত শ্রাদ্ধে নবদ্বীপ ও তাহার প্রান্তবর্তী গ্রাম-সমূহের অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজ সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন, বলা অধিক যে ব্যাকরণ, সাহিত্য স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের সকল টোলেই মাসাধিক পূর্ব হইতে ছাত্রগণ তর্কবিচারে 'শান' দিতে আরম্ভ করিতেন। উহা যেন ছাত্রসমাজের একটা বার্ষিক পরীক্ষার সময়, কে কাহাকে পরাজয় করিয়া নিজে কৃতী হইবে সে জন্য সকলেই বিশেষ ব্যস্ত।

আমার সেরূপ ব্যস্ততার কোন কারণ ছিল না। ব্যাকরণের ছাত্র আমি,—আমার বিচার আচার কিসের ? অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত আমিও সেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয় ছিলাম। গিয়া দেখি বিশাল সভাপ্রাঙ্গণে কোথাও ন্যায়ের, কোথাও স্মৃতি, কোথাও সাহিত্যের, কোথাও ব্যাকরণের ছাত্রগণের দলে দলে একেবারে বিচার বিতর্কের

দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সাত আট শত ছাত্র, দুই শতের অধিক অধ্যাপক—নানা শাস্ত্রের ভাবাভেদে বিচারের স্থানটি বিষম কোলাহলে পরিপূর্ণ। কেবল অধ্যাপক মধ্যস্থগণই যাহা কিছু নিস্তব্ধ। চতুর্দিকে পাঁচশতেরও অধিক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও ভদ্রগণ শ্রোতা দর্শকরূপে দণ্ডায়মান।

তখনও পাকা টোলের ছাত্রগণ আসিয়া উপস্থিত হন নাই। এই টোলের ছাত্রসংখ্যা তখন শতাধিক এবং সকল ছাত্রই মৈথিলী ব্রাহ্মণ। কবিতার পাদপূরণ করিতে পারিতাম বলিয়া আমার কিছুটা খ্যাতি ছিল। আমি উপস্থিত হইবা মাত্রই সভার কর্তৃপক্ষগণ একটি দৃশ্য, পদার্থস্বরূপে আমাকে বিশেষ আদর করিয়া তদানীন্তন অধ্যাপক সমাজের শীর্ষস্থানীয় হরমোহন তর্কচূড়ামণি, প্রসন্নকুমার ন্যায়রত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ সভার মধ্যস্থলে যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন আমাকে তাঁহাদের নিকট আসিয়া বসাইয়া দিলেন।

আমি যেমন গিয়া বসা, অমনই সমস্যা পূরণের তরঙ্গ উঠিল। অধ্যাপকগণ অনেকেই এক একটি প্রশ্ন করিলেন, তাহার সকলগুলিরই উত্তর দিতে লাগিলাম। এই কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় (ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণেতা ও সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক)' আনন্দবাবু প্রভৃতি তখনকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় দেখিলাম—পাকা টোলের ছাত্রমণ্ডলী সেই সভায় আসিতেছেন। সে এক অদ্ভুত অপরূপ দৃশ্য। সকলেই হিন্দুস্থানী বস্ত্র পরিহিত, গলে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক ত্রিপুণ্ড্র, মস্তকের শিখায় এক একটি জবাপুষ্প, অধিকাংশই সুদীর্ঘ মূর্তি এবং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ—হনৃ হনৃ করিয়া দ্রুতপদে বিচারোন্মুখ স্ফূরিত ওষ্ঠাধরে তাঁহাদের সেই সভা প্রবেশ মনে করিলেও এক অপূর্ব দৈব দৃশ্য বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, তাঁহারা সভার মধ্যস্থলে আসিয়া মণ্ডলাকারে বসিলেন।

বিচারের চেষ্টা হইতেছিল কিন্তু সম্মুখেই আমার পাদপূরণের ঘটাঘট্ট এবং সুখ্যাতির গৌরবটা যেন তাঁহাদের কিছু অসহ্য বোধ হইল। তাঁহারা বিচারের দিক হইতে আমার দিকেই দৃষ্টি প্রসার করিলেন এবং হরমোহন তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বলিলেন, আমরা একবার ইহার পরীক্ষা করিব। আমাদের প্রদত্ত সমস্যা যদি পূরণ করিতে পারে, তবেই ইহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিব, অন্যথায় নহে।"

এতদিন পর্যন্ত কখনও সমস্যা পূরণে আমার কোনোরূপ ভয়, বিভীষিকা বা আতঙ্ক উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আজ এই সকল মৈথিলী ছাত্রগণের এই ভীম ভৈরব মূর্তি আর ন্যায়শাস্ত্রের প্রখর বিদ্যার স্ফূর্তি, এই দুই দেখিয়া আমার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছিল।

তাহারা ত্বরিত পদে আমার নিকট আসিয়া আকুঞ্চ মুষ্টি প্রসারণপূর্বক সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, "সূচ্যগ্রে ষট্কূপং তদুপরি নগরী, তত্র গঙ্গাপ্রবাহ" অর্থাৎ একটি সূচের অগ্রভাগে ছয়টি কূপ, তাহার উপর এক নগরী, তাহাতে গঙ্গাপ্রবাহ।

শুনিয়া তো আমার চক্ষুস্থির। এ পর্যন্ত পাদপূরণের সময়ে কখনও বিশেষ সময় লইয়া কোনোদিন কিছু চিন্তা করি নাই, প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার উত্তর যখন যাহা মনে আসিয়াছে তখন তাহাই দিয়াছি, কিন্তু আজিকার প্রশ্নে সে চিন্তার আবশ্যক হইল বলিয়া লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হইলাম।

একটু চিন্তার পর আমার উত্তরের উপক্রম দেখিয়া পাণ্ডিত্য, এবং চাতুর্যের চূড়ামণি হরমোহন তর্কচূড়ামণি মহাশয় তখন আমাকে সাবধানতার ইঙ্গিতপূর্বক কহিলেন, "মুখে উত্তর করিও না কাগজে লিখিতে হইবে।" ইহা বলিয়া দোয়াত কলম কাগজ আমার কাছে সরাইয়া দিলেন।

আমি একবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া সর্বান্তঃকরণে জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া কবিতা লিখিলাম। আমার লেখা শেষ হইলে চূড়ামণি মহাশয় আমার হাত হইতে কাগজখানি লইয়া শ্লোকটি মনে মনে পড়িয়া দেখিলেন, দেখিয়া উহা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যাবতীয় ভদ্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনাদিগকে একবার ইহার মধ্যস্থ হইতে হইবে। মৈথিল সমাজের সহিত নবদ্বীপ সমাজের চিরকাল বিদ্যার স্পর্ধা, তজ্জন্য আমি বলিতেছি, আজ মৈথিলী ছাত্র-সমাজ এই বালকের প্রতি যে ভয়ঙ্কর কূট সমস্যার কঠোর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা আপনারা স্বচক্ষে দেখিলেন, স্বকর্ণে শুনিলেন। এখন বঙ্গীয় বালকের দ্বারা এই মৈথিলী অধ্যাপকগণের কূট সমস্যার উত্তর যাহা হইল তাহা এই কাগজে লেখা আমার হাতে। আগে আমি উহা পড়িতে দিব না। ইঁহারা যে শ্লোকের এক চরণে আজিকার এই প্রশ্ন করিয়াছেন অবশ্য তাহার আরো তিন চরণ আছে—ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। উঁহাদের দেশে এই সমস্যার উত্তরে সেই তিন চরণে কি লেখা আছে, তাহা না দেখিয়া না শুনিয়া আমরা আমাদের উত্তর উঁহাদিগকে দেখিতে দিব না। সেই তিন চরণ কি, অগ্রে আমাদিগকে বলুন।"

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কূট কৌশলে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে উহা বলিতে হইল, দুই কবিতার সমালোচনার জন্য উহাও কাগজে লিখিয়া লইলেন। সেই তিন চরণের ভাব মাত্র আমার মনে আছে—অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের যদি গতি স্তব্ধ, জলে যদি অগ্নি জ্বলে পর্বতের শিখরে যদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তবেই এরূপ প্রশ্ন হয়।

তাঁহাদের সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া চূড়ামণি মহাশয় তখন আমার সমস্যা পূরণের শ্লোকটি আমাকে পাঠ করিতে বলিলেন। আমি উহা পড়িলাম এবং উহার অর্থও সাধারণকে বুঝাইয়া দিলাম। শ্লোকটির কিছুমাত্র এখন মনে নাই, তবে যাহা মনে আছে তাহা এই—মনুষ্য জীবনের অতি সূক্ষ্মাগ্র মনই সুতীব্র সূচ্যগ্রস্বরূপ, তাহারই উপরিভাগে ছয়টি কূপ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, তদুপরি নগরী এই বিশাল সংসার, তন্মধ্যে গঙ্গা প্রবাহ—ইহলোক পরলোক নিরন্তর যাতায়াত।

ইহা শুনিয়া মৈথিলীগণ নিজেরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, "আমাদের যাহা শ্লোক আছে, এ শ্লোকের নিকট তাহা সমস্যাপূরণ বলিয়াই গণ্য নহে।"

তখন তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও বলিতে লাগিলেন, "তবে বল, তোমাদের দেশের প্রসিদ্ধ প্রবীণ ও প্রাচীন অধ্যাপকগণ দ্বারা যাহা হয় নাই, আমাদের বঙ্গদেশের দশ এগার বৎসরের বালকের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইল। ইহাও জানিয়া রাখিবে, এই বালক আমাদের নবদ্বীপ সমাজের গৌরবপতাকা।"

মৈথিলীগণ সানন্দে তাঁহার সে কথা স্বীকার করিয়া সহাস্য বদনে আমাকে যথেষ্ট আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বালক আজ শুধু কবি নয়, 'কবিরত্ন' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া বাঙালীর—বিশেষত নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

এই সভাতেই বালকবয়সে সর্বসম্মতিক্রমে আমার কবিরত্ন উপাধি লাভ হইল[১]।

সংকোচবশত নবদ্বীপের প্রবীণ পণ্ডিতদের প্রদত্ত এই উপাধি কিন্তু শিবচন্দ্র জীবনে কখনো ব্যবহার করেন নাই।

শিবচন্দ্রের মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া এ সময়ে যে সব অধ্যাপক বিস্মিত হন তাঁহাদের মধ্যে, দু'একজন প্রস্তাব করেন শিবচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হোক। কিন্তু শিবচন্দ্রের রক্ষণশীল পিতা ও পিতামহের সম্মতি মিলিল না, কারণ সেখানেও ইংরেজীর ছোঁয়াচ রহিয়াছে। নবদ্বীপের টোলেই উচ্চতর পাঠ তিনি সমাপ্ত করিলেন। পারঙ্গম হইয়া উঠিলেন ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে।

সংস্কৃত টোলের অধ্যয়ন শেষে শিবচন্দ্র কলিকাতায় গিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পরীক্ষা দেন, এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণও হন। কিন্তু এই বিদ্যাসাগর উপাধি গ্রহণেও তাঁহাকে সে সময়ে রাজী করানো যায় নাই।

তিনি দৃঢ়স্বরে সবাইকে বলেন, "ভেবে দেখলাম, আমার গুরুস্থানীয় জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় বেঁচে থাকতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ব্যবহার করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না। এতে তাঁর অসম্মান করা হবে। কাজেই এ উপাধি আমি বর্জন করছি।"

সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার এ কথা শুনিয়া মহা সমস্যায় পড়িলেন। অতঃপর অনেক কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা শিবচন্দ্রকে ভূষিত করিলেন বিদ্যার্ণব উপাধিতে। উত্তরকালে এই উপাধি দ্বারাই জনসমাজে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

পরীক্ষা, উপাধি, এসব সম্পর্কে তরুণ শিবচন্দ্রের আর যেন তেমন উৎসাহ নাই। বরং এই বয়সেই অধ্যাত্মজীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে তাঁহার অন্তরে। জন্মান্তরের শুভ সংস্কার নিয়া জন্মিয়াছেন, তদুপরি রহিয়াছে পিতা ও পিতামহের শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার বীজ। বংশের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তান্ত্রিক সাধনা—এই সাধনার দিকেই তিনি নিয়ত আকৃষ্ট হইতেছেন। জগজ্জননী তারামায়ের অমোঘ আহ্বান অন্তরে দোলা দিতেছে বার বার।

'বিদ্যাসাগর' উপাধি ত্যাগের সময় শিবচন্দ্র তাঁহার তারা-মায়ের উদ্দেশে একটি কবিতা লিখেন। তরুণ বিদ্যার্থী কিভাবে অধ্যাত্ম জীবনের পথে এ সময়ে মোড় নিতেছেন, এ ভাবময় কবিতাটিতে তাহার চিহ্ন পরিস্ফুট।

ভাইরে! আর কি কর বিদ্যার সাধন,
মহাবিদ্যা লাভে ভুলে।
বাধা পড় সেই পরীক্ষায় আমাদের
নিশান তুলে॥
মা বিদ্যা, তারা শিক্ষা, মা বিশ্ববিদ্যালয়
শাস্ত্র তারা, ছাত্র তারা, স্বয়ং গুরু তারাময়॥
যত দেখ দর্শন শাস্ত্র (ওরে), তারার দর্শন
কিছুতেই নয়।
ওরে, সব সদর্শন যদি আমার তারা মায়ের
দর্শন না হয়॥

---

১ তন্ত্রাচার্য মহাসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব — বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি পত্রিকা ২৯শে পৌষ, ১৩৭২

তারা পদাম্বুজ প্রান্তে যারা করে তারা লয়।
এই তারাতেই তারা দেখে মায়ের
তারা তার আলয় ॥
তারা মায়ের মায়া বলব কি ভাই!
হ'লে পরে মহা প্রলয়।
শব হয় এসব, তবু সে সব—ভাইরে
মা মোর কোলে লয় ॥
তাই—এ সময় ভাই! সময় থাকতে বল
—জয় জয় তারার জয়।
যে বলে সেই তারার জয় জয়, সেই
করে সেই তারার জয় ॥
তাই—তারা হয়েও তারার জয় নাই,
কেবল তারার ছেলের জয়।
অধিকন্তু, তারার জয়ে—তারা হয় রে
মৃত্যুঞ্জয়।

অধ্যাত্ম-জীবন গঠনের স্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। তাই শিবচন্দ্র এবার অধ্যাত্ম-ভাবতের মর্মকেন্দ্র কাশীতে গিয়া উপস্থিত হন। শাস্ত্র পাঠ, ধর্মদর্শনের আলোচনা ও সাধনভজন সব কিছুরই সুযোগ-সুবিধা এখানে রহিয়াছে। শিবচন্দ্র এই সুযোগ সম্পূর্ণ-রূপে গ্রহণ করার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। প্রসিদ্ধ বেদান্তী, শতাধিক বর্ষীয় আচার্য, রামরাম স্বামীর নিকট এ সময়ে তিনি বেদান্তের পাঠ নিতে থাকেন।

আগম নিগমের রহস্যবেত্তাও কাশীধামে কয়েকজন আছেন। ইঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বশিক্ষা করিতে শিবচন্দ্র সচেষ্ট হন।

অসামান্য মেধা ও প্রতিভা নিয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাই অল্প সময়ের মধ্যে ষড়্দর্শনের মর্ম এবং সাধনভজনের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায়।

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিবচন্দ্র নিজ জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ স্থির করেন। তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্র সাধনায় পারঙ্গম হইবার জন্য হন কৃতসংকল্প।

পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক ক্রিয়ায় তাঁহার পারদর্শিতার কথা সারা নদীয়া জেলায় পরিব্যাপ্ত। শিবচন্দ্র তাঁহারই নিকট হইতে তন্ত্রসাধনার পাঠ নেওয়া স্থির করিলেন।

কৃষ্ণসুন্দর আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন, বলেন, "শিব, তুমি যে আমাদের বংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী শক্তিসাধনায় রত হতে চাও, তন্ত্রতত্ত্ব আয়ত্ত করতে চাও, এ অতি উত্তম কথা। জানতো, আমাদের বংশেই জন্মেছেন তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ কামদেব জয়দেব, নিত্যানন্দ প্রভৃতি। এদের শক্তি বিভূতির কথা আজো মধ্য বাংলার সাধক ও পণ্ডিতেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে থাকেন। এই সব সিদ্ধ পুরুষদের ধারা তোমার ভিতর দিয়ে বয়ে চলুক, এই তো আমি চাই। কিন্তু এজন্য তোমাকে চলতে হবে একটা সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ ক'রে।"

শিবচন্দ্র উত্তরে বলেন, "কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন। শক্তি আরাধনার জন্য

আমি বদ্ধপরিকর। আরও স্থির করেছি, তন্ত্র সাধনা সম্বন্ধে লোকের মনে, বিশেষ ক'রে এ যুগের শিক্ষিত মানুষের মনে, যে ভুল ধারণা আছে তা দূরীভূত করবো।"

"এজন্য তো প্রস্তুতি চাই, ভাই।"

"আপনি আমায় নির্দেশ দিন কি করতে হবে, এজন্য জীবন দিতেও আমি কুণ্ঠিত হবো না।"

"দুটো কাজ তোমায় করতে হবে। তুমি আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করো, তন্ত্রাভিষেক গ্রহণ করো এবং তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া সম্যক্‌ভাবে আরম্ভ করো। এই সঙ্গে তন্ত্রের প্রকৃত শাস্ত্র-তত্ত্ব ও গূঢ় রহস্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠো।"

"এ সম্পর্কে আপনি যা করতে বলবেন, যেখানে যেতে বলবেন, আমি সেজন্য প্রস্তুত।"

"কোথাও তোমায় যেতে হবে না। আমাদের এই গৃহেই রয়েছে প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের বহুতর প্রাচীন পুঁথি। পিতৃপুরুষেরা এগুলো বহুকাল ধরে সংগ্রহ ক'রে আসছেন বাংলার তন্ত্রাচার্যদের কাছ থেকে। নেপাল ও তিব্বত থেকেও আনীত হয়েছে তালপত্রে ভূর্জপত্রে লেখা কিছুসংখ্যক মূল্যবান পুঁথি। এগুলো তুমি আমার কাছে বসে অধ্যয়ন করো। শক্তি সাধনায় শাস্ত্রীয় ভিত্তি দৃঢ় ক'রে তোল। আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরে তুমি তন্ত্রসিদ্ধ হও। পরিণত হও তন্ত্রের বিশিষ্ট আচার্যরূপে।"

অভিজ্ঞ ও প্রবীণ তান্ত্রিক বলিয়া পিতামহ কৃষ্ণসুন্দরের সুনাম ছিল। শিবচন্দ্র অবিলম্বে তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন শাক্তী দীক্ষা। এই সঙ্গে শুরু করিলেন আগম নিগম শাস্ত্রের চর্চা। প্রাচীন ও দুর্লভ যে সব পুঁথি গৃহে সযত্নে সঞ্চিত ছিল, এবার সেগুলি তিনি যত্ন সহকারে পাঠ করিতে থাকেন। ফলে তন্ত্রের শাস্ত্রীয় ভিত্তিটি তাঁহার জীবনে দৃঢ়তর হইয়া উঠে। শুধু তাহাই নয়, কয়েক বৎসরের মধ্যে কৌল সাধন ও কৌল শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি সফলকাম হন।

এই সময় ভেড়ামারা গ্রামের চিন্তামণি দেবীর সহিত শিবচন্দ্রের বিবাহ হয়। কিন্তু এই পত্নী বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই, একটি শিশুকন্যা রাখিয়া তিনি লোকান্তরে চলিয়া যান। পরবর্তীকালে পিতা চন্দ্রকুমারের আগ্রহে ও নির্দেশে আবার শিবচন্দ্রকে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ স্ত্রী ছিলেন কুমারখালি গ্রামের কন্যা, নাম—মনমোহিনী দেবী।

আজীবন ঘরসংসারে অবস্থিত রহিয়াছেন শিবচন্দ্র, দেশের মানুষ সমাজকে ভারতের আত্মিক-জীবনের প্রেরণায় করিয়াছেন উদ্বোধিত, আর তন্ত্রতত্ত্বের প্রচারে করিয়াছেন আত্ম-নিয়োগ। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কিছু অস্তিত্ব, সমস্ত কিছু কর্মোদ্যমের অন্তরালে সদা-বিরাজিত রহিয়াছেন তাহার ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলা মা। এই মায়ের কৃপায় ও মায়ের সাধনায় তাঁহার জীবন হইয়াছে দিব্য আনন্দ ও চৈতন্যে ভরপুর। উত্তর জীবনে এক তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে ঘটিয়াছে তাঁহার অভ্যুদয়।

তরুণ বয়সেই আপন জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য শিবচন্দ্র স্থির করিয়া ফেলেন। তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধকাম হইবেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচার করিবেন—এই সংকল্পটি তাঁহার মনে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠে।

জন্মগত সংস্কারের প্রভাবে শিবচন্দ্র স্বভাবতই মাতৃসাধনায় উদ্বুদ্ধ। ভট্টাচার্য বংশের

পুরাতন তান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং নিমানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ কৌলদের কাহিনী বাল্যকাল হইতে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া গিয়াছে তাঁহার অন্তরে। এবার তাঁহাদের অনুসৃত সাধনপন্থা তিনি গ্রহণ করিলেন একনিষ্ঠভাবে।

এই তন্ত্র সাধনা শুরু করার কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন শিবচন্দ্র। শিবধাম বারাণসীতে বেদান্তী যোগী তান্ত্রিক বৈষ্ণব সকল সাধকেরই আনাগোনা। প্রকাশ্যে এবং প্রচ্ছন্নভাবে মাঝে মাঝে প্রাচীন ও শক্তিধর তন্ত্রসাধকেরা এখানে আসিয়া অবস্থান করেন। উচ্চকোটি সাধক মহলে প্রায়ই ব্যাকুলভাবে খোঁজা-খুঁজি করেন শিবচন্দ্র। ইঁহাদের আস্তানা বাহির করিয়া ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করেন, শিক্ষা করেন সাধনার নানা নিগূঢ় পদ্ধতি।

শিবচন্দ্রের প্রধান শিষ্য এবং দীর্ঘ দিনের সহচর দানবারি গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'কাশীধামে থাকার কালে একবার দেখা যায়—জটাজুট সমন্বিত, রক্তচক্ষু, এক অতি প্রাচীন তান্ত্রিক মহাত্মার পিছনে পিছনে শিবচন্দ্র ঘোরাফেরা করিতেছেন। এ সময়ে মণি-কর্ণিকার শ্মশানে অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে কয়েকটি নিগূঢ় ক্রিয়াও এ সময়ে ঐ মহাত্মার সাহায্য নিয়া অনুষ্ঠান করেন। নিজেদের দৃঢ় সংকল্প, দুর্জয় সাহস ও একনিষ্ঠার ফলে শিবচন্দ্র মহাত্মাটির বিশেষ কৃপা লাভ করেন এবং তন্ত্রসাধনার কয়েকটি সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত হয়।

অতঃপর কাশী হইতে শিবচন্দ্র কুমারখালিতে ফিরিয়া আসেন। এখন হইতে জগন্মাতার দর্শনের জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠেন, মত্ত হন প্রচণ্ড সাধন সমরে। দেখি, ছেলে হারে কি মা হারে—এই ভাব। সারা দিনরাত অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায় মাতৃপূজায় আর মাতৃধ্যানে। আর অমাবস্যার নিশি আসিলেই গভীর রাত্রে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে উপবেশন করেন গ্রামের উপান্তে মহাশ্মশানে। চারিদিকে কঙ্কাল করোটির ছড়াছড়ি, আর মাঝে মাঝে দুই একটি চিতার আগুনে দগ্ধ হইতেছে শবদেহ।

তন্ত্রোক্ত সাধন-উপচার সঙ্গে নিয়া শিবচন্দ্র শ্মশানে বসিয়া সমাপ্ত করেন তাঁহার নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান। 'তারা তারা' শব্দে উত্থিত হয় তাঁহার ভীমভৈরব আরাব। তারপর স্বরচিত সাধন সংগীতের মধ্য দিয়া শুরু হয় তাঁহার প্রাণের আকুতি। ইষ্টদেবীর চরণে সিদ্ধির সংকল্প নিবেদন করেন বার বার

স্বয়ম্ভু শয়নে নিদ্রা পরিহরি,—
ষড়দলে সুষুম্না পদ ভেদ করি,
জাগো জাগো, মহা যোগ যোগেশ্বরী,
সে যোগ সংযোগে জা-গো।
ঢুলু ঢুলু আঁখি উন্মীলন করি,
চাহগো চিন্ময়ি। নিদ্রা পরিহরি,
ব'স দিগম্বর-হৃদে দিগম্বরী,
ঘুচাও মা বিরাগ॥
নব অনুরাগে মাত মাতঙ্গিনি!
মহাকাল-হৃদে কাল কাদম্বিনী
দোল দোল দিগম্বর নিতম্বিনি,
পুরাও যে সোহাগ।

সোহাগের ভরে সাদরে অধরে,
ধর কাদম্বিনী করাম্বুজ পরে,
মাতি শিবানন্দে, মাতাও শিবচন্দ্রে
(দাও) স্ববাস-সমাধি যোগ।
কুল মন্ত্রময়ি! কুল তন্ত্র মাঝে
কুল কুণ্ডলিনি। কুলযন্ত্র বাজে
সে কুল-কুণ্ডলে, এলোকেশী সাজে
একবার সাজগো!
লয়ে কুল-নাথে কুল সতী কুলে
কুল যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও মা! কুলে
সে আহুতি তবে ও যজ্ঞ কুহরে।
জানত মা! আজ জা গো।

অনন্ত কোটি বিশ্বের মহাবিস্তারে, অনাদ্যন্ত এ সৃষ্টিতে শিবচন্দ্রের আরাধ্যা জননী মহাকালীর লীলাবিলাস। ব্রহ্মানন্দের লহরী লীলায় নিরন্তর চলে তাঁহার লীলাবিলাস; এ লীলা বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়াছেন শিবচন্দ্র অন্তরের ভাব গদ্‌গদ ভাষায়। শুধু ভাবের ঐশ্বর্য নয়, বাংলা গদ্যের নিটোল মাধুর্য ও বলিষ্ঠতার প্রকাশ দেখি তাঁহার এই বর্ণনায়:

"আমরি মরি মরি! কি মধুর ভৈরব নিস্তব্ধতা! আর কিন্তু অনন্তশান্তি প্রস্রবণ; আনন্দময়ী মায়ের আমার ব্রহ্মানন্দ লহরী যেন বৈকল্যধাম হতে নিষ্যন্দিত হয়ে এই ধরাধাম বিপ্লাবিত করেছে। আমরি! আমরি! অমাবস্যার মহানিশার এই নবনীরদ নিবিড় নীল সৌন্দর্য সাগরে পূর্ণিমার পূর্ণেন্দু চন্দ্রিমা কি আজ জলবুদ্বুদ বিন্দু বলিয়া বোধ হয় না? ঊর্ধ্বে এই অনন্ত আকাশ, নিম্নে এই বিশাল বিস্তীর্ণ ধরিত্রীমণ্ডল—ইহারই আবার মধ্যস্তরে কখন শূন্য, কখন পূর্ণ, কখন বায়ু, কখন অগ্নি, কখন মেঘ, কখনও বিদ্যুৎ, কখন বৃষ্টি, কখন রশ্মি—কত রঙ্গে কত তরঙ্গ কতবার আসছে, কতবার যাচ্ছে, কার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করে?

"শুধুই কি এই? এর মধ্যে আবার কত চন্দ্র সূর্য কত গ্রহপুঞ্জ নক্ষত্রলোক স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ এক জ্বলছে আর নিভছে, যেন সুবর্ণের কুসুমস্তবক খচিত প্রসারিত নীলাম্বরের উদ্দীপ্ত অঞ্চল বায়ুবেগে একবার উড়ছে, একবার পড়ছে—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই চন্দ্র সূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্কদাম যেন সময় ঋতু তিথি ভেদে এক একবার জ্বলে উঠছে, অঞ্চলের পরিবর্তনে আবার যেন নিভে যাচ্ছে—কখন দিন, কখন রাত্রি কখন সন্ধ্যা, কখন বা মধ্যাহ্ন। কখন শীত, কখন গ্রীষ্ম, কখন শরৎ, কখন বসন্ত, কখন পূর্ণিমা, কখন অমাবস্যা, কত নিত্য নব পরিবর্তনে এ অঞ্চলে একবার উঠছে একবার পড়ছে—অথচ লোকে দেখছে—আকাশ কেবল শূন্য শূন্য বই আর কিছুই নয়। এমন অসীম পূর্ণতা কি আর কোথাও সম্ভবে?

"এই অসীম অনন্ত আকাশের নামই অম্বর—অসম্বর স্বরূপিণী দিগম্বরী মা আমার এই অম্বরে গা ঢাকা দিয়েছেন। পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী যাকে নিজের আবরণ করেছেন, সে যদি শূন্য হয় তবে আর পূর্ণ কার নাম? উঃরে দৃষ্টিভেদ, কালী বলি তা'ত হন—আবরণ বলেই কি এমন ক'রে গা ঢাকা দিতে হয় যে—স্বর্গ, মর্ত, রসাতল, আকাশ পাতাল—

কোথাও আর খুঁজে সন্ধান পাবার উপায় নাই। তুমি গা ঢাকাই দাও আর যাই করো, ও-অসম্বর স্বপ্রকাশ স্বরূপ তোমার অম্বরে কি গা ঢাকে মা? আমার কিন্তু দেখে বোধ হয়, খেলার ঘোরে উন্মাদিনী বালিকা যখন আপন ভাবে আপনি আত্মহারা হ'য়ে বসন-ভূষণ দূরে ফেলে খেলতে খেলতে এক দিগন্ত হতে অন্য দিগন্তে ছুটে পালায়, তেমনি কি জানি কি খেলার ঘোরে, আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে মা তুই তোর এই দিগম্বর ছুঁড়ে ফেলে উন্মাদিনী উলঙ্গিনী সেজে যেন কোন নিভৃত দিগন্তে গিয়ে কোথায় আবার কি খেলা খেলছিস্। তাই তোর অভাবে তোর বসন এই পূর্ণ আকাশেও আজ শূন্য হয়ে পড়ে আছে, অম্বরের অঞ্চলে এই স্তবে স্তবে কত চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র প্রকৃতির সোহাগের হিল্লোলে ও অভিমানে ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।"

বড় ভয়ঙ্করা, বড় মধুরা, বড় স্নেহময়ী শিবচন্দ্রের এই ইষ্টদেবী। এই দেবীকে সাধন-সমরে পরাভূত করিতে হইবে সাধক শিবচন্দ্রের হৃদয়সাগরে ঘটাইতে হইবে তাঁহার জ্যোতির্ময় পূর্ণ প্রকাশ '

কে রে, শ্যামা ত্রিভঙ্গিনী
অলস আবেশ খল খল হাসে,
একাকিনী তবু সমর রঙ্গিণী
প্রেমে টলমল অরুণ কমল,
মদে ঢল ঢল ত্রিনয়নী।
গলিত বসনে দলিত রসনে
মধুর হাসনে মনোমোহিনী।
মুক্ত মহাকালে, নৃত্য তালে তালে,
নিত্য লীলা ময়ী উন্মাদিনী।
শিবচন্দ্র হৃদি—আনন্দ জলধি
তরল তরঙ্গে চন্দ্রাননী।

"নাচ মা মোর এলোকেশী"—ভাবের ঘোরে এই গান প্রায়ই গাহিয়া উঠিতেন শিবচন্দ্র। হৃদয়াকাশের অন্তহীন গহ্বর, আর বিশ্ব সৃষ্টির আদি অন্তহীন মহাবিস্তার, এই দুইয়েতেই রহিয়াছে পরাশক্তি জগজ্জননীর এলোকেশ বিস্তারিত। সর্বত্রই শিবচন্দ্র দর্শন করেন, মহামায়ার মায়া। আদরের সন্তান তাঁহার ভাবরসে আপ্লুত হইয়া মাকে এই মায়া প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন অধ্যাত্ম-সাহিত্যে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি বলিয়াছেন

"মা, তুমি মায়া বিজয়িনী কিন্তু মায়া বিধ্বংসিনী নও, যেহেতু তুমি মা, ত্রিলোক-লোচনের আলোকরূপিণী, মায়া তোমার নিবিড় অন্ধকারময়ী তমঃ শক্তি, আঁধার আলোকের শরণাগত, তাই মায়া তোমার চরণাশ্রিতা, তাব দেখিয়া আমার বোধ হয়, মা। এই মায়াই তোমার আলুলায়িত কেশপাশ তাই নিত্য-লীলায় নিত্যধামে, তোমার ঐ নিত্য মূর্তি'র উপাদান কুঞ্চিত কেশকলাপরূপে অনিত্য জগৎ প্রসবিত্রী মায়াকেও তুমি স্থান দিয়াছ, মায়া তোমারি ইচ্ছায় উৎপন্না, তোমারই অবলম্বনে অবস্থিত। তুমি যদি তোমার শ্রীঅঙ্গে তাহার অবস্থান অঙ্গীকার করিয়া স্থান না দিতে, তবে কি মায়ার সত্তা বলিয়া জগতে

কোনো পদার্থ থাকিত ? তবে কি মায়া কেশরূপে হেলিয়া দুলিয়া তোমার সোহাগ ভরে ঢলিয়া ঢলিয়া চরণ চুম্বনের অধিকার পাইত ?

"মায়া লীলার অভিনয়ে কেশরূপে পরিণত তোমারই সচেতন কেশকলাপ যখন সংবৃত মস্তকে সম্বদ্ধ ছিল তখন ভাবিয়া দেখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার যাঁহাদিগের এক এক কটাক্ষের ফল, তাঁহারা যাহার চরণতলে ধুলায় লুণ্ঠিত—আমরা তাঁহার মস্তকে বাস করি, ইহা অপেক্ষা বিষম ধৃষ্টতার বিষয় আর কি আছে ? ভক্ত বলিয়া ত্রিজগৎ যাদের চরণাম্বুজের মকরন্দ মধুপানে নিত্য অধিকারী আমরা তাঁহার নিত্য দেহের নিত্যসঙ্গী অঙ্গীভূত হইয়াও সে চরণ সেবায় নিত্য বঞ্চিত, ইহা অপেক্ষা বিধির বিড়ম্বনা তো আর নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কেশপাশ সহসা যেন চরণতলে খসিয়া পড়িল। কেবল পড়িল তাহা নহে, না জানি কি কি মাধুর্যের রসাস্বাদে চরণযুগল বেড়িয়া ধরিল, আর মকরন্দ মধুপানে ভাবের ভরে বিভোর হইয়া হেলিয়া দুলিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিতে নাচিতে খেলিতে লাগিল, ফুল্ল কমলে ভ্রমরমালা মধুমত্ত হইয়া যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া একবার এপাশে একবার ওপাশে ঝঙ্কার দিয়া পড়িতে লাগিল, মঞ্জীরযব সংশিঞ্জিত চরণাম্বুজ বেড়িয়া যেন সেই নৃত্যের তালে তালে আপন গান সংযোজিত করিল।

"চির নিগড় বন্ধনগ্রস্ত সংসার কারাবদ্ধ জীব আমরা, তাই তোর মুক্ত কুন্তলকলাপ-কান্তি ত্রিতাপ তপ্ত হৃদয়ে শান্তির অনন্তধারা ঢালিয়া দেয়। কেশপাশ হেলিতেছে দুলিতেছে, খেলিতেছে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া প্রেমানন্দে ঢলিয়া পড়িতেছে। ঐ পতিতপাবন বন্ধনমোচন দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠে।

"বলিব কি মা! কালোরূপে ঐ এলো চুলে কেমন যে দেখায় মা। তাহা বলিবার নহে, শুনাইবারও নহে, দেখাইবারও নহে, কেবল প্রাণ ভরিয়া দেখিবার কথা। কিন্তু মা। দেখিবে কে! প্রাণে তুমি না জাগিলে নয়নে তোমায় দেখা যায় না। মুক্ত জীব না হইলে কেহ কি কখন মুক্তকেশীর স্বরূপ রূপ দর্শনের অধিকারী হয় ? এই জন্য এলোকেশী রূপে নৃত্যনিরতা মায়ের স্বরূপ দর্শন লালসায় সাধককুল সর্বদা লালায়িত। যে ভক্তের নয়নে মুক্তকেশী পাগলী মেয়ের আহ্লাদ-বিহ্বল রূপের ক্ষণপ্রভা মুহূর্তের জন্য পতিত হইয়াছে, তাহার মন আর বিশ্বের কোনো রূপেই আকৃষ্ট হয় না। তাহার চিত্ত মধুকর করুণাময়ীর চরণ সরোজের মধুপানে নিরন্তর বিভোর হইয়া থাকে। বহুবিধ সন্তাপে তাপিতচিত্ত জীব যদি একবার কালভয় নিস্তারিণী কালীর অভয় চরণে শরণাগত হয়, বিবিধ সমস্যা সমাকীর্ণ সংসারক্ষেত্রে আর তাহাকে বিড়ম্বিত হইতে হয় না। ব্যথিত-প্রাণ সন্তানকুলকে এই রহস্যময় তত্ত্বকথা স্মরণ করাইয়া অভয়দান করিবার জন্যই আমামায়ের এই মুক্ত কেশলীলা[১]।"

মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় দিব্য দর্শন ঘটিতেছে। চকিতে আবির্ভূত হইয়া জগজ্জননী, তাঁহার আদরিণী মা সর্বমঙ্গলা, আবার তেমনি চকিতে হইতেছেন অন্তর্হিত। কত ভাবে, কত ঐশ্বর্যেই না দর্শন দেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী। কখনো আসেন রণরঙ্গিণী বেশে। কখনো করুণাময়ী বরাভয়দায়িনী, কখনো বা তিনি স্নেহপীযূষময়ী সত্যকার জননী। ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ মায়ের এই লীলাময়ী রূপ দর্শনের কথা বিবৃত করিয়াছেন তাঁহার সংগীতে :

১ হিমাদ্রি পত্রিকা ১৩ই মাঘ ১৩৭৪

এই দেখছি শ্যামাঙ্গিনী
হচ্ছে আবার হেমাঙ্গিনী।
এই দেখ্‌ছি মা রক্তবস্ত্রা,
অমনি দেখি উলঙ্গিনী।
এই যে মা তোর বেণী বন্ধ,
আবার দেখি মুক্তকেশী।
এই দেখি ভ্রূকুটী ভঙ্গী
আবার দেখি আসছে হেসে।
এই দেখি মা তীক্ষ্ণ অসি,
শোভিছে বাম করোপরে।
এই দেখি মা জপের মালা,
ঘুরিছে ঐ দক্ষিণ করে।
এই দেখি মা সিংহাসনে,
আবার দেখি পদ্মাসনে।
আবার দেখি ঘোর শ্মশানে,
নাচছ শব শিবাসনে।
এই দেখি কিশোরী, মাগো,
হচ্ছ আবার ষোড়শী।
অমনি ভীমা ধূমাবতী,
অমনি রমা রূপসী।
এই দেখি মা দৈত্যের জিহ্বা,
ধরেছ ওই বাম করে।
আবার দেখি দক্ষিণ হস্তে
অভয় দিচ্ছ অমরে।
এই দেখি মেতেছ, মাগো!
শত্রুর সনে সমরে।
আবার দেখি পুত্র স্নেহে,
ঝরছে দুই ওই পয়োধরে।
এই দেখি মা ত্রিনয়নে,
চন্দ্র সূর্য অগ্নি জ্বলে।
আবার দেখি সেই নয়নে,
করুণা কটাক্ষ গলে।

মায়ের করুণা কটাক্ষ আর রুদ্র রোষ দুইকেই মায়ের দান হিসাবে শিরোধার্য করিতেন সাধক শিবচন্দ্র। সর্বমঙ্গলা মায়ের আদরের দুলাল রূপে পরিচিত ছিলেন তিনি। কিন্তু তঁাহার এই আদরের দুলালকে মা জীবনে কম দুঃখকষ্ট দেন নাই, পরীক্ষার আগুনে কম দহন করেন নাই। কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ সাধক সকল কিছু সহ্য করিয়াছেন অম্লান-বদনে।।

তখন শিবচন্দ্র স্বগৃহ কুমারখালিতে বাস করিতেছেন। মাতৃপূজার আর মাতৃধ্যানে

সদাই তিনি বিভোর থাকেন। সংসারের আয় তেমন কিছুই নাই, আকাশবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আছেন, যেদিন যাহা কিছু মায়ের ভোগরাগের জন্য উপস্থিত হয় তাহাতেই গৃহের সবাই করেন উদরপূর্তি।

প্রায় দুই দিন হয় অন্ন সংস্থান নাই। কোন মতে দুই একটি ফল সংগ্রহ করিয়া দেবী সর্বমঙ্গলার ভোগ দেওয়া হইতেছে।

সব চাইতে বিপদ শিশুকন্যা কালীকুমারীকে নিয়া। তাহার খাদ্য যোগাড় না করিলে তো চলিবে না। পত্নী চিন্তামণি দেবী তাই অনাহারে দুশ্চিন্তায় প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। এদিকে মাতৃমণ্ডপে বসিয়া ভাবাবিষ্ট সাধক শিবচন্দ্র ইষ্টবিগ্রহের সম্মুখে পরমানন্দে গাহিয়া চলিয়াছেন :

কবে গো, আনন্দময়ী। এ দীনে সে দিন দিবে?
যে দিন—দিন রাত্রি হবে, রাত্রি আমার দিন হবে।
নিশাচরে দিবাচরে, সমান হবে সচরাচরে,
দিবাকর নিশাকর করে, আলোক আঁধার হবে।
সম্পদ বিপদ হবে, বিজন স্বজন হবে।
স্বজন বিজন হবে, বিজন স্বজন হবে।
পিতামাতা ভ্রাতা জায়া, অসার সংসার মায়া,
ঘুচিবে সব ছায়া কায়া, আসা যাওয়া সমান হবে,
সংসার শ্মশান সাজিবে, শ্মশান সংসার হবে,
নদীতট শয্যা হবে, ভার্যা হবে চিতা যবে।[১]

উদাত্ত কণ্ঠের গান ও ভাবাবেশ শেষ হইতেছে না, পত্নী ক্রন্দনরত শিশুকন্যাকে কোলে নিয়া মণ্ডপে এক একবার ঝগড়া করতে গিয়াছেন আবার ফিরিয়া আসিতেছেন।

অবশেষে গান থামিলে, পত্নী সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, এসব তো বেশ শুনলাম। কিন্তু দুটো ভাতের সংস্থান কি করে হবে? তুমি নিজে দুদিন উপবাসী রয়েছো। শিশু মেয়েটাকে এ দুদিন যদিইবা কিছু খেতে দেওয়া হয়েছে। আজ তার কোনো ব্যবস্থাই নেই।"

প্রশান্ত স্বরে উত্তর দেন শিবচন্দ্র, "দ্যাখো, মা সর্বমঙ্গলা তাঁর এ সৃষ্টিটা তোমার আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করেন নি, চালাচ্ছেনও নিজেরই ইচ্ছেমতো। চালাবার শক্তিও তার আছে।"

"এসব তো অনেক বড় কথা, তাঁর সৃষ্টির কথা। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের কথা ভাববার সময় আছে কি তাঁর?"

"কি হাস্যকর কথা বলছো তুমি। এই অনন্ত কোটি গ্রহ তারায় যেমন আছেন তিনি, তেমনি আছেন অণুপরমাণুতে। তার তো কোনো কিছুকেই ভুলবার উপায় নেই। মা আমার সর্বমঙ্গলা। ব্যবস্থা একটা করেছেনই তিনি।"

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই গ্রামের পোস্টমাস্টার শশধর চক্রবর্তী সেখানে আসিয়া হাজির।

"কি মনে ক'রে ভাই? স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করেন শিবচন্দ্র।

১ গীতাঞ্জলি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

উত্তরে বলেন পোস্টমাস্টার, "ঠাকুরমশাই, আপনার একটা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার, আর চিঠি আছে। পিয়নের অসুখ, আজ সে কাজে বেরোয় নি। তাই বাড়ি যাবার পথে আপনার এ দুটো আমি নিজেই দিয়ে যাচ্ছি।"

এই টাকা ও চিঠিটি পাঠাইয়াছেন উত্তরপ্রদেশস্থিত গোরখপুরের এক ভক্ত। তিনি লিখিয়াছেন, 'গভীর রাতে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে দেবী সর্বমঙ্গলা মণ্ডপ আলো ক'রে বসে আছেন। আর আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, কুমারখালিতে আমার ছেলে শিবচন্দ্রকে শিগ্‌গীর একশো টাকা তুমি পাঠিয়ে দাও। বাড়ির সবার উপবাসে মরবার অবস্থা।'

"এই নাও এবার", পত্নীর দিকে টাকাটা ঠেলিয়া দিলেন শিবচন্দ্র। "মায়ের ভোগ-রাগের ব্যবস্থা মা নিজেই ক'রে নিলেন। বুঝলে তো, সন্তানের ওপর মায়ের দৃষ্টিটি ঠিকই থাকে।"

সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মূলে রহিয়াছেন পরাশক্তি মহামায়া, কৈবল্যে আর লীলায় সর্বত্র সর্বকালে তাঁহারই পরমসত্তা ক্রিয়াশীল। সিদ্ধ সাধক শিবচন্দ্রের দিব্য অনুভূতির এই তত্ত্বটি তাঁহার হৃদয়ের এক স্বতোৎসারিত সংগীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি গাহিয়াছেন :

কৈবল্যের সেই নিত্য লীলায়
লীলাময়ী আমারই মা।
মহাকালের হৃৎকমলে তালে তালে
নাচছে শ্যামা।
শিবের বামে জীবের বামে আমারই
সেই একই মা,
সর্বত্র সমদক্ষিণা, বামা হয়েও নন মা
বামা।
শক্তি স্বরূপিণী মা মোর, জীবেরও মা।
শিবেরও মা।
কি জীব, কি শিব, দুই-ই হন শব,
কোলে যদি না করেন মা,
জননে জননী মা মোর, ধারণে হন
ধাত্রী মা।
কারণে ক্রিয়া শক্তি, কার্যে ফল-
বিধাত্রী মা।
জীবনে জীবনী-শক্তি, মৃত্যুরূপা
মরণে, মা।
সাধনায় সাধনা, মুক্তি দানে মুক্ত-
কেশী—মা
কোলের ছেলে দোলে করে, দোলে
মা মোর কি শুধু মা।

আপন কোলে আপনি দোলে, আনন্দ
হিল্লোলে মা।
আপন মুখে আপন নাম ঐ
গেয়ে বেড়ায়, আমারই মা,
মায়ের কেবা আপন, কেবা হয় পর,
আর কিছু নাই সবই যে মা।
কোন্ মা তুমি, কে মা তুমি, সে কথায়
আর কাজ কি বা ?
যে মা, সে মা হও মা ! তুমি বলতে
দাও মা। 'জয় মা শ্যামা'।

কাশীধামের সেই ঈশ্বর প্রেরিত প্রাচীন তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষের কাছ হইতে নিগূঢ় ক্রিয়া গ্রহণ করার পর হইতে শিবচন্দ্রের নয়নসমক্ষে অভীষ্ট সাধনের বর্ত্মটি খুলিয়া যায়। মরণপণ সংকল্প নিয়া শেষ পর্যায়ের প্রয়াসে তিনি ব্রতী হন।

এ সময়ে কৈলাস ও মানস সরোবরে বৎসরাধিক কাল তিনি অবস্থান করেন এবং সেখানেও লাভ করেন এক উচ্চকোটির কৌলসাধকের কৃপা। সেখানে অনুষ্ঠান করেন কঠোর তপস্যার।

তারপর জ্বালামুখী, বিন্ধ্যাচল, কামাখ্যা প্রভৃতি দেবীপীঠে মাতৃআরাধনা সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাগত হন নিজ গৃহে। এখানে সর্বমঙ্গলা মণ্ডপে বসিয়া ধ্যানরত অবস্থায় বীরাচারী মহাসাধকের জীবনে আসে তাঁহার বহু প্রার্থিত পরমপ্রাপ্তির লগ্ন। জ্যোতিঃঘন, ষড়ৈশ্বর্যময়ী জগজ্জননী আবির্ভূতা হন তাঁহার নয়নসম্মুখে।

মহাকৌল শিবচন্দ্রের হৃদয় দহরে ফুটিয়া উঠে একমেবাদ্বিতীয়ম্, পরমসত্তার মহাপ্রকাশ। সেই প্রকাশের সম্মুখে শিব শিবানীতে পার্থক্য নাই, ব্রহ্ম ও শক্তিতে সদা রহিয়াছে অভেদ দর্শন, ধ্যেয় ও ধ্যাতা সেখানে একাকার। এই পরম উপলব্ধির কথা উত্তর জীবনে ঝঙ্কৃত হইয়াছে মহাসাধকের কণ্ঠে :

পূজার আগে সোহং, পরে সোহং,
মধ্যে যে ত্বং, সে ও অহংময় ;
নইলে তোমার অঙ্গন্যাসে, আমার কিবা আসে ?
আমার অঙ্গন্যাসে তোমার কিবা হয় ?
প্রেম জাগে যখন, আর কি তখন,
তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব
তোমায় আমার সাধনা হয়,
তখন অভেদ সম্বন্ধে—,
মাতি প্রেমানন্দে,
ব্রহ্মময়ীর পূজার পূজক ব্রহ্মময়[1] ॥

[1] ——— (১ম) : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব
গীতাঞ্জলি গীতাঞ্জলি

সাধনার সিদ্ধি ও ইষ্টদর্শন হইয়াছে, শিবচন্দ্রের অন্তরপটে মাঝে মাঝে ঘটিতেছে জ্যোতির্ময়ী জগজ্জননীর আবির্ভাব। আবার ঢাকিতে হইতেছে তাঁহার অদর্শন। এ সময়কার ব্যবহারিক জীবনে শিবচন্দ্র বহুতর কর্ম নিয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। কখনো তন্ত্রতত্ত্বের প্রচারে, কখনো বা ইষ্টদেবীর পূজা অনুষ্ঠানে, তিনি মত্ত থাকিতেন। কখনো তৎপর হইয়া উঠিতেন দেশমাতৃকার পূজারী মুক্তিসংগ্রামীদের সমর্থনে। কিন্তু যে কর্মেই নিয়োজিত থাকুন, অন্তরে জগজ্জননীর স্মরণ মনন অনুধ্যান চলিত নিরন্তর।

পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামী উত্তরকালে শিবচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ করিতে গিয়া তাঁহার এ সময়কার মনোভাবের চিত্র দিয়াছেন: "দিদিমার সহিত তাঁহার (বিদ্যার্ণবের) সর্বমঙ্গলা মন্দিরে আমারও যাতায়াত ছিল। কিন্তু আমি তখন ছোট। মনে পড়ে, সেই সময়েই একবার তিনি খুব ধুমধামের সহিত পাঁচখানি দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। যাহা হৌক, পরে আমি স্কুলে পড়ি, সেই সময়ে একদিন তাঁহার আলোচনা সভায় যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেদিন তিনি অনেক ভালো কথা বলিয়াছিলেন। পরে তাঁহার 'তন্ত্রতত্ত্বে' সেই সকল আলোচনা পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তিনি আলোচনা করিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে 'তারা, তারা, তারা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিতেছিলেন। বার কয়েক শুনিবার পর আমি ফস্ করিয়া বলিয়া বসিলাম—বেশ তো বলিতেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অমন চিৎকার করিয়া উঠিতেছেন কেন? বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আমি সংকুচিত হইয়া পড়িলাম। কোথায় সামান্য গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অর্বাচীন তরুণ ছাত্র আমি, আর কোথায় হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, সারপেণ্ট পাওয়ার প্রভৃতির লেখক, উডরফ সাহেবের গুরু, ভারতের অদ্বিতীয় সংস্কৃত বক্তা, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়।"[১]

উপস্থিত সবাই সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন বালকের ঐ মন্তব্যে। ভাবিতেছেন, শিবচন্দ্র এবার হয়তো ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে তিরস্কার করিবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল অন্যরূপ।

চক্ষু নিমীলিত করিয়া কিছুক্ষণ শিবচন্দ্র নীরব রহিলেন, তারপর বালকের দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ঠিক বলেছিস তুই। তারা—তারা ব'লে কত ডাকছি, কত কেঁদে মরছি, কিন্তু ছেলের কথায় যখন তখন সে বেটি তো সাড়া দেয় না। সব সময়ে তো পাইনে তার দর্শন!" বলিতে বলিতে শিবচন্দ্রের চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া আসিল। ভক্ত ও দর্শনার্থীরা মাতৃসাধকের দিব্যভাবমণ্ডিত আননের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

কুমারখালির প্রবীণ ভক্তসাধক কাঙাল হরনাথ এবং তরুণ শিবচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা ছিল অতি গভীর। এই অন্তরঙ্গতার প্রভাব শিবচন্দ্রের উপর বিশেষভাবে পতিত হয়, তাঁহার তন্ত্রধৃত জীবনে বাল্যকাল হইতেই দেখা দেয় উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা। তাই কালী ও কৃষ্ণের অভেদ তত্ত্ব তাঁহার ভিতরে অতি সহজভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে।

কাঙাল হরনাথ শিবচন্দ্রের পিতার কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নিয়াছিলেন, আবার শিবচন্দ্র শৈশবে হাতেখড়ি নিয়াছিলেন হরনাথেরই কাছে। উভয় পরিবারে তাই ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ ছিল।

---

১ স্মৃতি তর্পণ: তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র গৌরভাবিনী, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩

শুদ্ধা ভক্তির সাধনার কাঙাল হরনাথ উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার লেখায় গানে ও উপদেশে সমন্বয়মূলক প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফিকিরচাঁদ সংসদে বাল্যকালে শিবচন্দ্র প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, কাজেই হরনাথের ভক্তিভাব অনেক পরিমাণে তাঁহাকে রসায়িত করিয়াছিল।

উত্তর জীবনে শিবচন্দ্র তন্ত্রসাধক ও তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্‌রূপে খ্যাত হইয়া উঠেন। স্বদেশ এবং হিন্দুধর্মের উজ্জীবনের জন্য নানা কল্যাণকর প্রয়াসের সহিত তিনি যুক্ত হইয়া পড়েন। এ সময়ে কাঙাল হরনাথের সহিত প্রায়ই তাঁহাকে পরামর্শ করিতে দেখা যাইত। কি করিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ ও মনোমালিন্য মেটানো যায়, কি করিয়া জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবন হইতে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করা যায়, উভয়ে সেই পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেন।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে কৃষ্ণচরিত্র রচনা করেন, নিজের মতবাদ ও যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ চরিত্রের এক আধুনিক ব্যাখ্যা তিনি স্থাপন করেন।

বঙ্কিমের এই ব্যাখ্যার সহিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব একমত হন নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ ইহার এক সমালোচনা লিখিয়া ফেলেন। প্রবীণ সাধক হরনাথকে পড়িতে দিয়া জানিতে চাহেন তাঁহার অভিমত।

হরনাথ বলেন, "তুমি শক্তিমান্ সাধক, তত্ত্ব জানো। এ ধরনের সমালোচনায় শুধু দোষ ত্রুটি উদ্‌ঘাটিত হয়। এসব না লিখে বরং প্রকৃততত্ত্ব, প্রকৃত রস উদ্‌ঘাটন করো। কৃষ্ণলীলা মাধুর্যের রস পরিবেশন করো সর্বজনের কল্যাণে। তাতে কাজ বেশী হবে।"

শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এ কথা মানিয়া নিলেন। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে রচনা করিলেন 'রাসলীলা'। তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের এই গ্রন্থটি পড়িলে বুঝা যায়, পরম বস্তুতে কোনো ভেদ নাই, তাঁহার রসের ধারায় পরিতৃপ্ত হয় জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ।

কাঙাল হরনাথ যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন শিবচন্দ্র তাঁহার ভক্তদের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া মরদেহটি সৎকারের জন্য বহন করিয়া নিয়া যান। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদল অধ্যুষিত কুমারখালিতে তাঁহার এই কার্যটি অনেকের কাছে নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু তত্ত্ববিদ্ সাধক শিবচন্দ্র সেদিকে দৃক্‌পাত করেন নাই।

প্রখ্যাত মরমিয়া সাধক লালন ফকীর সে-বার কুমারখালিতে শিবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

লালন নিকটেই থাকেন। সাধক হিসাবে শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার কথা, তাঁহার শাস্ত্র বচন ও বাগ্মিতার কথা, তিনি শুনিয়াছেন। বয়স হিসাবে সিদ্ধ ফকীর লালন শিবচন্দ্র হইতে বড়। কিন্তু নিজেই সখ্যতা দেখাইতে আসিয়াছেন, পদব্রজে উপস্থিত হইয়াছেন শিবচন্দ্রের দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে।

শিবচন্দ্র তো মহা আনন্দিত, পরম সমাদরে এই সিদ্ধ ফকীরকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, "বড় অনুগ্রহ আমার ওপর।"

"অনুগ্রহ নয়—দর্শন। হেথায় দর্শন করতে এলাম আমার দাদা ঠাকুরকে।" সারল্য ভরা হাসি হাসিয়া বলেন লালন। "তাছাড়া, পড়শী তো আমরা বটেই। সেই মনের

মানুষ যে জন, তাঁকে ঘিরেই তো আমরা সব পড়শীরা দিন গুজরান করছি। আপনি যার জন্য ফকীর, আমিও তাঁর জন্যই। তাই না দাদাঠাকুর ?"

বাউলবেশী লালন ফকীরের কাঁধে ঝোলা, হাতে একতারা আর বীরাচারী মাতৃসাধক শিবচন্দ্রের পরিধানে একটি গৈরিক বসন, সারা দেহ ভস্মলিপ্ত, কপালে বৃহৎ রক্ত চন্দনের ফোঁটা আর ত্রিপুণ্ড্রক। দুই-ই ফকীর বই কি। গ্রামের লোকেরা লালনের আগমনবার্তা পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছে। সর্বমঙ্গলার মণ্ডপের সম্মুখে দুই সাধককে ঘিরিয়া কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে সংলাপ শোনার প্রতীক্ষায়।

শিবচন্দ্র গদ্‌গদ স্বরে বলেন, "ফকীর, তোমায় পেয়ে আনন্দ আমার উথলে উঠছে, সে আনন্দ প্রকাশ করার ভাষাও ফেলেছি হারিয়ে। যাক্, এসেছো যখন, প্রাণের পিপাসা মেটাও, বিলাও তোমার বাউল গানের সুধা।"

একতারা বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরেন লালন ফকীর .

আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
—পড়শী বসত করে।
গ্রাম বেড়ে তার অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
মনে বাঞ্ছা করি দেখাবো তারে,
কেমনে সে গাঁয়ে যাই রে।
কি কব পড়শীর কথা ও তার
হস্তপদ স্কন্ধমাথা নাই রে
ও সে ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
ও মোর যম যাতনা সকল যেতো দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়,
তবুও লক্ষ যোজন ফাঁক্-রে।

শিবচন্দ্র বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন, প্রিয় ভক্ত দানবাবুকে ডাকিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "দানু, দানু, প্রাণ ভরে শোন, কি অপূর্ব গান ফকীরের। সিদ্ধপুরুষ ছাড়া এ গান কে গাইতে পারে ?"

বলিহারের রাজার কৌলসাধনার উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্থির করিলেন, আচার্য শিবচন্দ্রকে বরণ করিবেন তাঁহার সভাপণ্ডিতরূপে। ভাবিলেন, সেই সুযোগে তাঁহার উপদেশ নিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যাইবে।

বহু অনুনয় বিনয় করিয়া শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে বলিহারে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে থাকিয়া শিবচন্দ্র বেশ কিছুদিন রত হইলেন শাস্ত্রচর্চা তপস্যায়। কিন্তু অতঃপর সভাপণ্ডিতের বৃত্তি তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। হঠাৎ একদিন সেখানকার বাস উঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন কুমারখালির নিজ আবাসে।

ভক্ত পরিবৃত হইয়া তিনি থাকিতেন। ঘরে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি ছিল, তারপর ছিল ইষ্টদেবীর পূজার দায়িত্ব। তাই শিবচন্দ্রকে এই সময়ে প্রতিমাসে বহু অর্থ ব্যয় করিতে

হইত। বলিহারের সভাপণ্ডিত হিসাবে প্রতিমাসে বাঁধাধরা একটা মোটা আয় ছিল, এবার তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, সংসারের বিপুল ব্যয়-ভার এবার কি করিয়া চলিবে? শিবচন্দ্র উত্তর দিলেন, "মায়ের অভয় পদে যে শরণ নিয়ে আছে, তার আবার ভয় কি? নাঃ—এখন থেকে কোনো ব্যক্তি বিশেষের অর্থ সাহায্যের ওপর আর আমি নির্ভর করবো না। আমার মা সর্বমঙ্গলা যা হোক একটা ব্যবস্থা করবেন বৈ কি।"

অতঃপর সংসারের ব্যয় এবং সর্বমঙ্গলার ভোগরাগ ও পূজা অর্চনার ব্যয় নির্বাহ হইত নিতান্তই ইষ্টদেবীর অনুগ্রহে। যেদিন যেমন অর্থের দরকার হইত, তাহা উপস্থিত হইত দূর দূরান্তের ভক্ত ও অনুরাগীদের নিকট হইতে।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং বরাবরই তন্ত্রসাধনার অনুরাগী ছিলেন। উচ্চ-কোটির সাধক মহলে তাঁহার যাতায়াত ছিল এবং সুযোগ পাইলেই ক্রিয়াবান্ সাধকদের নিকট হইতে তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

কামেশ্বর সিংজী একবার তারাপীঠে মহাত্মা বামাক্ষেপার নিকট উপস্থিত হন এবং অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শ্মশানে বসিয়া অভিচার অনুষ্ঠানের প্রার্থনা জানান।

ক্ষেপা তাঁহাকে আশীর্বাদ দিয়া বলেন, "তুমি তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্রের কাছে যাও, তিনি শক্তিমান্, তান্ত্রিক নিগূঢ় অনুষ্ঠানেও দক্ষ। তাঁর কৃপা পেলে সিদ্ধ হবে তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।"

নির্দেশমতো, কিছুদিনের মধ্যে কামেশ্বর সিংজী কুমারখালিতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষেপার কথা শুনিয়া এবং মহারাজার আন্তরিক ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া শিবচন্দ্র তাঁহাকে সাহায্য করিতে রাজী হন। অচিরে গভীর নিশাযোগে স্থানীয় শ্মশানে অনুষ্ঠিত হয় মহাকালীর আরাধনা। শিবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও সাধনবিভূতি দেখিয়া কামেশ্বর সিংজী মুগ্ধ হন, পরিণত হন তাঁহার এক অনুরাগী ভক্তরূপে।

অতঃপর আরও কয়েকবার কামেশ্বর সিংজী আচার্য শিবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তন্ত্রের সাধন ও তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ লাভ করেন। একবার শিবচন্দ্রের দেওঘরে অবস্থানের কালে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং সেখানকার শ্মশানে বসিয়া সম্পন্ন করেন তাঁহার উত্তরসাধকের কর্ম।

সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের শ্মশান সাধনার তথ্য খুব কমই জানা গিয়াছে। তাঁহার উত্তর সাধকদের প্রদত্ত যৎসামান্য সংবাদ হইতে এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি চিত্র দাঁড় করানো যায়।

তাঁহার শ্মশান সাধনা ছিল তিথি ও যোগ সাপেক্ষ। এই যোগ যে কখন সমাগত হইবে তাহা অপরে জানিত না। এই শুভ লগ্ন যখন উপস্থিত হইত তখন তিনি শ্মশান ভূমিতে গমন করিয়া সাধনা করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন, মাতৃতত্ত্বপিপাসু শিষ্যগণ যখন তাহার সহিত গমন করিতেন, শিক্ষাদানকল্পে যাহা আবশ্যক সকলকেই তাহা প্রদর্শন করিতেন, তবে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিষ্য না হইলে কখনো সঙ্গে লইতেন না বা সাধনার সময় নিকটে থাকিতে সম্মতি দিতেন না।

—হাওড়া শিবপুরের শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধ কৌল বামাক্ষ্যাপার আশ্রম তারাপীঠে কিছুদিন অবস্থান করেন। ক্ষেপা একদিন তাঁহাকে আদেশ করিলেন, 'ওরে, তুই কুমারখালির পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে যা, সেখানে তুই সায়েস্তা হবি।'

—ভাগ্যবান্ সাধক এই আদেশ প্রাপ্তির পর বিদ্যার্ণবের গৃহে সমাগত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, তারপর সর্বদা ভক্তি প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট সাধনা বিষয়ে নানা শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদা যখন শ্মশান সাধনার সুযোগ উপস্থিত হইল, তিনি গুরুদেবের সহিত নিশীথে সাধনার জন্য গৌরীতটে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। সাধনার কোনও প্রক্রিয়া কয়েকবার এই শিষ্যকে প্রদর্শন করার পরও যখন যথাযথ অনুষ্ঠানে তিনি অক্ষম হইলেন, তখন সেই নিস্তব্ধ শ্মশানেই ঠাকুর সক্রোধে শিষ্যকে চিমটা দ্বারা প্রহার করিলেন। তারপর আবশ্যকীয় ক্রিয়া ও সাধনায় তত্ত্বপিপাসু শিষ্যকে কৃতিবান্ করিয়া নিশা শেষে গৃহে ফিরিলেন।

ইহা ছাড়াও ঘোর নিশীথে কখনও কখনও কোনো শ্মশানে বসিয়া শ্মশানবাসিনী শ্যামামায়ের আরাধনায় তিনি নিমগ্ন থাকিতেন। সেখানে যে কি প্রকার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতেন, কিভাবে যোগ সমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন তাহা আর অন্য কেহ জানিতে পারিত না ; যদি কিছু জানা সম্ভব তাহা তাঁহার ভাগ্যবান্ শিষ্য দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়ই একমাত্র জানিতে পারিতেন।

কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত সে-বার বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতীয় সাধনা ও ধর্মসংস্কৃতির সম্বন্ধে ইঁহারা অতিশয় অনুসন্ধিৎসু। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তখন বারাণসীতে অবস্থান করিতেছেন, সারা উত্তর ভারতে তাঁহার তখন প্রচুর খ্যাতি। তান্ত্রিক ও ক্রিয়াবান্ এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে জার্মান পণ্ডিতেরা সোৎসাহে দর্শন করিতে আসিলেন। সবাই তাঁহারা ভালো সংস্কৃত জানেন, কাজেই কথাবার্তায় কোনো অসুবিধা হইল না। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে শিবচন্দ্র ভারতীয় সাধনার বৈচিত্র্য ও গভীরতা, বিশেষত প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতির মর্মকথা বুঝাইয়া বলিলেন।

তন্ত্রের আলোচনা উঠিল এবং এই সাধনধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে বর্ণনা করিলেন তাঁহার নিজের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব।

জার্মান পণ্ডিতেরা একমনে তাঁহার ভাষণ শুনিতেছেন, আর নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন তাঁহার মুখের দিকে।

বিদায়ের সময় সবাই একে একে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এই সিদ্ধ মহাত্মার চরণ বন্দনা করিলেন, পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন তাঁহার সস্নেহ আশীর্বাদ।

শিবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ভক্তশিষ্য এবং তাঁহার বহু নিগূঢ় ক্রিয়ার উত্তরসাধক ছিলেন কুমারখালির দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়। গুরুর জীবনের বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। তিনি বলিয়াছেন, "দীর্ঘকাল ঠাকুরের সঙ্গ করেও তাঁকে বুঝতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তাঁর সাধনজীবনের কার্যকলাপ যা কিছু দেখেছি, তা থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, তিনি ছিলেন মহাশক্তি মহামায়ার কৃপাপ্রাপ্ত সাধক, বিপুল-শক্তিবিভূতির উৎস।

"বীরাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী সব তন্ত্রসাধকেরাই আসতেন তাঁর কাছে। প্রত্যেককেই যাঁর যাঁর নিজস্ব ধারা ও প্রণালী অনুযায়ী প্রক্রিয়া তিনি দেখিয়ে দিতেন। নিগূঢ় উপদেশ পেয়ে তাঁরা কৃতার্থ হতেন। সত্যকার সাধনকামীদের প্রতি তিনি ছিলেন পরম

কৃপালু, হাতে কলমে তাঁদের শিক্ষা দিতেন, অনেক সময় শ্মশানে বসে সারা রাত্রি ব্যস্ত থাকতেন তাঁদের নিয়ে। বহুবার নিজে সঙ্গে থেকে এসব আমি দেখেছি।

"কাশীতে দেখেছি ভারতের নানা প্রদেশ থেকে শুধু শাক্তই নয়, আরো অন্য সম্প্রদায়ের সাধক—শৈব, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য, আসতেন তাঁর কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়ে। সবারই আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানে হাসিমুখে সাহায্য করতেন গুরুদেব।"

শিবচন্দ্রের মাতৃপূজার অনুষ্ঠানাদি সংখ্যায় যেমন অজস্র ছিল, তেমনি ছিল জাঁকজমকপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। কিন্তু সব সময়েই দেখা যাইত মায়ের প্রসাদে প্রয়োজনীয় অর্থ পূর্বাহ্নেই সংগৃহীত হইয়াছে, ভক্তদের খেদের কোনো কারণ থাকিত না।

একবার শিবচন্দ্র মহা আড়ম্বরের সহিত পঞ্চ-দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার এই পূজা যেমনি অভিনব, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সারা বাংলার ঘরে ঘরে এই রাজসিক মহাপূজার কাহিনী প্রচারিত হয় এবং দূরদূরান্তর হইতে অগণিত ভক্ত সাধক ও কৌতূহলী দর্শক তাঁহার পূজাক্ষেত্রে আসিয়া জড়ো হন।

শিবচন্দ্রের এই পঞ্চদুর্গার মূর্তিতে ছিল পাঁচটি বিভিন্ন ভঙ্গীর রূপকল্পনা। এগুলি যথাক্রমে সিংহ আরূঢ়া মহিষমর্দিনী, যার সম্মুখে আরাধনারত শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার পরিকরগণ বাংলার দশপ্রহরণধারিণী দেবী-দুর্গা, চণ্ডীতে বর্ণিত শ্রীদুর্গা, নবদুর্গা পরিবৃতা লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি সহ মহিষমর্দিনী দেবী, চৌষট্টি যে যোগিনী এবং দশমহাবিদ্যা বেষ্টিতা—মহাচণ্ডী।

শিবচন্দ্রের পরিকল্পিত এই মহাপূজার মর্মকথা এবং তাৎপর্য—অগণিত শক্তি ও প্রতীকের মূলে রহিয়াছে এক এবং অখণ্ড পরমাশক্তি।

এই মহাপূজায় কাশীধাম ও বাংলার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং এ পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল দেশের প্রভাবশালী ভূম্যধিকারীদের অকৃপণ সহায়তায়।

বাহ্য পূজার প্রয়োজনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন শিবচন্দ্র। তাছাড়া, দেবীপূজায় তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কোনো খুঁটিনাটি অনুষ্ঠান ও উপচার বাদ দিবার কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। শাস্ত্রোক্ত আরাধনায় জনমানসে দেবী স্ফুরিতা হইয়া উঠেন এবং মৃন্ময়ী চিন্ময় রূপ পরিগ্রহ করেন, একথাটি বার বার তিনি বলিতেন। পূজা সম্পর্কে শিবচন্দ্র লিখিয়াছেন

"যাঁহার শক্তি আমাতে সংক্রামিত করিতে হইবে, তাঁহার তত্ত্ব সাগরে আমার আত্মঅস্তিত্ব একেবারে ডুবাইয়া দিতে হইবে। নতুবা তাঁহার সে শক্তি কিছুতেই আমাতে সংক্রামিত হইবার নহে। যাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আত্মহারা হইয়াছেন তিনি তাঁহাতে ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন, যতদূর তন্ময়তা সিদ্ধ হইয়াছে, ততদূরই শক্তি তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছে। শক্তিরাজ্যে ইহা নৈসর্গিক নিয়ম।

"মাকে ডাকিবার, বিবিধ উপচারে অর্চনা করিবার এবং তাঁহার ভাবে আত্মহারা হইবার মতো শক্তি হৃদয়ে সঞ্চয় করিবার পর মায়ের প্রতিমায় তাঁহার আবির্ভাবের কথা বিচার করা আবশ্যক। তুমি দেখ প্রতিমার পূজা, কিন্তু যিনি স্বয়ং পূজা করেন, অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি কিন্তু দেখিতে পান—অচেতন প্রতিমা যন্ত্রে চৈতন্যময়ীর পূর্ণ আবির্ভাব। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিসর্জনের পূর্ব পর্যন্ত সাধকের সিদ্ধাঞ্জনস্নিগ্ধ নয়নে

মৃন্ময়ী প্রতিমা তখন চিন্ময়ীর স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া নিত্য নব লাবণ্যময়ী ব্রহ্মময়ী বিশ্বজননীর ব্রহ্মময় কান্তিচ্ছটা উদ্গিরণ করে।

"মায়ের ভক্ত তাঁহার অন্তর হইতে চিন্ময়ীর যে জ্যোতিঃ আনিয়া মৃন্ময়ীতে সংযোজিত করেন, মৃন্ময়ীতে পূজা শেষ করিয়া আবার সেই চিন্ময়ীর জ্যোতিঃ চিন্ময়ীতে সংযোজিত করেন। তখন বাহিরের মণ্ডপে যেমন ভুবনভরা রূপের ছটা, অন্তরের মণ্ডপেও দেখি তেমনই অনুপম সৌন্দর্য-ঘটা।"

বিশ্বজননীর লীলা সদাই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তজনের হৃদয়ে। চকিত আবির্ভাব ও অন্তর্ধানে, আলোয় আঁধারে, বহু বিচিত্র রসে এই লীলা উচ্ছলিত। মায়ের এই লীলা তাঁহার জীবনে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সে সম্পর্কে শিবচন্দ্র বলিতেছেন, "মা আমাদের যেমন ভিতরে তেমনি বাহিরে, যেমন বাহিরে তেমনি ভিতরে। কিছুদিন এইরূপে ভিতরে বাহিরে আসা যাওয়া করিতে করিতে প্রাণের কপাট যেদিন একেবারে খুলিয়া যাইবে সেইদিন আমার আবাহন বিসর্জন একেবারে জন্মের মতো ঘুচিয়া যাইবে। বাহিরে চাহিলে যেদিন ভিতরের মূর্তি আমি দেখিতে পারিব, ভিতরে চাহিলে যেদিন বাহিরের মূর্তি দেখিব, ভিতরে বাহিরে,—বাহিরে ভিতরে যেদিন এক হইয়া যাইবে, সেইদিন মা আমার আসা যাওয়া ঘুচাইয়া চরণ দুখানি গোছাইয়া স্থির হইয়া বসিবেন। অশান্ত নৃত্যকালী সেইদিন আমার শান্ত হইবেন কিংবা কি জানি অন্তরে বাহিরে খোলাপথ পাইয়া হয়তো আনন্দময়ী আরও ছুটাছুটি করিবেন। কিন্তু সে ছুটাছুটি করিলেও সেদিন আমি আর তাঁহাকে আনিব না, লইবও না, তিনি আপনি আনন্দে আপনি আসিবেন, আর আপনি যাইবেন—আপনি নাচিবেন, আপনি গাইবেন, আপন খেলা আপনি খেলিবেন, আমি সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া 'জয় মা—জয় মা' বলিয়া নাচিয়া বেড়াইব।"

শিবচন্দ্রের অনুরাগী এবং ভক্ত তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা ও অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী, শ্রীবসন্তকুমার পাল তাঁহার কুলকুণ্ডলিনী পূজার বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন

পরমসিদ্ধ, মাতৃসাধন সুধার অর্ণব, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের আরাধিতা সর্বমঙ্গলা দেবীর নিত্যকার পূজার সহিত অন্যতম অপরিহার্য অবশ্য অনুষ্ঠান-অঙ্গ তন্ত্রোক্ত বিধানে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পূজা এবং ভোগ ব্যবস্থিত ছিল। উহার উপচারাদির মধ্যে প্রধান ছিল কাঁচা দুগ্ধ, উৎকৃষ্ট জাতীয় সুপক্ক কদলী ও পরমান্ন প্রভৃতি। এই পূজাটি অনুষ্ঠিত হইত শিবমন্দিরে শিবসান্নিধানে। ভোগ নিবেদন সমাপন করিয়া শিবচন্দ্র নির্মীলিতনেত্রে ধ্যান নিমগ্ন হওয়ার অনতিকাল মধ্যেই কোথা হইতে কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপিণী একটি বৃহৎ গোক্ষুরসর্প (সাড়ে চার ফুট পাঁচ ফুট লম্বা) আসিয়া দুগ্ধ পরমান্ন ও পাত্রস্থিত নিবেদিত আহার্য ভক্ষণে রত হইত। কখনও কখনও সঙ্গে আর একটি শ্বেত সর্পের আগমন হইত, অবশ্য শ্বেত সর্পটি প্রত্যহ দেখা যাইত না। পরিতোষ সহকারে ভোগ প্রসাদ আহারান্তে সর্পটি ফণা বিস্তারপূর্বক ধ্যানে উপবিষ্ট শিবচন্দ্রের মস্তকের উচ্চতার সমান উচ্চে উঠিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় ফোঁসফোঁস শব্দে দুলিতে থাকিত।

অর্ধোন্মীলিত নেত্রে ভাবাবিষ্ট শিবচন্দ্র—"আয় মা আয় মা, এলি ? ব্রহ্মময়ী তারা মা আমার, আয় আয়" ধ্বনি করিতে করিতে সম্মুখে হস্ত সম্প্রসারণপূর্বক কুণ্ডলিনীস্বরূপা অজগরটির মস্তকে হাত বুলাইয়া দিলে উহা তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া এবং কুণ্ডলী পাকাইয়া বিরাট ফণাটি বিস্তারপূর্বক হিস্‌হিস্ শব্দে ডানে বামে দুলিতে থাকিত। আবার ক্ষণকাল পরেই বিদ্যার্ণব ঠাকুরের কখনও দক্ষিণবাহু কখনও বামবাহু জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমে উপরে

উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া পুনঃ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার বুকের সহিত মাথাটি লাগাইয়া যেন কান পাতিয়া থাকিত।

মনে হইত সর্পটি যেন বিদ্যার্ণব হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল উত্থিত মর্মোচ্ছ্বাস ধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্য এভাবে তাঁহার বাহুসংলগ্ন হইয়া থাকিত। আর বিদ্যার্ণব ঠাকুর মাঝে মাঝে ভাব নিমগ্ন অবস্থায়ই "তারা তারা তারা" বলিয়া তারায় আত্মহারা হইয়া তারস্বরে ধ্বনি দিতে থাকিতেন।

এইরূপে বারকয়েক ধ্বনি দেওয়ার পর পুনঃ সর্পের মস্তকে হস্ত সঞ্চালন করিলে সর্পটি এবার বিদ্যার্ণবের কণ্ঠ হইতে শিরে উঠিয়া দুই-চারবার বিস্তৃত ফণায় দোল দিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখস্থ শিবের লিঙ্গমূর্তিটির শীর্ষে আরোহণ করিত, পূর্ববৎ ফণা বিস্তার করিয়া ক্ষণকাল থাকিয়া, কোথায় আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত।

সর্পটি চলিয়া যাইবার পর শিবচন্দ্র ভোগের ভুক্তাবশিষ্ট হইতে প্রসাদ লইয়া "তারা তারা" ধ্বনি করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে তাহা গ্রহণ করিতেন। প্রথম প্রথম সকলেই তাঁহাকে এই প্রসাদ গ্রহণে বিরত থাকিবার জন্য আকুতি ও অনুরোধ করিত—কিন্তু তিনি নির্ভয়ে মায়ের প্রসাদ খাইয়া ফেলিতেন। নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক ছিল এই কার্য।[১]

তন্ত্রসাধন তন্ত্রসিদ্ধি ও তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্বের আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল শিবচন্দ্রের জীবন। এবার এই ভাস্বর জীবনে দেখা দেয় আচার্যের ভূমিকা। আচার্যরূপে জনকল্যাণের তিনটি বৃহৎ কর্মসূচী তিনি গ্রহণ করেন।

প্রাচীন তন্ত্রসাধনার অবনতি এদেশে বহু শত বৎসর যাবৎ শুরু হইয়াছে। এই অবনতি নিম্নতম পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার শেষ যুগে। সাধনার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে নানা বীভৎসতা নিষ্ঠুরতা ও যৌন কদাচার। শাস্ত্রের ভিতরে দেখা দিয়াছে নানা বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা। ফলে এই নিগূঢ় মুক্তি-সাধনা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে এই যুগ সঞ্চারিত হইয়াছে ঘৃণা, সন্দেহ ও অহেতুক আতঙ্ক।

এই অধঃপতন ও অপব্যাখ্যার কবল হইতে তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রকে মুক্ত করার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন শিবচন্দ্র।

এই কার্য সাধনা করিতে হইলে সাধনা এবং শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। তাই সাধনকামী শিষ্যদের সম্মুখে তিনি তুলিয়া ধরিলেন নিজের বীরাচারী ও শুদ্ধতর ক্রিয়াসমন্বিত সাধনা। কাশীতে থাকাকালে ভারতের কৌল সাধক এবং পণ্ডিত মহলে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রসিদ্ধির কথা প্রচারিত হয় এবং পণ্ডিত মুমুক্ষু ভক্ত তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসেন, দীক্ষা ও উপদেশ পাইয়া তাঁহারা ধন্য হন।

প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র এবং তন্ত্রতত্ত্বের প্রচার না হইলে তন্ত্র সম্পর্কে লোকের ভয় এবং সন্দেহ দূর হইবে না, অনুরাগও আসিবে না। তাই নিজের নিভৃত সাধনচক্র হইতে শিবচন্দ্রকে বাহিরে আসিতে হইল, অমিত উৎসাহ ও কর্মশক্তি নিয়া প্রচারকর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সর্বপ্রথমে কাশীধামে উচ্চকোটির সাধক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের নিয়া শিবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন সর্বমঙ্গলা সভা। এই সভার মাধ্যমে, শিবচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগী মনীষী ও সাধকদের চেষ্টায় তন্ত্রের শুদ্ধতর রূপটির সহিত সাধক ও ভক্ত জনগণের পরিচয় সাধিত হইতে থাকে।

১ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বসন্তকুমার পাল, *হিমাদ্রি পত্রিকা*, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

শিবচন্দ্র একাধারে ছিলেন সিদ্ধপুরুষ, শাস্ত্রবিদ্, কবি ও বাগ্মী, কাজেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল অপরিসীম। বিশেষ করিয়া জনজীবনে তাঁহার বাগ্মিতার প্রভাব ছিল বিস্ময়কর। বাংলা, সংস্কৃত এবং হিন্দিতে অনর্গলভাবে তিনি বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, ভাষায় আবেগময় ঝঙ্কার এবং তেজোদৃপ্ত উদ্দীপনায় সহস্র সহস্র শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়া যাইত, গ্রহণ করিত উচ্চতর জীবন সাধনার প্রেরণা।

এই সময়ে সারা উত্তর ভারতে সনাতন ধর্মের উজ্জীবনের জন্য এক প্রবল ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয়। এই তরঙ্গের শীর্ষে অধিষ্ঠিত দেখি ধর্ম সংস্কৃতির ধারক বাহক একদল প্রতিভাধর পুরুষকে। ইহাদের মধ্যে অগ্রণী—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি, কালিবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি।

শিবচন্দ্র এবং ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায়, বিশেষত ইহাদের বাগ্মিতা ও লেখনীর প্রভাবে, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষিতসমাজে নূতন মূল্যবোধ জাগিয়া উঠে, হিন্দুধর্মের শাশ্বত ও সর্বজনীন রূপের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

শিবচন্দ্রের আবাল্য বন্ধু জলধর সেন তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা সম্পর্কে বলিয়াছেন, "সাধু-ভাষায় এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখবার শক্তি সত্যসত্যই শিবচন্দ্রের ছিল। সে সময়ে আরও একজনের সে শক্তি ছিল, তিনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উভয়ের বক্তৃতার একটা পার্থক্য এই ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চলিত ভাষায় বক্তৃতা করতেন, আর শিবচন্দ্র সাধুভাষায় বলতেন। বাংলা ভাষা যে কতদূর শক্তিসম্পন্ন, বাংলা ভাষায় মাধুর্য যে কতদূর মনোমদ, যারা বাগ্মীপ্রবর শিবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা সেকথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করবেন।"

তন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিবচন্দ্র রচনা করিলেন 'তন্ত্রতত্ত্ব'। এই মহান্ গ্রন্থ তাঁর সারস্বত জীবনের এক মহান্ কীর্তি। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব, মহত্ত্ব এবং প্রামাণিকতা এই গ্রন্থে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সঙ্গে চেষ্টা করিয়াছেন তন্ত্র সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তিদের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস দূর করিতে। এই গ্রন্থে তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্র একথাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে তন্ত্রের সহিত বেদ দর্শন, প্রভৃতির ও পুরাণের কোনো বিরোধ নাই। শুধু তাহাই নয়, তন্ত্র, বেদান্ত, বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রভৃতি সকলেরই মধ্যে হিন্দু সাধনার পরমতত্ত্ব প্রতিফলিত, এই উদার সার্বভৌম মতও তিনি ইহাতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই উদার শুভবুদ্ধি ও অখণ্ড জীবনবোধ শিবচন্দ্রকে চিহ্নিত করিয়া দেয় সমকালীন ভারতের এক অসামান্য ধর্মনেতারূপে।

কবি, সাহিত্যিক ও তত্ত্বদর্শী শিবচন্দ্রের রচনার সংখ্যা কম নয়। সাহিত্যিক মূল্যায়নের দিক দিয়াও এগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তন্ত্রতত্ত্ব (১ম, ২য় ভাগ) গঙ্গেশ (নাটক), দুর্গোৎসব (১ম, ২য় খণ্ড), মা, কর্তা ও মন (১ম, ২য়) রাসলীলা (১ম, ২য়), গীতাঞ্জলি (১ম, ২য়), শৈব গীতাবলী, ভাগবতী তত্ত্ব, স্বভাব ও অভাব, পীঠমালা, স্তোত্রমালা, এবং দশমহাবিদ্যা স্তোত্র।

কৌল তত্ত্ব ও সাধনার ধারক বাহক 'শৈবী' নামক একটি পত্রিকাও কয়েক বৎসর তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

বাংলার মানস ও সমাজ বিবর্তনে তন্ত্রের সাধন ও দার্শনিকতার প্রভাব অস্বীকার করার

জগজ্জননীর অখণ্ড অদ্বৈতসত্তার উদ্ভাসন দেখা দিয়েছে সাধক শিবচন্দ্রের জীবনে। স্নেহময়ী ইষ্টদেবী আর পরাৎপরা মহাশক্তি এবার তাঁহার উপলব্ধিতে এক এবং অখণ্ড হইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি বলিতেছেন

—মূলে তিনি ব্রহ্মময়ী, বৃক্ষে তিনি মায়াময়ী, পুষ্পে তিনি জগন্ময়ী আবার ফলে তিনি মুক্তিময়ী, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, অবিদ্যা এই চারি তাঁহারই স্বরূপ। একা তিনিই এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া চরাচর জগতে আনন্দলীলায় অভিনেত্রী, আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া তিনি উন্মাদিনী, আপনি জন্মিয়া, আপনি মরিয়া, আপন শ্মশানে আপনি নাচিয়া, আপন সবে শিব হইয়া আপনি তিনি বিলাসিনী। আপনি পুরুষ আপনি প্রকৃতি, আপনি মহাকাল যুবতী, আপনি রতি, মতি, গতি পরমানন্দ নন্দিনী। আপনি মায়া, আবার আপনি অমায়া, আপনি মায়ারূপিণী, আপনি বিদ্যা, আপনি অবিদ্যা, আপনি আদ্যাসনাতনী, বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র যাহাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি তাঁহার এই অদ্বৈত বিভূতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

—সাধক সেই শাস্ত্রীয় আস্তিক্য দৃষ্টিতেই তাঁহার বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়রূপে ব্রহ্মাণ্ড-লীলা দেখিয়া, কি বন্ধনে কি মোচনে, উভয় দশাতেই মায়ের কোলে বসিয়া থাকেন, তিনি সেই সোহাগে গলিয়া গিয়া সেই অভিমানে কঠিন হইয়া, আদরে মায়ের কোলে বসিয়া, বন্ধনে বদ্ধ দুটি হাত মায়ের হাতে ধরিয়া দিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিতে থাকেন "মা! তুই বড় পাগলী মেয়ে!"

তন্ত্র অর্বাচীন নয়, সুপ্রাচীন—সনাতন তন্ত্র বেদবর্জিত নয়, বেদেরই অংশ। বৈদিক ঋষিদের অনেকেই তন্ত্রের মন্ত্রশক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। তাই বেদ ও তন্ত্রকে পৃথক করিয়া দেখা অতিশয় ভ্রমাত্মক—একথাটি শিবচন্দ্র বার বার তাঁহার লেখায় ও ভাষণে জোর দিয়া বলিয়াছেন

—ভগবান ভূতভাবন নিজেই বলিয়াছেন. "মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগম মহোদধি"— আমি জ্ঞানদণ্ডদ্বারা বেদশাস্ত্ররূপে মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া তন্ত্ররূপ অমৃতের উদ্ধার করিয়াছি।"

—বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত যদি তন্ত্রের পূর্বে না থাকিবে তবে বেদশাস্ত্রসমুদ্রের মন্থন সম্ভবে কিরূপে? এতাবৎ যিনি তন্ত্রের প্রচারকর্তা, তিনিই তো নিজ মুখে বলিয়াছেন ' বেদের পর তন্ত্রের প্রচার। তবে আর তন্ত্র আধুনিক বলিয়া নূতন কথাটা কি শুনাইলে ভাই? কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না ৪০ হইতে ৭০ বৎসর যাহাদের পরমায়ুর পূর্ণ সংখ্যা তাহাদের পক্ষেও আধুনিক। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি সংহার যাঁহার এক কটাক্ষের ফল তন্ত্রের এই আধুনিকতা তাঁহার চক্ষেই শোভা পায়। দ্বিনেত্রের উপর যাঁহার ত্রিনেত্র উদ্ভাসিত, তন্ত্রের স্বরূপ তাঁহার দৃষ্টিতেই প্রতিবিম্বিত. ভগবানের আজ্ঞা, শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়েই আমার নিত্যদেহ। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাশাস্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাস করিতে হইলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে আর শব্দব্রহ্মরূপে শাস্ত্রকে তাঁহারই নিত্যমূর্তি বলিয়া অবনতমস্তকে মানিয়া লইতে হইবে। তাহাতে কি বেদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কি জ্যোতিষ—ইহাদের সকলকেই ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। শাস্ত্রসকল যে এক কেন্দ্রবন্ধনে আবদ্ধ তাহার একটি বন্ধন ছিন্ন করিলেই সমস্তই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। কাহারও সাধ্য নাই ইহার কোনো একটির বিপর্যয় ঘটাইতে পারে।

—বেদ-মূলকতা না থাকিলে যেমন কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই, কোনো শাস্ত্রের

প্রামাণ্য না থাকিলেও তদ্রূপ বেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই। বিশেষত তন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র ; মন্ত্রই বেদের জীবনীশক্তি বা পরমাত্মা। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রের অভাব হইলে, বেদ তো তখন চেতনাহীন। বেদেও লোকের যেমন অধিকার, তন্ত্রেও তেমনিই। আসলে বৈদিক হইয়া যেমন বেদ বুঝিতে হয়, তান্ত্রিক হইয়া তেমনি তন্ত্র বুঝিতে হয়। সেইরূপ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া যেমন প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হয়, সাধনা করিয়া তেমনি সিদ্ধ হইতে হয়। মন্ত্রশাস্ত্র যদি বেদের আত্মা হয়, তবে আর বেদের পর তন্ত্রের সৃষ্টি—ইহা সঙ্গত কিরূপে? ·

—স্বয়ং মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্যন্ত সকলেই বেদের অনুসরণ-কর্তা ভিন্ন কর্তা কেহ নহেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবদবতার এবং অন্যান্য দেবগণ যুগযুগান্তে সময়ে সময়ে বেদের প্রকাশক হইয়াছেন এইমাত্র। শাস্ত্র প্রচারের সময় সকল ঋতু মাস বৎসরাদির ন্যায় স্ব স্ব চক্রবর্তেই ঘুরিয়া আসিতেছে, তাই বেদেও তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

—বেদে তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখ শুনিয়া হয়তো অনেকেই চমকিত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা তন্ত্রকে একমাত্র মন্ত্রশক্তিরই লীলা খেলা—সাধনাসিদ্ধির আকর—ভিন্ন আর কিছু বুঝি না। সেই মন্ত্রশক্তিই বেদের সঞ্জীবনী। অন্যান্য শাস্ত্র বেদের অঙ্গ হইলেও মন্ত্রশক্তি বেদের পরমাত্মা। জগৎপিতা ও জগজ্জননীর প্রশ্নোত্তরে তাহাই আগম ও নিগম মূর্তিতে পুনঃ প্রকটিত হইয়াছে মাত্র। বেদ ও তন্ত্র উভয়ের যথাশাস্ত্র অধিকারী যিনি, তিনি একথা কখনও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদ ভিত্তিক, বেদেরই 'অন্তর্ভুক্ত', এবিষয়ে শিবচন্দ্র নিঃসংশয় ছিলেন। তাই লিখিয়াছেন[১]

—হিন্দুজাতির একমাত্র আশ্রয় বেদবৃক্ষ—তান্ত্রিক পঞ্চোপাসনা উহারই পঞ্চশাখা। এই বিশাল শাস্ত্রবৃক্ষ সহস্র মন্বন্তর কল্পকল্পান্তরের প্রাচীন। জীবাত্মা পরমাত্মায় যে ভেদ, বেদ ও তন্ত্রে সেই ভেদ অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বে যেমন মনের (ন্যায় মতে জীবাত্মার) অস্তিত্ব, তন্ত্রের অস্তিত্বেও সেইরূপ বেদের অস্তিত্ব। জীবদেহে পরমাত্মা যেমন বিশুদ্ধ চিৎশক্তি, শাস্ত্রদেহেও তন্ত্র তদ্রূপ মন্ত্রময়ী চিৎশক্তি। জীবাত্মার যেমন সগুণ মনঃশক্তির প্রক্রিয়াসকল নিত্য প্রবাহিত, বেদও তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ অধিকারানুরূপ জ্ঞানময় শক্তিসকল নিত্য অধিষ্ঠিত। মারণ, উচাটন ইত্যাদি ব্যাপারের অধিকাংশ তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অথর্ববেদে কথিত হইয়াছে। আবার বেদোক্ত অনেক মন্ত্রই তান্ত্রিক উপাসনায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর বেদের যে শত সহস্র শাখা লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে কত শত তান্ত্রিক উপাসনাতত্ত্ব বিলীন হইয়াছে, কাহারো সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করিবে? অন্য উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, বেদের সর্বস্ব সার সম্পত্তি প্রণবও যে তন্ত্রমন্ত্রাতিরিক্ত নহে সাধকবর্গ মন্ত্রতত্ত্বে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

তন্ত্র সাধনায় মন্ত্রের চৈতন্যময় ক্রিয়াশক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী—একথাটি শিবচন্দ্র তাঁহার শিষ্যদের কাছে বার বার বলিতেন। আরও বলিতেন: "সাধকের আত্মশক্তি বায়ু স্থানীয় এবং মন্ত্রশক্তি অগ্নিস্থানীয় এজন্য তাঁহার আত্মশক্তি নিমেষ মধ্যে তাহাকে বিপুল করিয়া তুলিতে পারে। শাস্ত্র যত কেন দুর পারাবার না হয়, একমাত্র ভেলা যেমন অগ্রসর হইয়া তোমাকে তাহার পরান্তরে লইয়া যাইবে, তপ জ্ঞান, যোগ, সমাধিতত্ত্ব

[১] তন্ত্রতত্ত্ব ১ম ভাগ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

যত কেন দুরান্তর না হয় মন্ত্রময়ী মহাদেবী মূর্তিমতী হইয়া তোমার হাত ধরিয়া তাহার অপর পারে লইয়া যাইবেন। জ্ঞান, যোগ, সমাধি যাহারই কেন অনুষ্ঠান না করো, দেখিবে তাহার সকলের মধ্যেই সর্বেশ্বরী আনন্দময়ী মুক্তকেশী মা আমার আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছেন। তাঁহার অশ্রান্ত নৃত্যভরে আমার জ্ঞানের সমুদ্রে প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে।”

তন্ত্র গৃহ আর শ্মশান, যোগ ও ভোগ এই দুটিকেই যুক্তভাবে একীভূত সত্তায় দেখিতে শিখায়। জগৎ সৃষ্টির প্রতিটি ধূলিকণায় ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর বিভূতি ও স্বরূপ দর্শন করিয়া তন্ত্রাচারী বীর সাধক আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। তারপর দ্বৈত হইতে তাঁহার উত্তরণ ঘটে অদ্বৈতে, লীলা হইতে পৌঁছে গিয়া অদ্বৈতে। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শিবচন্দ্র বলিয়াছেন, “অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইত না তদ্রূপ এই নাম রূপাত্মক দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলে অদ্বৈত তত্ত্বও অবগত হওয়া যাইত না, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করিবার কর্তাও কেহ থাকিত না, প্রয়োজনও হইত না। মৃত্তিকা বুঝিতে হইলেই, যে দেশে ঘট কুম্ভ কুম্ভকার কিছুই নাই সেই দেশে গিয়া বুঝিতে হইবে, এরূপ নহে। বুদ্ধি থাকিলে ঘট সম্মুখে রাখিয়াই বুঝিতে হইবে যে, ইহা স্বরূপত মৃত্তিকা বই আর কিছুই নহে ; এইরূপ মৃত্তিকা তত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন তিনি ঘট দেখিয়া বিস্মিত হন না, অধিকন্তু ব্রহ্মময়ীর অনন্ত শক্তি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নামরূপ সকল ভুলিয়া প্রতিরূপে সেইরূপ দেখতে থাকেন—যেরূপে এই বিশ্বরূপ ডুবিয়া গিয়া ব্রহ্মরূপের আবির্ভাব হয়, তুমি আমি ঘট দেখিলেও জ্ঞানী যেমন তাহাকে মৃত্তিকা বই আর কিছুই দেখেন না, তদ্রূপ তুমি আমি স্ত্রীপুত্র পরিবারময় সংসার দেখিলেও তান্ত্রিক সাধক তাহাতে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ বই আর কিছুই দেখেন না।”

কালপ্রবাহের ফলে, যুগ পরিবর্তনের প্রভাবে, তন্ত্রসাধনা এবং তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে অনেক কিছু অবাঞ্ছনীয় বস্তু ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে তন্ত্র ও কৌলসাধকদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে সন্দেহ, ঘৃণা ও অপপ্রচার। ইহার প্রতিবিধান কিরূপে হইবে ? তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রকে ত্যাগ করিলে তো প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না। বরং ইহাদের পরিশুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে, সাধনালব্ধ সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া নিতে হইবে। এক কথায় তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাঁহার স্বমহিমায়, স্থাপন করিতে হইবে প্রকৃত সাধনার্থীদের পূজাবেদীর উপর।

আচার্য শিবচন্দ্র তাই বলিয়াছেন, “পথে প্রান্তরে শ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের শান্তিনিকেতন এই যে কোটি কোটি অশ্বত্থ বটবৃক্ষ দিগ্‌দিগন্তে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া কি লৌকিক পথিক পরামার্থ পথিক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাধু সন্ন্যাসী সাধক সিদ্ধমহাপুরুষগণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছে, কত যোগী যোগীন্দ্র, ঋষি মহর্ষি মুনিগণের সাধনা সিদ্ধ এই সকল স্থাবর গুরুতরুগণের চরণ প্রান্তে নিত্য নিবেদিতা হইতেছে ; সেই বিশাল বৃক্ষের প্রান্তরে অন্ধকারে সর্বস্ব অপহরণের জন্য চোর দস্যুদল, কোঠরে বা শাখাপ্রশাখার শরীর ঢাকিয়া কখনও কি লুক্কায়িত থাকে না ? এখনও সেই অপরাধেই কি যেখানে দেখিব অশ্বত্থ বটবৃক্ষ, সেইখানেই তাহাকে সমূলে ছেদন করিতে হইবে ? কোন রমণী কখনও যদি ব্যভিচারিণী হয়, এই অপরাধে বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নহে, বর্তমান সমাজেও অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারীদিগের দোষে সর্বমঙ্গলরূপ শাস্ত্রভাণ্ডার তন্ত্রশাস্ত্রকে ত্যাগ করাও তাহাই।”

কালের প্রভাবে পুণ্যময় ভারতে ধর্ম এবং তান্ত্রিক সাধনার অবনতি ও অবক্ষয় শুরু হইয়াছে, আর শক্তিবিভূতিধর সিদ্ধ তান্ত্রিক মহাপুরুষেরা দিন দিন দুর্লভ হইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং প্রকৃত দৃষ্টি দিয়া দেখিতে জানিলে এই সিদ্ধ মহাত্মাদের দর্শন এখনও মিলে। এখনও প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব হইতে, অন্তরাল হইতে, মাঝে মাঝে তাঁহারা প্রকট হন। এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ও দর্শনের ভিত্তিতে শিবচন্দ্র মুমুক্ষুদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন

"এখনও তান্ত্রিক সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষগণ নিজ নিজ তপঃপ্রভাবে ভারতের দিগ্-দিগন্ত প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন, এখনও ভারতের শ্মশানে প্রতি অমাবস্যার ঘোর মহানিশার প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব ভৈরবীগণের জ্বলন্ত দিব্যজ্যোতি নৈশতমসা বিদীর্ণ করিয়া গগনাঙ্গন আলোকিত করে, এখনও শ্মশানের জলমগ্ন মৃত ও পচিত শবদেহ সাধকের মন্ত্রশক্তি প্রভাবে পুনর্জাগ্রত হইয়া সিদ্ধ সাধনায় সাহায্য করে, এখনও তান্ত্রিক যোগিগণ দৈব্য দৃষ্টি প্রভাবে এই মর্ত্যলোকে বাস করিয়া দেবলোকের অতীন্দ্রিয় কার্য সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এখনও ভবভয়ভীত প্রণত শরণাগত ভক্ত সাধককে মুক্ত করিবার জন্য ভক্তভয়ভঞ্জিনী মুক্তকেশী মহাশ্মশানে দর্শন দিয়া থাকেন। এখনও ব্রহ্মময়ীর সেই ব্রহ্মাদি বন্দিত পদাম্বুজে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থাপন করিয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপে মিশিয়া যান, এখনও মন্ত্রশক্তির অদ্ভুত আকর্ষণে পর্বতনন্দিনীর সিংহাসন টলিয়া থাকে। মুক্তিপুরীর শ্রান্ত যাত্রী সাধকের পক্ষে ইহাই চিরপ্রশস্ত রাজপথ, শয্যাশায়ী মুমূর্ষু অন্ধের পক্ষে ইহা অন্ধকার বই আর কিছুই নহে, কিন্তু অন্ধ, নিশ্চয় জানিও—এ অন্ধকার তোমারই নয়নপথে"

প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ও ক্রিয়াবান্ তন্ত্রসাধকের জন্য শিবচন্দ্র যন্ত্র, অভিষেক, আবিচার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেন, আর সাধারণ মাতৃ-সাধক ভক্তদের বেলায় জোর দিতেন মাতৃনাম জপের উপর। তিনি বলিতেন "মাতৃনামে তারকব্রহ্ম নাম, এ নাম জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে উদ্ধার করে। তেমনি তন্ত্রসাধনা নির্বিচারে কোল দেয় সবাইকে। "পারের ঘাটের নৌকায় উঠিতে যেমন জাতি বিচার নাই, গঙ্গার জলে স্নান করিতে যেমন পুণ্যাত্মা পাপাত্মার বিচার নাই, কাশীধামে মৃত্যু হইলে নির্বাণ মুক্তির অধিকারে যেমন স্থাবর জঙ্গম কীটপতঙ্গ কাহারও কোনো তারতম্য নাই, তদ্রূপ এই ভবসাগরের পারের নৌকায় জ্ঞান-গঙ্গার পবিত্র জলে ব্রহ্মাণ্ডময় বারাণসী তান্ত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত হইতে কাহারও কোনো বাধা নাই। অধিক কি, কাহাকেও আত্মসাৎ করিতে অগ্নির যেমন আপত্তি নাই, তাই তান্ত্রিক দীক্ষা ত্রৈলোক্য নিস্তারের অদ্বিতীয় এবং অমোঘ উপায়।"

শিবচন্দ্রের সাধনা, সিদ্ধি ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি তাহার জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল সত্যকার পরমবোধ ও সমদর্শিতা। মহাকালীর আরাধনা ও শ্মশান-সাধকের ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন যে শিবচন্দ্র, তিনিই কৃষ্ণ উপাসনা ও গোপীপ্রেমের কথা বলিতে বলিতে পুলকাঞ্চিত হইতেন, বক্ষ প্লাবিত হইত অশ্রুজলে।

তিনি বলিতেন, 'আজও ভারতবর্ষের যে শুভদিনের সুপ্রভাত হয় নাই, যাহাতে আমরা স্বাধীনভাবে গোপীপ্রেমের বিনিময় ভগবানের তত্ত্বনির্ণয় নির্বিঘ্নে নিঃসংকোচ সাধারণের সমক্ষে খুলিয়া দিতে পারি।"

জননী সর্বমঙ্গলার সিদ্ধ সাধক, মহাকালীর পরমতত্ত্বের সংবাহক, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব অবলীলায় গোপীপ্রেম সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাহিয়াছেন তাহা যে কোনো মহা-বৈষ্ণবের লেখনীতেও দুর্লভ। তিনি লিখিয়াছেন

—গোপীগণ নিজ নিজ হৃদয়কুম্ভ লইয়া প্রেমের জল আনিতে শ্যাম সরোবরের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন, সে অগাধ প্রেমের জলে কামের কুম্ভ ডুবাইয়াছেন, দেখিতেছেন —তাহাতে একা গোপী কেন? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সুরাসুর নরনারী ঐ ত্রিতাপহরণ বারিদবরণ বারি সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কেহ ডুবিয়াছেন, কেহ ডুবিতেছেন, কেহ ডুবাইতেছেন আবার কেহ ডুবিবেন, কেহ ডুবাইবেন যিনি একবার আসিয়াছেন তিনি আর ফিরিয়া যাইবেন না, যদিও কেহ ফেরিয়া যান, যেমন আসিয়া-ছিলেন তেমনি আর ফিরিয়া যাইবেন না।

—শ্যাম সাগরের অগাধ জলে কামের কান্তি এবার ধুইয়া গিয়া প্রেমিকের প্রেমময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শ্যামকান্তি ছড়াইয়া পড়িবে। তখন কি সাগরে কি নগরে, কি গহনে, কি পবনে, কি ভুবনে, শ্যামময় নয়ন হইয়াছে অথবা নয়নের শ্যাম হইয়াছেন, বাঁশী বাজাইয়া মন হরণ করিয়া মনের অধীশ্বর আপনি আসিয়া মনের স্থান পূরণ করিয়াছেন, মনের সঙ্গে প্রাণকেও আকর্ষণ করিয়াছেন, এখন অবশিষ্ট বহির্মুখ দেহ বৃত্তি অন্তর্মুখ হইতে পারে না, হইলেও অন্তস্তাড়িত বহিঃনির্বাসিত কামকে বহিঃপ্রেম তরঙ্গের মধ্যে প্রতিঘাতে লাঞ্ছিত মূর্ছিত করা যায় না, তাই সে বহির্মুখ দেহবৃত্তি বাহিরে আকর্ষণ করিয়া যোগীন্দ্রগণের অন্তরের নিধি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননে প্রেমমন্থর নটবর ত্রিভঙ্গ মধুর শ্যাম-সুন্দর আসিয়া, দাঁড়াইয়াছেন, তাই গৃহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া কুলবিহঙ্গী গোপীকুলকে কুলনাথ আজ প্রেমসাগরের অকূল কূলে আকর্ষণ করিয়াছেন। কাহার সাধ্য তাহার জলে আত্ম অস্তিত্ব আর রাখিতে পারে?

প্রকৃত শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যেকার কোনো পার্থক্যকে শিবচন্দ্র কোনোদিন আমল দিতেন না। স্বরচিত পদাবলীতে যে তত্ত্ব তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সিদ্ধ জীবনের সমদর্শিতা ও অভেদদর্শনের পরিচয় আমরা পাই। তিনি লিখিয়াছেন:

শ্যাম ভজ আর শ্যামা ভজ,
আপনাকে দাও তাঁরই কাছে।
ওরে দাস হয়ে যাও প্রভুর পাছে,
ছেলে হয়ে রও মায়ের কাছে।
যারে শ্যামের বাঁশী বাজল প্রাণে,
তার কি আবার দু'কুল আছে?
নাচছে, শ্যামের অসি অট্টহাসি—
ভাঙ্গল কুল সে কুলের মাঝে।
কুলের মাঝে কুলের মা যে,
কুলকুণ্ডলিনী সাজে।
সে কূলের কাণ্ডারীর হাতে।
ঐ যে কুলের বাঁশী বাজে॥

কৈলাসধাম আর বৈকুণ্ঠধাম সিদ্ধপুরুষের ধ্যাননেত্রে এক হইয়া গিয়াছে, জগজ্জননী

উমা হইয়া উঠিয়াছেন রাসেশ্বরী—কৃষ্ণশক্তির সহিত একাত্মিকা এবং একীভূত। তাঁহার স্বরচিত নাটকে এই তত্ত্বের ব্যঞ্জনা পাই :

> তপনে যাঁর প্রভাশক্তি গগনে যাঁহার মহিমা।
> চন্দ্রমার চন্দ্রিমা মা মোর, জগতে যা অণিমা।
> পবনে মা বেগশক্তি দহনে সে যে দাহিকা মা।
> জলে যাঁহার শীতলতা, মধুরে মা মধুরিমা।
> ধরিত্রীর ধারণা শক্তি, জগদ্ধাত্রী আমারই মা।
> বিধাতার বিধাতৃশক্তি, বিষ্ণুর স্থিতি শক্তি মা।
> মহারুদ্রের মহারৌদ্রী মহাশক্তি সেই আমার মা।
> ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী মা, বৈকুণ্ঠবাসিনী রমা।
> কৈলাসধামে, বাবার বামে আমার মা-ই সেই গৌরী উমা।
> আবার সেই—গোলোকধামে, শ্যামের বামে
> রাসেশ্বরী আমার ই মা।[১]

দীক্ষায়, শিক্ষায় এবং বংশগত ঐতিহ্য ও সংস্কারে শিবচন্দ্র ছিলেন নির্ভেজাল তান্ত্রিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বৈষ্ণব সাধনার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

গ্রামে মদনমোহনের একটি মন্দির ছিল, প্রতি বৎসর ঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব সেখানে অনুষ্ঠিত হইত। মন্দির হইতে রথ মেলার দূরত্ব প্রায় এক মাইল। একটি বৃহৎ চৌদোলায় শ্রীবিগ্রহকে চড়ানো হইত, গ্রামবাসী ভক্তেরা সেটিকে কাঁধে তুলিয়া পরিক্রমণ করিতেন সমস্তটা পথ।

সেবার শিষ্যগণসহ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রও কাঁধে নিয়াছেন ঠাকুরের ঐ চৌদোলা। একে সেটি অত্যন্ত ভারী, তদুপরি এ কাজে তাঁহার মোটেই অভ্যাস নাই। কিছুটা পথ অগ্রসর হওয়ার পর গুরুভার চৌদোলার চাপে তাঁহার শরীর বাঁকিয়া গেল, ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিলেন।

এ সময়ে পাশ হইতে এক ব্যক্তি রসিকতা করিয়া সরবে বলিলেন, "আরে এ কি আর মায়ের দুলালের কাজ ?"

ক্লান্ত দেহে পথ চলিতে চলিতে শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দিলেন এ কথার এক সরস উত্তর, "আমি তো না হয় এক জায়গায় বেঁকে গেছি। কিন্তু বৃন্দাবনের দুলাল আর যশোদার দুলাল, যাঁকে আমরা কাঁধে করেছি তার কি অবস্থা বলতো ? তিনি তো নিজেই হয়েছেন ত্রিভঙ্গ মূর্তি—তিন জায়গায় বেঁকে গিয়েছেন। আমি কিন্তু ভাই, বহু চেষ্টা ক'রেও এখনও অবধি অতটা বেঁকে যেতে পারি নি।' এ কথায় মদনমোহনের মিছিলের মধ্যে একটা হাসির উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল।

প্রথম পরিচয়ের পর হইতে শিবচন্দ্রের আকর্ষণে লালন ফকির মাঝে মাঝে কুমারখালিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। দুই সাধকের মিলনে বহিয়া যাইত দিব্য আনন্দের তরঙ্গ।

লালন জাতিতে মুসলমান, ফকীর বাউলদের তিনি মধ্যমণি। কিন্তু জাতের বিচার তাঁহার কাছে কিছু নাই। একবার তাঁহাকে নিয়া গ্রামে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।

---

১ গঙ্গেশ (নাটক) : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

বহুদূরের পথ হইতে লালন ফকীর সেদিন আসিতেছিলেন। গ্রামে প্রবেশ করার পথেই পড়িল স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের টোল। সেখানে একটু বিশ্রাম করিবেন ভাবিয়া লালন বহির্বাটীর ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িলেন, এক কোণে বসিয়া পণ্ডিতমশাই একমনে ধূমপান করিতেছিলেন, লালন ফকীরের দিকে চোখ পড়িতে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে হুঁকাটি উপুড় করিয়া সবটা জল ফেলিয়া দিলেন।

নিমেষের মধ্যে লালন ব্যাপারটি বুঝিয়া নিলেন, পণ্ডিতমশাই জাত যাওয়ার ভয়ে ভীত, তাই তাড়াতাড়ি হুঁকার জল তাঁহাকে ফেলিয়া দিতে হইল। মনে মনে তিনি আহত হইলেন বটে, কিন্তু মুখে কিছুই বলিলেন না, ধীর পদে রওনা হইয়া গেলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের চণ্ডীমণ্ডপের দিকে।

লালনকে পাইয়া শিবচন্দ্র আনন্দে উচ্ছল, দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে কোল দিলেন। তারপর বিশ্রাম এবং জলযোগের পর শুরু হইল লালনের স্বরচিত বাউল সংগীত। ইতিমধ্যে ফকীরের আগমনবার্তা চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে, মণ্ডপের সম্মুখে জড়ো হইয়াছে বহু কৌতূহলী দর্শক।

করজোড়ে দাদাঠাকুরকে নমস্কার জানাইয়া লালন এবার গান ধরিলেন :

সবে বলে লালন ফকীর হিন্দু কি যবন ?
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান ॥
এক ঘাটেতে আসা যাওয়া।
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া।
তবুও কেউ খায় না কারও ছোঁয়া,
—ভিন্ন জল কোথাতে পান ?
বিবিদের নাই মুসলমানী।
পৈতা যার নাই সেও বামনী ॥
দেখবে ভাই দিব্যজ্ঞানী
দুই রূপ কিনলেন কিরূপ প্রমাণ।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব হাসিয়া বলেন, "ফকীর, তুমি সিদ্ধপুরুষ তোমার আবার জাত কি ? ঈশ্বর আর তার সৃষ্টি, সব তোমার চোখে যে একাকার হয়ে গিয়েছে।"

'দাদাঠাকুর, মানুষের মনের মণিকোঠার যিনি বসে আছেন তিনি যে সকলের, আর সকলেই যে তাঁর। এই সাদা কথাটা কেউ বুঝে না বলেই তো যত গোল।"

একতারার ঝঙ্কার তুলিয়া, ভক্তিরসে রসায়িত হইয়া, লালন আবার গাহিতে থাকেন

ভক্ত কবীর জাতে জোলা,
প্রেম ভক্তিতে মাতোয়ালা।
ধরেছে সে ব্রজের কালা,
দিয়ে সর্বস্ব তার।
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো।
এক বীজে সব জন্ম হলো।
ফকীর লালন ক'য়, মিছে কলহ
কেন করিস্ সদাই ?

গোঁড়া রক্ষণশীল দলের কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লোকের কানাঘুষায় ইতিমধ্যে তাঁহারা শুনিয়াছেন, স্মৃতিরত্নের বহির্বাটীর ঘটনার কথা। তাঁহারা বলেন, "মুসলমান লালনের স্পর্শদোষ এড়ানোর জন্য হুঁকোর জল ফেলে দেওয়া হয়েছে, তাতে দোষ কি হয়েছে? বর্ণাশ্রম আর আচার বিচার সব লোপ পেলে হিন্দু-ধর্মের রইল কি?"

এবার শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বলেন, "আচ্ছা, মা-সর্বমঙ্গলার দুয়ারের সামনে মুসলমান লালন ফকীরকে দিয়ে বর্ণাশ্রম বিরোধী এই যে সব গান আপনি গাওয়াচ্ছেন, এটা কি ভালো হচ্ছে?"

শিবচন্দ্র উত্তরে কিছু বলিবার আগেই লালন ভাবাবেশে নাচিয়া নাচিয়া আবার গান ধরেন।

ধর্ম-প্রভু জগন্নাথ
চায়না রে সে জাত অজাত।
ভক্তের অধীন সে রে।
যত জাত-বিচারী দুরাচারী,
যায় তারা সব দূর হয়ে।
লালন ক'য়, জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে রে।

আগুন দিয়া পোড়ানো হইবে 'জাত'-কে? এসব কি কথা? বর্ণাশ্রম ধর্মের চাঁইদের কয়েকজন উত্তেজিত হইয়া উঠেন, নিন্দা সমালোচনা শুরু করেন।

শিবচন্দ্র সতেজে উঠিয়া দাঁড়ান। সবাইকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে থাকেন, "দ্যাখো, জাতিভেদ মানা বা না মানা যার যার নিজের ব্যক্তিগত কথা। এ নিয়ে নিন্দা সমালোচনা বা ঝগড়া বিবাদ থাকবে কেন? বহিরঙ্গ জীবনে যত ভেদ বিভেদই আমরা দেখি না কেন, মূলত সর্ববস্তু ও সর্বজীব এক। একই ব্রহ্মময়ী মা সবার ভেতরে রয়েছেন অনুস্যূত। হিন্দুর বেদ, তন্ত্র ও দর্শনে রয়েছে সেই পরম এক এবং অদ্বিতীয়ের কথা। মুসলমান ধর্মও বলেছে—লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্। আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোনো ঈশ্বর নেই—তিনিই হচ্ছেন অদ্বিতীয় সত্তা। তবে, এ নিয়ে বৃথা এতো বাদ বিসম্বাদ কেন, বলতো?"

অতঃপর বেদ ও আগম নিগম হইতে বহুতর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সবাইকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, হিন্দুর ব্রহ্মবাদ ও পরাশক্তিবাদের আসল কথা—অভেদ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের উদারতা ও সর্বজনীনতা উপলব্ধি না করিলে হিন্দুধর্ম রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। নিন্দুক ও সমালোচকেরা এবার নীরব হইয়া গেল।

লালন ফকীর সিদ্ধ বাউল সদানন্দময় পুরুষ, বহিরঙ্গ জীবনের অনেক কিছু ঝড় ঝাপটার বহু ঊর্ধ্বে তিনি বিচরণ করেন। লালন কহিলেন, "দাদাঠাকুর, পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলে নিচের সব কিছু সমান দেখা যায়, তোমার তাই হয়েছে। তুমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসে আছো, আর আপন ভাবে আপনি রয়েছো মশগুল। তাইতো, মাঝে মাঝে তোমায় নামিয়ে আনি আমাদের এই মাটিতে, এতো বিতর্ক এতো হৈ-হুল্লোড় ক'রে তোমায় হুঁশে আনি, তোমার ভেতরকার প্রেমরস টেনে বার করি।"

প্রেমাবিষ্ট সিদ্ধপুরুষ শিবচন্দ্র ফকীরকে আবদ্ধ করেন প্রেম-আলিঙ্গনে, টানিয়া নেন বুকের মধ্যে।

"আবার আসবো দাদাঠাকুর, আবার প্রাণভরে তোমার কথা শুনবো,"—একথা বলিয়া লালন সেদিনকার মতো বিদায়গ্রহণ করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্গভঙ্গের আগুন তখন দাবানলের মতো বাংলার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রখ্যাত নেতা ও বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একসময়ে কুষ্টিয়ায় আসিয়াছেন স্বদেশী মেলায় ভাষণ দিবার জন্য। তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দনে বিভূষিত তেজোদৃপ্ত শিবচন্দ্র।

সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন ইংরেজীতে, যুক্তি-তর্ক, ভাবময়তা ও রাষ্ট্রচেতনায় তাহা ভরপুর। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের খুব কম লোকেরই তাহা বোধগম্য হইল। এবার শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব উঠিলেন তাঁহার বক্তব্য বলার জন্য। প্রায় দশ সহস্র নরনারী শহরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে জগন্মাতা আর দেশমাতার ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে, সাধু বাংলা ভাষায়, প্রাণ-উন্মাদনাকারী ভাষণ দিতে তিনি শুরু করেন, শ্রোতারা ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হইয়া উঠে।

সিংহ-পুরুষ শিবচন্দ্র ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন, "দেশমাতা আর জগন্মাতায় কোনো ভেদ নেই। অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী হয়ে রয়েছেন মা ব্রহ্মময়ী। এই ধরিত্রী ও তার অংশ ভারতবর্ষ সেই ব্রহ্মময়ীরই অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। জগজ্জননী মহামায়া যেমন বিশ্বাতীতা, তেমনি আবার বিশ্বগতাও বটেন। তাই ধ্যানদৃষ্টিতে দেখা যায়, দেশমাতার ভেতরেই রয়েছেন চৈতন্যরূপা ব্রহ্মময়ী।"

স্বদেশের এই চৈতন্যময় সত্তার কথাটি বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়া আবার তিনি কহিলেন, "এই আমাদের 'মা'-টি, ইনি কিন্তু শুধু মাটি নন—ইনি, হলেন প্রকৃত 'মা-টি'। এই 'মা'-টিকে খাঁটি ক'রে ধরতে হবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এই 'মা-টিকে' এতদিন আমরা চিনতে পারি নি, একে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, তাই তো আমরা মাটি হতে বসেছি। শিবহীন দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর এমনি ক'রেই মায়ের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল।"

শিবচন্দ্রের এই ভাষণ শুনিয়া জনতার মধ্যে প্রবল উদ্দিপনার সৃষ্টি হয়, জয়ধ্বনি ও করতালিতে সভাপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। প্রধান বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সাধক শিবচন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকেন।

সেদিনকার ঐ স্মরণীয় বক্তৃতা সম্পর্কে পণ্ডিত রাধাবিনোদ বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন, "তাঁহার সেই ছন্দোময়ী ভাষার কি মাধুর্যময়ী তেজস্বিতা, আর তাঁহার সেই উদাত্ত কণ্ঠের কি কমনীয় নমনীয়তা। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া ললিত উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করিতেছিলেন, মনে হইতেছিল যেন পুণ্য সলিলা জাহ্নবী কলতরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। তদুপরি তাঁহার ত্রিপুণ্ড্রক লাঞ্ছিত গৌরবর্ণ ললাটস্থিত রক্ততিলকের আভা, আয়ত নেত্র সমুদ্ভাষিত তপ্তকাঞ্চন বিনিন্দিত মুখমণ্ডলের সেই প্রশান্ত জ্যোতি, আবক্ষ-লম্বিত কাঁচ পাথর সমন্বয়ে গ্রথিত রঙবেরঙের বিচিত্র রুদ্রাক্ষের মালা, সর্বোপরি আজানুলম্বিত সেই রক্তগৈরিক, সবগুলি মিলিয়া তাঁহাকে এক অনির্বচনীয় শ্রী প্রদান করিয়াছিল।

"তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন ভাবে বিভোর হইয়া। আর তাঁহার দুই আয়ত নেত্র বহিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার বক্ষোদেশ প্লাবিত করিতেছিল।

মহাকবি ভবভূতির "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" ইত্যাদি উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, সেদিন সেকথা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, শিবচন্দ্র সত্যই একজন লোকোত্তর চরিত পুরুষ।"

কাশী ও বৈদ্যনাথ শিবচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। কাশীতে নানা গুপ্ত পীঠপাঠে বিশেষ করিয়া মণিকর্ণিকার শ্মশানে কৌলপদ্ধতি অনুসারে বহু নিগূঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়া তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে, সর্বমঙ্গলা সভা স্থাপনের পর দীর্ঘদিন কাশীই ছিল তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র। সেখানে অবস্থান করিয়া উত্তর ভারতের তন্ত্রাচারী সাধকদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করিতেন এবং সর্বমঙ্গলাসভার মাধ্যমে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচারে তৎপর থাকিতেন।

তপস্যার জন্য কয়েকবার তিনি বৈদ্যনাথধামে অবস্থান করেন। এই সময়ে শুধু সেখানকার বাঙালী সমাজেই নয়, স্থানীয় পণ্ডিত এবং পাণ্ডাদের মধ্যেও, তাঁহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। ইঁহাদের অনেকে তাঁহাকে শিবকল্প মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও সমীহ করিতেন।

বৈদ্যনাথধামের শ্মশানটি ছিল শিবচন্দ্রের অতি প্রিয় সাধনস্থান। কৃষ্ণা চতুর্দশী বা অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে এই প্রাচীন শ্মশানে গিয়া তিনি উপস্থিত হইতেন, সারা রাত্রি ব্যাপিয়া অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহার সংকল্পিত ক্রিয়া এবং অভিচার। মাঝে মাঝে কৌলপন্থার শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া শবসাধনাও তিনি সেখানে সম্পন্ন করিতেন।

গঙ্গাপ্রসাদ ফলাহারী নামে এক শক্তিমান্ তান্ত্রিক সাধক সেই সময়ে বৈদ্যনাথধামে বাস করিতেন। শিবচন্দ্রের শক্তি বিভূতি ও তন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদজী তাঁহার খুব অনুরক্ত হইয়া পড়েন। শ্মশানের কয়েকটি নিগূঢ় অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন শিবচন্দ্রের সহকারীরূপে।

শিবচন্দ্র যখন যেখানেই বাস করুন না কেন, ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার অর্চনা ও ভোগের ব্যাপারে কখনো কোনো ত্রুটি হইতে পারিত না। তাঁহার এই তান্ত্রিকী পূজার উপচার ও বিধিবিধান ছিল নানা রকমের এবং এগুলি সম্পর্কে কখনো কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিবার উপায় ছিল না। পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তান্ত্রিক প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করা হইত। কুমারী পূজা এবং শিবাভোগ প্রদানও ছিল শিবচন্দ্রের নিত্যকার কর্ম। ভোগ প্রসাদ গ্রহণে শিবাদল যদি কখনো দেরি করিত, সজল নয়নে আয় আয়, বলিয়া শিবচন্দ্র তাহাদের ডাকিতে থাকিতেন এবং তারপরেই ঘটিত তাহাদের আবির্ভাব। নীরবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রসাদ গলাধঃকরণ করিয়া তাহারা সরিয়া পড়িত।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনে কৃপালীলার প্রকাশ বহুবার দেখা গিয়াছে। শুধু ভক্ত ও মুমুক্ষু মানুষেরই তাঁহার আশ্রয় নেয় নাই, ঈশ্বরবিমুখ এবং সংশয়বাদী দুরাত্মারাও তাঁহার চরণে ঠাঁই নিয়াছে, দীক্ষা ও শিক্ষার মধ্য দিয়া শুরু করিয়াছে উন্নততর জীবন।

কালীধন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এমনই এক ব্যক্তি। হাওড়ার ব্যাঁটরা গ্রামে তিনি বাস করিতেন। দেব দ্বিজে কোনোদিনই তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না, অতিমাত্রায় ছিলেন আত্মম্ভরী ও ঈশ্বরদ্বেষী। সাধু সন্তের দেখা পাইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে নিন্দা ও বক্রোক্তি শুরু করিতেন, কখনো কখনো অপমান করিতেও ছাড়িতেন না।

শিবচন্দ্র তখন কিছুদিনেব জন্য হাওড়াব শিবপুবে অবস্থান কবিতেছেন। এই খ্যাতনামা তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষকে দর্শনের জন্য প্রতিদিন সেখানে ভিড় জমিযা উঠিত।

কালীধন চট্টোপাধ্যাযকে মাঝে মাঝে ঐ দিক দিযা যাওয়া আসা কবিতে হইত। অদূবে দাঁড়াইয়া তিনি এই জনসংঘট্ট দেখিতেন এবং শিবচন্দ্র সম্পর্কে কবিতেন নানা শ্লেষাত্মক উক্তি। শিবচন্দ্রেব বিশিষ্ট শিষ্য যতীন্দ্র মুখোপাধ্যাযেব সহিত কালীধনেব বন্ধুত্ব ছিল। যতীনবাবু একদিন কহিলেন, "সাধুকে ভালো ক'বে ঘনিষ্ঠভাবে না দেখে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা কি ভালো হে? কালীধন, তুমি একদিন আমাব সঙ্গে ঠাকুবেব কাছে চল। তাঁব দিব্যমূর্তি একটিবার দর্শন কবলে, আর ওজস্বিনী বাণী শুনলে, তোমাব এত সব লম্ফঝম্ফ আব থাকবে না।"

কালীধনের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। বলেন, "নিজেব পাযে যাব জোর নেই, সে-ই লাঠি ভব দিযে হাঁটে। সাধুব ওপর নির্ভর কবে তাবাই, যাবা দুর্বল, আব নেই কোনো আত্মবিশ্বাস। তাছাড়া, ভাই ঠিক ক'বে বলতো, তোমাব এই তান্ত্রিক গুরুব শক্তি কতটা, আব কি তিনি আমায দিতে পারেন?"

"তিনি সেই শান্তি দিতে পাবেন, যা আজ অবধি কোথাও তুমি পাও নি। আব যদি তাব চেযে আবো বড় কিছু চাও, ঈশ্বব দর্শন চাও, তাঁর কৃপায তাও হতে পাবে। মা-সর্বমঙ্গলাব আদবেব দুলাল শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। মাযেব কাছে যা তিনি সুপাবিশ করবেন তাই যে তুমি পাবে ভাই।"

"যাই বল না কেন, মাথায জটা, পবনে গৈবিক, গলায রুদ্রাক্ষের মালা, ঐ সব সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই বাগে আমাব পিত্তি জ্বলে যায। থাক্ ভাই, ওসব আসবে যেতে আমায আব অনুবোধ ক'বো না।"

"কালীধন, একবার আমাব গুরুকে দর্শন ক'বেই এসো না। সারা জীবনটা তো পাষণ্ডেব মতোই কাটালে, পাপও ঢের তুমি কবেছো। একবার ভগবানেব বাজ্যেব এ দিকটাও একটু দ্যাখো না। তুমি শক্ত লোক, আত্মবিশ্বাসী লোক, এ সাধু তো তোমাব মতো লোককে দর্শনমাত্র গিলে খাবেন না।"

কি জানি কেন, কালীধনের সুমতি হইল, বন্ধুর সঙ্গে উপস্থিত হইলেন সিদ্ধ মহা-পুরুষ শিবচন্দ্রেব আবাসে।

কালীধনকে দেখামাত্র আচার্য শিবচন্দ্র তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন, স্নেহপূবিত কণ্ঠে কহিলেন, "ওবে আয়, আয। আমাব কাছে আয। মাযেব পাগল ছেলে যে তুই, এতদিন মাকে ভুলে কোথায ছিলি? তোব সঙ্গে একটিবাব দেখা না ক'বে যে এ জাযগা আমি ছাড়তেই পাবছিলুম না। আয আয।"

মুহূর্ত মধ্যে কালীধনেব নযনসমক্ষে উদ্ভাসিত হইযা উঠিল সিদ্ধপুরুষেব জ্যোতির্ময দিব্যমূর্তি। অন্তবাত্মা হইতে কে যেন ডাকিযা বলিল, "অকূলে পথহাবা হযে এযাবৎ কেবলি তুই ঘুরে বেড়িযেছিস্, পাপ-প্রবৃত্তিব তাড়নায দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছিস্ বাব বাব। এবাব মিলেছে তোব পবমাশ্রয। এই পবম দযাল মহাত্মার চবণে তুই শবণ নে, লাভ কর পবমা পবম শান্তি।'

অহংকাব বিচাববুদ্ধি বা বিতর্কের কোনো অবকাশ রহিল না। আবেশে কালীধনেব সারা দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, দুই চোখে ঝবিতেছে অশ্রুধারা, ছুটিযা গিযা পতিত হইলেন শিবচন্দ্রেব আসনের সম্মুখে কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যজ্ঞান বহিল না।

অতঃপর আচার্য শিবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কালীধন চট্টোপাধ্যায় শুরু করেন তন্ত্রানুসারী সাধন-ক্রিয়া। গুরুর কৃপায় উত্তরকালে পরিণত হন এক বিশিষ্ট সাধকরূপে।

তন্ত্র-অনুরাগী সাধকদের শিবচন্দ্র সাধারণত সংসারে থাকিয়াই সাধন করিতে বলিতেন। সে-বার এক সন্ন্যাসকামী দীক্ষিত শিষ্যকে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেবাদিদেব স্বয়ং বলেছেন, গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও ভক্ত সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঘর-সংসারে জড়িয়ে থেকে কেবলই ধন বৃদ্ধি ক'রে যেতে হবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সাধন ও গুরুকৃপার বলে ব্রহ্মলাভ ক'রে থাকে, আবার সংসার-আশ্রমী সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফুরণ হলে গোটা সংসারটাই হয়ে পড়ে ব্রহ্মময়।

"সংসার ছেড়ে অত দূরের পথ পর্যটন করা কলিযুগের জীবের পক্ষে সহজসাধ্য নয়, তাই তন্ত্রশাস্ত্র বলেছেন, সংসারে বাস ক'রেই বাড়িয়ে তোল ব্রহ্মদৃষ্টি। যে সব সাধক গৃহী হয়েও বৈরাগ্যবান্ এবং কায়মনোবাক্যে সন্ন্যাসী, তারাই তো সত্যকার শ্মশানবাসী। শব আর কঙ্কালে পূর্ণ পূতিগন্ধময় মহাশ্মশানে তাঁরাই তো চৈতন্যরূপী মহাশিব।

"জগজ্জননী মহামায়া অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর মায়ারূপী কেশপাশ এলিয়ে দিয়েছেন, সবাইকে ভোলাচ্ছেন তাঁর মায়ায়। আবার দ্যাখো, ঐ কেশপাশ ছুঁয়ে আছে তাঁর চরণ দু'টি। ঐ চরণে রয়েছে যে তাঁর কৃপা, যে কৃপায় হয় সিদ্ধি আর মুক্তি। সংসারে থেকে ক্রিয়াবান্ সার্থক তান্ত্রিক হও, মহামায়ার চরণ ধরে পড়ে থাকো, মায়ার কেশপাশে আর জড়িয়ে পড়তে হবে না।"

শিবচন্দ্রের করুণালীলার অপর একটি ঘটনা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল বর্ণনা করিয়াছেন।

একদিন কুমারখালিতে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে বসিয়া ভক্ত শিষ্যদের সহিত তিনি নানা তত্ত্বালাপ করিতেছেন। হঠাৎ সেখানে এক জরুরী তারবার্তা আসিয়া উপস্থিত। যশোরের নলডাঙ্গার জমিদার এটি প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র হঠাৎ এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং জীবনের কোনো আশা নাই, শিবচন্দ্র যেন কৃপা করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন।

এই পরিবারটির উপর শিবচন্দ্রের গভীর স্নেহ ছিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর তিনি সর্বমঙ্গলার একটি বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানের জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন।

তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ঘন অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। দানবারি গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ভক্তেরা আচার্যের নির্দেশ পাইয়া অতি সত্বর প্রয়োজনীয় বহুবিধ উপচার সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। কিন্তু একজোড়া বোয়াল মৎস্য কোনোমতেই জোটানো গেল না।

কথাটি শিবচন্দ্রের কানে যাওয়া মাত্র তিনি কহিলেন, "চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখনি কাউকে পাঠিয়ে দাও কুণ্ডুবাবুদের পুকুরে, মাছ পেতে দেরি হবে না।" এই নির্দেশ অনুযায়ী মৎস্য অনতিবিলম্বে ধরিয়া আনা হইল, এবার শিবচন্দ্র তাঁহার সহকারীদের নিয়া রুদ্ধদুয়ার মন্দিরে মন্দিরে শুরু করিলেন মায়ের অর্চনা।

পূজা শেষে হোমকুণ্ডে দেওয়া হল পূর্ণাহুতি। রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, শিবচন্দ্র মন্দিরকক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া সহাস্যে কহিলেন, 'আর ভয় নেই, ম্র-

সর্বমঙ্গলাব কৃপায ছেলেটিব প্রাণবক্ষা হযেছে। এবার কযেকদিনেব ভেতবেই সে সুস্থ হযে উঠবে।”

তিন দিন পবেই কুমাবখালিতে আব একটি তাববার্তা আসিযা উপস্থিত। লেখা বহিযাছে, বোগীর সংকট কাটিযা গিযাছে, ঠাকুবেব কৃপাদৃষ্টি যেন তাহার উপব নিবদ্ধ থাকে।

শিবচন্দ্রেব আচার্য জীবনে, তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারেব কাজে, বড সহাযক ছিলেন তাঁহার দীক্ষিত ও কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য স্যার জন উডবফ। তন্ত্র সাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটুক, শুদ্ধ বীরাচাবী তন্ত্রসাধনা আবাব পূর্ব গৌববে অধিষ্ঠিত হোক, এই প্রার্থনাই শিবচন্দ্র বাব বাব নিবেদন কবিতেন জননী সর্বমঙ্গলার কাছে। আবো চাহিতেন, শুধু ভারতেই নয়, সাবা বিশ্বে এই মাতৃসাধনাব বীজ ছড়াইযা পড়ুক এবং এই সাধনাব মাধ্যমে ভাবতের ধর্ম সংস্কৃতিব জযগৌবব ঘোষিত হোক দিগ্‌বিদিকে।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের প্রণীত তন্ত্রতত্ত্বেব ইংরেজী অনুবাদ সম্পন্ন করনে শিষ্য উডরফ। তন্ত্রবহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ইংবেজী ভাষায আবো কযেকটি মহামূল্যবান গ্রন্থও তিনি বচনা করেন, আজো তাহা সারা বিশ্বের শিক্ষিতসমাজেব সম্মুখে তন্ত্রেব বিজয় বৈজযন্তী উড্ডীন করিয়া বাখিযাছে।[১] এই গ্রন্থগুলি উডবফ বচনা কবেন তাঁহার ছদ্মনামে। আভালন নাম দিযা এগুলি প্রকাশিত হয।

এই সব গ্রন্থে তন্ত্রেব তত্ত্ব এবং ধর্মসাধনার তত্ত্বেব বৈজ্ঞানিক উপযোগিতার উপব উডবফ জোব দিযাছিলেন। নিগূঢ় বহস্যে ঘেরা তন্ত্রসাধনাব প্রতি এতকাল বিশ্বের শিক্ষিতসমাজে যে ভীতি ও অবজ্ঞা ছিল উডবফেব প্রযাসে তাহার কিছুটা দূব হয।

শিবচন্দ্র ও উডবফেব যুগ্ম প্রচাব প্রযাস বামকৃষ্ণ বিবেকানন্দেব যুগ্ম সত্তাকে স্মবণ কবাইযা দেয। রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বামকৃষ্ণেব অধ্যাত্মবাদকে সাবা জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিযাছিলেন, অদ্বৈত বেদান্তেব যুগোপযোগী ব্যাখ্যার মধ্য দিযা গুবুর মহিমা ঘোষণা কবিযাছিলেন। উডবফও তেমনি আত্মপ্রকাশ কবিযাছিলেন স্বীয গুবু তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রেব শাস্ত্রপ্রচার কর্মের ধাবক বাহকরূপে। তাঁহাব রচনাব মাধ্যমে তন্ত্রের মাহাত্ম্য নূতন কবিযা ঘোষিত হইযাছিল, বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী মহলে শুবু হইযাছিল তন্ত্রচর্চাব ব্যাপক প্রযাস। উডবফ বিবেকানন্দেব মতো বিবাট আধ্যাত্মিক পুবুষ ছিলেন না, একথা ঠিক, কিন্তু ভাবতীয অধ্যাত্ম শাস্ত্রেব প্রচাবকরূপে তাঁহাব নিষ্ঠা ও দক্ষতার কথা অস্বীকাব করাব উপায় নাই।

ইংবেজী ভাষায বচিত উডবফেব তন্ত্রসাহিত্য ইউবোপ ও আমেবিকার মনীষীদেব মধ্যে তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে প্রবল অনুসন্ধিৎসাব সৃষ্টি কবিযাছিল। তখনকাব দিনেব 'ইণ্টাব ন্যাশনাল জার্নাল অব তান্ত্রিক অফার ইন আমেরিকা' প্রভৃতি পত্রিকা এই অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয দিযাছে।

উডবফের মাধ্যমে শিবচন্দ্রেব সহিত প্রসিদ্ধ কলাতত্ত্ববিদ্ ই. বি. হ্যাভেল এবং

---

১ এ বিষযে উডবফের প্রধান সহযোগী ছিলেন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায (বর্তমানের প্রখ্যাত তান্ত্রিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ), এবং শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর পরিচয় সাধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা উভয়েই তন্ত্রাচার্যের ভাবধারায় যথেষ্টরূপে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের মুখে তন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ এবং ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনিয়া ডঃ কুমারস্বামী মুগ্ধ হন। শুধু তাহাই নয়, কিছুদিন পরে হিন্দু-ধর্ম গ্রহণের জন্য তিনি আগ্রহী হইয়া উঠেন। ভট্টপল্লীর রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা কুমার-স্বামীর হিন্দুধর্মে আশ্রয় নিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা বিধান দেন, কুমার-স্বামী খ্রীষ্টান, শাস্ত্রমতে ম্লেচ্ছকে হিন্দুরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এসময়ে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব অগ্রসর হইয়া আসেন ডঃ কুমারস্বামীর সহায়তায়। বহুতর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া তিনি প্রমাণ করেন, ম্লেচ্ছের হিন্দুকরণ এবং ম্লেচ্ছের পক্ষে হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ মোটেই অশাস্ত্রীয় নয়। তাছাড়া তন্ত্রশাস্ত্রের উদার বিধানের কথা উল্লেখ করিয়াও কুমারস্বামীর হিন্দুত্ব গ্রহণের প্রস্তাব তিনি জোরালো ভাবে সমর্থন করেন, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, আর্য-অনার্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধু-পাষণ্ডী সবাই মাতৃতত্ত্ব ও তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী সাধক। জগজ্জননীর কোলে উঠিবার দাবি অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই।

শোনা যায়, বিদ্যার্ণবের এই উদার এবং শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক সমন্বিত ঘোষণার পর কুমারস্বামীর হিন্দুধর্ম গ্রহণে আর কেউ কোনো বাধা জন্মান নাই।

আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেলের সহিত বিচারপতি উডরফের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভারতীয় চারুকলার মর্ম উদ্‌ঘাটনের জন্য হ্যাভেল এক সময়ে খুব ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এ সময়ে উডরফের পরামর্শে তিনি শরণ নেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের।

তন্ত্রতত্ত্বের আলোকে শিবচন্দ্র ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব, চারুকলা এবং ভাস্কর্যের অপরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন সুধী গবেষক হ্যাভেলের কাছে। এই সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনিয়া হ্যাভেলের বহু সংশয়ের নিরাকরণ হয়, ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মর্মকথা জ্ঞাত হইয়া তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন।

অতঃপর উডরফের ভবনে হ্যাভেল এবং কুমারস্বামী মাঝে মাঝে শিবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তন্ত্রতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের নানা নিগূঢ় বিষয় প্রতিভাধর শিবচন্দ্র এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল ভাবে বলিয়া যাইতেন, আর উডরফ এবং তাঁহার সংস্কৃতের শিক্ষক হরিদেব শাস্ত্রী ঐ দুই সুধী জিজ্ঞাসুকে তাহা ইংরেজীতে বুঝাইয়া দিতেন।

বিদ্যার্ণবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং উপদেশ এই সময়ে গভীরভাবে হ্যাভেলকে প্রভাবিত করে। হিন্দু দেবদেবীর সূক্ষ্মতর দিব্য অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে নূতনতর চেতনা ও শ্রদ্ধা তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠে। শোনা যায়, এসময়ে হ্যাভেল তান্ত্রিক ঐতিহ্যযুক্ত কোনো কোনো দেবদেবীর ভাস্কর্যমূর্তি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কখনো বা অর্ধবাহ্য অবস্থায়, পদ্মাসন করিয়া বসিয়া পড়িতেন তাঁহাদের সম্মুখে। এ সময়ে হ্যাভেলকে এই আসন হইতে উঠাইয়া আনিতে গিয়া আর্টস্কুলের সহযোগীরা হইতেন গলদ্‌ঘর্ম।

হ্যাভেল সরলভাবে বন্ধুমহলে বলিতেন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রের প্রসাদেই ভারতীয় ভাস্কর্যের বহু নিগূঢ় রহস্য তাঁহার দৃষ্টি সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়, শিষ্য স্যার জন উডরফকে দীক্ষা দেওয়া এবং তন্ত্র প্রচারে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করা।

ব্যারিস্টারী ছাড়িয়া উডরফ তখন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিনের জন্য তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু সাধনা ও ভারত-তত্ত্বের প্রতি চিরদিনই তাঁহার প্রবল অনুসন্ধিৎসা। এসময়ে হাইকোর্টের প্রবীণ ভকীল অটলবিহারী ঘোষের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অটলবিহারী ছিলেন 'আগম অনুসন্ধান সমিতি'র একজন বিশিষ্ট সদস্য। কিছুদিনের মধ্যে উডরফ এই সমিতির সংস্রবে আসেন এবং তন্ত্রসাধনার রহস্য সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া উঠেন। তাঁহার এই কৌতূহল ক্রমে পরিণত হয় সত্যকার অনুসন্ধিৎসায় এবং তন্ত্রের মূল গ্রন্থ পাঠ করার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে শিক্ষা করা। হাইকোর্টের সরকারী দোভাষী, হরিদেব শাস্ত্রী, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এবং ইংরেজীতেও তাঁহার দক্ষতা আছে। উডরফ তাঁহাকেই নিযুক্ত করিলেন নিজের শিক্ষকরূপে। তাঁহার মতো প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষে এই ভাষা আয়ত্ত করিতে বিলম্ব হয় নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ভারত এবং তিব্বতের কতকগুলি দুরূহ তন্ত্রগ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন।

তন্ত্রের সাধন-রহস্য অবগত হওয়ার ইচ্ছাও ক্রমে তাঁহার দুর্বার হইয়া উঠে। কিন্তু শুধু গ্রন্থ পাঠে তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই দক্ষ ক্রিয়াবান্ কৌল সাধকের সাহায্য ও কৃপা। তেমন মহাপুরুষের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়? এখন হইতে এ চিন্তাই উডরফের চিত্তকে আলোড়িত করিতে থাকে। সংস্কৃতের শিক্ষক হরিদেব শাস্ত্রীকে মাঝে মাঝে এবিষয়ে প্রশ্ন করেন, অনুরোধ জানান দক্ষ কোনো তন্ত্রাচার্যের সন্ধান দিবার জন্য।

দৈবযোগে উপস্থিত হয় এক পরম সুযোগ। হাইকোর্টের একটি মামলার ব্যাপারে হিন্দুশাস্ত্রের, বিশেষত তন্ত্রশাস্ত্রের, কতকগুলি প্রশ্নের উপর আলোকপাতের জন্য কাশী হইতে আহ্বান করা হয় পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে।

হরিদেব শাস্ত্রী সহাস্যে উডরফকে বলেন, 'আপনি একটি উচ্চকোটির তন্ত্রবিদের সন্ধান চাচ্ছিলেন, এবার তিনি এসে গিয়েছেন।"

"কে বলুন তো, শাস্ত্রীজী," ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেন উডরফ।

"শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কথাই আমি বলছি। হাইকোর্টের কাজ উপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছেন। এই সুযোগে আপনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আমার মনে হয়, আপনার মনে তন্ত্রসাধনার জন্য যে গভীর আগ্রহ জন্মেছে, তা মিটতে পারে এঁরই সাহায্যে।"

"তাঁকে আজই তবে নিয়ে আসুন আমার গৃহে।"

"তবে একটা কথা, স্যর, ইনি কিন্তু ইংরেজী ভাষা জানেন না মোটেই। এইরূপ আচার্য আপনার পছন্দ হবে কিনা, জানিনে।"

"ইংরেজী না-জানা শাস্ত্রবিদ্‌ই তো আমি চাই। তাঁর ভেতরে রয়েছে নির্ভেজাল বস্তু।"

হরিদেব শাস্ত্রীর সাহায্য নিয়া উডরফ নিজের ভবনেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন আচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সঙ্গে। যথাসময়ে বিদ্যার্ণব সেখানে উপস্থিত হইলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আনিয়া বসাইলেন নিজের ড্রয়িংরুমে।

তন্ত্রাচার্যের প্রথম দর্শনেই উডরফ অভিভূত হন। শক্তি-সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। আয়ত নয়ন দুটি শাণিত ছুরিকার মতো ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মাথায় দীর্ঘ কেশের গুচ্ছ, ললাটে বৃহৎ সিঁদুরের ফোঁটা এবং রক্তচন্দনের তিলক। কণ্ঠে বিলম্বিত রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের কয়েক লহর মালা। পরিধানে একটি গৈরিকরঞ্জিত আলখাল্লা। নির্নিমেষ নয়নে এই বীরাচারী সিদ্ধকৌলের দিকে উডরফ চাহিয়া আছেন।

ক্ষণপরেই শুরু হয় তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে উভয়ের দীর্ঘ আলোচনা। উডরফ তাঁহার এক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, আর শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অবলীলায় তাঁহার সমাধান জ্ঞাপন করেন, সমর্থন টানিয়া আনেন প্রাচীন শাস্ত্রের ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি হইতে।

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন স্যার জন উডরফ। ভাবেন, শুধু শাস্ত্রবিদ্যা আহরণ করিয়া এমনতর তাত্ত্বিক দিক্‌দর্শন তো কেহ দিতে পারেন না। অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক প্রজ্ঞা রহিয়াছে এই মহাপুরুষের প্রতিটি উচ্চারিত বাক্যের পিছনে। প্রতিটি বাক্য যেন মন্ত্রচৈতন্য দিয়া আবির্ভূত হইতেছে, উডরফের সর্বসংশয় ভঞ্জন করিয়া দিতেছে সঙ্গে সঙ্গে।

বিদায়ের কালে শিবচন্দ্র কহিলেন, "সাহেব, আপনার ভেতর জন্মান্তরের শুভ সংস্কার রয়েছে, নতুবা তন্ত্র সম্বন্ধে এরূপ শ্রদ্ধা, আর অনুসন্ধিৎসা তো সম্ভব নয়।"

বিদ্যার্ণব কাশীধামে চলিয়া গেলেন, কিন্তু উডরফের মানসপটে দীপ্যমান রহিল সিদ্ধকৌল মহাপুরুষের সেই তপস্যাপূত মূর্তি ও তাঁহার শাস্ত্রীয় ভাষণের স্মৃতি।

তন্ত্রশাস্ত্রের নানা তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন এ-সময়ে উডরফের মনে জাগিয়া উঠিত। এগুলির মীমাংসা অবশ্য চাই। হরিদেব শাস্ত্রীর মাধ্যমে এসব প্রশ্ন তিনি কাশীতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে প্রেরণ করিতেন, উত্তরে তিনিও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বক্তব্য জানাইয়া দিতেন, করিতেন জটিল তত্ত্ব ও রহস্যের মীমাংসা।

অতঃপর কয়েক মাসের মধ্যেই উডরফ তাঁহার সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। হরিদেব শাস্ত্রীকে বলিলেন, "শাস্ত্রীজী, আমার অন্তরে আচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের প্রথম দর্শনের স্মৃতি চিরউজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কোনোমতেই তাঁকে ভুলতে পারছিনে। স্থির করেছি, তাঁর কাছ থেকেই আমি দীক্ষা নেবো।"

"একি অদ্ভুত কথা আপনি বলছেন, স্যার উডরফ? তান্ত্রিক দীক্ষা নেবার তাৎপর্য নিশ্চয় কিছুটা আপনি জানেন?" সবিস্ময়ে বলিয়া উঠেন হরিদেব শাস্ত্রী।

"তা জানি বৈ কি। তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া আমায় সম্পন্ন করতে হবে নিখুঁতভাবে, এ জীবনের অনেক কিছু সংস্কার, আচার আচরণ ত্যাগ করতে হবে। তাতে আমি মোটেই পশ্চাদ্‌পদ হবো না।"

"তা যেন বুঝলাম। কিন্তু বিদ্যার্ণব মশাইর সম্মতি তো আগে নেওয়া চাই। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম সংস্কৃতি আপনার। সহজে যে তিনি আপনাকে সাধন দেবেন, তন্ত্রের গুহ্য তত্ত্ব ও ক্রিয়া শেখাবেন, তা তো আমার মনে হচ্ছে না।"

"শাস্ত্রী, সেই জন্যই তো আপনাকে আমার উকিল নিযুক্ত করা। আমার হয়ে আপনি বিদ্যার্ণবকে জোর ক'রে বলুন। আমার দিক থেকে আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি। এমন কি, আমার স্ত্রীর অনুমতিও মিলে গিয়েছে।"

"এসব প্রশ্নের মীমাংসা দূর থেকে হয় না। তাহলে, বরং চলুন, আমরা দুজনে মিলে কাশীতে যাই। সেখানে গিয়ে বিদ্যার্ণবকে আপনি আপনার প্রার্থনা জানাবেন। আমিও যথাসাধ্য বলবো।"

"এ অতি উত্তম কথা। চলুন তা হলে কাশীতে গিয়ে তাঁকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।"

কয়েকদিনের মধ্যেই উভয়ে উপনীত হইলেন কাশীধামে। শিবচন্দ্র তখন পাতালেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার সর্বমঙ্গলা সভার জয়জয়কার চারিদিকে। দেশের দিগ্‌দিগন্ত হইতে তন্ত্রসাধনার অনুরাগীরা জড়ো হইতেছেন তাঁহার কাছে। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল ভক্তকেই তিনি দিতেছেন তাঁহার সাহায্য ও কৃপাপ্রসাদ।

শিবচন্দ্রের ভবনে গিয়া উডরফ ও হরিদেব শাস্ত্রী শুনিলেন, সেদিন সাড়ম্বরে মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিদ্যার্ণব মহাশয় অত্যন্ত ব্যস্ত, সাহেবকে পূজা শেষ না হওয়া অবধি ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভক্ত সেবকেরা উডরফ ও শাস্ত্রীজীকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং একটি নিভৃত কক্ষে নিয়া বসাইয়া দেন। অদূরে গৃহের অভ্যন্তরে দেবীর পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হইতেছে, কানে আসিতেছে সিদ্ধকৌল শিবচন্দ্রের উচ্চারিত মন্ত্র, আর আবেগকম্পিত কণ্ঠের ঘন ঘন আরাব—তারা, তারা, তারা!

পূজা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। রক্তগৈরিক পট্টবাস পরিহিত শিবচন্দ্র ধীরপদে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হন, তাম্রকুণ্ড হইতে ভস্ম নিয়া লেপন করিয়া দেন উডরফ এবং হরিদেব শাস্ত্রীর ললাটে।

মুহূর্ত মধ্যে উডরফের সর্বসত্তায় সঞ্চারিত হয় এক অলৌকিক শক্তির প্রবাহ। একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ যেন তাঁহার সারা দেহকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্তি হইবার উপক্রম হয়।

এই সময়ে শিবচন্দ্রের ইঙ্গিতে হরিদেব শাস্ত্রী তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরেন, পার্শ্বস্থিত তক্তপোশে শোয়াইয়া দেন।

কিছুক্ষণ বাদেই উডরফের সংবিৎ ফিরিয়া আসে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়া শিবচন্দ্রকে নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। শিবচন্দ্রের আশীর্বাদ ও কুশল প্রশ্নাদি শেষ হইলে শুরু হয় আসল কথাবার্তা।

উডরফ নিবেদন করেন, "ঠাকুর, কলকাতায় প্রথম যেদিন আপনাকে দর্শন করি, সেদিন থেকেই আমার মন জুড়ে বসে আছে তন্ত্রসাধনার আকাঙ্ক্ষা। তাই আজ আপনার শরণ নিতে এসেছি।"

শিবচন্দ্রের আরক্ত নয়নদ্বয় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, "সাহেব, আপনার ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ নিরন্তর বর্ষিত হোক। আপনি ভাগ্যবান্, তাতে সন্দেহ নেই। জগন্মাতার সন্তান তো এ জগতে কতোই রয়েছে, কিন্তু মাতৃ-সাধনার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে কয়জন ?"

"আমার দিক দিয়ে বন্ধন ও বাধাবিঘ্ন অনেক, তা আমি জানি," অকপটে বলেন

উডরফ। "কিন্তু, আমার একান্ত প্রার্থনা, কৃপা ক'রে সে সব আপনি দূর ক'রে দিন। তন্ত্র সাধনার আলোক দিয়ে জীবন আমার ধন্য করুন।'

"সাহেব, গোড়াতেই আমি বলে রাখতে চাই, এই সাধনা ও তত্ত্ববিদ্যা গুরুমুখী। শ্রদ্ধাবান্ হয়ে, ত্যাগ-তিতিক্ষা নিয়ে, গুরুর কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তবেই সিদ্ধি হবে করায়ত্ত। তাতো সহজ কথা নয়।"

"আমি আপনার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই শক্তি সাধনার আলো জ্বেলে আপনি আমার পথ দেখিয়ে দিন এই আমার প্রার্থনা।"

এবার স্নেহমধুর কণ্ঠে শিবচন্দ্র কহিলেন, "সাহেব, আমি হরিদেব শাস্ত্রীর কাছে শুনেছি, আপনি সুপণ্ডিত এবং প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী। এ খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আপনাকে বিশেষভাবে আমার দুই একটা নির্দেশ দেবার আছে।"

"বলুন। যথাসাধ্য আমি তা পালন করবো।"

"আমাদের এই ভারতবর্ষ পুণ্যময় হয়েছে, প্রজ্বলময় হয়েছে এত শত যোগী ঋষি ও সিদ্ধ মহাত্মাদের পুণ্য ও জ্ঞানের আলোকে। উচ্চকোটির এই সব সাধক প্রচ্ছন্ন রয়েছেন এদেশের হিমালয় অঞ্চলে, গঙ্গা, যমুনা, কাবেরীর তটে তটে, রয়েছেন বহুতর তীর্থ ও জাগ্রত মহাপীঠে। প্রকৃত শ্রদ্ধা নিয়ে, যুক্তপাণি হয়ে তাঁদের সন্ধানে বেরুলে আজকের দিনেও তাঁদের সাক্ষাৎ মেলে। আপনি হিমালয় অঞ্চলে গিয়ে এঁদের দু-চার জনকে খুঁজে বার করুন, তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও উপদেশ নিন। তাই হবে আপনার সাধনার বড় প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতির পর স্থির করা যাবে, তন্ত্রদীক্ষা আপনি নেবেন কিনা, কার কাছে নেবেন।"

শ্রদ্ধাভরে শিবচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া উডরফ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এখন হইতে তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল সিদ্ধ মহাত্মাদের অনুসন্ধান ও কৃপালাভ। এজন্য অজস্র চিঠিপত্র তিনি লিখিতে লাগিলেন, সাধু মহল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও পাঠাইলেন দিকে দিকে।

কাশীতে সেদিন শিবচন্দ্রের ভবনে এক অলৌকিক দিব্য অনুভূতি লাভ করেন উডরফ। এই অনুভূতির পুণ্যময় স্মৃতিটি উত্তরকালে তাঁহার অন্তরে চির জাগরূক ছিল।

এ সম্পর্কে স্যার জন উডরফ শিবচন্দ্রের প্রধান শিষ্য দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, "কাশীতে ঠাকুর শিবচন্দ্রের ভবনে সেদিন উপস্থিত হবার পরেই এক দিব্য অনুভূতিতে আমার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। একটা বিদ্যুতের প্রবাহ যেন আকস্মিকভাবে আমার দেহের ভেতরে প্রবেশ করে, ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেকটি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে। মনে হতে থাকে, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন চক্রাকারে ঘূর্ণিত হচ্ছে আর অপসৃত হয়ে যাচ্ছে সৃষ্টির নিঃসীম মহাকাশে। মনের ক্রিয়া তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল।

"কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব, ধীরে ধীরে ফিরে এলাম নিজের অভ্যন্তরে, একটা দিব্য পরিবেশে। বিদ্যুতের মতন দ্যুতিমান একটা বিরাটায়তন ওঙ্কার রূপায়িত হয়ে উঠল আমার নয়নসমক্ষে। তার ভেতর নিরন্তর ভেসে বেড়াচ্ছিল পবিত্র মাতৃবীজ সমন্বিত দিব্যোজ্জ্বল মন্ত্ররাশি। হরিদেব শাস্ত্রী আমায় পরে বলেছিলেন আমার অর্ধবাহ্য অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর শিবচন্দ্র ইঙ্গিতে শাস্ত্রীজীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমাকে শুইয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য আমার সংবিৎ ফিরে এসেছিল, তখন ঠাকুরের উপদেশ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম।"

উডরফ তখন কলিকাতায়। হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ আসিয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে তাঁহার এক সংবাদদাতার নিকট হইতে চিঠি পাইলেন, হরিদ্বারের কাছাকাছি অঞ্চলে এক ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি হরিদ্বারের দিকে রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে চলিলেন তাঁহার দোভাষী হরিদেব শাস্ত্রী এবং আরো দুই তিনটি সাধনকামী বন্ধু।

হরিদ্বারের নিকটস্থ এক পর্বতের নিভৃত কন্দরে ঐ মহাত্মার দর্শন পাওয়া গেল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সমাধি হইতে তিনি ব্যুত্থিত হইলেন, হাতছানি দিয়া সবাইকে ডাকিয়া নিলেন তাঁহার নিজের আসনের কাছে।

অপার শান্তির প্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে এই প্রাচীন তাপসের গুহাহিত জীবনে। দিব্য আনন্দের আলো দু'চোখ হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, সমগ্র গুহার পরিবেশকে করিয়া তুলিয়াছে স্নিগ্ধমধুর ও শান্তিময়।

স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাত্মা উডরফকে প্রশ্ন করিলেন, "বেটা, মনে হচ্ছে তুমি এদেশের নও, বিদেশ থেকে এসেছো। কি তোমার মনোবাঞ্ছা খুলে বল।"

"বাবা, ভগবৎ দর্শনের জন্য প্রাণ বড় অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ দর্শনের পথ বড় কঠিন, বড় বিপদসঙ্কুল। এ পথে সদ্গুরুর দর্শন যদি না মিলে, তিনি যদি হাত ধরে না নিয়ে যান, তবে তো এগোবার উপায় নেই। আমি তাই গুরুর সন্ধানে বেরিয়েছি। আপনি আমায় কৃপা করুন, এ বিষয়ে সাহায্য করুন।"

"দেখো বেটা, ভগবানের লীলা কত বিচিত্র, কত চমৎকার। সাত সমুদ্রের পারে তোমার দেশ। সংস্কার, জন্ম, পরিবেশ সব ভিনদেশী। আর তিনি তোমায় এদেশে টেনে এনে গুরুর সন্ধানে ঘোরাচ্ছেন অরণ্যে পর্বতে।"

অতঃপর মহাত্মা উডরফকে গুহার এক নিভৃত কোণে নিয়া বসাইলেন, স্পর্শ করিলেন তাঁহার ব্রহ্মদণ্ডে। এ যেন এক অবিশ্বাস্য ইন্দ্রজাল। উডরফের চিত্তপটে একের পর এক ফুটিয়া উঠিল বহুতর বিচিত্র দৃশ্য। এসব দৃশ্য যেন পূর্বজন্মে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অনির্বচনীয় আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

মহাত্মা স্মিতহাস্যে বলিলেন, "বেটা, এসব দৃশ্য যা দেখলে সবই তোমার নিজ জীবনের। বহুপূর্বে জন্মান্তরের ধারায় এসব ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা পরম্পরার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠেছে তোমার সংস্কার, আর তোমার অন্তর্জীবন। এর ফলেই সমুদ্র পার হয়ে, অজানা আনন্দের হাতছানিতে, তুমি এদেশের দেবভূমিতে এসে পৌঁছেছো। যথেষ্ট সুকৃতি তোমার রয়েছে, বেটা।"

দিব্য আনন্দের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে উডরফের শিরায় শিরায়। উদ্দীপনায় অধীর হইয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "বাবা, শুনেছি ব্রহ্মবিদ্ গুরু শিষ্যের তিন জন্মের সংস্কার ও সাধন ফল দেখে তারপর দীক্ষা দেন। দেখতে পাচ্ছি, আমার বহুজন্মের ওপর আপনার দিব্য দৃষ্টি রয়েছে প্রসারিত। তবে আপনিই এ অধমকে দীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করুন।"

"না বেটা, আমি তোমার গুরু নই। একাধারে শাস্ত্রবিদ্, জ্ঞানী, কর্মী ও শক্তি সাধনায় পারঙ্গম সাধক হবেন তোমার গুরু। তিনি তোমার কাছাকাছিই রয়েছেন। শুভলগ্ন উপস্থিত হলে তাঁর কৃপা তুমি পাবে।"

মহাত্মা এবার নীরব হইলেন, ধুনির সম্মুখে বসিয়া শুরু করিলেন তাঁহার ধ্যান মনন। অতঃপর উডরফ ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রণাম নিবেদন করিয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এবার সন্ধান আসিল হৃষিকেশের এক প্রখ্যাত যোগীর। গঙ্গার অপর পারে, ঘন অরণ্যে আবৃত এক কুঠিরায়, এই যোগী দীর্ঘদিন তাঁহার তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। দুইজন ভক্তিমান্ সঙ্গী নিয়া উডরফ তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইলেন।

প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে যোগী সহাস্যে কহিলেন, "বেটা, কেন তুমি বৃথা এদিকে ওদিকে ঘুরে মরছো, বলতো? হিমালয়ের ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মাদের দর্শন করছো, ভালো কথা। এ দর্শনে পুণ্য হয়, মন স্থির হয়, প্রত্যাহার ও ধ্যান ধারণা আপনি এসে যায়।"

"সেইজন্যেই তো এখানে আমার আসা, মহারাজ—" যুক্তকরে নিবেদন করেন উডরফ।

"কিন্তু বেটা, তোমার তপস্যার স্থান তো এটা নয়, তোমার গুরুও এখানকার কেউ নন। এখানকার উচ্চকোটির মহাত্মারা পরাজ্ঞানের উৎস, কর্ম বা শাস্ত্র প্রচারের ধার তাঁরা ধারেন না। তোমার ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, তোমার সাধনার সঙ্গে কিছুটা ঐশ্বরীয় কর্মও যুক্ত রয়েছে। তোমার স্থান তাই এখানে নয়, লোকালয়ে। তপস্যা ও জনকল্যাণ, দুই-ই তোমার করতে হবে সমভাবে।"

নানা চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়েন উডরফ। ব্যবহারিক জীবনের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে তিনি অতিমাত্রায় কুশলী। তীক্ষ্ণধী ব্যারিস্টার হিসাবে এক সময়ে তিনি সুপরিচিত ছিলেন তার পর কলিকাতা হাইকোর্টের এক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বিচারপতিরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সিদ্ধ মহাত্মাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তেই যে আসিতে পারিতেছেন না।

ভাবিলেন, শিবচন্দ্র সিদ্ধকৌল সাধক। নিজেই তিনি আগ্রহ করিয়া উডরফকে পাঠাইয়াছেন এই সব ঈশ্বরকল্প মহাত্মার সন্ধানে। এক্ষেত্রে বুঝিয়া নিতে হইবে, শিবচন্দ্র চাহিতেছেন, তাঁহার চাইতে বেশী শক্তিধর কোনো মহাপুরুষের নিকট উডরফ দীক্ষা গ্রহণ করুন। কিন্তু এখানে আসার পর উডরফের অভিজ্ঞতা হইয়াছে অন্য রকমের। এই মহাত্মাদের মতে, শিবচন্দ্রের মতো জ্ঞানবান্ ও কর্মীপুরুষই তাঁহার গুরু হওয়ার উপযুক্ত।

সংশয় ও বিপরীতধর্মী চিন্তাস্রোতে চিত্ত যখন বিভ্রান্ত এবং আলোড়িত, এমন সময়ে উত্তরাখণ্ডে থাকিতেই, আর এক ব্রহ্মজ্ঞ যোগী পুরুষের সংবাদ পান উডরফ।

গুপ্তকাশীর নিকটস্থ এক পর্বতগুহায় ইনি বাস করেন। স্থানীয় সাধক ও জন-সাধারণের বিশ্বাস ইঁহার বয়স তিন চার শত বৎসরের কম নয়।

নিকটস্থ এক অরণ্যে উডরফ ও তাঁহার সঙ্গীরা তাঁবু ফেলিলেন। বিশ্রাম ও আহারাদির শেষে উপনীত হইলেন যোগীরাজের গুহায়।

বেশ কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করার পর মহাত্মার ধ্যান ভাঙিল। ইঙ্গিতে দর্শনার্থীদের তিনি নিকটে ডাকিলেন। প্রণামান্তে উডরফ শুরু করিলেন তত্ত্বজ্ঞানের দুই চারিটি প্রশ্ন।

যোগীরাজ সহাস্যে মৃদুস্বরে কহিলেন, "বেটা, তোমার ভেতরে ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু অহংবোধ আর সংশয় সৃষ্টি করেছে দুস্তর বাধা।"

"বাবা, আপনার কথা অতি যথার্থ। আমি অন্ধ পথিক। কৃপা ক'রে আমায় আপনি চক্ষুষ্মান করুন। আমায় পথ দেখিয়ে দিন। তত্ত্ববিদ্ গুরুর সাহায্য না পেলে এক পা'ও যে আমি অগ্রসর হতে পারছিনে। সেই গুরুর সন্ধানে বেরিয়েছি, কিন্তু তিনি রয়ে গেছেন নাগালের বাইরে।"

যোগীরাজ উত্তরে বলিলেন, "বেটা, তুমি অন্ধ, একথা ঠিক। তত্ত্বজ্ঞান যাঁর জীবনে ফুটে ওঠে নি, সে অন্ধই বটে। কিন্তু তোমার জিজ্ঞেস করি, এর আগে যে দুই মহাত্মার কাছে গিয়েছিলে, তাঁরা তো তোমার বিধিনির্দিষ্ট গুরুর ইঙ্গিত ঠিকই দিয়েছেন। সেই চক্ষুষ্মান্ মহাত্মাদের বাক্যে তো তুমি কান দাও নি। অন্ধের মতো পথ চলছো, আর হোঁচট খাচ্ছ।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বৃদ্ধ যোগীরাজের দিকে তাকাইয়া থাকেন উডরফ। উপলব্ধি করেন, এই ঈশ্বরকল্প মহামানবের দৃষ্টির বাহিরে কোনো কিছুই নাই।

করজোড়ে কহিলেন, "বাবা, কৃপা ক'রে আমায় বলুন, কি আমি করবো, কার কাছে শরণ নেবো।"

"শোন বেটা। আগের দুই সর্বজ্ঞ মহাত্মা যা বলেছেন, তার ওপরে আমার আর কিছু বলার নেই। এবার স্বস্থানে ফিরে যাও, সদ্‌গুরু তুমি সেখানে বসেই পাবে। আরো একটা কথা মনে রেখো। জীবন ক্ষণস্থায়ী, এর একটি মুহূর্তও বিনা সাধনভজনে অপচয় ক'রো না। শিগ্‌গীর গিয়ে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নাও, তাঁর উপদেশ মতো কাজ করো। জীবনকে আহুতি দাও ঈশ্বরের যজ্ঞে। তবেই না ঈশ্বর তোমাকে কোলে টেনে নেবেন।"

যোগীরাজের নিকট বিদায় নিয়া নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন উডরফ। এবারে দৃষ্টি তাঁহার ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া উঠে। পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারেন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র এতদিন শুধু তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। ব্যারিস্টারী এবং জজিয়তী জীবনের অত্যুগ্র বিচার বিশ্লেষণ, অহমিকা বোধ আর সংশয় এতদিন উডরফকে ঘাটে ঘাটে ঘুরাইয়া মারিয়াছে। এবারে তাঁহাকে নিতে হইবে স্থির সিদ্ধান্ত।

সেইদিনই তাঁবু তুলিয়া সঙ্গীদের সমভিব্যাহারে উডরফ রওনা হইলেন কলিকাতার দিকে।

হাইকোর্টের ছুটি ফুরাইতে তখনো বেশ কিছুটা দেরি আছে। গুপ্তকাশী হইতে ফিরিয়া কয়েকদিনের জন্য উডরফ শৈলাবাস দার্জিলিংএ বেড়াইতে গিয়াছেন। সেদিন ঘুম্ পাহাড়ের এক বনের মধ্য দিয়া পথ চলিতেছেন, হঠাৎ চোখে পড়িল এক সাধুর ঝুপড়ি। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ভস্মমাখা, দীর্ঘবপু এক সাধু ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। কপালে তাঁহার সিন্দুর ও রক্ত চন্দনের ফোঁটা, গলায় হাড়ের মালা। বুঝা গেল, ইনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।

ধ্যান ভঙ্গ হইলে উডরফ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল, দীর্ঘদিন ইনি তিব্বতে তপস্যারত ছিলেন। এবার গুরুর আদেশে ফিরিতেছেন সমতলভূমিতে।

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে উভয়ের আলাপ চলিতেছে। এ সময়ে স্যার উডরফ তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি তন্ত্র সাধনার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি, কিন্তু সদ্‌গুরু লাভ এখানো হয়ে ওঠে নি।"

কিছুক্ষণ নীরবে নয়ন মুদিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "কেন বেটা, তোর গুরু তো তোর জন্য অপেক্ষা ক'রেই রয়েছেন। তাঁর নাম শিবচন্দ্র। তাঁর কাছ থেকেই মিলবে তোর শান্তি আর মুক্তির সন্ধান।"

সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানাইয়া উডরফ সানন্দে বিদায় নিলেন। এবার আর তাঁহার মনে

কোনো সংশয় নাই, দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই। ব্যারিস্টার ও বিচারপতি হিসাবে আইনের বহুতর কূট প্রশ্ন ও জটিল রহস্যের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে প্রচুর সাহস ও আত্মবিশ্বাস তাঁহার আছে। কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনের পথঘাট, গলিঘুঁজি অনেক কিছুই তাঁহার জানা নাই। প্রকৃত সমর্থ গুরু কে? তাঁহার ঈশ্বরনির্দিষ্ট গুরুই বা কোথায় রহিয়াছেন? কোন্ পথে কোন্ সাধনপ্রণালী অনুসরণ করিয়া হইবেন তিনি সিদ্ধকাম?—তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা এ সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারে না।

এজন্যই তো বার বার সাধু মহাত্মাদের কাছে তিনি ঘোরাফেরা করিতেছেন, অপেক্ষায় রহিয়াছেন নির্ভুল পথনির্দেশের।

হিমালয়ের যোগী তপস্বীদের কথায় ও ইঙ্গিতে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্রই তাঁহার বিধিনির্দিষ্ট গুরু। কিন্তু এই চিহ্নিত গুরু তো নিজে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতেছেন না। একটা অনিশ্চিতের মধ্যে তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন।

এবার তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাণী তাঁহার হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিয়াছে দৃঢ় প্রত্যয়ের শক্তি। শিবচন্দ্রের নাম বলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্ত হইতে। এবার লক্ষ্য তাঁহার স্থির। শিবচন্দ্রের নিকট হইতেই গ্রহণ করিবেন বহু আকাঙ্ক্ষিত দীক্ষা, মাতৃসাধনায় হইবেন সিদ্ধকাম।

কলিকাতায় ফিরিয়াই উডরফ তাড়াতাড়ি হরিদেব শাস্ত্রীকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "শাস্ত্রীজী, আমি সংকল্প স্থির ক'রে ফেলেছি, আচার্যবর শিবচন্দ্রের কাছ থেকেই দীক্ষা নেবো।"

শাস্ত্রীর চোখে মুখে প্রসন্নতার ছাপ। কহিলেন, "কাশীতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের গৃহে আপনার যে অলৌকিক অনুভূতি হয়েছিল, ওঙ্কার মধ্যস্থ মাতৃবীজ আপনি দর্শন করেছিলেন, তা বোধহয় আপনার স্মরণ আছে।"

"সে অনুভূতি, সে দর্শন, কোনোদিনই ভোলবার নয়।"

"আমি তখন বুঝেছিলাম, সিদ্ধকৌল শিবচন্দ্রের কৃপা আপনি পেয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরও আপনি হেথায় হোথায় অনর্থক গুরুর জন্য এত খোঁজাখুঁজি করেছেন।"

"সে কথা ঠিক। হয়তো আচার্যদেব, নিজেই ইচ্ছে ক'রে আমায় ঘুরিয়েছেন, আমার সংশয় ছেদন করার জন্য, সংকল্পকে দৃঢ় ক'রে তোলবার জন্য।"

"আপনি সাধনার যোগ্য আধার। শ্রদ্ধা, সরলতা ও পবিত্রতা আপনার আছে। আমার কিন্তু কেবলই ভয় হচ্ছে, তান্ত্রিক সাধনায় যে সব আচার আচরণ আবশ্যক, তা কি আপনি ধৈর্য ধরে করতে পারবেন? আচার্য শিবচন্দ্র কিন্তু অতিমাত্রায় আনুষ্ঠানিক ও ক্রিয়াবান্, মাতৃসাধনায় একটু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখলে ক্ষেপে ওঠেন। তাঁর সব নির্দেশ পালন ক'রে আপনি কি চলতে পারবেন?"

"আমি সব কিছুর জন্য মনকে তৈরি করেছি, শাস্ত্রীজী। তন্ত্রসিদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ক্রিয়া ও আচার আমি অবশ্য পালন করবো। তাছাড়া, আমার স্ত্রী এলেনের সম্মতিও আমি নিয়েছি। আমার শক্তি হিসেবে তিনিও দীক্ষা আর সাধন নেবেন। শাস্ত্রীজী, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। যত সত্বর হয় আপনি আচার্যদেবকে ক'লকাতায় নিয়ে আসুন।"

উডবফ ও হরিদেব শাস্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে কিছুদিনের মধ্যে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ ও কুশল প্রশ্নাদির পর শিবচন্দ্র স্মিতহাস্যে কহিলেন, "কি সাহেব, তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবার সব শেষ হয়েছে তো? মনের দ্বন্দ্ব সংশয় তো আর নেই?"

উডবফ জোড়হস্তে নতশিরে দণ্ডায়মান, কাতর স্বরে কহিলেন, "আচার্যদেব, আমি অবিদ্যার আবর্তে পড়ে মার খাচ্ছি। আমায় উদ্ধার করুন মাতৃসাধনার দীক্ষা আমায় দিন।"

"সাহেব, কাশীধামে যখন তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে তখনি আমি তোমায় দীক্ষা দিতে পারতাম। দিই নি, তার কারণ আছে। তোমরা ইউরোপীয়রা বড় ভোগসুখী, বাস্তবধর্মী এবং বিচারশীল। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে না দেখে, চাক্ষুষ না দেখে, তোমরা কোনো কিছু মেনে নিতে চাও না, তাই না?"

"হ্যাঁ, সে কথা যথার্থ।"

"সেই জন্যই তোমায় আমি এদেশের উচ্চকোটির সাধু মহাত্মাদের কাছে যেতে বলেছিলাম। তাঁদের শক্তিবিভূতির পরিচয় নিশ্চয় তুমি প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছো।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁদের যোগবিভূতি অকল্পনীয়। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয়, তাঁদের দৃষ্টির তুলনায় আমরা অন্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতো কিছু অধ্যয়ন ক'রেও আমরা অর্বাচীন, মূর্খ।"

"এই মূল্যবোধটি তোমার হোক্, শুধু সেইজন্যই তাঁদের কাছে আমি তোমায় পাঠাই নি। সিদ্ধ মহাত্মারা বড় কৃপালু। বিশেষ ক'রে যাঁরা সত্যকার মুমুক্ষু, সত্য উপলব্ধির জন্য ত্যাগ তিতিক্ষায় পশ্চাদ্‌পদ নয়, তাঁদের প্রতি ঐ মহাত্মাদের স্নেহ ও কৃপার অবধি নেই। তুমি ভিন্নদেশীয় লোক, ভিন্ন সংস্কার ও সংস্কৃতির মানুষ, তবুও তন্ত্রসাধনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছো, এটা তাঁরা বুঝেছেন এবং তোমায় আশীর্বাদও দিয়েছেন।"

"মূলে রয়েছে আপনারই কৃপা।"

"আমার শুভেচ্ছা ছিল বৈ কি। যাক্, মহাত্মাদের কৃপায় তোমার সংশয় মিটেছে, যাচাই করার বুদ্ধি হয়েছে দূরীভূত। এবার আমি তোমায় শাক্তী দীক্ষা দেবো। কিন্তু তোমার শক্তি?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমার স্ত্রী এলেন এজন্য প্রস্তুত, তিনিও আপনার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন।"

লেডি এলেন উডবফ পাশের ঘরেই ছিলেন, আহ্বান পাওয়ামাত্র দ্রুতপদে আসিলেন। শিবচন্দ্রের চরণে লুটাইয়া নিবেদন করিলেন সশ্রদ্ধ প্রণাম।

নির্ধারিত শুভ লগ্নে উডবফ দম্পতির দীক্ষা অনুষ্ঠান এবং দেবী সর্বমঙ্গলার পূজা-হোম সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইবার পর উডবফ করজোড়ে নিবেদন করেন, "আচার্যদেব, দীক্ষা দিয়ে, মাতৃপূজার অধিকার দিয়ে, আজ আপনি আমায় উদ্ধারের পথে নিয়ে এলেন। এবার আমার কর্তব্য গুরুদক্ষিণা নিবেদন করা। কৃপা ক'রে আমায় বলুন, কোন্ বস্তু আপনার প্রিয়। যে কোনো উপায়ে আমি তা সংগ্রহ ক'রে আপনার চরণে প্রণামী দেবো।"

শিষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই শিবচন্দ্রের ভাবান্তর ঘটিল। কিছুক্ষণের জন্য

মৌনী থাকিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, আমার প্রিয় বন্ধু তুমি আমার প্রণামী দিতে চাও, আমার সন্তোষ বিধান করতে চাও, খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু কোনো জাগতিক বস্তুতে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। মায়ের কোলে বসে, মাতৃমূর্তি আমি দর্শন করেছি, মত্ত রয়েছি মাতৃসাধনায়। আর তো কোনো কাম্য বস্তু আমার নেই। তুমি আমার প্রিয় মাতৃতত্ত্ব ও মাতৃনাম জগতে প্রচার করো। যতদিন জীবন থাকে, এই মহান কর্মেই তুমি রত হয়ে থাকো। এতেই হবে আমার সত্যকার সন্তুষ্টি বিধান, আর এটাই হবে তোমার গুরুদক্ষিণা।"

মাতৃগত-প্রাণ সিদ্ধপুরুষের কথা কয়টি শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দে উডরফের অন্তর ভরিয়া উঠে। করজোড়ে নিবেদন করেন, "আমায় আশীর্বাদ করুন আপনার ঈপ্সিত কর্ম যেন আমি উদ্‌যাপন করতে সমর্থ হই।"

"তথাস্তু, বৎস। মায়ের তত্ত্ব, মায়ের তারক-নাম প্রচারের ব্রত তোমার সার্থক হোক্।"

এ সময়ে শিবচন্দ্র কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং নূতন শিষ্য উডরফকে তন্ত্রোক্ত আচার অনুষ্ঠান ও পূজা হোমের ক্রিয়া পদ্ধতি দেখাইয়া দিতে থাকেন।

সিংহবাহিনী, দশভুজা মহিষমর্দিনী, দেবী দুর্গা উডরফের ইষ্ট বিগ্রহ। এই বিগ্রহের অর্চনা তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী যোড়শ-উপচারে নিত্য তিন সম্পন্ন করিতেন। পূজা, ধ্যান, জপ, হোম, ভোগরাগ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত নিখুঁত ভারতীয় প্রথায়।

দেবী পূজা সমাপ্ত করিয়া উডরফ ভাবাবেশে উঠিয়া দাঁড়াইতেন। গৌরকান্তি দীর্ঘবপু রক্তচন্দনে চর্চিত, পরনে রক্তবর্ণ ক্ষৌম বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো, তার কেশের শিখায় দুলিত একগুচ্ছ রক্তজবা, তন্ত্রধারক পণ্ডিত ও মণ্ডপের সহকারী এই বিদেশী কৌল সাধকের দিকে অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত।

এই সময় হইতে শিবচন্দ্র ও উডরফের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়িয়া উঠে। সুযোগ পাইলেই উডরফ সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত গুরুদেবকে স্বগৃহে আনয়ন করিতেন, গ্রহণ করিতেন নূতন নূতন নিগূঢ় ক্রিয়ার উপদেশ। কখনো বা নিজেই কুমারখালি গ্রামে অথবা কাশীতে শিবচন্দ্রের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইতেন। গুরু এবং গুরুপত্নী উভয়কেই তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেন। গুরুর সান্নিধানে থাকার সময়ে সকলেরই চোখে পড়িত তাঁহার নগ্নপদ, কাবায় পরিহিত রুদ্রাক্ষ শোভিত রূপ।

ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির বহু অনুষ্ঠান বা সভায় উডরফ আমন্ত্রিত হইতেন। সেসব স্থানে ভাষণ দিবার সময় সর্বপ্রথমে তিনি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতেন সদ্‌গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের উদ্দেশে।

তন্ত্রশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারূপে এবং তন্ত্র সাধনার সিদ্ধ সাধকরূপে সারা ভারতে তখন আচার্য শিবচন্দ্রের খ্যাতি প্রচারিত। বিশেষত কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উডরফকে দীক্ষা দিবার পর হইতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সাধনা ও সিদ্ধির তথ্য জানার জন্য অনেকেরই আগ্রহের অন্ত নাই। বহু স্থানে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা উডরফকেও তাঁহার গুরুদেব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তাই উডরফ মনে মনে স্থির করিলেন, গুরুদেবের একটি প্রামাণ্য জীবনী তিনি লিখিবেন।

কয়েকদিন পরেই শিবচন্দ্রের শুভাগমন হইল তাঁহার কলিকাতার ভবনে। কুশল

প্রশ্নের পরে শিবচন্দ্র কহিলেন, 'উডরফ, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটা নূতন কাজ শুরু করার সংকল্প করেছো। ব্যাপারটা কি খুলে বলতো ?"

বুঝা গেল, অনেক কিছুই এই অন্তর্যামী সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টি এড়ায় না। উডরফ হাসিয়া কহিলেন, "আচার্যদেব, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার মনে বাসনা জেগেছে, আপনার একটা প্রামাণ্য জীবনী রচনা করবার জন্য।"

"কেন ? তুমি কি ভেবেছো, একাজে আমি খুশী হবো ?"

"না, তা নয়।" আমতা আমতা করিয়া বলেন স্যার জন উডরফ। "ভারতের এবং ইউরোপ আমেরিকার বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আপনার জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আমায় প্রশ্ন করেন, অজস্র চিঠিপত্র লেখেন। তাই ভাবছি, এটা লিখবো।"

"শোন উডরফ, আমার জীবনী লিখলে আমি কিন্তু মোটেই খুশী হবো না। আমার জীবনী অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। আমি সারা জীবন ধরে অনুসন্ধান করে আসছি আমার মা মহামায়ার জীবনী, তাঁর সৃষ্ট সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনকথা। সেই জীবনী বাদ দিয়ে তুমি আমার জীবনী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো ?"

"আমাদের মতো সামান্য লোক আপনার মতো মহাপুরুষের কথা ভাবতেই খেই হারিয়ে বসে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর কথা কি ক'রে তারা জানবে বা লিখবে ?" পাল্টা প্রশ্ন করেন উডরফ।

"না উডরফ, আমার শিষ্য যে হবে, সে যে মহামায়ার তত্ত্ব নিয়েই নিমগ্ন থাকবে দিন রাত। তুমি সেই তত্ত্বকথাই প্রচার করো। দীক্ষার অব্যবহিত পরেই তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের কথা তোমায় আমি বলেছি। এখন থেকে তাই হোক তোমার ধ্যান জ্ঞান।"

গুরুদেবের এই কথা উডরফ শিরোধার্য করিয়া নিলেন। সেই দিন হইতেই শুরু করিলেন আদিষ্ট তন্ত্রপ্রচারের কাজ। ইংরেজী ভাষায় শিবচন্দ্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, 'তন্ত্রতত্ত্ব'-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনায় তিনি ব্রতী হইয়া পড়িলেন। অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত এ গ্রন্থ রচিত হইল এবং ইহার নাম দেওয়া হইল—প্রিন্সিপল্‌স্ অব তন্ত্র। তারপর এক একে রচিত ও প্রকাশিত হইল আরও বহুতর তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ।

ইংরেজী ভাষায় রচিত তন্ত্র সাহিত্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষিতসমাজের সম্মুখে উন্মোচিত করিল সাধনা ও দর্শনের এক নবদিগন্ত।[১] শক্তিসাধনার অন্তর্নিহিত শক্তি, মাতৃতত্ত্বের দার্শনিকতা এবং মন্ত্রের নিগূঢ় রহস্যের উপর ঘটিল নূতনতর আলোকপাত। গুরু শিবচন্দ্র তাঁহার তন্ত্রতত্ত্বে যে শুদ্ধতর বীরাচারী সাধনতত্ত্বের প্রচার করেন, শিষ্য উডরফ তাহাই তুলিয়া ধরেন সারা বিশ্বের অধ্যাত্মরসপিপাসু মানুষের কাছে।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের জীবনে দুইটি পর্যায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে রহিয়াছে সাধনা ও সিদ্ধির নিরন্তর প্রয়াস, সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ কৌল সাধকদের তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, বাছিয়া বাছিয়া জাগ্রত শক্তিপীঠ ও শ্মশানে উপস্থিত হইতেছেন,

---

১ স্যার জন উডরফের গ্রন্থগুলির নাম : প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ তন্ত্র, শক্তি অ্যাণ্ড শাক্ত, সারপেন্ট পাওয়ার গারল্যাণ্ড্ অব্ লেটার্স, ক্রিয়েশান অ্যাজ, এক্সপ্লেনড ইন তন্ত্র, ইন-ট্রোডাকশন টু তন্ত্র, ইজ্ ইণ্ডিয়া সিবিলাইজড, ইত্যাদি। কোনো কোনো গ্রন্থে ছদ্মনাম, আর্থার আভালন, তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

সিদ্ধ মহাত্মাদের সাহায্যে উদ্‌যাপন করিতেন নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান। এই সময়কার জীবনে তন্ত্রের প্রচার সম্পর্কে শিবচন্দ্রকে মোটেই উৎসাহী হইতে দেখা যায় নাই।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখিতে পাই শিবচন্দ্রের আচার্য রূপ এই সময়ে তন্ত্রতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসারের জন্য তাঁহার তৎপরতার অবধি নাই। এজন্য প্রথমে কাশীধামে এবং পরে স্বগ্রাম কুমারখালিতে সর্বমঙ্গলা সভা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। কামাখ্যা হইতে জ্বালামুখী, কেদারনাথ হইতে রামেশ্বর, সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান শক্তিপীঠের সাধক ও আচার্যদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন, তন্ত্রের উজ্জীবনের জন্য কর্মতৎপর হন। বিশেষ করিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে বাংলার শাক্ত-সাধক ও আচার্যদের মধ্যে শিবচন্দ্র এক গভীর যোগসূত্র গড়িয়া তোলেন। তাঁহার 'তন্ত্রতত্ত্ব' বাংলার তন্ত্র সাধকদের মধ্যে নূতনতর সাড়া জাগাইয়া তোলে, তাঁহার বজ্রগর্ভ ভাষণে শক্তিসাধনার আগ্রহী অগণিত নরনারী সে সময়ে নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে।

গুরুদেবের অশেষ কৃপা এবং তাঁহার প্রদত্ত সাধনের কথা বলিতে গেলেই স্যার জন উডরফের দুই চোখ কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিত। ঘনিষ্ঠ মহলে কখনো কখনো গুরু-দেব শিবচন্দ্রের নানা করুণার কথা বিবৃত করিতেন

"কলিকাতায় এতদিন তত্ত্ব ব্যাখ্যানের কালে হঠাৎ আমার ডাক পড়িল—উপস্থিত হইবামাত্র গুরুদেব বলিলেন, 'দেখ সাহেব, তুমি মাতৃসাধনায় রত। আমার ইচ্ছা একবার তুমি কোনো বিশিষ্টা মাতৃসাধিকার হস্ত হইতে একটি সিঞ্চন গ্রহণ করো। উত্তরে জানাইলাম, 'আপনি গুরু, পথ নির্দেশক। আপনার ইচ্ছা নিশ্চয়ই সর্বসময়ে সর্বোপরি বলবৎ হইবে। কিন্তু উক্ত কার্যে ক্রিয়াকুশলী যোগ্য দক্ষ সাধিকা কোথায় আছেন তাহা তো আমার জানা নাই। কাজেই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা তো এখন আপনাকেই করিতে হয়।'

"শিবচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন, 'তজ্জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মায়ের ইচ্ছার সময় পূর্ণ হইলে সকল সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। ইহার কিছু-দিনের পর গুরুদেবেরই ব্যবস্থায় কাশীধামের জয়কালী দেবী নামে এক বাঙালী মাতৃ-সাধিকা কর্তৃক গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী উক্ত 'সিঞ্চন' অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। শিবচন্দ্র বিরাট রহস্যময় মহাপুরুষ, এরূপ লোকোত্তর-চরিত মহাপুরুষের চরিত্রের রহস্য ভেদ করা তো সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য।"[১]

জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর শিবচন্দ্র প্রধানত কুমারখালিতেই অবস্থান করেন। দেবী সর্বমঙ্গলার সেবা ও আরাধনা হইয়া উঠে তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। মাতৃসাধনায় সিদ্ধ মহাসাধক মাতৃক্রোড়ে বসিয়া মাতৃস্নেহের সুধারসেই বিভোর থাকিতেন দিন রাত।

কলিকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শক্তিসাধনার অনুরাগী শত শত লোক এসময়ে দর্শন করিতে আসিতেন একপন্থী তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ শিবচন্দ্রকে। তন্ত্রসাধনার রহস্য, এবং দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা তাঁহার পাদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহারা জানিয়া নিতেন।

প্রিয় শিষ্য স্যার জন উডরফ মাঝে মাঝে তাঁহার আচার্যদেবকে কলিকাতার বাসভবনে নিয়া আসিতেন, নিজের 'শক্তি' শ্রীমতী এলেন সহ ভক্তিভরে করিতেন সদ্‌গুরু শিবচন্দ্রের

১ তন্ত্রাচার্য বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি পত্রিকা ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

পাদপূজা। সাধনার নিগূঢ়তর ক্রিয়াগুলি উডরফ হাতে-কলমে শিখিয়া নিতেন তাঁহার নিকট হইতে।

উডরফ তাঁহার সহধর্মী শক্তিসাধক বন্ধুদের নিয়া প্রায়ই উপস্থিত হইতেন কুমার-খালিতে। নগ্নপদ, কাষায় পরিহিত, রুদ্রাক্ষ মালায় শোভিত এই ইংরেজ তন্ত্রসাধক শুধু তাঁহার গুরু শিবচন্দ্রেরই প্রিয় ছিলেন না, কুমারখালি গ্রামের বহু নরনারীর ভালবাসা ও শুভেচ্ছা লাভেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন।

সদ্‌গুরু শিবচন্দ্রের কৃপায় উডরফ রূপান্তরিত হইয়াছিলেন এক উচ্চকোটির শক্তি-সাধকরূপে। গুরুর এই কৃপাপ্রসাদের কথা উডরফ সজলচক্ষে ভাবগদ্‌গদ ভাষায় প্রকাশ্যে সদাই সকলের সম্মুখে বর্ণনা করিতেন। শিবচন্দ্রের তিরোধানের পরেও সদ্‌গুরুর প্রতি তাঁহার এই শ্রদ্ধা, আস্থা ও কৃতজ্ঞতার এতটুকু তারতম্য দেখা যায় নাই। বসন্তকুমার পালমহাশয় উডরফের এই গুরুভক্তির একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন।

স্যার জন উডরফ তখন ইংল্যাণ্ডে। কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচার-পতির পদ হইতে তিনি অবসর নিয়াছেন, লণ্ডনে অবস্থান করিয়া রত রহিয়াছেন আইন অধ্যাপনার কাজে। গুরুদেব শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ইতিপূর্বে লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির অনুধ্যান, আর তাঁহার শেখানো তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান প্রভৃতিই তখন উডরফের সাধনজীবনের উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথ মিত্র উত্তরকালের বাংলার হোম সেক্রেটারী উডরফের লণ্ডনস্থ বাসভবনে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের কাহিনী উত্তরকালে তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষমহাশয়ের কাছে।[১]

এসময়ে লণ্ডনে থাকিয়া শ্রীমিত্র আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। স্যার জন উডরফের কাছে তিনি আইন পড়িতেন। উডরফের স্মৃতিতে তাঁহার গুরুস্থান ভারতভূমির মাহাত্ম্য চির প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি নরনারী তাঁহার অতি প্রিয়। উডরফ একদিন রবীন্দ্র মিত্রকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ জানাইলেন, উদ্দেশ্য—ভারতের স্মৃতি, গুরুদেবের স্মৃতি রোমন্থন করিয়া কিছুটা আনন্দ পাইবেন।

উডরফের ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন মিত্রমহাশয়। সেখানকার পরিবেশ দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। উডরফের ড্রয়িংরুমের চারিদিকের দেওয়ালে টাঙানো কতকগুলি ভারতীয় দেবদেবীর চমৎকার চিত্র। ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা, গায়ত্রী দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি। আরও আছে উডরফের গুরু শিবচন্দ্র ও তাঁহার পত্নীর সুদৃশ্য ফ্রেমে আঁটা চিত্র এবং রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য ও অন্যান্য মহাপুরুষদের বিস্তর ছবি।

মিত্রমহাশয়, অবাক্ হইয়া এগুলি দেখিতেছেন আর তাঁহার মনে হইতেছে এ যেন ইংল্যাণ্ডের কোনো স্থান নয়, ভারতের কোনো দেবালয় আশ্রম বা ধর্মপ্রাণ নাগরিকের গৃহে তিনি আসিয়াছেন।

স্যার জন উডরফ শ্রীমিত্রকে সস্নেহে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তারপর নানা কথা-বার্তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিলেন বিভিন্ন কক্ষের ফটো ও চিত্রসমূহ।

---

১ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি পত্রিকা, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩

ভারতের কয়েকটি গুহাবাসী সিদ্ধ মহাত্মার ফটোও এইসব কক্ষে ঝুলানো ছিল। এগুলি দেখানোর সময় উডরফ শ্রদ্ধাভরে তাঁহার যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "এই সব পবিত্র, দুরধিগম্য সাধনগুহা এবং এই সব মহাত্মাদের আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। এ পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল গুরুমহারাজ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কৃপা ও নির্দেশ পেয়ে।"

শিবচন্দ্রের কৃপায় তন্ত্রোক্ত নিগূঢ় সাধন পাইয়া জীবন তাঁহার ধন্য হইয়াছে, এবং এই সাধনার তত্ত্ব তাঁহার জীবনে দিনের পর দিন স্ফুরিত হইতেছে, একথা বলিতে গিয়া উডরফের দুই নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে, ভাবাবেগে সারা দেহ কম্পিত হইতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিতে থাকেন, "তন্ত্রসিদ্ধ যোগসিদ্ধ আচার্যেরা প্রত্যক্ষ দর্শন ও উপলব্ধির যে সব কথা শাস্ত্রে লিখে গিয়েছেন, শিষ্য পরম্পরায় বলে গিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের মতো সাধারণ স্তরের সাধকদের বলবার কিছুই নেই।"

গুরুদেব শিবচন্দ্রের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় আবার তাঁহার ভাবাবেগ দেখা দিল, গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন

"আমার মতো লোকের প্রতি গুরুদেবের ছিল অহেতুক কৃপা, তাঁর জীবিতকালে এবং তাঁর তিরোধানের পরে কত করুণালীলা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর যোগবিভূতির মাধ্যমে পেয়েছি কত গভীর স্নেহের স্পর্শ। কলকাতায় থাকতে যেমন তাঁর দর্শন ও সাহায্য পেয়েছি তেমনি লণ্ডনে এসেও তা পেয়ে ধন্য হচ্ছি।

"গুরুদেব একবার স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে কতকগুলো গুহ্য তান্ত্রিক রহস্য বুঝিয়ে দিলেন। বললেন,—গুরুর মনুষ্যদেহের বিনাশ হলেও শিষ্যের উপর গুরুশক্তির ক্রিয়া সমভাবেই বর্তমান থাকে, সকল অপবিত্রতা ও অমঙ্গল থেকে তাকে রক্ষা করে।"

"আমার জীবনে তখন এক বিরাট সংকট চলেছে, গুরুদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ করে আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন। অন্তরে দিনরাত চলছে শোকের আর্তি। এ সময়ে একদিন কলকাতার হাইকোর্ট বেঞ্চে একটি গুরুতর এবং জটিল মামলা চলছে। আইনের বহু কূট তর্ক উঠেছে এবং বহু চেষ্টাতেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছুতে পারছিনে। দেহ মন ক্লান্তিতে নৈরাশ্যে মুহ্যমান, অসাড় হয়ে পড়েছে এমন সময়ে দেখতে পেলাম বিদেহী গুরুমহারাজের আবির্ভাব। তাঁর আত্মিক স্পর্শে সঙ্গে সঙ্গে মন বুদ্ধি সতেজ ও স্বচ্ছ হয়ে উঠল, মামলাটির সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পড়লাম অচিরে।

"তাছাড়া, কলকাতায় ও লণ্ডনে বার বার তাঁর বিদেহী আত্মার স্নেহ স্পর্শ পেয়েছি ঘুমন্ত অবস্থায়, স্বপ্নযোগে। যখন যে সব দুশ্চিন্তা ও সংকটে মুষড়ে পড়তাম, তখনি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেতাম তাঁর কাছ থেকে। কর্তব্য ও কর্মপন্থা সেই মুহূর্তে সহজ সরল হয়ে উঠতো।

"একবার কলকাতার হাইকোর্টে আমার এজলাসে প্রকাণ্ড ও একটি জটিল মামলা চলছে। প্রধান সাক্ষীরা সুচতুর এবং অতিমাত্রায় অসৎ তারা বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছিল বিচারপতিকে। তাঁদের কথাবার্তা সতর্কভাবে শুনছি, চোখ মুখের ভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি। কিন্তু সত্য উদ্‌ঘাটনের কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিনে। একবার সন্দিগ্ধ মনে একটি সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে তার কথায় প্রকৃত সত্যতা অনুধাবন করতে চাচ্ছি এমন সময়ে সহসা আমার দৃষ্টি পড়ল কোর্টের দেওয়ালের দিকে। দেখলাম—বিদেহী গুরু-

মহারাজের জ্যোতির্ময় মূর্তিটি আকারিত হয়ে উঠেছে সেখানে। গুরুমূর্তি দর্শনে তৎক্ষণাৎ মনে মনে নিবেদন করলাম আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। গুরুদেবের চোখে মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে। দক্ষিণ হাত উত্তোলন ক'রে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, 'কল্যাণমস্তু'। দিবালোকে প্রকাশ্য আদালত কক্ষের দেওয়ালে বিদেহী গুরুজীর এ এক মহনীয় এবং সদর্শনীয় আবির্ভাব। মন প্রাণ আমার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীদের জবানবন্দীর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যও স্বচ্ছ হয়ে উঠল আমার দৃষ্টিতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

"শুধু ব্যবহারিক কাজকর্মেই নয়, আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও বিদেহী সদ্গুরুর স্নেহময় হাতটিকে প্রসারিত দেখেছি বার বার। সেবার বাড়িতে বসে গভীর রাতে একটা বড় জটিল মামলার রায় লিখছি। হঠাৎ দেখলাম, জ্যোতির্ময় তান্ত্রিক ভৈরবের বেশে, ত্রিশূল হস্তে, গুরুদেব কক্ষমধ্যে অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন, নয়ন থেকে ঝরে পড়ছে দিব্য আনন্দের আভা। ঐ মূর্তির উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করলাম। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে, বরাভয় দিয়ে, তিনি বললেন, 'কল্যাণমস্তু'। তৎক্ষণাৎ কক্ষমধ্যে ফুটে উঠল এক অত্যাশ্চর্য অতীন্দ্রিয় দৃশ্য। গুরুদেবের এ মূর্তিটি পরিণত হল অসংখ্য জ্যোতির্ঘন মূর্তিতে, সারা কক্ষটি তাতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠল। বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি ঐ মূর্তি। দিব্য আনন্দে আমি অধীর হয়ে উঠলাম, নয়ন বেয়ে ঝরতে লাগল পুলকাশ্রু। নয়ন মুছে, ভাবাবেগ সংবরণ ক'রে যখন কক্ষের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, তখনো আমার চোখে পড়ছিল ঐসব দিব্যমূর্তি। এমনি অপার ও অহেতুকী ছিল আমার সদ্গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের করুণা।"

জীবনের শেষ তিনটি বৎসর শিবচন্দ্র কুমারখালিতেই অতিবাহিত করিয়াছেন, সহজে এস্থান ত্যাগ করিতে চাহিতেন না। ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার পূজা ও ধ্যানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত, এক-একদিন সারা রাত্রিই কাটিয়া যাইত দিব্য ভাবাবেশে। মাতৃসাধক রূপান্তরিত হইতেন মায়ের এক শিশুরূপে।

অনেক সময় দেখা যাইত, ভাবাবিষ্ট শিবচন্দ্র নিবিষ্ট মনে মা-সর্বমঙ্গলার সহিত কত কথাবার্তা বলিতেছেন, কত আদর আবদার করিতেছেন। ইষ্টদেবী ও ভক্তের এই লীলা-খেলার মধ্যে হঠাৎ এক এক সময়ে শিবচন্দ্র ভাবাবেশে, প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন, পার্শ্বে উপবিষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্ত সাধকদের ডাকিয়া বলিতেন, "ঐ দ্যাখো, মা আমার জ্যোতির ছটায় নওপ আলো ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন আর প্রসন্নমধুর হাসি হাসছেন। নাও, দেখে নাও তোমরা প্রাণভরে আমার মা'কে।

শিবচন্দ্রের আহ্বানে জাগ্রতা হইয়া উঠিতেন ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলা। শুধু তাঁহারই নয়ন সমক্ষেই মা দাঁড়াইতেন তাহা নয়, শিবচন্দ্রের স্নেহভাজন ভক্ত সাধকদের কাছেও হইতেন প্রত্যক্ষীভূত। এভাবে মাতৃদর্শনের দিব্য সুধা শিবচন্দ্র পরমানন্দে বিলাইয়া দিতেন স্বগণদের মধ্যে। তাই ভক্তদের অনেকে কৃপালু গুরুদেবকে অভিহিত করিতেন, 'সদাশিব নামে।

কুমারখালির কাছাকাছি গ্রাম তেবাড়িয়া। এই গ্রামের নেপালচন্দ্র সাহা ছিলেন শিবচন্দ্রের অন্যতম ভক্ত। সেবার নেপালের ভ্রাতুষ্পুত্র নীরদ এক প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, শহর হইতে খ্যাতনামা ডাক্তারদের আনা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের চিকিৎসায় রোগী নিরাময় হয় নাই। সংকট দিন দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

নেপাল শিবচন্দ্রের কাছে ছুটিয়া আসিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন 'বাবা ঠাকুর আমার ভাইপো নীরদের জীবনের কোনো আশা নেই। আপনি একবার [illegible] কৃপা করুন, প্রাণ ভিক্ষা দিন।'

শিবচন্দ্র মা সর্বমঙ্গলার ধ্যানে আবিষ্ট। কহিলেন, 'নেপাল আমি তাঁর চরণ নিয়ে পড়ে আছি, তাঁর মুখ চেয়ে আছি, তুমি সেই বেটিকে ডাকো। সৃষ্টি স্থিতি লয়ের যে তিনিই কর্ত্রী।'

'বাবা, আমরা পাপী-তাপী মানুষ তাঁকে তো আমরা চিনিনে। চিনি শুধু আপনাকেই। যা করবার আপনি করুন, বা আপনার মাকে দিয়ে করান।'

'ব্রহ্মময়ীর সুধাসমুদ্রে ক্ষুদ্র মকরীর মতো আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার সাধ্য কতটুকু বল।'

'সে সব কথা আমি বুঝিনে, বাবা। এইতো সেদিন পাঁচুপুরের জমিদার নিচুবাবু সাংঘাতিক অসুখে ভুগে মরতে বসেছিলেন, আপনিই তো কৃপা করে তাঁর প্রাণরক্ষা করলেন।'

'ঠিকই বলেছো, নেপাল, কিন্তু সেটা আমি করি নি। করেছেন আমার ঐ মা বেটি। তাঁর প্রত্যাদেশ পেয়েছিলাম, তাই তো অসম্ভব সম্ভব হল, নিচু বেঁচে উঠল।'

'আপনি সংকল্প করলে মা তা সিদ্ধ করবেন না তা কি কখনো হতে পারে? না, বাবাঠাকুর আপনি আমার নীরদকে এবার বাঁচান। আমার ছোটভাই যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, তখন তার এই ছেলেকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল। ছেলে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। একে যদি না বাঁচাতে পারি আপনার সর্বমঙ্গলা মায়ের দুয়ারে আমি আত্মঘাতী হবো।'

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে নেপাল সাহা হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠেন, খড়মসহ আচার্যবর শিবচন্দ্রের পা দুটি সবলে জড়াইয়া ধরেন। নীরবে কিছুক্ষণ কাটাইবার পর শিবচন্দ্র মৃদুস্বরে বলেন, "এ ছেলের বড় দুটি ভাইও তো এই একই রকম রোগে মারা গিয়েছে। কি বল, নেপাল তাই না?"

'আজ্ঞে হাঁ, আপনি অন্তর্যামী আপনার অজানা তো কিছু নেই। ডাক্তারেরা বলছেন এ রোগ কোনোমতে সারানো সম্ভব নয়। আর তাই শুনে বাড়ির মেয়েরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।'

'হুঁ' এ যে মহাকালের ডাক। এ রোগীকে ফিরিয়ে আনা বড়ই কঠিন।

'বাবাঠাকুর মা সর্বমঙ্গলার দোহাই, আপনি এ ছেলের প্রাণ ভিক্ষা দিন।'

কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে, মায়ের পদ-প্রান্তে গিয়া শিবচন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করেন। কিছু সময় ইষ্টদেবীর সম্মুখে রহিলেন ধ্যানস্থ। তারপর দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া নেপালকে বলেন, চল নেপাল। তোমার সঙ্গে আমি এখনি রওনা হচ্ছি। তোমার বাড়িতে গিয়ে করতে হবে পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ। কিন্তু, এ যে মহাকালের [illegible] ফল অভিজ্ঞাচার্যের পক্ষে জানা হবে না। অন্যকে এর দণ্ড গ্রহণ করতে হবে, নেপাল। বরণ করতে হবে নিজের আয়ু। যাক হতভাগ্য শিশুটি তো বাঁচুক।'

রোগীর ভবনে পৌঁছিয়াই শিবচন্দ্র শুরু করিয়া দিলেন দেবীর পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠের ক্রিয়া। সাধকের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল — ভিতরে শুধু রহিলেন শিবচন্দ্র

তাঁহার তন্ত্রধার এবং মুমূর্ষু রোগী নীরদ। শেষ রাত্রে সকল কিছু অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে শিবচন্দ্র পরিবারস্থ সবাইকে নিকটে আহ্বান করিলেন। ভাবাবিষ্ট স্বরে কহিলেন, "তোমাদের আর কোনো ভয় নেই মায়ের কৃপা হয়েছে। নীরদ এবার বেঁচে গেল।"

বলা বাহুল্য, সেই দিনই রোগীর সংকট কাটিয়া যায় এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার পর দীর্ঘ পরমায়ু নিয়া সে সংসার ধর্ম পালন করিতে থাকে।

তিন মাস পরের কথা। মা-সর্বমঙ্গলার ভবনটির সংস্কার ও মেরামতের কাজ চলিতেছে। মিস্ত্রীরা নানা আবর্জনার সঙ্গে কয়েকটা তীক্ষ্ণ বাঁশের খণ্ড আঙিনায় ফেলিয়া গিয়াছে। শিবচন্দ্র নগ্নপদে সেখান দিয়া চলিতেছিলেন, হঠাৎ একটি তীক্ষ্ণ বাঁশের ফলা তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হয়, প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হইতে থাকে।

পরের দিনই গোটা পা ফুলিয়া উঠে এবং শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। স্থানীয় ডাক্তারেরা অভিমত দেন, ক্ষতস্থানটি বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে শিবচন্দ্রকে কলিকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা দরকার। আধুনিকতম ইনজেকশান ও ঔষধাদি ছাড়া এ রোগীকে বাঁচানো যাইবে না।

এ সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছানো মাত্র উডরফ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তেরা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল, একটি আধুনিক বড় হাসপাতালের ক্যাবিনে, কোনো খ্যাতনামা সার্জনের চিকিৎসাধীনে শিবচন্দ্রকে রাখা হইবে।

কিন্তু গোল বাধাইলেন শিবচন্দ্র নিজে। শান্ত দৃঢ় স্বরে তিনি কহিলেন, "তোমরা অনর্থক হৈচৈ ক'রো না। ডাক এসে গিয়েছে, মায়ের কোলে এবার আমাকে ফিরতে হবে। এ কটা দিন নিভৃতে, একান্তে বসে, মা-সর্বমঙ্গলার শ্রীমুখ আমি দর্শন করবো, তাঁর নামসুধা রসে মত্ত হয়ে থাকবো। অন্তিম সময়ে কুমারখালির এই মাটি, মায়ের মন্দির আর সিদ্ধাসন ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।"

অগত্যা ভক্তগণ কুমারখালি গ্রামেই যথাসাধ্য সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে হইবে, সার্জন ও তাঁহার সহকারীরা তৈরী হইলেন, এনাস্থেশিয়া দিয়া রোগীকে অচেতন করিবার জন্য। শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "এত হাঙ্গামা কি দরকার? এমনিতেই অস্ত্রোপচার শেষ ক'রে ফেলুন।"

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কাটাকুটি ও ড্রেসিং চলল, মহাপুরুষ দিব্য ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটি কাতরোক্তিও বাহির হইল না।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা দিল চরম সংকট, চিকিৎসক ও সেবকেরা বুঝিলেন, তাঁহাদের এত কিছু সেবাযত্ন সবই এবার ব্যর্থ হইতে যাইতেছে। রোগীকে আর বাঁচানো সম্ভবপর নয়। শুধু সর্বমঙ্গলার মন্দিরে নয় সারা কুমারখালি গ্রামে নামিয়া আসে আসন্ন শোকের কৃষ্ণছায়া।

১৩২০ সালের ১১ চৈত্র। চতুর্দশীর তিথিটি পূর্বদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। শিবচন্দ্রের শয্যার পাশে পত্নী, পরিজন ও ভক্তশিষ্যেরা বিষন্ন বদনে দাঁড়াইয়া আছেন। অনেকেই অশ্রুমোচন করিতেছেন।

শিবচন্দ্র কহিলেন, 'কাঁদবার সময় তোমরা অনেক পাবে, সে সব পরে হবে। অমাবস্যা পড়ে গিয়েছে, আর মোটেই দেরি ক'রো না, মা-সর্বমঙ্গলার পুজো যথারীতি সম্পন্ন ক'রে ফেল।"

পূজা সাঙ্গ হইল কহিলেন, "এবার সবাই মিলে আমায় ধরাধরি ক'রে বাইরে বিল্বমূলে নিয়ে শুইয়ে দাও।"

শিবচন্দ্রের নির্দেশ মতো তাঁহার পরমাশ্রয় বাণলিঙ্গটি আনিয়া রাখা হইল তাঁহার বক্ষোদেশে। আর ইষ্টবিগ্রহ সর্বমঙ্গলাকে স্থাপন করা হইল অদূরে নয়নসমক্ষে।

মা সর্বমঙ্গলার দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহাসাধক উচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকিয়া উঠেন, —"মা—মা, তারা, তারা—ব্রহ্মময়ী।" বজ্রকঠোর সিদ্ধকৌল শিবচন্দ্র এবার যেন মায়ের কোলের, আদরের শিশুটি হইয়া গিয়াছেন। মা-সর্বমঙ্গলার মুখপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার বদনমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে দিব্য জ্যোতির আভা। তারপর নয়ন দুটি ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া আসে, ব্রহ্মময়ীর আদরের দুলাল, মাতৃমন্ত্রের সিদ্ধসাধক শিবচন্দ্র নরদেহ ত্যাগ করেন। ভারতের কৌল সাধনার আকাশ হইতে স্খলিত হয় একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ষদ, তাঁহার তত্ত্বের ধারক বাহক এবং রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্যতম নেতা। অধ্যাত্ম-শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য হস্তের স্পর্শে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হন তিনি, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্যা, মনীষা, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠে তাঁহার সাধনজীবন। এই জীবনের আলোয় আলোকিত হইয়া উঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত শত মুমুক্ষু নরনারী।

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও কুশলতা নিয়া গুরু রামকৃষ্ণের বাণী ও বেদান্তের পরমতত্ত্ব প্রচার করেন অভেদানন্দ। পূর্বসূরী ও গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপের জনমানসের সম্মুখে হিন্দুধর্মের শাশ্বত রূপটি তুলিয়া ধরেন, সৃষ্টি করেন অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব ও আদর্শের ভাবতরঙ্গ। অভেদানন্দ এই তরঙ্গকে আমেরিকার দিকে দিকে ছড়াইয়া দেন, নবসৃষ্ট আন্দোলনকে দাঁড় করান সুদৃঢ় ভিত্তিতে। মাতৃভূমি ভারতের ও ভারত-ধর্মের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তিনি সেখানে গড়িয়া তোলেন। ভারতে ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসের পক্ষে তাই প্রবর্তক ও আচার্য অভেদানন্দকে কোনোদিন বিস্মৃত হইবার উপায় নাই।

অভেদানন্দের পিতা রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন প্রখ্যাত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর কৃতী শিক্ষক। সৎ এবং বিদ্বান্ বলিয়া লোকে তাঁহাকে সম্মান করিত। জননী নয়নতারার চরিত্রে ধর্মভাব খুব প্রবল ছিল, কালীঘাটের মন্দিরে প্রায়ই তিনি পূজা দিতে যাইতেন, দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাইতেন একটি ধার্মিক পুত্রের জন্য। দেবী তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তাঁহার অঙ্কে আবির্ভূত হয় এক প্রিয়দর্শন শিশুপুত্র। দেবীর কৃপায় জন্ম, তাই এ শিশুর নাম রাখা হয়, কালীপ্রসাদ।

কিশোর বয়স হইতেই কালীপ্রসাদের জীবনে দেখা যায় বুদ্ধিমত্তা ও মেধা প্রতিভার বিকাশ। ক্লাসের পরীক্ষায় প্রায়ই ভালো ফল করিতেন, এবং পারিতোষিক ইত্যাদি পাইতেন। অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজীতে তাঁহার অধিকার জন্মে, জিজ্ঞাসু তরুণ, বহুতর গ্রন্থ এসময়ে পড়িয়া ফেলেন।

উইলসনের রচিত ভারতের ইতিহাসে আচার্য শঙ্করের কথা পাঠ করিলো কালীপ্রসাদ। অদ্বৈত বেদান্তের দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন শঙ্কর। কালীপ্রসাদের মনে জাগিয়া ওঠে উদ্দীপনা, ভাবেন, বড় হইয়া এমনি দুর্ধর্ষ পণ্ডিত ও দার্শনিক তিনি হইবেন।

অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের উৎসাহ ছিল তাঁহার প্রচুর। তাই এই বয়সেই জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা, এবং হোর্সেল, গ্যানো, লুইস হ্যামিলটনে প্রভৃতির বই-এর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছে। এই সঙ্গে কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা এবং ভট্টি-কাব্যের অধ্যয়নও চলিয়াছে। বুঝুন আর না-ই বুঝুন গোপনে গীতা অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এ গ্রন্থের তত্ত্ব আয়ত্ত প্রয়াসী হন।

বাংলার দিকে দিকে তখন প্রাণের স্পন্দন দেখা যাইতেছে। রাজনীতি, ধর্ম এবং সংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তরা কলিকাতার পার্কে পার্কে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়া বেড়াইতেছেন। আর তরুণেরা সব মাতিয়া উঠিয়াছেন, দলে দলে যোগ দিতেছেন এই সব সভায়। কালীপ্রসাদও সুযোগ পাইলেই কোনো কোনোটিতে গিয়া উপস্থিত হন, তরুণ চিত্ত নূতন স্বপ্ন নূতন উদ্দীপনায় উচ্ছল হইয়া উঠে।

অ্যালবার্ট হলে একসময়ে প্রসিদ্ধ বক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি পাতঞ্জলির যোগসূত্র ও যোগসাধনা সম্বন্ধে ভাষণ দিতেছিলেন। কালীপ্রসাদ এই ভাষণ শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠেন। স্কুলের জলখাবারের পয়সা জমাইয়া কিনিয়া ফেলেন এক খণ্ড পাতঞ্জল দর্শন কিন্তু এবয়সে ঐ কঠিন দর্শনতত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার কই।

ভাবিয়া চিন্তিয়া শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, "কহিলেন, আপনি যদি দয়া ক'রে এ বই-এর সূত্রগুলি আমায় বুঝিয়ে দেন তবে আমি কৃতার্থ হই।"

তর্কচূড়ামণি খুশী হইয়া উঠেন, বলেন, বাবা এ বয়সে তোমার যোগসূত্র পাঠ করবার ইচ্ছে হয়েছে এতে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি। আমার সময় থাকলে অবশ্যই তোমায় আমি সাহায্য করতাম। কিন্তু বক্তৃতার কাজ নিয়ে সদাই আমি ব্যস্ত তার ওপর এত লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হচ্ছে। আমার হাতে যে সময় নেই।'

কালীপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি কহিলেন, বাবা, তুমি এক কাজ করো। কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে যাও। আমার নাম ক'রে তাঁকে বল, তিনি নিশ্চয়ই রাজী হবেন।"

কালীবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি কহিলেন, 'তোমার মতো ছোট ছেলেদের এ ইচ্ছে হয়েছে, এতো খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি যে এসময়ে পাতঞ্জল দর্শনের বাংলা অনুবাদ করছি। সময়ের বড় অভাব। তা হোক, বাবা, তুমি এক কাজ করো, স্নানের আগে রোজ একটি সেবক বেশ কিছুকাল আমায় তেল মাখায়। রোজ সে সময়ে তুমি এসো, কিছু কিছু সূত্র আমি তোমায় বুঝিয়ে দেবো।

কালীপ্রসাদ তাহাতেই রাজী। কিছুদিন বেদান্তবাগীশের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে 'শিবসংহিতা' তিনি পাঠ করিয়াছেন। হঠযোগ, প্রাণায়াম ও রাজযোগের পদ্ধতি এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কালীপ্রসাদ এসব অভ্যস্ত করার জন্য মহাব্যগ্র। কিন্তু শুধু বই পড়িয়া তো কোনো কাজ হইবে না এই ধরনের সব বইএতেই লেখা রহিয়াছে— সিদ্ধগুরুর সাহায্য ছাড়া যোগসাধন সম্ভব নয়।

যোগীগুরু কোথায় পাওয়া যায় ? কালীপ্রসাদের অন্তরে সেদিন উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে এই প্রশ্নটি। অনেকের কাছে এ সম্পর্কে খোঁজখবরও নিতে থাকেন।

তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া সহপাঠী এক বন্ধু কহিলেন, ভাই, আমি কিন্তু এক সিদ্ধ-পুরুষের সন্ধান জানি। খুব বড় যোগী, দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। তাঁর কোনো ভড়ংটি নেই। শুনেছি শহরের গণ্যমান্য লোকেরা তাঁর কাছে যাতায়াত করেন। সেখানে গেলে হয়ত তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

অতঃপর একদিন কালীপ্রসাদ পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন সেখানে নেই কলিকাতার এক ভক্তের গৃহে গিয়াছেন।

ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় তখন সেখানে উপস্থিত। পূর্বে সে আরো দুই-চারবার ঠাকুরের কাছে আসিয়াছে। কালীপ্রসাদকে সে উৎসাহিত করিয়া বলিল, 'এসো, এবেলা এখানে মায়ের প্রসাদ খেয়ে আমরা অপেক্ষা করি। পরমহংসদেব রাত্রে ফিরবেন। তখন তুমি তাঁর দর্শন করো তোমার মনের কথা খুলে বলো।"

রাত্রে বাড়িতে ফেরা হইবে না বলে না, বাবা দুশ্চিন্তায় থাকিবেন। কালীপ্রসাদ

ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শশী তাঁহাকে সাহস দিল, "আমার তো এরকম মাঝে মাঝেই হয় দক্ষিণেশ্বরে এসে আর কলকাতায় ফেরা হয় না। বাড়িতে সবাই ভেবে অস্থির হন। তা কি আর করা যাবে, বল। সাধু দর্শনে এসে, শেষদর্শন না ক'রে তো ফেরা ঠিক নয়।"

কালীপ্রসাদ অপেক্ষা করিল। গভীর রাত্রে পরমহংসদেব ফিরিয়া আসিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়াই প্রবেশ করিলেন নিজের কক্ষে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকুর কালীপ্রসাদকে কাছে ডাকাইয়া নিলেন। ভক্তিভরে প্রণাম সারিয়া নিয়া কালীপ্রসাদ সম্মুখস্থ একটি মাদুরের উপর বসিলেন। নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন গৌরকান্তি, সৌম্যদর্শন এই মহাপুরুষের দিকে।

স্নিগ্ধস্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কতদূর পড়েছো ?"

কালীপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, এণ্টাস ক্লাসে পড়ছি।"

"সংস্কৃত জানো ? কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়েছো।"

"রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এসব কাব্য, আর গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, শিবসংহিতা পড়া হয়েছে।"

"বেশ, বেশ।" বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপ্রসাদকে আশীর্বাদ জানাইলেন। তারপর উত্তরের বারান্দায় ডাকিয়া নিয়া গিয়া নিভৃতে সম্পন্ন করিলেন একটি বিশেষ ধরনের অলৌকিক ক্রিয়া। উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ এ ঘটনাটির প্রামাণ্য বিবরণ নিজের আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন :

—আমি যোগসাধনে উপবিষ্ট হইলে পরমহংসদেব আমায় জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। আমি জিহ্বা বাহির করিলে তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা জিহ্বায় একটি মূলমন্ত্র লিখিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত দ্বারা বক্ষস্থলের ঊর্ধ্বদিকে শক্তি আকর্ষণ করিয়া মা কালীর ধ্যান করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়া কাষ্ঠবৎ অবস্থান করিতে লাগিলাম এবং এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন জগতের সমস্ত বিষয় ভুল হইয়া গেল। এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না।

—কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব আমার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি নিম্নদিকে নামাইয়া আনিলেন। তখন আমার বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং অপূর্ব নির্মল এক আনন্দস্রোতে সমগ্র শরীর পূর্ণ হইয়া গেল।

—আমার সেই অবস্থা দেখিয়া পরে রামলালদাদা ও গোপালমা বলিয়াছেন "কি আশ্চর্য। তোমাকে স্পর্শ করামাত্র তুমি কাষ্ঠবৎ ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলে।" যাহা হউক, আমি গভীর ধ্যানে কি অনুভব করিয়াছিলাম পরমহংসদেব সস্নেহে আমায় জিজ্ঞাসা করিলে আমি সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি শুনিয়া আনন্দে হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন . 'তোমার কি বিবাহ করবার ইচ্ছা আছে ?" আমি বলিলাম "না।" তখন পরমহংসদেব বলিলেন "তুমি বিবাহ করো না।" তাহার পর কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তাহা তিনি শিক্ষা দিয়া বলিলেন

> "শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
> দুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি ॥"

উত্তরকালে অভেদানন্দ বলিতেন, "ঠাকুরের এই পদ দু'টির হেঁয়ালীর অর্থ সেদিন

বুঝতে পারবি নি, পরে বুঝেছিলাম। শুচি ও অশুচি, ভালো ও মন্দ এই দুইয়ের পার্থক্য জ্ঞান বজায় থাকিলে অভেদ জ্ঞান স্ফুরিত হয় না, মায়াতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের পূর্ণ উপলব্ধিও সম্ভব হয় না।"

এভাবে শক্তি সঞ্চারিত করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "রোজ রাতে নিজের বিছানায় বসে ধ্যান করবে, ধ্যানে দর্শনাদি হবে। সে সব এখানে এসে আমায় বলে যেয়ো। এবার যাও কালীমন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসো।"

ধ্যান শেষে ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর সস্নেহে কালীপ্রসাদকে কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ খাইতে দিলেন।

এবার তাঁহার কলিকাতায় ফেরার পালা। ঠাকুর মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন "আবার এখানে এসো।" এই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর আসবার পথঘাট, কোথায় কি করিয়া আসা যায়, এসব সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

কালীপ্রসাদ সরল তরুণ, প্রশ্ন করিলেন, "যদি ভাড়া যোগাড় না করিতে পারি তবে কি হবে?"

ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলেন, "যাহোক ক'রে এসে পড়বে, তারপর এখান থেকে তোমার যাতায়াতের ভাড়াটা যোগাড় ক'রে দেওয়া যাবে।"

একটি ধনী ভক্ত এ সময়ে নিজের গাড়িতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছেন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য। তিনি ফিরিবার সময় তাঁহারই গাড়িতে কালীপ্রসাদকে ঠাকুর উঠাইয়া দিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই স্নেহস্নিগ্ধ মূর্তি, এই সুধাময় বাক্যের স্মৃতি, বার বার উঁকি দিতে থাকে তরুণ ভক্ত কালীপ্রসাদের মনের দুয়ারে। এই স্মৃতির মধুর রসে সারা অস্তিত্ব তাঁহার রসায়িত হইয়া উঠে।

এদিকে কালীপ্রসাদের জনক-জননী দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। সারাটা দিন রাত কাটিয়া গেল, তবুও ছেলের কোনো খোঁজ নাই। তবে কি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, অথবা কোনো দুর্ঘটনায় পড়িয়াছে? চারদিকে বহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও পুত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রভাতে হঠাৎ নয়নতারা দেবীর মনে পড়িয়া যায়, কয়েকদিন আগে কালীপ্রসাদ তো তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি কোথায়, কলিকাতা হইতে কতটা দূরে? ধর্মের দিকে যে পুত্রের প্রবল ঝোঁক, একথা জননীর অজানা নাই, ভাবিলেন হয়ত কাহারো সঙ্গে সে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়াছে, কোনো কারণে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই।

পত্নীর মুখে একথা শুনিয়া রসিকচন্দ্র তখনি দক্ষিণেশ্বরের দিকে ছুটিলেন। মন্দিরে পৌঁছিয়াই খোঁজ করিতে গেলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

ঠাকুর কহিলেন, "সে তো কাল এখানেই ছিল। এখানেই খাওয়া-দাওয়া করেছে, শুয়ে থেকেছে। আজ একজনের সঙ্গে গাড়িতে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি।"

এ সংবাদে রসিকচন্দ্র শান্ত হইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের জন্য দেখা দিল আর এক দুশ্চিন্তা। দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা ঠাকুরের কাছে সে আসা-যাওয়া শুরু করিয়াছে, শেষটায় ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া না বসে।

ঠাকুরকে অনুনয়ের সুরে কহিলেন, "কালীপ্রসাদ আমার ছেলে। সে যাতে মন দিয়ে লেখাপড়া করে ঘর-সংসার করে, আপনি দয়া ক'রে তাকে সেই উপদেশ দেবেন।"

মৌল এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ঠাকুর ধোঁয়াটে কথাবার্তা বলিতেন না। পবিত্রভাবে কহিলেন, "আপনার ছেলের ভেতর যোগীর লক্ষণ রয়েছে, যোগ সাধনার জন্য অধীর হয়েও উঠেছে। এ অবস্থায় তাকে বিয়ে দিলে, তার ফল কি ভাল হবে?"

রসিকচন্দ্র উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, পিতামাতার সেবাই তো পরমধর্ম। তাই নয় কি?"

"তা বটে, তা বটে", বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উত্তরকালে অভেদানন্দ বলিতেন, "ঠাকুর যে আসলে পিতামাতার সেবা বলতে জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতার সেবা বুঝে নিয়েছিলেন এবং সেইজন্যই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, আমার বাবা তা তখন বুঝে উঠতে পারেন নি।"

প্রথম দর্শনের পর হইতেই কালীপ্রসাদের মন রামকৃষ্ণ চরণে বাঁধা পড়িয়া যায়। বাড়িতে বসিয়া দিনরাত তাঁহারই কথা, তাঁহার বিপুল স্নেহ ভালবাসা ও কৃপার কথা ভাবিতে থাকেন। লেখাপড়ায় আজকাল আর তাঁহার মনোযোগ নাই, বাড়ির কোনো কিছুতেই নাই পূর্বেকার সেই আকর্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মতো রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রতিরাত্রে শয্যায় বসিয়া ধ্যান করেন, কত বিচিত্র কত উদ্দীপনাময় অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি তাঁহার হইতে থাকে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কালীপ্রসাদের জীবনের ভিত্তিমূলে এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়াছেন। ফলে বিরাট এক পাষাণপিণ্ড হইয়াছে অপসারিত, আর উন্মোচিত হইয়াছে দিব্যরসের অমৃত নির্ঝর।

তাঁহার এ ভাবান্তর পিতা ও মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। উভয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কাছে আর তাঁহার যাওয়া চলিবে না। কিন্তু কালীপ্রসাদকে নিরস্ত রাখা আর সম্ভব হয় নাই।

এক একদিন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য কালীপ্রসাদ অধীর হইয়া উঠিতেন। যে কোনো উপায়ে উপস্থিত হইতেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের চরণতলে।

যাতায়াতের ভাড়া ঠাকুরই প্রায় সময়ে সংগ্রহ করিয়া দিতেন। বিদায়কালে স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিতেন, "তুই না এলে, তোকে না দেখলে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রোজই তোকে দেখতে ইচ্ছে হয়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কালীপ্রসাদ কহিতেন, "আমিও রোজই আপনার দর্শনের জন্য অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু বাবা মা আমার কেবলই নিষেধ করেন।"

স্মিতহাস্যে ঠাকুর বলিতেন, "কাউকে জানাবি নে, গোপনে চলে আসবি হেথায়। হাতে পয়সা না থাকলে, এখান থেকে নিয়ে নিবি।"

দেবমানব ঠাকুরের প্রেমঘন মূর্তি আর মধুময় কণ্ঠস্বর। কালীপ্রসাদ কখনো ভুলিতে পারেন না। এ কি অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা স্নেহ প্রেম তাঁহার? এ ভালোবাসায় স্বার্থের লেশমাত্র নাই। ভালোবাসার একমাত্র লক্ষ্য কালীপ্রসাদের ধর্মজীবনকে গড়িয়া তোলা, মুক্তির অমৃতলোকে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া। মর্তের মানুষের মধ্যে এ বস্তু কখনো খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

একদিন কালীপ্রসাদের পিতা সারাদিন বাড়ির সদর দরজায় তালা লাগাইয়া

রাখিলেন। পুত্র যাহাতে বাহিরে যাইতে না পারে। বিকালে তিনি ভাবিলেন দিন প্রায় শেষ হইতে চলিল, আজ এমন অসময়ে কালীপ্রসাদ আর দূরের পথ দক্ষিণেশ্বরে যাইবে না। সদর দরজাটি তাই খুলিয়া দেওয়া হইল। সুযোগ পাওয়ামাত্র কালীপ্রসাদও উন্মাদের মতো ছুটিয়া বাহির হইলেন রাজপথে। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া লুটাইয়া পড়িলেন ঠাকুরের চরণতলে। হৃদয় তাঁহার দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্মিতহাস্যে এক দৃষ্টে এতক্ষণ নূতন ভক্তের দিকে চাহিয়া আছেন। এবার প্রসন্নমধুর কণ্ঠে কহিলেন, "ঠিক হচ্ছে। ওরকমই করবি। ঈশ্বরের জন্য এমনি ব্যাকুলতাই তো চাই। সুযোগ পেলেই এসে উপস্থিত হবি। যা কিছু দর্শন হবে, অনুভূতিতে আসবে, সব এখানে বলে যাবি।'

ধ্যানের সময় কালীপ্রসাদ প্রায়ই বহুতর দিব্যমূর্তি দর্শন করিতেন। একদিন দেখিলেন, অন্তর আকাশ জোড়া বিস্ফারিত রহিয়াছে এক দিব্যচক্ষু। আর একদিন দেখিলেন, তাঁহার আত্মা যেন দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া মুক্ত বিহঙ্গের মতো মহাশূন্যে বিচরণ করিতেছে। মনোলোকে ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে একসময়ে ইহা এক পরম রম্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অসংখ্য দেব-দেবী অবতার ও সিদ্ধপুরুষ সেখানে বিরাজিত। এই দর্শনের কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইলে তিনি কহিলেন, "তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়েছে।"

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সত্যকার রসরসিক। দিনের পর দিন নানা রস নানা ভাববৈচিত্র্য তাঁহার জীবনলীলায় প্রকট হইয়া উঠিত, আর তরুণ কালীপ্রসাদ আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিতেন এই লীলার সুধারস। জীবন কথায় তিনি লিখিয়াছেন, "কখনও তিনি ভাবাবেশে হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন ও নাচিতেন এবং কখনও বা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা মধুরকণ্ঠে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের রচিত গান করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। কখনও কখনও তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কীর্তন করিতেন। কখনও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন রচিত পদাবলী গান করিতেন এবং আপন ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানে নূতন নূতন আখর দিতেন। কখনও বা পরম বৈষ্ণব তুলসীদাস যেইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপে রামসীতার লীলা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবেশে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাইতেন। সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব পরমহংসদেবের জীবনে প্রত্যহ প্রতিফলিত হইত এবং সকলকে তিনি 'যত মত তত পথ' এই উদার সার্বভৌমিক ভাবের উপদেশ দিতেন। আমি সেই সকল উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপূর্ব আনন্দে মগ্ন থাকিতাম।

দিনের পর দিন ঠাকুরের কত করুণালীলাই না উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কালীপ্রসাদের নয়নসমক্ষে। সে-দিন রাম দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ করিয়াছেন। অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা ঘরে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসানো হইল। ঠাকুর চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কই, নরেন কই, তাকে তো দেখছি না।"

রাম দত্ত কহিলেন, "নরেন খুব অসুস্থ, তাই আসতে পারে নি। মাথায় খুব যন্ত্রণা, চোখ খুলতে পারছে না।"

ঠাকুর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নির্দেশে তখনি কালীপ্রসাদ প্রভৃতি

নরেনের বাড়ি গিয়া হাজির। কহিলেন, "ঠাকুর তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছেন, তাড়াতাড়ি সেখানে চল।"

নরেন একটি ভিজে গামছা মাথায় দিয়া নিচের ঘরে শুইয়া আছেন। কহিলেন, দ্যাখ আমার অবস্থা। কি ক'রে যাই? আলোয় চোখ মেললেই মাথায় দারুণ যন্ত্রণা হয়।"

কালীপ্রসাদ প্রভৃতির চাপে পড়িয়া নরেনকে অগত্যা যাইতে হইল। মাথায় একটি ভেজা গামছা চাপা দিয়া বন্ধুদের হাত ধরিয়া কোনোক্রমে উপস্থিত হইলেন রাম দত্তের ভবনে।

নরেন আসিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দের অবধি নাই। কাছে ডাকিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "কিরে, তোর মাথায় কি হয়েছে?"

কি আশ্চর্য, ঠাকুরের হস্তটি মাথায় রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে নরেনের তীব্র যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। স্বাভাবিক ভাবে চোখ মেলিতেও তিনি সক্ষম হইলেন।

নরেন সবিস্ময়ে কহিলেন, "মশায়, আপনি কি করলেন, আর আমার মাথার বেদনা হঠাৎ কোথায় চলে গেল!"

ঠাকুর তখন মিটিমিটি হাসিতেছেন। একটু পরে নরেনকে কহিলেন, "এবার গান গেয়ে শোনা দেখি।"

নরেন আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন, তানপুরার সুর দিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেলেন ধ্যানের গভীরে। নরেন কিন্তু পরমানন্দে একের পর এক গান গাহিয়াই চলিয়াছেন। দেখিয়া কে বলিবে, একটু আগেই তিনি শয্যায় শুইয়া তীব্র যাতনায় ছটফট করিতেছিলেন?

নরেনের গানে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মনে জাগিয়া উঠিল দিব্যভাবের প্রবল উদ্দীপনা। প্রত্যক্ষদর্শী তরুণ সাধক কালীপ্রসাদ সেদিনকার এই দৃশ্যটির চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন, "পদকীর্তন শুনিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সমবেত ভক্তগণও ভাবে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরমহংসদেবের মুখে অপূর্ব জ্যোতি ও প্রসন্ন হাসি বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পর যখন আবার 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে' বলিয়া কীর্তন আরম্ভ হইল, তখন পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কোমরে কাপড় জড়াইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় নাচিতে আরম্ভ করিলেন। উদ্দাম সেই নৃত্য, অথচ মুখে প্রসন্ন হাসি ও ভাব। ইহা দেখিয়া মনে পড়ে, শ্রীচৈতন্যের নৃত্য দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণের কথা। তাঁহারা বলিয়াছেন, 'গোরা আমার মাতাহাতী।' সেইদিন আমরা সেই মত্তহস্তীর ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম।"

নরেন প্রভৃতি তরুণ ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের অহেতুক স্নেহ ও প্রেম, ইষ্টগোষ্ঠী ও কীর্তনানন্দ দিনের পর দিন কালীপ্রসাদ প্রত্যক্ষ করেন, আর অভিভূত হইয়া যান।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেমনি প্রতিভাধর নট ও নাট্যকার, তেমনি ছিলেন উদ্দাম প্রকৃতির। কালীপ্রসাদ শুনিয়াছেন, ইতিপূর্বে গিরিশ ঠাকুরকে তেমন পাত্তা দেন নাই, মদের ঘোরে কয়েকবার তাঁহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালও দিয়াছেন। বীতরাগভয়ক্রোধ ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। অন্তরঙ্গ ভক্তদের বরং বলিয়াছেন, "মদ খেয়ে অমন আবোল-তাবোল বলছে। থাক্ না শালা কদিন থাকে।"

ঠাকুরের অগাধ স্নেহ-প্রেমের আকর্ষণ অতঃপর গিরিশকে নরম করিয়া আনে, পরিণত করে একনিষ্ঠ ভক্তরূপে।

সেদিন দুপুরবেলায় কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। দেখিলেন, একটু পরেই গাড়ি করিয়া গিরিশ ঘোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "ঠাকুর আমায় কৃপা ক'রে উদ্ধার করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিমধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন, মা-ভবতারিণীর সহিত চলিতেছে তাঁহার অন্তরঙ্গ সংলাপ। মৃদুস্বরে ঠাকুর কহিতেছেন "বীরভক্ত গিরিশ ওসব পারবে না মা।"

ক্রমে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে, স্নেহপূর্ণ স্বরে গিরিশকে বলেন, "মা তোমায় বললেন বকলমা দিতে। তাই করো। তুমি আমার বকলমা দাও, সব ভার সঁপে দাও আর কিছু তোমায় ভাবতে হবে না।"

সাশ্রুনয়নে ভক্ত গিরিশ তাহাই করিলেন, ঠাকুরের অভয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পতিত হইলেন তাঁহার চরণতলে।

কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যক্ষ করেন এমনি সব বিস্ময়কর ঘটনা, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা ও অধ্যাত্মশক্তির মাহাত্ম্য অনুভব করেন সারা মনপ্রাণ দিয়া।

তরুণ সাধক কালীপ্রসাদ স্বভাবতই খুব ধ্যানপরায়ণ ছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপা, আর সাধন সম্পর্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ, তাঁহার এই ধ্যানপ্রবণতাকে চালিত করে উচ্চতর সিদ্ধি ও উপলব্ধির দিকে। এসময়কার একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতার তথ্য তাঁহার আত্মচরিতে আমরা পাই। তিনি লিখিয়াছেন

'দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার ছোট ঘরটিতে বসিয়া আছেন এবং আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পদসেবা করিতেছি। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে লাভ করা যায়!" আমি বলিলাম, পাতঞ্জলদর্শনে একটি সূত্র আছে ' তীব্র সম্বেগনা মাসন্নঃ—অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে তীব্র সংবেগ (শ্রদ্ধা, বীর্যাদি) থাকে তাহাদের শীঘ্র সমাধি হয়। তিনি আমাকে সহাস্যে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে।' তাহার পর তিনি আমার কপালে নখদ্বারা জোরে চিমটি কাটিয়া বলিলেন, এ-স্থানে মন স্থির করবি। ন্যাংটা (তোতাপুরী) আমার কপালে একটা কাঁচখণ্ড বিদ্ধ ক'রে সেই বিন্দুতে মন স্থির করতে বলেছিল। আমি সে রকম করলে আমার নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না। আমিও তিনদিন ও তিন রাত্রি সমাধিস্থ হয়ে ছিলাম। আমার অবস্থা দেখে ন্যাংটা বলেছিল, ক্যা দৈবী মায়া হ্যায়। চাল্লিশ বরষ সাধন করকে হামকো জো নির্বিকল্প সমাধি মিলা হ্যায়, উন তিন রোজমে সিদ্ধ কর লিয়া ?—অর্থাৎ কি দৈবী মায়া! আমি চল্লিশ বছর কঠোর সাধন ক'রেও যে সমাধি লাভ করতে পারি নি, রামকৃষ্ণ তা তিন দিনে লাভ করল।

"তাহার পর পরমহংসদেব আমাকে পঞ্চবটীর নিচে বসিয়া ধ্যান করিতে আদেশ দিলেন। তখন হরিশ নামক অপর একজন সেবক আসিল। আমি পরমহংসদেবের সেবার ভার তাকে দিলাম এবং পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবটীর তলায় ধ্যান করিতে অগ্রসর হইলাম। সেইখানে আমি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে মনস্থির করিয়া ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কতক্ষণ সমাধিস্থ ছিলাম জানি না। তবে ধীরে ধীরে বাহ্য-

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমি উঠিয়া আসিয়া পরমহংসদেবের চরণে প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।"

সাধনার গোড়ার দিকে, বিশেষত সাধকদের তরুণ বয়সে, তত্ত্ব ও দর্শনের কত জটিল প্রশ্নই না মনে আসিয়া ভিড় করে। কালীপ্রসাদ স্বভাবতই মননশীল, তাই অনেক প্রশ্নই তাঁহার মনে অবসারিত হইয়া উঠিত। সব প্রশ্নেরই জবাব মিলিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে. নিতান্ত আপনার জনরূপে, পিতা ও সখারূপে সতত তিনি তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতেন, জাগাইয়া তুলিতেন ঈশ্বর সম্বন্ধে নূতনতর উদ্দীপনা।

বেদান্তের তত্ত্ব, ব্রহ্ম ও মায়ার তত্ত্ব ঠাকুর তাঁহার নবীন ভক্ত-শিষ্যদের বুঝাইয়া দিতেন প্রাঞ্জল ভাষায়, অতি সহজভাবে কহিতেন, "ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম কেমন জানিস্? যেমন সাপ স্থির হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আবার সেই সাপ যখন এঁকে-বেঁকে চলছে, তখন সগুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম অখণ্ড স্থির সমুদ্র। তাতে তরঙ্গ অথবা ক্রিয়া নেই, অচল ও অটল সুমেরুবৎ। মায়াশক্তি ব্রহ্মে যেন সুপ্তাবস্থায় লীন হয়ে থাকে। সেই অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎও মহাপ্রলয়ে লীন হয়ে থাকে। মায়াশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠলে সেই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে তরঙ্গ হতে থাকে। সেই অবস্থাকে বেদান্তশাস্ত্রে সগুণব্রহ্ম বলা হয়েছে। তখন ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ হয় এবং সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। এই সগুণব্রহ্মই 'অর্ধনারীশ্বর' 'হরগৌরী' নামে শাস্ত্রে অভিহিত।"

কালীপ্রসাদ প্রভৃতি যুবক ভক্তদের উৎসাহিত করিতে গিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলিতেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" অর্থাৎ, সাধকের পক্ষে দরকার আগে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহার ফলে সংসারজীবনের কাজকর্মে থাকিয়াও মানুষ অবিদ্যা ও অজ্ঞানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

কালীপ্রসাদ একদিন প্রশ্ন করিলেন ঠাকুরকে, "জীব আর ব্রহ্মে পার্থক্য কি?"

উত্তর হইল,—"নদীর স্রোতে জলের উপরে একটা লাঠি এড়োভাবে ধরলে মনে হয় জল দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিচের জল সেই একই জল রয়েছে। ঠিক সেই রকম, অহং লাঠিটা তুলে ধরার ফলে জীব ও ব্রহ্মকে পৃথক মনে হয়। কিন্তু আসলে কোনোই ভেদ নেই। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, সব ভেদ দূর হয়ে যায়।"

আরও বলিতেন, "যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। ঈশ্বরের সাকার রূপও জানতে হবে। সাধক যে রূপ চিন্তা বা ধ্যান করে. সেই রূপই দর্শন করে। পরে অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যায়। তখন সাকার নিরাকার হয়ে যায়।"

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বীজটিও এই সময়ে ঠাকুর রোপণ করিয়া দেন কালীপ্রসাদ এবং অন্যান্য তরুণ ভক্তদের সাধনজীবনে। বলেন, "যিনি সর্ব ধর্মমতের সমন্বয় করতে পারেন. তিনিই খাঁটি লোক অন্য সবাই একঘেয়ে। বেদে যাঁকে 'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই বলেছে, 'ওঁ সচ্চিদানন্দ শিব', আর পুরাণে বলেছে 'ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ'। যত মত তত পথ। তাঁকে পাবার জন্য নানা মত ও নানা পথ, কিন্তু লক্ষ্য একটাই।"

বেদ বেদান্তের তত্ত্ব ও সিদ্ধ সাধকদের উপলব্ধ সত্য ঠাকুর অতি সহজ সরলভাবে ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেন এবং এ তত্ত্বগুলি তাঁহাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকিত।

অভেদানন্দ বলিয়াছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির প্রসঙ্গ তুলিয়া আলোচনা করিতেন। কিন্তু তখন আমি বা আমরা কেহই তাহার যথার্থ অর্থ

বুঝিতে পারিতাম না। আমরা বুঝিতাম, সচ্চিদানন্দব্রহ্ম সকলেব মধ্যেই বিরাজমান, সুতরাং কেহ ছোট বা বড এইরূপে চিন্তাব কোন অর্থ নাই। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরেব পদ-সেবা করিতেছি। নিকটে কেহই ছিল না। আমি তাহাকে একাকী পাইয়া সেই জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন, 'ব্রহ্ম সকলেব মধ্যে আছেন সত্য, কিন্তু সবার শক্তির প্রকাশে তারতম্য আছে। এই প্রকাশের তারতম্যেই ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি হয়। জীবকোটি নিজে মুক্তি পান, অপরকে মুক্তি দিতে বা উদ্ধার করতে তিনি পারেন না। কিন্তু যিনি নিজে উদ্ধার লাভ ক'রে অপরকে উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরকোটি। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির মধ্যে এই প্রভেদ, কেউ কেউ আবার ঐ শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন।'

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জীবকোটি কি তাহলে ঐ শক্তি পায় না? জীবকোটি কি ঈশ্বরকোটির স্তরে কখনো উঠতে পারে না?'

"শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, 'হ্যাঁ পারে। জীবকোটি যদি জগন্মাতার নিকট অপরকে উদ্ধার করার জন্য শক্তি প্রার্থনা করে তবে মা তাকে তা দেন।' এই উপলক্ষে তিনি একটি দৃষ্টান্তও দিলেন। তিনি বলিলেন, 'বনের মধ্যে চারদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা ছিল। কিন্তু কোনো লোক হয়তো ভিতরের দিকে লক্ষ্য ক'রে এবং আনন্দে হা হা ক'রে হেসে পড়ে যায়। এ হল জীবকোটি। কিন্তু যার বিশেষ শক্তি আছে, সে দেওয়ালে উঠে ভিতরের জিনিস দেখে ফিরে আসে এবং আর আর সঙ্গীদের খবর দিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। এ হল ঈশ্বরকোটি'[১]।"

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। এ সময়ে হঠাৎ একদিন ধরা পড়িল, শ্রীরামকৃষ্ণের গলদেশে ক্যান্সার হইয়াছে। শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগীদের উদ্বেগের অবধি রহিল না। কিছুদিন পরে চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে শ্যামপুকুরের একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। তাছাড়া, সেবা শুশ্রূষার জন্য দেবী সারদামণিকেও সেখানে নিয়ে আসা হয়।

কালীপ্রসাদও এসময়ে চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে চলিয়া আসেন, প্রাণমন উৎসর্গ করেন তাঁহার সেবা পরিচর্যায়। নরেন প্রায় সময়েই ঠাকুরের শয্যার পার্শ্বে থাকিতেন। এজন্য ভক্তেরা রসিকতা করিয়া এই দুই বিশিষ্ট সেবককে বলিতেন,—পার্সোনাল্ আতাসে টু হিজ্ হোলিনেস্ শ্রীরামকৃষ্ণ।

এসময়ে ঠাকুরের দিব্য ভাব এবং ভগবত্তার ভাবটি দিনের পর দিন দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতে থাকে কালীপ্রসাদ এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তদের দৃষ্টিতে।

কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক খ্রীষ্টান ভদ্রলোক সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে ঐ খ্রীষ্টানটি যীশুখ্রীষ্টের লীলা ও মাহাত্ম্য কিছু কিছু বর্ণনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মনে জাগিয়া উঠিল দিব্যভাবের উদ্দীপনা, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভাবাবেশে রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খ্রীষ্টান ভদ্র লোকটি তখন ঠাকুরকে যেন দর্শন করিতেছেন তাঁহার ইষ্টদেব খ্রীষ্টরূপে। ভক্তিভরে তিনি স্তব শুরু করিয়া দিলেন।

তারপর তিনি কহিলেন, আপনারা "এঁকে চিনতে পারছেন না। ইনি আর আমাদের খ্রীষ্ট অভিন্ন। আজ এঁর যে ভাব দর্শন করলাম, প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঠিক এমনিতর ভাব

১ আমার জীবনকথা : স্বামী অভেদানন্দ

হত। আমি এর আগে খ্রীষ্ট এবং পরমহংসদেব, এ দুজনকেই স্বপ্নে দেখেছি। ইনিই বর্তমান যুগের যীশুখ্রীষ্ট।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও সেবকেরা একথা শুনিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন।

সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন। কালী-প্রসাদ ঠাকুরের পাশে অদূরে উপবিষ্ট। এসময়ে উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় সে সম্পর্কে উত্তরকালে অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে বলিলেন, আমি আপনাকে ঢাকায় এই রকম স্থূল শরীরে দেখেছি। আপনি সেখানে গিয়েছিলেন কি ?"

"পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনার ভক্তির জোরে আপনি আমায় দেখেছেন।' এই কথা বলিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং বিজয়কৃষ্ণের বক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপন করিলেন। তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া ভাবে, অশ্রুজলে, ভাসিতে লাগিলেন। আমরা সকলে অবাক্ হইয়া সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম তাহা দেবলীলাই বটে।"

সেদিন ছিল কালীপূজার দিন। ভক্তেরা ঠাকুরের পূর্বদিনের নির্দেশমতো পূজার উপচার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কক্ষে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পূজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ঠাকুর আসনে আসিয়া বসিলেন, নিজদেহে বিরাজমানা জগন্মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিজেই অর্পণ করিলেন পুষ্পাঞ্জলি। সঙ্গে সঙ্গে হস্তে প্রকাশিত হইল বরাভয় মুদ্রা। উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন।

প্রধান ভক্ত গিরিশ ঘোষ পাশেই বসিয়া ছিলেন, ঠাকুরের ভগবত্তা ভাবের উদ্দীপন দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের সামনে আজ জীবন্ত মা কালী বিরাজ করছেন। এসো সবাই তাঁরই পূজা করি।"

মাল্য ও পুষ্পচন্দন নিয়া গিরিশ প্রথমে ঠাকুরকে অঞ্জলি দিলেন, উচ্চারণ করিলেন ঘন ঘন জয়-মা, জয় মা রব।

কালীপ্রসাদ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসেবকেরা সবাই আনন্দে অধীর। সোৎসাহে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি, ভক্তিভরে গ্রহণ করিলেন প্রসাদ। স্তবগানের ঝঙ্কারে সারা কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিল।

উত্তরকালে ঠাকুরের এই ভগবত্তা ভাবের দৃশ্যটি বর্ণনা করিয়া স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন, "সে অপূর্ব দৃশ্য এ জীবনে কোনোদিন আমরা ভুলতে পারবো না।"

চিকিৎসায় শ্রীরামকৃষ্ণের তেমন কিছু উপকার হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তারেরা স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন। কাশীপুরে আশি টাকা ভাড়ায় একটি পুরাতন বাগানবাড়ি ভাড়া করা হইল।

ভক্ত সুরেশ মিত্রকে ডাকিয়া ঠাকুর কহিলেন, "এরা গরীব প্রায়ই কেরানী, বেশী টাকা দেবার ক্ষমতা এদের কই ? বাড়ি ভাড়াটা তুমি দিও। সুরেশ মিত্র তখনি রাজী হইয়া গেলেন।

এবার বলরামবাবুকে কহিলেন, "ওগো, তুমি আমার খরচটা দিও। চাঁদার খাওয়া আমি পছন্দ করিনে।" বলরাম সোৎসাহে এ নির্দেশ শিরোধার্য করিলেন।

ঠাকুরের দর্শনের জন্য, সেবাশুশ্রূষার তত্ত্বাবধানের জন্য, গৃহী ভক্তদের অনেকে এখানে আসা শুরু করিলেন। আর ত্যাগী তরুণ ভক্তেরা রহিলেন ঠাকুরের সেবা ও চিকিৎসার সকল কিছু দায়িত্ব নিয়া। একদিন কালীপ্রসাদ ও অন্যান্য সেবক ভক্তদের ঠাকুর কহিলেন, "দ্যাখ্, আমার এই গলার ঘা একটা উপলক্ষ মাত্র। এই সূত্রে তোরা সবাই একত্র হয়েছিস।"

এইভাবে ঠাকুর তাঁহার নিজের অসুখটি উপলক্ষ করিয়া উত্তরকালের রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বীজটি রোপণ করিলেন। শুধু তাহাই নয়, যাহাতে এ বীজ অঙ্কুরিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠে, সযত্নে তাহার পরিবেশও রচনা করিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রনাথ যুবক ভক্তদের অগ্রণী, তাঁহার নেতৃত্বে সবাই পালা করিয়া গ্রহণ করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকার্যের ভার।

নরেন সম্পর্কে, সেদিন সামান্য একটু মন্তব্য আর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে নরেন্দ্রনাথের জীবনকে ঠাকুর প্রবাহিত করিলেন বিধিনির্দিষ্ট খাতে।

নরেন্দ্র রাত জাগিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেন। চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করেন, আবার এই সঙ্গে অবসর সময়ে তৈরী হইতেছেন নিজের আইন পরীক্ষার জন্য।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁহাকে কহিলেন, "দ্যাখ্, তুই যদি উকিল হোস্, তবে তো তোর হাতের জল আর আমি খেতে পারবো না। কালীপ্রসাদও সেদিন সেখানে উপস্থিত। দেখিলেন, নরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন, তারপর তখনি নিজের ঘরে গিয়া আইনের বইগুলি একধারে সরাইয়া রাখিলেন। কহিলেন, "আইন পরীক্ষাটা দেওয়া আর হল না।"

যে কাজ করিলে প্রাণপ্রিয় ঠাকুর তাঁহার হাতের জলটুকু পর্যন্ত খাইবেন না, সে কাজ তিনি কি করিয়া করিবেন?

নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ, শরৎ, নিরঞ্জন প্রভৃতি একসঙ্গে সেদিন বেড়াইতেছেন বাগানে। নরেন্দ্র কহিলেন, "ঠাকুর যে কঠিন ব্যাধি নিজ শরীরে নিয়েছেন, মনে হয় তিনি দেহ-রক্ষার সংকল্পই করেছেন। এসো, এখন আমরা প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করি, সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে যাই জপ ধ্যান ও সাধনভজন।"

অভেদানন্দ উত্তরকালে এ সময়কার জীবনের এবং বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথের ও তাঁহার নিবিড় অন্তরঙ্গতার বর্ণনা দিয়াছেন:

—রাত্রিতে আমরা আপন আপন পালা বা কর্তব্য শেষ করিয়া পূর্বের ন্যায় আগুন জ্বালাইয়া ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান, বেদান্ত বিচার, গীতাপাঠ ও শাস্ত্রালাপ করিতে থাকিতাম। তাহার পর শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর ও নির্বাণষট্কের শ্লোকগুলি আবৃত্তি ও তাহাদের অর্থের ধ্যান করিতাম। সেই সময় হইতেই সত্য সত্য আমি ও শরৎ (সারদানন্দ) নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন করিতাম এবং তাঁহার ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। নরেন্দ্রনাথ আমার ও শরতের নাম দিয়াছিল 'ঘেলুয়া' ও 'ভুলুয়া'। তখন কখনও অষ্টাবক্র সংহিতা, যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করা হইত, কখনও বা ভাগবতের 'গোপী-গীতা' আবৃত্তি করা হইত। নরেন্দ্রনাথ সুমধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদী গান, ব্রহ্মসংগীত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর যে সমস্ত গান গাহিতেন সেই সমস্ত গাহিয়া আমাদের সকলকে মাতাইয়া রাখিত। আবার কখনও বা আমরা 'জয় রাধে' বলিয়া সংকীর্তনে মাতিয়া নৃত্য করিতাম।

—নরেন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা প্রায় চারি বৎসরের বড় ছিল। আমি নরেন্দ্রনাথকে সেই অবধি আপন জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভালো বাসিতাম। নরেন্দ্রনাথও আমায় আপনার সহোদরতুল্য ভালোবাসিত। তাহা ছাড়া আমি যে তাহাকে শুধু ভালোবাসিতাম তাহা নহে, তাহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সকল কাজই করিতাম। বলিতে গেলে আমি নরেন্দ্রনাথের ছায়ার মতো সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। এবং নরেন্দ্রনাথ যাহা করিত আমিও নির্বিবাদে তাহা করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যাহা করিতে বলিত, অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা করিতাম।

—নরেন্দ্রনাথ ও আমি জ্ঞানমার্গের 'নেতি নেতি' বিচার করিতাম এবং অদ্বৈত বেদান্ত-মতের একান্ত পক্ষপাতী ছিলাম। নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যদর্শন ও ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিল। ঐ সকল বিষয়ে তাহার সহিত আলোচনা করিতে করিতে আমার জ্ঞান-পিপাসা দিন দিন আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া এই সকল বিষয়ে নরেন্দ্র-নাথকে আমি এত অধিক অনুকরণ করিতাম যে, যখন নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতে বসিত তখন আমিও ধ্যান করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যেমনটি ভাবে ও সুরে মোহমুদগর কৌপীন পঞ্চক বিবেকচূড়ামণি ও অষ্টাবক্র সংহিতা প্রভৃতি আবৃত্তি করিত আমিও তদনুরূপে করিতাম। আমাদের দুইজনের মধ্যে ছিল এক নিবিড় সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক চিরদিন অটুট ছিল।[১]

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তরুণ ভক্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত এবং স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধিকারী। ব্রাহ্মদের মতো জাতের বিচার পূর্ব হইতেই তিনি মানিতেন না এবং সর্বদিক দিয়া ছিলেন অত্যন্ত উদারপন্থী। একদিন কালীপ্রসাদ প্রভৃতিকে কহিলেন, "চলো, তোমাদের কুসংস্কার ভেঙে আসি। পিরুর দোকানের ফাউলকারী রান্না খাইয়ে দিই।"

বন্ধুরা তখনি সায় দিলেন। চমৎকার মুসলমানী রান্না, নরেন্দ্রনাথ উৎসাহের সহিত প্লেটের সবটা উড়াইয়া দিলেন। কালীপ্রসাদ, শরৎ প্রভৃতি নিজেদের কুসংস্কার ভাঙার জন্য, ঘৃণা দূর করার জন্য, নামমাত্র আহার করিলেন।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার তাঁহাদের ডাকাডাকি করিতেছেন। কালীপ্রসাদ তাঁহার সেবার জন্য শয্যার পাশে যাওয়া মাত্র প্রশ্ন করিলেন, "তোরা সবাই কোথায় গিয়েছিলি, বলতো।"

"বিডন স্ট্রীটে পিরুর হোটেলে।"

"কে কে গিছলি ?"

"নরেন, শরৎ, নিরঞ্জন আর আমি।"

"সেখানে কি খেলি ?"

"মুর্গির ঝোল।"

"ক্যামন লাগলো তোদের ?"

"আজ্ঞে, আমার আর শরতের তেমন ভাল লাগে নি। তাই একটুখানি মুখে দিয়ে কুসংস্কার ভাঙলাম।"

উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলেন, "বেশ করেছিস, ভালো হল, তোদের কুসংস্কার সব দূর হয়ে গেল।"

---

১ আমার জীবন কথা স্বামী অভেদানন্দ

এতক্ষণে কালীপ্রসাদের দুশ্চিন্তা দূর হইল. ঠাকুর তবে রাগ করেন নাই বরং বেশ কৌতুক বোধ করিতেছেন তাঁহাদের এই অভিযানের কথা শুনিয়া।

নরেন্দ্রনাথের উৎসাহে কাশীপুর বাগানের পুকুরে কয়েকদিন খুব মাছ ধরার কাজ শুরু হইয়া গেল। ঠাকুরের সেবা পরিচর্যার ফাঁকে ফাঁকে তরুণ ভক্তেরা পুকুরের ধারে আসিতেন, ছিপ হস্তে বসিয়া পড়িতেন। এই কাজে কালীপ্রসাদের দক্ষতা ছিল সব চাইতে বেশী, তাঁহার ছিপেই মাছ ধরা পড়িত বেশী সংখ্যায়।

ঠাকুর সেদিন কহিলেন, "কিরে তুই নাকি ছিপ দিয়ে খুব মাছ ধরেছিস?"

বিনীত উত্তর হইল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"ছিপ দিয়ে মাছ ধরা পাপ. এতে জীব হত্যা হয়।"

কালীপ্রসাদ তর্ক তুলেন, "কেন, গীতার শ্লোকে তো রয়েছে, য এনং বেত্তি হন্তারং, ইত্যাদি। আত্মা হন্তা নয়, হতও হয় না কোনোদিন। তবে মাছ ধরার পাপ কি?"

ঠাকুরও যুক্তি দিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণ বুঝাইলেন, তারপর কহিলেন, "যার ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে, তখন আর বেতালে পা পড়ে না। যারা তপস্যা করে, গোড়ার দিকে তাদের অনেক কিছু ভালোমন্দ পাপপুণ্য বিচার ক'রে চলতে হয়।"

একটু থামিয়া আবার বলিলেন "আমি তোকে ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান বলে জানি। আমি যে কথাগুলো বললাম, তুই তা স্মরণে রেখে ধ্যান কর সব বুঝতে পারবি।"

তিন দিনের মধ্যে ধ্যানাবিষ্ট কালীপ্রসাদের উপলব্ধিতে আসিয়া গেল ঠাকুরের বক্তব্যের যথার্থতা। ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিলেন, 'এবার আমি বুঝতে পেরেছি, মাছ ধরা কেন অন্যায় কাজ। একাজ আর আমি করবো না। আমায় ক্ষমা করুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার হাসি। কহিলেন "মাছ ধরলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। খাবারের লোভ দেখিয়ে বড়শী লুকিয়ে রাখা আর অতিথি বা বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে খাবারের ভেতর বিষ লুকিয়ে রাখা, একই ধরনের পাপ।"

কথাগুলি তরুণ সাধক কালীপ্রসাদের মর্মে প্রবিষ্ট হইয়া গেল, ঠাকুরের করুণাঘন মূর্তির দিকে তিনি সজলনয়নে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কহিলেন, "আত্মা মরে না, অপরকে মারেও না বটে. কিন্তু এই জ্ঞান যার হয়েছে সে তো আত্মস্বরূপ। কাজেই অপর কাউকে হত্যা করার প্রবৃত্তি তার হবে কেন? যতক্ষণ হত্যার প্রবৃত্তি থাকে, ততক্ষণ তো সে আত্মস্বরূপ হতে পারে না, আত্মজ্ঞানও প্রকাশিত হয় না। তাই বলছি যে, ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে মানুষের আর বেতালে পা পড়ে না। জানবি—আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়-মন, বুদ্ধির পারে ও সাক্ষীস্বরূপ।"

বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে কালীপ্রসাদের সব সংশয় ইতিমধ্যে দূর হইয়াছে, আনন্দে অভিভূত হইয়া বার বার কেবলই ঠাকুরের কৃপার কথা ভাবিতেছেন।

কালীপ্রসাদ স্বভাবতই তীক্ষ্ণধী, মননশীল ও প্রতিভাধর। নূতন নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্ব শিখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের অবধি নাই। ঠাকুরের সেবা এবং ধ্যান জপের অবকাশে এ সময়ে প্রায়ই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন।

একদিন সেবাকর্মের এক ফাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে বসিয়া জন স্টুয়ার্ট মিলের একখানি বই পড়িতেছেন। ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, কি বই এটা?"

"আজ্ঞে, ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্র।"

"কি শেখায় ওতে ?"

"এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের তর্ক, যুক্তি ও বিচার শেখায়।"

"তুই তো দেখছি এখানে ছেলেদের মধ্যে বইপড়া ঢোকালি। তবে কি জানিস, বই পড়া বিদ্যে আসলে কিছু নয়। আপনাকে মারতে গেলে একটা নরুনই যথেষ্ট। কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দরকার হয়। অবশ্যি, যারা লোকশিক্ষা দেবে তাদের এসব পড়ার দরকার আছে।"

এ কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব হইয়া যান, কালীপ্রসাদের বই পড়া নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। তিনি অন্তর্যামী, তাই বুঝিয়াছিলেন উত্তরকালে তাঁহার এই নবীন শিষ্য কালীপ্রসাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব প্রচার করিবে। শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ধর্মনেতাদের সম্মুখীন হইবে। তাই কালীপ্রসাদের বই পড়া নিষেধ করেন নাই। ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে সেসময়ে প্রায়ই ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হইত। কালীপ্রসাদের প্রতিভা যুক্তি, তর্ক ও পরিশীলিত বুদ্ধি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ঠাকুরের কানে সব সংবাদই যাইত। একদিন কালীপ্রসাদকে ডাকিয়া বেশ কিছুটা উৎসাহিতও করিলেন। কহিলেন, "ছেলেদের মধ্যে তুইও বুদ্ধিমান। নরেনের নিচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, তুইও সেরকম পারবি।"

প্রবীণ ভক্ত বুড়ো গোপাল একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন, "মশায়, কালী কিছুই মানে না। একেবারে নাস্তিক হয়ে গেছে।" শুনিয়া ঠাকুর শুধু একটু মুচকি হাসি হাসিলেন।

একদিন কালীপ্রসাদকে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁরে, তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস ?"

কালীপ্রসাদ নিরুত্তর। আবার ঠাকুরের জিজ্ঞাসা, "তুই ঈশ্বর মানিস ?"

সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর হইল, "না।"

"অন্য কোনো সাধুর কাছে একথা বললে, সে তোর গালে চড় মারতো "

"আপনিও মারুন। যতক্ষণ না ঈশ্বর আছেন এবং বেদ সত্য, একথা ঠিক বুঝতে না পারছি, ততক্ষণ আমি অন্ধবিশ্বাসে সে সকল মানবো কি ক'রে ? আপনি আমায় বুঝিয়ে দিন, আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিন। তখন আমি সব মানবো।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার হাসি। সস্নেহে বলেন, "একদিন তুই সব জানবি, আর সব মানবি। এই দ্যাখ্, নরেন আগে কিছুই মানতো না। কিন্তু এখন 'রাধে রাধে' বলে নাচে আর কীর্তনে নৃত্য করে। এর পর তুইও সব মানবি।"

"আমায় আপনি সব জানিয়ে দিন, তবে তো।"

"সময়ে তুই সব বুঝতে পারবি। একটা কথা মনে রাখিস্—কখনো একঘেয়ে হস্ নি। আমি একঘেয়ে ভাব ভালোবাসিনে।"

উত্তরকালে আপ্তকাম সাধক স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "ইহার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন। তখন আমি সাধন রহস্যের সকল কথাই জানিতে পারিলাম এবং সকল জিনিস তখন মানিতে লাগিলাম। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার কথা ভাবিলে আজিও আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে।"

কাশীপুরে কালীপ্রসাদ সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতেছেন, ঠাকুর বলিলেন,

"ওরে, তোর বাবা কাল এসেছিলেন, তোর মা তোর জন্যে কেঁদে সারা হচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছে, তুই যেন বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসিস্। আমি কথা দিয়েছি। তুই তোর মায়ের কাছে একবার যা।"

ঠাকুরের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কালীপ্রসাদ আহিরীটোলার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে প্রায় আধঘণ্টা সময় কাটানোর পরই মন উচাটন হইয়া উঠিল। কাশীপুরে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন, তারপর পিতা মাতার কাছে বিদায় নিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের সহিত দেখা হইতেই কহিলেন, "কিরে তুই বাড়িতে যাস নি ?"

কালীপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে গিয়েছিলাম।"

'মা বাবা নিশ্চয় থাকতে বলেছিলেন। তবে থাকলিনে কেন ?"

"ছিলুম তো।"

"কতক্ষণ ছিলি ?"

"আধ ঘণ্টা মাত্র।"

"এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি কেন ?"

"মা বাবা খুব যত্ন করলেন, থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমার বোধ হল, আমি যেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রয়েছি। প্রাণ ছটফট করতে লাগল। একটু মিষ্টি মুখে দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে এসেছি। এখানে এসে শান্তি পেলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হইয়া উঠিলেন, স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "এখানে শান্তি পাবি বৈ কি।"

ঠাকুরের স্নেহ মমতার পিছনে ছিল, আত্মিক শান্তি ও আত্মিক আনন্দের স্পর্শ, এই স্পর্শ কালীপ্রসাদ প্রভৃতি তরুণ সাধকদের রূপান্তরিত করিয়াছিল নূতন মানুষে। তাই সংসার জীবন ও পিতা মাতার স্নেহ মমতা তাহাদের কাছে সে সময়ে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হইত।

পৌষ সংক্রান্তি প্রায় আসন্ন। গঙ্গাসাগরের মেলায় যাওয়ার জন্য কলিকাতার জগন্নাথ ঘাটে সাধু সন্ন্যাসীরা ভিড় করিতেছে। বুড়ো গোপালের ইচ্ছা, সন্ন্যাসীদের একখানি করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষ-মালা দান করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কানে একথা গেল। বুড়ো গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন, "গঙ্গাসাগর যাত্রী সন্ন্যাসীদের গেরুয়া কাপড় দিলে যে ফল পাবি, তার হাজার গুণ বেশী ফল হবে যদি তুই আমার এই ছেলেদের দিস্। এদের মতো ত্যাগী সাধু আর কোথায় পাবি। এদের এক একজন হাজার সাধুর সমান। হাজারী সাধু। বুঝলি ?"

বুড়ো গোপালের মত তখনি পরিবর্তিত হইয়া গেল। ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদেরই তিনি ঐ বস্ত্র ও মালা দান ক'রলেন।

"নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি অনেকেই পরমহংসদেবের আদেশে এক একখানি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে নবীন সন্ন্যাসীর বেশে দর্শন করিয়া পরমহংসদেব আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা একে একে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেব তাঁহাদিগকে 'ইষ্ট লাভ হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র শিশিতে রক্ষিত কারণবারি সকলকে আঘ্রাণ করাইয়া এবং সিঞ্চন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস

আশ্রমের অধিকারী করিলেন। একখানি বস্ত্র অতিরিক্ত ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল[১]।"

দশনামী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত সন্ন্যাস অথবা তান্ত্রিক বা বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস দানের প্রথা হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আচরিত এই প্রথাটি স্বতন্ত্র ধরনের। তবুও নরেন, রাখাল, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি এগারজন ত্যাগী ভক্ত এখন হইতে ঠাকুরের প্রদত্ত এই সন্ন্যাসকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন, এবং সাদা কাপড় ত্যাগ করিয়া পরিতে শুরু করিলেন গৈরিক কাপড়।

কাশীপুর বাগানে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের সেবকের সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, তেমনি অজস্র গৃহস্থ ভক্তও আসিতেছেন তাঁহাকে দর্শনের জন্য। অনেকে এখানেই খাওয়া দাওয়া করিতেছেন। ফলে ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে।

প্রবীণ গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যয় সংকোচনের জন্য অতিমাত্রায় উৎসাহী। তাঁহারা প্রস্তাব দেন, ঠাকুরের সেবার জন্য দুইজন ভক্ত বাগানে স্থায়িভাবে থাকুক। আর সবাই যার যার বাড়ি হইতে এখানে আসা যাওয়া করুক।

একথা শুনিয়া ঠাকুর বিরক্ত হইলেন। নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ প্রভৃতিকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার আর এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। এত খরচ চলবে কি ক'রে? ভাবছি, ইন্দ্রনারায়ণ জমিদারকে টানবো নাকি? না, তোরা বড় বাজারের সেই ভক্ত মাড়োয়ারীটাকে ডেকে আন্।"

অতঃপর ঐ মাড়োয়ারী ভক্তটি কিন্তু কিছুদিন পরে প্রচুর অর্থ ভেট নিয়া নিজ হইতেই ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি টাকার তোড়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলেন, "নাঃ তোদের কাঞ্চন আমি গ্রহণ করবো না।"

ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতীক্ষায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। তিনি কহিলেন, "তোরা আমায় অন্য কোথাও নিয়ে চল। আমার জন্য তোরা ভিক্ষে করতে পারবি? তোরা যেখানে আমায় নিয়ে যাবি, সেইখানেই যাবো। আচ্ছা, তোরা কেমন ভিক্ষা করতে পারিস্, দেখা যাক। ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ অন্ন। গৃহস্থের অন্ন খাবার ইচ্ছে আমার নেই।"

ভক্তেরা সমস্বরে জানান, "আপনার জন্য নিশ্চয় আমরা ভিক্ষে করবো।"

পরদিন প্রভাতে মা-সারদামণির নিকট হইতে ছেলেরা প্রথম মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর ভিক্ষার জন্য বাহির হন পথে-পথে গৃহস্থ বাড়িতে। কেউ মুষ্টি দেয়, কেউ বা শ্লেষোক্তি করে, তাড়া করিয়া আসে। কোনো কোনো মহিলা তীব্র কণ্ঠে বলেন, হোৎকা জোয়ান সব মিন্‌সেরা, গতর খেটে খেতে পারে না, ভিক্ষে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়। দূর হয়ে যা এখান থেকে।"

ত্যাগ তিতিক্ষার পথে বাহির হইবার পর নবীন ভক্তদের এ এক অভিনব বাস্তব অভিজ্ঞতা। সংগৃহীত ভিক্ষাদ্রব্য ঠাকুরের চরণতলে রাখিয়া একে একে উঁহারা প্রণাম নিবেদন করেন।

সারদামণি সেদিন ঐ ভিক্ষান্ন হইতেই ঠাকুরের জন্য প্রস্তুত করেন চালের মণ্ড। খাইতে খাইতে ঠাকুর বলেন, "ভিক্ষান্ন বড় পবিত্র। এতে কারুর কোনো বাসনা নেই। আজ ভিক্ষান্ন খেয়ে আমি পরম আনন্দ লাভ করলাম।"

---

১ স্বামী অভেদানন্দের জীবন কথা : শঙ্করানন্দ

নিজের নরদেহ ত্যাগের পূর্বে, ত্যাগী তরুণ ভক্তদের সন্ন্যাস-বেশ ধারণের পর, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভিক্ষা গ্রহণের কর্তব্যটিও তাঁহাদের শিখাইয়া দিয়া গেলেন।

তরুণ সাধকেরা প্রায়ই বুদ্ধদেবের জীবনী ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। একবার নরেন্দ্র, তারক এবং কালীপ্রসাদ ঠাকুরকে কিছু না জানাইয়া বুদ্ধগয়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য, বুদ্ধের পুণ্যময় সাধনস্থলীতে বসিয়া কিছুটা তপস্যা করা। এইস্থানে ধ্যানাসনে বসিয়া নরেন্দ্রনাথের জ্যোতি দর্শন হয় এবং তারক ও কালীপ্রসাদের অন্তরে দিব্য আনন্দ ও শান্তির প্রবাহ সঞ্চারিত হয়।

অতঃপর উৎসাহী তরুণ তাপসদের মনে অনুতাপ জন্মে, অসুস্থ ঠাকুরকে এভাবে ফেলিয়া আসা তাঁহাদের উচিত হয় নাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এ কয়দিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের পরে তীর্থস্থানের তপস্যা, মাধুকরী প্রভৃতির কাহিনী শুনিয়া তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন।

সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে কহিলেন কিছুদিন আগে গয়ার বরাবর পাহাড়ে এক প্রসিদ্ধ হঠযোগীকে তিনি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। গোস্বামীজী তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

কালীপ্রসাদ মনে মনে সংকল্প করিলেন, এই হঠযোগীকে একবার দর্শন করিবেন এবং সম্ভব হইলে তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু সাধন প্রক্রিয়া শিখিয়া নিবেন।

একদিন কাহাকেও কিছু না জানাইয়া গোপনে রওনা দিলেন, ট্রেনযোগে উপস্থিত হইলেন গয়াধামে। বরাবর পাহাড়ের নিচেই রহিয়াছে একটি ছোট গ্রাম, এই গ্রামের ধর্মশালাতে নিলেন সে রাত্রের মতো আশ্রয়।

একজন দশনামী পুরী সন্ন্যাসী তখন এই ধর্মশালায় অবস্থান করিতেছেন। কালীপ্রসাদ তাঁহার সহিত ভাব জমাইয়া ফেলিলেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-পদ্ধতি এবং বিরজাহোমের তথ্য সম্বলিত একটি ছোট পুঁথি আছে। কালীপ্রসাদ তো এ সংবাদে মহা উল্লসিত। তখনি তাড়াতাড়ি সেটি হইতে বিরজাহোমের প্রৈষমন্ত্র, মঠ, মড়ি যোগপট্ট ইত্যাদি সন্ন্যাস মন্ত্র লিখিয়া লইলেন।

পরের দিন রওনা হইলেন পাহাড়ের চড়াইয়ের পথে হঠযোগীর গুহার দিকে। গ্রামের লোকেরা আগে হইতে কালীপ্রসাদকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, হঠযোগীর গুহায় যাওয়া তেমন নিরাপদ নয়। কাহাকেও সেদিকে অগ্রসর হইতে দেখিলে তাঁহার চেলারা বড় বড় পাথর ছুঁড়িতে থাকে, কেহ তাঁহাদের সাধনা বা ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন জন্মায় ইহা তাহাদের অভিপ্রেত নয়।

গুহার নিকট পৌঁছিলে কালীপ্রসাদের উপরও প্রস্তর-খণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে। তিনি তখন এক চাতুরীর আশ্রয় নেন। দূর হইতে হঠযোগী ও তাঁহার চেলাদের প্রণাম জানাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, 'ওঁ নমো নারায়ণায়'।

এবার সাধুরা শান্ত হয়, প্রস্তর বর্ষণ স্থগিত রাখে। তাহাদের ধারণা হয় কালীপ্রসাদ একজন সন্ন্যাসী তাহা দ্বারা কোনো অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই। কিন্তু নিকটে যাওয়া মাত্র কালীপ্রসাদকে মঠাম্নায় সন্ন্যাস মন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বার বার জেরা করিতে থাকে।

কালীপ্রসাদ সদ্য সদ্য এসব তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন, তাই তাঁহার উত্তরে হঠযোগীর চেলারা শান্ত হইল।

আলাপ আলোচনার পর কালীপ্রসাদ বুঝিলেন, আসলে এই সাধুটি হঠযোগী নয়, অঘোরপন্থী। অধ্যাত্ম-সাধন সম্পর্কেও তাঁহার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নাই। স্থির করিলেন আর কালক্ষেপণ না করিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়িবেন।

কিন্তু এই হঠযোগীর খপ্পর হইতে পলায়ন করা বড় সহজ নয়। হঠযোগী ইতিমধ্যে কালীপ্রসাদের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্থির করিয়াছেন তাঁহাকে চেলার দলে ভর্তি করিয়া নিবেন। প্রস্তাব জানাইয়া স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিয়াই ফেলিলেন, 'তুমহার মাফিক চেলা বহুত ভাগ্‌সে মিলতা হ্যায়।'

কালীপ্রসাদ পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, হঠাৎ এক ফাঁকে হঠযোগীর গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিলেন এক দৌড়। হাঁফাইতে হাঁফাইতে নামিয়া আসিলেন বরাবর পাহাড়ের নিচে।

কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "এতদিন কোথায় গিয়েছিলি তুই, বলতো ?"

কালীপ্রসাদ ঠাকুরকে তাঁহার হঠযোগী সন্দর্শনের সব ঘটনা বিবৃত করিলেন ; তারপর কহিলেন, "হঠযোগীকে আমার ভালো লাগল না। আপনার তুলনায় সে কিছুই নয়। তাই তো আপনার চরণতলে আবার ছুটে এলাম।"

ঠাকুর প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "যত বড় সাধু বা সিদ্ধযোগী যে যেখানে আছে, আমি সব জানি। চারখুঁট ঘুরে পায়, কিন্তু এখানে (নিজের বুকে হাত দিয়া) যা দেখছিস্ এমনটি আর কোথাও পাবি নি।" বলিতে বলিতে শায়িত অবস্থায় নিজের চরণটি কালীপ্রসাদের বুকে স্থাপন করিলেন, কালীপ্রসাদ নিমজ্জিত হইলেন অপার আনন্দ সাগরে।

ইতিমধ্যে একদিন কালীপ্রসাদের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। অনুরোধ জানান, "আপনি কালীপ্রসাদকে এত ভালোবাসেন, আপনি তাঁর সত্যকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যাক্।

ঠাকুর এবার স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন তাঁহাকে, কহিলেন, "তোমার ছেলেকে আমি খেয়ে ফেলেছি। সে এখন আর তোমার নয়। এখান থেকে আর সে ফিরবে না।"

গুরুর কৃপার স্পর্শে, বৈরাগ্যময় সাধনার মধ্য দিয়া কালীপ্রসাদ নূতন মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছেন—এ সত্যটি তাঁহার পিতাকে ঠাকুর সেদিন বুঝাইয়া দিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

আর একদিন সেবারত কালীপ্রসাদকে কহিলেন, "তোদের সঙ্গে আমার আত্মার সম্বন্ধ—এটা পূর্ব জন্মের জানবি। তোরা যেন বাঁদর আর আমি বাঁদরওয়ালা। বাঁদর যখন দুষ্টুমি করে, বাঁদরওয়ালা দড়িটা একটু টেনে ধরে, তখন বাঁদর ঠিক হয়ে যায়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। কালীপ্রসাদ এবং তাঁহার গুরু-ভাইদের শোকসাগরে ভাসাইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরলীলা সংবরণ করিলেন। ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া তরুণ ভক্তেরা একান্তভাবে ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়াছিলেন, সে আশ্রয়টি সেদিন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

দুইজনে মিলিয়া ভাবী কর্মপদ্ধতির কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ছেলেদিগকে একত্র রাখিতে হইবে—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আদেশ পালন করিতে না পারিলে নরেন্দ্রনাথ মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। এক্ষণে কালীপ্রসাদকে সহায় রূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। দুইজনে মিলিয়া তাঁহারা বালক ভক্তগণের বাড়ি গমন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ ও তীব্র বৈরাগ্যোদ্দীপক বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন।"

"শেষে বালকভক্তগণের মনে এমন আতঙ্কের সৃজন হইল যে, নরেন্দ্রনাথ ও কালী-প্রসাদকে দেখিতে পাইলে তাঁহারা অনেকেই দ্বার বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেন। নরেন্দ্রনাথও ছিলেন নাছোড়বান্দা। তিনি দরজাতে লাথি ও কিল দিয়া এমনই অবস্থার সৃষ্টি করিতেন যে, তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও ভীত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বাধ্য হইতেন। বালকগণের অভিভাবকেরা ইহা ভালো চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং তাহাদের অনুপস্থিতিতেই এই কার্য সকল করিতে হইত। তৎকালে অভিভাবকগণ নরেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসাদের এই প্রকার আচরণের সংবাদে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। একদিন তাহারা দুইজন ও হুটকো গোপাল, শরৎ ও শশীর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। শরৎ দরজা খুলিবেন না, আর নরেনও ছাড়িবেন না। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ দরজার আরও জোরে করাঘাত করিয়া শরৎকে দরজা খুলিতে বাধ্য করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই নরেন্দ্রনাথ অবিরত তীব্র বৈরাগ্য ও ভগবদ্ লাভের প্রসঙ্গ তুলিয়া এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিলেন। শরৎ ও শশী তাঁহার সেই আবেগময়ী বাক্যস্রোতে সত্যই ভাসিয়া গেলেন। সবশেষে নরেন্দ্রনাথ যখন বলিলেন: 'চল্ বরানগরের মঠে যাই,' তখন আর তাঁহারা আপত্তি করিতে পারিলেন না। শরৎ ও শশী গায়ে চাদর ফেলিয়া তখনই তাহাদের সহিত বরাহনগরে রওনা হইলেন।"

বরাহনগর মঠে নবীন সাধকদের ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন চরমে উঠিয়াছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও নেতৃত্বের এমনই প্রভাব ছিল যে, এই কঠোর জীবনের দুঃখ কষ্টকে কেহ গায়ে মাখিতেন না। এ সময়কার স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন: "মহা সমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন 'তুই ছেলেদের একত্রে রাখিস্ ও তাদের দ্যাখাশোনা করিস্।' আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ স্মরণ করাইয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিত-ভাবে ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা ও সুখ সান্ত্বনার স্থল। তখন সকলের জীবন অতিশয় দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনে সহায় সম্বল করিয়া মনের আনন্দেই দিনযাপন করিতাম। অবশ্য খাওয়া-পরার তখন অত্যন্ত কষ্ট ছিল।"

"তারকদাদা, আমি, লাটু, গোপালদাদা প্রভৃতি সকলে ভিক্ষায় বাহির হইয়া সামান্য-ভাবে যে চাল প্রভৃতি পাইতাম তাহাই সকলে পালা করিয়া রান্না করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। কোনো কোনো দিন শাক্-সব্জী কোনোরূপ না পাইয়া তেলাকুচার পাতা আনিয়া সিদ্ধ করিতাম ও তাহা দিয়া ভাত খাইতাম। অবশ্য আহার আমাদের একবেলাই

জুটিত। সকলের পরনে কাপড় ছিল না। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন করিয়া আমরা তাহাই পরিতাম এবং আর একখানি মাত্র কাপড় আমরা রাখিয়া দিতাম, কেহ কোথাও গেলে সেইখানি পরিয়াই বাহির হইত। সেই সব দুঃখ-কষ্টের দিনের কথা আর কি বলিব। তবে এখন সেই সব দিনের কথা মনে হইলে মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে।"

এই সময়ে তরুণ রামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে কৃচ্ছ্র, ধ্যান ও শাস্ত্রপাঠের উৎসাহ চরমে উঠে। কালীপ্রসাদের একটি ক্ষুদ্র নিভৃত ঘর ছিল, সেখানে দিনের পর দিন তিনি তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে মগ্ন থাকিতেন, দেহের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ছিল না। তাঁহার ঐ ঘরটিকে গুরুভাইরা বলিতেন কালীতপস্বীর ঘর।

একদিন মঠের বারান্দায় শুইয়া কালীপ্রসাদ ধ্যান করিতেছিলেন, ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। মধ্যাহ্নের সূর্যকরে বারান্দার ধূলিরাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, উহারই উপর তিনি শুইয়া আছেন। এসময়ে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মঠে বেড়াইতে আসিয়াছেন। কালীপ্রসাদকে অসাড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার কাছে গেলেন। হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, রৌদ্রে দেহটি তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের কোনো লক্ষণ নাই। মহেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন ভাবিলেন অত্যধিক কঠোর তপস্যা করিতে গিয়া কালীপ্রসাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

মঠের অভ্যন্তরে গিয়া বিষণ্ণ স্বরে একথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও কি মরে ? ও শালা অমনি ক'রেই ধ্যান করে।' কালীপ্রসাদের ধ্যাননিষ্ঠা সম্পর্কে সে সময়ে সকল গুরুভাই-ই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

মঠের গুরু-ভাইদের মধ্যে এসময়ে যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনা সত্যই বিরল। একদিন নরেন ও কালীপ্রসাদ কোনো কাজ উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছেন। গৃহী ভক্তদের বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলাপ আলোচনাদি করিলেন, কিন্তু কোথাও কেহ আহারাদি করার কথা বলিলেন না। ক্রমে বেশ রাত্রি হইয়া আসিল। নরেন্দ্র ও কালীপ্রসাদ এবার নরেন্দ্রের পৈত্রিক বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। বাড়িতে তখন চরম আর্থিক দুর্গতি চলিতেছে জ্ঞাতিদের সহিত মোকদ্দমায় তাঁহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, দু-মুঠো অন্নের সংস্থান নাই। অবস্থাটি উভয়ের জানা ছিল, তাই বাড়িতেও আহারের কথা তাঁহারা বলিলেন না।

সারাদিন একেবারে অনাহারে গিয়াছে, রাত্রিতে খাবার মিলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সব চাইতে বড় বিপদ পৌষের প্রচণ্ড শীত। নরেন বা কালীপ্রসাদ কাহারও একটুকরা গাত্রবস্ত্র নাই।

এ অবস্থায় কি করা যায় ? কোঁচার কাপড় কোনোমতে গায়ে জড়াইয়া দুইজন পিঠাপিঠি করিয়া শুইয়া রহিলেন। তামাক খাওয়া, বেদান্তের আলোচনা সবই চলিতে লাগিল, কিন্তু শীত কিছুতেই যাইতেছে না। অনাহারে শরীরও অবসন্ন।

কালীপ্রসাদ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'ভাই নরেন, শীতের দাপটে যে আর ঘুমুতে পারছিনে।"

নরেন উত্তর দিলেন, "দূর শালা, ভেবে কি হবে, আর একটু ঠাসাঠাসি করে শো।"

অতঃপর কালীপ্রসাদের খুব কষ্ট হইতেছে বুঝিয়া নরেন উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "থাম্ শালা, উঠে ব'স, দেখি তো তোর জন্য চায়ের যোগাড় করতে পারি কিনা।" খুঁজিয়া পাতিয়া কিছু চা চিনি ও কেটলী সংগ্রহ করা গেল।

চা তৈরি হইলে নরেন কহিলেন, "কিরে শালা, জেগে আছিস ?"

কালীপ্রসাদ তখনো শীতে কাঁপিতেছেন, কহিলেন, "এ অবস্থায় জেগে থাকবো না তো কি ? ঘুম আর হল কোথায়। শীতে যে আমার গা কালিয়ে যাচ্ছে।"

"নে শালা, চা খা, একটু গরম হয়ে নে।" বলিয়া নরেন চায়ের বাটিটি কালীপ্রসাদের হাতে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হইল, উভয়ে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন বরাহনগরের দিকে।

সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে তরুণ রামকৃষ্ণ-তনয়েরা এমনিভাবে দিনের পর দিন একত্রে দিন কাটাইয়াছেন, নিজেদের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছেন এক অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধন।

মঠে তরুণ সাধকেরা শাস্ত্রপাঠ, জপধ্যান ও কীর্তনে মাতিয়া রহিয়াছেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন নরেন্দ্রনাথ বলেন, "আমি ভাবছি, সবাই মিলে এবার আমরা শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিই। তোমাদের কি মত ?"

কালীপ্রসাদ মন্তব্য করেন, "শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিলে আমাদের বিরজাহোম করতে হবে। বিরজাহোমের মন্ত্র কিন্তু আমার কাছে রয়েছে।"

নরেন্দ্রনাথ কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করেন, "তাই নাকি ? তুমি ঐ মন্ত্র কি ক'রে পেলে ?"

কালীপ্রসাদ জানাইলেন, "বরাবর পাহাড়ে সে-বার হঠযোগীর সন্ধানে গিয়েছিলাম, জান তো ? তখন পাহাড়ের নিচেকার ধর্মশালায় এক সন্ন্যাসীর খাতা থেকে এগুলো টুকে রেখেছিলাম।"

নরেন্দ্রনাথ তো মহা আনন্দিত। বলেন, "তাহলে এসব ঠাকুরেরই কৃপা। কেমন শুভ যোগাযোগ দ্যাখো। এসো আমরা বিরজা হোম সম্পন্ন করে শাস্ত্রীয় মতে পুরোপুরি সন্ন্যাসী হই।" সকলে সোৎসাহে একথা সমর্থন করিলেন।

কালীপ্রসাদ এই অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "একদিন প্রাতঃকালে সকলে গঙ্গায় স্নান করিয়া বরাহনগরে মঠে ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র পাদুকার সম্মুখে উপবেশন করিলাম। শশী বিধিমতো শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সমাপ্ত করিল। হোমের জন্য কিছু বিল্বকাষ্ঠ, বারোটি বিল্বদণ্ড ও গব্যঘৃত সংগ্রহ করা হইয়াছিল অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল। নরেন্দ্রনাথের আদেশে আমি তন্ত্রধারকরূপে, আমার খাতা হইতে সন্ন্যাসের প্রেষমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ও পরে রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, সারদা প্রভৃতি সকলে আমার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেষমন্ত্র পড়িতে পড়িতে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল। পরে আমি নিজেই প্রেষমন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে আহুতি দিলাম। অবশ্য সন্ন্যাসদীক্ষা আমরা পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে পাইয়াছিলাম। পূর্বে গোপালদাদা কর্তৃক গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সাধুদের উদ্দেশে দান করার জন্য বারোখানি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম, তবে শাস্ত্রমতে সন্ন্যাসানুষ্ঠান আমাদের বরাহনগরের মঠে হইয়াছিল।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নরেন্দ্র নাম গ্রহণ করিলেন বিবিদিষানন্দ,[১] রাখাল—ব্রহ্মানন্দ আর কালীপ্রসাদ—অভেদানন্দ। অপর সকলেও নরেন্দ্রনাথের পরামর্শ মতো নাম গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে মা সারদামণির আশীর্বাদ নিয়া স্বামী অভেদানন্দ তীর্থ ভ্রমণের জন্য বহির্গত হন। প্রথমে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার, হৃষিকেশ, বদরী, কেদার প্রভৃতি এসময়ে তিনি পরিভ্রমণ করেন।

পরিব্রাজক অভেদানন্দ এসময়ে সংকল্প গ্রহণ করেন টাকা-পয়সা তিনি স্পর্শ করিবেন না, রন্ধন করিবেন না, জামা পরিধান করিবেন না এবং কাহারও গৃহে শয়ন করিবেন না। তাছাড়া, মাধুকরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন, আর রাত্রিকালে আশ্রয় নিবেন কোনো বৃক্ষতলে।

এই পরিব্রাজনের সময় বহু বিপদে ও সংকটে তিনি পড়িয়াছেন কিন্তু প্রতিবারই উদ্ধার পাইয়াছেন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা বলে। নির্জন অরণ্যে, পথে প্রান্তরে, নিভৃত ধ্যানগুহায় সর্বত্র অলক্ষ্যে থাকিয়া সদ্‌গুরুই জুটাইয়া দিয়াছেন আহার এবং আশ্রয়, প্রতি-পদে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

এই পরিব্রাজনের সময়ে দীর্ঘদিন তিনি হৃষিকেশে অবস্থান করেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেদান্তী ধনরাজ গিরির আশ্রম ছিল এই স্থানে। অভেদানন্দ তাঁহার নিকট থাকিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং জ্ঞানমার্গের উচ্চতম তত্ত্বসমূহে পারঙ্গম হইয়া উঠেন।

ইহার কিছুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হৃষিকেশে ধনরাজ গিরির সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজী অভেদানন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে গিরি মহারাজ মন্তব্য করেন, "অভেদানন্দ? উসকো তো অলৌকিকী প্রজ্ঞা থে।"

অতঃপর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থ সম্পর্কে পরিব্রাজন করিয়া অভেদানন্দ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। মঠ তখন আলম বাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন। পূর্বেকার মতো আর্থিক দুরবস্থা আর নাই। এখন কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখিতেছেন তরুণ তাপসেরা। গৃহস্থ ভক্তেরা নানা-রকমের ভে পাঠাইতেছেন, ঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগের এ সময়ে আর কোনো অসুবিধা নাই।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে পাওয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ। চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় ামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়াছেন, সারা আমেরিকায় তুলিয়াছেন বিপুল আলোড়ন।

কিছুদিনের মধ্যে মঠে স্বামী বিবেকানন্দের এক পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিসন্ধিমূলক প্রচার চলিয়াছে এবং বলা হইতেছে, তিনি হিন্দুধর্মের কোনো প্রতিনিধি নহেন এবং আসলে একটি ভ্যাগাবণ্ড মাত্র। তাই অবিলম্বে কলিকাতায় ।"

---

১ পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ এই বিবিদিষানন্দ নাম পরিবর্তন করিয়া বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্য ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিং-এর পরামর্শমতো এই নাম নিয়া তিনি আমেরিকা যান। দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দ। এ ফরগটন্ চ্যাপ্টার অব হিজ লাইফ—বি. এস. শর্মা।

একটি সর্বজনীন সভা আহ্বান করা প্রয়োজন। এই সভার প্রস্তাবে বলিতে হইবে যে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি এবং তাঁহার প্রচারকর্মে ভারতের জনগণের বিপুল সমর্থন রহিয়াছে।

অভেদানন্দ সারদানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইরা এই কার্য সাধনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হইল এবং গৃহীত প্রস্তাব প্রেরিত হইল আমেরিকায়।

কলিকাতার এই সময়কার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "কালী বেদান্তী এই সময়ে প্রাণপণে খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মতো দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউনহলের সভা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার কার্যপ্রণালী মুদ্রিত করা এবং এই রিপোর্টগুলি নানা প্রেসে পাঠানো প্রভৃতি সমস্ত কার্য তিনি সাধনার মতো করিয়াছিলেন।"

১৮৯৬ সালে স্বামী অভেদানন্দের জীবনে সংযোজিত হয় এক নূতন অধ্যায়। 'কালী বেদান্তীর' অভ্যুদয় দেখা দেয় আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেদান্ত-প্রচারক সন্ন্যাসীরূপে প্রথমে ইংল্যাণ্ডে পরে আমেরিকায় গিয়া তিনি অদ্বৈত বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করেন। বিশেষত আমেরিকায় প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বিবেকানন্দের প্রচারিত ভাবধারাকে বিস্তারিত করেন এবং গড়িয়া তোলেন একটি দৃঢ়-সম্বদ্ধ সংগঠন।

বিবেকানন্দ সে-বার আমেরিকা হইতে লণ্ডনে আসিয়াছেন। সেখানকার বেদান্তের প্রচারে প্রয়োজন এক সুযোগ্য গুরুভ্রাতার। এজন্য আহ্বান করিয়া নিলেন স্বামী অভেদানন্দকে।

প্রায় মাসখানেক যাবৎ অভেদানন্দ লণ্ডন শহরে আসিয়াছেন, সেখানকার রীতিনীতি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিয়া নিতেছেন। এ সময়ে বিবেকানন্দ নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন। সেদিন হঠাৎ তিনি অভেদানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "এখানকার ক্রাইস্ট থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে তোমায় বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তা হিসাবে তোমার নাম ওরা ছাপিয়ে দিয়েছে।"

অভেদানন্দ তো আকাশ হইতে পড়িলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "সে কি কথা। আমি কি ক'রে বক্তৃতা দেব? আমি তো বক্তৃতা করতে জানি নে।"

"ও কথা শুনবো না, বক্তৃতা তোমায় দিতেই হবে।"

"আমার সে ক্ষমতা একেবারেই নেই, আমি কিছুতেই করতে পারবো না।"

"তবে এখানে এলে কেন?" উত্তেজিত স্বরে বলেন বিবেকানন্দ।

"তুমি ডেকেছিল তাই। বলতো আবার ফিরে যাচ্ছি। বক্তৃতা দিতে হবে এ কথা জানালে কখনই আমি আসতুম না।"

এবার বিবেকানন্দ দৃঢ়স্বরে বলেন, "তা হবে না। এখানে তোমায় থাকতে হবে, আর বক্তৃতা দেওয়া শিখতেও হবে।"

"আমি পারব না।"

"তুমি কি তা'হলে আমায় অপদস্থ করতে চাও?"

"কেন অপদস্থ হবে?"

"এ সভায় বক্তৃতা দিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি বলেছি এবার আমি বক্তৃতা করবো না, আমার এক গুরুভ্রাতা এখানে এসেছেন, তিনি মহাপণ্ডিত, তিনিই বক্তৃতা করবেন। তাঁরা শুনে খুব খুশী হলেন এবং নোটিশ ছাপাতে দিলেন।"

"তুমি আমায় আগে কিছু না জানিয়ে ও রকম নিমন্ত্রণ নিলে কেন?"

"নিয়ে ফেলেছি এখন আর কি হবে?"

এতক্ষণে অভেদানন্দ কিছুটা নরম হইলেন। কহিলেন, "তবে বক্তৃতা কি ক'রে আরম্ভ ও শেষ করতে হয় আমায় বলে দাও।"

"আমাকে কে কবে বলে দিয়েছিল? তোমার অন্তর যে ভাবে, যে রসে পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাই দাঁড়িয়ে উঠে ঢেলে দেবে। তুমি তো কালী-বেদান্তী, এতদিন বেদান্তের কত আলোচনা করলে, সেই সম্বন্ধে বলবে। এই তো পঞ্চদশী একখানি বেদান্ত গ্রন্থ—এতে যা শিক্ষা দেয় তা ইংরাজীতে লেখ। লিখে কয়েকবার তা পড়ে ফেল। পরে সভায় দাঁড়িয়ে তাই বলবে।"

"ইংরেজীতে লেখা যে আমার অভ্যেস নেই।"

'চেষ্টা কর, ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন। প্র্যাক্‌টিস কর। প্র্যাকটিস মেক্‌স্ এ ম্যান পারফেক্ট।"

অভেদানন্দ মহা সমস্যায় পড়িলেন। নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিতে গেলেই হতাশ হইয়া পড়েন। সত্যিই তো নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে, এখন বক্তৃতা না করিলে স্বামী বিবেকানন্দকে যে এখানকার সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে। ইহা তো অভেদানন্দ প্রাণ থাকিতে ঘটিতে দিতে পারেন না।

অগত্যা সাহসে বুক বাঁধিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে ভক্তিভরে স্মরণ করিয়া 'পঞ্চদশী' অবলম্বন করিয়া লিখিয়া ফেলিলেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। তারপর বার বার সেটি পাঠ করিয়া আয়ত্ত করিয়া নিলেন।

ইষ্ট স্মরণ করিয়া অভেদানন্দ বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন। কোনো জনসভাতেই ইতিপূর্বে কখনো ভাষণ দেন নাই, তাছাড়া এ সভা যে ইংলণ্ডের মতো প্রাগ্রসর দেশের এমন একটি সভা যেখানে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান শ্রোতারা সমবেত হইয়াছেন। আর সম্মুখে বসিয়া আছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই মনে কিছুটা আতঙ্ক ও দৌর্বল্যের সঞ্চার হইল। কিন্তু ধৈর্য সহকারে নিজেকে শক্ত ও দৃঢ় করিয়া নিলেন, শ্রোতারা তাঁহার দৌর্বল্য বা চাঞ্চল্যের কথা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে আত্মস্থ হইয়া বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় অনর্গলভাবে বেদান্তের উচ্চতম তত্ত্বগুলি তিনি চমৎকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। দেবী সরস্বতী সেদিন যেন তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা। মা সারদামণি এক সময়ে অভেদানন্দকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 'বাবা, সরস্বতী তোমার কণ্ঠে অধিষ্ঠাতা হোন', সে কথা এবার সর্বসমক্ষে ফলিয়া গেল।

লণ্ডনে দুই গুরুভ্রাতা যে অন্তরঙ্গ পরিবেশে বাস করিতেন শঙ্করানন্দজী তাঁহার কিছুটা বর্ণনা দিয়াছেন, "নূতন বাড়িতে স্বামীজী, গুডউইন এবং অভেদানন্দ বাস করিতে লাগিলেন। গুডউইন স্বামীজীর বক্তৃতা সাঙ্কেতিক লিপি দ্বারা লিখিয়া লইতেন ও বাজার করিতেন। অভেদানন্দ বাড়ির কাজকর্ম ও রন্ধনাদি করিতেন। বাড়িতে দাসদাসী ছিল না। স্বামীজীও মাঝে মাঝে রাঁধিতেন এবং ইংরেজ বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খিচুড়ী,

নিরামিষ ডালনা প্রভৃতি ভারতীয় খাদ্য তাঁহার করাইতেন। গুড্‌উইন রান্না করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেন না।

"স্বামীজী যেদিন সন্ধ্যার পর সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন সেদিন তাঁহার সুনিদ্রা হইত না। মস্তকে রক্ত উঠিয়া মস্তিষ্ক গরম হইয়া যাইত। অভেদানন্দ রাত্রি জাগিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সেবাকার্য করিতেন। স্বামীজীর আহার সম্বন্ধে কোনো নিয়ম ছিল না। কোনোদিন খুব পেট ভরিয়া মৎস্যাদি আহার করিতেন, আবার কোনো দিন ফলাহার, কোনো দিন উপবাস বা অর্ধ উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ অনিয়মের জন্য তিনি প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগিতেন। অভেদানন্দ তাঁহাকে আহার সুনিয়মিত করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেন।"

লণ্ডনের বেদান্ত সমিতির সভাপতিরূপে স্বামী অভেদানন্দ প্রায় বৎসরখানেক কৃতিত্বের সহিত কাজ করেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হন।

বেদান্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তখন সারা আমেরিকাতে এক বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেখানকার শিক্ষিতসমাজে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জাগিয়া উঠিয়াছিল বিস্ময়কর শ্রদ্ধা। স্বামী বিবেকানন্দের ঐ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল একটি ক্ষুদ্র উদারপন্থী দলের মধ্যে। পরে স্বামী অভেদানন্দ ঐ আন্দোলনকে স্থায়িত্ব দেন, এবং আরো বিস্তারিত করিয়া তোলেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর তিনি আমেরিকায় বসবাস করেন এবং নিজের প্রতিভা কর্মকুশলতার গুণে সে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হন।

সেদেশে গোড়ার দিকে অভেদানন্দকে দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করিতে হয়। নিজের স্মৃতিচারণে তিনি লিখিয়াছেন[১], 'স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের যতটুকু সূত্রপাত করেছিলেন আমেরিকায়, তা সফল ক'রে তুলতে আমি উপায় খুঁজতে লাগলাম। কাজ চালাবার জন্য আমার কাছে তখন টাকা পয়সা কিছুই ছিল না বা কোনোরকম দানও ছিল না। কাজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমাকে একাই ঘরভাড়া ও হোটেলের খরচপত্র, লেকচার হলের ভাড়া, নিজের পকেট খরচা, বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও অন্যান্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার টাকা-পয়সা সবই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ক্লাস ও সাধারণ বক্তৃতার পর শ্রোতারা স্বেচ্ছায় যে যা দিত তা' ছাড়া টাকা-পয়সা পাবার আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু আমার খরচ, তার তুলনায় আর খুব সামান্য ছিল। কাজেই নিজের সকল কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সে সময়ে ছাত্রদের কাছেই আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমার অনেকদিন খরচ সংকুলান করতে হয়েছে। এটা ছিল একরকম ভারতের সন্ন্যাসীদেরই ভিক্ষাবৃত্তির মতো।"

ক্রমে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, স্বামী অভেদানন্দের মনীষা প্রতিভাদীপ্ত ভাষণ, বাগ্মিতা এবং পূত চরিত্রে আকৃষ্ট হইতে থাকেন আমেরিকার একদল বুদ্ধিজীবী ও মুমুক্ষু নরনারী। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল তাঁহার ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানের কৌশল। আবেগ ও ভাবময়তা অপেক্ষা যুক্তিতর্কের সাহায্যই তিনি বেশী পরিমাণে নিতেন। বেদান্তে পরম

১ লীভস্ অব্ মাই ডায়েরী ' অভেদানন্দ (অনুবাদ প্রজ্ঞানানন্দ)

তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য জীবনধারার কোনো বিরোধ নাই, এ কথাটি সর্বদাই তিনি জোর দিয়া বলিতেন।

"হিন্দুইজ্‌ম্ ইনভেডস আমেরিকা'র লেখক মিঃ ওয়েনডন টমাস অভেদানন্দের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,[1] "স্বামী অভেদানন্দের মধ্যে আপন ক'রে নেবার শক্তি বিশেষভাবে আমাদের নজরে পড়েছে। মার্কিন দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর বাণী এবং জীবনধারাকে তিনি মিশিয়ে নিয়েছিলেন।...ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এবং কর্ম-পরিধির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি—স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বিশ্ববরেণ্য নেতার চেয়ে প্রাচ্যের বেদান্ততত্ত্বকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে বরং অধিকতারূপে খাপ খাওয়াতে পেরেছিলেন। জ্বলন্ত ও অনর্গল ভাষা-নিঃসারী বাগ্মিতা দিয়ে অভিভূত না ক'রে সত্যকার যুক্তিতর্ক এবং নূতন নূতন আকর্ষণীয় তথ্যের সাহায্যে শ্রোতার মন জয় করার দিকে তিনি বেশী নজর দিয়েছিলেন।"

যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টান ধর্মসম্পর্কে অভেদানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় যে নূতন মূল্যায়ন করেন তাহা আমেরিকার মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধ্যাপক কর্সন এ প্রসঙ্গে বলিয়া-ছিলেন, "আপনার বক্তৃতা যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে আমার ধারণার জগতে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে। ...যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে এমনি এক চূড়ান্ত মীমাংসা আপনি করেছেন যাতে গোঁড়ামি ভাবাপন্ন খ্রীষ্টান মতকেও পরিশেষে আপনার সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে।"

অদ্বৈততত্ত্ব নিয়া অভেদানন্দের সঙ্গে আমেরিকার প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস-এর দীর্ঘ বিতর্ক হয়। অধ্যাপক জেমস অবশেষে বললেন, স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ ও যুক্তিতর্কের দিক হইতে বিচার করিলে অদ্বৈততত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার নিজের দিক হইতে ইহা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই বিতর্কের সময় রয়েস, লানমান, শেলার, লুই জেমস প্রভৃতি প্রখ্যাত অধ্যাপকেরা উপস্থিত ছিলেন, সবাই স্বামী অভেদানন্দের মনীষা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বারের প্রচারকর্মে আমেরিকায় উপস্থিত হন। স্বামী অভেদানন্দ ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা জাঁকাইয়া বসিয়াছেন, নিউইয়র্কেও বেদান্ত সমিতি তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার সাফল্য দেখিয়া বিবেকানন্দ সোল্লাসে কহিলেন, "নিউইয়র্কের দ্বারে আমি তিন তিনবার আঘাত করেছিলাম, কোনো সাড়া পাই নি। আমার খুব আনন্দ হয়েছে, দেখছি তুমি একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করেছো, নিউইয়র্কে এই প্রথম আমাদের সমিতির নিজস্ব গৃহ হল।"

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের পঁচিশ বৎসরের প্রচারের ফল হয় সুদূরপ্রসারী। এ সম্পর্কে নিজের এক ভাষণে তিনি বলিয়াছেন

দেবা "আমার বেদান্ত প্রচারের ফলে আমেরিকায় অনেক খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের চোখ খুলিয়া নম্যকেছ এবং গীর্জার উপাসনার সময় তাঁহারা বেদান্তের ভাব গ্রহণ করিয়া ঈশাহী ধর্মের এবার সগুলি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সত্যান্বেষী ও চিন্তাশীল

লণ্ডনে ঈশাহী ধর্মের গোঁড়ামিপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস করেন না। এখন আমেরিকাতে বর্ণনা দিয়াছেন, ন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। 'নিউ থট' 'খ্রীষ্টান সায়েন্স', 'স্পিরিচুয়্যা .স্ট লাগিলেন। গুডউইন স্ব.

করিতেন। অভেদানন্দ বাণী প্রজ্ঞানানন্দ ; ২ ঐ-ঐ।

ছিল না। স্বামীজীও মাঝে মাঝে

সোসাইটী' প্রভৃতি নব ধর্মমত প্রচারিত হইতেছে। আর এই সকলগুলিই হইতেছে মুখ্য গৌণভাবে আমাদের পঁচিশ বৎসর বেদান্ত প্রচারের ফল। খ্রীষ্টান সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাত্রী মেরী বেকার এডি গীতার কয়েকটি শ্লোকের উপর তাঁহার সম্প্রদায়ের বুনিয়াদ খাড়া করিয়াছেন। 'নিউ থট' সম্প্রদায়ের সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র এবং তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনিই সব হইয়াছেন এবং তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া কোনো ব্যক্তিকে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তবে তাঁহারা 'খ্রীষ্টত্ব' নামক আধ্যাত্মিক আদর্শকে স্বীকার করেন। আর 'খ্রীষ্টত্ব' সর্বব্যাপী; ইহা আমাদের অন্তরেই বিরাজমান। সত্য কথা বলিতে কি তাঁহারা মনে করেন—প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বরূপতঃ 'খ্রীষ্ট'। এই উদার মতবাদ গোঁড়ামিপূর্ণ খ্রীষ্টধর্মের গোড়ায় কুঠারাঘাত করিয়াছে। কারণ গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ যীশুখ্রীষ্ট নামক এক ব্যক্তিতে বিশ্বাসী এবং মনে করেন যে, খ্রীষ্ট তাঁহার রক্ত দিয়া পাপী-তাপীদের পাপতাপ দূর করিয়াছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই প্রকারের পাপ হইতে মুক্তি বিশ্বাস করেন না। শিক্ষিত ব্যক্তি-গণ বিশেষত যাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আর 'অনন্ত নরকে'র মতবাদে আস্থা স্থাপন করেন না। এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এখন প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

"পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আর তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। আর ইহাও বিশ্বাস করেন না যে, যীশুখ্রীষ্টের রক্তই সমস্ত পাপ দূর করিবে। তবে তাঁহারা 'খ্রীষ্ট' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করেন। ইহাকে তাঁহারা 'খ্রীষ্ট' বলেন এবং তাঁহারা আরও বলেন যে, এই 'খ্রীষ্টত্ব' প্রত্যেক জীবাত্মাতে সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহা জাগরিত হইবে। ইহা সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহা জাগরিত হইলে প্রত্যেকেই এক একজন 'খ্রীষ্ট' হইবে। তাঁহারা খ্রীষ্টত্বের এই প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পঁচিশ বৎসর পূর্বের খ্রীষ্টধর্ম ও আমেরিকার বর্তমান খ্রীষ্টধর্ম এক নহে। বর্তমানে বেদান্ত প্রচারিত এক অনন্ত ও সত্য সত্তার উপরেই খ্রীষ্টধর্মকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হইতেছে। বেদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' প্রভৃতি বাণী আজ খ্রীষ্টান সায়েন্স, নিউ থট ও স্পিরিচুয়্যালিজম্ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যে নূতন ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছি তাহা দ্বারা তাঁহারা খুবই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

"ইউরোপেও ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিতরূপে তাহার ধাক্কা লাগিয়াছে। তাই ইংলণ্ডেও আজ অসংখ্য 'খ্রীষ্টান সায়েন্স'-এর চার্চ এবং বহু 'নিউ থট' মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। স্যার আর্থার কনান ডয়েল, স্যার অলিভার লজ প্রভৃতি প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণ বেদান্তের ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বর্তমানে প্রেততত্ত্ব অনুশীলন করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আত্মা নিত্য ও অবিনশ্বর, মৃত্যুর পরে আমাদের অনন্ত নরকে যাইতে হয় না। স্যার অলিভার লজের কথাই ধরুন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং তিনি তাঁহার 'রেমণ্ড' নামক পুস্তকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমরা মৃত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারি।

দীর্ঘ গবেষণা, ভাষণ এবং লেখার মধ্য দিয়া মনীষী অভেদানন্দ আমেরিকার শিক্ষিত মহলে ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যটিও তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতের একটি অপরূপ ভাবমূর্তি গড়িয়া উঠে। তিনি বলিয়াছিলেন। "আর্য সভ্যতার অরুণালোকে ভারতের দিক্‌চক্রবাল উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রথমে। গ্রীসে রোমে, আরবে বা

পারসে। নয়, ভারতবর্ষই সকল কিছু অধ্যাত্মশাস্ত্র, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, কলা-
া. সংগীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সভ্যতাবের নৈতিক ধর্মের আদিভূমি।

হিন্দুরাই প্রথমে বৈদিক ঋকৃছন্দ থেকে ংগীতকলার বিকাশ সাধন করেছিলেন। বিশেষ ক'রে সামবেদ তো গানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। গ্রীকদের বহুশত বৎসর পূর্বে সপ্তস্বর ও তিনগ্রামের প্রচলন .তবাসীরা জানতেন। সম্ভবত গ্রীকরাই ভারতবর্ষের কাছ থেকে ঐ সমস্ত জিনি ক্ষা করেছিলেন। তোমাদের একথা জেনে কৌতূহল হবে যে, পাশ্চাত্যের া খ্যাত সংগীতবিদ্ ওয়াগ্‌নারও হিন্দু সংগীতের কাছে—বিশেষ করে তার 'লিডিং মোটিভ'-এর জন্য ঋণী ছিলেন। ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে ওয়াগ্‌নারের সংগীত পদ্ধতির অনেক মিল আছে। এইজন্যই বোধহয় পাশ্চাত্য সংগীতার্থীদের পক্ষে তাঁর সংগীত তত সহজবোধ্য ছিল না। ওয়াগ্‌নার কয়েকটি ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রের লাটিন অনুবাদ পড়েছিলেন। এবং জার্মান দার্শনিক সোপেন হাওয়ারের সঙ্গে তিনি ঐ সম্বন্ধে আলোচনাও করেছিলেন।"

স্বামী অভেদানন্দ আরও বলিয়াছেন, "পীথাগোরাস যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন—এ'কথা বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। পীথাগোরাস হিন্দুদের কাছ থেকে জ্যামিতি ও অঙ্কশাস্ত্র, জন্মান্তর ও পরলোকবাদ, নিরামিষ আহার ও পঞ্চভূতের তত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা করেছিলেন এবং গ্রীসে ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকেদের ভিতর সেগুলি প্রচার করেছিলেন। ইহুদীদের এসেনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সব ভাবধারার প্রচলন ছিল। মনে হয় এসেনীরা গ্রীকদের কাছ থেকে পরে ঐ সমস্ত ভাব গ্রহণ করেছিল। ইজিপ্ট ও গ্রীসের লোকেরা চারটি ভূততত্ত্ব (উপাদান বা এলিমেণ্ট) স্বীকার করত, তবে আকাশতত্ত্ব তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। পরে হিন্দুদের কাছ থেকে ঐ দু'টি দেশ আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করেছিল।

আমেরিকায় বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের প্রচারের পূর্বেও বেদান্তের ভাবধারা কোনো কোনো আমেরিকান মনীষীর মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছিল। তবে এ ভাবধারা ছিল অতিশয় ক্ষীণ। এ সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন "র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো এমার্সন আমেরিকার একজন জগদ্বিখ্যাত মনীষী। তিনিই সর্বপ্রথমে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে এসব ভাব আছে। এই তো তাঁর এস্‌সে অন ইম্মর্টালিটি'-র (আত্মার অমরত্ব প্রবন্ধের) ভিতর নচিকেতার গল্প আছে। তাঁর 'ব্রহ্ম' বলে একটি কবিতা আছে। গীতায় যে আছে,—য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে—এই ভাব সে কবিতায় রয়েছে—এরই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। তখন চার্লস উইল্‌কিন্স সাহেবের গীতার ইংরেজী অনুবাদ ছিল। এই অনুবাদ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় হয়। এমার্সন আর কার্লাইল দুজনে বন্ধু ছিলেন। কার্লাইলের সঙ্গে এমার্সনের দেখা হলে তিনি এমার্সনকে গীতা উপহার দিয়ে বলেছিলেন—'এ একখানা আশ্চর্য বই। এতে আমার সব সন্দেহের উত্তর পেয়েছি এবং আমার মনে হয়, আমার ন্যায় আপনিও গীতার উপদেশ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পাবেন।' এমার্সন এই গীতা পড়েই 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে তাঁর ঐ কবিতা লিখেছিলেন।

"এমার্সন ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ম্যালরি আমার ওই 'ব্রহ্ম' কবিতাটির মানে জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, এসব এমার্সন কোথা থেকে পেয়েছিলেন? আমি তাঁকে গীতার ওই কথা বললুম।

আমি এমর্সেনের লাইব্রেরী দেখেছি। সেখানে গীতা, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদ আছে [১]।"

আমেরিকার ক্রিশ্চয়ান সায়েন্স নামক তত্ত্ববাদের প্রভাব যথেষ্ট। স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন, আমেরিকায় ক্রিশ্চয়ান সায়েন্সের খুব প্রভাব। এই তত্ত্ব যে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মবিজ্ঞানের কাছে ঋণী তা এই মতাবলম্বীরা স্বীকার করিতে চান না।

এই মতবাদ প্রবর্তন করিয়াছিলেন মিসেস এডি। তাঁহার রচিত সায়েন্স অ্যাণ্ড হেল্থ' গ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ আমেরিকায় হইয়াছে। এই গ্রন্থের চতুর্বিংশ সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য, ঐ সংস্করণের অষ্টম অধ্যায়ে গীতা হইতে স্পষ্ট উদ্ধৃত বাণী ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ বহু শ্রম স্বীকার করিয়া এই সব তথ্য আমেরিকায় বাস করার কালে উদ্‌ঘাটন করেন এবং চোখে আঙুল দিয়া আমেরিকানদের দেখাইয়া দেন যে তাঁহাদের জনপ্রিয় ক্রিশ্চয়ান সায়েন্স মতবাদ ভারতীয় দর্শনের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হইয়াছে।

আমেরিকার নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া এবং ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্ত হইয়াও অভেদানন্দ কোনো দিন মানসিক স্থৈর্য হারান নাই। মাঝে মাঝে সহকর্মীদের বলিতেন, শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আর বিবেকানন্দের অপার স্নেহ প্রীতির কথা স্মরণ করিয়াই এই দীর্ঘ সংগ্রামে তিনি যুঝিতে পারিয়াছেন।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী সারদামণির স্নেহাশিসও তাঁহাকে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছে।, মা সারদামণির একটি পত্রে তাঁহার কিছুটা পরিচয় মিলে। তিনি লিখিয়াছেন, "কল্যাণীয়েষু, গতকল্য তোমার কুশলসহ এক পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার প্রেরিত পার্সেল পাইয়াছি। তুমি শারীরিক ও মানসিক ভালো আছ জানিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমার কার্য ভালোরূপ হইতেছে জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমরাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখোজ্জ্বল করিতেছ। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি এবং আশীর্বাদ করিতেছি তোমার কার্য যেন সফল হয়। তিনি তোমার এই মহৎ কার্যে সহায় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? আহারাদি সম্বন্ধে আর তাদৃশ কঠোরতা করিবে না। তুমি সেখানে একদম নিরামিষ আহার না করিয়া উত্তম মৎস্যাদি আহার করিবে। তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে উহা খাইবে। সর্বদা শরীরের দিকে নজর রাখিবে। মধ্যে মধ্যে নির্জন স্থানে বাস করিবে। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি তোমাদের মা।"

শ্রীমার উদ্দেশে প্রণতি জানাইয়া অভেদানন্দ তাঁহার ভক্তদের মাঝে মাঝে বলিতেন, "আলমবাজার মঠে থাকতে 'শ্রীমার স্তোত্র' রচনা করে শ্রীমাকেই প্রথম শোনালাম। তিনি শুনে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'তোমার মুখে সরস্বতী বসুক'। 'মূকং করোতি বাচালং' সত্যই আমার মতো মূককে তিনি বাচাল করেছিলেন। নইলে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার মতো দেশে, ধুরন্ধর সব পণ্ডিত ও পাদরীদের কাছ থেকে আমার মতো নগণ্য একজন ভারতবাসী কি জয়টীকা নিতে পারে? সবই শ্রীমা ও শ্রীঠাকুরের কৃপা।"

একনিষ্ঠভাবে, সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া, সমগ্র সত্তা দিয়া অভেদানন্দ আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে। কি পরিব্রাজক জীবনে, কি প্রচারক ও আচার্য

১ মহারাজের কথা স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

জীবনে, সর্বত্র সর্বসময়ে তিনি বিশ্বাস করিতেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন, ঐশ্বরীয় কর্ম সাধনায় যোগাইতেছেন দিব্য প্রেরণা।

উত্তরকালে কথা প্রসঙ্গে নিজ ভক্তদের কাছে ঠাকুরের এক করুণালীলার কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন : "তিনি যে সব সময়েই পিছনে থেকে আমাদের (তাঁর সন্তানদের) সাহায্য ও রক্ষা করতেন ও এখনও সদা সর্বদা করেন তার জলন্ত নিদর্শন আমি ভূরি ভূরি পেয়েছি। তাঁর উপস্থিতি জীবনে অনুভব করেছি বহুবার। তিনি যে অশেষ করুণাময়, আমাদের হাত ধরেই সর্বদা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—একথা মর্মে মর্মে আমি বুঝেছি।

"লণ্ডন থেকে সেবারে আমেরিকায় যাব। জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিক। ইংলণ্ডের বন্দর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তার নাম ছিল লুসিটেনিয়া। টিকিট কিনতে গিয়ে (৬ই মে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। টিকিট কিনবো এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন টিকিট কিনতে আমায় স্পষ্ট নিষেধ করল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাবলাম মনের ভুল। এদিকে সেদিকে তাকালাম, কাকেও দেখতে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিনতে কিন্তু সেবারেও ঠিক সে'রকম। তখন টিকিট কেনা আর হল না। বাসায় ফিরে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম—কালই না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি বড় বড় হরফে লেখা S. S. Lusitania is no more অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের বুকে কাল ধায়ে ডুবে গেছে। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। চোখে জল এল। বুঝলাম শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় রক্ষা করেছেন[১]।

কুসুমের মতো মৃদু এবং বজ্রের মতো কঠোর ছিলেন অভেদানন্দ। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বলিতেন, তাঁহার অন্তর ছিল শিশুর সরলতায় পূর্ণ। বহিরঙ্গ জীবনের যে কোনো কাজে যে কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে ভুল বুঝাইতে সক্ষম হইত। আবার তাত্ত্বিক বিচারের সময় এই মানুষটির ভিতরেই দেখা যাইত বিস্ময়কর বিশ্লেষণ শক্তি, ক্ষুরধার তত্ত্বোজ্জ্বল বুদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত স্থাপনের দৃঢ়তা।

অভেদানন্দের আমেরিকান শিষ্য সিস্টার শিবানী (মেরী ল' পেজ) দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার এই জীবন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে।[২] শিবানী লিখিতেছেন, আমাদের বর্ষীয়সী বান্ধবী মিসেস কেপ একদিন আমাদের মতো কয়েকটি তরুণী ছাত্রীকে বললেন "দ্যাখো, যে কোনো সামান্য ঘটনা সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ উপস্থিত হবে, সে সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য অবশ্যই শুনে নিতে চেষ্টা করবে। আমি একটা সামান্য ঘটনার কথা বলছি। সেদিন এখানে ছিল রামকৃষ্ণ উৎসব। বেশী টাকা খরচ করে একটি মনোরম পুষ্পস্তবক আমি কিনে নিয়েছিলাম। স্বামীজী তখন ভজনালয়ের বেদীর কাছে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমি সোৎসাহে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে স্তবকটি দেখিয়ে বললাম, "স্বামীজী, দেখুন কি চমৎকার আমার এই পুষ্পার্ঘ্য, আপনি কি এটি পছন্দ করছেন না?" মুহূর্তে স্বামীজী তাঁর মুখটি ঘুরিয়ে নিলেন, একটি কথাও আমায় বললেন না, মনোরম পুষ্পগুচ্ছটি সম্পর্কেও করলেন না সামান্যতম মন্তব্য।

---

১ মন ও মানুষ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

২ স্বামী অভেদানন্দ ইন্ আমেরিকা (অ্যান অ্যাপোসল্ অব্ মনিজম্) : সিস্টার শিবানী

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কখনো তো এমন রূঢ় আচরণ স্বামীজী আমাদের সঙ্গে করেন না। শুধু তাই না, তাঁর মতো এমন ভদ্র ও কোমল আচরণ খুব কম লোকেরই আমরা দেখতে পাই। তবে কেন এমনটি আজ করলেন? আমি অন্তরে তীব্র আঘাত পেলাম, বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। সমিতির ভবন ত্যাগ করার আগে স্বামীজীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম আমি, কিন্তু তিনি তা এড়িয়ে একপাশে সরে পড়লেন।

আমি সব ব্যাপারই বেশ তলিয়ে দেখতে চাই, এটা আমার চিরদিনের অভ্যাস। কয়েক দিন পরে আবার স্বামীজীকে আমি চেপে ধরলাম। বললাম, 'সেদিন আপনার ঐ রূঢ় আচরণের মধ্য দিয়ে আমায় কোনো শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। কি সে শিক্ষা তা আমায় খুলে বলুন।' উত্তরে তিনি শুধু বললেন, 'সেদিন ঐ ফুলের গুচ্ছটি কি তুমি আমার জন্যে এনেছিলে, না আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের জন্যে এনেছিলে?'

মিসেস কেপ তৎক্ষণাৎ এ কথার তাৎপর্য বুঝিয়া নিলেন। যে পুষ্পার্ঘ্য প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য আনা হইয়াছে, তাহা দিয়া প্রভুর দাস অভেদানন্দের মন ভুলাইবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে সমীচীন হয় নাই।

সিস্টার শিবানীর কথিত আর একটি ঘটনায় অভেদানন্দের পুরুষ-সিংহ মূর্তিটির পরিচয় পাই। "সেদিন আশ্রমের লাইব্রেরীতে বসে কাজ করছেন আমাদের প্রিয়দর্শিনী সেক্রেটারী এবং অপর একজন ছাত্রী। হাউসকীপার এ সময়ে একটি অপরিচিত ব্যক্তিকে সেই কক্ষে নিয়ে এল। আশ্রম সম্বন্ধে দু'চারটি প্রশ্ন করার পরই লোকটি নেমে এল ব্যক্তিগত স্তরে। উচ্চ স্বরে শুরু করল স্বামীজী সম্পর্কে অপমান পূর্বক মন্তব্য এবং গালিগালাজ। জানতে চাইল, কেন এই সব কৃষ্ণকায় হিন্দুদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের ভদ্রমহিলারা সামাজিকভাবে মেলামেশা করছেন।

"লাইব্রেরীতে উপবিষ্ট মহিলাদ্বয় উত্তেজিত স্বরে ঐ লোকটির কথার প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এমন সময় সিঁড়িতে শোনা গেল ভারী জুতোর পদধ্বনি। মুহূর্ত মধ্যে দেখা গেল, স্বামীজী ঐ অপরিচিত অভদ্র লোকটিকে সবলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বাইরে। সিঁড়ির ওপারে রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে তার দেহ। প্রয়োজনবোধে স্বামীজীকে নির্দ্বিধায় এ ধরনের বীর্যবত্তা প্রকাশ করতে দেখেছি। এবং তখন কেউ তাঁর গতিরোধ বা প্রতিবাদ করতে সাহসী হতো না। এই ঘটনার কথা আশ্রমমণ্ডলীতে অচিরে ছড়িয়ে পড়ল। ভক্তেরা সবাই আনন্দিত হল এ ঘটনার কথা শুনে, স্বামীজীর প্রতি আস্থা তাদের বহুগুণ বেড়ে গেল, তাঁর ভাবমূর্তি আরো প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। গুরু হিসাবে এবং সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে স্বামী অভেদানন্দের জুড়ি নেই, এ উপলব্ধিটি সেদিন এসে গেল অনেকেরই মনে।"

সিস্টার শিবানী বলিয়াছেন, "স্বামী অভেদানন্দের যোগশক্তি, রোগনিরাময়ের শক্তি সম্পর্কে অনেকেরই আস্থা ছিল। কিন্তু স্বামীজী নিজে কখনো এ সম্বন্ধে হাঁ বা না, কিছুই বলিতেন না। আমার কাছে সব চাইতে বিস্ময়কর মনে হয়েছে স্বামীজীর একটি যোগবিভূতির প্রয়োগ। আশ্রমের এক ছাত্রীর তরুণী বোনটির মাথা খারাপ হয়ে যায়। আশ্রমে প্রায়ই সে আনাগোনা করতো, স্বামীজীর সঙ্গে তারও বেশ জানাশোনা ছিল। ঐ রুগ্না মেয়েটিকে উন্মাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল এবং ডাক্তারেরা শেষটায় বলে দিলেন চিকিৎসার আর কোনো ফল হবে না।

"এবার ঐ পাগল মেয়েটির দিদি, আমাদের আশ্রমের ছাত্রীটি শরণ নিল স্বামী অভেদানন্দের। বলল, 'আপনি মহাত্মা, আপনার যোগশক্তির ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমার বোনের উন্মাদরোগ ভালো করুন, তাঁকে বাঁচিয়ে তুলুন।' অভেদানন্দ যতই বলেন, তিনি যোগী নন, যোগবলে রোগ আরোগ্য করার পদ্ধতি তিনি জানেন না, ছাত্রীটি ততই হয় নাছোড়বান্দা, অবশেষে তাকে সেখান থেকে সরাতে না পেরে স্বামীজী বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তিন দিন পরে আমার কাছে এসো. তখন আমি তোমার এ প্রার্থনার জবাব দেবো।'

"ছাত্রীটি তাই করল, তিন দিন পরে উপস্থিত হল আশ্রমে। অভেদানন্দ তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন সেই উন্মাদাগারে। সেখানে গিয়ে রোগিনীর পাশে প্রশান্ত বদনে তিনি উপবিষ্ট হলেন, স্নেহভরে তার হাত ধরে রইলেন, আর মাঝে মাঝে দু একটি টোকা দিতে থাকলেন। কথা কিন্তু তিনি বেশী বললেন না, বেশীর ভাগ সময়ই রইলেন অন্তর্লীন অবস্থায়, কোনো চাঞ্চল্যকর ম্যাজিকের ব্যাপার নেই, হৈ-চৈ নেই। প্রশান্ত ও নির্বিকার-ভাবে বসে একান্তভাবে শুধু তিনি তাকিয়ে রইলেন খানিকটা সময়।

"এর কয়েকদিন পরেই উন্মাদ মেয়েটি আরোগ্য লাভ করল, শুধু তাই নয়, হাস-পাতাল থেকে ডাক্তারেরা সানন্দে তাকে ছেড়ে দিল। তখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, মনের বল আস্থা বিশ্বাসকরবূপে আবার ফিরে পেয়েছে। কৃতজ্ঞ ছাত্রীটি তার বোনের এই আরোগ্য লাভের পর স্বামীজীর কাছে এসে উপস্থিত হয় তাঁকে কিছু অর্থ ও সোনা গয়না ভেটস্বরূপ দিতে। তার কথা শুনে দৃঢস্বরে স্বামী অভেদানন্দ বলে ওঠেন, সত্য কখনো বিক্রি করা যায় না, তা কেনাও যায় না। এক্ষেত্রে আমি কিছুই করি নি। আসলে যোগমুক্তি সম্পর্কে যা কিছু করবার করেছেন আমার পরম কৃপালু গুরুদেব।"

আর একটি কাহিনীও পাওয়া যায় সিস্টার শিবানীর লেখায় তাঁহার এক নিকট সেবীদের একজন তরুণী বান্ধবী ছিল। এই মেয়েটি কিরূপ অলৌকিকভাবে অভেদা-নন্দের কৃপাপ্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা দিয়াছেন সিস্টার শিবানী। "মেয়েটি সেদিন তার অফিসে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে মুষড়ে পড়ে এবং আমার বাসকক্ষে ছুটে চলে আসে। আমি তখন বাইরে ছিলাম। আমার অবর্তমানে মেয়েটি সেখানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং আমাদের হাউসকীপারের সাবধানতার ফলে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর আমি ঘরে ফিরে আসি এবং সারা বিকেলবেলাটা মেয়েটির ঝঞ্ঝাট আমাদের পোহাতে হয়।

"মেয়েটি স্বামীজীর কথা আমাদের কাছে আগে শুনেছিল। সন্ধ্যেবেলায় নিজেই বললে, স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে সে আশ্রমে যাবে। নির্ধারিত সময়ে আমরা সবাই হলঘরে উপস্থিত হলাম। আশ্চর্যের কথা, বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ হঠাৎ বলা শুরু করলেন আত্মহত্যার প্রবণতার কথা। বললেন, এই প্রবণতার ফল মানুষের দেহ আত্মার পক্ষে বিপর্যয়কর। এই প্রবণতায় যারা ভুগছে তাদের নানা রকমের আশা ও আশ্বাসের বাণীও তিনি এসময়ে শোনালেন।

"বক্তৃতা শোনার পর আমাদের ঐ মানসিক দৌর্বল্যের রোগীটি বলে উঠল, সে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। সাক্ষাতের সময় সে স্বামীজীকে কৃতজ্ঞতার সুরে ধন্যবাদ জানালে, তাঁকে খুলে বলল নিজের মানসিক দুরবস্থার কথা। খুব আশ্চর্যের কথা, স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা করার তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ মেয়েটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে

উঠিল। এবার কেউ যদি আমার প্রশ্ন করে, কি ক'রে স্বামীজী সেদিন ঐ মেয়েটির মনের সংকটের কথা জানতে পেরেছিলেন, কেনই বা আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তার উত্তরে আমি বলবো, স্বামীজী যথার্থই ছিলেন একজন অন্তর্যামী মহাপুরুষ।"

আমেরিকায় প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল অভেদানন্দ অবস্থান করেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে সতেরবার তাঁহাকে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত একনিষ্ঠ কর্মসাধনার ফলে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের ঈপ্সিত কর্ম তিনি উদ্‌যাপন করেন। বেদান্তের বাণী আমেরিকায় ও বিশ্বের অগ্রসর দেশগুলিতে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ের মধ্যে আমেরিকায় বেদান্ত সমিতিও সুসম্বদ্ধ রূপে সংগঠিত হইয়া উঠে।

এবার অভেদানন্দ সংকল্প করেন জন্মভূমি ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য। জাপান, চীন ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি কলিকাতায় উপনীত হন।

আমেরিকায় থাকিতে অভেদানন্দ রুশ পর্যটক নিকোলাস নটোভিচের রচিত 'দি আননোন্ লাইফ অব জেসাস্ ক্রাইস্ট' পাঠ করিয়াছিলেন, নটোভিচ তাঁহার এ বইয়ে তিব্বতের হিমিস মঠে রক্ষিত একটি পুঁথির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে যীশু-খ্রীষ্টের তিব্বত ও ভারতে আসার বিবরণ আছে। তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে অভেদানন্দের কৌতূহল ও গবেষণা-নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। তাই ভারতে ফিরিয়া তিনি তিব্বতে উপস্থিত হন এবং হিমিস মঠে গিয়া প্রধান লামার নিকট হইতে নটোভিচ প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান করেন। সেই অনুসন্ধানের চাঞ্চল্যকর তথ্য তিনি তাঁহার 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অদ্বৈতবাদ ও রামকৃষ্ণতত্ত্ব প্রচারে অভেদানন্দ আগ্রহী হন। তদনুসারে কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হইতে নূতন প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত হইতে থাকে।[১]

কলিকাতায় ও দার্জিলিংএর মঠ ভবনে বহু মুমুক্ষু ভক্ত বহু দেশনেতা ও কর্মী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। কর্মযোগ, মনীষা ও তত্ত্বজ্ঞানের মিলিত মূর্ত বিগ্রহ এই মহা-পুরুষের বাণী ও পূত চরিত্র তাঁহাদের জীবনে জাগাইয়া তুলিত আত্মিক সাধনার প্রেরণা।

আচার্য হিসাবে স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এক অসামান্য দিক্‌ দিশারী, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বহু ভাগ্যবান্ ভক্ত-সাধক তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন. তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্পর্কে তিনি একদিন বলিলেন, "ব্রহ্মানন্দে ছোট ছোট

১ অজস্র সংখ্যক বক্তৃতাদানের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ব্যবস্থাপনায় তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। অভেদানন্দজীর প্রবর্তিত বিশ্ববাণী পত্রিকা এই মঠের মুখপত্র।

সমস্ত সুখ অন্তর্নিহিত আছে, আর ছোট ছোট সুখ সমস্ত এই ব্রহ্মানন্দের এক এক কণা মাত্র। বৃহদারণ্যকে আছে —এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। যারা এই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেয়েছে তারা টুকরো টুকরো আনন্দ চায় না। তারা আনন্দময় হয়ে আছে। সংসারসুখের অভাববোধ কখনো তাদের হয় না। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর এ সংসার তুচ্ছ হয়ে যায় আর এ সুখ তো ক্ষণস্থায়ী। একটু বিচার করলে দুঃখই তো বেশী দেখা যায়।

অপরদিকে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সুখ নিত্য। তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন তা নিরপেক্ষ, অর্থাৎ অন্য কোনো জিনিসের অপেক্ষা করে না।

গীতার 'কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন' শ্লোকটি নিয়া আলোচনা চলিতেছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর ঈশ্বর করছ ; কে ঈশ্বর ? আকাশে কি বসে আছেন ? তাঁকে কি ক'রে সেবা করবে ? এই সমস্ত মনুষ্য সমষ্টির মধ্যে তাঁকে দেখ। তাঁকে বলা হয় বিরাট পুরুষ। এইভাবে তোমার সংসারে স্ত্রী পুত্রের ভিতর, পাড়াপ্রতিবেশীর ভিতর—নমঃশূদ্র, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ এই সবার ভিতর যে নারায়ণ আছেন তাকে দেখ। আর এই ঈশ্বরবুদ্ধি ক'রে নামযশ কি স্বার্থসিদ্ধি কিছুর দিকে লক্ষ্য না রেখে তাদের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের সেবা ক'রে যাও।

"তোমরা কি মনে কর—যে কাজ তোমরা করছ ভগবান্ অমনি তা বসে বসে লিখছেন আর তাই খতিয়ে খতিয়ে তিনি ফল ঢেলে দিচ্ছেন ? তা নয়। তাঁর সব কিছুর আইন আছে। তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। নিত্য কি—না অনাদি অনন্ত। শুদ্ধ অর্থাৎ তাতে কিছুমাত্র মলিনতা নেই। তারপর তিনি জ্ঞান-চৈতন্যস্বরূপ। তা ভগবান্ লাভ করতে হলে আমাদের সেই অবস্থা পেতে হবে। যেটা অনিত্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান কি বন্ধন, তা ত্যাগ করতে হবে। প্রতিদিন রাত্রিবেলা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, পাপ পুণ্য সব ভগবানেই অর্পণ করবে। ঠাকুর একটি ফুল নিয়ে মা'র পায়ে দিয়ে বললেন—'মা, এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য ; এই নে তোর অবিদ্যে , এই নে তোর ভালো, এই নে তোর মন্দ , আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে।' উপাসনার এই আদর্শ। ভগবানের চোখে ভালোমন্দ নেই। এই ধর আগুন। এতে যেমন রান্নাও হয়, শীতকালে বেশ গা গরমও রাখে। আবার ছেলেটি হয়তো পুড়ে গেল কি সর্বস্বান্ত হয়ে গেল, তখন বললে—ঈশ্বরের অভিশাপ। স্বার্থের হানি হলেই আমাদের মনে মন্দ হল। তা বলে আগুনের কি দোষ আছে বলতো ? এই ধর বিদ্যুৎ। দিব্যি ট্রাম চলছে, কিন্তু তার ছিঁড়ে মাথায় পড়লেই মন্দ হয়ে গেল। একই জিনিস ভালো মন্দ দুই-ই। তা ভালোটা নিতে গেলে মন্দটাও নিতে হবে।" "সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।" আগুন জ্বাললে ধোঁয়াটাও নিতে হবে বৈ কি। অ্যাব্‌সোল্যুট্ গুড্ বা নিছক ভালো এখানে নেই। মনে করতে হবে, এ সংসার ভগবানের। "আমি 'আমার' বললেই ফলভোগ। বাসনাবর্জিত হয়ে কাজ করা অভ্যাস করতে হবে[১]।"

আর একদিন স্বামীজী বুঝাইতেছিলেন, দেহের ভোগেচ্ছা ছাড়িয়া ব্রহ্মানন্দের দিকে মনকে চালিত করিতে হয়, এজন্য দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক বলিয়া ভাবার অভ্যাস করা দরকার। এ প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেহ থেকে আত্মাকে আলাদা ক'রে নিলে বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হয়ে যেতে হয়। এ আমরা ঠাকুরের হতে দেখেছি। চোখ হয়তো খোলা

১ মহারাজের কথা : চিৎস্বরূপানন্দ

আছে তাতে আঙুল দিলেও পাতা পড়ে না। মন নিশ্চল হলেই শরীর জড় হয়ে গেল। এই যে সব ব্যাপার, এ ঠাকুর দেখিয়ে শেখালেন—ব্যাখ্যা করেন নি। প্রত্যক্ষ দেখেছি হাত অসাড় হয়ে গেছে—সব যেন স্টিফ্, অনড়। কি কঠোর তপস্যাই না তিনি করেছিলেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া নেই, স্থিরভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এই রকম কত সাধনাই তিনি করেছিলেন।

"ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা হয়ে গেল যে দিনরাত ভাবের ঘোরে থাকতেন। তখন এক সাধু তাঁকে রুল দিয়ে খুব মেরে মেরে একটু জ্ঞান করাতো। আর সেই অবসরে হৃদয় জোর ক'রে কিছু খাইয়ে দিত। আঘাত বন্ধ হলেই আবার তাঁর সেই অবস্থা। সে যে কী—বারো বছর তিনি ঘুমান নি, চোখের পাতা পড়ে নি। এ অবস্থায় খুব কম সাধকই যেতে পারে। পরে তিনি বলতেন, 'ওরে, সে একটা ঝড় ব'য়ে গেছে। দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। তখন আমরা বুঝতে পারতুম না—অবাক হয়ে থাকতুম। এখন সব বুঝতে পারছি। দেহ থেকে আত্মা একেবারে আলাদা ক'রে ফেলেছিলেন, তাই এই বিদেহ অবস্থাতেও যাঁদের দেহ থাকে এমন মহাপুরুষ খুব কম।"

প্রণব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অভেদানন্দ সোৎসাহে বলিতেন, "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ—যত নাম তুমি চিন্তা করিতে পার, যা-ই কিছু পড় বা শোন, বিষ্ণুর সহস্র নামই হোক বা শিবের লক্ষ নামই বল না কেন—সবই ওই এক প্রণবেতে আছে। এই হচ্ছে যথার্থ তত্ত্ব। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ তো ওঙ্কারেরই ব্যাখ্যা। অকার জাগ্রত অবস্থা, উকার স্বপ্নাবস্থা, মকার সুষুপ্তি এবং নাদ তুরীয় অবস্থা। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি শব্দের এক একটি স্থান। 'অ'-এর কণ্ঠ থেকে উৎপত্তি। এর উচ্চারণে কোনো খিচ্ নেই, বেশ সরল। 'অ'-কারই বেদের মূল। 'ম' শেষ বর্গীয় বর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করে উচ্চারণ করতে হয়, আর 'উ' মাঝা-মাঝি। তা তুমি যত রকমের শব্দই উচ্চারণ কর না কেন সব এই এক ওঙ্কারেই আছে। খ্রীস্টানেরা প্রার্থনার শেষে যে 'আমেন' বলে সে এরই অপভ্রংশ।

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। এই ওঙ্কার জপ করতে হবে। পাথরেও এক এক ফোঁটা জল ক্রমাগত পড়লে এ একটা জায়গা ঠিক ক'রে নেবে। সেই রকম ক্রমাগত এক চিন্তা করতে হবে। মন অন্য জায়গায় গেলে হবে না। হাতে হরিনামের মালা ওদিকে কার সর্বনাশ করবে মনে ভাবছ—এতে কিছুই হবে না। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থ চিন্তা করতে হবে। এতে মনের মলিনতা, কলুষ প্রভৃতি দূর হয়ে যাবে—চিত্ত শুদ্ধ হবে। সংসারী মন বড় পাজী। তাই ভগবান্ কি শুধু ফুল মধু ছড়িয়ে শিক্ষা দেন? তা নয়। মাথায় ঘা দিয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু—এই রকম বারে বারে কত ঘা খেয়ে মনের শিক্ষা হচ্ছে। সংসারীর দিক থেকে এসব মহা অশান্তির কারণ বলে মনে হলেও ভগবানের দিক থেকে এ যথার্থ কল্যাণকর। তাই তো কুন্তী বলে-ছিলেন—হে ভগবান্, আমায় দুঃখ দাও। বল দিকিনি এভাবে প্রার্থনা জগতে আর কে করতে পারে? এই যে আছে না—যে করে আমার আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ। সব শ্মশান হয়ে গেলে মন নিরালম্ব হয়—আর তখনই ভগবান্ আসেন।"

আর একদিন ভক্তদের বলিতেছেন,[১] "ব্রহ্ম বা ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ। তুমিও তাই। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ। জ্ঞান তার প্রকাশের জন্য অন্য কিছু সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না।

১ মন ও মানুষ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

আলোকে জানার জন্য আর আলোর দরকার হয় না। তাই সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, কবে জ্ঞান লাভ করবে ঐ রকম ক'রে খতিয়ে দেখতে নেই। সাধন-ভজন তো আর আলু বেগুনের ব্যবসা নয় যে খতিয়ে দেখবে লাভ হল—কি লোকসান হল।

"সাধনভজনের বেলায় লাভ লোকসান যদি হয় তো তা একমাত্র সাধকের নিজের দোষের বা গুণের জন্য হয়। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়ই হবে, আর লোক দেখানো জপ-ধ্যান কর তো নিজে ফাঁকিতে পড়বে। আসল সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, আর চিন্তা করতে হয়, কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে করছ, কতটুকু তোমার মন উদার ও সংস্কারমুক্ত হয়েছে, পরের দোষদর্শন না ক'রে কতটুকু সকলের গুণের দিকে তোমাদের দৃষ্টি যাচ্ছে, নিজেকে যেমন ভালোবাস তেমনি কতটুকু অপর সকলকে তুমি ভালোবাস, কতটুকু স্বার্থবুদ্ধি ও কামভাব তোমার ভেতর থেকে দূর হয়ে গেছে—এই সব! এগুলোই তো খতিয়ে দেখার এবং বিচার করবার জিনিস। নইলে সাধন-ভজনও করছ, আর মনের মধ্যে কুসংস্কারগুলোকে জাগিয়েও রাখছ, এতে কিছু হবে না।

"তাই সাধন-ভজন করবার সময় একান্তই যদি জানতে চাও যে কবে তোমার সিদ্ধি-লাভ হবে, তা হলে একথাই মনে রাখবে যে, মনের সকল সংস্কার যেদিন দূর হবে সে'দিনই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। মনে সংকীর্ণতা থাকবে আর ভগবান্ লাভ করবে—এতো আর হয় না। শঙ্করাচার্য ঠিক এ ধরনের কথাই বলেছেন যে, জ্ঞানলাভ করা মানে অজ্ঞান দূর করা। আলোর প্রকাশ চিরকালই আছে, অজ্ঞান-রূপ আবরণের জন্যই অন্ধকার। তাই অন্ধকার দূর করার জন্য যেমন আলোর দরকার, অজ্ঞান দূর করার জন্য তেমনি সাধন-ভজন অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিচার করা দরকার। ব্রহ্মজ্ঞান সর্বদাই আছে, সুতরাং তাকে সাধন-ভজন দিয়ে আর কি লাভ করবে বলো? যা নেই তাকে পাবার জন্যই চেষ্টা, কিন্তু যা সর্বদাই আছে তাকে পাবার জন্য কি আর চেষ্টা করবে, বলো? অজ্ঞান নাশের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়।"

তরুণ ভক্ত সাধকেরা নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, "ওসবের ধারণা করা বড় শক্ত মহারাজ।"

উত্তর হইল, "এসবের ঠিক ঠিক ধারণা করতে গেলে চাবিকাঠি দরকার।"

'এই চাবিকাঠিটি কি?'—এ প্রশ্নের উত্তরে অভেদানন্দজী কহিলেন, "ঐকান্তিকতা একনিষ্ঠা ভক্তি বিশ্বাস ব্যাকুলতা এ'গুলোই চাবিকাঠি। উদ্দেশ্যের প্রতি মনের একমুখিতা থাকা চাই। তোমার মন কেবল ইষ্টকেই চাইবে দুনিয়ার আর কিছু চাইবে না। পার্থিব সব কিছু পড়ে থাকবে মনের বাইরে, তোমার মন থাকবে আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে। মনের তখন আর আলাদা অস্তিত্ব কিছুই থাকবে না। মনকে এই আত্মনিষ্ঠ বা ব্রহ্মাবগাহী করার কৌশল জানার নামই চাবিকাঠি। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং'—আত্মা হৃদয় গুহার অবরুদ্ধ কি—না লুকিয়ে আছেন। সেই গুহার দরজা খুলতে গেলে এই চাবিকাঠি চাই।"

ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরভাবনা কি করিয়া আত্মজ্ঞানে ও অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার একটি উদাহরণ অভেদানন্দজী প্রায়ই দিতেন। বলিতেন: "একজন সুফী তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দরজায় আঘাত করলে। ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, 'বাইরে কে?' সুফী বললে, 'আমি তোমার বন্ধু।' বন্ধু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে, 'যাও বন্ধু, আমার টেবিলে দু'জনের স্থান হবে না।' সুফী বন্ধু তখন মনে গভীর দুঃখ নিয়ে ফিরতে বাধ্য হল, কিন্তু বিরহের আগুন তার হৃদয়কে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সে তাই ফিরল, ভয় ও শ্রদ্ধা নিয়ে

তার বন্ধুর দ্বারে এসে আবার আঘাত করলে। ভেতর থেকে আগের মতোই উত্তর এল, 'বাইরে কে ?' এবার সুফী বন্ধু উত্তর দিলে, 'হে প্রিয়তম, তুমি।' তখন দরজা খুলে গেল ও তার বন্ধু বললে, 'তোমার আমিত্ব যখন ঘুচে গেছে তখন ভেতরে এসো, কেন না আমার ঘরে দুজন আমির স্থান নেই।'

একদিন মন সম্পর্কে ভক্ত সাধকদের কহিলেন, "মানুষের মন আর কি না পারে বলো। মন এত বলীয়ান্ কেন ? তার পিছনে সর্বশক্তিময় আত্মা আছেন বলে ? চন্দ্র যেমন সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার করে জ্যোতিষ্মান্ মনও তেমনি। নইলে মন তো আসলে জড় একটা যন্ত্র, আত্মচৈতন্য তার পিছনে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলেই সে কাজ করে। মন সব কিছু করে মানে আত্মাই মনকে প্রেরণা দেয়। মন তাই মাধ্যম বা যন্ত্র। কিন্তু আত্মাতে কোনো কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ বা অভিমান নেই অথচ 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি,' তাঁরই আলোকে দুনিয়ার সব কিছু আলোকিত। জীবজন্তু সবই তাঁর কাছে থেকে শক্তি ও প্রেরণা পেয়ে কাজ করে। দেদীপ্যমান সূর্য সকলের ওপর সমান ভাবে কিরণ দেয়। পক্ষপাতিত্ব তাতে কিছুমাত্র নেই। সূর্য কিরণ না দিলে আলোর অস্তিত্ব থাকতো না। আগুনই কি পেতে ? আত্মাও তেমনি। মন আত্মার দ্বারী, সাধারণ লোক কিন্তু মনকেই কর্তা ভাবে, আর তখনি সে মনের বশীভূত হয় ও সৃষ্টি হয় যত কিছু অনর্থ।

"সাধনা মানেই মনের 'অহং' কর্তৃত্বাভিমানকে নষ্ট করা, মনকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তুমি কর্তা নও, কর্তা হলেন শরীর আত্মা—যিনি শরীরে আছেন আবার জগতের সর্বত্র আছেন। যখন এই রকম ভাবতে পারবে তখনি তোমার মন বশীভূত হবে, তুমি মনের পারে যাবে। মনই মুক্তির অন্তরায়, আবার মনই মুক্তির সহায়ক। অন্তরায়—কেননা মনই কর্তা সেজে নিজে আত্মা থেকে পৃথক এ কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়, আর সহায়ক—কেন না মনই—বুদ্ধিরূপে আত্মাকে জানিয়ে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন, আর তাতে ক'রে বৃত্তির মধ্যে যে অজ্ঞান তা' নষ্ট হয়ে জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান—ইংরেজীতে যাকে বলে সেল্‌ফ নলেজ বা গড্ কনশাসনেস্। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথাকেই একটু ভিন্ন ভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, মহামায়া অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারেন না তিনি ব্রহ্মকে দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হন। এই দেখিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কিন্তু মনের অর্থাৎ বুদ্ধির, মন বা বুদ্ধিই আমার মায়া বা মহামায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদ কেবল পার্থিব দৃষ্টিতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে দুইই এক[১]।"

ভক্তেরা প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন মন প্রসন্ন হলে তা আত্মজ্ঞানও দিতে পারে। ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর, তাই কি ?"

অভেদানন্দজী উত্তর দেন, "হ্যাঁ, তাই বৈ কি। মন প্রসন্ন হওয়া মানে মন শুদ্ধ হওয়া। মনের সংকল্প-বিকল্প বৃত্তি-দুটো চলে গেলেই মন শুদ্ধ হয়। সাধকের মন শুদ্ধ হলে আর মন থাকে না, তখন তা শুদ্ধচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়। এটাকেই ভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে, মন প্রসন্ন হ'লে তা-ই আত্মজ্ঞান দিতে পারে। একই কথা।"

অভেদানন্দজীর সকল কিছু তত্ত্ব উপদেশের মধ্যে জ্ঞানচর্চা ও আত্মজ্ঞান লাভের কথা শুনা যায়। কিন্তু তাঁহার সব কিছু বক্তব্যের পশ্চাৎপটে রহিয়াছে মানবপ্রেম, জীবের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা।

---

১ মন ও মানুষ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

"তিনি বলিতেন, এ যুগে বিবেকানন্দই জ্ঞানচর্চার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। দেশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে এখন বেদান্ত উপনিষদের চর্চা চাই। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। তবেই মৃত্যুভয় থাকবে না—জগৎকে ভালোবাসতে পারবে। তা নয় খালি নিজে নিজের বউটি আর ছেলেটি। দুনিয়া ডুবুক আমার কি? এর ওষুধ হচ্ছে ভালোবাসা—তোমার নিজের মতো ক'রে ভালোবাসো তোমার প্রতিবেশীকে—এই ভালোবাসা এখন সন্ন্যাসীদের ভিতরেও নেই। তাই তো বেদান্ত চর্চা করতে হবে—গাছতলায় ব'সে নয়। এবং এ শুধু সন্ন্যাসীদের জন্যেও নয়। বাড়িতে, স্ত্রীপুত্রের ভিতর, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক মা প্রত্যেক ছেলেকে এই শেখাবে, তবে আমাদের দেশের মঙ্গল হবে।

ভক্তপ্রবর চিৎস্বরূপানন্দের মতে, অভেদানন্দের চরিত্রের ভিত্তি হইতেছে তাঁহার অপার মানবপ্রেম। এই দৃষ্টিকোণ হইতে স্বামীজীর মূল্যায়ন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন : এই মনীষা, এই প্রতিভা, এই সাহস, এই ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধি সুনিবিড় দার্শনিকতা, সুগভীর জ্ঞান যা তাঁর জীবনে সুনিহিত, সুষমাযুক্ত ঐক্যে পুষ্পিত হয়েছিল, এসবের উপরেও তাঁর চরিত্রের যে পরম মাধুর্য ছিল সেটি হচ্ছে তাঁর আশ্চর্য সরলতা, আর অকারণে সবাইকে ভালোবাসা। আজ যখন সে সব কথা ভাবি তখন মনে হয় তিনি যে কে ছিলেন তা জানি না। কেবল জানি, আমাদের সঙ্গে তাঁর ছিল একটি গভীর অন্তরের টান। তিনি ছিলেন প্রেমিক, সত্যিকার দরদী, তাই যা কিছু প্রাণবান্ তার প্রেরণা পাই তাঁর কাছ থেকে। বিশ্বের দরবারে প্রচার করতে গিয়ে ভোলেননি তিনি স্বদেশের দুঃখ, স্বজাতির ব্যথা। স্বল্প কথায় 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপল,'-এ যা বলেছেন সেখানে চাপা থাকে নি দেশের দুঃখে কেমন ক'রে কেঁদেছিল তাঁর প্রাণ। তার প্রেম জলধি ভৌগোলিক গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি শুধু বাংলার নয় ভারতের নয়—নিখিল মানবের অন্তরবেদীর নিরালায় যুগে যুগে পাতা তাঁর কালজয়ী সিংহাসন।

"মানুষ যে এত সরল হতে পারে তাঁকে না দেখলে তা কখনো বিশ্বাস করতুম না। কতবার তাঁকে দেখেছি ক্ষমার ঠাকুররূপে তাকিয়ে আছেন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে। কত লোক এসেছে, ভক্তি জানিয়েছে, প্রণাম করেছে, কৃতকৃতার্থ হয়ে চলে গেছে। আবার কতজনে এ সোনার আদর্শ নির্মমভাবে অস্বীকার ক'রে গেছে। কিন্তু যাঁর সামনে এসব ঘটেছে, তাঁর হাসি—সেই দেবদুর্লভ হাসি কেউ ম্লান করতে পারে নি[১]।

স্বামী অভেদানন্দের দীর্ঘ কর্মময় জীবনে এবার ধীরে ধীরে আসিয়া পড়ে বিরতির পালা। এ সময়ে মাঝে মাঝে স্মিতহাস্যে অন্তরঙ্গ ভক্তদের দিকে তাকাইয়া কহিতেন, "জানো, এবার ঠাকুর আমায় পেনসেন দিচ্ছেন। অনেক খেটেছে এই দেহটা, এবার একটু বিশ্রাম করে নিক্, কি বল?"

দেহান্তের প্রায় বৎসর দেড়েক আগে হইতেই স্বামীজী নানা অসুখে ভুগিতে থাকেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকেরা প্রাণপণ প্রয়াসে তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা পরিচর্যার ব্যবস্থা করেন।

রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও অভেদানন্দ তরুণ সাধনার্থীদের উপদেশ দানে বিরত

১ মহারাজের কথা : চিৎস্বরূপানন্দ

হন নাই। যে কেহ তাঁর নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইত, লাভ করিত সাধন উপদেশ, রামকৃষ্ণ-তনয়ের মুখে রামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণ শুনিয়া জীবন সার্থক করিত।

এ সময়ে একদিন স্বামীজী বালকের মতো হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"দেশের সর্বত্যাগী নায়ক সুভাষ, তাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে।"

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর বেদান্ত মঠে আসিয়া উপনীত হন, নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্বামীজী তখন অত্যন্ত অসুস্থ, উঠিয়া বসিতে পারেন না। কিন্তু দেশের মুক্তি সংগ্রামের পুরোধা পুরুষ সিংহ সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। সোৎসাহে বলিলেন, "এসো এসো সুভাষ। তোমায় একবার আলিঙ্গন করি।"

কোনমতে উঠিয়া সস্নেহে সুভাষচন্দ্রকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "আশীর্বাদ করি, তুমি বিজয়ী হও।" অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়া নম্র কিশোর বালকের মতো সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর শয্যার পাশে বসিয়া রহিলেন, মাঝে মাঝে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উভয়ের বাক্যালাপ হইতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে সুভাষচন্দ্র স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন।

দেহান্তের আর বেশী দেরি নাই, এ কথা অভেদানন্দ নিজে ভালোভাবেই জানেন। মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলেন, "কি গো, তোমরা আমার শেষ কৃত্য কোথায় করবে?"

এটা ওটা নানা কথা বলার পর নিজেই নির্দেশ দেন, "সব চাইতে ভালো, ঠাকুরের চরণতলে শুয়ে থাকা।" ভক্তেরা বুঝিলেন, তিনি কাশীপুর শ্মশানে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের সৎকার স্থলের কথাটির উল্লেখ করিতেছেন।

অবশেষে নির্ধারিত চিরবিদায়ের লগ্নটি আসিয়া যায়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সমাধিযোগে মহাপ্রয়াণ করেন আত্মকাম সাধক স্বামী অভেদানন্দ।

অধ্যাত্মশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ সযত্নে রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার সাধক তনয়দের একটি মণিময় হার। সে হার হইতে একটি উজ্জ্বল মণি সেদিন খসিয়া পড়িল।

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের এই গুরুভাই সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাই লিখিয়াছেন.[১] "তিনি (অভেদানন্দ স্বামী) ছিলেন বহির্ভারতে আমাদের জন্মভূমি ও তাহার ধর্ম সংস্কৃতির একজন প্রখ্যাত প্রবক্তা। তাঁর জীবনে সম্মিলিত হয়েছিল সুগভীর অধ্যাত্মশক্তি এবং সেবানিষ্ঠা—এবং তার পুণ্যময় মহাজীবন নিঃশব্দে নিবেদিত হয়েছিল মানবের পরম কল্যাণে। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে, তাঁর সদ্‌গুরুর কর্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। তারপর সে ব্রত সমাপ্ত ক'রে তিনি অন্তর্ধান করেছেন সেই আলোকেরই উৎসস্থলে যেখান থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন এই ধরণীতে।"

১ দ্য ডিসাইপল্‌স অব রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম

কৃষ্ণপ্রেম

সারা ইয়োরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হইয়াছে। ট্যাংক ও হাউইৎজের কামান নিয়া দুর্ধর্ষ জার্মান সেনা বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বম্বার ও ফাইটার বিমান হইতে চালাইতেছে অশ্রান্ত গোলাবর্ষণ।

জলে স্থলে আকাশে ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীও মরণপণ করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। শত্রুর উপর হানিতেছে প্রচণ্ড আঘাত।

দেশের অন্যান্য তরুণের মতো কেমব্রিজের প্রতিভাধর ছাত্র রোনাল্ড নিক্সনও সেদিন দেশরক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ। ইউনিভার্সিটির পড়া ছাড়িয়া দিয়া সোৎসাহে যোগ দিয়েছেন রয়েল এয়ার ফোর্সে। জার্মানীর ভয়াবহ আক্রমণ রোধ করার জন্য ইংরেজরা সবেমাত্র একটি ক্ষুদ্র বিমান বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন। নিক্সন সেই বাহিনীরই অন্যতম বিমানচালক। দক্ষ ও দুঃসাহসী পাইলট রূপে অল্প দিনের মধ্যে সম্মানজনক একটি 'এইস'-ও তিনি লাভ করিয়াছেন।

হঠাৎ সেদিন কর্তৃপক্ষের গোপন নির্দেশ আসিল, জার্মান অধিকৃত বেলজিয়ামের একটা সময় ঘাঁটিতে শত্রু নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, জড়ো করিয়াছে বিপুল সমর সম্ভার। অবিলম্বে ঐ ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতে হইবে।

গুটিকয়েক বম্বার প্লেন তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রবেগে উড়িয়া চলিল সেই লক্ষ্যের দিকে। চালকরূপে রোনাল্ড নিক্সনও রহিলেন তাহার একটিতে।

বেলজিয়ামের আকাশে ঢুকিবার আগেই একটি গুপ্ত ঘাঁটি হইতে উড়িয়া আসে একদল জার্মান ফাইটার বিমান, ক্ষিপ্রবেগে করে নিক্সনের পশ্চাৎ-ধাবন। এতক্ষণ সেদিকে তিনি লক্ষ্য করেন নাই। একমনে লক্ষ্যস্থলের দিকে উড়িয়া চলিয়াছেন, কক্‌পিট-এ বসিয়া দৃঢ় হস্তে থ্রটল ঠেলিয়া নিতেছেন বার বার, বিমানের গতি আরো তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল দূরে আকাশের কোণে, দুর্ধর্ষ জার্মান ফাইটারগুলি তাঁহাকে ঘেরাও করার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। একাকী এতগুলি শত্রুবিমানের সঙ্গে যুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। নিক্সন প্রমাদ গণিলেন।

মুহূর্ত মধ্যে এই সংকটকালে তাঁহার নয়নসমক্ষে ভাসিয়া উঠে এক অতীন্দ্রিয় দৃশ্য। তুষারমৌলী এক উত্তুঙ্গ পর্বত সূর্যের রূপালী আলোয় ঝলমল করিতেছে, আর সেই পর্বতের কন্দর হইতে নির্গত হইতেছে শুভ্র-উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোকধারা। এই আলোকের তরঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছে রোনাল্ড নিক্সনের সারা অস্তিত্ব।

ক্ষণপরেই এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়েন তিনি। অর্ধ-বাহ্য অবস্থায় অনুভব করিতে থাকেন, কোথা হইতে একটা অজানা শক্তি তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও হস্তপদের ক্রিয়া।

ঐ শক্তি-ই এবার চালাইয়া নিতে থাকে নিক্সনের বম্বার প্লেনটিকে। ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে দূর আকাশে সেটি উঠিয়া যায়। তারপর ঘুরিয়া চলিতে থাকে বিপরীত দিকে।

বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নিক্সন চাহিয়া দেখেন। বিমানের কক্‌পিটে তিনি আর বসিয়া নাই। রহিয়াছেন লণ্ডনের কাছাকাছি একটি সামরিক হাসপাতালে।

তাঁহার বিমানটি ইংল্যাণ্ডে নিজস্ব বিমান ঘাঁটিতে নিরাপদে অবতরণ করে। কিন্তু অবতরণ করার পর দেখা যায়, পাইলট নিক্সন মূর্ছিত অবস্থায় কক্‌পিটের মধ্যে ঢলিয়া পড়িয়া আছেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

সেদিনকার অভিযানের সঙ্গী পাইলটের অনেকেই হত বা নিহত হইয়াছে। কয়েকটি বৃটিশ বিমান হইয়াছে একেবারে বিধ্বস্ত। পাইলট নিক্সন কি করিয়া শত্রু বূহ্যের কাছাকাছি গিয়াও নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেন, এ এক পরম বিস্ময়। সঙ্গী পাইলটেরা কেউ কেউ দেখিয়াছিলেন, নিক্সনের বম্বার প্লেনটি আকাশে বহু উঁচুতে উঠিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল। তারপর দেখা গেল, সেটি বৃটিশ বিমান ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর নিকসন পড়িয়া আছেন অচেতন অবস্থায়।

এয়ার মার্শাল নিজে সেদিন হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত, নিক্সনের শয্যার পাশে বসিয়া করেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সেদিনকার অভিযানে বৃটিশ বিমান বহর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাই এ সম্পর্কিত তথ্য তি নি সংগ্রহ করিতে চান।

"তোমার বম্বার বিমান কি ক'রে ফিরে আসতে পারল দুর্ধর্ষ জার্মান ফাইটারগুলোর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে"—প্রশ্ন করা হইল রোনাল্ড নিক্সনকে।

সরলভাবে নিক্সন খুলিয়া বলিলেন সেদিনের সকল কথা, একটা বিস্ময়কর দৈবী শক্তি হঠাৎ কি জানি কেন, আমায় অধিকার ক'রে বসেছিল। শুধু তাই নয়, আমায় পর্যুদস্ত ক'রে, হাতদুটিকে বাধ্য করেছিল ঘুরপথে পালিয়ে আসার জন্য।

"দৈবী শক্তি? যত সব অর্থহীন বাজে কথা।" তাচ্ছিল্যের সুরে মন্তব্য করেন এয়ার মার্শাল। যাইবার সময় ডাক্তারকে বলিয়া গেলেন, পাইলট রোনাল্ড নিক্সনের স্নায়বিক চাঞ্চল্যের দিকে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

নিক্সন কিন্তু মনে মনে হাসিলেন। তিনি যে নিশ্চিতরূপে জানেন, অযথা কোনো অলৌকিকত্বের অবতারণা তিনি করেন নাই। যে দিব্য ভাবাবেশে বেলজিয়ামের আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় তিনি আবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ধরনের ভাবাবেশে আরো কয়েকবার এই হাসপাতালে আসার পর তাঁহার হইয়াছে। স্পষ্টরূপে একাধিকবার তিনি দেখিয়াছেন সেই অলৌকিক দৃশ্য—সূর্য করোজ্জ্বল সেই অভ্রভেদী পাহাড়ের চূড়া, আর সেই পাহাড় চূড়া হইতে নির্গত হইতেছে শুভ্র জ্যোতির প্রবাহ। শুধু তাহাই নয়, এখানে আসার পর ঐ পাহাড়ের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাঁহার কাছে। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন বারে বারেই অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিতেছে "হিমালয় দেখেছো তুমি সেদিনকার অলৌকিক দর্শনের মধ্যে। পবিত্র হিমালয়ের কন্দরে থাকেন যে সব যোগী ঋষি, তাঁদের কৃপা তুমি পেয়েছ। সেই কৃপাই সেদিন উদ্ধার করেছে তোমায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

'হিমালয়', আর 'ভারতবর্ষ' এই দুইটি নাম ঘুরিয়া ফিরিয়া উপস্থিত হইতেছে নিক্সনের মানসপটে। অব্যক্ত আনন্দের রোমাঞ্চ শিহরণ ঘটিতে থাকে বার বার। ভারত সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানা নাই তাঁহার। কলেজ লাইব্রেরী হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত দুই একটি গ্রন্থ পড়িয়াছেন আর পড়িয়াছেন থিয়োসফিস্ট অ্যালকট ও ব্লাভাৎস্কির কয়েকটি রচনা। হিমালয়ের শক্তিধর মহাত্মাদের কাহিনী অল্পস্বল্প তিনি জানেন বটে

কিন্তু ইহা নিয়া কোনোদিনই মাথা ঘামান নাই। ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র রোনাল্ড নিক্সন, ইংরেজী সাহিত্যের উপর বরাবরই তাঁহার প্রবল অনুরাগ; এই সাহিত্যেই তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, অনার্স নিয়া পাস করিয়াছেন। আপন খেয়াল খুশীমতো দুই চারটি ধর্ম দর্শনের বই পড়িয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে তেমন কোনো আকর্ষণ বোধ করেন নাই। এবারকার এই অলৌকিক অভিজ্ঞতা কিন্তু নিক্সনের মানসিক স্তরে ঘটাইয়া দিল এক বিপর্যয়। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন ও সাধু মহাত্মাদের সম্বন্ধে জাগিয়া উঠিল এক নূতনতর মূল্যবোধ।

অলৌকিক অনুভূতি আজ আর তাঁহার কাছে ধোঁয়াটে কোনো বস্তু নয়। অলৌকিক কৃপা ও শক্তির অভিজ্ঞতা তাঁহার নিজ জীবনে স্পষ্টরূপে ধরা দিয়াছে। এই কৃপা এবং এই শক্তি শুধু তাঁহার প্রাণ রক্ষাই করে নাই, নূতনতর আত্মিক চেতনা জাগ্রত করিয়াছে তাঁহার জীবনে, উদ্বোধিত করিয়াছে নূতনতর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ।

বার বারই রোনাল্ড নিক্সনের অন্তরে জাগে আলোড়ন, উদগ্র হইয়া উঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন,—'অলক্ষ্যে থেকে কেন ঐ কল্যাণময় শক্তি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্য? কে রয়েছেন ঐ শক্তির পেছনে? কি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ? কোথায়, কোন্ পথে পাওয়া যাবে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়?'

নাঃ, এসব প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে পাইতেই হইবে, করিতে হইবে সেদিনকার অলৌকিক অভিজ্ঞতার রহস্যভেদ। যুদ্ধের কাজে আর তাঁহার মন বসিল না, রয়েল এয়ার ফোর্সের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুই জীবনের মোড়ই এবার ফিরিয়া গেল।

পড়াশুনার কাজে কিছুদিন তিনি ব্যাপৃত রহিলেন বটে, কিন্তু বেলজিয়ামের আকাশের সেই অলৌকিক ঘটনার স্মৃতি সতত জাগরূক রহিল তাঁহার অন্তরে। সেই সঙ্গে চলিল অন্তরের অন্তস্থলে বারংবার অবগাহন। দুজ্ঞেয় দিব্যলোকের হাতছানি কেবলই চঞ্চল করিয়া তোলে নিক্সনকে, একটা নূতনতর আত্মিক আস্বাদের জন্য সারা মনপ্রাণ তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিতে থাকে।

এই ব্যাকুলতা এবং ভাবান্তরের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে অধ্যাত্ম জীবনের আকাঙ্ক্ষা। পূর্বে যাহা ছিল নিছক কৌতূহলের বস্তু, এবার তাহা আবির্ভূত হয় জীবনের প্রধান লক্ষ্যরূপে। অনির্দেশ্য নিয়তি নিক্সনকে অনিবার্যরূপে ঠেলিয়া নিয়া যায় তাঁহার পরম সম্ভাবনার দিকে। এ পথে অগ্রসর না হইয়া আর কোনো উপায়ান্তর নাই।

এই সময়ে একাগ্র চিত্তে ধর্ম সংস্কৃতির বহুতর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন নিক্সন। বিশেষ করিয়া ভারতের ধর্ম সাধনা ও সাধকজীবনের দিকে তাঁহার মন আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। থিয়োসফিস্টদের চাঞ্চল্যকর বহু গ্রন্থ পাঠ করেন, কিন্তু তাহাতে কৌতূহলের নিবৃত্তি যতটা হয় মন প্রাণ ততটা ভরিয়া উঠে না। রবং বৌদ্ধ দার্শনিকতা ও বৌদ্ধ সাধক সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুকাল ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করেন লণ্ডনের এক প্রবীণ বৌদ্ধ সাধকের নির্দেশ নিয়া ধ্যান জপেও কিছুকাল নিবিষ্ট হন। কিন্তু ইহাতে অধ্যাত্মজীবনের তৃষ্ণা তো তাঁহার মিটে না। আরো নিবিড় করিয়া পরম তত্ত্বকে যে তিনি আঁকড়িয়া ধরিতে চান। সূক্ষ্মতর আত্মিক উপলব্ধির জন্য মুক্তির আস্বাদের জন্য রোনাল্ড নিক্সন অধীর হইয়া উঠেন।

অবশেষে তিনি স্থির করেন। ভারতে গিয়াই স্থায়িভাবে এবার বসবাস করিবেন, সাক্ষাৎভাবে আসিবেন সেখানকার সিদ্ধ মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে। ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নিগূঢ় সাধনা।

নিক্‌সন অচিরে উপস্থিত হন তাঁহার ধ্যানের ভারতে, খুঁজিয়া পান তাঁহার নিজস্ব সাধনার পথ। তাঁহার সেই পথ—বৃন্দাবনের গুরুপরম্পরা-ধৃত এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবীয় পথ। সাধনজীবনে সন্ন্যাস নিয়া নিক্‌সন পরিগ্রহ করেন নূতন নাম—'কৃষ্ণপ্রেম'। উত্তরকালে এ নাম তাঁহার সার্থক হইয়া উঠে, কৃষ্ণপ্রেমের সিদ্ধ সাধকরূপে ঘটে তাঁহার মহারূপান্তর। ভারত এবং ইয়োরোপ আমেরিকার বহু মুমুক্ষু ও সাধনকামী নরনারীর পরমাশ্রয়রূপে তিনি খ্যাত হইয়া উঠেন।

রোনাল্ড নিক্‌সন, উত্তরকালের বহুজনবন্দিত বৈষ্ণব সাধক কৃষ্ণপ্রেম, ভূমিষ্ঠ হন ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে। ইংল্যাণ্ডের একটি শিক্ষিত, ধর্মপরায়ণ মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বালককাল হইতেই নিক্‌সনের মধ্যে দেখা যায় অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার স্ফুরণ। যৌবনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের স্নাতক পরীক্ষায় উচ্চতর সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন।

কলেজে পড়াশুনা করার সময় হইতেই ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তাঁহার কৌতূহল জাগিয়া উঠে এবং এ সময়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম, বৌদ্ধবাদ ও থিয়োসফির কিছু কিছু গ্রন্থ তিনি পড়িয়া ফেলেন। আত্মিক জীবনের যে সংস্কার এতদিন সুপ্ত ছিল, এবার তাহা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। সূক্ষ্মৈবলোকের রহস্য জানার জন্য নিক্‌সন চঞ্চল হইয়া উঠেন।

ঠিক এই সময়ে জার্মানীর আক্রমণের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে; বৃটেনের অন্যান্য দেশপ্রেমিক যুবকদের মতো রোনাল্ড নিক্‌সনও যোগদান করেন প্রতিরক্ষা বাহিনীতে। রয়েল এয়ার ফোর্সে তিনি কমিশন প্রাপ্ত হন এবং অল্পকাল মধ্যে বিমান চালনায় দক্ষ হইয়া গ্রহণ করেন বোমারু বিমান চালনার গুরুদায়িত্ব। এই সময়ে একদিনকার আকাশ অভিযানের সময় যে চাঞ্চল্যকর অলৌকিক অভিজ্ঞতা নিক্‌সনের ঘটে তাহাই উন্মোচিত করে তাঁহার জীবনের নূতনতর অধ্যায়। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার রহস্য জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া ওঠেন।

ইংল্যাণ্ডে থাকিতে ভারতে বসবাসের যে সংকল্প রোনাল্ড নিক্‌সন করিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহা সিদ্ধ হইয়া উঠে। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন লণ্ডনে উপস্থিত। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের জন্য তিনি একটি সুযোগ্য অধ্যাপকের খোঁজ করিতেছিলেন। এক মধ্যবর্তী বন্ধুর সাহায্যে নিক্‌সন ডঃ চক্রবর্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, প্রকাশ করিলেন মনের গোপন বাসনা। তিনি প্রতিভাধর তরুণ ইংরেজ অধ্যাপক তদুপরি ভারতের প্রতি, ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অপরিসীম। উপাচার্য শ্রীচক্রবর্তী সানন্দে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে।

অল্পদিনের মধ্যেই লখনৌতে পৌঁছিয়া রোনাল্ড নিক্‌সন যোগ দিলেন তাহার নূতন

কাজে। নূতন অধ্যাপকের জন্য তাড়াতাড়ি কোনো ভালো বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না, উপাচার্য কহিলেন, "তুমি অবিবাহিত, একটিমাত্র লোক। তুমি আমার বাড়িতেই তো থাকতে পারো। যতদিন স্টাফ কোয়ার্টার তৈরি না হয়, আমার এখানেই থাকো। অবশ্যি যদি তোমার নিজের দিক দিয়ে কোনো আপত্তি না থাকে।"

নিকৃসন উত্তরে বলিলেন, "আপত্তি তো আমার নেই-ই বরং উৎসাহ আছে। আপনার বাড়িতে বাস করলে ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমি জ্ঞান লাভ করতে পারবো এবং এখানকার রীতিনীতিও আয়ত্ত করা যাবে সহজে। এতো আমার সৌভাগ্যের কথা।"

নিকৃসনের বাসস্থান সম্পর্কে সেই ব্যবস্থাই করা হইল এবং ইহার মধ্য দিয়া অলক্ষ্যে তাহার জীবনধারায় ঘটিল এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূত্রপাত।

উপাচার্য ডঃ জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী'র স্ত্রী মণিকাদেবী রোনাল্ড নিকৃসনকে গ্রহণ করিলেন পরম স্নেহে এবং পুত্রজ্ঞানে। মণিকাদেবীর মধ্যে নিকৃসন কি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল তিনি তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছেন। আনন্দরূপিণী, সদাহাস্যময়ী, এই বর্ষীয়সী মহিলা ছিলেন সহজ নেতৃত্বের অধিকারিণী। এই অধিকার নিকৃসনও সেদিন নিজের অলক্ষ্যে মানিয়া নিলেন।

মণিকাদেবী কহিলেন, "না বাবা, তোমার ঐ নিকৃসন নামে আমি আর তোমায় ডাকছিনে। ভারতে এসেছো ভারতের সব কিছুকে ভালোবেসে, তাই একটা ভারতীয় নামই তোমায় দেওয়া যাক্, কি বল?"

"বেশ তো মা, আপনার খুশী মতো, নূতন নামই তা হলে একটা দিন।" আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উত্তর দেন নিকৃসন।

"হ্যাঁ, বাবা, আজ থেকে তোমায় আমি গোপাল বলে ডাকবো। 'গোপাল' এদেশের মায়েদের অন্তরের ধন। এমনটি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।"

"মা, আমি আপনার গোপাল হয়েই থাকবো।" সোৎসাহে সম্মতি জ্ঞাপন করেন নিকৃসন।

মণিকাদেবীর দুইটি কন্যা, কোনো পুত্রসন্তান নাই। এখন হইতে এই তরুণ সুদর্শন ইংরেজ তনয়ের উপরই বর্ষিত হইতে থাকে তাঁহার মাতৃহৃদয়ের উদার অফুরন্ত অপত্যস্নেহ।

অধ্যাপনার কাজ শুরু করিয়া দেন রোনাল্ড নিকৃসন, এই সঙ্গে তৎপর হইয়া উঠেন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির জ্ঞান আহরণে। বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পূর্ব হইতেই তাঁহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবার বৌদ্ধ সাহিত্যের অধ্যয়ন ও ধ্যান ধারণায় নিবিষ্ট হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে উপলব্ধি করিলেন, মূল বৌদ্ধশাস্ত্র পালি ভাষায় লেখা, ইহার মর্মে প্রবেশ করিতে হইলে পালি শিক্ষা করা দরকার। বহু পরিশ্রম করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। তারপর একে একে শেষ করেন বৌদ্ধবাদের প্রধান গ্রন্থগুলি। কিন্তু এই তত্ত্ব ও সাধনায় নিকৃসন তৃপ্ত হইতে পারেন কই? সমগ্র জীবনের মূলে তাঁহার প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গিয়াছে, আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে প্রবলভাবে। নিকৃসন এবার ভারতের সনাতন ধর্ম দর্শন ও সাধনায় অনুধাবন করিতে চান, প্রবেশ করিতে চাহেন মর্মমূলে।

এখন হইতে বেদ উপনিষদ, গীতা অধ্যয়নে তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। একাগ্রতা

ও নিষ্ঠা তাঁহার জন্মগত বৈশিষ্ট্য, তাই সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া মূল শাস্ত্রগ্রন্থগুলির তত্ত্ব তিনি উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন।

রোনাল্ড নিক্সন তখন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী অধ্যাপকরূপেই সুপরিচিত নন, লখনৌর সমাজজীবন ও অভিজাতচক্রের তিনি তখন এক বড় আকর্ষণ। সুগৌরকান্তি, দীর্ঘ সুঠাম দেহ, আয়ত নীল নয়ন দুটি অসাধারণ বুদ্ধির দীপ্তিতে সদাই ঝকঝক্ করিতেছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনীতি যে কোনো বিতর্কে ফুটিয়া উঠে তাঁহার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বুদ্ধি মুহূর্তে যে কোনো সমস্যার মূলদেশে গিয়া প্রবেশ করে।

শহরের গণমান্য ব্যক্তিরা প্রতিভাধর তরুণ অধ্যাপক নিক্সনকে ভালোবাসেন, সমীহ করেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ। আর অভিজাত পরিবারের কন্যার মাতারা অনেকেই তখন লুব্ধ নেত্রে তাকাইয়া আছেন এই প্রিয়দর্শন তরুণ অধ্যাপকের দিকে।

বহিরঙ্গ জীবনে সামাজিক উৎসব, নিমন্ত্রণ ও চা-চক্রে নিক্সনকে সদাই দেখা যায় হাস্যময় এবং প্রাণচঞ্চল। কিন্তু অন্তরের গোপন মর্মকোষে একটু নাড়া দিলেই বাহির হইয়া আসে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, জীবনের গভীরতর স্তরে ডুবুরীর মতো কোন পরম ধন যেন তিনি হাতড়াইয়া ফিরিতেছেন, যা কিছু শাশ্বত যা কিছু অমৃতময় তাহার জন্য সমগ্র জীবনচেতনা তাঁহার হইয়া রহিয়াছে কেন্দ্রীভূত। ভারতীয় সাধনা ও আত্মিক জীবনের সংস্কারের প্রতি একটা সহজ মমত্ব ও ঐক্যবোধ ধীরে ধীরে তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে।

উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন লখনৌর শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজে শীর্ষ স্থানীয়, আর তাঁহার পত্নী, বর্ষীয়সী রূপসী মহিলা মণিকাদেবী ছিলেন সেই সমাজের মধ্যমণি। যে কোনো পার্টি, অ্যাটহোম এবং উৎসবের প্রাণ ছিলেন মণিকাদেবী। ভারতীয় খানাদানা রীতিনীতি যেমন তিনি জানিতেন, তেমনি রপ্ত ছিলেন ইয়োরোপ ও আমেরিকার আধুনিক আদব কায়দায়। স্বামীর সঙ্গে বিশ্বের বহু স্থানে তিনি ঘোরাফের করিয়াছেন, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির অনেক কিছু করিয়াছেন আহরণ। তাই পার্টি বা মজলিসে মণিকাদেবীর জুড়ি তখনকার লখনৌ শহরে আর ছিল না। যে কোনো মিলন সভা বা উৎসবে হাসি আনন্দের ফোয়ারা তিনি খুলিয়া দিতেন, গল্পগুজবে মাতাইয়া রাখিতেন সবাইকে।

এই সব উৎসবে রোনাল্ড নিক্সনও যোগ দিতেন সোৎসাহে, সবার সঙ্গে উপভোগ করিতেন সামাজিক জীবনের আনন্দ রঙ্গ। কিন্তু আসলে তাঁহার সবটা মন এবং সবটা দৃষ্টি পড়িয়া থাকিত হাস্যলাস্যময়ী মণিকাদেবীর উপর। নিক্সন লক্ষ্য করিয়াছেন মণিকাদেবীর বহিরঙ্গ জীবনের এই হৈ-হুল্লোড় ও হাসি উচ্ছ্বাসটাই তাঁহার বড় পরিচয় নয়, এই উচ্ছ্বাসের ভিতরকার স্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে আর একটা রহস্যঘন জীবন, সে জীবন —আত্মিক চেতনার প্রোজ্জ্বল, প্রেমভক্তির মাধুর্যে রসায়িত।

বেশ কিছুদিন যাবত, নিক্সনের অন্তর্দৃষ্টিতে এ বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়িয়াছে। আধুনিক ধরনের ফ্যাসনের সাজসজ্জা করেন মণিকাদেবী, মুখে সুগন্ধ পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক মাখানো। সিগারেটের ধোঁয়া ছড়াইয়া এ টেবিল হইতে ও টেবিলে ঘুরিতেছেন, আর

হাসি গল্পে মাতাইয়া তুলিতেছেন বন্ধু বান্ধবী ও অভ্যাগতদের। কিন্তু এই রসরঙ্গের মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে ঘটে ছন্দপতন। অদ্ভুত ভাবান্তর দেখা যায় তাঁহার চোখে মুখে, দ্রুতপদে হলঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন, সারাসরি আপন কক্ষের এক কোণে গিয়া নিভৃতে করেন আত্মগোপন।

কি এই ভাবান্তরের রহস্য? কেনই বা হঠাৎ এমনভাবে বন্ধু বান্ধবীদের হইতে নিজেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন? নানা চিন্তা ও দুশ্চিন্তা খেলিয়া যায় নিকসনের মনে। একি মণিকাদেবীর কোনো শারীরিক অসুস্থতা? স্নায়বিক দৌর্বল্যের কোনো উপসর্গ? যদি এসব কিছু না ঘটিয়া থাকে তবে হয়তো ইহার পিছনে রহিয়াছে কোনো অলৌকিক রহস্য। দুর্জ্ঞেয় অপার্থিব লোকের হাতছানি হঠাৎ কখন আসিয়া পড়ে, আর অমনি তিনি সরিয়া পড়েন লোকলোচনের সম্মুখ হইতে, একান্তভাবে নিজেকে গুটাইয়া নেন নিজের গণ্ডীর মধ্যে।

নিকসন মনে মনে স্থির করিলেন, মায়ের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের রহস্য তাহাকে ভেদ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার নিজের মনের অশান্তি দূর হইবে না।

চক্রবর্তী ভবনে সেদিন এক বড় মজলিস বসিয়াছে। হাসি আনন্দ গানে গল্পে সবাই মশগুল, নিকসন লক্ষ্য করিলেন, মণিকাদেবী হঠাৎ কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িলেন। তারপর নীরবে সবার পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন নিজের কক্ষে।

মজলিস তখনো জমজমাট। কিছুক্ষণ বাদে নিকসনও বিদায় নিলেন, সেখান হইতে ছুটিয়া আসিলেন তাঁহার মায়ের কাছে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। সুসজ্জিত কক্ষের এক কোণে। মা ঋজুভঙ্গীতে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন. নয়ন দুটি নিমীলিত, দেহ নিস্পন্দ, বাহ্যচৈতন্য নাই।

নির্নিমেষে অবাক্ বিস্ময়ে এই ধ্যানাবিষ্ট মাতৃমূর্তির দিকে চাহিয়া আছেন রোনাল্ড নিকসন। ভাবিতেছেন, এ কোন্ দৈবীলীলা? লখনৌর অভিজাত মহলের মক্ষীরানী মণিকাদেবীর একি অভাবনীয় নূতন রূপ। সব চাইতে আশ্চর্যের কথা, যে মাকে নিকসন এমন প্রগাঢভাবে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন, তাঁহার এই মহিমময়ী রূপটি আজ অবধি তাঁহার কাছে ধরা পড়ে নাই। আত্মিক জীবনের অন্তঃসঞ্চারী ফল্গুধারাটি গোপনেই এত-দিন বহিয়া চলিয়াছে, বাহিরের লোক ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারে নাই।

ধ্যানাবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইলেন মণিকাদেবী, বাহ্যচেতনা এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, আর কপোল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রুর ধারা। অতীন্দ্রিয়লোকের মধুময় দৃশ্য মণিকাদেবী এতক্ষণ সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহারই আনন্দ শিহরণে কম্পিত হইতেছে সর্বদেহ, নয়নে বহিতেছে দরবিগলিত ধারা।

খানিক বাদেই সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠেন মণিকাদেবী। তাড়াতাড়ি উপস্থিত হন ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে, অশ্রুসিক্ত কপোল মুছিয়া ফেলেন, নূতন করিয়া রুজ্ পাউডার লাগাইয়া আসিয়া দাঁড়ান ঘরের দুয়ারে।

নিকসন তখনো সেখানে নীরবে নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান। মা বাহিরে আসিতেই ঝটিতি অগ্রসর হইয়া নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম, গদ্‌গদ স্বরে বলেন, "মা, তোমার অনুমতি না নিয়েই তোমার এই স্বর্গীয় দৃশ্য এতক্ষণ দেখছিলুম। আর ভাবছিলুম, মা হয়ে ছেলেকে কি ফাঁকিই তুমি এতদিন দিয়ে এসেছো। মায়ের ধনে ছেলেরই তো অধিকার। তাই না মা?"

সস্নেহে নিক্সনের চিবুকটি স্পর্শ করিয়া বলেন মণিকাদেবী, "গোপাল, তুমি তাহলে এসব দেখে ফেলেছো। ভালোই হল। সব কথা তোমায় খুলে বলবো, বাবা। কিন্তু আজ নয়, কাল বলবো সব খুলে। পার্টি চলছে অন্য বাড়িতে। চলো তাড়াতাড়ি ওদের কাছে যাওয়া যাক্। সত্যি, বড্ডো অভদ্রতা হয়েছে আমার দিক থেকে। আমার বাড়িতে রিসেপশান, আর আমি এড়িয়ে রয়েছি ওদের, ছি-ছি।"

আবার অভ্যাগতদের মধ্যে আসিয়া হাজির হন মণিকাদেবী। হাস্যে লাস্যে ও সরস বাচন ভঙ্গীতে মাতাইয়া তোলেন বন্ধুবান্ধবীদের। তারপর অতিথিরা তৃপ্তমনে একের পর এক তাঁহার ভবন হইতে বিদায় নেন।

পরের দিন প্রাতরাশের পর নিক্সনকে একান্তে ডাকিয়া নেন মণিকাদেবী। বলেন, "গোপাল, এবার তোমায় সব কথা খুলে বলছি। তুমি ঠিকই ধরেছো, বেশ কিছুদিন যাবৎ বড্ডো বদলে গেছি আমি। পুরোনো জীবনধারায় ছেদ পড়ে গিয়েছে।"

"তাই তো মা, এত কাছে থেকেও আমি তোমার খোঁজ পাচ্ছিনে"—মন্তব্য করেন নিক্সন।

"গোপাল, আমাদের এই বহিরঙ্গ জীবনটা আসলে কিছু নয়। দেহ আর মনের আড়ালে রয়েছে—আত্মা। সে আত্মিক স্তরে যখন তরঙ্গ ওঠে মানুষ তখন বদলে যায়; পরম আত্মা যিনি, ভগবান্ যিনি, তাঁর চরণে গিয়ে সে আছড়ে পড়ে। আমার জীবনে তাই ঘটতে শুরু করেছে।"

"মা, এটা কি ঘটেছে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের পরে, না আগে?" প্রশ্ন করেন নিক্সন।

"আগে থেকেই গোপাল। জানতো, আমার স্বামী শুধু এদেশের শ্রেষ্ঠ একজন শিক্ষাবিদ্ই নন, থিয়োসফি আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং একজন বড় দার্শনিক তিনি। তাঁর সঙ্গে থিয়োসফি নিয়ে আমিও মেতে ছিলাম। এ নিয়ে ইয়োরোপে আমেরিকায় কম ঘোরাঘুরি করি নি। কিন্তু থিয়োসফির তত্ত্ব আর অলৌকিক কাহিনীতে আমার ক্ষুধা মিটল না, জীবনে এল না পরম শান্তি। স্বামী তাই ঝুঁকলেন বৈষ্ণব দর্শন ও ধ্যান ধারণার দিকে। আর আমি? ঝুঁকে পড়তে গিয়ে, আমি গেলাম একেবারে ডুবে। জন্মগত সংস্কার ছিল ভক্তিপ্রেমের, তাই কে যেন আমায় হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেল প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে। দীক্ষা নিলাম বৃন্দাবনে গিয়ে, রাধারমণজীউ মন্দিরের বাল-কৃষ্ণ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে।"

"তা হলে, মা, তুমি এতদিন গোপনেই চালিয়ে যাচ্ছো তোমার সাধনভজন?"

"হ্যাঁ গোপাল, আমার এ ভজনময় জীবন বাইরে আমি প্রকাশ করিনে। কিন্তু বাবা আমার ঠাকুর যে বড্ডো দুষ্টু, বড্ডো লীলা-চপল। স্থান নেই অস্থান নেই, সময় নেই অসময় নেই, হঠাৎ ডেকে নেন তাঁর কাছে। কৃষ্ণের চরণ থেকে নেমে আসে আলোর ধারা, অমনি সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে যায়, বাহ্যচৈতন্য হারিয়ে ফেলি। আমার দিক থেকে তেমন কিছুই করিনে আমি, আমার কৃষ্ণ নিজেই আমায় আকর্ষণ ক'রে নিচ্ছেন, বার বার অবগাহন করাচ্ছেন তাঁর অমৃত সায়রে।"

একি অদ্ভুত লীলাকাহিনী নিক্সন শুনিতেছেন তাঁহার মায়ের মুখে? আনন্দে বিস্ময়ে তিনি অভিভূত।

মাকে প্রণাম করেন ভক্তিভরে, করজোড়ে বলেন, "মা, যে পথে তুমি অগ্রসর হয়েছো, সেই কৃষ্ণপথে আমায় নিয়ে যাও। মায়ের সম্পদেই তো ছেলের অধিকার।"

"গোপাল, তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু এজন্য তো প্রস্তুতি চাই, বাবা। আমি এতদিন লক্ষ্য করেছি, বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য পড়ার ঝোঁক তোমার চলে গিয়েছে। এ দুটো বৎসর উপনিষদ আর গীতা তুমি গভীরভাবে পড়েছো। ভালোই হয়েছে, হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বটি তোমার জানা হয়েছে। এবার তুমি প্রেম ভক্তি-ধর্মের শাস্ত্র পাঠ করো, স্মৃতি পুরাণের কাহিনী জেনে নাও। সেই সঙ্গে শুরু করো রাধা কৃষ্ণের ধ্যান জপ ও ভজন। কৃষ্ণের কৃপা তোমার ওপর হবে, বাবা।"

রোনাল্ড নিক্‌সনের জীবনে এবার আসে এক নূতনতর ভাবের জোয়ার, এ জোয়ারে ভাসিয়া যায় তাঁহার বিগত জীবনের সকল কিছু সংস্কার ও ধ্যান ধারণা। কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণ কাহিনী অনুধাবন করিতে থাকেন গভীরভাবে, কৃষ্ণপ্রেমের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে তাঁহার সমগ্র জীবন।

এ সময়ে লখনৌর জীবনে হঠাৎ ছেদ পড়িয়া যায়। মণিকাদেবীর স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। সপরিবারে তিনি চলিয়া আসেন বারাণসীতে। রোনাল্ড নিক্‌সন শুধু চক্রবর্তী পরিবারভুক্তই নন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও মণিকাদেবীর তিনি পুত্রস্বরূপ। তাই নিক্‌সনও এই সময়ে লখনৌর কাজ ছাড়িয়া দিয়া গ্রহণ করেন বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অধ্যাপকের পদ।

লখনৌর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন নিক্‌সনের জন্য। তাঁহারা চাপিয়া ধরেন বলেন, কি অদ্ভুত খেয়ালীপনা তোমার বলতো? এখানকার ইউনিভার্সিটিতে যে সম্মান যে টাকা পাচ্ছো বেনারসে গেলে তার অর্ধেকও তো তুমি পাবে না। এখানে পাচ্ছো আটশো টাকা, ওখানে তিনশোর বেশী তোমায় দেবে না। কি ক'রে চলবে তোমার?"

নিক্‌সন হাসিয়া উত্তর দেন, "একটা লোকের তিনশো টাকার বেশী কেনই বা দরকার হবে, বলতো? কোনো বিলাসিতা আমার নেই, সামান্য নিরামিষ আহার করি, কম্বলে শুয়ে থাকি। ঐ টাকাটাই তো আমার পক্ষে বেশী।"

"লখনৌতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এখানকার ভাইস-চ্যান্সেলার হতে পারবে তুমি, সে কথাটা কি একবার ভেবে দেখেছো?"

সকৌতুকে বন্ধুদের কথা শুনিতেছেন নিক্‌সন আর পাইপ টানিতেছেন। একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া সহাস্যে কহিলেন, "তোমরা কি ভেবেছো, নিজের দেশ ছেড়ে আত্মীয় স্বজনদের মায়া কাটিয়ে সাত সমুদ্রের এপারে এদেশে আমি এসেছি শুধু একটা মোটা মাইনের চাকরি নিতে, আর ভাইস-চ্যান্সেলার হতে? যে পরম পথের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম একদিন, সে পথ আমি পেয়ে গিয়েছি। আর তো আমার ফেরবার কথা ওঠে না।" একথা বলিয়া সকল বিতর্কের অবসান ঘটাইয়া দিলেন রোনাল্ড নিক্‌সন।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদিকে, লংকা পল্লীর অনতিদূরে গঙ্গার তীরে, রাধাবাগ নামে এক বিরাট ভবন নির্মাণ করিলেন, মণিকাদেবী ও উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ। এখন হইতে এই ভবনটিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে একটা চমৎকার পরিবেশ। এই

রাধারাণে আরো কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশের ভক্ত মণিকাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, প্রেমভক্তি সাধনার পথে তাঁহারা অগ্রসর হন।

নিক্‌সনের জীবনে এবার আসে সাধনভজনের তীব্র আবেগ। আহার বিহারে শুরু করেন তীব্র কঠোরতা, রাধাকৃষ্ণের ভজন ও লীলা অনুধ্যানে দিন রাতের অধিকাংশ সময় কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, তাহার হুঁশ থাকে না। কখনো গঙ্গাতীরের মৃত্তিকা গোফায় কখনো বা রাধাবাগের ছাদের নিভৃত কোণে ধ্যান ভজনে তিনি নিমগ্ন থাকেন। এ সময়ে কাশীর যেসব জিজ্ঞাসু ভক্তেরা রাধাবাগে যাইতেন, বিস্মিত হইতেন বিদেশী তরুণ রোনাল্ড নিক্‌সনের সাধনার কঠোরতা ও নিষ্ঠা দর্শনে।

নিক্‌সনের সাধনভজন দিন দিন যত গভীর হইতেছে, মা মণিকাদেবীর সহিতও তেমনি গড়িয়া উঠিতেছে নিবিড় অন্তরঙ্গতা ও একাত্মতা। বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রতত্ত্ব ও সাধনভজনের যে কোনো কূট প্রশ্ন বা রহস্যের সম্মুখীন হন নিক্‌সন অমনি ছুটিয়া যান তাঁহার মায়ের কাছে। আর মায়ের এক একটি সংক্ষিপ্ত উক্তির মাধ্যমে মীমাংসা হইয়া যায় সকল প্রশ্নের, সর্ব সংশয় তাঁহার ছিন্ন হয়। মায়ের এই অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া দিনের পর দিন তিনি বিস্মিত হন, তাঁহার তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির আলোকে সাধনপথে চলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন নিক্‌সন।

সেদিন মা কহিলেন, "গোপাল, এবার তুমি ভাগবত পড়ো, আর প্রতিদিন আমার সঙ্গে বসেই তা পড়ো।"

নিক্‌সনের আনন্দের আর অবধি নাই। মায়ের কাছে ভাগবত অধ্যয়ন করিবেন, কৃষ্ণলীলার গূঢ় রহস্য জানিয়া নিবেন তাঁহার সাধনজাত প্রজ্ঞার আলোকে। মণিকাদেবীর নির্দেশে একখণ্ড হিন্দি ভাষায় লিখিত ভাগবত কিনিয়া আনা হইল, শুরু হইল নিত্যকার পাঠ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

উত্তরকালে কৃষ্ণপ্রেম বলিতেন, "মায়ের কাছে বসে ভাগবত পড়েছি, আর শুনেছি তাঁর মুখ থেকে নিগূঢ় লীলারসের ব্যাখ্যান। তার ওপরেই তো গড়ে উঠেছে আমার সমস্ত কিছু সাধনভজন।"

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিক। রাসপূর্ণিমার আর বেশী দেরি নাই। চক্রবর্তীদের রাধাবাগ ভবনে এ সময়ে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। রাস উৎসব এবার সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার প্রস্তুতির জন্য সবাই ব্যস্ত।

সেদিন নিত্যকার ভজন সারিয়া আসিয়া নিক্‌সন মাকে প্রণাম করিলেন, যুক্তকরে নিবেদন করিলেন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কহিলেন, "মা, আমি সংকল্প করেছি, বৈষ্ণব-মন্ত্রে সন্ন্যাস দীক্ষা নেবো।"

"বেশ তো গোপাল, এ তো খুব ভালো সংকল্প।" প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন মা।

"হ্যাঁ, আরো স্থির করেছি, তোমার কাছ থেকেই আমি এ সন্ন্যাস নেবো।'

"তা কি ক'রে হয় বাবা? আমি মন্ত্র দিতে পারি, কিন্তু সন্ন্যাস তো আমার দিয়ে হবে না। আমি গৃহী, সন্ন্যাসী নই। শুধু সন্ন্যাসীই পারেন সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে।"

"এত সব আমি জানিনে মা, জানতেও চাইনে কিন্তু এটা স্থির, তোমার কাছ থেকে ছাড়া আর কারুর কাছে আমি সন্ন্যাস নেবো না।"

মা বুঝিলেন, গোপাল তাঁহার সংকল্পে অটল। দৃঢ়, ঋজু ও একনিষ্ঠ স্বভাব তাঁহার মনে প্রাণে যে সংকল্প একবার স্থির করিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা কঠিন।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে নিমীলিত নয়নে মা বসিয়া রহিলেন, আননখানি এক দিব্য আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অতঃপর কহিলেন, "গোপাল, তাই হবে। তোমার সংকল্প যাতে সিদ্ধ হয়, পরমপ্রাপ্তি যাতে সহজে ঘটে, তা-ই করবো। রাধারানীর অনুমতি এই মাত্র পেলাম। তবে সর্বাগ্রে আমায় যেতে হবে বৃন্দাবনে সেখানে প্রভু বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে আমি সন্ন্যাস নেবো। তারপর তোমায় সন্ন্যাস দেবার অধিকার আমি পাবো।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মণিকাদেবী নূতন নাম গ্রহণ করিলেন—যশোদা মাঈ। আর নিক্সনকে সন্ন্যাস দান করিয়া তিনি তাঁহার নামকরণ করিলেন—কৃষ্ণপ্রেম।

ইতিমধ্যে মনীষী শিক্ষাবিদ্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের পর হইতে সাধিকা যশোদা মাঈর জীবনে শুরু হয় এক নূতনতর অধ্যায়। রাধাবাগের প্রাসাদোপম ভবন ত্যাগ করিয়া তিনি আশ্রয় নেন হিমালয়ের কোলে। আলমোড়ার চোদ্দ মাইল দূরে মির্তোলায়, বাগেশ্বর শিবস্থানের কাছাকাছি অঞ্চলে ক্রয় করা হয় একটি নাতিবৃহৎ পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর স্থাপিত হয় রাধাকৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্র মন্দির এবং মন্দির সন্নিহিত আশ্রমভূমির নাম দেওয়া হয় উত্তর বৃন্দাবন।

আশ্রম এবং মন্দির নির্মাণের আগে কিছুদিন যশোদা মাঈ আলমোড়ায় বাস করিতে থাকেন। ধর্মপুত্র এবং শিষ্য কৃষ্ণপ্রেম সর্বদা ছায়ার মতো রহিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। একদিন যশোদা মাঈ কহিলেন, "গোপাল, ভিক্ষান্ন বড় শুদ্ধ অন্ন। তাছাড়া, সন্ন্যাস নেবার পর ভিক্ষান্ন দিয়ে দেহ ধারণ করতে হয়। আমি চাই এখানে কিছুদিন তুমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে থাকো।"

মায়ের আদেশ শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেম মহা আনন্দিত। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়া ভিক্ষা শুরু করিয়া দিলেন আলমোড়া শহরের গৃহস্থদের ঘরে। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকধারী, সুগৌরকান্তি সন্ন্যাসীর গলায় বিলম্বিত পবিত্র তুলসীর মালা। প্রশান্ত ললাটে অঙ্কিত মধ্ব বৈষ্ণবদের দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক, মাঝখানে তার কৃষ্ণবর্ণ এক সরলরেখা। ঘননীল নয়ন দুটির দিকে পথচারীরা অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। ইংরেজ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর এই ভিক্ষাবৃত্তি আলমোড়ার ছোট শহরটিতে চাঞ্চল্য তুলিয়া দেয়।

অল্প দিনেই মধ্যেই আলমোড়ার নরনারী যশোদা মাঈ এবং তাঁহার বিদেশী শিষ্য কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। পাহাড়ের ঢালুতে অবস্থিত কুটিরটি পরিণত হয় ভক্ত মানুষ ও দীন দুঃখীজনের আশ্রয়স্থলরূপে।

প্রায় বৎসর খানেক বাদে মির্তোলার উত্তর বৃন্দাবন আশ্রম ও মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। এবার গুরু যশোদা মাঈকে নিয়া কৃষ্ণপ্রেম স্থায়িভাবে সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন।

পাহাড়ের কোলে স্নিগ্ধ-মধুর শান্তিময় পরিবেশে রচিত এই পবিত্র আশ্রম। ঘন সবুজ বৃক্ষরাজির পটভূমিকা, তাহার সম্মুখে নির্মিত হইয়াছে একটি নাতিবৃহৎ মন্দির। মন্দিরের পূজা-কক্ষে শ্বেত প্রস্তরের বেদীতে বিরাজিত রাধাকৃষ্ণের নয়ন ভুলানো যুগলমূর্তি। এই যুগলমূর্তি এবং তাঁহাদের পূজা অর্চনা আরতি ও ভোগরাগ প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় পরম নিষ্ঠায়। শঙ্খ, ঘণ্টা ও ঝাঁঝর করতালের ধ্বনিতে সারা পাহাড় মুখরিত হইতে থাকে।

গোড়ার দিকে একটি পূজারী নিয়োগ করা হয় মন্দিরের পূজা ও বিগ্রহসেবার জন্য।

কিছুদিন পরে কৃষ্ণপ্রেম নিজেই পরম আগ্রহভরে এ কাজ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া নেন। ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি একসময়ে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমই গ্রহণ করেন ভোগ-প্রসাদ ও রান্নার সকল কিছু দায়িত্ব। কিছুদিন এমন নিষ্ঠা ও দক্ষতা নিয়া একাজ তিনি সম্পন্ন করেন যে সকলেই তাঁহার রান্না-করা প্রসাদের গুণ-গানে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। ফলে ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের কাজে কৃষ্ণপ্রেমই পাকাপাকি-রূপে নিযুক্ত হইয়া পড়েন।

সাধিকা যশোদা মাঈ মাধ্ব বৈষ্ণব শাখার অন্তর্ভুক্ত, তদুপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল অত্যধিক। তাই ঠাকুর পূজা ও ঠাকুরসেবার প্রতিটি কাজ পবিত্রভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে করার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত। মায়ের এই মনোভাব এবং এই নৈষ্ঠিকতার কথা কৃষ্ণপ্রেম জানিতেন। তাই এ বিষয়ে কোনো ত্রুটি বা স্খলন পতন প্রাণ থাকিতে তিনি ঘটিতে দিতেন না।

দোতলা মন্দিরের চারদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে আশ্রমপ্রাঙ্গণ। ঠাকুরের নিত্যপূজার জন্য ফুলের বাগান রচিত হইয়াছে সেখানে। মন্দিরের নিচতলায় আশ্রমিক সাধকদের বাসস্থান। আশেপাশে নির্মিত তিনটি কুটির। একটিতে স্থাপিত ক্ষুদ্র একটি পাঠাগার, আবার সেটিকে নবাগত অতিথিদের আশ্রয়কক্ষরূপেও ব্যবহার করা হয়। আর একটি ক্ষুদ্র কুটিরে রহিয়াছে স্থানীয় গরীব ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা। গোড়ার দিকে, শরীর অসুস্থ না হওয়া অবধি, যশোদা মাঈ নিজেই ছেলেমেয়েদের পড়াইতে বসিতেন। স্নেহময়ী মায়ের ধর্মপুত্রদের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকার সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা যেমন ছিল, তেমনি ছিল মির্তোলা ও বাগেশ্বরের দীন দুঃখী ছেলেমেয়েরা। সবারই জন্য সদা উন্মুক্ত ছিল এই মহীয়সী জননী যশোদা মাঈর হৃদয়দ্বার।

আশ্রমের একপাশে স্বল্পব্যয়ে সাধুদের জন্য একটি ধর্মশালা তৈরি করা হয়। কৈলাস ও বাগেশ্বরের যাত্রী যে সাধু সন্ন্যাসীরা এ অঞ্চলে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকে আশ্রয় নিতেন এখানে। উত্তরকালে পাহাড়ের আরো একটু উঁচুতে একটি ছোট ডিসপেনসারীও স্থাপন করা হয়। রোগক্লিষ্ট দরিদ্র পাহাড়ীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এটি ব্যবহৃত হইতে থাকে।

আশ্রমের সন্নিহিত ঢালু জায়গায় খাঁজে খাঁজে কিছুটা চাষের ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় লোকদের নিয়া কৃষ্ণপ্রেম ও তাঁহার সহকর্মীরা ঐসব চাষের ক্ষেতে ফসল ফলাইতেন, আর একাজকে সবাই গণ্য করিতেন ঠাকুরের সেবারূপে।

ডাক্তার আর. ডি. আলেকজাণ্ডার ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমের কৈশোর-জীবনের বন্ধু। কৃষ্ণপ্রেমের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনিও ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন, স্বদেশ ছাড়িয়া এখানে উপস্থিত হন। কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু এদেশে আসা মাত্রই বন্ধুকে তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে দেন নাই। তাঁহাকে বলিয়াছেন, "অ্যালেক্, হঠাৎ ঝোঁকের বশে বা ভাবালুতার বশে, তুমি কিছু ক'রে বসো না। কিছুদিন অপেক্ষা করো, তোমার নিজের মতামতকে যাচাই করো, তারপর নাও স্থির সিদ্ধান্ত।"

আলেকজাণ্ডার একথায় রাজী হইলেন। উচ্চতর ডাক্তারী ডিগ্রি এবং চিকিৎসার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল। লখনৌর এক বড় হাসপাতালে তিনি চাকরী নিলেন, বেশ কিছুদিন সুনাম ও কৃতিত্বের সহিত কাজ চালাইয়া গেলেন। তারপর সে কাজে আর মন বসিল না, ভবিষ্যতের সকল কিছু উজ্জ্বল সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া শরণ নিলেন কৃষ্ণ-

প্রেমের কাছে, তাঁহার কাছ হইতে নিলেন বৈষ্ণবীয় মন্ত্র ও সন্ন্যাস দীক্ষা। নূতন নাম হইল—হরিদাস। মির্তোলা আশ্রমের চাষবাস আর ডিসপেনসারীর কাজ দেখাশুনার পর বাকীটা সময় হরিদাস অতিবাহিত করিতেন ঠাকুরের ধ্যান ভজনে। এই প্রতিভাধর নূতন শিষ্যের জীবনে কৃষ্ণপ্রেমের ত্যাগ তিতিক্ষা, সেবা-নিষ্ঠা ও ভক্তিপ্রেম মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

উত্তর বৃন্দাবনের অপর আশ্রমিক ছিলেন মাধব আশীষ। তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের কাহিনীও বড় অদ্ভুত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই তরুণ ইংরেজ তনয় পশ্চিম বাংলায় আসেন সামরিক বিমানক্ষেত্রের গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার রূপে। তারপর একবার ছুটির সময় বেড়াইতে যান হিমালয় অঞ্চলে। সেখানে কৃষ্ণপ্রেমের জীবন-কথা শুনিতে পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠেন, মির্তোলায় আসিয়া উপস্থিত হন কৃষ্ণপ্রেমকে দর্শন করার জন্য। এই প্রথম দর্শন পরিণত হয় প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও প্রেমে। অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবায় উৎসর্গ করেন তনুমনপ্রাণ।

যশোদা মাঈর কনিষ্ঠা কন্যা মতিরানীও বাস করিতেন মির্তোলার আশ্রমে। যশোদা মাঈএর তিরোধানের পরে কৃষ্ণপ্রেমের কাছ হইতেই তিনি গ্রহণ করেন মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস। মতিরানী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমকে ডাকিতেন 'ছোট-বা', অর্থাৎ ছোট-বাবা বলিয়া। আনন্দ চঞ্চল মতিরানী সকল সাধুদেরই ছিলেন স্নেহভাজন. মির্তোলার আশ্রমের দিকে দিকে সদাই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন মুক্তবিহঙ্গিনীর মতো। কৃষ্ণপ্রেমের এই শিষ্য ও স্নেহের দুলালী বেশীদিন জীবিত থাকেন নাই, অকালে লোকান্তরে চলিয়া যান।

গুরু সেবা আর কৃষ্ণবিগ্রহের সেবা—এই দুইটি কৃত্যের উপর সিদ্ধ সাধিকা যশোদা মাঈ আরোপ করিতেন সর্বাধিক গুরুত্ব। তাই সেবা মাহাত্ম্যের এই তত্ত্বটি ছিল কৃষ্ণপ্রেমের জীবনসাধনার ভিত্তি। দীর্ঘকালের ত্যাগ তিতিক্ষা ও একৈকনিষ্ঠার মধ্য দিয়া এই সেবাকর্মে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, গুরুকৃপায় লাভ করিয়াছিলেন পরমপ্রভু কৃষ্ণকে, জীবন হইয়াছিল কৃতকৃতার্থ।

কৃষ্ণপ্রেমের কাছে যশোদা মাঈর প্রতিটি কথা, প্রতিটি নির্দেশ ছিল বেদবাক্যের মতো। গুরুর প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে, নিমেষপাতের দিকে, অনন্য নিষ্ঠা নিয়া তাকাইয়া থাকিতেন আর নিজের সাধনজীবনকে গড়িয়া তুলিতেন, নিয়ন্ত্রিত করিতেন তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে। গুরুর সহিত একাত্মক হইয়া গিয়াছিলেন তিনি, ফলে সাধিকা যশোদা মাঈর জীবনে যে ইষ্টকৃপা ও সিদ্ধি স্ফুরিত হইয়াছিল, অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের জীবনে।

গুরুর কাছে তাঁহার এই আত্মসমর্পণ এবং গুরুর সঙ্গে তাঁহার এই একাত্মকতা সম্ভব হইয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের নিজস্ব বিশ্বাসের শক্তি ও একনিষ্ঠ ভক্তির ফলে। চরিত্রের এই দুইটি বৈশিষ্ট্যই কৃষ্ণপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল চরম ত্যাগের পথে। নিজের দেশ, আত্ম-পরিজন ও ধর্ম সংস্কৃতি ছাড়িয়া এই মহাবৈরাগী ঝাঁপ দিয়াছিলেন কৃষ্ণঅনুরাগের সাগরে। সারা জীবনে আর পিছন ফিরে তাকান নাই।

কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ একবার তাঁহার শিষ্য স্যাডউইক্-কে এক পত্রে

লিখিয়াছিলেন : "কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে একটা শক্তি ছিল যার বলে তিনি বহিরঙ্গ জীবনের চিন্তাস্রোত এবং ভাবাবেগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারতেন, পৌঁছুতে পারতেন শাশ্বত জ্ঞানের উৎসস্থলে। তাঁর এ শক্তি সত্যিই বড় প্রশংসার্হ। যদি তিনি জাগতিক চিন্তাস্রোতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন তাহলে হয়তো রঁম্যা রলাঁ বা এই ধরনের সংস্কৃতিবান মনীষীদের স্তরেই তাকে পড়ে থাকতে হতো। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম আসলে জীবনকে দেখেছিলেন যোগদৃষ্টির দিক থেকে, সম্যক্ দৃষ্টির দিক থেকে, এবং তাঁর জীবনসাধনায় যে প্রস্তুতি নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভক্ত এবং শিষ্যের প্রকৃত আত্মসমর্পণের ভাবটি দ্রুততার সহিত এবং পরিপূর্ণরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর সাধনা হয়েছে এমন সাফল্যমণ্ডিত। একটি আধুনিক মানুষের পক্ষে, তা সে শিক্ষিত ইয়োরোপীয়ই হোক আর ভারতীয়ই হোক, এ সাফল্য অর্জন করা অতি কঠিন। তার কারণ, আধুনিক মানুষের মধ্যে রয়েছে অত্যধিক বিচার বিশ্লেষণ, সংশয় এবং ছন্নছাড়া ভাব, ইচ্ছে থাকলেও এ থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। ফলে সাধনজীবনে যে আলো, যে শক্তি এগিয়ে আসছে, তা দেখে সে পিছু হটতে থাকে, তার ভেতরে সে দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না, বলতে পারে না—যদি-আমায় তোমার ভেতরে প্রবেশ করতে দাও, তবে এখনি আমি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি আমার নিজের বলতে যা আছে তার সব কিছুকে, আমার চৈতন্যকে নিয়ে যাও তোমার পরম পথ দিয়ে তোমার পরম সত্যে, তোমার ভাগবত সত্তায়। আমাদের ভেতর এ মনোভাব এবং এ প্রস্তুতি ঠিকই রয়েছে, কিন্তু সংশয় ও দৌর্বল্য করছে তার পথরোধ, একটা যবনিকা রচনা করে আছে অন্তরাল। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সাধকদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সত্য উপলব্ধির পথ কখনোই এত দীর্ঘ হতে পারে না, সাধনার পথে এত ঘুরপাক খেতে হয় না, যদি অত্যধিক বিচার বিশ্লেষণ ও সংশয়ের বাধা থেকে মুক্ত থাকা যায়। কৃষ্ণপ্রেমকে আমি প্রশংসা জানাই, তিনি অবলীলায় এবং অতি সহজে ঐ বাধা অতিক্রম করেছেন।"[১]

গুরুকৃপা এবং মাতৃস্নেহ এই দুই-ই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন যশোদা মাঈর নিকট হইতে। সন্ন্যাস দীক্ষা নিবার পূর্বে এবং পরে, বিভিন্ন সময়ে মায়ের মাধ্যমে বহুতর অলৌকিক লীলা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। ফলে কৃষ্ণভজনের আস্থা ও কৃষ্ণরতি তাঁহার হইয়াছিল গভীরতর। পরবর্তীকালে সিদ্ধপুরুষ কৃষ্ণপ্রেমের কৃপায় তাঁহার ভক্ত শিষ্যেরা ঐ ধরনের নানা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যশোদা মাঈর নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবজীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি সতর্কভাবে অনুসরণ করিতেন কৃষ্ণপ্রেম। এ সম্পর্কে কোনো শৈথিল্য বা আপোস রফার স্থান তাঁহার মনে পাইত না।

বিজ্ঞানী বশী সেন এবং তাঁহার স্ত্রী জারট্রুড এমারসন সেনের সঙ্গে যশোদা মাঈ ও কৃষ্ণপ্রেমের ঘনিষ্ঠতা ছিল। মির্তোলায় আসা যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে তাঁহারা আলমোড়া শহরে মিঃ সেনের বাংলোতে অবস্থান করিতেন। সাধুদের নৈষ্ঠিকতার কথা শ্রীমতী সেনের জানা ছিল। তাঁহারা আসিলেই বাংলোর বারান্দা ধুইয়া পুছিয়া নূতন রন্ধন পাত্র কিনিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কৃষ্ণপ্রেম এবং যশোদা মাঈ স্বহস্তে

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম - দিলীপকুমার রায়

রান্না করিতেন এবং ঠাকুরের ভোগ চড়াইয়া নিজেরা করিতেন প্রসাদ গ্রহণ। এ সময়ে বশী সেন মহাশয় কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে সপ্রেম ভঙ্গীতে নানা ধরনের রঙ্গ রসিকতা করিতেন।

শ্রীমতী জারট্রুড সেন লিখিয়াছেন,[১] "সেদিন আমার স্বামী কৃষ্ণপ্রেমকে ঠাট্টার সুরে বললেন, ভোগ রান্নার এসব ছুৎমার্গী কাণ্ড যদি আমার বিধবা বৃদ্ধা ঠাকুমা করতেন, তাহলে না হয় বুঝতাম। কিন্তু আপনি কেন এসব করতে যাবেন? আপনার আগেকার জীবনের পরিবেশ যে ছিল একেবারে পৃথক ধরনের। কেমব্রিজে পড়বার সময়, ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয় প্রচুর গোমাংস আপনি খেয়েছেন, তবে আর এত সব গোঁড়ামি আর বাধানিষেধের মধ্যে আছেন কেন, বলুন তো?

"গোপাল কিন্তু একটুও বিরক্ত হলেন না এই ঠাট্টা শুনে। হেসে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, আর এমন একটি উত্তর দিলেন, যা প্রত্যেকটি শ্রোতার অন্তরে জাগিয়ে তুলল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এর পর আমার স্বামী আর কখনো এসব নিয়ে ঠাট্টা অথবা রসিকতা করেন নি। গোপাল বললেন, "এ যুগে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের সব কিছু সংযম আর নিয়ন্ত্রণই তো জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আমার তো মনে হয় এমন দুঃসময়ে নিজের ওপরে এ ধরনের সংযমের বাঁধ কিছুটা চাপিয়ে রাখা ভালো। তাছাড়া, আমার আগে যাঁরা এ পথ ধরে এগিয়েছেন, তাঁরা লক্ষ্যস্থলে ঠিকই পৌঁছে গেছেন। তাহলে আমার মতো লোক, যে এ পথে যাত্রা শুরু করেছে, তার পক্ষে কি বলা শোভা পায়—আমি এটা করবো, ওটা করবো না, এ নিয়ম মানবো, আর ওটা মানবো না? আমি তাই এ পথের সবটাই মেনে চলেছি।"

মির্তোলার আশ্রমে কোনো রেডিও বা খবরের কাগজ রাখা হইত না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের আশ্রম নিয়া এককেন্দ্রিক জীবনযাপন করিতেন কৃষ্ণপ্রেম, সেখানে অবান্তর কোনো কিছুর প্রবেশাধিকার ছিল না। দেশ বিদেশের সমস্যা ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনার কোনো প্রয়োজনবোধ তাঁহার ছিল না। তাছাড়া কেনই বা থাকিবে? নিজে হইতে যে জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত থাকার তো কোনো কারণ নাই। শাশ্বত পরম সত্য, কৃষ্ণ, তাঁহার লক্ষ্যবস্তু। সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে সমগ্র জীবনটাকে পরিণত করিতে হইবে একটি ঋজু ক্ষিপ্রগতি ধনুঃশর-রূপে। আর সেই শরকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিতে হইবে পূজা অর্চনা ও ধ্যান ভজনের মধ্য দিয়া।

আলমোড়ায় সেনেদের বাংলোয় বসিয়া চা-পানের পর নানা কথাবার্তা হইতেছিল। জাতি বর্ণের প্রসঙ্গ উঠিলে কৃষ্ণপ্রেম কহিলেন প্রাচীন যুগের জাতি বিভাগ প্রাচীন ভাবতেই অনেক কল্যাণসাধন করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আবার এটাও ঠিক যে, যে ধরনের জাতিবর্ণ বিভাগ আজকের দিনে রয়েছে তা আর টিকবে না, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, আজকাল আর্থিক সংস্কার সাধন, শিল্পের প্রসার, পরিসংখ্যান এসব নিয়ে যে বাড়াবাড়ি আর পাগলামি চলছে, এর ফল শেষটায় কি কল্যাণকর হবে? মানুষকে কি শুধু সংখ্যাতত্ত্বে পরিণত করা হচ্ছে না? আত্মিক উন্নয়নের মূল্য কি ক্রমেই কমে আসছে না? ভারতের পক্ষে কি নিজের ঐতিহ্যের শেকড় আঁকড়ে ধরে প্রভূত কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়?

---

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম, ভূমিকা : জারট্রুড ইমারসন সেন

পাশ্চাত্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর নকলবৃগেই কি তাকে গড়ে উঠতে হবে? হ্যাঁ, তবে এটা ঠিক, আমরা যে যা ই বলি, পেছন থেকে ঠাকুরই যে টেনে চলেছেন তাঁর সুতো। তিনি যেমন আমাদের চালাচ্ছেন, তেমনি চলছি আমরা। তিনি নাচান, আর আমরা নাচি—এইটেই হচ্ছে প্রকৃত কথা।"

চীন তখন ভারত আক্রমণ করিয়াছে। এ আক্রমণের ফল কি দাঁড়াইবে, এ কথা ভাবিয়া সবাই উদ্বিগ্ন। মিসেস সেনও এ সম্পর্কে তাঁহার দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিতেছিলেন।

কৃষ্ণপ্রেম কিছুকাল নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, "আপনাদের তো নিশ্চয় মনে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করার জন্য অশ্বত্থামা হেনেছিলেন অমোঘ বাণ। সে বাণ ছিল ব্রহ্মাস্ত্র, কোনো কিছু দিয়েই তার প্রতিরোধ সম্ভবপর ছিল না। সেই সংকটে সারথীরূপে কৃষ্ণ তার চরণ দিয়ে রথটি চেপে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে রথের চাকা গেল বসে। গোটা রথটা নিচু হয়ে গেল, আর ঐ মারাত্মক বাণ উড়ে চলে গেল অর্জুনের মাথার ওপর দিয়ে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের যে-কোনো সংকটে কৃষ্ণ তেমনিভাবে তাঁর চরণ দিয়ে আমাদের চেপে ধরবেন—এদেশ রক্ষা পাবে। ভারতের আত্মা কখনো বিনষ্ট হতে পারে না।"

কৃষ্ণপ্রেম আরো বলিতেন, "ভারত হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র দেশ যা পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার কাছে পরাজিত হয় নি, তলিয়ে যায় নি। কারণ আজ অবধি তাকে বর্মের মতো ঘিরে রেখেছে, সদাই রক্ষা ক'রে চলেছে তাঁর অগণিত সিদ্ধ মহাপুরুষদের আত্মিক জ্যোতির কল্যাণ-বলয়।"

তাই আধুনিক তার্কিকেরা এ দেশের সাধু-সন্তদের পরগাছা বলিয়া অভিহিত করিলে তিনি শ্লেষের হাসি হাসিতেন মন্তব্য করিতেন, "ভগবানের কৃপায় পাশ্চাত্য দেশে যদি এ ধরনের পরগাছা বেশী ক'রে জন্মাতো তাহলে বোধহয় দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতো।"

বারাণসীতে থাকার সময় কৃষ্ণপ্রেম একদিন বারাণসীর মাহাত্ম্য এবং শিবের জ্যোতির কথা বর্ণনা করিতেছিলেন। অতি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উন্নাসিক এক শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, এই ধুলো কাঁকরময় বিশ্রী শহরে আপনি শ্রদ্ধা করবার মতো সত্যই কি কিছু পেয়েছেন?"

কৃষ্ণপ্রেমের চোখ মুখ দিব্য আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। প্রসন্নমধুর কণ্ঠে বলেন, "পেয়েছি বই কি, বন্ধু। পেয়েছি এখানে সোনার ধুলো কাঁকর, আর গঙ্গার স্বর্গীয় সংগীত।" প্রত্যয় সমুজ্জ্বল সাধকের চোখ মুখের ভাব আর শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া প্রশ্নকর্তার মুখে কোনো কথা সরিল না।

গুরু যশোদা মাঈ সম্পর্কে একবার আমরা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কি তিনি পাইয়াছেন তাঁহার মায়ের কাছে, কিভাবে পাইয়াছেন, তাহাও জানিতে চাওয়া হইয়াছিল। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "আমার একটা বড়ো সুবিধে—মা, গুরু আর কৃষ্ণ একই পথের ধাপ বেয়ে আমার কাছে এসে গেছেন। মা কি কোনোদিন সন্তানকে বর্জন করতে পারে? যত দুর্বল যত দুষ্কৃতই হোক না কেন মা তাকে দু হাত দিয়ে আগলে রাখবেন। আমার এই মা ই আবার আমায় দিয়েছেন সাধন-আশ্রয়। তারপর সিদ্ধা মাতা আর সিদ্ধা গুরুর মাধ্যমে পরম প্রভু কৃষ্ণও এসেছেন আমায় কৃপা করতে। মার থেকে স্নেহরস ধারা

যেমনি স্বাভাবিকভাবে এসেছে আমিও তা পান করেছি স্বাভাবিকভাবে। জীবন আমার কৃতার্থ হয়ে উঠেছে। সর্বদাই ভেবে এসেছি, কৃষ্ণও যদি আমায় ত্যাগ করেন, মা—সদ্‌গুরুরূপী মা, আমায় কখনো ফেলে দেবে না তাঁর আশ্রয় থেকে।"

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোদা মাঈর তিরোধানের পরে মির্তোলার আশ্রমে নামিয়া আসে শোকের কৃষ্ণচ্ছায়া। আর এ শোক তীক্ষ্ণ শায়কের মতো বিদ্ধ হয় গুরুগতপ্রাণ কৃষ্ণপ্রেমের বক্ষে। জীবনে এমন দুঃসহ আঘাত আর কখনো তিনি পান নাই।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের কাছে শোকসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "...গলস্টোনের ব্যাধিতে মা নরদেহ ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। দেহান্তের সময় যে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছিল তাঁর ভেতরে তা অবর্ণনীয়। কৃষ্ণ দর্শনের পরিতৃপ্তির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চোখে মুখে, মনে হচ্ছিল বিগত জীবনের বৎসরগুলো সব যেন ঝরে পড়ে গেছে তাঁর দেহ থেকে। আমি ঠিক জানি, তিনি এখনো আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন, এবং আগের চাইতে আরো ঘনিষ্ঠতর রূপেই রয়েছেন, তবু তাঁর দৈহিক সান্নিধ্য হারিয়ে ফেলার ক্ষতি যেন আমি সহ্য করতে পারছিনে। যদিও আমি জানি কৃষ্ণের অবিস্মরণীয় কথা—বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণ পত্নীদের তিনি বলেছিলেন—দৈহিক সান্নিধ্য দিয়ে তো শ্রীভগবান্‌কে কখনো লাভ করা যায় না। মা আমাদের আগে থেকেই বলেছিলেন, তাঁর শেষ সময় আসন্ন। কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি চলে যাবেন তা ভাবতে পারি নি। তুমি তো জানো, মা আমার কাছে কোন্ পরমবস্তু ছিলেন—বিশ বছরের অধিক কাল তিনি ছিলেন আমার—সদ্‌গুরু, আর ছিলেন আমার মা। তিনি ছিলেন সেই কেন্দ্রটি, যার চারদিকে আমার সমগ্র জগৎ এতকাল আবর্তিত হয়েছে। এখনো তিনি সেই কেন্দ্ররূপেই বিরাজিতা রয়েছেন, কিন্তু দেহে তাঁকে দর্শন করতে পারছি না, এটাই হয়ে উঠেছে অসহনীয়।"

গুরু এবং গুরুতত্ত্বের আদর্শ সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেমের নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। যশোদা মাঈ তখনো জীবিত, সে-বার তাঁহাকে নিয়া কৃষ্ণপ্রেম এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছেন। দিলীপকুমারও তখন সেখানে, যশোদা মাঈ এবং অন্যান্য অভ্যাগতদের সম্মুখে বসিয়া সেদিন তিনি গাহিতেছিলেন শঙ্করাচার্যের রচিত প্রসিদ্ধ এক গুরুস্তোত্র। কৃষ্ণপ্রেম এই স্তোত্রসংগীত শুনিতে শুনিতে ভাবতন্ময় হইয়া গিয়াছেন।

সংগীত থামিলে, একজন ভক্ত শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করিলেন, "গুরুর কৃপা লাভের প্রধান উপায় কি?"

উত্তর হইল, "গুরুর প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তিনিষ্ঠা।"

"প্রার্থনা ও ধ্যান ধারণা কি গুরুকে উদ্দেশ ক'রে করতে হবে, না শ্রীভগবান্‌কে ভেবে করতে হবে?"

"দুই ই করতে পারেন, ফল হবে একই। আসলে দুই-ই যে এক বস্তু।"

এক কূটতার্কিক অধ্যাপক সেখানে উপবিষ্ট। কহিলেন, "তা কি ক'রে হবে? ভগবান্ একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই, আর গুরু আজকাল গজাচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। তাছাড়া, তন্ত্রসার তো সোজা বলে দিয়েছেন,—মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে, তেমনি জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও এক গুরু থেকে আর এক গুরুর কাছে যাবে, আহরণ করবে জ্ঞান।"

কৃষ্ণপ্রেম বলিয়া উঠিলেন, "জানি, মশাই, ও শ্লোকের কথা জানি। স্যার জন উডরফের তন্ত্রের বই-এ ঐ উদ্ধৃতি বারো বৎসর আগে আমি পড়েছি। কিন্তু উডরফ নিজেই বলেছেন, তান্ত্রিকদের মধ্যে উচ্চকোটি এবং সাধারণ, নানা স্তরের সাধক রয়েছেন। তাছাড়া, এ শ্লোকটিও তিনি সংকলন করেছেন—গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টঃ, গুরুকে তুষ্ট করলেই শিবকে তুষ্ট করা হয়।

তার্কিক অধ্যাপক তাঁহার খুঁটি কিছুতেই ছাড়িবেন না। বলিলেন, "আসল প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞানান্বেষী সাধক বিভিন্ন গুরু থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে কিনা ?"

কৃষ্ণপ্রেম দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মশাই, আপনার কিন্তু গোড়াতেই গলদ রয়েছে। শিক্ষক আর গুরুতে আপনি গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। যে সাধক গুরুকে শুধু শিক্ষক বলে মনে করে, সে বহু গুরুর কাছে অবশ্য যেতে পারে। কিন্তু যে গুরুকে গুরুর দেহের বাইরে, সূক্ষ্মতর সত্তায় পেয়েছে, নিজের হৃদয়ের ভেতরে স্থাপন করেছে, সে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে না গুরুকে ত্যাগ করার কথা।"

যশোদা মাঈ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "গোপাল, তুমি ঠিকই বলেছো। যে সাধ্বী স্ত্রী তার স্বামীকে সারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে, সত্যিকার ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছে, ভালোবাসার তৃষ্ণা মেটাতে সে কি কখনো অপর কোথাও যায়, না যেতে পারে ?"

সংশয়ী, তার্কিক অধ্যাপক একথার পর তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিরোধানের পরও গুরু যশোদা মাঈর দৃষ্টি তাঁহার অধ্যাত্মতনয় কৃষ্ণপ্রেম হইতে সরিয়া যায় নাই। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুদের কাছে কৃষ্ণপ্রেম এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

সেদিন দণ্ডেশ্বরের ঝর্ণার পাশে যশোদা মাঈর মরদেহ ভস্মীভূত হইবার পর কৃষ্ণপ্রেম ও অন্যান্য ভক্তেরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সারা দিন দুশ্চিন্তা ও ছোটাছুটিতে কাটিয়াছে, দেহ অতিশয় পরিশ্রান্ত। শয্যায় শয়ন করার পর আসিল গভীর নিদ্রা। অভ্যাসমতো শেষ রাত্রে উঠিয়া প্রত্যহ তিনি ধ্যান ভজন করেন, কিন্তু সেদিন দেহ অবসন্ন, তাই যথাসময়ে নিদ্রা ভাঙে নাই। হঠাৎ এসময়ে তিনি শুনিতে পান বিদেহী যশোদা মাঈর কণ্ঠস্বর, "গোপাল, একি, এখনো ঘুমিয়ে আছো ? ভজনে বসবার সময় যে চলে যাচ্ছে" একটু থামিয়া, আশ্বাসের সুরে মা আবার বলিলেন, "গোপাল, আমি কিন্তু এখনো আগের মতো তোমার পাশে রয়েছি।"

কৃষ্ণপ্রেম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়েন। মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুইচোখ সজল হইয়া উঠে, কাতর স্বরে বলিয়া উঠেন, "মা, যদি তুমি আমার পাশেই রয়েছো, তবে তোমায় দেখতে পাচ্ছিনে কেন ? আর কি আমায় দেখা দেবে না ?"

"না বাবা, ধাপের পর ধাপ এগিয়ে তোমারই যে আসতে হবে আমার কাছে। তোমার সাধনা ঠিক মতো চালিয়ে যাও, এখানে এই লোকে এসে আমার দেখা পাবে।" অদৃশ্য-লোকের ঐ বিশেষ চৈতন্য স্তর হইতে যশোদা মাঈ ইহার পর আরো কিছুকাল তাঁহার গোপালকে নির্দেশাদি দিয়াছেন। পরবর্তীকালে, এই দৈবী কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় নাই।

আমাদের প্রীতিভাজন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার একবারকার একটি অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেম ও মতিরানী সে সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তাঁহাদের আহ্বান পাইয়া কাশী হইতে গোবিন্দগোপালও সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। সবাই মিলিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিতেছেন, ঠাকুর দর্শন করিতেছেন : ভজন কীর্তন ও অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় দিন বেশ আনন্দে কাটিতেছে।

ইতিমধ্যে গোবিন্দগোপালের দাদার এক টেলিগ্রাম সেখানে হাজির। কৃষ্ণপ্রেমের সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন, মির্তোলায় ফিরিবার আগে কৃষ্ণপ্রেম যেন তাঁহার কাছে বৈদ্যনাথধামে একবার অবশ্য যান।

সেখানে যাওয়া সম্পর্কে সোৎসাহে আলাপ আলোচনা চলিতেছে, এসময়ে কৃষ্ণপ্রেম হঠাৎ কহিলেন "তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি ভেতর থেকে আসছি।"

কিছুক্ষণ পরে নিজকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "মায়ের নির্দেশ এইমাত্র আমি পেলাম। বললেন, 'সরাসরি মির্তোলায় চলে যাও। সেখানে তোমাদের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। ব্যাপারটা খুব জরুরী।"

ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম মির্তোলায় গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন আগের দিন ভারপ্রাপ্ত পূজারীটি আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছে। সেদিন তাঁহারা মির্তোলায় না পৌঁছিলে ঠাকুরের পূজা অর্চনা হইত না, এবং তাঁহাকে উপবাসীও থাকিতে হইত।

রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নানা লীলা বৈচিত্র্য উত্তর বৃন্দাবন আশ্রমের ভক্তেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অধিকাংশ দিন ঠাকুরের ভোগ কৃষ্ণপ্রেম নিজেই অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে প্রস্তুত করিতেন। একদিন আশ্রমে খুব ভালো ঘৃত সংগৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম সযত্নে ইহা দিয়া হালুয়া তৈরি করিলেন। ভোগ নিবেদন করার পর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, প্রাঙ্গণে বসিয়া সবাই শুরু করিলেন জপ ধ্যান। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রেম হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "মনে হচ্ছে, ঠাকুর আজ ভোগ আস্বাদন ক'রে খুশী হয়েছেন। চলতো, সবাই গিয়ে দেখি প্রসাদের অবস্থা কি। সত্য সত্যই আজ কিছুটা খেয়েছেন কিনা।"

যশোদা মাঈ পাশেই বসিয়াছিলেন। গোপালের কথা শুনিয়া তিনি নীরবে শুধু মুচকি হাসিলেন। অতঃপর আশ্রমিকেরা মন্দির কক্ষে ঢুকিয়া দেখেন, ঠাকুর স্থূল দেহীর মতো সত্য সত্যই সেদিন ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু তাই নয়, হালুয়ার বেশীটা অংশই প্রভু উড়াইয়া ফেলিয়াছেন, বালগোপালের কচি আঙুলের ছাপটি দেখা যাইতেছে স্পষ্টরূপে। এই দৃশ্য দেখিয়া সবাই মহা আনন্দিত। সোৎসাহে তাঁহারা শুরু করিলেন ভজন ও কীর্তন।

ঠাকুর এবং ঠাকুরানীর প্রেমলীলার বৈচিত্র্যও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। একদিন প্রত্যূষে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া কৃষ্ণপ্রেম ঘরে ঢুকিয়াছেন। শ্রীমূর্তির দিকে নজর পড়িতেই চমকিয়া উঠিলেন। একি অদ্ভুত দৃশ্য। কৃষ্ণের পায়ের সোনার নূপুর দুটি স্থানান্তরিত হইয়াছে রাধারানীর পায়ে, আর রাধারানীর সোনার হারটি চলিয়া আসিয়াছে কৃষ্ণের গলায়।

কৃষ্ণপ্রেম উচ্চস্বরে সবাইকে ডাকিয়া আশ্রমের মন্দিরে জড়ো করিলেন। আগের

রাত্রে আরতির পরে সর্বসমক্ষে শ্রীবিগ্রহের শয়ান দেওয়া হইয়াছে। তারপর সারা রাত তো মন্দিরের দুয়ার ছিল তালাবদ্ধ। ভক্তেরা মহা উল্লসিত, শ্রীবিগ্রহের এই মানুষী লীলার কথা নিয়া তাঁহারা সোৎসাহে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের চোখে মুখে দিব্য আনন্দের আভা। কহিলেন, "দ্যাখো দেখি ঠাকুর ঠাকুরানীর কি কাণ্ড। ভক্তের হৃদয় মঞ্চে, মন্দিরের বেদীতে, আর অপ্রাকৃত ব্রজধামে সবখানেই সেই একই লীলাবিলাস।"

কৃষ্ণপ্রেমের সাধনার একটা বড় ধাপ—রাধারানীর কৃপাপ্রাপ্তি। এই কৃপা দিনের পর দিন তাঁহার সাধনজীবনের নানা প্রশ্নের মীমাংসা যেমন করিয়া দিত, তেমনি করিত আশ্রমজীবনের এবং বহিরঙ্গ জীবনের নানা কর্মের দিক্‌দর্শন।

কোনো ভক্ত কখনো দীক্ষাপ্রার্থী হইলে অথবা কোনো ভগবৎ তত্ত্বের দিক্‌দর্শন প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণপ্রেম বলিয়া উঠিতেন, "অপেক্ষা করো, রাধারানীর অনুমতি আগে নিয়ে নিই।" তারপর প্রবেশ করিতেন মন্দিরে, কিছুকাল ধ্যানাবিষ্ট থাকার পর ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসু ভক্তকে দিতেন তাঁহার প্রার্থিত সাহায্য।

জীবনের শেষ পর্যায়ে যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার জীবন যেন শ্রীরাধার ভাবেই আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কীর্তনে রাধার নাম, ভাষণে রাধা, আবার কাহাকেও অভিবাদন বা সম্বোধন করিতে হইলেও 'জয় রাধে'।

বন্ধুবর হেরম্ব মুখোপাধ্যায় একবার কয়েকমাস মির্তোলায় কৃষ্ণপ্রেমের আতিথ্যরূপে আহ্বান করেন এবং তাঁহার অশেষ স্নেহ ও কৃপালাভ করেন। এ সময়ে কৃষ্ণপ্রেমের শ্রীমুখাৎ রাধারানীর এক মনোজ্ঞ লীলা কাহিনী তিনি শুনিয়াছিলেন।

ভক্ত সুনীল এবং তাঁহার স্ত্রী আরতি দেবী মির্তোলার আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কৃষ্ণপ্রেমের কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সাধনভজন করিতেন। সুনীল থাকিতেন এলাহাবাদে, আর মাঝে মাঝে অফিসের কাজে ছুটি নিয়া সপরিবারে উপস্থিত হইতেন গুরুর সকাশে।

সেবার উভয়েরই মনে প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছে, মির্তোলা আশ্রমে গিয়া কয়েকদিন কাটাইয়া আসিবেন। মাসের শেষ, হাতে তখন তেমন টাকাকড়ি নাই, পাথেয় কি করিয়া যোগাড় করা যায়?

ভক্তিমতী স্ত্রী আরতি এ সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। হাতের সোনার বালা-জোড়া বিক্রয় করিয়া, সংগ্রহ করিলেন রেল ভাড়ার টাকা। অতঃপর পরমানন্দে তাঁহারা মির্তোলার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। ঠাকুরের সেবা পূজা ও ভজনাদি শেষ হওয়া মাত্র কৃষ্ণপ্রেম আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ান। হাতে তাঁহার এক জোড়া সোনার বালা। সুনীল ও আরতি কাছে আসিতেই স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা আরতি, তোমার বালা দু'গাছা কি করেছো বলতো? সত্যি ক'রে বলো।"

আরতির মুখে কোনো কথা নাই, সসংকোচে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন।

স্মিতহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম এবার কহিলেন, "দ্যাখো, রাধারানী এই মাত্র আমার সব কথা জানিয়ে দিলেন। মির্তোলায় আসবার খরচপত্র তোমরা তাড়াতাড়ি জোটাতে পারছিলে না, তাই শেষটায় আরতির সোনার বালা বিক্রি করতে হয়েছে। তাইতো রাধারানী বললেন, আমার হাতের বালা জোড়া খুলে নাও, আরতিকে দিয়ে দাও। ওর হাত বড্ড খালি দেখাচ্ছে।"

রাধারানীর নির্দেশ মতো তাঁর ঐ অলঙ্কার আর্বাত দেবীকে দিয়ে দেওয়া হল। ভক্তের তপস্যায় জাগ্রত উত্তর বৃন্দাবনের রাধারানী বিগ্রহ আরো বহুতর লীলা উত্তরকালে প্রকটিত করিয়াছেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপ্রেম সেবার মির্তোলা হইতে বাহির হইয়াছেন। প্রথমে মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী হইয়া পৌঁছিলেন তিরুভন্নামালাই-এ মহর্ষি রমণের আশ্রমে। মহর্ষির জ্ঞানময় সাধন পথ এবং যশোদা মাঈর প্রেমের পথে পার্থক্য প্রচুর, তবুও এই আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের উপর চিরদিনই কৃষ্ণ-প্রেমের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া দুই চারিটি প্রধান বিগ্রহ দর্শন করিয়া মির্তোলায় ফিরবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা। মহর্ষি সন্দর্শনের মনোজ্ঞ অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বিভিন্ন সময়ে অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনের অব্যবহিত পরেই আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু 'দাদাজী' ডুবাই স্বামী আইয়ার, তিরুভন্না-মালাই-এ উপস্থিত হন। মহর্ষির ঘনিষ্ঠ মহল হইতে কৃষ্ণপ্রেমের দিব্য অনুভূতিময় অভিজ্ঞতার কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। মহর্ষি এবং কৃষ্ণপ্রেমের তখনকার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি এইরূপ :

আহার ও বিশ্রামের পর কৃষ্ণপ্রেম মহর্ষির হলঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করেন, নিচে এক পাশে উপবিষ্ট হইয়া শুরু করেন ধ্যান মনন। মহর্ষি তাঁহার কৌচটিতে হেলান দিয়া শুইয়া আছেন। আয়ত নয়ন দুটির দৃষ্টি কোন্ দুজ্ঞেয় রহস্যলোকে উধাও হইয়া গিয়াছে। ঠোঁটের কোণে অর্ধস্ফুট প্রসন্নতার হাসি। ত্রিশ-চল্লিশটি ভক্ত ও দর্শনার্থী তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। কেহ অবাক বিস্ময়ে এই আত্মজ্ঞানী মহাত্মার দিকে নির্নিমেষ চাহিয়া আছেন, কেহবা রত রহিয়াছেন প্রাত্যাহিক এবং নিয়মিত ধ্যান জপে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম দিব্য ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তস্তল হইতে বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে একটি অস্ফুট স্বরের প্রশ্ন—'কে তুমি ? কে তুমি ? কি তোমার প্রকৃত স্বরূপ ?'

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একনিষ্ঠ সাধক কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিপ্রেম আর বিগ্রহ সেবায় দিনরাত থাকেন মশগুল। অন্তর্লোক হইতে উত্থিত ঐ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তেমন আমল দেন নাই। কিন্তু তিনি এড়াইতে চাহিলেও, এ প্রশ্ন এবং নেপথ্যচারী প্রশ্নকর্তা যে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না। আবার তাঁহার চৈতন্যের দ্বারে বার বার আসে করাঘাত। কে যেন বলিতে থাকে—কে তুমি, কে তুমি, কি তোমার স্বরূপ ?

ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই উত্তর দিতে চেষ্টা করেন কৃষ্ণপ্রেম, বলেন, "আমি কৃষ্ণের নগণ্য দাস মাত্র।"

আবার ধ্বনিত হয় দৈবী প্রশ্ন—"কে কৃষ্ণ কে কৃষ্ণ ?"

"কৃষ্ণ শ্রীনন্দের নন্দন। বংশীধর, রসময়, ভক্তের প্রাণধন।"

তবুও বিরাম নাই অন্তরাত্মা হইতে উত্থিত সেই দৈবী প্রশ্নের। এবার কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণের স্বরূপ ও পরিচিতির পরিধি বাড়াইতে থাকেন, বলেন, "কৃষ্ণ অবতার, পরাৎপর, সারাৎসার তবুও দৈবী প্রশ্নকর্তার নিরস্ত হইবার লক্ষণ নাই। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া কৃপাময়ী রাধারানীর শরণ নেন কৃষ্ণপ্রেম। রাধারানী বলিয়া দেন 'কৃষ্ণ ছাড়া বিশ্ব সৃষ্টিতে দ্বিতীয়

কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই তবে কৃষ্ণের পরিচয় কে দেবে ? কে জ্ঞাপন করবে তাঁহার স্বরূপ আর মাহাত্ম্য ? শুধু কৃষ্ণই যে বলতে পারেন কৃষ্ণের কথা। যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ—মানুষের সাধ্য কি যে তাঁর সম্বন্ধে বলবে ?"

পরের দিন প্রভাতে কৃষ্ণপ্রেম আশ্রমের হলঘরে মহর্ষির পায়ের কাছাকাছি বসিয়া আছেন। মহর্ষি একটু ঘুরিয়া বসিয়া তাঁহার দিকে করিলেন প্রসন্নমধুর দৃষ্টিপাত—অগাধ অতলস্পর্শী দৃষ্টি হইতে স্বর্গের সুধা যেন অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছে। নীরবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মহর্ষি মৃদু হাসি হাসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের কাছে মহর্ষির লীলাখেলাটি পরিষ্কার হইয়া উঠিল। উপলব্ধি করিলেন, গতকাল যে দৈবী প্রশ্ন বার বার তাঁহার অন্তরাল হইতে উত্থিত হইয়াছে, মহর্ষিই ছিলেন তাহার পিছনে।

প্রসন্ন মনে, নয়ন নিমীলিত করিয়া, কৃষ্ণপ্রেম ধ্যানে বসিলেন। অল্পক্ষণের ম । অনাস্বাদিতপূর্ব দিব্য আনন্দে তাঁহার সারা দেহমন প্রাণ প্লাবিত হইয়া গেল।

এই আনন্দের আবেশ কিছুটা কাটিয়া যাইতেই মহর্ষির দিকে তাকাইয়া কৃষ্ণপ্রেম মনে মনে প্রশ্ন করিলেন, 'যদি এতটা কৃপাই আমায় করেছেন, হে মহাত্মন্, তবে এবার আমার জানিয়ে দিন কে আপনি, কি আপনার স্বরূপ কি আপনার তত্ত্ব ?'

এই নীরব প্রশ্নটি করার পর মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, এ কি অদ্ভুত কাণ্ড, মহর্ষি তাঁহার কৌচে নাই। এতগুলি ভক্ত ও দর্শনার্থীর দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুহূর্ত মধ্যে স্থূল-দেহটি কোথায় উড়িয়া গেল ? কোথায় তিনি অন্তর্হিত হইলেন ? এ কি কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টি বিভ্রম না মহর্ষিরই অলৌকিক লীলা ?

নিজের চোখ দুইটি ক্ষণতরে নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেম আবার তাকাইলেন কৌচের দিকে। এ কি। এবার যে মহর্ষি সশরীরে জীবন্ত শিবের মতো সেখানেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, কৃষ্ণপ্রেমের দিকে অপাঙ্গে স্মিতহাস্যে একটু তাকাইয়া মুখটি ফিরাইয়া নিলেন অন্যদিকে। স্থূল শরীরের এই চকিত আবির্ভাব আর অন্তর্ধান এই 'ঝাঁকি দর্শন', সেদিন কৃষ্ণপ্রেমকে কোন তত্ত্ব জানাইয়া দিয়া গেল ? শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত কৃষ্ণপ্রেম এ সময়ে অস্ফুট স্বরে আপন মনে কহিতে লাগিলেন, "মহর্ষি, আপনার কৃপায় আমি বুঝেছি।—স্থূল সূক্ষ্মের গণ্ডীর বাইরে, দ্বন্দ্বাতীতলোকে, আপনি রয়েছেন সদা বিরাজিত। আত্মজ্ঞানী হে মহাসাধক, আপনাকে প্রণাম, বার বার প্রণাম।"

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, উচ্চকোটির গুপ্ত সাধক শ্রীএস, ডুবাইস্বামী আইয়ারের সহিত মহর্ষি রমণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[১] কৃষ্ণপ্রেমের তিরুভন্নামালাই-এ যাওয়ার কিছুদিন পরে ডুবাইস্বামী মহর্ষি রমণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। সে সময়ে মহর্ষি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন, "তুমি কি কৃষ্ণপ্রেমকে জানো ? এবার সে এখানে এসেছিল।"

ডুবাইস্বামী উত্তরে বলেন, "আমি তাঁর কথা, তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষার কথা, অনেক শুনেছি। আমার কয়েকটি বন্ধু কৃষ্ণপ্রেমকে অন্তরঙ্গভাবে জানেন। তবে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি কখনো।"

---

১ এস ডুবাইস্বামী আইয়ার কর্মজীবনে ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ অ্যাড-ভোকেট। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন তিনি, আর ছিলেন মহর্ষি রমণের স্নেহধন্য, কৃপাধন্য। পরবর্তীকালে ডুবাইস্বামী যোগীবর কালীপদ গুহরায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হন।

মহর্ষি রমণ কহিলেন, "দেখা ক'রো তার সঙ্গে। ত্যাগী প্রাণসুন্দর পুরুষ—জ্ঞানী আর ভক্ত একাধারে সে দুই-ই।"

কয়েক বৎসর পরে তুরাইস্বামীর সহিত কৃষ্ণপ্রেমের সাক্ষাৎ ঘটে কলিকাতায়, হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে। সে সময়ে উভয়ে উভয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পাইয়া আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন।

ত্রিবুভন্নামালাইর পর ত্রিচিনপল্লী হইয়া কৃষ্ণপ্রেম শ্রীরঙ্গমে উপনীত হন। এ স্থানে প্রভু রঙ্গনাথের সম্মুখে যে অলৌকিক দর্শন ও দিব্য অনুভূতি তিনি লাভ করেন, তাহার স্মৃতি জীবনে কোনো দিন তিনি ভুলিতে পারেন নাই। হঠাৎ কখনো কখনো মনের দুয়ার খুলিয়া গেলে, কৃষ্ণপ্রেম অন্তরঙ্গ মহলে এই অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করিতেন।

পুণ্যতোয়া কাবেরীতে স্নান সমাপন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। শেষশায়ী প্রভু রঙ্গনাথের মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকার পর তাঁহার ধ্যাননেত্রে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে এক অলৌকিক দৃশ্য। দেখেন দিব্যালোকের তরল জ্যোতির ধারা সারা বিশ্ব সৃষ্টিতে ওতপ্রোত রহিয়াছে আর ঐ জ্যোতির সাগরে বিরাজিত রহিয়াছেন পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানী। ঠাকুর আর ঠাকুরানীর চরণপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইতেছে দিব্যপ্রেমের অনন্ত প্রবাহ—আর এই প্রবাহে সমস্ত বিশ্বসংসার হইয়া উঠিয়াছে প্রেমময় চৈতন্যময়।

উত্তরকালে যখনি কৃষ্ণপ্রেম এই দিনকার দিব্য উপলব্ধির কথা বলিতেন, তখনি মন্তব্য করিতেন, "ভারতের মন্দির ও সিদ্ধপীঠগুলো আধ্যাত্মিকতার এক একটি শক্তি-কেন্দ্র। নিষ্ঠা নিয়ে, অহংবোধ বিবর্জিত হয়ে এসব পুণ্যস্থলীতে গিয়ে তপস্যা করলে পরম বস্তু পাওয়া যায় বৈ কি।"

নির্মোহ, অভিমানহীন, প্রেমিক মহাপুরুষ ছিলেন কৃষ্ণপ্রেম। তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সাক্ষাৎভাবে দেখার সুযোগ আমরা একবার পাইয়াছি। এলাহাবাদে থাকার সময়ে কৃষ্ণপ্রেমের (তৎকালীন রোনাল্ড নিক্‌সন) সহিত শ্রীযুক্ত বীরেন ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই ঘনিষ্ঠতা উত্তরকালে পরিণত হয় শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়।

বীরেন ব্যানার্জি মহাশয় কলিকাতার একটি প্রতিষ্ঠানের অফিসার ছিলেন। দূরে থাকেন বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমের হিমালয় আশ্রমে সব সময়ে যাওয়া ঘটিত না, কিন্তু পত্রের মাধ্যমে সর্বদা যোগাযোগ রাখিতেন।

কলিকাতায় যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়কে বীরেনবাবু ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং নিয়তই হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে তাঁহার নিভৃত কক্ষে আসিয়া তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিতেন।

একদিন শ্রীগুহরায়ের কক্ষে বসিয়া লেখক দুই একটি ব্যক্তিগত কথা বলিতেছেন এমন সময়ে বীরেনবাবু সেখানে ঢুকিলেন। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত গুহরায় বলিলেন, "কি ব্যাপার? কয়েকদিন দেখি নি কেন? আপনাকে যেন এক নূতন মানুষ দেখ্‌ছি?'

"না-না নূতন আর কি হবো, যথা পূর্বং পরং", বলিয়া ব্যানার্জি মহাশয় চোখ মিলিয়েছেন।

"ফাঁস ক'রে দেবো নাকি আপনার গোপন প্রেমের কথা? এখানে বাইরের কেউ নেই।"

"কি যে বলছেন—বলিয়া ব্যানার্জিমহাশয় তখন বিপন্নভাবে আমতা আমতা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গুহরায় উচ্চরবে হাসিয়া কহিলেন, "আরে, ভালো সন্দেশ, সবাইকে তা বেঁটে দিতে হয়। লুকোচ্ছেন কেন? কৃষ্ণপ্রেমের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, এতো ভালো কথা। কোথায় কিভাবে কোন্ ভঙ্গীতে বসে, কি মন্ত্র নিয়েছেন, সব যে আমার জানা।"

"আপনার কাছে, দাদা কিছুই লুকানো যায় না, তা দেখেছি। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ যোগী আপনি। তা আমাদের মতো চুনোপুটিকে নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করা কেন?"

"আপনি বুঝি ভাব্ছিলেন, লোকে বলবে—বীরেন ব্যানার্জি অনেক দিন বিলেতে ছিলেন, এখানে এসেও সাহেব-গুরু ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করলেন না—এই তো? এ জন্যই তো এত গোপনতা।" কৌতুকের সুরে বলেন শ্রীযুক্ত গুহরায়।

"না না, তা নয়। ভাবছিলুম, আমার মতো লোকের দীক্ষা, এ আর আপনাকে জানাবার মতো কি সংবাদ।"

"না না, এ খুব সুসংবাদ। আমি আপনাকে ভালোবাসি, তাই বিশেষ ক'রে খুশী হয়েছি এই দেখে যে আপনি উপযুক্ত গুরু পেয়েছেন। কৃষ্ণপ্রেম খাটি বস্তু।"

বীরেন ব্যানার্জিমহাশয়ের বয়স হইয়াছে, শরীরও তেমন ভালো নয়, গুরুর কাছে সব সময়ে যাওয়া আসা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়ের প্রতি তাঁহার প্রচুর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস. নির্ভরতাও ছিল। গুরুকে তিনি সব সময়ে কাছে পান না, তাই অনন্যোপায় হইয়া একদিন নিজের সাধন সম্পর্কিত একটি সমস্যায় গুহরায়মহাশয়ের পরামর্শ চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত গুহরায় বলিলেন, "তা তো হয় না। আপনার গুরু কৃষ্ণপ্রেমের কাছ থেকে তাঁর অনুমতি আনিয়ে নিন, নইলে আপনাকে আমি সাহায্য করি কি ক'রে?"

কয়েকদিন পরে ব্যানার্জিমহাশয় বলিলেন, "গোপাল দার (কৃষ্ণপ্রেমের) কাছে চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি লিখেছেন,—বীরেন, তুমি যোগীবরের কাছ থেকে উপদেশ অবশ্যই নিতে পারো। তোমার কথা রাধারানীর কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি জানালেন, এতে তোমার কল্যাণই হবে।"

শ্রীযুক্ত গুহরায় একথা শুনিয়া সহাস্যে কহিলেন, "এই দেখুন আপনার গুরু কৃষ্ণপ্রেমের প্রকৃত মহত্ত্ব। আমার কাছ থেকে আপনি নির্দেশ নিলে গুরু হিসেবে তাঁর আপত্তির কারণ নেই। আচ্ছা, সারা ভারতবর্ষে ক'জন গুরু এমন কথা, এমন মন খুলে বলতে পারেন?"

বীরেন ব্যানার্জিমহাশয়ের সম্পর্কিত এই ঘটনাটি হইতে বুঝা যায় প্রেমসাধনার কোন্ উত্তুঙ্গ স্তরে কৃষ্ণপ্রেম বিরাজিত ছিলেন আর ভারতের উচ্চকোটির মহাত্মাদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল কত ঘনিষ্ঠ।

সে বার কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণপ্রেম কলিকাতায় আসিয়াছেন। যোগীবর কালীপদ গুহরায় এবং কৃষ্ণপ্রেম উভয়েরই উভয়কে দেখার প্রবল ইচ্ছা। হিমাদ্রি [illegible] ভবনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল, আমরা পূর্বাহ্নেই জানাইয়া দিলাম, কৃষ্ণপ্রেমের ভজন কীর্তন আমরা শুনিব। কয়েকটি ভক্ত শিষ্য নিয়া, সন্ধ্যার পর [illegible] কৃষ্ণপ্রেম সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই দুই মহাত্মার মিলনে আনন্দের জোয়ার বহিয়া গেল

কীর্তন শুরু হইয়াছে। ভাবাকুল নেত্রে কৃষ্ণপ্রেম গাহিতেছেন, আর তরুণ ভক্ত মাধবা-

শীর বাজাইতেছেন মৃদঙ্গ। সারা দেহ-মন-প্রাণ দিয়া যে কীর্তন গাওয়া হয়, ভক্তের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া যে কীর্তন সরাসরি পৌঁছে গিয়া ইষ্টদেবের চরণ-কমলে, এ সেই প্রাণময় চৈতন্যময় কীর্তন। মননী শ্রোতারা উপলব্ধি করিলেন, এই ভজন কীর্তন কৃষ্ণ-প্রেমের ঠাকুর-সেবা ও ঠাকুর-পূজার এক প্রধান অন্যতম উপচার।

নয়ন মুদিয়া, গদ্‌গদ কণ্ঠে করতাল জোড়া বাজাইয়া কৃষ্ণপ্রেম গাহিয়া চলিয়াছেন :

নন্দরবী বাধে আওরে ধনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুটমণি।

সারা হলঘরটি সুধী ভক্ত শ্রোতাদের সমাগমে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও তিলধারণের স্থান নাই, কাহারো মুখে একটি শব্দ নাই। ভাবতন্ময় দীর্ঘবপু, শালপ্রাংশু মহাভুজ এই ইংরেজ বৈষ্ণবের দিকে নির্নিমেষে অবাক্ বিস্ময়ে শ্রোতারা সবাই চাহিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন রাধারানী এবং কৃষ্ণের কৃপা কি অঝোর ধারেই না ঝরিয়াছে এই মহাবৈষ্ণবের আধারে। এ গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধরিলেন রাধা প্রেমের ভিখারী কৃষ্ণের আর এক মর্মস্পর্শী গান।

কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটিযুগ যদি আমারে ভজয়ে
বৃথাই সাধনা তার।

প্রায় ঘাত একটা অবধি ভজন কীর্তন চলিল। শ্রোতারা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ, সার্থকনামা সাধকের চৈতন্যময় সংগীত তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দিয়াছে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের দিব্যলোকে।

কীর্তনের শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন কৃষ্ণপ্রেম। একজন শ্রোতা কহিলেন, "রাধারানীর উদ্দেশে নিবেদিত আপনার গানগুলি অনেকেরই চোখে জল এনে দিয়েছে। আজকাল আপনি দেখছি রাধাপ্রেমেই বেশী বিভাবিত।"

"রাধা কৃষ্ণশক্তি! রাধা আর কৃষ্ণে তফাত কোথায়? কৃপাময়ীর কৃপার বলেই যে কৃষ্ণকে ধরা ছোঁয়া যায়। আজকাল রাধারানীই চালাচ্ছেন আমায়, যা কিছু পাবার পাচ্ছি তাঁর কাছ থেকেই।"

আবার একজন শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে অনুরোধ করিলেন, "কৃষ্ণ ভজনের পথ কি, সংক্ষেপে আমাদের একটু বলুন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "পথ তো একটাই। সেটি হচ্ছে ঠাকুরের রাজপথ, সবারই তো চেনা। সে দিয়ে, সর্বময়কে পেতে হবে? তবে কে কিভাবে সে পথে এগুবে, সেইটাই প্রশ্ন। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণ তো নিজেই তাঁর কথাটি সহজ ক'রে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাম্ নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যম্ তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।

—মনকে একাগ্র করো আমার দিকে, তোমার ভক্তি দাও আমায়, সব কিছু কর্ম অর্পণ করো আমার সেবা পূজায়, তাহলেই তুমি আসবে আমার কাছে, আমার প্রিয় হবে, এ প্রতিশ্রুতি তোমায় আমি দিচ্ছি।

আরো কয়েকবার দেখা হইয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে। একদিন ভজন ও তত্ত্বালোচনা শুনিতে অনেকে সেখানে জড়ো হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণপ্রেমকে বলিলাম, "বেশ

আছেন আপনারা হিমালয়ের কোলে মির্তোলায়। সমস্যা-জর্জর আধুনিক সমাজের ছোঁয়া সেখানে পৌঁছে না, কানে আসে না হিংসা ও আর্তির কণ্ঠস্বর। কৃষ্ণ আর রাধারানীকে নিয়ে পরমানন্দে রয়েছেন উত্তর বৃন্দাবনের আশ্রমিকেরা।"

সাধক কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টি সদাই ছিল স্বচ্ছ, নির্মোহ এবং একাগ্র। ভাবালুতা আর সংশয়ী কূটতার্কিকতা দুইয়ের ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি আর সাধনজাত সূক্ষ্ম অনুভূতির বলে যে কোন প্রশ্নের মর্মমূলে পোঁছিতে পারিতেন মুহূর্তমধ্যে। উত্তরে কহিলেন, "এই পাগলোটে পৃথিবী থেকে দূরে আমরা রয়েছি, মানুষের হানাহানি আর হিংস্র কলরব সেখানে নেই তা ঠিক। সাধনজীবনের পক্ষে সে পরিবেশ অনুকূল তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেইটেই তো বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, মনকে কেন্দ্রীভূত ক'রে কৃষ্ণচরণে স্থায়ীভাবে ন্যস্ত করা, মিলিয়ে দেওয়া। একৈকনিষ্ঠা আর একাগ্রতা নিয়ে 'এক'-কে ধরতে হবে, তাছাড়া তো অন্য পথ নেই। মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপমাটি সব সাধকেরই মনে রাখা উচিত। 'ওম' হচ্ছে ধনু, আত্মা—শর আর লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান্, ব্রহ্ম—যাঁর ভেতরে বিদ্ধ করতে হবে ঐ শর, মিশিয়ে দিতে হবে সম্পূর্ণরূপে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ—তা নইলে কিছুই হবে না। উত্তর বৃন্দাবন আর বৃন্দাবন বড় কথা নয়, বড় কথা তাঁর চরণে আত্মার আহুতি—পূর্ণাহুতি।"

সমাগত সবাইকে লক্ষ্য ক'রে প্রসন্নমধুর স্বরে বলিলেন, "কৃষ্ণ আমাদের সবটা নিতে চান, আর দিতে চান নিজের সবটা একেবারে পুরোপুরি। আংশিক দেওয়া নেওয়া তাঁর ধাতে নেই। অখণ্ড পরম বস্তু কিনা, তাই। কৃষ্ণকে পেতে হলে, দুহাত দিয়ে তাঁর চরণ ধরতে হবে, একহাত কৃষ্ণের চরণে আর এক হাত নিজের দিকে—বিষয়ের দিকে. তা হলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি কখনো হবে না।"

আবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম কৃষ্ণপ্রেমকে, "কোন শাস্ত্র পাঠ ক'রে কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান আপনি পেয়েছেন ?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'। এই মহান্ গ্রন্থ প্রথমে পড়েছি গুরুমায়ের কাছে, শেষেও পড়েছি তাঁরই কাছে। তাঁর সঙ্গে আমি এই পুরাণের প্রতিটি লাইন বার বার ক'রে পড়েছি, তাঁর শ্রীমুখ থেকে তত্ত্বোজ্জ্বলা ব্যাখ্যা শুনে উপলব্ধি করেছি কৃষ্ণের জীবন ও বাণীর রহস্য। আমি তো মনে করি, উপনিষদের হৃদয় হচ্ছে ভাগবত, আর উপনিষদের জ্ঞান-সায়রে ভাগবত যেন মধুময় শতদলের মতো ফুটে রয়েছে যুগযুগান্তের ভক্তদের কল্যাণে।"

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেম যেমন শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তেমনি তিনি বিশ্বাস করিতেন, এ যুগেও ভারতের মানুষ আধ্যাত্মিক সত্যের মূল্য বেশী দেয়।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে একদিন তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "গোড়ার দিকে ভারতের অন্তর্জীবন সম্বন্ধে সংশয় ও সন্দেহ কিছুটা ছিল। কিন্তু দীক্ষা নেবার পর সে সব দূরীভূত হল দৃষ্টি আমার স্বচ্ছ হয়ে এল। দেখলাম, ভারতই বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ বজায় রয়েছে সিদ্ধসাধকদের রাজত্ব, কখনো সে রাজত্বে ছেদ পড়ে নি, আর এ দেশের কোটি কোটি মানুষ তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে আসছে। প্রায় এক শতক আগে মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও অধিকাংশ ভারতবাসী আজ অবধি প্রাচীন যুগের ধ্যান ধারণা ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু একদল আধুনিক শিক্ষিত লোক হঠকারী মনোবৃত্তি নিয়ে পাশ্চাত্যের লোকদের অনুসরণ ক'রে

বলতে শুরু করেছে—হিন্দুধর্ম মধ্যযুগীয়, হিন্দুর দেবদেবীর পূজা আসলে গাছ পাথরের পূজা, হিন্দু সাধুরা সমাজের পরগাছা, আর হিন্দুর অবতারগণ শূন্যগর্ভ ধর্মনেতা। যারা এসব কথা বলছে, তারা পাশ্চাত্যের চোখ ঝলসানো মেকি বৈষয়িক সাফল্য দেখে মোহাবিষ্ট হয়েছে, তাদের আমি অনুকম্পার চোখে দেখি। কিন্তু সুখের কথা, সে সব লোকের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়, ভারতের আত্মার স্পন্দন তাঁদের কানে কোনো দিন পৌঁছায় নি, অথচ একটু স্থির হয়ে কান পেতে শুনলে আজো ভারতের জনজীবনে তার সন্ধান মেলে। তাই দেখতে পাই এক টুকরো গৈরিক পরা যে কোনো সাধু এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে পায় রাজোচিত সম্মান, শুধু পাশ্চাত্যের গোলামিতে অভ্যস্ত যারা, সংখ্যায় যারা খুবই কম, তারাই এঁদের অবজ্ঞা করে। আসল কথা, ভারতের সাধারণ মানুষ আজো সাধু-জীবনের পবিত্রতাকে সম্মান দেয়, ভক্তি ও জ্ঞানকে শ্রদ্ধা জানায়। যদি নিজে সে ভজন সাধন কিছু নাও করে, তবুও ভগবানের প্রতিনিধিরূপে যে সব সিদ্ধপুরুষ হাজার হাজার বছরের পুরাতন আত্মিক ঐশ্বর্য বহন করে চলেছেন তাদের চরণে প্রণত হয়।

"কুম্ভমেলায় কি দেখ? লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দীন দরিদ্র লোক মাঘের প্রচণ্ড শীতে গঙ্গায় অবগাহন করছে, ছিন্নবাস পরিহিত সাধুদের পায়ে প্রণাম ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করছে। শুধু কুম্ভমেলা কেন, যে কোনো হিন্দু পূজা পার্বণের পেছনে রয়েছেন ভগবান্ আর তার প্রতীক দেবদেবীর প্রেরণা।"[১]

ভারতবর্ষে থা কয়া ভারতের বৈরাগ্যময় তপস্যায় ব্রতী হইয়া কৃষ্ণপ্রেমকে মাঝে মাঝে কটুবাক্য শুনিতে হইয়াছে, নিগ্রহও ভোগ করিতে হইয়াছে।

একবার তিনি ট্রেনে চড়িয়া মাদ্রাজের দিকে যাইতেছিলেন। কামরায় এক পাশে বসিয়া একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। কৃষ্ণপ্রেমের পরনে গৈরিক বহির্বাস, মুণ্ডিত মস্তকে দীর্ঘ শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তের ঝুলিতে রহিয়াছেন ঠাকুরের বিগ্রহ—এটি তাঁহার নিত্যকার পূজার বিগ্রহ।

কৃষ্ণপ্রেমের কথাবার্তা শুনিয়া মহিলাটি বুঝিলেন ইনি একজন খাঁটি ইংরেজ। একটু বাদেই কৃষ্ণপ্রেমের দিকে রোষভরে তাকাইয়া তিনি গালাগালি শুরু করিলেন, "ধর্মত্যাগী অপদার্থ কোথাকার। তোমার কি লজ্জা নেই একটুও? কোন্ মুখে পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম ছেড়ে, নিজের আত্মীয়স্বজন ও দেশ ছেড়ে, এই সব বাজে দলে ঢুকেছো?"

মনে হইল মহিলাটি যেন ক্রোধে ফেটিয়া পড়িতেছেন। সঙ্গীয় সহযাত্রীরা চঞ্চল হইয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু নীরব রহিয়াছেন, আর মিটিমিটি হাসিতেছেন।

মহিলাটি এবার আরো উত্তেজিত হয়ে কহিলেন, 'আমি জিজ্ঞেস করি, কি পেয়েছো তুমি? কি পেয়েছো তোমার নিজের দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি সব কিছু ছেড়ে এসে?"

কৃষ্ণপ্রেম প্রশান্ত ভাবে ঝুলি হইতে ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহটি বাহির করিলেন, তারপর সেটি হাতে নিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ম্যাডাম, পেয়েছি এটিকে—আমার কৃষ্ণকে আমি পেয়েছি এখানে এসে।"

মহিলাটির আর বাক্স্ফূর্তি হইল না, ঘাড় বাঁকাইয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন।

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম : রেমিনিসেন্সেস : দিলীপকুমার রায়

নিজের সাধ্য ও সাধনা বিষয়ে কৃষ্ণপ্রেম বলিয়াছেন, "আমার আদর্শ বা তত্ত্বকে চারটি কথায় প্রকাশ করা যায়,—'কিছুই চেয়ো না. দাও সর্বস্ব।' এক সময়ে অধ্যাত্ম জীবনের অনুভূতি ও দর্শনাদির জন্য মন বড় ব্যাকুল হতো। তারপর বুঝতে পারলাম, এসব চাইলে কৃষ্ণ বড় কৃপণ হয়ে পড়েন, পিছিয়ে যান। আরো উপলব্ধি করলাম, কৃষ্ণকে যখন ভালবাসা দিচ্ছি, তখন তার মধ্যে দিব্য অনুভূতি লাভ করার লোভ জড়িত থাকবে কেন? কৃষ্ণ তাঁর ইচ্ছে মতো, আর আমার প্রয়োজন বুঝে সেসব দেবেন। আলো হাওয়ার মতো সহজ ও মুক্ত হবে আমাদের ভালবাসা।

"কেউ তাঁকে বলে নিরাকার, কেউ বলে সহস্রপাদ। আমার কাছে পর্যাপ্ত তাঁর ঐ দুটি চরণ। কী অপূর্ব কী মধুময় তাঁর চরণ! ঐ চরণ দুটি হারিয়ে গেলে, তার বদলে ব্রহ্মানন্দ বা মুক্তিও আমার কাম্য নয়। পরম বস্তু বিশ্বসৃষ্টির বস্তুতেই রয়েছেন। কৃষ্ণ আনন্দময় না হলে এই বিশ্ব আনন্দে ওতপ্রোত থাকতো না, একথা যদি সত্য হয়, তবে আমি বলবো, কৃষ্ণ বস্তুময় এবং বাস্তব না হলে এই বিশ্বপ্রপঞ্চে বাস্তব বলে কোনো কিছু থাকতো না, অনুভবেও তা আসতো না। কৃষ্ণের বিগ্রহ কৃষ্ণের জ্যোতি, কৃষ্ণের মাধুর্য সবই আমার কাছে বাস্তব[১]।"

অনেক স্থলে অনেকের কাছে কৃষ্ণপ্রেম বার বার বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ প্রাপ্তি হলে, কৃষ্ণের দেখা পেলে, মায়া প্রপঞ্চ বলে আর কিছু থাকে না, যা কিছু চোখে পড়ে, যা কিছু অনুভবে আসে, অনুভবের বাহিরেও যা কিছু থাকে, সবই হয়ে যায় কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের ভেতরেই সব কিছু রয়েছে, কৃষ্ণই বিরাজ করছেন সব কিছুকে নিয়ে। তিনিই ব্রহ্মানন্দ, তিনিই নন্দনন্দন, তিনিই গোপীবল্লভ, আবার তিনিই কুরুক্ষেত্রের সারথি—তিনিই একাধারে সব কিছু[২]।"

সাধনা সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেমের ধারণা ছিল অতি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। সাধক কবি দিলীপ-কুমার রায়কে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন "ধর্ম অথবা যোগ, যে নামেই আত্মিক সাধনাকে অভিহিত করা হোক না কেন, তার অর্থ কিন্তু শুধু একটিই। শক্তি লাভের জন্য কোনো কোনো সাধক বিশেষ ধরনের জ্ঞান আহরণে প্রয়াসী হয়, কখনো বা শুধু জ্ঞান লাভের জন্যই সচেষ্ট হন। এ কিন্তু যোগ নয়। সাধকের ভাবময়তা অনেক সময় মনোরম স্বর্গীয় সৌন্দর্যময় দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এটাও যোগ নয়। কোনো কোনো সাধক তাঁদের ধ্যান ধারণার বলে অতীন্দ্রিয় ধোঁয়াটে ধরনের চিন্তারাশিকে ফুটিয়ে তোলেন, তাও যোগের পর্যায়ে পড়ে না। দুর্গত মানবের সেবাকে যোগ বলে আমি অভিহিত করবো না, যদিও সিদ্ধ সাধকেরা বিশ্বের সর্বজীবকে এমন ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, বুদ্ধের মতে—যে ভালোবাসা শুধু মায়ের বুক থেকে ঝরে পড়ে তাঁর একমাত্র সন্তানের জন্য। হঠযোগীর আসন মুদ্রা প্রাণায়ামের ফলে ব্যাঙের মতো বিস্ফারিত হওয়া আর ফেটে পড়া, তাকে তো প্রকৃত যোগের পর্যায়ে ফেলা যায়ই না। আসলে যোগের স্বরূপ হচ্ছে, কৃষ্ণে

---

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম : দিলীপকুমার রায় (পত্রাবলী)

২ কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাখ্যাত তত্ত্বের পরিচয় মিলে প্রধানত তাঁহার রচিত তিনটি গ্রন্থে। এগুলির নাম সার্চ ফর ট্রুথ, যোগ অব্ ভগবৎ গীতা, যোগ অব্ কঠোপনিষদ্। ইহা ছাড়া 'এরিয়ান পাথ্' সাময়িকীতে বিভিন্ন সময়ে বহু প্রবন্ধাদি তিনি লিখিয়াছেন। মুমুক্ষুদের কাছে লেখা তাঁহার মূল্যবান চিঠির সংখ্যাও কম নয়।

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ—এ সমর্পণে কোনো দাবি নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনো বাসনার লেশমাত্র নেই, আছে কেবল নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া। যেসব কাজ বা চিন্তা এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকে সম্ভব ক'রে তোলে তাই হচ্ছে সাধনা। আর এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতি হিসেবে যে আত্মিক বস্তু এগিয়ে আসে সাধকের সামনে, তাই হচ্ছে ভাগবতী লীলা।"

কৃষ্ণপ্রেমকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল ভগবৎ-কৃপা বলিয়া কোনো বস্তু আছে কিনা এবং সে কৃপার প্রকৃত স্বরূপ কি ?

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট দৃঢ় ভাষায় বলবো, ভগবৎ-কৃপা বিরাজ করছে সারা সৃষ্টি জুড়ে, আর সেই কৃপার মাধ্যমেই মানুষ পৌঁছতে পারে কৃষ্ণের চরণে। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে কৃষ্ণ পুরুষকার আর দৈবের মানুষের ইচ্ছাশক্তি আর ঐশ্বরীয় বিধানের কথা বলেছেন, পুরুষকার যেন ক্ষেত্রকর্ষণ, আর দৈব—আকাশের বৃষ্টি-ধারা। এ তুলনাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, তাহলে তপস্যা হচ্ছে—বীজবপন, যে বীজ সাধক তার অভীপ্সা অনুযায়ী বপন করে থাকে। আর সেই বীজের ওপর যে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ে তা আসে ভগবানের কাছ থেকে।"

এই ভগবৎ কৃপাপ্রসঙ্গে বিশদভাবে আরো তিনি কহিলেন, "এই ধূলিধূসর কোলাহলময় পৃথিবীতে যখনই কেউ আত্মাহুতি দেয়, নিজেকে উজাড় ক'রে ঢেলে দেয় ভগবৎ প্রেমের আগুনে, তখনই ঘটে একটা অলৌকিক বিস্ফোরণ। তাই হচ্ছে ভগবৎ কৃপার প্রকৃত স্বরূপ।

হরিদাস (ডাঃ আলেকজাণ্ডার) ছিলেন একবার অন্যতম শ্রোতা। রসিকতার সুরে তিনি কহিলেন, "উপমাটি চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন শুধু শুধু ঐ আগুনের ভেতর নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেবে কেন ? আমরা সবাই ঐ আগুনের ভস্ম হতে যাবো কেন ?"

স্মিতহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম বলিলেন, "এ মন্তব্যের উত্তর আমি অবশ্যই দিতে পারি। সূর্যের ভেতর যখনই যে কোনো জ্যোতিষ্ক প্রবেশ ক'রে বিলীন হয়ে যায়, তখনই তা বিশ্বজগতে সৃষ্টি করে এক নূতন প্রাণদায়িনী শক্তি ও উত্তাপ। প্রকৃতপক্ষে, কোনো আত্মাহুতিই তো এই পৃথিবীতে ব্যর্থ হয়ে যায় না।"

লোকচক্ষুর অন্তরালে, হিমালয় অঞ্চলের নিভৃত অঞ্চলে, প্রেম—ভক্তির সাধনায় দীর্ঘকাল নিরত ছিলেন কৃষ্ণপ্রেম। অতিমাত্রায় প্রচারবিমুখ ছিলেন এই বৈরাগী মহাপুরুষ, সহসা কাহাকেও শিষ্য করার সম্মতি তিনি দিতেন না। শহর বন্দর ও জন-সংঘট্ট সতর্কভাবে এড়াইয়া চলা ছিল তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস। কিন্তু ফুল ফুটিলে ভ্রমর আসিয়া জুটিবেই। তেমনি সাধক কৃষ্ণপ্রেমের সিদ্ধিময় জীবনের সৌগন্ধ আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল শত শত ভক্ত ও মুমুক্ষুকে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু জিজ্ঞাসু শরণ নিয়াছিলেন তাঁহার কাছে। যুদ্ধোত্তর সমাজের হিংসা দ্বেষ ও অশান্তিতে উত্ত্যক্ত হইয়া অনেকে আসিতেন, অনেকে আসিতেন জড়বাদী আধুনিক সভ্যতার বন্ধ্যা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া। ভাবুক ও স্বপ্নবিলাসী একদল বিদেশী আসিতেন রহস্যময় হিমালয়ের আশ্রয়ে সাধনভজন করার জন্য। ইহাদের অনেকেই হয়তো শেষ অবধি স্থায়িভাবে এদেশে থাকতে পারেন নাই কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের সান্নিধ্য ও উপদেশ তাঁহাদের জীবনে প্রেরণা যোগাইয়াছে, সাধনজীবনের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে।

সব চাইতে বিস্ময়কর, কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি ভারতীয় ভক্ত ও মুমুক্ষুদের আকর্ষণ। সংখ্যায় ইহারা বিদেশী ভক্তদের চাইতে বেশী। সত্যকার বিশ্বাস ও নিষ্ঠা নিয়া ইহাদের অনেকেই কৃষ্ণপ্রেমকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, অগ্রসর হইয়াছিলেন প্রেম ভক্তিময় সাধন পথে। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, ভারতের বহু আশ্রমেই ভারতীয় সাধকদের কাছে বিদেশী ভক্তদের ভিড় করিতে দেখা যায়, কিন্তু কোনো বিদেশী গুরুর কাছে ভারতীয় ভক্ত মুমুক্ষুরাও শরণ নিতেছে, এমন দৃশ্য সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। কৃষ্ণপ্রেমের বেলায় এই ব্যতিক্রমটি দেখা গিয়েছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সর্বশ্রেণীর ভারতীয় ভক্তকে নির্বিচারে আশ্রয় দিয়াছেন কৃষ্ণপ্রেম, গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁদের অধ্যাত্মজীবন।

সাধনা ও সিদ্ধিময় জীবন এবার ধীরে ধীরে তাহার শেষ পর্যায়ে আসিয়া পড়ে। কৃষ্ণপ্রেম এবার প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন চিরবিদায়ের প্রতীক্ষায়।

বহুদিনের পুরানো হুক্‌ওয়ার্ম রোগ আবার সেদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শরীর হইতেছে জীর্ণ ও বিধ্বস্ত। চিকিৎসার কথা উঠিলেই সহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম বলেন, "চিরদিন ঠাকুরই তো আমার ডাক্তার। আর কার কাছে যাবো, বলতো?"

অন্তরঙ্গ শিষ্য মাধবাশীষ ও অন্যান্য ভক্তেরা পীড়াপীড়ি করিয়া নাইনিতালের বড় ডাক্তারের কাছে তাঁহাকে নিয়া গেলেন, কিন্তু তেমন কিছু উন্নতি দেখা গেল না।

ভক্তেরা অনুনয় করিয়া কহিলেন, "গোপালদা, ঠাকুর ও রাধারানীর কাছে কত কথাই তো আপনি নিবেদন করেন, কখনো তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন না। এবার বলুন, আপনি যাতে ভালো হয়ে ওঠেন।"

স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "আয়ু বাড়ানোর কথা বলছো? একবার তো ঠাকুর বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেই বাড়ানোর মেয়াদই এখন চলছে।"

এ সময় দেহ সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার হইয়া উঠিয়াছেন কৃষ্ণপ্রেম। কথাবার্তায় সদাই দেখা যায় আত্মস্থ ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব। ভক্ত শিষ্যেরা আপ্রাণ চেষ্টায় সেবা পরিচর্যা করিয়া চলিয়াছেন। সকলেরই চোখে মুখে প্রবল উৎকণ্ঠার ছাপ। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণপ্রেম বলেন, "জানতো, ঠাকুরের হাতে দুটো ডোর রয়েছে, একটা ওপরের দিকে টানেন, আর একটা নিচের দিকে। এবার নিচেরটা টানবার পালা।"

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ই নবেম্বর কৃষ্ণপ্রেমের প্রতীক্ষিত বিদায় লগ্নটি আসিয়া যায়। প্রিয় ভক্ত ও সেবকদের দিকে তাকাইয়া ভাবাবিষ্ট অর্ধবাহ্য অবস্থায় মহাসাধক বলেন, "মাই শিপ ইজ সেইলিং"—আমার জাহাজ এবার পাড়ি দিতে চলেছে। অতঃপর, ছেদ পড়িয়া যায় মরজীবনের ধারায়, সার্থকনামা সাধক কৃষ্ণপ্রেম বিলীন হইয়া যান কৃষ্ণপ্রেমের মহাপারাবারে।